# বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

২য় খণ্ড ] বৈশাখ, ১৩১০ সন। [ ১ম সংখ্যা।

## আনন্দ-লহরী।

অথবা

যোগ-বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,—
আনন্দেন জীবন্তি,—
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

অর্থাৎ

আনন্দ হইতেই এই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইতেছে,—আনন্দ-স্বরূপের আনন্দ-শক্তিতে জীবিত রহিতেছে, এবং প্রয়াণ-সময়েও পুনরায় সমস্তই সেই আনন্দস্বরূপে যাইয়া প্রবেশ করিতেছে।

প্রভাত-সূর্য্য, প্রদোষ-লক্ষ্মীর ললাট-ভূষণ স্বরূপ প্রফুল্ল চন্দ্রমা, এবং আকাশ-কুসুম-সদৃশ নক্ষত্র-মালা, যেন কার আনন্দে আনন্দময় হইয়া, এই নিখিল জগতে, আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে, কতই ত আনন্দ দান করিতেছে। মনুষ্য নিরানন্দ রহিতেছে কেন? সুগভীর সমুদ্র, সমুচ্ছ্রিত পর্ব্বত, শ্যামল প্রান্তর, ঘন-শ্যাম বৃক্ষরাজি,—বৃক্ষ-সন্নিহিত পুষ্পিত ব্রততী, সকলেই ত এ সংসারে আনন্দের প্রতিকৃতি। তবে মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তিতে সে আনন্দ উদ্ভাসিত হয় না কেন?

সমীর-সঙ্গ-চঞ্চলা স্বভাব-বিহ্বলা নদী,

জোয়ারে ফুলিয়া, আপনার লীলাময় অঙ্গে ভাবের ঢেউ তুলিয়া, সূর্য্যের সমুজ্জ্বল আলোকে, অথবা চন্দ্রের সুশীতল জ্যোৎস্নায়, হাসিয়া খেলিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, কুলু-কুলু-কল-নাদে বহিয়া যাইতেছে। আনন্দ-চঞ্চলা শফরী, নদীর প্রান্তশোভি পুলিনে, ক্ষণে ক্ষণে, আপনার পুচ্ছ বিক্ষেপণে, কটাক্ষ-বিক্ষেপের অনুকরণ করিতেছে। সুবিশাল রোহিত, গভীর জলে আনন্দে সঞ্চরণ করিয়া, নদীর তরঙ্গ-চাঞ্চল্যেও অস্পৃষ্ট রহিতেছে। নাদের বিহঙ্গমালা, চরাভূমির চারিদিকে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া, প্রকৃতির সর্ব্বময়-আনন্দে আনন্দের ভাগ অথবা "ভোগ-রাগ" যোগাইতেছে। শুধু জীব-শ্রেষ্ঠ মনুষ্যই, অদূরে—একাকী উপবিষ্ট রহিয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে, কিংবা অবসন্ন বদনে, আপনার নিরানন্দ-জীবনের দিন গণিতেছে! ইহা কেন?

যেমন নদীর তটে, তেমন নিদাঘ-শোভাময় বন-ভূমির বিশাল ও বিচিত্র পটে। সেখানেও সকল সময়েই প্রকৃতির ঐ সদানন্দ মহোৎসব। যখন বন-ভূমির আনন্দ-প্রবণ উদাস-প্রাণ, ঊষার হসিত-মূর্ত্তি, অথবা সন্ধ্যার শত-বর্ণ-সুচিত্রিত ঝল-মল সৌন্দর্য্য দর্শনে, অসংখ্য-বিহঙ্গের কল-কঠোর, মৃদু-গম্ভীর, সুখ-সুশ্রুত-নিঃস্বনে, সমতান-সংগীতবৎ, একসঙ্গে মুখরিত হয়;—অবনীর সে স্তুতি-গীতি যখন আকাশে উঠিয়া, মেঘের পটল-মালা পার হইয়া, নক্ষত্রে নক্ষত্রে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, অন্তরীক্ষচারী দেবপুরুষ ও দেবনারীরাও, বোধ হয় তখন, জীব-জন্তুর জগন্ময় আনন্দে, এক অননুভূত-পূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু মনুষ্য, তাদৃশ অসাধারণ সময়েও, আপনার নিরানন্দ-হৃদয়ের অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইয়া, প্রকৃতির সুস্নিগ্ধ তনুকে প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সন্তাপিত করে কেন?

বস্তুতঃ মনুষ্যের এই নিরানন্দ অন্ধকারের অর্থ কি? মনুষ্য দুঃখে যেমন স্বভাবতঃ নিরানন্দ, সুখের সাময়িক উচ্ছ্বাস-সময়েও, যেন স্বভাবের বিরুদ্ধভাবে, প্রায় তেমনই নিরানন্দ;—প্রিয়-বিচ্ছেদে যেমন নিরানন্দ, প্রার্থিত-দুর্ল্লভ-প্রিয়-সম্মিলনেও প্রায় তেমনই নিরানন্দ। মনুষ্য-হৃদয়ের এই নিত্য-মগ্ন নিরানন্দ-জড়তা মানবজাতিকে বিশেষ কিছু শিখায় কি? মনুষ্য, সিংহাসনে বসিয়া অথবা সোনার খাটে শুইয়াও, অশ্রু বিসর্জ্জন করে, এবং পর্ণকুটীরে অবস্থিত হইয়াও অশ্রুজলে আপ্লুত রহে। মনুষ্য কি তবে এই সংসারে শুধুই কাঁদিতে আসিয়াছে, কাঁদিয়া দিন কাটাইবে,—এবং এই ভাবে, স্বভাবে ও অভাবে, ভবের হাটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শরীরে শীর্ণ ও অন্তরে বিদীর্ণ হইয়া, এক দিন মহাশূন্যে মিশিয়া যাইবে?

সেকেন্দর, সিজর ও সার্‌লিমেন * প্রভৃতি

* । Charlemagne or Charles the Great এক সময়ে সমগ্র ফ্রান্সের রাজ্যেশ্বর, এবং জার্ম্মণিক-সাম্রাজ্য অথবা (Empire of the West) পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও অধীশ্বর ছিলেন। তৃতীয় লিয়ো (Pope Leo III) নামক রোমের পোপ লম্বার্ডদিগের রাজ্যধ্বংসের পুরস্কারে

সর্ব্বজয়ী বীরেরা যেমন, জয়োল্লাসের পর অবসাদে কাঁদিয়াছেন ; সাহিত্য যাঁহাদিগের নাম-উচ্চারণেও শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত হয়, — যাঁহাদিগের প্রসঙ্গে, সামান্য কোন কথা লিখিতে হইলেও, ভয়ে দুঃখে, লজ্জায় ও ঘৃণায়, জড়ীভূত হইয়া, মাথা নোয়ায়, তাদৃশ কাপুরুষেরা,—ফরাশি-রাজকুমার ফ্রান্‌শোয়া * প্রভৃতি তাদৃশ পুরুষ-কলঙ্কেরাও এই পৃথিবী হইতে সেইপ্রকার শুধু কাঁদিয়া গিয়াছেন। রাজ-রাজ্যমান ও রমণীমোহন এণ্টনি কাঁদিয়াছেন, একদিকে রোমের সাম্রাজ্য এবং আর একদিকে রূপসী ক্লিওপেটরার অতুল-রূপের বাণিজ্য-সম্ভার নয়নের সম্মুখে লইয়া ; আর শা ইন্‌ শাহ্‌ আলমগীর কাঁদিয়াছেন, আপনার অতৃপ্ত অভিমানে ও অপরিতৃপ্ত ক্রোধের আগুনে, অহর্নিশ দগ্ধ হইয়া। ফল-কথা, এ বিষয়ে, এক, দুই, তিন করিয়া, প্রসিদ্ধ অথবা অপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক-পুরুষের নাম-উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মানব-জাতির সাহিত্যই মানব-হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি, বিকাশ ও ক্রমাগত সুখ-দুঃখের আশ্চর্য্য ইতিহাস। যদি আমরা সাহিত্যরূপী ইতিহাসের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করি,—যদি বাল্মীকি ও ব্যাস এবং হোমার ও ভর্জ্জিলের লেখা হইতে আরম্ভ করিয়া, অদ্যকার সদ্যোমুদ্রিত কাব্যসাহিত্যের উপরও নয়নাবর্ত্তন করিয়া যাই, তাহা হইলে কি দেখিতে পাই ? দেখিতে পাই, উহার পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে, সর্ব্বত্রই ঘন কিংবা তরল অশ্রুরেখা ; এবং উহার আদ্যোপান্ত সমস্ত কথাই মনুষ্যের অবিরাম-প্রবাহিত অশ্রুজলে লেখা। কিবা বায়রণ ও শেলির মত কবি, কিবা লামার্টিন ও রুস্‌সোর মত সান্দর্ভিক, সকলেই নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন ; এবং যাঁহারা ক্ষণকাল হাসিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারাও, হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া, মানব-হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় হাহাকারের সাক্ষ্য দিয়াছেন। পুনরপি জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যের এই নিরাশ অন্তর্দ্দাহ ও নিরানন্দ জীবনের মর্ম্মার্থ কিছু আছে কি ?

জগতের কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী এবং স্থলচর ও জলচর সর্ব্ববিধ জীবই, খেলিয়া সে-ই ইঁহার প্রতারণায় প্রাণ হারাইয়াছে, অথবা ঘোরতর বিপত্তির সাগরে গড়াইয়া পড়িয়া, চিরকাল হাহাকার করিয়াছে।

---

* ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় হেন্‌রী এবং 'রুধির-পিপাসাকুলা' রাজ্ঞী ক্যাথারিণের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি প্রথম বয়সে ডিউক অব্‌ আলেন্‌সোঁ ( Duke of Allencon ) বলিয়া পরিচিত ছিলেন,—তার পর, ডিউক অব্‌ আন্‌জু ( Francois De France, Duke of Anjou ) নামে চিরকাল ফরাশি ইতিহাসে পরিচিত রহেন। স্ত্রীলোক ও পুরুষের মধ্যে যে ইঁহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে নব-গঠিত পাশ্চাত্য-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

বেড়িয়া, আনন্দ করিয়া, দিন যাপন করিতেছে। অথচ, জীবের মধ্যে, যে আজি, অবনীতে, অধীশ্বরের ন্যায় দণ্ডায়মান,—যে আজি, করে দূরবীক্ষণ ও প্রভাবীক্ষণ * (Spectroscope) লইয়া, দূরাদ্‌-দূরতর-স্থিত দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছে, অথবা অণুবীক্ষণের সাহায্যে চর্ম্ম-চক্ষুর অগ্রাহ্য অণুপ্রমাণ-কীটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে;—বিদ্যুৎ যাহার আজ্ঞাপালনের জন্য বিনা তারে সংবাদ লইয়া যায়, এবং বিশ্বের আর সর্ব্ববিধ অপ্রত্যক্ষ শক্তিও, প্রত্যক্ষবৎ সম্মুখে রহিয়া, অহোরাত্র যাহার মন যোগায়, সেই মহাশক্তিশালী মহীপতি মনুষ্য, কার আক্রোশে উৎপীড়িত, অথবা কার অভিসম্পাতে অন্তর্দগ্ধ হইয়া, দিনে নিশীথে অশ্রু বর্ষণ করে, এবং আপনার নিরানন্দ অন্ধকূপে আপনি একাকী ডুবিয়া রহে। যথা কবির উক্তিতে,—

"এ আমার আঁধার কুটীরে,
সন্ধ্যার প্রদীপ নাহি জ্বলে,
আমি যে তিমিরে, আহা! সে তিমিরে
ডুবে আছি অদৃষ্টের ফলে।"

এ আমার নীরব কুটীরে
একা আমি জীবন কাটাই,
একা ভাসি তপ্ত অশ্রু নীরে,
বিষাদের গান একা গাই।"*

মানব-জীবনের উল্লিখিতরূপ জগদ্ব্যাপি নিরানন্দ-গীতির অর্থ করিতে যাইয়া দার্শনিক ও নীতিপ্রবর্ত্তকদিগের মধ্যে কত লোকে কতপ্রকার অপরূপ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই উত্তমরূপে অবগত আছেন। কেন না, এই কথাই, প্রকারান্তরে কাব্যসাহিত্য, ইতিহাস ও উপন্যাসের প্রধান কথা, এবং ইহা পৃথিবীর দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রেরও মুখ্য কথা। †

কিন্তু এই পুরাতন তত্ত্বকথা, ধীরে ধীরে আলোচিত ও ধীরে ধীরে অনুধ্যাত হইয়া, এই ক্ষণ, বহু যুগের পরে, যোগ-তত্ত্বজ্ঞ বৈজ্ঞা-

---

* "(Spectrum and scope.)—An optical intrument for forming and examining spectra (as that of solar light, or those produced by flames in which different substances are volatalized) so as to determine, from the position of the spectral lines, the composition of the substance." এতগুলি কথা ঐ এক স্পেক্ট্রস্কোপ শব্দে প্রকাশ পায় কি না, তাহা বিজ্ঞ লোকের বিচার্য্য। বাঙ্গালায় ইহার অর্থবোধক আর কোন শব্দ না থাকা হেতু প্রভাবীক্ষণ শব্দ ব্যবহৃত হইল।

* "মাধুরী।—কবিতা-পুস্তক।—শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন প্রণীত।"

† যাঁহারা কথাটা ভাল করিয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা The Hopes of The Human Race by Frances Power Cobbe আর Essay on Religion by John stuart Mill এই দুই খানি পুস্তক মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন।

নিকদিগের শান্ত, সমুন্নত ও সুনির্ম্মল অন্তরে, যে সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে হৃদয়ে আর কোনরূপ দুঃখ দুর্ভাবনার স্থান থাকে'না। পুরাতন ভারতের ধ্যান-মগ্ন ঋষিরা যেমন, অন্তঃপ্রজ্ঞার আলোকে অপ্রত্যক্ষকেও প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া, হৃদয়ের আনন্দে, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন যে,—আনন্দ হইতেই এই অখিল-সংসারের উৎপত্তি, আনন্দেই ইহার অবস্থিতি, এবং আনন্দময়ের সহিত তন্ময়তাতেই ইহার শেষ; উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকেরাও সেইরূপ, অন্তরালোক-লব্ধ তত্ত্ব-জ্ঞান, আর প্রমাণ-পরীক্ষিত বিজ্ঞান, এই দুইয়ের সুন্দর সামঞ্জস্য করিয়া, প্রীতি-গদগদকণ্ঠে উপদেশ করিতেছেন যে,—আনন্দময়-অনন্তশক্তিই এই জগতের আদি প্রস্রবণ, আনন্দের ক্রম-বিকাশেই ইহার নিত্য-পরিবর্দ্ধন, এবং চরমে সে আনন্দের পরিপূর্ণতাতেই ইহার পরম-সমাপন। তাঁহাদিগের মতে, এই জল-স্থল-নভোমণ্ডল-ব্যাপিত অনন্ত জগৎ এক অতল ও অপার আনন্দ-সাগর, এবং ইহার আবর্ত্ত ও বিবর্ত্ত সমস্তই সেই এক অনাদি-অনন্ত পূর্ণানন্দের লীলা বলিয়া বিশুদ্ধ-জ্ঞানের চক্ষে চির-মনোহর। এই বিশ্ব-বিলাসি আনন্দ-লীলা অথবা আনন্দ-সাগরের আনন্দ-লহরী, নিখিল জড়জগতে রূপের তরঙ্গে, এবং নিম্ন-স্তরস্থ জীব-জগতে নানারূপ আনন্দ-উল্লাসে, উদ্ভাসিত হইয়াও, মনুষ্যের হৃদয়ে যে অনুভূত হয় না, ইহার এই উত্তর,—মনুষ্য আত্মভ্রষ্ট, উদ্দেশ্যভ্রষ্ট অথবা জীবনের তত্ত্বভ্রষ্ট; এবং সুতরাংই প্রাকৃত-নিয়মের অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে, নিজ নিজ হৃদয়-নিহিত নিরানন্দ-ভাবের দুর্ব্বহ বোঝায় অহোরাত্র ক্লিষ্ট। মনুষ্যের রোগ-যন্ত্রণা যেমন আরোগ্যের উপায়-প্রদর্শক, মনুষ্য-জাতির এই নিত্যব্যাপি হৃদয়-যন্ত্রণাও সেইরূপ নিত্যস্থায়ি হৃদয়ানন্দের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু কোন মনুষ্যেরই এই অবস্থা চিরস্থায়ি নহে। মনুষ্য যখন হৃদয়-দাহে উদ্বোধিত হইয়া আপনাকে জানিতে চায়, আপনাকে চিনিতে পায়,—আপনাতে আপনি অবস্থিত হইয়া, আত্মচৈতন্য লাভ করিতে বাধ্য হয়, তাহার অজ্ঞান-জনিত নিরানন্দ-অন্ধকার তখন একবারে দূর হইয়া যায়; এবং সে, সে সময়ে, ঐ আনন্দ-সাগরের লহরীর উপর প্রফুল্ল ও প্রসন্ন মরালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া, পরের প্রাণেও, শতপ্রকারে আনন্দ বিলায়।

যোগ-বিজ্ঞানের এ সিদ্ধান্ত যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ রহিতে পারে না। কারণ, যে জগতে জীবের রক্তশোষক জলৌকা হইতে জগদুজ্জ্বল সূর্য্য পর্য্যন্ত কিছুই অনর্থক নহে,—প্রকৃতির যে বিশাল রাজ্যে বিষ-কীট, বিষাক্ত বিছুটির কণ্টকিত পত্র, এবং লোক-ভয়ঙ্কর ভূকম্প, জল-প্লাবন ও ঘূর্ণডীন প্রভৃতি বাতাবর্ত্তও সার্থক বলিয়া সুপ্রমাণিত, সেই জগতে,—প্রকৃতির সেই রাজ্যে, সমগ্র-মানবজাতিরূপ বিরাট্-বিগ্রহের অন্তর্দ্দাহ-সূচিত নিরানন্দ-নৈরাশ্য কখনও নিরর্থক হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য আত্মভ্রষ্ট, তত্ত্বভ্রষ্ট, অথবা উদ্দেশ্য-ভ্রষ্ট, এ সকল কথার অর্থ কি? মনুষ্য

আত্ম-সম্পর্কে, এবং সমবেত-মানব-জীবনের গতি ও পরিণতি-সম্পর্কে, নিজ নিজ জীবনকে কি ভাবে নিয়মিত করিলে, নিরানন্দের অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আনন্দের অমিয়-মধুর সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সতত শীতল রহিতে পারে? এ তত্ত্ব সামান্যতঃ যতকুটু বুঝিয়াছি, তাহাই সুকুমার-মতি পাঠককে সংক্ষেপে বুঝাইতে যত্নবান্ হইব।

# কিশোর-গৌরাঙ্গ।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

## বিদ্যাবিলাস ও আত্মবিশ্বাস।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই,
সেই পুত্র সেবা বহি আর কার্য্য নাই।"

ভক্তেরা শচীকে আই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। কেন না, তিনি গৌরাঙ্গের গর্ভধারিণী। এই গ্রন্থোদ্ধৃত পুরাতন পদ্যের অনেক স্থলেই আই শব্দ দৃষ্ট হইবে; এবং আমরাও, চির-স্মরণীয়া শচী মাকে সময়ে সময়ে, আই মা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া, আমাদিগের ভক্তিশূন্য পাষাণ-হৃদয়ে ভক্তের আনন্দ অনুভব করিতে যত্নপর হইব।

শচীর সংসার এখন তিন জনকে লইয়া;—স্বয়ং শচী, শচীর জীবন-সর্ব্বস্ব গৌরাঙ্গ, আর আমাদিগের সেই পূর্ব্বপরিচিত স্নেহার্দ্রচিত্ত ঈশান। শচীর পিতা নীলাম্বর মিশ্রপুরন্দরের পূর্ব্বেই স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছেন। ভাই বিষ্ণুদাসও এখন আর নাই। আপনার জন বলিতে আছেন এখন শচীর সখীপতি শ্রীবাস পণ্ডিত, আর ভগিনীপতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন। তাঁহারা সুযোগ পাইলেই গৌরাঙ্গকে দেখিয়া যাইতেন। কিন্তু সে সুযোগ সর্ব্বদা ঘটিত না। গৌরাঙ্গ, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়াই, গঙ্গাদাসের টোলে চলিয়া যাইতেন; শচী নানা রূপ কষ্টে সৃষ্টে গৌরাঙ্গের সংসার নির্ব্বাহ করিতেন, এবং গৌরাঙ্গের জন্য যখন যাহা চাই, তাহাই কাঙ্গালের আয়োজনে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। পরিচারক ঈশান এখনও কতকটা পিছে পিছে থাকেন। তিনি পুনঃপুনঃই টোলে যাইয়া গৌরাঙ্গকে দেখিয়া আসিতেন, এবং শচীকে সর্ব্বদা সংবাদ দিতেন।

পাঠক জানেন, শচী স্বভাবতঃই একটু বেসী স্নেহশীলা ও সন্তানবৎসলা। তিনি তাঁহার সমস্ত সন্তানকেই প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়াছিলেন। সেই ভালবাসা, এখন,

একীভূত হইয়া, এক মাত্র গৌরাঙ্গে আসিয়া ন্যস্ত হইয়াছে। স্রোতস্বিনীর অনেকগুলি মুখ ছিল; বিধাতার ইচ্ছায়, সকল মুখই বন্ধ হওয়ায়, এখন সে সলিল-রাশি, একত্র সঞ্চিত হইয়া, এক-ধারায় অথবা এক-প্রাণে, একই দিকে গড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই দিক্ শচীর সোনার গৌরাঙ্গ।

পতির উপরও শচীর বড় প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি ছিল। শচী, তাঁহার বয়সের প্রথম স্ফুরণ হইতেই, উদার জগন্নাথের জীবন-সঙ্গিনী। পত্নী মাত্রই পতির সুখ-দুঃখ-ভাগিনী সহধর্ম্মিণী ও জীবন-সঙ্গিনী নহে। কিন্তু সরল-হৃদয়া শচী সর্ব্বাংশেই জগন্নাথ মিশ্রের জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন। ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী কেহ ছিলেন না; এবং গৃহস্থালীর প্রথম-পত্তন-সময়ে, দুই চারিটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া সামাজিক-সুহৃজ্জনের সন্দর্শন-রূপ সৌভাগ্য-সুখও বেশী একটা ঘটিত না। তখন জগন্নাথ যেমন শচীকেই তাঁহার সাংসারিক সুখের এক মাত্র লক্ষ্য এবং প্রাণের প্রিয়তম বস্তু জ্ঞানে ভালবাসিতেন, শচীও জগন্নাথকেই তাঁহার সুহৃৎ, সখা, গুরু, জ্ঞান-দাতা এবং প্রাণারাধ্য দেবতা জ্ঞানে, তেমনই অনন্ত-ভাবময়ী প্রেম-ভক্তির উপচারে পূজা করিতেন। সেই জগন্নাথ এখন স্বর্গগত। শচী, পতি-বিয়োগের পর, প্রথম এইপ্রকার অনুভব করিতেন যে, তাঁহার প্রাণটা বুঝি জগন্নাথের মৃতদেহের সহিত চিতার আগুনে ভস্ম হইয়া গিয়াছে, —শুধু তাঁহার দেহটিই লোকে ধরা ধরি করিয়া ঘরে লইয়া আসিয়াছে। তার পর, ক্রমে তাঁহার এইরূপ বোধ হইতে লাগিল যে, তাঁহার লোকান্তরিত পতির যত কিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা,—তাঁহার স্নেহ-মমতা, তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও ভগবৎ-পরায়ণতা, সমস্তই যেন ঐ এক গৌরাঙ্গকে আশ্রয় করিয়া, সজীব ভাবে জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। শচী তাই, স্নেহের সকল প্রকার আকর্ষণে, পুত্রের জন্য এখন প্রকৃত প্রস্তাবে পাগলিনী।

"দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র,
মূর্চ্ছা পায় আই দুই চক্ষে হৈয়া অন্ধ।"
(বৃন্দাবন দাস)

মা যেমন পুত্রের জন্য পাগলিনী, পুত্রও তেমনই মায়ের জন্য পাগল। গৌরাঙ্গ তাঁহার দুঃখিনী মাতাকে কি প্রকারে একটুকু সুখ-শান্তি প্রদান করিবেন, সর্ব্বদাই তাহা চিন্তা করিতেন, এবং মাতার কাছে বিরলে বসিয়া, তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া, মধুমাখা কথায় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেন। বলিতেন,—

"শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি,
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি।

যে পুত্র, শোক-সন্তাপিতা অনাথা মাতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আপনার প্রাণটা ঢালিয়া দিয়া, এইরূপ প্রাণ-স্পর্শি কথা কহে, পৃথিবীতে তাহার সদৃশ-জনের সংখ্যা খুব বেশী নহে। যে পুত্র, মাতাকে প্রকৃতই গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতাজ্ঞানে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করে, এবং মাতৃসেবারূপ মহাব্রতকে ভক্তির ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া মনুষ্যত্বের মহিমা বাড়ায়, তাহার সমান-ধর্ম্মাও সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না।

ভক্তির পুতুল গৌরাঙ্গ তাঁহার দুঃখিনী মাতাকে যেমন প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, তেমন আবার গাঢ়-চিত্তে ভক্তি করিতেন। কিন্তু, তাঁহার মাতৃস্নেহ শৈশব হইতেই সোহাগের খুটি নুটিতে মধুর; মায়ের উপর আখুঁটির অত্যাচার তাঁহার ভালবাসার এক অঙ্গ হইয়াছিল। উহা না হইলেই নয়। তিনি মায়ের কাছে আসিলেই, তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বয়ঃসমুচিত গাম্ভীর্য্য ও বিচার-মল্লতা প্রভৃতি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, ঝাঁপ দিয়া গিয়া মায়ের কোলে বসিতেন; এবং কোথায় কি হইয়াছে, কোথায় কি করিয়াছেন, সমুদয়ই মাতাকে সবিস্তরে জানাইতেন। বাহিরের লোকে তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও মেধার কথা লইয়া নানারূপ সমালোচনা করিত। তিনি অল্প-বয়সেই কিরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, টোলের ছাত্র এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে, সে কথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বদাই আলাপ হইত। তিনি, তাঁহার পৈত্রিক বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া, সেই বয়সেই কিরূপ তদ্গতপ্রাণে ও ভক্তির আবেশে নিত্য-পূজা সমাধা করিতেন, লোকে তাহাও বিস্ময়ের চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। কিন্তু, শচী জানিতেন, তাঁহার নিমাই তখনও সেই অশান্ত শিশু। শচীর কাছে আসিলেই গৌরাঙ্গের আর এক ভাব। ঘরে কি আছে, কি না আছে, তাহার বিচার নাই; কিন্তু যখন যাহা চাই, তন্মুহূর্ত্তেই তাহা পাওয়া আবশ্যক। তাহা পাইতে তিলার্দ্ধের বিলম্ব হইলেই, গৌরাঙ্গ ঘরের দ্রব্য সামগ্রী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পাগলের মত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে শচীর স্নেহেও এক বিচিত্র অন্ধতা ছিল। তিনি গৌরাঙ্গের স্নেহ-শীতল কথায় সুখী হইতেন বটে, কিন্তু গৌরাঙ্গের স্নেহময় আবদারেও হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিতেন। ভগবান্ মাতৃস্নেহে তাঁহার এই কি এক অমৃতময় অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় ভাব লুকাইয়া রাখিয়াছেন, চিন্তা দ্বারা কে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিবে?

গৌরাঙ্গ তাঁহার শৈশবে মাতৃস্নেহের নিকট একবার বিশেষ পরাভব পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার প্রস্ফুট কৈশোরেও সেই মাতৃস্নেহের নিকট আবার অতি বিচিত্র ভাবে মাথা নোয়াইতে হইয়াছিল। মিশ্র মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তির কএক মাস পরে এই ঘটনা। এস্থলে ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখযোগ্য। বেলা দুই প্রহর হইয়া আসিল, গৌরাঙ্গ তখন পর্য্যন্তও বাড়ী আসেন নাই। শচী, গৌরাঙ্গের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তখন তকও বিষ্ণু পূজা হয় নাই। গৌরাঙ্গ না আসিলে, বাড়ীর বিগ্রহ সেবা করিবে কে? গৌরাঙ্গ এমন সময় টোল হইতে বাড়ী আসিলেন। বোধ হয়, সে দিন টোলে, কোন না কোন প্রসঙ্গে, তাঁহার চিত্তে একটুকু বিরক্তি ঘটিয়া থাকিবে। শচী, গৌরাঙ্গকে দেখিয়াই, গঙ্গায় যাইয়া স্নান করিতে বলিলেন। গৌরাঙ্গ বলিলেন,—মা, আমি যে মালা চাহিয়াছিলাম, আমার সেই মালা কই? এ মালা নিজের অঙ্গে ধারণের জন্য নহে,—গঙ্গায় পূজা দিবার

জন্য। কিন্তু শচী, মনের ভুলে মালা সংগ্রহ করিয়া রাখেন নাই। গৌরাঙ্গ, তাহা বুঝিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎই আকস্মিক ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। সম্মুখে একটা ঠেঙ্গা ছিল। তিনি তাহাই হাতে তুলিয়া লইয়া ঘরের সমস্ত মৃণ্ময় ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যথা চৈতন্যভাগবতে,—

"তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে,
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাতে।
ছোট বড় ঘরে যত ছিল ঘট নাম,
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্।
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ,—
তণ্ডুল কাপাস ধান্য লোন বড়ি মুদ্গ।"

কিন্তু ইহাতেও সে ক্রোধের নিবৃত্তি নাই। ক্রোধ আর আগুন এক-প্রকার পদার্থ। উহাতে যতই ইন্ধন যোগান যায়, ততই উহা বাড়িয়া উঠে। ঘরের সমস্ত আহার্য্য বস্তু যখন, ক্রোধের ঐরূপ প্রভাবে, বিনষ্ট হইল, ক্রোধোন্মত্ত গৌরাঙ্গ তখন সিকার সামগ্রী এবং সজ্জিত বস্ত্রাদির উপরও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং তাহাতেও আপনার প্রাণের জ্বালা জুড়াইতেছে না দেখিয়া, বাস্তুগৃহ এবং গৃহ-সন্নিহিত বৃক্ষাদির উপরও পাগলের মত ঠেঙ্গা মারিতে লাগিলেন।

"যতেক আছিল সিকা টানিয়া টানিয়া,
ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া,
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে,
খান খান করি চিরি ফেলে দুই করে।
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষে,
তবে শেষে গৃহ প্রতি হইল ক্রোধাবেশে।
দোহাতিয়া ঠেঙ্গা মারে গৃহের উপরে,
হেন প্রাণ নাহি কারু, যে নিষেধ করে।
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া,
তাহার উপরে ঠেঙ্গা মারে দোহাতিয়া।
তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়,
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা, নাহি সমুচ্চয়।"

গৌরাঙ্গের এইরূপ ক্রোধোন্মাদ অনেকের নিকট অস্বাভাবিক অথবা বিস্ময়াবহ বোধ হইবে। কিন্তু, প্রকৃতপ্রস্তাবে, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কথা নাই। হৃদয় যেখানে ভাবের টল-টল উদ্বেলতায় একটুকু বেশী উচ্ছল, সমস্ত মনোবৃত্তিই সেখানে স্বভাবতঃ প্রবল ও আবেগ-বিহ্বল। ইহাই প্রকৃতির চিরন্তনী গতি। গৌর-চরিত্রে ( emotion ও sentiment অর্থাৎ ) ভাবাদি বৃত্তির অতিমাত্র আধিপত্য ও আবেগ-বিহ্বলতা শিশুকাল হইতেই সমান পরিস্ফুট। তাঁহার প্রাণটা যখনই কোন এক বিশেষ ভাবে আকুলিত হইত, তখনই তিনি একবারে আত্মহারা হইয়া সেই ভাবে ডুবিয়া যাইতেন। তিনি মন-সাধে মালা দিয়া গঙ্গা পূজা করিবেন, প্রাতঃকাল হইতে মনে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে ছিলেন। সে মঙ্গল্য আকাঙ্ক্ষার প্রতি মায়ের ঐ রূপ উপেক্ষা তাঁহার প্রাণে সহিল না। মা তাঁহার ভক্তির পথে উপেক্ষার ভাবে বাধা দিলেন, ইহা তাঁহার একবারেই ভাল লাগিল না। তাঁহার মনোভীষ্ট গঙ্গাপূজা বেশী, না গৃহস্থালীর সুখ-সম্পদ্ ও সাজ-সজ্জা বেশী। মা এতটুকুও বুঝিলেন না কেন? তাই

তিনি, ক্রোধের ক্ষণিক উন্মাদে, কেমন একপ্রকার হইয়া, মায়ের উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা করিলেন। যখন তাহাতেও আত্মায় শান্তি জন্মিল না, তখন আঙ্গিনার ধূলিরাশির মধ্যে লুণ্ঠিত হইয়া, গড়াগড়ি যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে,
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে।
শ্রীকনক-অঙ্গ হৈ'ল বালুকা-বেষ্টিত,
সেই হৈ'ল মহাশোভা অকথ্য-চরিত।
কতক্ষণে মহা প্রভু গড়াগড়ি দিয়া,
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া।"

গৌরাঙ্গের এইরূপ ক্রোধ আর কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই। তিনি, ক্ষণকাল ঐ ভাবে ধূলায় রহিয়া, শেষে একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। সে সংজ্ঞা-শূন্যতা নিদ্রা, না মূর্চ্ছা, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। কিন্তু ক্রোধের আবেগে মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছার পরিণতিতে নিদ্রা, এইরূপ উদ্বেল-প্রকৃতির স্বাভাবিক রীতি। শচী, এত ক্ষণ অদূরে লুকাইয়া থাকিয়া, সমস্ত দেখিতেছিলেন। যখন গৌরাঙ্গ চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, তখন তিনি পুত্রস্নেহে সকলই পাসরিয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন।—

"উঠ উঠ বাছা মোর হের মালা ধর,
আপন ইচ্ছায় গিয়া বিষ্ণু পূজা কর।
ভাল হৈল, যত বাপ ফেলিলা ভাঙ্গিয়া,
যাউক সকল তোমার নিছনি লইয়া।"

গৌরাঙ্গের অন্তরে এতক্ষণ ক্রোধের আগুন ধবক্ ধবক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। উহা ক্ষণস্থায়ি বহ্নিশিখার ন্যায়, ক্ষণ-কালের মধ্যেই জ্বলিয়া ও জ্বালাইয়া, নিবিয়া গেল; এবং তদীয় গভীর-হৃদয়ের ভক্তি ও স্নেহ-পরতা প্রভৃতি চিরস্থায়ি ও চির-পীযূষ-বর্ষি উচ্চ-ভাব সকল, সময় পাইয়া, উথলিয়া উঠিল। গৌরাঙ্গ, মায়ের চক্ষের দিকে চাহিয়া, লজ্জায় যার-পর-নাই জড়সড় হইলেন; এবং মায়ের পদ-ধূলি মাথায় লইয়া, স্নানার্থ নিঃশব্দে গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গেলেন।

গৌরাঙ্গ ঐ দিন বুঝিলেন যে, এ সংসারে মাতৃস্নেহের তুলনা নাই। তিনি, তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অপেক্ষায়, মাতাকে চির দিনই অনেক বেশী ভালবাসিতেন। কিন্তু সেই অতুল ভালবাসায় একটুকু যে বাল-চাপল্য ও ঔদ্ধত্যের লক্ষণ ছিল, সে দিন হইতে তাহা জন্মের মত প্রক্ষালিত হইয়া গেল। মধুর-স্বভাব শ্রীগৌরাঙ্গ, মাতৃভক্তির মধুর-স্বাদ উপলব্ধি করিয়া, মায়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। কিন্তু, মায়ের কাছে গৌরাঙ্গের এই অচিন্তিত ভাব-পরিবর্ত্ত ভাল লাগিল কি? গৌরাঙ্গের আর আবদার নাই, আখুঁটি নাই,—ভালবাসার অত্যাচার নাই। সকল সময়েই তিনি নম্রতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ও বদ্ধাঞ্জলি জ্ঞান-বৃদ্ধ। শচী এ ভাব দেখিয়া পূর্ব্বের সে সুখানুভবে সমর্থ হইতেন কি? মা ভিন্ন মায়ের প্রাণের কথা কে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবে?

কবিবর বৃন্দাবন দাস স্বপ্রণীত চৈতন্য-ভাগবতে লিখিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গ সে দিন অপরাহ্নে, এবং আরও দুই এক দিন, সাংসা-

রিক ব্যয়-সঙ্কুলেনর জন্য, মায়ের হাতে কিছু সোনা আনিয়া দিয়াছিলেন। চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-চরিতামৃত এবং কবি-কর্ণ-পূরের গ্রন্থ-নিচয়ে এইরূপ কোন ঘটনার উল্লেখ থাকা মনে পড়ে না। গৌরাঙ্গ এই বয়সে কোথায় এইরূপ সোনা পাইতেন ? নবদ্বীপে বুদ্ধিমন্ত খাঁন নামক কায়স্থ-ভূম্যধিকারী তখন বড় সমৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁনের সহিত জগন্নাথ মিশ্রের বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকা জানা যায়। নবদ্বীপের অন্যতর কায়স্থ-ভূম্যধি-কারী মুকুন্দ সঞ্জয়, পণ্ডিতবর গঙ্গাদাসের প্রিয়তম শিষ্য। গৌরাঙ্গ সর্ব্বদাই মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। উল্লিখিত সুবর্ণ-সংগ্রহ, পিতৃহীন গৌরাঙ্গের প্রতি এই সকল মহাশয়-পুরুষদিগের অলক্ষিত স্নেহ ও অনুগ্রহ কি না, তাহা অবধারণ করা এইক্ষণ অতি কঠিন। যাঁহারা ইহাতে অলৌকিক-তার অনুসন্ধান করিতে ভালবাসেন, আমরা তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, কোটিহৃদয়ের ভাব-বিপ্লাবি ভক্তির সমুদ্র গৌর-চরিত্রে যাহা কিছু অলৌকিকত্ব, তাহা প্রকৃতই অলৌকিক। সে অপ্রতিম অলৌকি-কতার সহিত সামান্য স্বর্ণখণ্ড অথবা রজত-খণ্ডের সম্পর্ক থাকা সম্ভব নহে। অপিচ, ঐশী শক্তি ঐশ্বরিক-নিয়মের উল্লঙ্ঘন-দ্বারা প্রতি-ষ্ঠিত হওয়াও ইতিহাস-সঙ্গত কিংবা বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। যদি গৌরাঙ্গ, কোনরূপ অজ্ঞাত ও অলৌকিক-শক্তির স্বাভাবিক প্রয়োগে, ধূলি-মুষ্টিকে স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত করিয়া,চিত্তে প্রীতি বোধ করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনও আপনার জীবনে অন্যদীয় অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতেন না ; এবং বুকে দয়ার তাদৃশ তরঙ্গ-বিহ্বলা দেব-গঙ্গা পোষণ করিয়া, বঙ্গে দুঃখ-দারিদ্র্যের লব-লেশও রাখিয়া যাইতেন না।

# আমার স্বপ্ন

## ( ক্ষুদ্র গল্প )

( ১ )

আমার কালেজ বন্ধ হইল। মা এ সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। তিনি বলিলেন,—কাল থেকে কালেজের দু মাস ছুটী হ'ল। এখন তবে, এই দুই মাসের জন্য পাহাড়ে যাও। ললিত ডাক্তার আমাকে বলেছে যে, এই দুই মাস পাহাড়ে হাওয়া খেয়ে এলে, সব রোগ একেবারে ভাল হ'য়ে যাবে।" বিনা আবেদনে মার অনুমতি পাইয়া পরদিন আমি নাইনিতাল পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলাম। দুই মাস পাহাড়ের বায়ু সেবন করিয়া আমার স্বাস্থ্যের কত উপকার হইল, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। ফিরিয়া আসিয়া সকলের মুখে শুনিলাম,আমি পূর্ব্বের

অপেক্ষা আরও কৃশ হইয়াছি। আমার মুখ নাকি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও অধিক পাণ্ডু বর্ণ হইয়াছে। আমার গলার স্বর শুনিতে পাইয়া মা আমাকে দেখিবার জন্য দ্রুতপদে আসিলেন। তিনি কত আশা করিয়া, আমি কেমন সুস্থ, সবল ও সুন্দর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, মনে করিয়া, হাসিতে হাসিতে আমাকে দেখিতে আসিলেন। কিন্তু আমাকে দূর হইতে দেখিয়া, তাঁহার সে হাসি কোথায় লুকাইল!

তিনি সজল চক্ষে বলিলেন "এতদিন পাহাড়ে থেকে শেষ কি এই হ'ল!" তিনি, সেই দিন অবধি প্রত্যহ, আপনার অদৃষ্টকে কত ধিক্কার দিতেন; তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের অপরাধের জন্য কত অনুতাপ করিতেন! অবশেষে স্থির করিলেন, আগামী শ্রাবণ মাসে ৺ তারকেশ্বরের মন্দিরে যাইয়া, আমার জন্য হত্যা দিবেন! প্রতিদিন তাঁহার এই উৎকণ্ঠা ও আত্মগ্লানি ক্রমে যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। আমার মনে হইল, যেন আমি শীঘ্রই পাগল হইব। কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এইরূপে নানা চিন্তা করিতে করিতে, হঠাৎ একদিন মনে হইল, এরূপ বিষময় যন্ত্রণাময় জীবন-ভার বহন করা অপেক্ষা, আত্মহত্যা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। সহসা হৃদয় মধ্যে যেন কি অভিনব আনন্দ সঞ্চার হইল। মনে হইল, মরিলে এ বিষাদময় মনুষ্যলোকে থাকিতে হইবে না। এ বিষম যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিব। তবে কি প্রকারে আত্মহত্যা করিব? দেখিলাম আত্মহত্যার উপায় ত অতি সুলভ;—উদ্বন্ধন, বিষ পান, নদীগর্ভে নিমজ্জন, ইহার মধ্যে সকলগুলিই ত অনায়াস সাধ্য! আমি একাকী বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া এই সকল কথা ভাবিতে ছিলাম, এমন সময় মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "সতীশ! একবার আমার কাছে আয়। একটা নূতন খবর আছে।"

মার কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। তখনই আবার আত্মহত্যার কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম। আমি মনে মনে বলিলাম, "যার মা আছে, সে নাকি আবার আত্মহত্যা করিতে পারে"! মার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "কি মা! কি নূতন খবর? "কি চিঠি এসেছে, পড়ে দ্যাখ্।"

"কার চিঠি"

"মামীর চিঠি!" মা চিঠি খানি আমার হাতে দিলেন। অকস্মাৎ যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে তাড়িত-প্রবাহ ছুটিল। আমি অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া পত্র পড়িলাম। পত্রের কথাগুলি সব মনে নাই, কিন্তু তাহার মর্ম্ম এখনও ভুলি নাই, এ জন্মে ভুলিবার নহে

"তোমার মামার জ্বর হওয়া অবধি, তাঁর শরীর বড় ভাল নাই। তাই ডাক্তার বৈদ্যদিগের পরামর্শ মত তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম দেশে যাইতেছেন। আপাততঃ আমরা মির্জাপুরে থাকিব। কেন না আমার নাতির উপর তোমার মামার যে রাগ হইয়াছিল, এখনও তাহার কোন মুষ্টিযোগ দেওয়া হয় নাই। সে জন্য তিনি

কাশীতে যাইতে অসম্মত হইলেন। তুমি অবিলম্বে সতীশকে মির্জাপুরে পাঠাইয়া দিবে। সে আমার কাছে আসিলেই, তোমার মামার সঙ্গে তাহার বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিব। তার-পর দুই চারি দিন পরেই আমরা সকলে কাশীতে তোমার নিকটে যাইব। আমরা ২০শে আষাঢ় শুক্রবার মির্জাপুরে পৌছিব। দেখিও যেন সতীশের আসিতে বিলম্ব না হয়।"

মা বলিলেন "আজ ২১শে আষাঢ় শনিবার। কাল তাঁরা মির্জাপুরে এসেছেন। তবে শীঘ্র যাও। আর দেরি করে কাজ নাই!"

আমি মাকে কিছু না বলিয়া বাটীর বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

( ১০ )

দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট উদ্ধব বাবু নামে আমার পরিচিত এক জন বাঙ্গালীর একটি ইংরেজী ঔষধের দোকান ছিল। আমি সেই দোকানে গিয়া দেখিলাম, উদ্ধব বাবু একাকী একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া একটি গুড়গুড়ী সম্মুখে রাখিয়া ধূম পান করিতেছেন ও এক একবার ঔষধক্রেতার প্রতীক্ষায়, দ্বারদেশে চাহিয়া দেখিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া বলিলাম,—"উদ্ধব বাবু! আপনার দোকানে যত প্রকার বিষ আছে,—তাহার মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা অমোঘ ও আশুফলপ্রদ বিষ কোন্‌টি?" তিনি বলিলেন,—"কেন? Liquor Hydrocenic acid।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কতখানি সেবন করিলে, এক জন মানুষের জীবন নষ্ট হয়?" তিনি বলিলেন "দশ ফোঁটা একজন লোকের পক্ষে যথেষ্ট। কেন? ব্যাপারটা কি?"

"ব্যাপার আর কি? বিশ ফোঁটা দুইটা শিশিতে সমান অংশে আমাকে দিন।"

আমি মনে মনে স্থির করিলাম, এই বিষ ঔষধ লইয়া গিয়া মির্জাপুরে নিতাই দাদার স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তার-পর তাঁকে গঙ্গায় স্নান করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যাইব। আর দুজনে পবিত্র গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, দুজনে, এক সঙ্গে, এই অমোঘ বিষ সেবন করিব! দুজনের ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত, দুজনে এক সঙ্গে করিব! দুজনের পাপ, দেহ গঙ্গার অনন্ত প্রবাহে একসঙ্গে ভাসিয়া যাইবে। দুজনের পাপ প্রেম-লালসা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্রোতে জন্মের মত এক সঙ্গে বিলীন হইবে! উদ্ধব বাবু আমার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন,—"আপনি না কালেজের প্রোফেসার? আপনি না এম এ, পাশ করেচেন? আপনি কি জানেন না, এ বিষ, ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন না হ'লে আমাদের এক ফোঁটাও বিক্রী করবার ক্ষমতা নাই।"

"সে সব কথা থাক, যদি দুশ টাকা নগদ দাম দিই, তাহ'লে বিশ ফোঁটা—Hydrocenic acid আমাকে দিবেন কি না, বলুন।"

উদ্ধব বাবু সবলে আলবোলার নল টানিতে টানিতে বলিলেন,—"দুশ টাকা?—তা! তা! কি জানেন, মশায়!—তবে কি না! তা আপনি কোন ডাক্তারের (Prescription) প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন যোগাড় কর্‌তে পারেন না?"

"না। ডাক্তারের (Prescription) প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন আবার কোথায় পাব ?"

"তাই ত! তা দুশ টাকা আপনি সঙ্গে এনেচেন ?"

"এখনি নগদ দুশ টাকা আপনাকে এনে দিচ্চি !"

"হাঁ!—অবশ্য! তা ত অবশ্য এনে দিবেন জানি! তা টাকাটা—তবে কি জানেন—তা বলুন দেখি, Hydrocenic acid নিয়ে আপনি কি ক'র্‌বেন ?"

"সে কথায় আপনার দরকার কি? আপনি নগদ টাকা নিন, আর আমাকে ঔষধ দিন।" উদ্ধব বাবু আবার চিন্তা করিয়া, আবার সজোরে ধূম পান করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"না মশায়! বড়ই দুঃখের বিষয়! কি জানি, কেহ জান্‌তে পার্‌লে, শেষে কি টাকার লোভে, বুড়ো বয়সে জেলখানায় যাব ?"

আমি উদ্ধব বাবুর দোকান হইতে চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে পার্শ্ববর্ত্তী একখান দোকান হইতে এক টাকার আফিম কিনিয়া পকেটে রাখিয়া, বাটী ফিরিয়া আসিলাম।

বাটী আসিয়া দেখিলাম, মা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মির্জাপুরের মেল গাড়ি কোন্ সময় যাবে ?"

আমি কৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিলাম "এগারটার পর।"

"তবে শীগ্‌গির খাওয়া দাওয়া ক'রে নাও।" পাছে মা আমার মনের কথা জানিতে পারেন,এই আশঙ্কায় আমি স্নানাদি শেষ করিয়া, অনেক ক্লেশে ও অনেক যত্নে কিছু খাদ্য সামগ্রী গলাধঃকরণ করিলাম। মা বলিলেন "তাড়াতাড়িতে কিছুই খাওয়া হ'ল না! তা ফিরে আস্‌তে কদিন লাগ্‌বে? সেখানে অধিক দেরি না ক'রে, যত শীগ্‌গির পার, তোমার নিতাই দাদাকে আর তোমার ঠান্ দিদীকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে।"

আমি সজল চক্ষে জন্মের মত মাকে শেষ প্রণাম করিয়া, আফিমের কৌটাটি অতি যত্নে পকেটে রাখিয়া, ষ্টেশনে আসিয়া রেলগাড়ীতে উঠিলাম। আমি সেই আষাঢ়ের বিপুলকায়া গঙ্গার সফেণ, সুন্দর শীতলতরঙ্গ রাশি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মনে হইল, এই পবিত্র শ্বেত-তরঙ্গরাশির অনন্ত শয্যায় শান্তিময়, স্বপ্নহীন চির নিদ্রা কি অসীম সুখ! আবার অকস্মাৎ মার মুখ মনে পড়িল। মা আমাকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। যখন তিনি শুনিবেন, এ জন্মে আর আমি তাঁর নিকটে ফিরিব না, তখন তিনি কি করিবেন? ভাবিতে ভাবিতে, চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে, আমি দুই প্রহরের পর মির্জাপুরে পৌছিলাম।

( ১১ )

নিতাই দাদা মির্জাপুরে, গঙ্গার ধারে যে বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন, ঠান্‌দিদীর পত্রে তাহার ঠিকানা লেখা ছিল। আমি অল্পক্ষণ মধ্যেই,সেই বাটীর সম্মুখে পৌছিলাম। তখন প্রবলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তিনী গঙ্গার তরঙ্গ কল্লোলের সঙ্গে, বৃষ্টিধারা পত-

নের শব্দ ও মেঘ গর্জ্জনের ঘোরগম্ভির নিনাদ মিশিতেছিল। সেই বাটীর বাহিরের দুয়ার খোলা ছিল। আমি বাটীর ভিতরে আসিয়া, সেই দুয়ারের নিকট দাঁড়াইলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অকস্মাৎ সেই বৃষ্টিধারার শন্ শন্ শব্দের সঙ্গে, সেই পূর্ণকায়া জহ্নবীর প্রেমোচ্ছ্বাসে অস্ফুট, অব্যক্ত অমর লোকের ভাষার সঙ্গে, সেই মেঘগর্জ্জনের মৃদঙ্গ নিনাদের সঙ্গে আর একটি কি মধুর নিনাদ মিশিল! আমার প্রাণ মুগ্ধ করিয়া,—হৃদয়ের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া, সম্মুখের দ্বিতল কক্ষ মধ্য হইতে রমণী কণ্ঠে গীতধ্বনি উঠিল! আমি নিশ্চল দেহে, শিহরিত কলেবরে, সেই গীত শুনিতে লাগিলাম।

এই যদি ছিল মনে কেন দেখা দিয়েছিলে!*
নয়নে রাখি নয়ন কেন আঁখি মিলাইলে!
ছিছি সখা! নাহি মনে, বারেক আঁখিমিলনে,
কত যে প্রাণের কথা নিমেষেতে বলে ছিলে!
কত সাধ, কত আশা, কত সুখ ভালবাসা,
কত যে অমৃত ধারা প্রাণ মাঝে বরষিলে॥
হায়! কোন্ অপরাধে, না জানি নাথ! কি সাধে,
সে সব কাড়িয়া, হৃদে, হুতাশন জ্বেলেদিলে।
ঢালিলাম অবিরল, শতধারে আঁখিজল,
নিবিবেনা সে অনল, তুমি আসি না নিবালে॥

গীতি ধ্বনি নীরব হইল। তবুও আমি সংজ্ঞাহীনের ন্যায় সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সহসা যেন বিষাদময় মর্ত্ত্যলোকে, চারিদিকে, সহস্রধারে প্রীতি-প্রবাহ ছুটিল!

আমার আত্মহত্যার সংকল্প সেই প্রীতি-প্রবাহে ভাসিয়া গেল। মনে হইল, মনুষ্যলোক সুখ, শান্তি ও প্রেমের নিকেতন! কতক্ষণ আমি সেই ভাবে, সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, বলিতে পারি না! হঠাৎ কাহার উচ্চ সম্বোধনে আমার মোহ-ভঙ্গ হইল। কে পশ্চাৎ হইতে বলিল, "বলি কেডা ও? বলি হোথায় চোরের মতন দেঁড়্যে কেডা ও?" দেখিলাম,নসীরাম হুঁকা হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বলিতে লাগিল,—"বলি তবু ভাল! এত দিন পরে যে পাতরডা নরম হ'য়েছে, স্যাও ভাল। মুই ভাবেছেলাম, চুম্বুক পাথরের টানে পাতরডা আপনি চলে আস্‌বে! শ্যাষ কিনা দ্যাখলাম, তোমার সকলি উল্‌টো।" আমি বলিলাম,—"নসীরাম! কি খবর বল দিকি!" নসীরাম বলিল,—"খবর আবার ফের জেগ্‌গাসা কর্‌চো? তুমি যেদিন কাউকেও কিছু না ব'লে পেল্যে আস্‌লে, সেইদিন থ্যাকে তোমার নিতাই দাদার মুখে য়্যাক দণ্ডের জন্য হাসি দ্যাখ্‌লাম না। আর মোর লাতনীর কথা আর কি বল্‌বো? স্যাতো তোমার জন্যি ঝ্যান বোশাখ মাসের চাতক পাখী হ'য়ে উঠ্‌লো!"

নসীরামের কথা শুনিয়া আমার মনে রাগ হইল। আমি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলাম—"সে সব কথা তোমাকে

* মল্লার—আড়াঠেকায় এই গীতটি গাওয়া যাইতে পারে।

জিজ্ঞাসা ক'র্‌চি না। এখানে কে কে এসেছে, তাই বল।"

নসীরাম বলিল "মুই সঙ্গে না এলে তো তোমার নিতাই দাদা গাঁয়ের বাই'রি পা বাড়াতি পারেন না। তা তো জান। তাই মুই এসেছি, তোমার নিতাই দাদা, আর মোর দুই লাতনী এসেছে! আর রাঁধা বাড়া করবার জন্যে হৃদয়পুরের সেই মাসী মা এসেচেন!"—"তোমার দুই লাতনী আ-বার কে, তা তো বুঝ্‌তে পার্‌চি না!"

"তা আর য়্যাখন বোঝ্‌বে কেন? হা মোর অদেষ্টো! এই দ্যার বছরের মধ্যি সব ভুলেগেছে? বলি স্যাই যে, মোদের মোহনপুরে আস্‌বার সময়, স্যাই বাগানডার মধ্যি দেঁড়্‌য়ে, স্যাই মন্দিরডার মধ্যি থানে কারে দেখেছিলে মনে পড়ে কি? আবার এখনি ঝার গান শুনে য়্যাতক্ষণ হতভোম্বা হ'য়ে এখানে দেঁড়্‌য়েছিলে, সে কে তাও বুঝ্‌লে না? য়্যা মোর স্যাই লাতনীর গান! এখন বোঝ্‌লে কি না?" নসীরামের কথা শুনিয়া আমার মনে কি একটা বিষম সন্দেহ হইল। আমি তাহাকে বলিলাম,—"আমার নূতন ঠান্‌দিদী অর্থাৎ নিতাই দাদার স্ত্রী তোমার নাতনী, তা ত জানি। কিন্তু তোমার আর এক নাতনী কে, তা ত আমি জানি না।"

আমার কথা শুনিয়া নসীরামের যেন বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল,—"তুমি হটাৎ ঝে কেন য়্যামন রাতকানা হোয়ে উঠ্‌লে তা তো মুই কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি না! বলি, মোর বড় লাতনী ঝে লবক্যাষ্টো বাবুর লাতনী, তার সঙ্গে তো তোমার নিতাই দাদার আজ চার বছর হ'ল বেয়া হ'য়েছে, তা তো জান! আর গণেশ-পুরের হোরি দাস বাবুর ম্যায়ে, মোর বড় লাতনীর মাস্‌তুতো বোন, স্যাই তো মোর ছোট লাতনী! ঝার নাম হচ্চে, উষা! ঝার সঙ্গে য়্যাতকাল তোমার বেয়ার যোগাড় কর্‌ছিলাম! এখন বুঝ্‌লে? না আরও কিছু বল্‌তি হবে? কিছু বল্‌চ না ঝে? অই ঝে মোদের গাঁয়ের চন্দুরে ধোপা আগা গোরা মহাভারতের কথা কতক ঠাউরির মুখে শুনে, শ্যাষে বোলে ওঠ্‌লো, ক্যাষ্টো ঠাউর তো দোরাপদীর ভাসুর ছ্যালো! তোমারও দ্যাখ্‌চি তাই! তোমার মোহন-পুরে আস্‌বার কথা ঠিক হয়ে গেলে, মোর বড় লাতনী, তুমি বেয়ার আগে মোর ছোট লাতনীকে দেখে পচন্দ করবে জেনে, নিজ বাড়ীতে এনে রাখ্‌লেন। তারপর স্যাই মন্দিরডার মধ্যেতে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে লুকয়ে রইলেন। তারপর আবার ঝখন তুমি বাড়ীর মধ্যেতে জলখাবার খাতি গেলে, তাকে উঠোনে, তোমার সামনে দাঁড় করিয়ে, তোমাকে স্যাখ্‌য়ে দেলেন! সে সব কথা কি স্যার বছরের মধ্যে সব ভুলে গি-য়েছ?" আমার হৃৎপিণ্ড মধ্যে প্রবল ধারে শোণিতপ্রবাহ বহিল। আমি রুদ্ধকণ্ঠে নসী-রামকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে আমি তোমার সঙ্গে মোহনপুরে আস্‌বার সময়,

মন্দিরের ভিতরে যাকে দেখেছিলেম, সে কে? আমার ঠান্‌দিদী নিতাই দাদার স্ত্রী নয়?" "স্যা কথাডা আবার জেগ্‌গাসা কর্‌চো? সেই তো মোর ছোট লাতনী। ঝার সঙ্গে তোমার বেয়ার ঠিক ক'রেছিলাম, আর ঝাকে দ্যাখ্‌বে বোলে, মোর বড় লাতনী বিলাসপুরে আনয়ে ছিলেন, মুই তো স্যা সব কথা তখনি তোমাকে বল্‌লাম।"

আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া, নসীরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

নসীরাম বলিল—"তোমার নিতাই দাদা তো ঘুমুচ্চেন। আর একটু পরেই তিনি ওঠ্‌বেন? মোর লাতনীরা কি কর্‌চে দ্যাখে আসি। খবরডা কিন্তু য়্যাখনও তাদের দেওয়া হবে না?

নসীরাম অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। আমি সেই খানে বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শ্রীননিলাল বন্দোপাধ্যায়।

## পান সম্বন্ধে দু'চার কথা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে, আমরা আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য পান সম্বন্ধেই দু'চারিটি কথা বলিব। "পান সম্বন্ধে দু'চারি কথা" এইরূপ না বলিয়া "তাম্বুলতত্ত্ব" বলিলে প্রবন্ধের শিরোনামটি বেশ গম্ভীর হইত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, আমরা তাম্বুলতত্ত্ব লিখিতে যাইতেছি না। তাম্বুল জিনিসটি অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহার ইতিহাস ক্ষুদ্র নহে। আমরা পানের ইতিহাসে হাত দিব না। কিছু দিন গত হইল, একদিন পান খাইতে খাইতে, মনে পান সম্বন্ধে যে দু'একটি কথার উদয় হইয়াছিল, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব রেজী ধরণে শিরোনাম দিতে হইলে, প্রবন্ধের নাম "পান খাইতে খাইতে চিন্তা" রাখিতে পারিতাম; কিন্তু তাহাতেও যেন প্রবন্ধের গৌরব অথবা পাঠকের আশা কিঞ্চিৎ বাড়িয়া যাইতে পারে। যখন নূতন কোন কথা শুনাইব বলিয়া সাহস নাই, তখন প্রবন্ধের ওরূপ নাম দেওয়াও সঙ্গত হইবে না।

ভারতবর্ষে পানের প্রচলন বহু দিন হইতে আছে, ইহা নিঃসন্দেহ। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে "তাম্বুলস্য দ্বাদশগুণাঃ" বলিয়া মুখের দুর্গন্ধ অপহরণ প্রভৃতি পানের বারটি গুণ বর্ণিত আছে। পানের রস অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ আধুনিক শাস্ত্র নহে। প্রাচীন সংস্কৃত কবিদিগের অনেক গ্রন্থেই তাম্বুলের নাম পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহাকবি কালিদাস এবং বররুচি এই উভয়ের মধ্যে কবিত্বে কে শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে বিবাদ বাধিলে, বাগ্‌দেবী স্বয়ং এক বৃদ্ধার বেশে তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া, পান সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে এক

একটি কবিতা রচনা করিতে বলেন, এবং রচিত কবিতা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণয় করিয়া দেন। * পান যে বহু দিন ধরিয়া হিন্দুসমাজে প্রচলিত, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, ইহা দেবার্চ্চনায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেবদেবীর পূজার নৈবেদ্যে পান একটি উপকরণ বলিয়া গণ্য। ঠিক কোন্ দিন পান প্রথম জন্মিয়াছে, অথবা মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা সে প্রশ্নের অনুসন্ধান করা আমাদের সাধ্যাতীত বলিয়া মনে করি।

ভারতে পান যেমন বহুকাল ধরিয়া প্রচলিত, ইহার প্রচলনও তেমনই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। এ দেশে, বোধ হয়, এমন স্থানই নাই, যেখানে পান ব্যবহৃত হয় না। ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত, পানের অধিকার সর্ব্বত্র সমান। প্রভেদ এই যে, পান কোথায়ও বা সুবর্ণপাত্রে, কোথায়ও বা কাংস্য কৌটায়, আর কুত্রাপি জীর্ণবস্ত্রখণ্ডে বা ছিন্ন কদলীপত্রে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ইহা রাজার হর্ম্মে্য, ভৃত্যের হস্তস্থিত করঙ্কে, আফিসাদিতে কেরাণীকুলের পকেটে, রন্ধনগৃহে পাচিকার অঞ্চল-কোণে, শস্যক্ষেত্রে কৃষকের কোমরের কাপড়ে লুক্কায়িত রহে। তবে কোন স্থানে সুপারি, চূণ, খদির, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি নানা দ্রব্য সংযোগে মনুষ্যবক্ষে নিপতিত হয়, আর কোন স্থানে সুপারি এবং চূণই ইহার সহচর।

* পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত উদ্ভট কবিতা দেখুন।

পান যে বিলাসীর আদরের জিনিস, ইহা সকলেই জানেন। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিব না। পান যে সর্ব্বসাধারণের আদরপ্রদর্শনের সামগ্রী, তাহাতেও সন্দেহ নাই। হিন্দুর প্রায় প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যে ও উৎসবেই পান ব্যবহৃত হয়। প্রতিবেশীদিগকে পান সুপারি বিতরণ, অনেক শুভকার্য্যের অঙ্গস্বরূপ।

আমাদের রাজা ইংরেজ জাতির মধ্যে পানের প্রচলন নাই। শীতপ্রধান দেশে পান জন্মেই না। শুনিয়াছি, বিলাতে সুপারি কুক্কুর এবং অশ্ব দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তথাপি ভারতে রাজদরবারে পানের সম্মান আছে। এখনও যাহারা, 'রাজা' 'মহারাজা' 'রায়বাহাদুর' প্রভৃতি উপাধি পান, উপাধি দরবারে তাঁহাদিগকে পান এবং আতর প্রদত্ত হইয়া থাকে। উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মর্য্যাদা অনুসারে তাঁহারা উচ্চ নীচ পদস্থ রাজপুরুষ-প্রদত্ত পানে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। সহজেই অনুমান করা যায় যে, মুসলমানদিগের সময় হইতেই, পানের এইরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। পান ভারতবাসীর এতই প্রিয়সামগ্রী যে, এ হেন অনুদার (?) হিন্দুশাস্ত্রেও, লোক-সমারোহ স্থলে, হিন্দুর পক্ষে, পান খাইতে নিষেধ নাই। ইহাতে স্পর্শদোষ ঘটে না।

রাজা যেমন প্রজাকে পান দিয়া সম্মান করেন, অনেক স্থানে প্রজাও তেমনি রাজাকে পান দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া থাকে। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে, কোন সম্মানার্হ ব্যক্তি

বাটীতে পদার্পণ করিলেই, গৃহস্থ তাহাকে একটি মুদ্রা এবং পান উপঢৌকন দিয়া থাকে। মুদ্রাটি স্পর্শ করিয়া প্রত্যর্পণ করিতে হয়, পানটি গ্রহণ করাই বিধি। বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত লোকের গৃহে গেলে ব্যক্তিমাত্রই প্রায় পানের দ্বারা আদৃত হন। বস্তুতঃ, পানের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত আর সর্ব্বজনাদৃত বস্তু, বোধ হয়, আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় নাই।

পান সর্ব্বত্র জন্মে না; আর পানের চাষও সকল স্থানে নাই। নবশাকদিগের মধ্যে বারুই জাতিই সাধারণতঃ পান জন্মাইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে, মুসলমানেরাও পানের বরজ করে। পানের ক্ষেত্রগুলি বরজ বা বর নামে অভিহিত হয়। বরজগুলি এক একটি অনুচ্চ এবং বহুদূরবিস্তৃত চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত মণ্ডপের ন্যায়। ইহাতে রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে না। বারুইগণ অপবিত্রদেহে বা অশুচিভাবে কখনও বরজে প্রবেশ করে না। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এরূপ করিলে, সমস্ত বরজের পান নষ্ট হইয়া যায়। বরজ প্রায়ই অতি অরক্ষিত অবস্থায় থাকে; কিন্তু ইহার মধ্যে চোর প্রবেশ করে না। লোকের বিশ্বাস এই যে, বরজে প্রবেশ করিয়া পান স্পর্শ করিলে, চোরের বংশ থাকে না।

প্রবন্ধারম্ভেই আমরা বলিয়াছি যে, কিছু দিন গত হইল, আমরা পান সম্বন্ধে দু'একটি কথা ভাবিয়াছিলাম। কিসে পানের কথা উঠিয়াছিল, আমরা তাহাই বলিতেছি। সে দিন পান বড়ই মহার্ঘ্য হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "পানভিক্ষা" হইয়াছে কি? জানিতে পারিলাম, পানভিক্ষা হয় নাই। আর পানভিক্ষা কি, তাহা অনেকে বুঝেন না। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালার স্থানে স্থানে পানভিক্ষা ছিল। পানভিক্ষা কি বুঝাইয়া বলিতেছি।

বারুইদিগের মধ্যে একতা আছে। পান প্রায় একই রকমের জিনিস। একসময়ে এক স্থানে পানের মূল্য একইরূপ হইয়া থাকে। বারুইরা ইচ্ছা করিলে, পানের দর কিঞ্চিৎ চড়াইয়া দিতে পারে। গৃহস্থের পান না কিনিয়া উপায় নাই। অনেক লোক এমন আছে যে, তাহারা বলে 'ভাত,—না খাইয়া থাকিতে পারি, কিন্তু পান না খাইয়া পারি না।' বাঙ্গালার একটি চলিত কথা আছে যে, অন্য সমস্ত দ্রব্যই বাড়ীতে কিম্বা ক্ষেত্রে উৎপন্ন করা যায়; কিন্তু পান আর লবণ ইহা ইতর ভদ্র সকলকেই কিনিতে হয়। আমরা বাল্য কালে দেখিয়াছি, কোন কোন দিন, আমাদের বাড়ীর নিকটস্থ হাটে পান অতিশয় মহার্ঘ্য হইত। পূর্ব্বের হাটে পানের "গ" বা বিড়া তিন পয়সা, আর পরের হাটেই একবারে দু পয়সা। একদিন ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। শুনিলাম হাটে 'পানভিক্ষা' হইয়া গিয়াছে। পানভিক্ষার কথা এই।—কোন একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা কিম্বা মাতার শ্রাদ্ধ করিতে অক্ষম। তিনি সমস্ত বারুইদিগকে অনুরোধ করিলেন,—'আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও'। বারুইগণ তাঁহার

অবস্থা জানিয়া স্থির করিল ইনি ভিক্ষার উপযুক্ত পাত্র বটেন। অমনই নির্দ্ধারিত হইল, আজি পানের 'শ' দু'পয়সা। হাটে সাধারণতঃ ২০০০০০ পান বিক্রীত হইয়া থাকে, আজ ১২০০০০ হইল। অনেকে কিছু অল্প কিনিল। বারুইরা তাহাদের নিজের মূল্য ৫৬।০ টাকা লইল; ব্রাহ্মণও ঐ পরিমাণ টাকা পাইলেন।

এই পান ভিক্ষায় বারুইদিগের কিছুই ক্ষতি হইত না। সাধারণ ক্রেতার নিকট সামান্য বর্দ্ধিত মূল্য আদায় হইত। দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিশেষ আনুকূল্য লাভ করিতেন। এখন আর 'পানভিক্ষা' কথা শুনিতে পাই না। লোকের তেমন প্রাণই নাই। ব্রাহ্মণের প্রতি নিম্ন বর্ণের লোকের তাদৃশ শ্রদ্ধা ভক্তি নাই। অনেক ব্রাহ্মণও আবার কালমাহাত্ম্যে পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধেই একরূপ উদাসীন। অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন বা সাহায্য প্রদান বিরল হইয়া আসিতেছে; আর অন্যের সাহায্য বা সহানুভূতি প্রার্থনা করাও দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

এখন আমরা সে কালের এবং আধুনিক সময়ের পান খাইবার এবং পান দিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিব। কিছু দিন পূর্ব্বে পান প্রায়ই খোলা অবস্থায় দেওয়া হইত এবং সুপারি, মশল্লা, চূণ ইত্যাদি পানের কাছে পৃথক্ ভাবে সজ্জিত থাকিত। আজি কালি সে ব্যবস্থা নাই। এখন তামাক সাজার ন্যায় পান সাজা হইয়া থাকে;—অর্থাৎ সুপারি চূণ ইত্যাদি দিয়া একবারে প্রস্তুত করিয়া পান অন্যের সম্মুখে ধরিতে হয়। সে কালে ছিল পানের বাটা, এখন হইয়াছে পানের ডিবা। তখন সুপারি মশল্লা প্রভৃতি সমস্তই সম্মুখে থাকিত। ইচ্ছামত লওয়া যাইতে পারিত। এখন কোন্ দ্রব্য কত আছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সমগ্র সাজা পানটিকে উদরস্থ করাই রীতি। কেহ কাহাকে পুরাতন নিয়মে পান দিলে, নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে সে লোকটি অসভ্য। পল্লীগ্রামে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই এখন পুরাণ নিয়ম বজায় রাখিয়াছে। আমাদের কিন্তু মনে হয় যেন পুরাতন পদ্ধতিই ভাল। সাজা পানের মধ্যে পচা সুপারি, ঝিনে চূণ প্রভৃতি সব চলিয়া যাইতে পারে। সমস্ত জিনিস পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে, এমন হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সাজা পান এবং খোলা পান হইতে, আমরা যেন অনেকটা সে কাল এবং এ কালের সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারি। তখনকার দিনের লোকগুলি খোলা স্বভাবের ছিলেন। আজি কালি সকলই প্রায় ঢাকা। আজি কালি আমাদের উপরটি যেন বেস পরিষ্কার কিন্তু ভিতরটি তেমন নহে। তখন ভিতর বাহিরে এত পার্থক্য ছিল না। এখন আমরা মুখে লোককে অতিশয় আদর দেখাই, সৌজন্য প্রদর্শন করি, কিন্তু অন্তরে তেমন করি না, বা ভাবি না। তখন লোকে অনেকে হয় ত মুখের এমন মোলায়েম আদর জানিত না; কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণ সরল, প্রীতি ও আদরের আধার ছিল। পূর্ব্বে অপরিচিত লোক দেখিলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করা

চলিত, 'মহাশয়ের নাম কি, বাসস্থান কোথায়, পিতার নাম কি' ইত্যাদি। এখন এ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। "বেতন কত,"—জিজ্ঞাসা করিলে ত আজ কাল মার খাইতে হয়। তাই বলিতেছিলাম, এখন যেন সব ঢাকা। কাহার ভিতরে কি আছে, জানিবার চেষ্টা করাই অসভ্যতা। পরিচ্ছদের সামান্য পারিপাট্য থাকিলে, সকলেই বাবু অথবা সাহেব। পান যেমন সাজা হয়, তেমনই আজি কালি বাবু অথবা সাহেবও সাজা হইয়া থাকে। শুনিয়াছি, কলিকাতায়, গোলাপী খিলির ন্যায়, অল্প কিছু দক্ষিণা দিলে, লোককে গোলাপী বাবুও সাজাইয়া দেয়।

সে কালের পান ধুইবার রীতিও এখন অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন পান রীতিমত প্রক্ষালিত হইত, ইহাতে কোনরূপ ময়লা দ্রব্য বা অন্য কিছু থাকিতে পারিত না। প্রাচীনা গৃহিণীদিগকে দেখিয়াছি তাঁহারা প্রথমতঃ পানগুলি নদী কিংবা পুষ্করিণী হইতে ধুইয়া আনিয়া আর্দ্র বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা পানের এ পিঠ ও পিঠ পরিষ্কার করিতেন। আজকাল অনেক স্থানে দেখিতে পাই, একখানি অপরিষ্কার গামছায় পান স্পর্শ করাইয়াই পান ধোওয়ার কাজ হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে পরিহিত বস্ত্রাঞ্চলই আবার গামছার কার্য্য করে। কোন কোন বাড়ীর গৃহিণী অথবা ভৃত্য পানগুলি এইরূপ ভাবে ধুইয়া বা মুছিয়া হয় ত একটি বিস্কুটের বাক্সের উপর রাখিয়া, তদুপরি সুপারি মশলা প্রভৃতি দিয়া থাকে। কখনও কখনও ঘরের মেজেতে রাখিয়াই পান সাজা হয় ইহাতে যে পানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়, তাহা নহে, যাহাদিগকে ঐরূপ পান দেওয়া হয়, সময়ে সময়ে, তাহাদিগের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। পানের গায়ে গরল প্রভৃতি পদার্থ থাকা অসম্ভব নহে। অপরিষ্কার পান খাইয়া অনেকের মুখে ঘা হইয়া থাকে। সুতরাং, সকলেরই এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য এবং পুরাতন রীতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত না হইলেও, যাহাতে পানগুলি পরিষ্কার রূপে ধৌত হয়, তাহা দেখা উচিত।

আমরা আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বে রীতি ছিল, —যাহার তাহার হাতে পান খাইতে নাই। পানের মধ্যে মাদক দ্রব্য অথবা অন্যরূপ অনিষ্টকারী বস্তু থাকিতে পারিত বলিয়াই এইরূপ নিয়ম ছিল। আমরা শৈশবে দেখিয়াছি, বৃদ্ধেরা পান খাইতে হইলেই পূর্ব্বে তাহার ঘ্রাণ লইতেন। এখন আমরা কিছুই বাছি না। যাহার তাহার হাতে পান খাইয়া থাকি। এ প্রথায়, সময়ে সময়ে, যে অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমরা এখানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লেখ করিব।

গতবৎসর, পূজার পূর্ব্বে, আমাদের পরিচিত কোন ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ আসিতেছিলেন। শিয়ালদহ ষ্টেশনে আর একটি ভদ্রবেশধারী লোক তাঁহার গাড়িতে উঠিয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করেন, এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তির গন্তব্যস্থান

জানিয়া লইয়া নিজের গন্তব্যস্থান তাহা হইতেও দূরের একটি স্থান বলিয়া প্রকাশ করেন। প্রথমে দুই একটি সিগারেট খাইয়া এবং ভদ্রলোকটিকে দিয়া, কিছুকাল পরে, পকেট হইতে একটি ডিবা বাহির করেন, এবং নিজে একটি পান খাইয়া ভদ্রলোকটিকে বলেন,—'মহাশয় একটি পান ইচ্ছা করিবেন কি ?' ভদ্রলোক মহাশয় আপত্তি করিলেন না। কিন্তু যেমনই পান ইচ্ছা, অমনই সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ইচ্ছা। অতি অল্পকালের মধ্যেই নিদ্রা এবং ক্রমে তাহা কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় পরিণত। গোয়ালন্দের কাছে আসিয়া সেই নিদ্রা ভাঙ্গিল। নিদ্রাভঙ্গে ভদ্রলোকটি দেখিলেন, তাঁহার সহযাত্রী পানপ্রদাতা গাড়ীতে নাই। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুকের পকেটটি কিছু লঘু মনে হইল। হাত দিয়া দেখেন পকেটস্থিত থলির মধ্য হইতে ১৩ খানি গিণি ( ১৯৫৲ টাকা ) অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। দুএকটি পয়সা এবং টিকেটখানি মাত্র তাহাতে রহিয়াছে। লোকটি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আর কখনও অপরিচিত লোকের হাতে পান খাইব না। আমরা বলি সকলেরই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত। যেখানে সেখানে, যাহার তাহার হাতে পান খাইলে, একসময়ে এইরূপ বিপদে পড়া অসম্ভব নহে।

শ্রীচন্দ্রশেখর কর।

# বঙ্গে বিজ্ঞান।

অধুনা সাময়িক পত্রিকা সমূহে নানাভাবের নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইহা পৃথিবীর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অপরিহার্য্য ফল। লোকের রুচি বিজ্ঞানে। এই হেতু বাঙ্গালা ভাষায়, একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ না থাকা সত্ত্বেও, নবীন বাঙ্গালা লেখকগণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। লেখকদের বিজ্ঞান-জ্ঞান অবশ্য ইংরেজী গ্রন্থ অধ্যয়নে। কিন্তু পাঠকদিগের অনেকেই যে ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইতে পারেন, ইহা বুঝিয়া যে তাঁহারা প্রবন্ধ লেখিতেছেন, পাঠ করিয়া তাহা অনুমিত হয় না। বিজ্ঞান অথবা যে কোন তত্ত্বই হউক না কেন, সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাহার সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সাময়িক প্রবন্ধ উহার পথপ্রদর্শক বা রুচিপ্রবর্ত্তক মাত্র। কোন বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ভাষাতত্ত্বাভিজ্ঞ সম্পাদক, বর্ত্তমান বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যাদির এই অবস্থা দর্শন করিয়া, বন্ধুভাবে আমাকে তাঁহার পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি উত্তর দিয়াছিলাম,—অগ্রে বাঙ্গালা ভাষায়, ইংরেজী, ফরাশি, জার্ম্মেণ এবং রুষ ভাষা হইতে বিজ্ঞান-গ্রন্থ সমূহ, যেমন চীন ও জাপান ভাষায় অনুবাদিত

হইয়াছে, তদ্রূপ অনুবাদিত হউক, পরে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে যথাসাধ্য লিখিতে চেষ্টা করিব। বিশেষতঃ এইরূপ খণ্ডবিজ্ঞান প্রবন্ধে বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ খণ্ড প্রবন্ধে বাহ্যিক ঘটনাগুলি প্রক্রিয়া ও নিয়মানুসারে কিরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ তাহা দেখাইয়া, উহার প্রকৃত সাক্ষাৎ কারণে উপনীত হওয়া দূরের কথা, একাংশেরও বিশদব্যাখ্যা অসম্ভব। ইহাতে বরং ইংরাজীতে যে প্রবাদ আছে 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী,' অথবা আমাদের দেশে যে সাধারণ কথায় বলে 'আধা বুঝার প্রাণ গেল' তদ্রূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে। এমন কি, ধর্ম্ম বিশ্বাসেও, গুরুতর আঘাত লাগিবার আশঙ্কা। আঘাত লাগিবে কি, আমার বিশ্বাস, এইহেতু ইহার মধ্যেই সে আঘাত লাগিয়াছে। অর্দ্ধ-শিক্ষিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের ধর্ম্ম সম্পর্কে কথায় কথায় বিজ্ঞানানুমোদিত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বাক্য এবং পুনরুত্থানকারী হিন্দুদের বক্তৃতায় স্থানে অস্থানে বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়াই এ কথার প্রমাণ। বুঝিয়া যদি মজিতেই না পারিলাম, আধা বুঝার প্রাণ যাওয়া অপেক্ষা, অবুঝের ন্যায় থাকাই ভাল।

ইংরেজী, ফরাশি, জার্ম্মেণ ও রুষ বিজ্ঞান ভাষান্তরিত করা অতি কঠিন কার্য্য নহে। আমি বোধ করি, অবান্তর বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিষৎ সভা যদি ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন, অনায়াসে কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে।

বহুদিন হইয়াছে, বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একটি বিজ্ঞান-সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণও সে সভার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। সময় সময় ইনি, উনি, তিনি লঘু বিজ্ঞান-তত্ত্ব অর্থাৎ কোন ভৌতিক পদার্থের গুণ বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন, এইরূপ বিজ্ঞাপন বড় বড় সংবাদ-পত্রে প্রকটিত হইয়া থাকে। লঘু গুরু যাহাই হউক, ঐ সমস্ত বক্তৃতার মর্ম্ম, শ্রোতৃবর্গ ভিন্ন সাধারণের জ্ঞাত হওয়ার কোন উপায় আছে কি না, জানি না। এগুলি মুদ্রিত হয় কি না এবং বক্তৃতায়ই বা শ্রোতার সংখ্যা কত হয়, কিছুই অবগত নহি। শুনিয়াছি, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রদর্শনার্থ ঐ সভায় সামান্য সামান্য যন্ত্রাদিও আছে বঙ্গদেশে ডাক্তার সরকারের উদ্যোগে বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য, যখন ঐ সভা সংস্থাপিত হয়, এবং তিনি যখন স্বয়ং চিন্তা-শীল ও বিজ্ঞানের শাখাবিশেষে কৃতী। তখন ভাবিয়াছিলাম, এই সভা হইতে বাঙ্গালীর বিশেষ অভাব দূর হইবে।—বিজ্ঞান আলো-চনার প্রবৃত্তি জন্মিবে; বাঙ্গালী চিন্তা করিতে শিখিবে, এবং বাঙ্গালীরা বঙ্গদেশে থাকিয়াই ইউরোপীয় ও আমেরিকদিগের মত, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবে। সভা সংস্থাপনকালীন সংস্থাপকের ইহাই অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। এবং অর্থদাতৃগণও সম্ভবতঃ এই সভাকে বঙ্গের সৌভাগ্য সোপান,—প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জ-নের উপায় মনে করিয়া ইহার উন্নতি কল্পে অকাতরে অর্থ সাহায্য দান করিয়াছিলেন।

সর্ব্বসাকল্যে কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, জানি না। শুনিয়াছি, একজন যথার্থ বঙ্গবন্ধু ( ইনি কাগজে নাম প্রকাশ অথবা গবর্ণমেণ্ট উপাধি অভিলাষী নহেন ) প্রথমে পাঁচাত্তর, পরে যন্ত্রাদির নিমিত্ত পঁচিশ সহস্র, মোটে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সভাদ্বারা বঙ্গবাসীর সে আকাঙ্ক্ষা কত দূর সফল হইয়াছে, অথবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কি পরিমাণ উন্মুক্ত হইয়াছে, বলিতে পারি না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের সুসন্তান অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সভার সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। কিন্তু সভার সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব আছে কি না, সন্দেহ। যেহেতু, উপদেশকদের মধ্যে তাঁহাদের নাম কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সন্দেহ যদি সত্য হয়, তবে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? উৎসাহ, উদ্যোগ এবং পরিশ্রমের নিমিত্ত ডাক্তার সরকার ধন্যবাদার্হ। কিন্তু অনেকেই বলেন, সংগৃহীত এত অর্থ ব্যয়ের সফলতা কি হইল? সভাতে উক্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদ্বয়ইবা যোগ দিলেন না কেন? বস্তুতঃ বিজ্ঞান সভার মুখ পানে তাকাইয়া লোকের মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত সে আশার যে বিশেষ কোন সাফল্য ঘটে নাই, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

জাতীয় প্রতিনিধি ( National congress ) সভার কথা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক। বক্তৃতায় রাজনৈতিক সমালোচনা করিয়া রাজনীতির সংস্কার করা মহাসমিতির লক্ষ্য। বিজ্ঞান তাঁহার ক্ষেত্র নহে। কিন্তু দেশের ও সমাজের উৎকর্ষ ভিন্ন, রাজনৈতিক উৎকর্ষ সম্ভবপর নহে। আবার দেশের প্রকৃত উৎকর্ষ ও উন্নতি বহুলাংশেই জ্ঞান-বিজ্ঞান সাপেক্ষ। এত বৎসরেও যখন জাতীয় মহাসমিতির ধুরন্ধর প্রতিনিধিবর্গের, বক্তৃতার সেই সাময়িক উচ্ছ্বাস ও ঐন্দ্রজালিক মোহ এড়াইয়া, এই সারসত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িল না, তখন আর আশা কোথায়?

আশাশূন্য জীবন বড় ভারাবহ। এইহেতুই এক্ষণ কেবল বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ সভার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। বিজ্ঞানাঙ্গ বিশেষে জগদীশ, প্রফুল্ল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যেরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই সভায় যোগ দিয়া, যদি তাঁহারা, উপদেশদ্বারা বাঙ্গালীদিগকে ঐভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দেন, তবে দেশের প্রভূত উপকার হইতে পারে।

বারান্তরে, হিন্দু জ্যোতিষ সম্পর্কে ২।১টি কথা সংক্ষেপে বলিয়া, আমার বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা শেষ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রী-

# স্বামী না ত কি ?

## দুই সখীর কথা।

### নবন্যাস।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুভাষিণীর তৃতীয় পত্র।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরঃ
শরণম্।

শুক্রবার।
৺ কাশীধামং।

প্রাণাধিক সরযূ,

প্রাণ-সখি, আজি সপ্তাহ হইল তোমার পত্র পাইয়াছি; এবং এই এক সপ্তাহ কাল, অধ্যয়নের সমস্ত সামগ্রী দূরে রাখিয়া, ঐ একখানি পত্রই প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ পড়িয়াছি। পত্র পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, সিংহীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে,—সোহাগিনীর সুখ-সুপ্ত অভিমান আবার ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিতেছে,—স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা অথবা নিরঙ্কুশ-স্বাধীনতানুরাগিণীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, প্রণয়-পিঞ্জরের শিক্‌লী ভাঙ্গিয়া, আবার যেন উড়ন্ত পক্ষিণীর ন্যায়, উধাও হইয়া, ঊর্দ্ধ গগনে উড়িতে চাহিতেছে। কেমন গো আমার সখীমণি,—সর্ব্ববিধ-বিদ্যার অগাধ-খনি, আমার কথা গুলি সত্য নয় কি?

তুমিই ত বলিয়া থাক যে, আমি অনুমান-খণ্ডে অদ্বিতীয় পণ্ডিত (!) অনুমান-খণ্ডে কি বলে? বলে,—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।" আমি, পর্ব্বত-প্রতিরূপিণী পণ্ডিতার নয়ন-বিবরে ক্রোধ-কালিমার ধূম-সম্ভার প্রত্যক্ষ দেখিয়া, অপ্রত্যক্ষ হৃদয়-গহ্বরে প্রজ্জলিত প্রতিভার অগ্নি-সঞ্চার অনুমান করিতেছি। আমার এ অনুমান সত্য নয় কি? দ্রৌপদী যেমন, শাস্তরসাস্পদ দ্বৈতবনে, ক্রোধে ও অভিমানে, ঝঙ্কার দিয়া, যুধিষ্ঠিরের দিকে চাহিয়া, গর্ব্বিত-রাজহংসীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিয়াছিলেন,—"নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা,"—আমার মনে লয়, তুমিও যেন সেইরূপ, অভিমানের আগুনে অল্প অল্প জ্বলিয়া, শান্তশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দিকে চাহিয়া, গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিতেছ,—

"ইমামহং বেদ ন তাবকীষ্কিয়ং
বিচিত্ররূপাঃ খলু চিত্তবৃত্তয়ঃ।"

অর্থাৎ,—

কি আছে বুদ্ধিতে তব বুঝিতে না পাই,
—ওগো বুঝিতে না পাই,—
বিচিত্র চিত্তের গতি, ক্ষণ-স্থিরা নহে মতি,
মরে যাই এ মতির লইয়া বালাই।

ভাই, তুমি এ সংসারে আগে এক

জনকে ভালবাসিতে; এখন সে স্থলে দুই জনকে ভালবাসিতেছ। যা আগে ছিল, তাও ভাল। যা এখন হইয়াছে, তাও ভাল। ভালবাসার একাধিপত্যও ভাল, আর ভগবানের বিহিত প্রণালীতে ভাগ-বখ্‌রাও ভাল। কিন্তু তোমার সে উভয় ভালই, এবার যেন, ভাবের স্রোতে, ঈষৎ একটুকু ভাঁটার টানে পড়িয়াছে। তোমার পত্রে এবার 'তোমার' মনোর উপরও যেমন একটুকু মধুর-বিরক্তির কটাক্ষ আছে; যাহাকে শিশুকাল হইতে সখী জ্ঞানে শত প্রকারে ভালবাসিয়া আসিয়াছ, তাহার উপরও তাদৃশ মধুমাখা বিরক্তির ঈষৎ বিক্ষেপ আছে। আমি মুখরার মত পুনরপি জিজ্ঞাসা করি, আমার এ অনুমানও নূতন ও পুরাতন "ন্যায়-সম্মত" নয় কি?

ভাইরে, আমি ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, —যুক্ত-করে, স্নিগ্ধ-স্বরে ও ভীত-ভীত অন্তরে, আজি তোমায় একটি কথা কহিব। আমরা ছোট বেলায় যেমন, একে অন্যকে একটি অপ্রিয় কথা কহিতে হইলে, আগে গলায় জড়াইয়া আদর করিয়াছি; তার পর, অমত কথাটি নত-নয়নে কহিয়া, আবার একটুকু বেশী ভালবাসার প্রক্ষেপ দিয়াছি; আজিও আমি সেইরূপ, মনে মনে তোমাকে আমার গলায় গাঁথিয়া, আমার প্রাণ-ভরা ভালবাসার দুই এক ফোঁটা মধু মিশাইয়া, একটি কথা কহিব। যদি তুমি কথাটি শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠ, তাহা হইলে আমি নির্জ্জনে বসিয়া, তোমারই মত, অশ্রু বিসর্জ্জন করিব। তোমারও এই রীতি, আমারও এই রীতি। ইহা ছাড়া আমি আর কি করিতে পারি?

কথাটি ভাই এই,—তুমি স্বামিত্ব আর প্রেমের স্বত্ব লইয়া তর্ক করিতেছ প্রাণসখীর সঙ্গে, আর দেশ-দেশান্তরের সভ্যতার সমালোচনা করিতেছ রমণী-হৃদয়ের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা-প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে, যদি কাহারও মধ্যস্থতা করিবার অধিকার থাকে,—যদি কাহারও মধ্যস্থের মত কথা কহিবার সুযোগ ঘটে, তাহা হইলে, আজি কালি, সে জন তোমার মনোরঞ্জন। তুমি, মনোরঞ্জনের মধ্যস্থতাকে মানিনীর মত পায়ে ঠেলিয়া, দোহাই দিতে যাইতেছ বৃদ্ধ দুর্গামোহন দাসের। ইহা ভাই, কোন অংশেও, তোমাহেন রমণীর উপযুক্ত হইয়াছে কি? শকুন্তলা আর প্রিয়ংবদার প্রণয়-কলহে শ্বেত-শ্মশ্রু-মণ্ডিত শার্ঙ্গরবকে সাক্ষী মানিলে, তাহা কখনও শোভা পাইত কি?

দুর্গামোহন বাবুকে আমরাও চিনি; এবং আমরাও তাঁহাকে এক জন সদাশয় সাধু পুরুষ বলিয়া জানি। কিন্তু তিনি তোমার ও আমার কল-মধুরা কলহ-বিধুরা কথার মধ্যস্থতা করিবার জন্য কে? আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, তাহাতে তাঁহার নাম-উল্লেখে প্রণাম শব্দের প্রয়োগ করিতে পারি না। তাঁহাকে তুমি যেমন উচ্চশ্রেণীর লোক বলিয়া সম্মান কর, আমিও তেমন উদার-হৃদয় সাধু বলিয়া ভক্তি করি। কিন্তু যেখানে এক দিকে মনু-অত্রি-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদিগের শাস্ত্রকথা, এবং আর এক দিকে মিল-কোম্‌টি-

ফূরিয়ে * প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের সমাজ-বৈজ্ঞানিক নীতিকথা, সেখানে বাবু দুর্গামোহনের আইন-আদালতী ও আহেলে-বিলায়েতী কোন্ কথা ভাই কোথায় থাকে ?

তুমি যদি সত্যই ভাই, মধ্যস্থের আশ্রয় বিনা, দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে অসমর্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে, যাঁহাকে চির জীবনের তরে হৃদয়ের মধ্যস্থরূপে বরণ করিয়াছ, তাঁহাকেই এ সখী-সংবাদে অথবা সখের বিবাদে মধ্যস্থের আসন প্রদান করিও; আমি দুঃখিত হইব না। কিন্তু বাবু দুর্গামোহনের মত একটানা ও এক-দিগ্‌দর্শী সাম্প্রদায়িক ও সম্রান্ত বৃদ্ধকে সম্মুখে দণ্ডায়মান করিয়া, আমাকে লজ্জা দিতে অথবা পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিও না। ইহা তোমার চির-পরিচিত অভিন্ন-প্রাণা প্রীতির যোগ্য নহে।

এখন, যোগ্যতা ও অযোগ্যতার কথা পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষণকালের তরে, আসল কথায় মনোনিবেশ কর। আসল কথা, রমণীর সুখ-সম্মান, সমুন্নতি, স্বাধীনতা এবং সর্ব্ব-জন-পূজ্য ও সর্ব্বত্র-স্বীকার্য্য পবিত্রতা। আমরা উভয়েই ত, বোধ হয়, মানিয়া লইয়াছি যে, বিবাহের অনুষ্ঠান জগন্ময়-সাংসারিক-জীবনের প্রাণ,—এবং সুতরাং,—রমণী-জীবনেরও একমাত্র আশ্রয়-স্থান ও সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তির নিদান। কিন্তু সে বিবাহবদ্ধ জীবন কোন্ দেশে বাঞ্ছিত-ফল-প্রদ ?

আমি তোমার পত্র পড়িয়া যাহা কিছু বুঝিয়াছি,—যতটুকু সার-উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই মনে লয় যে, সে বাঞ্ছিত ফল শুধু ইয়ুরোপ ও আমেরিকায়ই ফলিয়া থাকে, এ দেশে কখনও ফলে না। তুমি তোমার প্রথম বয়স হইতেই পাশ্চাত্য সভ্যতার একটুকু বেশী পক্ষপাতিনী, তাহা জানি। কিন্তু সে পক্ষপাতিতা যে ভাই তোমার উন্নত প্রাণের সুতায় সুতায় এত সূক্ষ্ম-সূত্রে গাঁথা হইয়াছে, তাহা জানিতাম

* এই তিনটি নামের মধ্যে ইংলণ্ডের অলোক-সাধারণ চিন্তাশীল পণ্ডিত যন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং ফরাশি দেশের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক অগাষ্ট্ কোম্‌টি অধিকাংশ পাঠকের নিকট সুপরিচিত। চার্লস্ ফূরিয়ে (Charles Fourier) অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। তিনিও ফরাশি পণ্ডিত; এবং কোম্‌টির সমসাময়িক লোক হইলেও, তাঁহার একটুকু পূর্ব্ববর্ত্তী। কোম্‌টি জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে, ফূরিয়ে জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ কোম্‌টির তেইশ বৎসর পূর্ব্বে। কোম্‌টি লোকান্তরিত হন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, ফূরিয়ে লোকান্তরিত হন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ বিশ বৎসর পূর্ব্বে। কোম্‌টির নামে যেমন কোম্‌টিবাদ (Comtism) নামক এক প্রকার ধর্ম্মমত প্রচলিত; ফূরিয়ের নামেও সেইরূপ ফূরিয়েবাদ (Fourierism) নামক সাম্য-তত্ত্বের কতকগুলি কথা সভ্যজগতে সুপ্রচলিত। কিন্তু ফূরিয়ের মত ইংলণ্ড অপেক্ষা আমেরিকায় সমধিক আদর পাইয়াছিল। মিল-কোম্‌টি-ফূরিয়ে এই তিন জনই অবলা-বান্ধব এবং তিনপ্রকার সাম্যবাদের উপাসক।

না। তুমি ইয়ুরোপে ও আমেরিকার দাম্পত্য-জীবনের সহিত এদেশীয় দাম্পত্য-জীবনের তুলনা করিয়া লিখিয়াছ যে, "ফুল লইয়া আমাদিগের কথা নহে, কথা হইতেছে এই-ক্ষণ শুধুই ফল লইয়া।" আমিও বলিতেছি—তথাস্তু,—তদেবাস্তু,—তাহাই হউক, এবং দেবতার বরে, তোমার চন্দ্রবদনের উপরে, পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকুক। কিন্তু ভাই, কথা ভুলিও না,—ফুল আর ফল লইয়া কথা। দাম্পত্য-জীবন কোন্ দেশে ফুটিয়াছে, ফুলের শোভায় ও ফুলের সৌরভে, আর কোন্ দেশে ফলিয়াছে স্বাদু-শীতল সুখ-স্বাস্থ্য-শান্তি-বর্দ্ধক ফলের স্বাদে, এই ত এইক্ষণ প্রশ্ন, অথবা প্রধান কথা। এস আমরা,'এ বিষয়েও' আজি প্রাণে প্রাণে মিশিয়া, এক-প্রাণে ও এক-মনে এ কথাটার পরখ করিয়া দেখি।

তোমার চক্ষে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার স্বামী মাত্রই অমল-চরিত্র দেব-পুরুষ; আর "যাহারা আমাদিগের এ দেশে, পরের মেয়ে ঘরে আনিয়া, স্বামী সাজিতেছেন," তাঁহারা অসুর, পিশাচ অথবা পিশাচেরও অস্পৃশ্য কাপুরুষ।" ভাই, এ দেশে সকল পুরুষই রামানুজ-ভরত, অথবা বিদর্ভনাথ নলের মত উদার, উচ্ছ্রিত ও অনিন্দ্য-প্রকৃতি মহাপুরুষ, এমন আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। যাহারা আপনার স্নেহাশ্রিত "স্ত্রীকে হাড়ে মাংসে জ্বালাইয়া, ও অশেষ প্রকারে নিপীড়ন করিয়া, অবশেষে আত্মহত্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য করে," ভারত-ভূমি যে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, তাদৃশ নীচাশয় নরাধমের দুর্ব্বহ বোঝায় নিপীড়িত নহেন, এমন কথাও আমি বলিতে চাহি না। বস্তুতঃ উপরিধৃত কথাগুলি তোমার না আমার, তাহাও আমি জানি না। কেন না, এতৎসম্পর্কে, তোমার মনে যে ভাব—যে কথা, আমার মনেও ঠিক সেই ভাব,—সেই কথা।

আমি তোমার কাছে, কোন এক পত্রে, স্পষ্টাক্ষরেই ত লিখিয়াছি যে, আমার এই প্রাণটা অসংখ্য দুঃখিনী ভারত-বাসিনীর দীর্ঘশ্বাসে সর্ব্বদা সন্তাপিত রহে; এবং আমার হাড়-পাঁজরও যেন, সময়ে সময়ে, তাহাদিগের অস্ফুট হাহাকারে, ভস্ম হইয়া যায়। ভাই সরযূ,—আমার দ্বিতীয় প্রাণ,—আমি অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি,—তাই অনেক শিখিয়াছি। আমায় কি এ বিষয়ে কিছু বলিতে হইবে? আমি অবলা হইয়াও যদি অবলার দুঃখে কাঁদিতে না জানিতাম,—আকুল-প্রাণে না কাঁদিতাম, তাহা হইলে, তুমি জ্ঞানাভিমানিনী সরযূবালা ঘোষ-জায়া কি আমার ভালবাসায় পাগল হইতে,—না আমার প্রাণে প্রাণটা লুকাইয়া রাখিতে ভালবাসিতে? ভাই আমি তোমায় অধিক কি বলিব? আমি, আমার এ জীবনে, অনেক দিন, পিশাচ-পীড়িত প্রতিবেশিনী বালিকার প্রহার-ক্ষত শরীরে স্বহস্তে প্রলেপ দিয়াছি; এবং সে অগ্নিদগ্ধ অফুটন্ত নলিনীকে আমার নয়ন-জলে ভাসাইয়া,—মায়ের মত তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া, তাহার সহিত, সমস্ত দিন, অভুক্ত পড়িয়া রহিয়াছি।

কিন্তু ভাই, আমি তথাপি, এক বারের

স্থলে এক লক্ষ বার, অতি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, দাম্পত্য-জীবন আমাদিগের এ ভক্তি-প্রবণ ভারত-রাজ্যে 'যত টুকু' অমিয়-মধুর শান্ত-সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা হয় নাই;—আর রমণী, আমাদিগের এ দেশে, প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত স্ত্রীত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া, স্বামীকে স্বামী জ্ঞানে প্রাণের ভালবাসায় পূজা করিবার জন্য, 'যতটুকু', সুযোগ পাইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তাহা পায় নাই। অন্য কোন দেশে তাহা সম্ভবে না।

কেন সম্ভবে না, তাহা সর, তুমি বুঝিতেছ না কি? এ দেশও এক প্রকারে সভ্য, অন্য দেশও অন্য আর এক প্রকারে সভ্য। কিন্তু এদেশীয় সভ্যতা, সমাজ-নীতির সর্ব্বাঙ্গীণ গঠনে যেমনই কেন হউক না, উহার মূল-প্রস্রবণ মহাত্মা ঋষিদিগের প্রাণারাধ্য ধর্ম্ম-জীবন;—অন্যদেশীয় সভ্যতার উৎপত্তি-স্থান স্বার্থ-প্রণোদিতা পশু-শক্তির সর্ব্বগ্রাসি প্রয়োজন। ইহার এই ফল,—আমাদিগের ভারত-বর্ষে যাহারা স্বামীর পদে প্রতিষ্ঠিত, তাহারা যদি একবারে পশু না হয়,—তাহাদিগের যদি অতি সামান্য মাত্রায়ও মনুষ্যত্ব অথবা ধর্ম্ম-বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীকে তাহাদিগের অবশ্যই ধর্ম্ম-পরিগৃহীতা জীবন-সঙ্গিনী ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিতা গৃহলক্ষ্মী জ্ঞানে, দেশের প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনে, সম্মান করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত সমাজ ও সামাজিক ধর্ম্ম একবারে বিধ্বস্ত হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত ইহার অন্যথা কিংবা ব্যত্যয় নাই। তোমার অত সাধের ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সম্পর্কে এমন উচ্চ কথা বলা যায় কি? তুমিই ক্রমে বৃত্তান্ত ও বিবরণ সমালোচনা করিবে; এবং রীতিমত সমালোচনা করিয়া, বিচার ও ব্যবস্থার পথ লইবে।

হিন্দুস্থানীরা বলেন, "আদ্মীকা সয়তান আদ্মী।" আমি এ কথার রূপান্তর করিয়া বলিয়া থাকি যে, এ দেশে স্ত্রীজাতির শত্রু স্ত্রীজাতি। স্ত্রীজাতির পতিরূপী শত্রু, স্থানে স্থানে অসুরের উপমাস্থল হইলেও, একেবার অচিকিৎস্য নহে। কারণ সে যখনই স্ত্রীকে তাহার সংসারের সাথী, শেষ-কালের সম্বল এবং ধর্ম্ম-জীবনের সঙ্গিনী মনে করিতে আরম্ভ করে, তখনই স্ত্রীর প্রতি তাহার একটা সম্মানের ভাব জন্মে। কিন্তু স্ত্রীজাতির আর এক প্রকার শত্রু, আমাদিগের এ দেশে, অসংখ্য ও অচিকিৎস্য। এ দেশের কুল-বালা, বয়সের প্রথম বিকাশ-সময়ে, শিক্ষা-বিমুখ স্বামীর ক্রোধে ও ক্রূরতাজনিত বি-দ্বেষে, যত না উৎপীড়িত হয়, তাহা অপেক্ষা শত গুণ বেশী উৎপীড়িত হয় স্বামীর সন্নি-হিত অথবা সুদূর-সম্পর্কিত শকুনী-সদৃশী শুষ্কমূর্ত্তি বর্ষিয়সীদিগের বিকার-বিদ্বেষের বিষ-জ্বালায়।

কিন্তু, তোমার সভ্যতাভিমানিনী সুশিক্ষিতা পাশ্চাত্য-রমণীর অবস্থা সাধারণতঃ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার স্ত্রীজাতীয় শত্রু অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু পতিরূপী শত্রু অনেক স্থানে প্রকৃত প্রাণ-পীড়ক। তিনি বাহিরে,—সমাজের বহিরঙ্গনে,—নৃত্যগীতের বিলাস-

নিকেতনে, অথবা নয়নানন্দ কুসুম-কাননে সকলের চক্ষেই কুসুম-কামিনী। অথচ তাঁহারা জীবনের যবনিকান্তরালে,—রমণী-জীবনের অন্তঃপুরে,—রমণীমোহন বলিয়া নির্ব্বাচিত নিষ্ঠুর-নরাধমের প্রণয়-কর্পরে, যার-পর-নাই লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও পশুবৎ-নিগৃহীত হতভাগিনী।

কিন্তু, আজি আমি তোমার কাছে উল্লিখিত-রূপা কুসুম-কামিনীদিগের কথা কহিব না। তাঁহাদিগের দুঃখের কথা যন্ ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি বড় লোকেরা কহিয়া গিয়াছেন। আমি আজি যাহাদিগের কথা বলিব বলিয়া মনঃস্থ করিয়াছি, তাহাদিগকে লোকে কুসুম-কামিনী বলে না। তাহারা কাঙ্গালিনী। তাহারা, কাঙ্গালের ঘরে, অন্ধকারে জন্মিয়া, অন্ধকারেই জীবন-যাপন করে,—অন্ধকারে কাঁদে, - এবং ইয়ুরোপীয় সমাজের নেপথ্যস্বরূপ নিবিড়-অন্ধকারে, গৃহ-পালিত মার্জ্জারী ও কুক্কুরী অপেক্ষাও অধিকতর নিপীড়িত হইয়া, জীবনের অবসান সময়ে, নৈরাশ্যের অন্ধকূপে গড়াইয়া পড়ে। ভাই, যদি দাম্পত্য-জীবনের দেশ-নিষ্ঠ ফলাফল ও স্বামিত্বের সুখ-স্বত্ব লইয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে, ইহাদিগেরও সংবাদ লইতে হইবে। কারণ, ইহারাও সমাজের অঙ্গ।

যেমন দালানের সম্পর্কে ভূতলস্থ ভিত্তি, তেমন সমাজের সম্পর্কে নিম্নশ্রেণির নরনারী। ভিত্তিটা যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে দালান যেমন ভাঙ্গিয়া পড়ে; সমাজের নিম্নস্তরও যদি নিতান্ত নরক-তুল্য হয়, তাহা হইলে উহার ঊর্দ্ধস্তর-বাসীরা আপনা হইতেই অধঃপাতে যায়। তাই বলি, এস, আজি আমরা, দাম্পত্য-জীবনের সুখ-দুঃখ-সম্পর্কে, ইয়ুরোপীয় সমাজের নিম্নস্তরটাই আগে ভাল করিয়া দেখি।

তুমি * প্রসিদ্ধনামা ডক্টর নিকল্‌সের গ্রন্থরাশি পড়িয়াছ কি? তিনি তাঁহার "অন্তর্গূঢ় নৃজাতি-বিজ্ঞান" প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের মহিমায় যেমন পূজিত ছিলেন ইয়ুরোপে, তেমনই পূজা পাইয়াছিলেন আমেরিকায়। তিনি তাঁহার এক খানি পুস্তকে ইংলণ্ডীয় রমণীর গার্হস্থ্য-জীবন সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"যাহারা অজ্ঞ ও দরিদ্র, বিবাহিতা স্ত্রী তাহাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ ক্রীত-দাসী। নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থেরা গরু বাছুরকে যেরূপ গল-রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখে, পূর্ব্বকালে ইংরেজেরাও, সেইরূপ, তাহাদিগের গৃহিণীদিগকে গল-রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিত; এবং তাহাদিগকে ঐ অবস্থায় হাটে কিংবা বাজারে লইয়া যাইয়া, রীতিমত নিলামে চড়াইয়া, উচ্চতম মূল্যে বিক্রয় করিত। †

* T. L. Nichols, M. D., Author of "Esoteric Anthropology," "Human Physiology the Basis of sanitary and social science," "Forty years of American Life." ETC. ETC.

† "Formerly Englishman of the lower classes sometimes put a halter round his wife's neck, and sold her in the market-place to the highest

ডক্টর নিকলস্ পুনরপি বলিতেছেন যে, এ ঘটনা যে বড় বেসী দিনের পুরাতন এমন নহে। তিনি ১৮৭৩ সালে তাঁহার গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন ; এবং তাহার অল্প কএকটি বৎসর পূর্ব্বেও, ইংলণ্ডের হাট-বাজারে, নিলামের ঘোষণা-সহকারে, কথিত-প্রকার স্ত্রীবিক্রয়ের কথা তিনি সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন। ইংলণ্ডীয় দরিদ্রদিগের ঘরে স্ত্রী আর গৃহপালিত পশু, ডক্টর নিকলসের বিবেচনায়, একশ্রেণীর পদার্থ। কেন না, স্বামী কথায় কথায় স্ত্রীকে প্রহার করে, নাথি মারে,—ভয়ানক গালি দেয়, এবং নানা প্রকারে অত্যাচার করিতে করিতে কখনও বা খুন করিয়া ফেলায়।

আমাদিগের এই শান্ত-রস-প্রধানা ধর্ম্মাভিমানিনী ভারতভূমি ভিন্ন, পৃথিবীর সকল দেশেই, স্ত্রীবিক্রয়ের প্রথা, এক সময়ে, দেশ-প্রচলিত-রীতি মধ্যে পরিগণিত ছিল। এ অশ্রোতব্য কথা এখনও, অনেকস্থলে, নিত্য-ব্যবহৃত বাণিজ্যপ্রথা। অবনীর অনেকস্থানে, আজও অবলা, বাড়ীর একটা গাভী অথবা ঘোটকী অপেক্ষা অল্প মূল্যে, বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু সুসভ্য ইয়ুরোপ কিংবা আমেরিকাও যে, এ দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত, ইহা গ্রন্থপত্র ঘাটিবার পূর্ব্বে জানিতাম না, এবং লোকে বলিলেও মানিয়া লইতে চাহিতাম না।

bidder. Within a few years I have read of such cases in the newspapers." Dr. Nichols, M. D.

ডক্টর নিকলসের জন্মস্থান আমেরিকা, কর্ম্মস্থান ইংলণ্ড। ইংলণ্ডীয় সভ্যতার উপর তাঁহার বেসী অনুরাগ না থাকিতে পারে। কিন্তু, তিনি জন্মাবধি যে জাতীয় সভ্যতার উপাসক, তাঁহার সেই আমেরিক-সভ্যতাও স্ত্রীবিক্রয়রূপ নরাতঙ্ক কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত রহিয়াছে কি ? আমেরিকার * মুল্লাতু ও কোয়াড্রুন্-জাতীয় সুন্দরীদিগের ইতিহাস কিরূপ লাঞ্ছনা, বিড়ম্বনা ও লোক-ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার ইতিহাস, তাহা আমা অপেক্ষাও তুমি বেসী জান। তোমার জগৎপূজ্য চ্যানিঙ্, পার্কার্, গ্যারিসন ও ওয়েণ্ডেল ফিলিপিস্ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা, তাহাদিগের জন্য আর্ত্ত-নাদ করিয়া, অবনীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছেন ; এবং রমণীজাতির আভরণ-রূপিণী হারিয়েট ষ্টৌ তাহাদিগের দুঃখের গীত গাইয়া লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে নয়নজলে ভাসাইয়াছেন।

আমি সেই মুলাতু ও কোয়াড্রুন্ জাতীয় দুঃখিনীদিগের কথা কহিব না। তাহাদিগের প্রতি পাশব-অত্যাচারের পাতকে আমেরিকার বক্ষঃস্থল এক সময়ে অযুত-বজ্রে আহত

* পিতা ও মাতার মধ্যে এক জন শ্বেতাঙ্গ ও এক জন শ্যামাঙ্গ, এইরূপ বিচিত্র সম্মিলন-জাত সন্তানের নাম আমেরিকায় মুলাতু (Mulatto)। কোয়াড্রুন (Quadroon) মুলাতু অপেক্ষায় একটুকু উচ্চতর-জাতীয়। উহার পিতা ও মাতার মধ্যে এক জন শ্বেতাঙ্গ, আর এক জন উপরিবর্ণিত মুলাতু। কোয়াড্রুন রমণীরা বড় বেসী সুন্দরী।

হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকার নিম্নসম্প্রদায়স্থ অর্দ্ধ-ভদ্র ও অর্দ্ধশিক্ষিত লোকেরাও যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, আপনার হৃষ্ট-পুষ্ট ও বলিষ্ঠ স্ত্রীকে বিক্রয়ের বস্তু জ্ঞানে ব্যবহার করিয়াছে;—এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া ও বাজারে লইয়া যাইয়া, তাহাদিগকে উচ্চতম মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে, আমার প্রাণ-সখী তাহা বিশ্বাস করিবে কি ?

আমি এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের কথা প্রামাণিক গ্রন্থে পড়িয়াছি ; এবং কয়েকখানি বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া, তোমারই দৃষ্টির জন্য, যত্নের সহিত রাখিয়াছি। আজি—এই মুহূর্ত্তে—সেগুলি আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। আর এক দিন পাঠাইয়া দিব। আমি কিরূপ এলোভুলো উৎপাতগ্রস্ত, তাহা তুমি জান। কোথা কি রাখি, তাহার ঠিকানা থাকে না ; এবং যে সময়ে যেটি চাই, শত প্রকার খুঁজিলেও, সে সময়ে সেটি পাই না। তবে, আমার স্মৃতির উপর যদি তুমি * নির্ভর করিতে পার, তাহা হইলে, একটি বিজ্ঞাপন এইরূপ ;—

"সুন্দরী স্ত্রী ! সুন্দরী স্ত্রী !"

ওয়েনী নামক ডিষ্ট্রীক্‌টের অন্তর্গত হামর্গ-গ্রাম-নিবাসী চীকৃব্রুক হগের হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও রূপসী স্ত্রী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত। বয়স চব্বিশ। সর্ব্ব-অঙ্গে নীরোগ ও নিখুঁত। সমধিক শ্রমপটু। মূল্যের অঙ্কে এখন পর্য্যন্ত পনর ডলার (৫২॥ টাকা) প্রস্তাবিত হইয়াছে। আগামী শনিবার, ওবারটনের হাটে, উচ্চতম মূল্যে বিক্রীত হইবে। যাঁহারা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইবেন, অথবা বিশ্বস্ত এজেণ্টের দ্বারা বিজ্ঞাপন-দাতা স্বামীর নিকট সংবাদ লইবেন।"

আমার প্রাণ-প্রিয় সরু, স্ত্রীবিক্রয়ের এইরূপ অপরূপ বিজ্ঞাপন ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তোমার চক্ষে পড়িয়াছে কি ? তুমি যেরূপ সুমার্জ্জিত-রুচি, সূক্ষ্মতত্ত্ব মেয়ে, তাহাতে, এই বিজ্ঞাপন পড়িবার সময়, তোমার বমন-উদ্রেক না হইলেই বাঁচি। আমার কথা এই বলিতে পারি, আমি পড়িয়াছি, আর কাঁদিয়াছি ; এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার পোড়া কপালে মনে মনে ঝাঁটা মারিয়াছি।

বিক্রয়ত সই সহজ কথা। যাহারা দু'টি পয়সা পাইলেই, ঘরের স্ত্রীকে পরের নিকট পণ্য বস্তুর মত বিক্রয় করিতে পারে, তাহারা আরও কত কি পারে, তাহা, সখি তুমি ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? ইংলণ্ডে এবং য়ুরোপের আরও অনেক স্থানে, লর্ড অব্ দি মেনর ( Lord of the Manor ) অর্থাৎ ভূম্যধিকারীর খাস-তহশিলের কর বলিয়া অধিকারস্থ তরুণীদিগের বিবাহ-সময়ে, কি প্রকার একটা কদর্য্য-কুৎসিত কলঙ্কিত কর আদায় হইত, তাহা বোধ হয় তুমি কানেও কখনও শুনিতে পাও নাই। আমি যে দিন, এ প্রসঙ্গে, সমস্ত কথা প্রথম অবগত হইয়াছি, সে দিন সত্য সত্যই সই ঘৃণায় ও মনের জ্বালায় উন্মাদিনীর মত আন্ চান্ করিয়া দিনমানটা অতিবাহিত করিয়াছি ;

* এইরূপ বিজ্ঞাপন আমিও পড়িয়াছি।
শ্রীজ্ঞানানন্দ শর্ম্মা

আর, কোথায় হে তুমি করুণার নিধি বলিয়া জগদীশ্বরকে ডাকিয়াছি।

তুমি অভিন্ন-হৃদয়া সখী, তাই তোমার কাছে কথাটা ইঙ্গিতে বলিলাম। কিন্তু, তোমার সখীপতির চক্ষের দিকে চাহিয়া, এ পাপ-কথা আমি জিহ্বায়ও আনিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, আমাদিগের এদেশেও নাকি, কতকগুলি নিকৃষ্ট-নচ্ছার নগণ্য সাম্প্রদায়িকের মধ্যে, "গুরুপ্রসাদী" নামে, এমনই কি একটা পৈশাচিক প্রথা, কিছু কাল প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু সে পাপ, সমাজের নিম্নস্তরেও, সর্ব্বত্র প্রসারিত হইতে পারে নাই; এবং সামাজিকদিগের ছি ছি, থু থু. ধিক্কারের মধ্যে, দীর্ঘকাল তিষ্ঠিয়া রহিতে সমর্থ হয় নাই। অথচ, ইংলণ্ডের এ অকথ্য-পাপ দেশের কত পরিবারকে, পারিবারিক-জীবনের প্রথম-বিকাশ-সময়েই,নরকের জ্বলন্ত জিহ্বায় আহুতি দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। না ভাই সরু,—না আমার প্রাণ-সখী, তুমি ইয়ুরোপীয় সভ্যতাকে যাহা মনে করিয়াছ, উহা তাহা নহে। তুমি, উহার বাহিরের বর্ণ-চিত্র দেখিয়া, বালিকার মত আত্ম-বিস্মৃত হইও না,—আসল কথা ভুলিয়া যাইও না।

ইংরেজী সাহিত্যের বক্ষঃস্থল, বহুকাল হইতে, অনেকপ্রকার কলঙ্কের বোঝা বহন করিয়া আসিতেছে। সেই স্তূপীকৃত কলঙ্কের মধ্যে, একটা বস্তুর নাম উপরিলিখিত "ভূস্বামিত্বের কর" (অর্থাৎ "Custom of the Manor") নামক এক খানি কদর্য্য নাটক। ইয়ুরোপের অভিনয়মঞ্চে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে, যে সকল নাটক ও প্রহসন নিত্য-নূতন ঢঙে অভিনীত হইত, ডক্টর নিকল্‌স্‌ তৎসমুদয়ের কথা উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে, সেগুলি আজি-কালি-কার মনুষ্যের পক্ষে প্রকৃতই অশ্রোতব্য। তিনি তখনকার পুরুষমাত্রকেই নীতিশূন্য পশু ও নগরবাসী পতিমাত্রকেই কুলটা-পতি বলিয়া গালি দিয়াছেন; এবং ইয়ুরোপের তদানীন্তন সামাজিক-ভাব-মণ্ডলকে পুঞ্জীকৃত পাপের টগ-বগ হাঁড়ি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমি সই তোমার কাছেও কালি-কলমে লিখিতে পারিলাম না।

ইয়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট অনেক ভাল কথা শিখিয়াছি। তন্মধ্যে এখনকার প্রধান-কথা বিবর্ত্তবাদ অথবা ক্রম-বিকাশ-তত্ত্ব। তুমি অবশ্যই জান যে, ইহার ইংরেজী নাম Theory Of Evolution. এই ক্রম-বিকাশের নিয়ম-অনুসারে, ফুল যেমন ক্রমে ফোটে,—ফল যেমন ক্রমে ফলে,—দেশীয় সভ্যতাও সেইরূপ, ক্রমে ক্রমে বিকশিত অথবা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া থাকে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সপ্তদশ শতাব্দীই অষ্টাদশ-শতাব্দীরূপে ফুটিয়াছিল। অষ্টাদশ ফুটিয়া হইয়াছিল উনবিংশ। উনবিংশ-শতাব্দী, আবার কত দিনে সম্পূর্ণরূপে দেহান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, তোমার মত, উচ্চ-স্বভাবা রমণীর আকাঙ্ক্ষার অনুরূপা হইবে, তাহা তুমি নিভৃতে বসিয়া চিন্তা করিও।

ভাই, তুমি বড়মানুষের মেয়ে,—বড় পণ্ডিতের হৃদয়-লক্ষ্মী, আর আপনিও অতি-বড় বিখ্যাত পণ্ডিত। ইংলণ্ডে যেমন প্রতি-ভাশালী যুবকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ডবল্‌ ফার্ষ্ট হয়, তুমিও সেইরূপ ডবল এম এ;—বিজ্ঞানে এম এ, দর্শনেও এম এ। তুমি জন্মিয়া অবধি কলিকাতার ত্রিতল-প্রাসাদে বাস করিয়াছ; এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরাশিতে বেষ্টিত রহিয়া, আকাশের তারা গণিয়াছ, অথবা অবনীর তরু-লতা ও কীট পতঙ্গের প্রকৃতি পাঠ করিয়াছ। তুমি মনুষ্য-সমাজের কি জান? আর, মনুষ্যের মধ্যে যাহারা, আমাদিগের এ দেশে, কাঙ্গাল গরীব অথবা হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল বলিয়া সমাজে উপেক্ষিত, তাহাদিগেরই বা তুমি কি জান?

আমি সামাজিক ব্রাহ্মণের মেয়ে, সমাজের সঙ্গে শত প্রকারে জড়িত। সুতরাং সমাজের অনেক সংবাদ রাখি; এবং ঐ যে কাঙ্গাল গরীব ও হাড়ি-ডোম-চণ্ডালের কথা বলিলাম, উহাদিগের গৃহস্থালীর পারিপাট্য সময়ে সময়ে স্বচক্ষে দেখি। যখন পিত্রালয়ে —গ্রামে—ছিলাম, তখন পিসীমার সঙ্গে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়া, বিস্তর দেখি-য়াছি; পতি-গৃহে বাস-সময়েও কিছু কিছু দেখিতে পাইয়াছি; এবং এইক্ষণ, অদ্বিতীয় নামা পিতামহের আশ্রয়েও, অসংখ্য তীর্থা-গত দীন-দুঃখীকে অহরহঃ দেখিতে পাই-তেছি। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ কি দেখি? বিশেষ এই দেখি, ইয়ুরোপ ও আমে-রিকার যে শ্রেণীস্থ পুরুষেরা, গড়িলা কিংবা গণ্ডার ও ভল্লুকের ন্যায়, ভয়ঙ্কর জানোয়ার বলিয়া বর্ণিত; এ দেশের সেই শ্রেণীস্থ পুরুষেরা,—সেই প্রকার নিম্নজাতীয়েরা, যার-পর-নাই মূর্খ ও মাঝে মাঝে গঞ্জিকাসক্ত হই-লেও, আপেক্ষিক-তুলনায়, অনেক উচ্চস্থানীয়, এবং অধিকাংশ স্থলেই দয়া-ধর্ম্মশীল মনুষ্য।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায়, সমাজের নিম্ন-স্তর, প্রকৃতই কুম্ভীপাকের নিম্নতম প্রদেশের ন্যায়, সকল সময়েই, ঘোর-গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেখানে ঈশ্বরের নাম নাই, ধর্ম্মের কোন প্রসঙ্গ নাই, আর পাশ্চাত্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা পবিত্রকীর্ত্তি খৃষ্টেরও কোন পরিচয় নাই। অপিচ, সেখানে লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই; এবং মনুষ্যোচিত-চরিত্রের সামান্য কোন চিহ্নও বিদ্যমান নাই। সেখানে আছে শুধুই পেটের ক্ষুধা, প্রচণ্ড পশু-বিক্রম, এবং পাশব-লালসার সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব।

ভাই, অধিক আর কি বলিব, ইংরেজী ইতিহাস-উপন্যাস ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া যাহা বুঝি, তাহাতে ইহা একপ্রকার নিঃসং-শয় যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার নিম্নস্তরে অতি বড় পবিত্র সম্পর্কও সম্পর্ক বলিয়া পরিগণিত হয় না। ধর্ম্ম-যাজকেরা এই শ্রেণীর লোক-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া,—ইহাদিগের মধ্যে খৃষ্টের নিত্য-স্মরণীয় নাম ও নির্ম্মল ধর্ম্ম প্রচার করিতে ব্যাপৃত না রহিয়া, কি নিমিত্ত, এই বেদান্ত-পুরাণাদি-শাস্ত্র-পরিরক্ষিত পুণ্যব্রত ভারতভূমিতে, ধর্ম্ম-প্রচারের অভি-লাষে, অকারণ পদার্পণ করেন, তাহা আমি বুঝি না। তাঁহারা, স্বদেশে থাকিয়া, স্বজা-

তীয় সহস্র লক্ষ Rough অর্থাৎ ষণ্ডামার্ক গঁওয়ারদিগকে মনুষ্যত্বের পাঁচটা মোটা কথা ও অবলার প্রাণ-মান ও ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা দিলেই ভাল হয় না কি? যাহাদিগের মধ্যে, পুরুষও পুরুষের কাছে আপনার নাক-কান লইয়া নক্ষত-পরিরক্ষিত রহে না, কোমল-স্বভাবা অবলার আর তাহাদিগের কাছে কি আশা হইতে পারে? আর, অবলা যে তাহাদিগের সান্নিধ্যে মুহূর্ত্তের তরেও গৃহিণী বলিয়া সম্মান পায় না,—সহধর্ম্মিণী বলিয়া স্বীকৃত হওয়া দূরে থাকুক, সহবাসিনীর পশু-সমুচিত আদরেও পুষ্ট হয় না, ইহাতেই বা বিস্ময়ের কথা কি থাকে?

পক্ষান্তরে, যাহারা আমাদিগের এ দেশে নিম্নস্তরের লোক,—যাহারা সাধারণতঃ কেঁওর, কৈবর্ত্ত, বাগ্দী, বাঁশফোর, এবং চণ্ডাল ও চামার প্রভৃতি নামে একপ্রকার সমাজের বহিঃপ্রদেশে অবস্থিত, তাহাদিগের মধ্যেও ভক্তি ও প্রীতি-স্নেহের অনুষ্ঠান-পূত কোন না কোনরূপ ধর্ম্ম আছে; এবং যেখানে ধর্ম্ম আছে, সেখানে নিশ্চয়ই স্ত্রীজাতির অবস্থানুরূপ সামান্য একটু সুখ-শান্তি ও সম্মান আছে। এ সকল নিম্নজাতীয় লোকের সন্নিহিত হইলেই দেখিতে পাইবে, ইহাদিগের কুটীর-দ্বারের পুরোবর্ত্তি-প্রাঙ্গণে, উন্নত-বেদীর উপরে তুলসী বৃক্ষ,—ইহাদিগের গলায় তুলসীর মালা, ললাটে তিলক; এবং সমস্ত বাড়ী, গোময়ের প্রলেপে, ভিক্ষু-বৈষ্ণবের আশ্রম কিংবা আখরার ন্যায়, শুচি-শোভাযুক্ত। ইহারা স্নান করিয়া নাম জপ করে,—দিনান্তে, দশ জনে মিলিয়া, মৃদঙ্গ-মন্দিরা লইয়া, হরি-নাম গায়,—ভদ্রলোক দেখিলে, কম্পিত-কলেবরে, কর-যোড়ে দাঁড়ায়; এবং পিতা মাতা প্রভৃতি বৃদ্ধদিগকে রীতিমত পূজা করিয়া, প্রাণে একটা উচ্চ ভাবের শান্তি পায়। ইহাদিগের কুটীর-বাসিনী কাঙ্গালিনীরা যে ইহাদিগেরই অনুরূপা,—যৌবনে স্বামীর সুখ-সঙ্গিনী, বার্দ্ধক্যে সাদর-পালিতা, সসম্মান-সংবর্দ্ধিতা 'ঘরণী গৃহিণী,' এবং মহোৎসবাদি-ক্রিয়াকর্ম্মে, রাজ-রাণীর ন্যায়, রীতিমত স্বামীর সহধর্ম্মিণী, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

আমি এই জন্যই সই বলিয়াছি যে, দাম্পত্য-জীবন এ দেশে যেরূপ শান্ত-প্রীতিময় গার্হস্থ্য সুখে পরিণত হইয়াছে, এ পৃথিবীর আর কোথায়ও তাহা হয় নাই,—আর কোথায়ও তাহা হইতে পারে না। তুমি আমাকে সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনে নিষেধ করিয়াছ। এ নিষেধ কতকটা যুক্তিসঙ্গতও বটে। কেন না, সুদূর-গগনের শ্বেতস্ফুট অরুন্ধতী যেমন আবিল গগনে চর্ম্মচক্ষের বিষয় হয় না; সীতা ও সাবিত্রীর স্বর্গ-দুর্লভ চরিত্রও, সেইরূপ, সাধারণতঃ মনুষ্য-হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে চাহে না,—প্রতিভাত হইতে পারে না। কিন্তু এ দেশের 'দীন-হীনা' কাঙ্গালিনী,—শাকান্ন-সম্বলা চণ্ডালিনীও যে, জীবনের বিকাশে, কিঞ্চিদংশে, ঐ সীতা ও সাবিত্রীর ছাঁচে গঠিত,—অতি অল্প পরিমাণে হইলেও, সীতা ও সাবিত্রীর স্বর্গ-দুর্লভ চরিত্রে অনুপ্রাণিত, তাহা ভাই, তুমি প্রাসাদ-বহুলা রাজধানীতে থাকিয়া

অনুভব করিতে পাইবে কি? এ দেশের চণ্ডালিনীরাও, কন্যা কিংবা পুত্রবধূর অকাল-বিয়োগে, "হা আমার সীতা গো" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে; কন্যা কিংবা পুত্র-বধূকে আদর করিতে হইলে, তুমি সাবিত্রীর সমান হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে; আর এই শ্রেণীর ভাগ্যবতীদিগের মধ্যে কেহ কেহ, কুত্রচিৎ কখনও, সত্য সত্যই সাবিত্রীর ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া, ব্রাহ্মণাদি বিশিষ্ট উচ্চ বর্ণেরও বিস্ময় ও ভক্তি জন্মাইয়া থাকে।

তুমি বলিবে ইহা কি সম্ভব? আমি প্রত্যুত্তরে বলিতেছি, ইহা শুধু সম্ভব নহে, ইহাই এ দেশের প্রকৃত অবস্থা। ইহার নাম সভ্যতার নিম্ন-নির্গমন। যদি কথাটা না বুঝ, তাহা হইলে, তোমার ভাষায়, তোমার মত চোক ঢুলাইয়া বলিব—"Filtration of Civilization." এ দেশে জাতিভেদ আছে; কিন্তু জীবনের তন্তুচ্ছেদ ও গ্রন্থিভেদ নাই। তাই এ দেশে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, জাতি-সম্পর্কে পরস্পর-বিভিন্ন হইয়াও, সমাজের সুখ-সম্পদে ও মূল-গ্রন্থিতে অচ্ছিন্ন; এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী ও দীনবন্ধু চঙ্গের বৃদ্ধা গৃহিণী, গার্হস্থ্য বিধানে, একে অন্যের সমতাপন্ন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী ও সুকুমার-মতি বালিকারা যেমন, বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে, চিকণীর অন্তরালে বসিয়া, ধরণীধর কথক অথবা কৃষ্ণকান্ত পাঠকের মুখে, সীতা, সাবিত্রী, চিন্তা ও দময়ন্তী প্রভৃতি রমণীর শিরোমণিরূপা দেবতাদিগের কথা, অথবা দেব-প্রকৃতি প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের কথা, শ্রবণ করে; স্বভাব-ভক্ত দীনবন্ধু চঙ্গের তিলক-তুলসী-মণ্ডিতা বৃদ্ধা স্ত্রী এবং বয়স্থা মেয়েরাও সেই-রূপ, চণ্ডীমণ্ডপ-প্রাঙ্গণের প্রান্তরেখায় উপবিষ্ট রহিয়া, ঐ সকল কথাই কান পাতিয়া শুনিতে শুনিতে অজস্র-বিগলিত অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়া থাকে।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় এ দৃশ্যের সাদৃশ্য আছে কি সেই? ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় জাতিভেদ নাই। কিন্তু ঐ উভয় দেশে, জাতিভেদের অভাব সত্বেও, জীবনের স্তর-ভেদ এমন ভয়ঙ্কর প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, বড় লোক আর নর-লোককে একই ভূলোকের অধিবাসী বলিয়া একত্র আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং, ঐ সকল দেশে যাহারা সমাজের অধঃস্থিত, তাহারা এক-প্রকারে মনুষ্য-নাম ও মনুষ্য-নিবাসের বহির্ভূত; এবং স্ত্রীজাতি তাহাদিগের মধ্যে, যেমন স্ত্রীত্বের সকল স্বত্বে বঞ্চিত, তেমনই সর্ব্বপ্রকার অশ্রাব্য লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত। ঐরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুঃখিনীরা, সহবাসী পুরুষকে স্বামী না বলিয়া, সর্ব্বনেশে বলিতে পারে। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কেন না, স্ত্রী যেখানে জীবন-সঙ্গিনী নহে, সেখানে পুরুষ, কোন্ গুণে, স্বামিনামের অধিকারী হইবে? তবে যে দেশে,—সামাজিক জীবনের যেরূপ বিকাশে, সমাজের নিম্নতম স্তরেও, পুরুষ পরিণীতা স্ত্রীর সর্ব্বাচ্ছাদক-পরিরক্ষক, এবং সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, প্রকৃত স্নেহময় অভিভাবক, সেই দেশে,—সমাজের

সেই অবস্থায়, তাহাকে স্বামী বলা যায় কি না, তাহা তোমারই বিবেচ্য।

আজি এখানেই ভাই বিরত রহিলাম। পারিত শীঘ্রই আবার তোমার কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতার উর্দ্ধস্তরের দু'চারিটি কথা জানাইব। আমি তোমাকে আমার প্রাণটা হইতেও বেসী ভালবাসি, অথচ আমি "অবোধিনী," এ সকল কথা লিখিয়া লিখিয়া, তোমার কোমল প্রাণে আঘাত করি। তুমি ইহাতে কি বুঝিতেছ না যে, এ সকল কথা তোমার ও আমার নহে; এগুলি সমস্ত মানব-জাতিরই ইহকাল ও পরকালের কথা। অতএব এ বিষয়ে, প্রাণে যাহা আছে, তাহা কোন অংশেও গোপন না করিয়া, প্রাণ খুলিয়া বলাই সঙ্গত।

হায়! আমি যদি আমার এই প্রাণটা সই তোমার প্রাণে ঢালিয়া দিতে পারিতাম, বোধ হয়, তাহা হইলে, তোমাকে আমার হৃদয়ের জ্বালা কতকটা বুঝাইতে সমর্থ হইতাম। কথায় কথায় ত সই পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকি যে, তুমিও রমণী, আমিও রমণী, এবং উভয়েই রমণীর সুখ-সম্মানে অনুরাগিণী। কিন্তু স্বামিত্বের কিরূপ ব্যবস্থায়, রমণীর প্রকৃত সুখ, স্বত্ব ও সম্মান পৃথিবীর কোন্ দেশে কিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে সমস্ত কথার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি, এ প্রসঙ্গে, ইহার পর, তোমার কাছে যাহা লিখিব বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া, তুমিও সরু চমকিয়া উঠিবে; এবং যদিও রাম-নাম লওয়া তোমার অভ্যাস নহে, তুমিও, নিশ্চয়ই, রাম রাম বলিয়া কানে হাত দিবে।

একটি কথা। আমার এই পত্রখানি, অন্ততঃ পত্রের এই শেষ অংশটুকু ভাই,—দোহাই তোমার মনোর, মনোকে কিংবা আর কাহাকেও দেখাইও না। পরেশ, সুরেশ, ও হৃদয়কেও না। উহাদিগকে আমার স্নেহপরিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ জানাইও; এবং তুমি তোমার নবোদগত প্রেমের উচ্ছ্বাসে যাঁহাকে পাড়াগেঁয়ে পারাণী নৌকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ, তাঁহাকে আমার অসংখ্য প্রীতিসম্ভাষণ উপহার দিও। তোমার কাছে আরও কিছু লিখিবার আছে। কিন্তু সে কথা আমার কলমে সরিল না। বঙ্গীয় সঙ্গীত-সাহিত্যের সে পুরাতন কবিগাথা জান ত?—

"তারে বলি বলি বলি
বলা হইল না।
শরমে—মরমের কথা
মুখে ফুটিল না।"

যাহাকে আমার প্রাণাধিক-প্রাণ বলিয়া ডাকি, এবং যাহার প্রীতিশীতলা প্রতিকৃতি খানি সতত প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখি, তাহাকে মনে করিয়াও লজ্জায় জড়ীভূত হইতেছি। ইহাই না আমাদিগের অবলা-স্বভাবের স্বাভাবিক গতি! যাহা হউক, দিদী মা তোমার বাবার কাছে আর তোমার কাছে পৃথক্ পত্র লিখিতে যাইতেছেন। তুমি তাহাতেই সমস্ত জ্ঞাত হইবে; এবং আমাকে সর্ব্বদা হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিবে। •

দিদী মা আমাকে যাহা বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তোমার সম্পর্কেও তাহাই আশা করেন, এবং তাহাই বলিয়া, তাঁহার জপের মালা হাতে লইয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। আমি আমার প্রাণ-সখীর সে সুখের কথা কত দিনে কানে শুনিয়া প্রাণ জুড়াইব? ভাই, কোম্‌ট যেমন বলিয়াছেন, আমিও সেইরূপ বলি, মাতৃত্বই রমণী-জীবনের চরম-স্বত্ব ও পরম-মহত্ব। রমণী আগে জগন্মোহিনী, তার-পর জগজ্জননী। মনুষ্য, এ মহাতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য কবে সম্যক্ বুঝিয়া, জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে তদ্গত-চিত্তে প্রণত হইবে;—এবং রমণীমাত্রকেই মাতৃত্বে তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি মনে করিয়া ভক্তির সহিত পূজা করিবে? বোধ হয়, আমি তোমাকে আর একদিন বলিয়াছি যে, হিন্দুশাস্ত্রে পাণিগৃহীতী রমণীর এক নাম জায়া—অর্থাৎ আত্মজ-জননী। রমণীর এ সম্মানের কাছে মিলের মনঃকল্পিত রাজনৈতিক সম্মান অতি তুচ্ছ বস্তু।

এখানে আমরা সকলেই বিশ্বেশ্বরের কৃপায় এক প্রকার কুশলে আছি। তুমি তোমার সকলকে লইয়া কুশলে থাকিলেই, আমাদিগের অধিকতর কুশল।

তোমার চির-প্রেম-গৌরবিণী,
চির-জীবন-সঙ্গিনী
সখী—সুভাষিণী।

# ছায়া-দর্শন।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

### উপক্রম।

আকাশে, অকস্মাৎ, একটা অভিনব আলোকের অভ্যুদয়-দর্শনে, মনুষ্যজগতের হৃদয় যেমন আনন্দে অথবা ঔৎসুক্যে উথলিয়া উঠে; আজি এক মাসের কিছু অধিক হইল, ইংলণ্ডীয় শিক্ষিত-জগতের হৃদয়ও, একখানি অভিনব গ্রন্থের প্রকাশ-দর্শনে, আশায় ও বিশ্বাসে, এবং ভক্তি ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে, সেইরূপ উথলিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের বৈজ্ঞানিক ও তাত্ত্বিক, ভক্ত ও ভক্তিপিপাসু পণ্ডিত মাত্রই, সে গ্রন্থ লইয়া, এত প্রকারে প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন যে, দেশে প্রকৃতই যেন একটা অপূর্ব্ব হর্ষের হল-হলা-শব্দ সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে। সামান্য একখানি গ্রন্থপ্রকাশেও কি ঐরূপ অসামান্য বিদ্বজ্জনের দেশে এমন একটা ভাব-বিপ্লবের সম্ভাবনা ঘটে? সে গ্রন্থ কি? গ্রন্থে এমন কি আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহা লইয়া ইংলণ্ডে ও ইংলণ্ড-সংসৃষ্ট সমস্ত সুসভ্য-দেশে এইরূপ আনন্দময় আন্দোলন হইবে?

গ্রন্থের নাম "Human Personality

and Its Survival of Bodily Death." অর্থাৎ মানবীয় আত্মার পৃথগস্তিত্ব এবং উহার পারলৌকিক জীবন। গ্রন্থকারের নাম (Frederic W. H. Myers.) ফ্রেডারিক মিয়ার্‌স্। গ্রন্থকার এইক্ষণ জড়জগতে জীবিত নাই। যদি তিনি এইক্ষণও পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে, অবশ্যই তিনি, তাঁহার প্রাণের আশা ও পুণ্যব্রতের অভাবনীয় সাফল্য-দর্শনে, হৃদয়ের অতি গভীর কৃতজ্ঞতায় অশ্রু বর্ষণ করিতেন।

ইংলণ্ডের রাজধানী, রাজ-সম্পদের কলকলায়মানা সমুদ্রসদৃশী লণ্ডন-নগরী অসংখ্য সভাসমিতির আশ্রয়-ভূমি। সে অসংখ্য সভাসমিতির মধ্যে একটি বিশেষ সমিতির নাম (Psychical Research Society) অর্থাৎ অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান-সভা। এই সভা অথবা সমিতি, অনেকের বিবেচনায়, ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের এক বৃহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ। * ইহা কতকগুলি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের যত্নে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং সেই সময় হইতে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার স্থানে স্থানে, পণ্ডিত-বহুলা শাখা ও প্রশাখা প্রসারণের দ্বারা, ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমস্ত প্রসিদ্ধ দেশে ছড়াইয়া পড়ে। এই সভার সদস্যদিগের মধ্যে অনেকেই আগে অধ্যাত্মতত্ত্বে যার-পর-নাই অবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহারা, অবিশ্বাসীর হৃদয় লইয়া, অনুসন্ধানে অগ্রসর হন; এবং ক্রমে, বহু অনুসন্ধানে, বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিতে পঁহুছিয়া, বিস্ময়ে মস্তক অবনত করেন। এই সভা এইক্ষণ একটি বিশাল বট-বৃক্ষের ন্যায় বদ্ধ-মূল। ইহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং ক্রমেই চর্ম্মচক্ষের অগ্রাহ্য, অজড় ও অপ্রত্যক্ষ অধ্যাত্মশক্তির প্রাকৃত-গতি ও অজ্ঞাত-পূর্ব্ব প্রভাব বিষয়ে বিবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করিতেছে। ইয়ুরোপের সকল শ্রেণির শিক্ষিত ব্যক্তিই ইদানীং এই সভার মুখ-প্রেক্ষী। কেন না, ইহার উদ্দেশ্য বড় উচ্চ ও বিশ্বব্যাপী। সম্প্রতি রুষ-সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, বিশ্রুতনামা অধ্যাত্মতাত্ত্বিক, মাননীয় আলেকজেণ্ডার আক্‌সাকফ্, (Hon. Alexander Aksakof) তদীয় দেহ-ত্যাগসময়ে, এই সভার পরিপোষণার্থ, তিন হাজার আট শত পাউণ্ড, অর্থাৎ সাতান্ন হাজার টাকা দান করিয়া, ইহার প্রতি আপনার হৃদ্গত ভক্তির সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

ফ্রেডারিক মিয়ার্স সুদীর্ঘকাল উল্লিখিত অধ্যাত্ম-তত্ত্বানুসন্ধান-সভার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ছিলেন; এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বুদ্ধি-প্রতিভা, এবং ধীরতা, সহিষ্ণুতা, অক্লান্ত-শ্রমশীলতা ও সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণে আপনার পদের বিশেষ গৌরব বাড়াইয়াছিলেন। তিনি যখন, ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন, তখন তাঁহার মন দুইটি গুরুতর প্রশ্নে আলোড়িত হয়।—

* Psychical Research in the Victorian Era by A. Goodrich-Freer.

প্রথম প্রশ্ন এই,—মানুষ কি অস্থি-পঞ্জর-রক্ত-মাংসময় শরীর-রূপ যন্ত্রের একটা জড়-পুতুল মাত্র, না সেই যন্ত্রের অভ্যন্তরস্থিত,—যন্ত্রাতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র আত্মা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন মনুষ্যের পরকাল।—অর্থাৎ, মানুষের দেহ যখন রোগে কিংবা অন্য কারণে বিনষ্ট হয়, মনুষ্যের আত্মাও কি তখন, সেই সঙ্গে সঙ্গে, বিনষ্ট হইয়া যায়;—না উহা, স্থানান্তরে, সূক্ষ্মতর-শরীরে অবস্থিত রহিয়া, জগদ্‌যন্ত্রের অলঙ্ঘ্য নিয়মে, জীবনের বর্ত্মে ক্রমে উন্নতি লাভ করে!

এই উভয় প্রশ্নই, পৃথিবীর অনেকের নিকট, যার-পর-নাই উপেক্ষার বস্তু। কাট পাট, কাঁসা তামা, কয়লা অথবা সুদের বাণিজ্য করিয়া, সোনার অট্টালিকা গড়িব,—সুসজ্জিত শকটে আরূঢ় হইয়া মনুষ্যের মধ্যে ইন্দ্রের প্রতাপে প্রতিষ্ঠিত রহিব; অথবা—প্রয়োজন ঘটিলে—রবি চন্দ্র, রাহু কেতু প্রভৃতি সমস্ত গ্রহদেবতাকে, গৃহ-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ন্যায়, সামান্য উপচারেই স্ববশে আনিয়া, শত্রুর বক্ষে বজ্রাঘাত করিব। আত্মা ও পরলোক থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে আসে যায় কি?

কিন্তু মহামতি মিয়ার্সের হৃদয় ও মন আর একপ্রকার উপাদানে গঠিত ছিল। তিনি উপরিলিখিত প্রশ্নদ্বয়কেই মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন বলিয়া মনে করেন, এবং এই প্রশ্নদ্বয়ের মীমাংসার উদ্দেশ্যে, আপনার হৃদয় ও মন, বুদ্ধি ও প্রতিভা, সাংসারিক প্রতিপত্তি ও আশান্বিত জীবন তদ্গত চিত্তে উৎসর্গ করিয়া, ত্রিশ বৎসর কাল তত্ত্বের অনুসন্ধানে নিবিষ্ট রহেন। আজিকার এ আলোচ্য গ্রন্থ তাঁহার সেই ত্রিংশদ্‌বর্ষব্যাপি প্রতীক্ষা, পরীক্ষা, প্রভূততম শিক্ষা ও পরিশ্রমের পীযূষময় ফল।

এই গ্রন্থ সমাপনের অল্প কিছুদিন পরেই মিয়ার্স মনুষ্যলোক হইতে তিরোহিত হন। তাহাও আজি দুই বৎসরের কথা। তিনি তাঁহার এই প্রাণারাধ্য বস্তু, পৃথিবীতে থাকা কালে, স্বয়ং প্রকাশ করিতে পারিবেন না, বোধ হয় পূর্ব্বেই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পাইয়াছিলেন। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি লোকান্তরে গমন করেন; অথচ তাহার বহুপূর্ব্বে—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে, ডক্টর হজসন এবং এলাইস্ জনসনের হস্তে এই গ্রন্থ-মুদ্রণের সমস্ত ভার সমর্পণ করেন। তাঁহার এই বিশাল গ্রন্থ, শুধু লিপিশ্রমের পরিমাণেও, অলোক-সামান্য পরিশ্রমের পরিচায়ক। ইহা দুইটা বড় বড় ভল্যুমে বিভক্ত, এবং ক্ষুদ্রাক্ষর-মুদ্রিত চৌদ্দশত পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। তিনি ১৮৯৩ সালে (Science and a Future Life) বিজ্ঞান ও ভাবিজীবন নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন; এবং মনুষ্যের পারলৌকিক জীবন বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রত্যক্ষ সত্যের মধ্যে পরিগণিত কি না, এই কথাই তাহাতে প্রধানতঃ আলোচনা করেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই প্রশ্নেরই শেষ মীমাংসা।

মিয়ার্স, তাঁহার মীমাংসায় পঁহুছিবার জন্য, যেরূপ প্রামাণিক বৃত্তান্তের আশ্রয়

লইয়াছেন, এবং সে স্তূপীকৃত প্রমাণ-বিবরণের প্রকার-নিবেশে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও প্রবীণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিয়া, টাইমস্ (The London Times) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদকেরাও চমৎকৃত হইয়াছেন। রিভিউ অব্ রিভিউ নামক পত্রিকার সম্পাদক সুপরিচিত ষ্টীড্, আপনার হৃদয়ের আবেগ গোপন করিতে না পারিয়া, এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধের নাম—"মানুষ দেহান্তর-প্রাপ্তির পর জীবিত থাকে কি? উত্তর,—বিজ্ঞানের কঠোর পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, মানুষের আত্মা অনন্ত-কাল-স্থায়ী।" ষ্টীড্ গ্রন্থসমালোচনায় বলিয়াছেন যে,—এ গ্রন্থ এ মাসের গ্রন্থ নহে, এ বৎসরের গ্রন্থ নহে, ইহা প্রকৃতই এ যুগের গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত (W. E. Garrett Fisher) গ্যারেট ফিসার লণ্ডনের ডেইলী মেইল (Daily Mail) নামক পত্রিকায়, অতি সার-গর্ভ প্রবন্ধে, গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, মার্কোনির বৈতারিক বিদ্যুদ্বার্ত্তা যেমন বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য, আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব ও দেহাতিরিক্ত অধ্যাত্ম শক্তিও সেইরূপ পরীক্ষিত সত্য।

কিন্তু এ সকল সমালোচনার উপর পড্মোরের সমালোচনাই বিশেষ আলোচ্য। ফ্রাঙ্ক পড্মোর (Frank Podmore) ইদানীন্তন বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অবিশ্বাসীর অগ্রগণ্য। এ হেন পড্মোরও মিয়ার্সের গ্রন্থ পড়িয়া মাথা নোয়াইয়াছেন। পড্মোর বলিয়াছেন,—

এ গ্রন্থ ফলতঃই এক স্মরণীয় বস্তু। কি বা তর্কের নির্ভীক নূতনত্ব, কি বা সেই তর্কপরিপোষক বিষয় ও বৃত্তান্তের প্রাচুর্য্য এবং প্রাণমোহন পারিপাট্য, সর্ব্বাংশেই এই গ্রন্থ স্মরণীয়। ইহা, শ্রুতিমধুর বাক্যসমূহের বীরোচিত বিন্যাস, এবং অতি বড় রুচির-সুন্দর চিত্রনিচয়ে প্রদর্শিত, বিশ্বদর্শি জ্ঞানের বিকাশ, সকল দিকেই মনুষ্যের স্মরণীয়।

পড্মোরের মুখে এ সকল কথা সাধারণ কথা নহে। কিন্তু মিয়ার্সের কি কথায় আজি মানব-জাতির এইরূপ আনন্দ উন্মাদ? আমাদিগের "এই অসভ্য ও অন্ধতমসাচ্ছন্ন" হিন্দুজাতির পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা শত সহস্র প্রকারে যে কথা বুঝাইতে যত্ন

* বাঙ্গালায় কোন ক্রমেই ইংরেজীর ভাল অনুবাদ হয় না। আমরা ভাল অনুবাদ করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি; এবং এ জন্য, পড্মোরের মৌলিক লেখা হইতে কএকটি পংক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।—
"This is a memorable book, memorable for the daring novelty of the argument, and for the fascinating nature of the material so abundantly employed to illustrate and and enforce that argument. Memorable also for the stately marshalling of sonorous periods, and for the cosmic range of the author's outlook, as reflected in imagery of exquisite fitness and beauty."

পাইয়াছেন, এবং ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অধ্যাত্মতাত্ত্বিকেরা যে কথা বুঝাইবার জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধে সহস্রাধিক সারসত্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, মিয়ার্স সেই পুরাতন কথাকেই এখনকার বৈজ্ঞানিক-প্রথার নূতন প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মিয়ার্স যে মীমাংসায় উপনীত হইয়া এইরূপ যশোধ্বনিতে অভ্যর্থিত হইতেছেন, তাহার মর্ম্মনিষ্কর্ষ এই;—

(১) *মনুষ্যের আত্মা অখণ্ড চিন্ময় পদার্থ,* অনন্তপ্রকার-শক্তিসম্পন্ন ও অনন্তজীবী।

(২) আত্মা, দেহের পিঞ্জরে নিরুদ্ধ থাকা সময়েও, সাধনা-বিশেষ অথবা বিশেষরূপ শক্তি লাভের দ্বারা, সময়ে সময়ে, দেহের বাহিরে যাইতে পারে, এবং দেহাবচ্ছিন্ন অবস্থায়ও দূরবর্ত্তী সুহৃজ্জনকে মনের কথা জানাইতে সমর্থ হয়।

(৩) মনুষ্যের দেহ যখন জড়জগতের পরিচিত প্রণালীতে বিনাশ পায়, আত্মা তখন, দেহমুক্ত হইয়া, আপনার কর্ম্ম-ফল-নিয়মিত গতি লাভ করে; এবং লোকান্তরেও,—ক্রমিক উন্নতির বিধান অনুসারে, অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায়, অনুতাপ-দাহে পরিশোধিত হইয়া, উর্দ্ধগামী ও উচ্চতর সুখের অধিকারী হয়।

(৪) মনুষ্যের আত্মা বায়ু কিংবা বাষ্পের ন্যায় নিরাকার পদার্থ নহে। এখানে, এ জড়-দেহে, তাহার যেমন চক্ষু কর্ণ, হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে; অজড়-অধ্যাত্ম দেহেও তাহার সেইরূপ হস্ত পদ, ও চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে; এবং সে, অধ্যাত্ম-জগতের নিয়ম অনুসারে, সময়ে সময়ে, মনুষ্যকে ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দান করিতে পারে।

(৫) তাহার প্রাণে এখানেও যে ভালবাসা, *সেখানেও সেই ভালবাসা।* প্রাণের এই ভালবাসা ক্রমে বাড়ে, কখনও ক্ষয় পায় না; এবং যে যাহারে ভালবাসে, সে পরলোকবাসী হইয়াও তাহারে একবারে ভোলে না,—তাহার উপকার করিবার সুযোগ পাইলে, সে সুযোগ পরিত্যাগ করে না।

(৬) মনুষ্যের আত্মা, সূক্ষ্ম তনু লাভ করিয়া, যে অধ্যাত্মধামে অবস্থান করে, তাহা, এই পৃথিবীর উপরে, স্তরে স্তরে, অবস্থিত,—নক্ষত্র-মণ্ডলের ন্যায় দূরস্থিত নহে। সে সকল ধাম সূক্ষ্মতর পদার্থে রচিত বলিয়া পার্থিব চক্ষুর অলক্ষ্য। অপিচ, মানব-জীবন, এখানে যেমন, ক্রম-বিকাশের নিয়মাধীন, লোকান্তরিত আত্মার অধ্যাত্ম জীবনও, সে সকল ধামে, সেইরূপ, ক্রমবিকাশের নিয়মাধীন। ইহার এই ফল, মনুষ্য এখানে যেমন, বহুশতাব্দীর শিক্ষা, পরীক্ষা ও ক্রমিক উন্নতির পর, ধূমযানের সাহায্যে দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করিতেছে, এবং বিনা তার-যোগে অথবা তারে বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপকথনে সমর্থ হইয়াছে; মনুষ্যের আত্মা, সেখানেও সেইরূপ, বহুশতাব্দীর শিক্ষা, পরীক্ষা ও ক্রমিক উন্নতির পর, পৃথ্বীধামে যাতায়াতের জন্য, ইদানীং অধিকতর সুবিধা পাইয়াছে;—পৃথ্বীবাসী মনুষ্যের

হৃদয় ও মনের উপর কার্য্য করিবার জন্য, অধিকতর শক্তিলাভ করিয়াছে।

( ৭ ) অনন্তদেব জগদীশ্বরের নিকট আকুল প্রাণে প্রার্থনা অরণ্যে রোদন নহে। যে সকল আত্মা, ঊর্দ্ধধামে উন্নত হইয়া, দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভগবানের সিদ্ধ সেবক। মনুষ্যের প্রার্থনা যখন প্রপন্নবৎসল পূর্ণানন্দের প্রীতিকর হয়, তখন অন্তরীক্ষচারী দেবতারা, প্রাণে তাহা অনুভব করিয়া, সেই প্রার্থনার অনুরূপ ফল-দানে, আনন্দ-বিহ্বল-প্রাণে ব্যাপৃত হন।

সুবিজ্ঞ পাঠক সহজেই বুঝিতে পাইবেন যে, মিয়ার্স, মনুষ্যজাতির হৃদয়ে যে সত্য দৃঢ় মুদ্রিত করিবার জন্য, ত্রিশ বৎসর কাল পরিশ্রম করিয়াছেন, আমরাও মনুষ্যকে সেই সত্যে আকর্ষণ করিবার জন্যই, ছায়া-দর্শন প্রবন্ধে বিবিধ আত্মিক-কাহিনী উপহার দিয়া আসিতেছি। তবে, আমরা, পারলৌকিক-জীবনের অন্যবিধ প্রমাণ বিষয়ে, এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু না বলিয়া, শুধুই যে আত্মিক-মূর্ত্তির আকস্মিক-দর্শনের কাহিনীগুলি বিজ্ঞ-বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের সাক্ষ্যের উপর নির্ভরে, সংকলন করিয়া আসিতেছি, তাহার অবশ্যই কারণ আছে। সে কারণ স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ না করিলেও, অনায়াসেই অনেকের বোধগম্য হইবে। আমরা তথাপি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত আছি যে, যদি ভগবানের কৃপায়, বান্ধব, উহার পরিগৃহীত ব্রতধর্ম্ম-উদ্যাপনে, কিঞ্চিৎ পরিমাণেও কৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে, আমরা অচিরেই, অধুনাতন অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস ও ভারতীয় ঋষিতাপস-প্রোক্ত পুরাতন অধ্যাত্মতত্ত্বের সমস্ত কথা লইয়া, পাঠকের সম্মুখীন হইতে যত্নপর হইব।

পরলোক-গত আত্মা, দেবপুরুষদিগের অনুকম্পায়, আপনার পৃথ্বীবাসী প্রাণপ্রিয় জনের নিকট দর্শন-দানের জন্য উপস্থিত হইলে, অনেক সময়, সে ছাড়া অন্যে তাহাকে দেখিতে পায় না। ইহার কারণ কি? এ কথার মূলতত্ত্ব ওয়ালেস ও এপ্‌স্ সার্জেণ্ট * প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বহু বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া, প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আত্মিক মূর্ত্তি যাহাকে দর্শন দান করিতে ইচ্ছা করে, তাহার আত্মায় দর্শনের উপযোগি শক্তি জন্মাইয়া লয়। আর পাঁচ জনের আত্মার উপর সেইরূপ ক্রিয়া হয় না, তাই তাহারা সম্মুখস্থ মূর্ত্তিকেও দেখিতে পায় না।

এ স্থলে এমন বলা যাইতে পারে যে, দশ জনের মধ্যে শুধুই এক জনের দৃ অলীক-কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইবে না কেন? ইহার এই উত্তর,—উপেক্ষিত হইবে না পরবর্ত্তি ঘটনার প্রামাণ্যে। আমরা অদ্য পাঠককে যে ঘটনাটির আলোচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহার দুঃখময় ইতিহাসে লণ্ডনের অনেকের চক্ষে অজস্র অশ্রু

* Miracles and Modern Spiritualism By Alfred Russel Wallace, D C L, L L D, F R S, and Scientific Basis of Spiritualism By Epes Sargent.

ঝরিয়াছিল। লোকান্তরিত আত্মা, কেবল এক জনের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, সে প্রকাশ প্রত্যয়-যোগ্য কি না, পাঠক নিজেই তাহা, সমস্ত ঘটনা মিলাইয়া, সহজে অবধারণ করিতে পারিবেন।

## আত্মিক-কাহিনী।

জেন্ আর আনি ( Jane and Anne ) দুইটি সহোদরা ভগিনী। দুইটিই সুশিক্ষিতা, সাদর-সংবর্দ্ধিতা, এবং চরিত্রগুণে বিশেষ পরিচিতা। পিতা ও মাতা উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এখন জীবিত নাই। লণ্ডনের পশ্চিম-প্রান্ত-স্থিত কোন এক নির্জ্জন পল্লীতে, দুটি বোন, এক বাটীতে, একত্র বাস করে। জেন্ জ্যেষ্ঠা, আনি কনিষ্ঠা। উভয়ের মধ্যে বয়সের পার্থক্য দুই তিন বৎসরের বেসী নহে। তথাপি, অন্য অভিভাবক না থাকা হেতু, জ্যেষ্ঠা জেন্ই আনির অভিভাবিকা, এবং আনি জেনের জীবন-সঙ্গিনী প্রাণাধিকা। ভালবাসার কেমন এক বিচিত্র বন্ধনে, দুটি বোন যেন এক-আত্মা, এক-প্রাণ।

জেন্ ও আনি দুই ই যুবতী, দুই ই সুন্দরী। কিন্তু, আত্মীয়স্বজনের মধ্যে, রূপের তুলনায়, জেন্ অপেক্ষা আনির আদর একটু বেসী। আনি, বয়োধর্ম্মে বিকসিত হইয়াও, ব্যবহারে একটি কচি বালিকার মত। আনি কাহারও চোখের দিকে সাহস করিয়া চায় না,—কাহারও চোখের দিকে চাহিয়া কথাটি কহিতেও সমর্থ হয় না। আনি যেমন নম্র, তেমনই বিনীত, তেমনই আবার মিষ্ট-প্রকৃতি। বস্তুতঃ, আনি একটি মূর্ত্তিমতী লজ্জাবতী লতা; সর্ব্বদাই যেন আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। সকলেই বলে, আনির মত লাজুক মেয়ে পল্লীতে দ্বিতীয় আর একটি নাই। আনির মধুর-স্বভাব, ভাসা-ভাসা ও ঢল-ঢল চোক দুটির সলজ্জ-মধুর স্নেহশীতল দৃষ্টি তাহার ছাঁচে-কাটা কমনীয় মুখ-খানিতে এমনই একটু অনুপম মাধুরী আঁকিয়া রাখিয়াছিল যে, তাহাকে দেখিলে, অপরিচিতের প্রাণেও অতিপ্রগাঢ় প্রীতি বা স্নেহের সঞ্চার হইত।

আনির আর এক সম্পদ্ সঙ্গীত-প্রতিভা। পিয়ানো ( Piano ) বাদনে আনি, আত্মীয়-প্রতিবেশি-মণ্ডলের মধ্যে, একপ্রকার অদ্বিতীয়া। আনির সুকোমল কর-স্পর্শে নির্জীব পিয়ানোতে মানব-কণ্ঠের সজীব-মাধুরী উন্মাদ-তরঙ্গে উছলিয়া উঠিত। অপিচ, তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি যেমন মধুর, কণ্ঠ-স্বর তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মধুর ছিল। আনি যখন, পিয়ানোর সুরে সুর মিশাইয়া, আপনার অর্দ্ধমুদ্রিত ও স্বপ্নাবেশ-সুখ-স্মিত চোক্ দুটি ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া, স্বকীয় কল-কণ্ঠের কল-সঙ্গীতে আত্মবিস্মৃত হইত, তখন গৃহ-পালিত পশু-পক্ষীও, যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ, সেই স্বর-লহরীতে আকৃষ্ট রহিত।

ভগিনী দুটি এখনও অবিবাহিতা কুমারী। জ্যেষ্ঠা জেন্, মনে মনে কোন যুবকে অনুরাগিণী কি না, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু কনিষ্ঠা আনির কুসুমিত-প্রাণের নিভৃত-

কক্ষে একটি প্রিয়দর্শন যুবার মোহন-মূর্ত্তি, দেব-মূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আনি, তাহার সেই প্রাণ-লুক্কায়িত প্রিয়দেবতার অমল প্রণয়ানুরাগে আপনার প্রাণ ও মন সমর্পণ করিয়া একপ্রকার তাহাতেই, যেন জীবিত আছে।

আনির প্রেমারাধ্য যুবকের নাম চার্লস্। সে অল্প দিন হয়, সেনাবিভাগে প্রবিষ্ট হইয়াছে ; এবং আপনার স্বাভাবিক সাহস ও শৌর্য্যে, অচিরেই সৈনিকদিগের সমাজে প্রশংসা পাইয়াছে। চার্ল্‌স্ পার্সিভাল ( Charles Percival ) নবীন যুবা হইলেও, ধীর-প্রকৃতি। পরন্তু, বংশমর্য্যাদা, বিদ্যা বুদ্ধি, বয়ঃসমুচিত বিনোদ-কান্তি, অমায়িক চরিত্র, অনিন্দ্য রূপ এবং বিনীত অথচ বীরোচিত ব্যবহারে, সকলেরই প্রীতিভাজন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আনির মুখে প্রায়শঃ কথা ফোটে না। সে তাহার প্রাণের কথা,—প্রেমের ইতিহাস, সমবয়স্কাদিগের কাছেও মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে না। কিন্তু রমণীর প্রেমার্দ্র হৃদয়, আপনার প্রাণ-নিহিত ভালবাসাটুকু, লজ্জার লুকোচুরিতে, যতই প্রাণের পটলে পটলে, ঢাকিয়া ঢুকিয়া, লুকাইয়া রাখিতে যত্ন পায়, উহা ততই বেসী ফুটিয়া বাহির হয়। বেচারা আনিরও ইদানীং সেই দশা। আনি যতই তাহার প্রাণের ভালবাসা গোপন করিতে চেষ্টা করে, ততই উহা সকলের কাছে বেসী ধরা পড়ে। যেখানে প্রাণ, প্রীতির নীরব-ভাষায়, প্রাণের সহিত সম্ভাষণ করে, সেখানে উহা ঢাকিয়া রাখা অসম্ভব। আনির, অত সতর্কতা, লজ্জা ও সঙ্কোচের অত সাবধানতা সত্বেও, তাহার ভালবাসার সকল কথা একদিকে বুঝিয়া লইয়াছিল চার্ল্‌স্, আর বুঝিয়াছিল জ্যেষ্ঠা সহোদরা, ভগিনীবৎসলা জেন্।

চার্ল্‌স্, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া, অমিয়-মধুরা আনিরে হৃদয়-মন্দিরের দেবতা স্বরূপ পূজা করিতে লাগিল; অথচ আনির চির-পরিচিত-সলজ্জ স্বভাবের সম্মানার্থ, বাহিরের ব্যবহারে বড় বেসী শিষ্ট-সঙ্কুচিত রহিল। স্নেহ-ময়ী জেন্ মনে মনে হাসিল ; এবং যে দিক্ দিয়া যতটুকু সম্ভব, ভগিনীর এই সুপাত্রে প্রণয়-সংস্থাপনে সহায়তা করিল।

চার্ল্‌স্ ও আনির লুক্কায়িত প্রেম ক্রমে অতি গভীর ভালবাসায় পরিণত হইল। কথাটা এখন আর বাহিরেও অপ্রকাশ থাকিল না। আনির পরিচিত সকলেই ইহা জানিতে পাইলেন। লজ্জার পুতুল আনি লজ্জায় আরও জড়সর এবং সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে এখন আর, কাহারও পানে, ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহে না। পৃথিবীর সকলেই যেন, কেবল তাহারই বিবাহের কথা লইয়া, কানাকানি ও আলোচনা করিতেছে, সে, এমনই একটা কল্পনা ও বিচিত্র লজ্জার যন্ত্রণায়, একবারে আপনাতে আপনি জড়ীভূত রহে।

কিছু কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর, চার্ল্‌স ও আনি, উভয়েই, জেনের সস্নেহ যত্নে সুদিনে, শুভসম্মিলনে মিলিত হইবার আশায়, একান্ত আশান্বিত হইল।

চার্‌লস্‌ রণ-ক্ষেত্রের ভীষণ-কোলাহলে, অহোরাত্র অন্যপ্রকার উদ্যমে ব্যাপৃত থাকিয়াও, আনিরে ক্ষণকালের তরে ভুলিতে পারিল না। আনির অকৃত্রিম ভালবাসা, আনির সেই মুগ্ধ-মনোহর সুন্দর মূর্ত্তিখানি, কল্পনার আকর্ষণে, সর্ব্বদা যেন কাছে কাছে রহিয়া, তাহার বীর-বাহুতে দ্বিগুণ শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিল। সে, উন্নতির পর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া, ইংরেজ সৈন্যদলে, একজন গণনীয় সেনা-নায়কের পদ ও সম্মান লাভ করিল। চার্‌লসের যোদ্ধৃ-বিক্রম ও গুণপণার যশোধ্বনি, লণ্ডনের পশ্চিম-পল্লীতে শতমুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আনিও ইহা শুনিল; এবং আপনার হৃদয়ের আনন্দ গোপন করিবার জন্য, জ্যেষ্ঠার কাছেও পাঁচ প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া, পুনঃপুনঃ লজ্জা পাইল।

কিন্তু রণ-ক্ষেত্রের অসম-সাহস, বীরত্বব্যঞ্জক হইলেও, বিপজ্জনক। আনির স্নেহকাতর কোমল প্রাণ, এই হেতু, প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে, অনিবার্য্য ভীতির সঞ্চারে, প্রতিনিয়তই ধুক্ ধুক্ করিয়া কাঁপিত। সে কাহাকেও কিছু বলিত না। নির্জ্জনে বসিয়া একাকিনী নানা কথা ভাবিত, আর দিবসে শতবার,—"দয়াময় আমার চার্‌লস্‌কে রক্ষা করিও" এই বলিয়া, নয়নজলে ভাসিয়া, প্রার্থনা করিত। আনি এক্ষণ, অধিকাংশ সময়ই, লোক-চক্ষুর অগোচরে থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু অবোধ সমাজের আবদারে ও স্নেহের অত্যাচারে সকল সময়ে, তাহা পারিয়া উঠে না।

লণ্ডনের পশ্চিম-পল্লীতে মিষ্টার সাটনের ( Mr. Sutton ) বাস-ভবন। সাটনের পত্নী জেন্‌ ও আনির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। আজি সাটনের আনন্দময় ভবনে বড় ঘটার সহিত নৈশভোজের আয়োজন।

ইউরোপে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে, ইংলণ্ডের বিজয়কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে। সমগ্র লণ্ডন উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত। ঘরে ঘরে উৎসব, ঘরে ঘরে আমোদ। অদ্য সাটনের বাড়ীতেও সেই বিজয়-উৎসবেরই অনুষ্ঠান। নগরের নায়কশ্রেণীস্থ প্রধান পুরুষেরা, আত্মীয়-অনুগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগের সহিত, আমন্ত্রিত হইয়াছেন। উৎসব-গৃহ সুসজ্জিত, এবং উজ্জ্বল আলোকমালায় প্রফুল্ল দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত। সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের প্রদীপ্ত-প্রতিভা, সুন্দরীদিগের প্রস্ফুট রূপ ও পরিচ্ছদের অনুপ-প্রভার সহিত মিশিয়া, সমস্ত গৃহ ঝল-মল করিতেছে। সকলেই হাস্য, কৌতুক, গল্প ও আমোদের হল-হলায় উৎফুল্ল।

আত্মীয়ের গৃহে উৎসব। জেন্‌ ও আনিও আদরে আমন্ত্রিত হইয়াছে। জেন্‌ আসিয়াছে মনের উৎসাহে; আনি আসিয়াছে—অনিচ্ছায়—যেন অতি বড় দায়ে ঠেকিয়া। আনি আসিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুতেই, আপনাকে আর সকলের ন্যায়, উৎসবের তরল তরঙ্গে ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হইতেছে না। সে গৃহের এক কোণে নীরবে ও সসঙ্কোচে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

আনির প্রাণ চাহিতেছে, পাঁচ জনের

দৃষ্টির অন্তরালে, অলক্ষিত অবস্থায় লুকাইয়া থাকিতে। কিন্তু লোকে তাহার প্রাণের কথা বুঝিতেছে না। তাহার স্বভাবনম্র রুচির মুখখানি যেমন সকলের চিত্ত ও চক্ষু আকর্ষণ করিল; তাহার কণ্ঠ-মাধুরীর স্বাদ-লালসাও, উৎসব-গৃহের বহু হৃদয়ে, অতিমাত্র ঔৎসুক্য জন্মাইল। পরন্তু, তাহার ভালবাসার কাহিনী এবং ভাবী বরের বীর-কীর্ত্তিও তাহার প্রতি প্রীতি ও কৌতুকের অজস্র ইঙ্গিত ও অঙ্গুলি-সংকেত ঘটাইল। আনি, এ অবস্থায়, ঘরের এক প্রান্তে, আপনার প্রাণটুকু আর প্রাণের শান্তিটুকু লইয়া, আপনাতে লুকাইয়া রহিতে পারিল না। সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সকলেই, পিয়ানো সহযোগে গান গাইবার নিমিত্ত, আনিরে বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিল।

আনি গান গাইতে একবারেই অনিচ্ছুক। সে, প্রথমতঃ এ, ও, তা, এবং নানা-প্রকার ছুতানতা দেখাইয়া, সঙ্গীতের দায় হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিল। পরে, শরীরে বড় অপটু, মনটা ভাল লাগিতেছে না, এই বলিয়া, মৃদু মৃদু হাসিয়া, সমানবয়স্কাদিগের কাছে, করযোড়ে, বহু কাকুতি মিনতি জানাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহারা আজি, কোন কথায় এবং কোন ছুতায়ই, নিরস্ত হইবার নহে।

অনেকে, ভঙ্গিক্রমে, আনি ও চার্লসের গুপ্তপ্রণয় ও ভাবি পরিণয়ের প্রসঙ্গ তুলিয়া, একটু বেসী শ্লেষ-পরিহাস করিল। আনি, কোথায় যাইয়া, কাহার বুকের ভিতর মাথা গুজিয়া, আপনার লজ্জা রক্ষা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। পরিহাস-প্রিয় আত্মীয়গণ, গীতিপুস্তকে বহু অনুসন্ধান করিয়া, আনির জন্য, একটি গীত মনোনীত করিলেন। ইংলণ্ডীয় গীতি-সাহিত্যের অনেক গীতই বীর-রস ও আদিরসের বিচিত্র মিশ্রণে বড় বেসী মধুর। নির্ব্বাচিত গীতটিও অক্ষরে অক্ষরে মধুমাখা। কিন্তু, সেই গীতের ভাবের সহিত আনির প্রণয়-কাহিনীর এতদূর সাদৃশ্য যে, আনির মত লাজুক মেয়ের পক্ষে, অত লোকের সম্মুখে, উহা গান করা যার-পর-নাই দুরূহ ব্যাপার।

আনি কিছুতেই ঐ বাছা গীত গাইবে না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাহারা আনির সমানবয়স্কা সুন্দরী,—আনিতে কতকটা অনুরাগিণী, তাহারাও কিছুতেই উহা না গাওয়াইয়া ছাড়িবে না। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পরে, আনির প্রিয়সখীরা তাহাকে পিয়ানোর কাছে এক প্রকার টানিয়া লইয়া গেল। আনি, লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া, প্রকৃতই নিতান্ত অনিচ্ছায়, পিয়ানো লইয়া বসিল,—এবং পিয়ানোতে অনিচ্ছায় হস্তার্পণ করিয়া আবার একটু একটু হাসিল। কিন্তু তাহার প্রতিভা-নিপুণ কর-স্পর্শে, পিয়ানো যখন মধুরে-গম্ভীরে বাজিয়া উঠিল, যখন পিয়ানোর তান-লয়-শুদ্ধ তরল ধ্বনি, শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে সঙ্গে, আনির প্রাণেও যাইয়া স্পৃষ্ট হইল, তখন আর তাহার সে জড়-সড় যন্ত্রণা বেসী রহিল না। তাহার মনের সেই আধো বিষাদের ভাবটিও, পিয়া-

নোর প্রাণঢালা প্রমদ-নাদ-স্রোতে ক্ষণেকের তরে কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। আনি, শ্রোতৃবর্গে আদেশ অনুসারে (Allen water) এলান–পুলিনের প্রেম-সংগীত-নামক বাছা * গীতটিতেই তান ধরিল। সে পিয়ানো যোগে গাইল।—

"অধরে অমিয় ক্ষরে তার—
কথায় সে ভুলা'য়েছে মন,
নবীন সৈনিক সে গো নয়ন-মোহন।"

আনির কণ্ঠ হইতে এই গীত নিঃসৃত হওয়া মাত্র, সমস্ত গৃহ, চিত্রার্পিতের মত, নীরব ও নিস্পন্দ হইল। শ্রোতৃবর্গের কর্ণে অমৃতধারা বহিল। মুহূর্ত্তের তরে, সকলেরই প্রাণ ও মন সেই স্বর-প্রবাহে ডুবিয়া গেল। ভাব-বিভোরা আনি আবার গাইতে লাগিল।—

"তারি মনোনীতা প্রেম-পুলকিতা
এলান-পুলিনে বালা,
তারি পানে চেয়ে, আপনা ভুলিয়ে,
গাঁথিছে প্রেমের মালা।
রমণী কে প্রমোদিনী আছে গো এমন?*"—

ইত্যাদি।—গাইতে গাইতে হঠাৎ গীত থামিয়া গেল। সে অমিয়-কণ্ঠলহরী, না জানি কি ঐন্দ্রজালিক মোহে, গীতের শেষ পদের শেষার্দ্ধ পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই, সহসা একবারে নীরব হইল। আনির অঙ্গুলি ক'টি, পিয়ানোর চাবির উপরে যেমন ছিল, তেমনই রহিল বটে; কিন্তু একটুকুও নড়িল না, সুতরাং পিয়ানোও আর বাজিল না। পিয়ানোর উত্থিত স্বরটুকু, ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া, বায়ুপথে একবারে মিশিয়া গেল।

অকস্মাৎ এ কি হইল!—সকলেই উৎসুক-নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন,—আনি, বিস্ফারিত নেত্রে, সম্মুখের দিকে, শূন্য আকাশের পানে, একদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে। নয়নে পলক নাই। কপোলে সে প্রফুল্ল কমলের কান্তি নাই। মুখ-শ্রীতে আর সে লজ্জার মাধুরী নাই। সেখানে অত লোক উপস্থিত, এ জ্ঞানটি পর্য্যন্তও বিলুপ্ত। মারবেল পাথরের একটা নির্জ্জীব মূর্ত্তি যেন পিয়ানোর সম্মুখে স্থাপিত রহিয়াছে! এ যে কি হইল, কেহই তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী জেন্ তাড়াতাড়ি আনির কাছে আসিল। আনির কাঁধে হাত দিয়া মৃদুভাবে তাহাকে ঝাকাইল। আনির সেই আকস্মিক-মোহ কিছুতেই ভাঙ্গিল না। জেন্ ইহার পর আনিকে ডাকিল ও কহিল,—"আনি হঠাৎ তোর কি হইয়াছে বোন, তুই এমন করিয়া রইলি কেন?"

আনি জেনের কথা শুনিল না, অথবা বুঝিল না। ফিরিয়াও চাহিল না। চক্ষু দুটি আকাশের সেই শূন্য শরীরে, তেমনি নিবদ্ধ রহিল। মুখে একটি কথাও ফুটিল না।

সকলে পরে জানিল, আনি তখন এক খানি ছায়াময় মূর্ত্তি দেখিতেছিল। আনি দেখিতে ছিল,—"সম্মুখে, অদূরে, রণ-সজ্জায় সজ্জিত তাহার প্রাণাধিক চার্‌ল্‌স্ দণ্ডায়মান। পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন ও রুধিরাক্ত। বক্ষঃস্থলে,—ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপরে, একটা

* এলান একটি ক্ষুদ্র নদী। ঐ নদীর নামে গীতের নাম এলান-পুলিনের প্রেম সংগীত। গীতটির ভাবাত্মক পদ্যানুবাদ গ্রহ হইল।

ভয়ানক ক্ষত। উহা হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। মুখ খানি বিষাদে মলিন। নয়নে অশ্রুধারা। মূর্ত্তি, বড়ই কাতর দৃষ্টিতে, আনির মুখের পানে, স্থির-নয়নে, চাহিয়া রহিয়াছে।"

অন্যে যে স্থানটি শূন্য দেখিতেছিল, আনি সেই স্থানেই এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া আড়ষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই ভীষণ দৃশ্য হইতে আনির চক্ষু কিছুক্ষণ আর ফিরিল না। আনি খানিক পরেই অতি করুণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে আর্ত্তরবে সকলেই যার-পর-নাই আকুলিত ও অন্তরে একান্ত আহতবৎ হইলেন।

জেন্ আবার কম্পিত দেহে আনির নিকটস্থ হইয়া কম্পিত স্বরে কহিল,—"আনি, আজি অকস্মাৎ তোর এ কি হইল বোন আমার?" জেন্ বহু চেষ্টা করিল, কিছুতেই আনির সংজ্ঞা জন্মাইতে পারিল না। আনির বিস্ফারিত চক্ষু আরও বিস্ফারিত হইল। কিন্তু উহা, চিত্র-নিবদ্ধ প্রস্ফুট পুষ্পের ন্যায়, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানেই লাগিয়া রহিল।

এ যে কি বিচিত্র ব্যাপার, কেহই তাহা প্রথম স্থির করিতে পারিল না। কেহ মনে করিল, আনির হঠাৎ উৎকট পীড়ার আক্রমণ হইয়াছে; কেহ বুঝিল, মনের আবেগে অকস্মাৎ মূর্চ্ছা ঘটিয়াছে। সকলে, আনির চারি দিকে দাঁড়াইয়া, এইরূপ চিন্তা ও জল্পনা করিতেছে, এমন সময়ে, ঐরূপ আড়ষ্ট ও অচেতন অবস্থায়ই, আনির ঠোঁট দুখানি ঈষৎ একটু নড়িয়া উঠিল। উহাতে অর্দ্ধস্ফুট মৃদু কথাও ফুটিল। যাঁহারা অত্যন্ত সন্নিহিত ছিল, তাহারা শুনিতে পাইল,—আনি বলিতেছে—"ঐ ত—ঐ ত—সে!—উহু হু! কি ভয়ঙ্কর—কি ভয়ঙ্কর গো!—কি সাংঘাতিক আঘাত গো!—ঠিক বুকের উপরে—আহা! আহা! ম'রে যাই, ম'রে যাই"—

এই রূপ বলিতে বলিতে বালিকা, বাণবিদ্ধা কপোতীর ন্যায়, কম্পিত-কলেবরে, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া, ভীতিবিহ্বলা ভগিনীর বাহুমূলে ঢলিয়া পড়িল। উৎসব-গৃহে এইক্ষণ বিষম হুলুস্থূলু। কোথায় সে উৎসব-তরঙ্গ, কোথায় সে আনন্দ-উচ্ছ্বাস? বালিকার মুখের ঐ মর্ম্মবিদারি কাতর-উক্তি আর ঐ আর্ত্তনাদ শুনিয়া, এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া, সেখানে আর কেহই স্থির থাকিতে পারিল না। সকলেই ভীত, বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়।

মুহূর্ত্তের মধ্যেই উৎসব গৃহের জনতা সরিয়া পড়িল। নিমন্ত্রিতদিগের অধিকাংশ, শিষ্টতা ও শান্তির অনুরোধে, শকট বা অন্য কোনরূপ যান-আরোহণে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ডাক্তারের জন্য দ্রুত লোক প্রেরিত হইল। আনির কএকটি আত্মীয় এবং পরিচর্য্যারত কতিপয় ব্যক্তি মাত্র সেই স্থানে রহিল। তাহারা, অতিসাবধানে, ধরাধরি করিয়া, আনিরে বৈঠকখানা হইতে দোতালার উপরে, শয়ন-কক্ষে লইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আনি তখন শয্যাশায়িনী। মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতেছে। ডাক্তার যখন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন, আনি তখন

একবারে সংজ্ঞাশূন্য। পূর্ব্বকথিত ঐ বিচিত্র উক্তির পরে, সে আর একটি কথাও কহে নাই। সমস্ত শরীর বরফের মত শীতল। ডাক্তার রোগী দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে,—কোন অজ্ঞাত কারণে, বালিকার কোমল-প্রাণে, সহসা কঠোর আঘাত লাগিয়াছে। তাহাতেই হঠাৎ সর্ব্বাঙ্গ পক্ষাঘাত-গ্রস্তবৎ হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার উগ্রবীর্য্য উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। ঔষধের শক্তিতে, কিছুক্ষণ পরে, আনির শরীরে একপ্রকার চেতনা-সঞ্চার হইল। কিন্তু তখনকার সেই সচেতন অবস্থায়, বালিকার দুঃসহ যাতনা দেখিয়া, ডাক্তার ভাবিলেন,—এ চেতনা অপেক্ষা ইহার পক্ষে ঐ মোহজন্য-বিস্মৃতিই শতগুণে ভাল ছিল।

আনি ক্রমে চক্ষু মেলিল। চক্ষু মেলিয়া চাহিল। কিন্তু সে দৃষ্টির কোন অর্থ নাই। যাঁহারা শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, আনি কিছুকাল শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকেই দেখিল। মুখে রক্তের চিহ্নও নাই, যেন ভস্ম মাখিয়া দিয়াছে। অবিরাম-বাহি শীতল ঘর্ম্মে ললাট সিক্ত ও শ্লথ। শরীরে বিন্দুমাত্র স্পন্দন নাই। কেবল বুকখানি, সুদীর্ঘ গভীর-নিশ্বাসে, থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

আনি আপনা আপনি বলিতে লাগিল—"হা দুর্ভাগিনী, তুই এখনও এ পোড়া দেহে আছিস্?—তোমরা এ হতভাগিনীকে যাইতে দিলে না কেন?—সে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইতে আসিয়াছিল।—আহা! কতই না কাতর-কণ্ঠে আমাকে ডাকিতেছিল।—আমিও ত যাইতেছিলাম,—তোমরা যাইতে দিলে না কেন?—কিন্তু—আমি—নিশ্চয়ই যাইব।—হাঁ—অবশ্য যাইব।"

স্নেহশীলা ভগিনী জেন্ বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল,—"আনি—প্রাণাধিকা—বোন, ছি! অমন কথা তুই মুখে আনিস্ না। চার্‌ল্‌স্ দেশান্তরে গিয়াছে। শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।—নিশ্চয়ই কুশলে ফিরিয়া আসিবে।"—

আনি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—"না—না—না, না দিদী,—আর না—আর না,—আর সে ফিরিয়া আসিবে না।—কখনও না—কখনও না—আমি যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তুমিত, দিদী তাহা দেখ নাই—উহু কি ভয়ঙ্কর—কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য গো।"—

ডাক্তার, জেন্ ও আনির পিতৃবন্ধু। তিনি, স্নেহভরে, আনির কম্পিত হাতখানি আপনার হাতের মুষ্টিতে ধরিয়া, স্নেহশীতল মধুর ভাষায় বলিলেন,—"বাছা আনি, তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ। তুমি যাহা বলিতেছ, ইহা নিশ্চয়ই উন্মাদের প্রলাপ। একটু স্থির হও। এমন অলীক কল্পনাকে মনে ঠাঁই দিও না। মিছামিছি দুর্ভাবনায় অধীর হইও না। তুমি অকারণ তোমার বন্ধুবান্ধব সকলকেই আতঙ্কে একবারে আকুল করিয়া তুলিতেছ। আবারও বলি, আনি, মনটা একটু স্থির কর বাছা। একটু শান্ত হও।"

বালিকা চকিতের ন্যায় ডাক্তারের দিকে চক্ষু ফিরাইল, এবং কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিতে লাগিল,

—"আপনি কি বলিতেছেন !—এ স্বপ্ন !—না না ইহা স্বপ্নের প্রলাপ নহে—আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা প্রকৃত সত্য।—আমার চার্‌ল্‌স্ নেই!—আমি জানি-স্পষ্ট—প্রত্যক্ষ, তাহাকে দেখিয়াছি।—বন্দুকের গুলি বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছে—রক্তে বুক ভাসিয়া যাইতেছে—উ-হু-হু—কি ভয়ানক!"—বলিতে বলিতে উপর্য্যুপরি তিন চারিটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল;—হাত পা খিঁচিয়া ধরিল। আনি আবার পূর্ব্ববৎ মোহাচ্ছন্ন ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। প্রেমময়ী সতী, বালিকা হইলেও, এই ক্ষণ শোকে মাতৃকল্পা, এবং সকল বিষয়েই বর্ষীয়সীর মত। তাই উহার স্বাভাবিক লজ্জা শোকের আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইয়াছে।

জেন্ ও আনির আত্মীয়া,—বাটীর গৃহস্বামিনী,—মিষ্টার সাটনের পত্নী এত ক্ষণ আনির শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। এ দৃশ্য আর তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি অর্দ্ধচেতন-অবস্থায় স্বামিকর্ত্তৃক স্থানান্তরে নীত হইলেন। জেনের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সে তাহার প্রাণের আনিকে ফেলিয়া, তিলেকের তরেও, অন্যত্র যাইতে সম্মত হইল না।

ডাক্তার আবার বহু আয়াসে ও যত্নে আনির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কিন্তু, অবস্থাদর্শনে, তাঁহার মনে বড় শঙ্কা হইল। বলিলেন,—অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিলে, সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি আসিবেন। সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। অন্যথা, পর দিন প্রাতে আসিয়া, আনিকে দেখিবেন। ডাক্তার, জেন্‌কে এই বলিয়া আশ্বাস দিয়া, চলিয়া গেলেন।

পর দিন, বেলা ৯টার সময়, ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন,—আনি প্রায় একই অবস্থায় আছে। কিন্তু, পূর্ব্বদিন অপেক্ষা, একটু বেসী দুর্ব্বল, এবং অধিকাংশ সময়ই মোহাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে মুখ নড়িতেছে, এবং কেকাইয়া কেকাইয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া, আপনার মনে আপনি কি কহিতেছে। ডাক্তার বিশেষ মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া রহিলেন। শুনিলেন,—আনি কহিতেছে,—"হাঁ—শীঘ্রই—চার্‌ল্‌স্—শীঘ্রই—হাঁ—কালই।" ইত্যাদি।

আনি কাহারও কোন কথায় কান দিতেছে না। কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, কে কোথায় কি করিতেছে, সে কিছুরই খবর লইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলেও, উত্তর দিতেছে না। ডাক্তার আরও দুই একজন পরিপক্ক চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক মনে করিলেন অপরাহ্ণে, ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে, অন্য দুইটি প্রসিদ্ধ চিকিৎসককে ডাকা হইল। তিন জনে মিলিয়া, খুব ভাল করিয়া, রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও শরীর-যন্ত্রাদির পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার পর, তাঁহারা তিন জনে একবাক্যে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রোগীর জীবনী শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। যদি কোন অলৌকিক ঘটনায় অব-

স্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে, আর বেসী সময়, জীবনের আশা নাই।

অপরিচিত ডাক্তার দুটি চলিয়া গেলে, আনির পারিবারিক ডাক্তার পুনরায় আসিয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন; এবং ভাল করিয়া আনিকে দেখিতে লাগিলেন।—দেখিলেন মুখখানি বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট, কিন্তু তথাপি বড়ই মধুর। মাঝে মাঝে, সেই মাধুরীর গায়ে গভীর বিষাদের ছায়াপাত হইতেছে। আবার ক্ষণে ক্ষণে, উহাতে ভগ্ন-হৃদয়ের ঘোরতর নৈরাশ্যের ভাব ফুটিয়া পড়িতেছে। ডাক্তার দেখিলেন, আর রুমাল দিয়া আপনার অশ্রুজল মুছিতে লাগিলেন। তিনি যখন এইরূপে আনির পার্শ্বে উপবিষ্ট, তখন শুনিতে পাইলেন,—আনি আপনা আপনি মৃদু মৃদু কহিতেছে,—"গিয়াছে—সে চলিয়া গিয়াছে—গিয়াছে—জয়মালা গলে পরিয়া। আহা! কি গৌরবের সহিত গিয়াছে।—আর আমি—আমিও যাইতেছি- ঐ রণজয়ী নবীন সেনাপতিকে দেখিতে যাইতেছি—যাইব—অবশ্যই যাইব। আমি কাছে গেলে—সে না জানি—আমাকে কতই ভাল বাসিবে।—আহা মনে পড়ে—সব মনে পড়ে।"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে আবার বলিল,—"মনে পড়ে,—এলান-পুলিনের সেই গীত মনে পড়ে। নির্দ্দয় আমোদিনীরা, জেদ করিয়া, আমাদ্বারা গীত গাওয়াইয়া ছিল।—আমি গাইতেছিলাম,—আর আমার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।" কহিতে কহিতে যুবতীর নির্জ্জীব দেহ সহসা শিহরিল! আবার বলিল—"মনে আছে,—অক্ষরে অক্ষরে সে দুঃখের গান আমার মনে পড়িতেছে। এই ত সেই এলান-পুলিনের শোকসঙ্গীত।"—

অধরে অমিয় ক্ষরে তার,<br>
কথায় সে ভুলা'য়েছে মন,<br>
নবীন সৈনিক সে গো নয়ন-মোহন।<br>
তারি মনোনীতা প্রেম-পুলকিতা<br>
'এলান'—পুলিনে বালা।<br>
তারি পানে চেয়ে আপনা ভুলিয়ে,<br>
গাঁথিছে প্রেমের মালা।<br>
রমণী কে প্রমোদিনী আছে গো এমন!<br>
মধুর বসন্ত, না হইতে অন্ত,<br>
দারুণ নিদাঘ-জ্বালা—<br>
ক'য়ে গেল সখা,—কথা মন-রাখা!<br>
খে'লে গেল মিছা খেলা!<br>
এত কিগো অবিশ্বাসী সে হৃদিরঞ্জন॥"

ও—না—না—না—কখনও না, কখনও না—অসম্ভব।—আমার চার্‌ল্‌স্‌ কখনও অমন হইতে পারে না।—আহা! আহা—আমার চার্‌ল্‌স্‌,—আমার প্রাণাধিক, তুমি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইয়াছ!—নিহত হইয়াও আমায় পাসরিতে পার নাই। তুমি ত কখনও অবিশ্বাসী নও?"

ইহার পরে, সে রাত্রিতে, আনির মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাহাকে সহানুভূতির ভাবে অনেক উপদেশ দেওয়া হইল,—স্নেহ ও অনুরোধের ভাষায় অনেক কথা বলা হইল; কিছুই আর তাহার কানে ঠাঁই পাইল না। মাঝে মাঝে, অতি ক্ষীণ স্বরে,

তাহার মুখে এই ক'টি কথা উচ্চারিত হইল, —"অনেক হইয়াছে,—আর না— দাও দাও, —তোমরা আমাকে আমার প্রাণাধিকের কাছে একটু শান্তিতে চলিয়া যাইতে দাও।"

পরবর্ত্তি দুটি দিনে নিবু নিবু দীপ আরও নিবু নিবু হইয়া আসিল। এই দুদিনের মধ্যে, কেবল একবার আনি, পিয়ানো বাজাইবার ভঙ্গিতে, হাত দুখানিতে, একটু একটু তাল রাখিয়া, সহসা চমকিয়া উঠিয়াছিল; —এবং "ঐ ত—ঐ," এই দুই তিনটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে, কোনরূপ জীবন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

চতুর্থ দিন, প্রাতঃকালে, ইউরোপের রণস্থল হইতে, আনির গৃহে একখানি চিঠি আসিয়া পঁহুছিল। চার্ল্‌স্‌ যে সৈন্যদলের অন্যতর কাপ্তান, চিঠিখানি সেই দলের কর্ণেলের স্বাক্ষরিত; এবং শোক-সূচক কাল-রেখায় অঙ্কিত। চিঠির মর্ম্ম এই যে, সে দিন শেষ যুদ্ধের অবসান সময়ে, চার্‌ল্‌স্‌ পার্সিভাল, একদল অশ্বারোহী সৈন্যের নায়ক-রূপে, বিপুল বিক্রমে, বিপক্ষ সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে ছিল। হঠাৎ বিপক্ষের এক অশ্বারোহী, চার্‌ল্‌স্‌কে লক্ষ্য করিয়া, পিস্তল ছুড়িয়াছিল। পিস্তলের গুলিতে চার্‌ল্‌সের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চার্‌ল্‌স্‌ অমনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

চিঠিখানি পাঠ করিয়া, আনির আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা, সকলেই যার-পর-নাই বিস্মিত ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। আনি যাহা দেখিয়াছে,—আনি যে দৃশ্যের কাহিনী অমন কাতর আর্ত্তনাদের সহিত বর্ণনা করিয়াছে, তাহা তবে সম্পূর্ণ রূপে সত্য! যে শুনিল, সেই অবাক্‌ হইল;—সেই প্রস্তরবৎ জড়ীভূত হইয়া রহিল। এ যে কি অলৌকিক কাণ্ড তাহা তখন কেহই বুদ্ধিস্থ করিতে সমর্থ হইল না।

কিছুকাল তর্ক-বিতর্কের পরে, আত্মীয় স্বজনেরা, এই মর্ম্মবিদারি শোকসংবাদ, মুমুর্ষু আনিকে জানানই কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। এ দুষ্কর কর্ম্মের ভারও ডাক্তারের হাতেই অর্পিত হইল। ডাক্তার, কর্ণেলের সাংঘাতিক চিঠিখানি লইয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে, আনির শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

আজি আনির মর্ত্ত্যজীবনে মহা-পরিবর্ত্ত। ডাক্তার আনির নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, মুখের আকৃতি, এবং হস্ত-পদাদির শৈত্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন। শয্যাশায়িনী হওয়া অবধি, এক বিন্দু জলও যে আনির উদরস্থ হয় নাই, এ কথাও চিন্তা করিলেন। ডাক্তার সমস্ত অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিলেন,—আর বড় বেসী বিলম্ব নাই। কিন্তু তিনি কিরূপে এই অর্দ্ধ-চেতন মুমুর্ষুকে অমন দারুণ কথা শুনাইবেন? ভাবিয়া কোন পথ পাইলেন না। অনেক ক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল।

ডাক্তার এই ভাবে বসিয়া আছেন, এমন অবস্থায়, কি কারণে বলা যায় না, একবার আনির নির্ব্বাণ-প্রায় নয়নতারা ডাক্তারের মুখমণ্ডলে স্থাপিত হইল। ডাক্তার অমনি

চিঠিখানি হাতে তুলিয়া লইয়া আনিকে দেখাইলেন। চিঠি চার্লসের সীলে মুদ্রিত। কিছুকাল পরে, চিঠির সেই চিরপরিচিত সীলের দিকে আনির দৃষ্টি পড়িল। দৃষ্টি-মাত্র আনির শরীর ও মনের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইল। আনি অমনি কথা বলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না।

কেন আমি এই নিষ্ঠুর কর্ম্মের ভার লইলাম, এই বলিয়া, ডাক্তার, মনে মনে আপনাকে শতবার ধিক্কার দিলেন। ইহার পরে, তিনি চিঠিখানি খুলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে আনির মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন, এবং অতি-ধীরে,যত-দূর-সম্ভব স্নেহশীতল সুমধুর সান্ত্বনা বাক্যে, কহিতে লাগিলেন,—"বাছা, তুমি ভীত বা শঙ্কিত হইও না। ভীত বা শঙ্কিত হইলে, আমি তোমাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা বলিতে পারিব না।"

আনির সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। যেন বিলুপ্ত চেতনা আবার ফিরিয়া আসিল ঠোঁট দুখানি নড়িল। আবিল চক্ষে আকুলতার ভাব ফুটিয়া পড়িল। বালিকা শুষ্ক ঠোঁট আর্দ্র করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইল।

ডাক্তার কহিলেন,—"এই চিঠিখানি ইউরোপের রণ-স্থল হইতে আসিয়াছে। ইহা কর্ণেলের স্বাক্ষরিত। ইহাতে সংবাদ আসিয়াছে যে,"—এইটুকু বলিতেই ডাক্তারের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। তিনি থত মত খাইয়া থামিয়া গেলেন। কিন্তু আনি নিজেই বাক্যাংশের পরিপূরণ করিল। আনি বলিয়া উঠিল,—"আর কি সংবাদ ডাক্তার মহাশয়, —সংবাদ আসিয়াছে আমার চার্‌ল্‌স্‌ নেই। আমি ইহা জানি, আমি ত পূর্ব্বেই ইহা আপনাকে বলিয়াছি।"

আনির কণ্ঠ স্বাভাবিক ও সতেজ। ডাক্তার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন,—তবে কি এই সংবাদ ইহার লুপ্তপ্রায় মনঃশক্তিকে পুনরুদ্বোধিত করিল! —ইহা কি তবে বিপন্না আনির স্বাস্থ্য লাভের পক্ষে অনুকূল হইল ?

আনি,—সমগ্র পত্রখানি পড়িয়া শুনাইবার নিমিত্ত ডাক্তারকে ক্ষীণকণ্ঠে অনুরোধ করিল। ডাক্তার পত্র পাঠ করিলেন। আনি চক্ষু বুজিয়া আগা গোড়া সমস্ত শুনিল। একটি কথাও কহিল না। পত্র-পাঠের পরে, ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"বাছা, তুমি যে এমন প্রশান্তভাবে, এতদুর দৃঢ়তার সহিত, এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে সমর্থ হইলে, তজ্জন্য জগদীশ্বরকে শত ধন্যবাদ প্রদান করি।"

আনি, বড় কষ্টে, ধীরে ধীরে কহিল— "আপনি চিকিৎসক; আমার বাবার বন্ধু আপনি কি এমন কোন ঔষধ জানেন, যাহা খাইলে, চক্ষে জল ঝরে,—কণ্ঠে কান্নার স্বর ফোটে। যদি এমন কোন ঔষধ থাকে, আমায় দয়া করিয়া তাহা দিন্। আমার বুকে পর্ব্বতের চাপ,—শ্বাস রোধ হইয়া আসিল যে। আমি কিসে একটু কাঁদিতে পারি, আপনি তারই উপায় করুন,—কান্নার ঔষধ

থাকেত, একটু দিন"—আনি, থাকিয়া থাকিয়া, ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর কণ্ঠে, কএক বার এইরূপ কাকুতি করিল।

ডাক্তার আনির হাত দুখানি ধরিয়া অতি স্নেহের সহিত কহিলেন,—"আনি, তোমাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি একটু শান্ত হও,—একটু স্থির হইয়া থাক; দেখিবে, এখনই সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হইবে।"

আনি পুনরপি কহিল—"হাঁ তা সত্য।—হায়! একবার যদি আমার চক্ষে একটু জল আসিত—একটু যদি কাঁদিতে পারিতাম।" ইহার পরে আরও যেন কি একটু কহিল, কিন্তু কথা স্পষ্ট হইল না। ডাক্তার তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া রহিলেন। তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন,—আর কে যেন, আনির বুকের ভিতর হইতে, আর এক প্রকার কণ্ঠস্বরে কহিতেছে,—"চুপ কর, জেন্‌কে ডাক।" এ কণ্ঠস্বর কার? তবে কি চার্লস্‌ই, তদ্গতপ্রাণা আনির দেহে আবিষ্ট হইয়া, উহারে লইয়া যাইতেছে? ইহার পরে আনির কণ্ঠে একটু গর-গর শব্দ হইল। ডাক্তার অবস্থা বুঝিয়া, সকলকে ডাকিয়া আনিবার নিমিত্ত, ইঙ্গিত করিলেন।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী জেন্ সকলের আগে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে জেনের চক্ষু দুটি ফুলিয়া গিয়াছে। কান্না রোধের চেষ্টায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে।—"আনি—বোন—প্রাণাধিকা দিদীমণি আমার"ইহা বলিতে বলিতে জেন্ ছুটিয়া গিয়া, আনির গলা ধরিয়া, ফুকুরিয়া কাঁদিতে লাগিল; এবং আবেগভরে আনির ললাটে, গণ্ডে ও মুখে বারংবার চুম্বন করিল। বলিল,—"আনি, তুমি কি এখন আর আমাকেও চিনিতে পারিতেছ না, বোন? হায়রে আমি যদি না কাঁদিয়া পারিতাম।"

অন্য সকলে আনির শয্যা ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সকলের চক্ষেই জল, সকলের প্রাণেই শোকের উচ্ছ্বাস। ডাক্তার শিরা ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শিরায় স্পন্দন নাই। ডাক্তার ভাবিলেন,—ইহা তাঁহারই ভ্রম। তিনি নিজের আকুলতা-হেতুই সম্ভবতঃ শিরায় গতি টের পাইতেছেন না।

জেন্ আবার বলিল—"আনি—অভাগিনী জেনের জীবন-সর্ব্বস্ব—প্রাণাধিকা দিদী আমার—একটি কথা কও বোন, একবার চোখ মেলিয়া চাও। তোমার চির-দুঃখিনী ভগিনী কাকুতি করিয়া বলিতেছে, একবার চোখ মেল, একটি কথা কও।"

জেন্ আবার আনির অধর চুম্বন করিয়া চমকিয়া উঠিল "হা ভগবান্ আমার আনি ত আর নেই"—।এই বলিয়া,কাঁপিতে কাঁপিতে, জেন্ মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ডাক্তার দেখিলেন কথা ঠিক। আনি ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। চার্লসের বক্ষোবিদারি গুলি অলক্ষিত-শক্তিতে এই মুগ্ধস্বভাবা, প্রেমময়জীবিতা, মধুরমূর্ত্তি বালিকার কোমল প্রাণও ভেদ করিয়া গিয়াছে! এমন সাংঘাতিক আঘাতের ঔষধ ডাক্তার কোথায় পাইবেন? এইরূপে, আশামুগ্ধা দুঃখিনী আনির প্রেমজীবনের শেষ

পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইল। আনি, উৎসব-গৃহে—আমোদ-উৎসবের উচ্ছ্বাসের মধ্যে, প্রত্যক্ষ যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যে পর-লোক-গত চার্‌লস্ পার্‌সিভালেরই ছায়া-মূর্ত্তি, এই বিশ্বাস, সকলেরই মনে, চিরকালের তরে, দৃঢ়-মুদ্রিত হইয়া রহিল।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন

১। "মাতৃমঙ্গল। শ্রীপ্রেমানন্দ বিরচিত।" যিনি হেলেনা কাব্য রচনা করিয়া কবিসমাজে আদরের আসন পাইয়াছেন, তিনিই মাতৃমঙ্গল রচনা দ্বারা ভক্ত সমাজেও শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন; এবং প্রেমিক ভক্ত বলিয়া প্রেমানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার লেখনীর মুখে, এই গ্রন্থে, প্রেম-ভক্তির নানারূপ সুরভি ও সুন্দর পুষ্প অজস্র ঝরিয়াছে; এবং তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থখানি হারাইয়াছি। তাই, গ্রন্থের দুই একটি গীত এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। কিন্তু স্মৃতির উপর যত দূর নির্ভর করা যায়, তাহাতে বলিতে পারি যে, আমরা গ্রন্থপাঠ-সময়ে, স্থানে স্থানে, প্রকৃতই ভক্তির অমৃত-স্পর্শে, আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়াছি; এবং গ্রন্থকার, ভাবুক-তত্ত্বদর্শীর ন্যায়, জাতীয়-হৃদয়ের পুরাতন ভাবভক্তির প্রবাহকে নূতন খাতে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। যাঁহারা এই নিখিল-জগতের আদি-কারণরূপিণী অনাদ্যা শক্তিরে মা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা প্রেমানন্দের মাতৃমঙ্গল পাঠ করিলে প্রাণে অতি পবিত্র প্রীতিশীতল 'আনন্দ' লাভ করিবেন।

২। "সংকীর্ত্তন। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাস-প্রণীত।" এখানিও গীতি-পুস্তক এবং গুণ-গৌরবে আদর-যোগ্য। ইহার অন্তর্নিবিষ্ট গীতগুলি, নাম-সংকীর্ত্তন, প্রেম-ভক্তি, ব্রজ-লীলা ও শ্যামাসংকীর্ত্তন এই চারি নামে, চারিটি পৃথক্ পৃথক্ তরঙ্গ অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থকার, আমাদিগের বিবেচনায়, নাম-সংকীর্ত্তনে যে প্রকার কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, প্রেম-ভক্তি ও ব্রজলীলা প্রভৃতি তরঙ্গে ঠিক সেই প্রকার কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। যেমন শ্রীরাগের ভাঁজ এড়াইয়া বাগেশ্রীর আলাপ করা কঠিন; সেইরূপ ভোগ-লালসার ভাঁজ এড়াইয়া, বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির অবতারণা অতি দুষ্কর। অপিচ, শ্যামা-সংগীতের মাতৃধ্যানে, রাম-প্রসাদের অনুকরণে, এক দিকে মর্ম্ম-স্পর্শি নির্ভরের ভাব, আর এক দিকে শিশুসমুচিত তুই-তুকারের ভাষা, এই দুইয়ের সামঞ্জস্যও সহজ কথা নহে। কিন্তু, এই গ্রন্থের অধি-কাংশ গীতেই শব্দের সুখ-শ্রুত লালিত্য ও ললিত কবিত্বের পরিচয় আছে; এবং কোন কোন গীতে প্রকৃত ভক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ড।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০। ২য় [ সংখ্যা।

# বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

( পুনঃপ্রচারিত। )

বৈশাখ হইতে চৈত্রে বর্ষ-গণনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।



গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিন্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা।

## বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয়

## নিয়মাবলী।

### অগ্রিম।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩৲ | ।৴০ | ৩।৴০ |
| ষাণ্মাসিক | ২৲ | ৶০ | ২৶০ |

### পশ্চাদ্দেয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৪৲ | ।৴০ | ৪।৴০ |
| ষাণ্মাসিক | ২॥০ | ৶০ | ৩॥৶০ |

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারী সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইলে কার্য্যাদি সম্পর্কে আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হইবে না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা হয়, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৵০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

৪। লেখকদিগের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা বান্ধবে প্রকাশার্থ প্রবন্ধাদি যাহা প্রেরণ করেন, তাহা যেন প্রত্যেক ফর্দ্দের দুই পৃষ্ঠায় না লিখিয়া, দয়া করিয়া, এক পৃষ্ঠার পরে এক পৃষ্ঠা শাদা রাখিয়া লিখেন। ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কাহারও প্রবন্ধ কিংবা কবিতা বান্ধবে প্রকাশিত না হইলে, আমরা কাপি ফেরত পাঠাইতে পারিব না।

ঢাকা [illegible]
বান্ধব-কুটীর।
১২১০ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীহরকুমার বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

# অগ্নি আর অঙ্গার

"অগ্নিমীলে পুরোহিতম্"

ঐ যে প্রজ্বলিত অগ্নি পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে,
উহাকে আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

অগ্নি আর অঙ্গার, আকৃতি ও প্রকৃতিতে, অথবা রূপে ও গুণে, পরস্পর অতি প্রতিকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, উভয়ে বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কেন না, যাহা আগে ইন্ধন অথবা উপজীব্য স্বরূপ আদৃত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে,—যাহা ইন্ধনের স্বভাবে, অন্তরে বাহিরে অগ্নিময় হইয়া, পুড়িয়া ভস্ম হয়, তাদৃশ কোন সামান্য বস্তুর অঙ্গাশ্রয় না পাইলে, অগ্নি সাধারণতঃ প্রজ্বলিত হয় না। অপিতু, অগ্নি যখন নিবিয়া যায়, এবং ইন্ধন যখন অঙ্গার হইয়া সর্ব্বপ্রকারে অগ্নির সম্পর্কশূন্য হয়, মনুষ্য তখন উহাকে কোন অংশেও বস্তু বলিয়া মনে করে না। কবি কহিয়াছেন,—

জ্বলিতং ন হিরণ্যরেতসম্
চয়মাস্কন্দতি ভস্মনাং জনঃ।

অর্থাৎ,—মনুষ্য জগদুজ্জ্বল অগ্নির পূজাই করিয়া থাকে, অগ্নিকে কখনও পদতলে পেষণ করে না। কিন্তু অগ্নি যখন নির্ব্বাণ হইয়া যায়, তখন অঙ্গার অথবা অগ্নিশূন্য ভস্মরাশিকে কেহই পাদ-তলে দলন করিতে ত হয় না।

প্রাচীন ঋষিরা অগ্নির উপাসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহা তাঁহাদিগের নিন্দার কথা নহে, বরং প্রশংসারই কথা। বিজ্ঞানের আধুনিক প্রক্রিয়ায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আলোক আর উত্তাপ ( Light and heat ) এই দুই পদার্থই জগৎ-সংসারের সর্ব্ববিধ জীবন,—জীবনী শক্তির ক্রিয়া, এবং সজীব সৌন্দর্য্যের আদি প্রস্রবণ। ঐ যে ফুলটি হাসিতেছে, ফলটি পাকিতেছে, আর কচি কচি পাতাগুলি, চক্ষের পাতার মত প্রসারিত হইয়া, ফুল ও ফল উভয়কেই আধো আবরিয়া রাখিতেছে, উহাদিগের সর্ব্ববিধ বিলাস অথবা বিকাশের অন্তঃশক্তি আলোক আর উত্তাপ। আর ঐ যে সুন্দরী, আপনার সর্ব্ব অঙ্গে, শত শত ফুলের সলজ্জ ও সহাস্য মাধুরীতে প্রস্ফুটিত হইয়া, কবি ও ভাবুকের হৃদয়ে, প্রকৃতির ঘনীভূত সৌন্দর্য্যবৎ প্রতিভাত হইতেছেন, উঁহার ঐ অপ্রতিম অমিয়-স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের অন্তঃশক্তিও আলোক আর উত্তাপ

ফলতঃ, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জলে স্থলে ও নভোমণ্ডলে,—তুষার-রাশি-মণ্ডিত পর্ব্বত-শৃঙ্গে, অথবা তরল-শোভাময় সামুদ্র-তরঙ্গে,—কল-কলান্বিত লোকারণ্যে, অথবা কল্পনার অগম্য মহাশূন্যে, সকল স্থানে এবং সকল প্রকার বস্তু-বিতানে, প্রকৃতির নিত্য-লীলা আলোক আর উত্তাপে। অগ্নি, এই

জড়-জগতে, এক-আধারে, সেই আলোক ও উত্তাপের মিশ্রিত মূর্ত্তি কিংবা প্রত্যক্ষ বিগ্রহ। সুতরাং ঋষিরা, সেই প্রত্যক্ষ ও পুরঃস্থিত অগ্নিকেই সর্ব্বাগ্রে পূজা করিয়া, অগ্নির অভ্যন্তর-স্থিত অপ্রত্যক্ষ শক্তিকে অন্তরে অনুভব করিতে ধ্যানস্থ হইতেন; এবং কিবা উৎসবে, কিবা ব্যসনে,—কিবা ক্ষণ-স্থায়ি গার্হস্থ্যজীবনের বিবিধ অনুষ্ঠানে, কিবা চিরস্থায়ি অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষবিধানে, অগ্নিকেই তাঁহারা সাক্ষিরূপে সতত সমক্ষে রাখিয়া, আত্মায় যার-পর-নাই শান্তি লাভ করিতেন। তাঁহারা, উষার অরুণিত আলোকে, নয়ন উন্মীলন করিয়া, আগে অগ্নির মূর্ত্তি দেখিতেন; এবং নিশার নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যেও, অগ্নির আভা দেখিতে দেখিতে, নিদ্রার নির্ভয়-বিস্মৃতিতে ডুবিয়া যাইতেন। অগ্নি তাঁহাদিগের চক্ষে ঋত্বিক্ ও রত্নধাতম, অর্থাৎ দেব-স্তুতির আহ্বানকারী ও রত্নধারী। * তাঁহারা প্রকৃতই ইহা বিশ্বাস করিতেন, অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক সাধনায় নিশ্চয় বুঝিতে পাইতেন যে, অগ্নির আভা অনুধ্যাত হইলেই, হৃদয়ে দেবতার আভা প্রতিভাত হইবে; এবং আত্মা অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত রহিলে, সুখ ও সম্পদ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রত্ন আপনা হইতে ঘরে আসিবে।

তাই বলিয়াছি যে, ঋষিদিগের অগ্নি-উপাসনা,—ঋষি-ভাষার সে "অগ্নিমীলে পুরোহিতম্" প্রভৃতি উদাত্ত-সমুচ্চারিত উদ্গীতিবন্দনা কোন প্রকারেও নিন্দনীয় নহে। উহাতে ভক্তির অসামান্য উদ্দীপনা আছে, অথচ জ্ঞানের কোনরূপ অবমাননা অথবা হৃদয়ের বিড়ম্বনা নাই। কারণ, সেই স্নাত-পূত, তত্ত্ব-দীক্ষিত, ঊর্দ্ধচেতা তাপসেরা, জীবন্ত অগ্নিরই উপাসনা করিতেন, কখনও কোন রূপ অঙ্গারের উপাসনা করিয়া অধঃপতিত হইতেন না। তাঁহারা যখন,—"যো দেবোঽগ্নৌ" —অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে অবস্থিত—ইত্যাদিক মন্ত্রের নিগূঢ় সত্যে নিমগ্ন হইয়া, অগ্নির পারমার্থিক আদর্শ চিন্তায় চিত্ত সমর্পণ করিতেন, তখন তাঁহাদিগের আত্মায় এক অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিত; এবং সে তেজোময়ী অগ্নিশিখা, তাঁহাদিগের চিত্ত ও চরিত্র উভয়কেই পবিত্র করিয়া, মানব-জগতে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় পরিশোভিত হইত। নহিলে, সিংহাসনের সম্রাট্ ও সমর-ক্ষেত্রের রথারূঢ় বীর, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্র, মাথার মুকুট অথবা কর-ধৃত কার্ম্মুক দূরে রাখিয়া, তাঁহাদিগের কাছে করযোড়ে দাঁড়াইত না; এবং তদানীন্তন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রকারে সমুন্নত একটা সুবিশাল রাজ্যের সকল শ্রেণীস্থ লোকই, তাঁহাদিগের মুখের কথাকে মহার্হ দেববাণী মনে করিয়া, সংসারের সমস্ত বিষয়ে, তাঁহাদিগের নিকট ভয়ে ও ভক্তিতে মাথা নোয়াইত না।

আমরা অধশ্চর মনুষ্য, এবং জীবনের

* অগ্নিমীলে পুরোহিতম্,—যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং,—হোতারং,—রত্নধাতমং। ঋগ্বেদঃ প্রথমোঽষ্টকঃ।

আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যে, সর্ব্বাংশে অধঃস্তরস্থিত। সুতরাং, আমরা অগ্নির উপাসনায় অনুরাগী নহি। আমরা, স্বভাবের বিকৃতিতে, অগ্নির উপাসনায় বিরক্ত; এবং কিবা সুখের অন্বেষণে, কিবা সাহিত্যের অনুশীলনে,—কিবা ধর্ম্মে, কিবা প্রেমে ও প্রাত্যহিক কর্ম্মে, শুধু অঙ্গার লইয়াই সতত ব্যাপৃত,—অঙ্গারের উপাসনায় আত্মবিস্মৃত। বস্তুতঃ, আমরা অগ্নির স্বরূপ ও শক্তির কথা একবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; এবং যেন কেমন এক মোহে অন্ধ হইয়া, সকল বিষয়েই স্তূপীকৃত অঙ্গার লইয়া জীবিত আছি। আমরা অঙ্গার তুলিয়া গায়ে মাখি,—অঙ্গারের কালি জিহ্বায় চাখি; এবং আত্মা যখন বিষাদে অবসন্ন হয়, তখন আপনারাও অঙ্গারের মত হইয়া, অঙ্গার-রাশির মধ্যে লুকাইয়া থাকি।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, ধর্ম্মজগতের ইতিহাস সম্পর্কে একটুকু অন্তর্দর্শি আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ, অগ্নি ও অঙ্গারের নৈকট্য ও দূরতা,—অন্তরঙ্গসাযুজ্য ও অতিমাত্র পার্থক্য ধর্ম্মজগতেই একটু বেশী পরিস্ফুট। জড়-জগতে যাহার নাম অগ্নি, ধর্ম্ম-জগতে তাহার নাম দৈবী প্রতিভা অথবা দেব-জ্যোতিঃ; জড়জগতে যাহার নাম অঙ্গার, ধর্ম্ম-জগতে তাহার নাম সাম্প্রদায়িক উৎসাহ। জড়-জগতের অগ্নি, আলোক আর উত্তাপ দান করিয়া, সংসারের সমস্ত বস্তুতে শক্তি যোগায়; ধর্ম্মজগতের অগ্নি, আলোকের অধ্যাত্ম আদর্শস্বরূপ জ্ঞান এবং উত্তাপের অধ্যাত্ম প্রতিরূপক প্রেম বিলাইয়া, মানব-জাতির সমবেত-হৃদয়ে ভক্তি ও শান্তি সঞ্চারণ করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জড়-জগতের অগ্নি, কোনরূপ ইন্ধন অথবা অঙ্গারের আশ্রয় না পাইলে, প্রজ্বলিত হয় না। ইহা বড়ই বিচিত্র, যে ধর্ম্মজগতের দেবাগ্নিও, সাম্প্রদায়িকতার উৎসাহ ও কতকগুলি সাম্প্রদায়িকের সঙ্গস্বরূপ ইন্ধন অথবা অঙ্গারের বল না পাইলে, এ সংসারে প্রজ্বলিত হইতে পারে না। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মই এ কথার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। আমরা তথাপি তিনটি পৃথ্বীব্যাপি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম হইতেই এ স্থলে প্রমাণ সংগ্রহ করিব।

পৃথ্বীব্যাপি ধর্ম্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ কিছু মহিমা আছে। সে মহিমা ধর্ম্মের উদারতা ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাতার অলোক-সামান্য উন্নত-চরিত্র, উভয় দিকে সমান। অতএব বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কথাই আগে কহিব। সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহ যখন, সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যার পর, আপনাতে আপনি বুদ্ধদেব রূপে বিকসিত হইলেন;—যখন তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার আত্মা জগৎ-পাবন অগ্নির অলৌকিক জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে, এবং মনুষ্যজাতি সে অগ্নির অভাবে অন্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি আর আপনাতে আপনি তৃপ্ত রহিতে পারিলেন না,—আপনার প্রাণের অগ্নিশিখা প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, আত্মসুখে তিষ্ঠিয়া রহিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তিনি কিরূপে সংসারে সে অগ্নি বিলাইবেন?—কিরূপে একাকী, এক-শত কোটি

লোককে আলোকিত করিয়া, তাহাদিগের আত্মার অন্ধকার দূর করিবেন? তিনি ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য আকুল হইলেন; এবং আর কোথাও ইচ্ছার অনুরূপ ইন্ধন-লাভে কৃতকার্য্য না হইয়া, বারাণসী ধামে,—মৃগবাটিকা নামক নিভৃত-আশ্রমে, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত পাঁচটি কৃচ্ছ্রব্রত ভিক্ষুর কাছে যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

উল্লিখিত পঞ্চ ভিক্ষুর মধ্যে, যিনি বয়সের জ্যেষ্ঠতা ও বিজ্ঞ-বিচক্ষণতা প্রভৃতি নানা কারণে আর চারি জনের নায়ক ও চালক ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কৌণ্ডীণ্য। কৌণ্ডীণ্য প্রভৃতি ভিক্ষু-তাপসেরা ধর্ম্মাভিমানে অন্ধ। তাঁহারা সিদ্ধার্থকে প্রথমতঃ কোন প্রকারেই সিদ্ধ পুরুষ অথবা বুদ্ধদেব বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা, অল্প কিছু কাল পূর্ব্বে, যাঁহাকে এক জন সাধারণ সন্ন্যাসী জ্ঞানে, উপেক্ষা করিয়াছিলেন, আজি তাঁহাকেই আবার অসাধারণ জ্ঞানে, হৃদয়ের আসনে, গুরুরূপে বরণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। কিন্তু এ সংসারে, কে কোথায় সজীব অগ্নিকে, দীর্ঘ কাল অস্বীকার করিতে পারে? কৌণ্ডীণ্য ও তদীয় বন্ধুরাও বুদ্ধদেবকে বহুদিন এড়াইয়া রহিতে পারিলেন না। তাঁহারা যখন, বুদ্ধ-গৌতমের জ্ঞানাত্মিকা শক্তিতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাথমিক অগ্নিশিখারূপে জ্বলিয়া উঠিলেন, তখন অসংখ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হৃদয়, চারিদিক হইতে উড়িয়া আসিয়া, জয়-জয় শব্দ সহকারে কোলাহল করিতে লাগিল; এবং যাহার যেরূপ ক্ষমতা, সে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিতে সেই পরিমাণে ইন্ধন যোগাইল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাত্ম অগ্নি, এইরূপে, সমস্ত ভারতবর্ষকে আলোকিত করিয়া, আসিয়া ও আফ্রিকা প্রভৃতি বিশাল ভূখণ্ডের অতি দূর প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়িল; এবং উত্তরে চীন, দক্ষিণে সিংহল, পূর্ব্বে জাপান, ব্রহ্ম ও শ্যাম, এবং পশ্চিমে পার্ব্বত্য অসভ্য ও মিসর-দেশীয়েরাও ঐ অগ্নি লইয়া মনের উৎসাহে উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্মের দেব-জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি, প্রশান্ত, প্রফুল্ল, পরার্থপরায়ণ ও সর্ব্বজন-শুভাভিলাষী বুদ্ধদেবের সময় হইতে, কয়েকটি শতাব্দী এ অবনীতে কিরূপ অমর্ত্ত্য আনন্দ দান করিয়াছে, এবং কতই কি মঙ্গল্য পরিবর্ত্ত ঘটাইয়াছে, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে না। পৃথিবীর সুখ-সম্ভোগ-মত্ত স্বার্থমুগ্ধ মনুষ্য, সে অগ্নির আলোকে উত্তাপিত হইয়া, জন্তুর অগম্য গহন বনেও ধ্যান-নিকেতন সংস্থাপন করিয়াছে;—বুদ্ধদেবের প্রাণের কথা প্রস্তর-ফলকে ও পর্ব্বতের অঙ্গে, বৃহদক্ষরে অঙ্কিত করিয়া, ধর্ম্মের সারসত্যকে পণ্ডিত ও মূর্খ সর্ব্বসাধারণেরই সুলভ করিয়া রাখিয়াছে;—মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, মনুষ্য চিরকাল যাহার মাংস খাইয়া উদর পূরণ করিত, তাদৃশ পশুপক্ষীর প্রাণরক্ষা ও সুখ-স্বাস্থ্য বিধানের জন্যও অসংখ্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে;—এবং পরম শত্রুকেও প্রিয়তম বোধে আলিঙ্গন করিয়া,—যে ব্যক্তি ঈর্ষ্যা

ও অভিমানের আক্রোশে, প্রাণের উপর আঘাত করিবার জন্য, শেল ও শূল প্রভৃতি সাংঘাতিক অস্ত্র হাতে লইয়া, প্রচণ্ড চণ্ডালের ক্রোধে, দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহার প্রাণেও দয়া ও প্রীতিস্নেহের শান্তি দান করিয়া, সকলের বিস্ময় জন্মাইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের সে অগ্নি এখন কোথায়? উহা পৃথিবীর সমস্ত স্থলেই এখন এক প্রকার নির্ব্বাণ। এখন উহার আছে কি? আছে সাম্প্রদায়িক বিকার-বিদ্বেষের অঙ্গার-রাশি। উল্লিখিত রূপ অঙ্গার কোন কোন স্থলে এমনই কদর্য্য যে, উহার স্পর্শ মাত্রেও মনুষ্যের শরীর কলঙ্কিত হয়। বুদ্ধদেব "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাসত্যকেই তাঁহার মহাযজ্ঞের মূলমন্ত্ররূপে আশ্রয় করিয়া, মানবজাতির মুক্তির পথ খুলিয়াছিলেন। এখনকার অসংখ্য কূট-নীতি-কুশল কঠোর-কর্ম্মা বৌদ্ধ প্রশ্রয়-প্রার্থী প্রতিবেশিদিগের প্রাণের রক্ত চুষিয়া খাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। প্রাথমিক বৌদ্ধেরা পাদ-রক্ত-শোষক পিপীলিকাটিরেও স্নেহ ও করুণার চক্ষে দেখিতেন, এবং স্নেহ ও করুণার একটুকু কণিকা দান করিতে পারিলে হৃদয়ে কৃতার্থতা অনুভব করিতেন। এখনকার বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক জাতি, ধাঙ্গর ও বন্যবর্ব্বরের মত, মাঠ ও ক্ষেত কুড়িয়া, ধেনো ইন্দুর ধরিয়া, তাহার অপক্ক বা অর্দ্ধপক্ক মাংস, কড়্মড়্ শব্দে, দাঁতে চিবাইয়া খায়; এবং জীব-হিংসাকে জীবনের বিশেষ সুখ-জ্ঞানে, জীব-জন্তুর অন্বেষণে, বনে বনে বেড়াইয়া বেড়ায়। পৃথিবীর বিজ্ঞ পরিব্রাজকদিগের নিকট বহুদেশীয় বৌদ্ধদিগের আহারের বিবিধ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে বিবরণের সার কথা এই যে, যেরূপ পূতিগন্ধি পচা মাংস পিশাচেরও মুখে রোচে না, বৌদ্ধের জন্য তাহা দেব-ভোজ্য। তাহার কিছু না কিছু সংকলন না হইলে, কোন প্রকারেও বৌদ্ধদিগের দিনপাত হয় না।

অহিংসাও যেমন বৌদ্ধধর্ম্মের এক সত্য, চিত্ত ও চরিত্রের উজ্জ্বল পবিত্রতাও বৌদ্ধধর্ম্মের আর এক সত্য। পারিবারিক-জীবনের সে অনবদ্য পবিত্রতা, তিব্বত, চীন ও ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে, ইদানীং কিরূপ ভস্মাবশেষে পরিণত হইয়াছে, তাহা সকলেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবগত আছেন। আমি যখন এ সকল কথা কানে শুনি, তখন মনে মনে ভাবি, হা বুদ্ধদেব! হা করুণার সাগর সিদ্ধ-গৌতম! তুমি এখন কোথায় রহিয়াছ? তুমি পৃথিবীতে অপার্থিব প্রেমের নাম লইয়া কি অগ্নি জ্বালিয়াছিলে! আর সে অগ্নি তোমার, এইক্ষণ কিরূপ অঙ্গার হইয়া, জীবের আতঙ্ক জন্মাইতেছে!

যে দৈবী প্রতিভা আমাদিগের এ দেশে বৌদ্ধ অগ্নি, সেই দৈবী প্রতিভাই, দেশান্তরে —জর্দ্দনের তীরে, খ্রীষ্টধর্ম্মের দয়াধর্ম্মময় ও প্রেম-ভক্তিপূর্ণ পাবন-অগ্নি। খ্রীষ্টধর্ম্মের সেই প্রথমোদ্গত অগ্নিশিখা এবং এইক্ষণকার সাম্প্রদায়িক অঙ্গারে কিরূপ পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহাও কি উদাহরণ যোগে বুঝাইয়া দিতে হইবে? বৌদ্ধধর্ম্ম, ভক্তিশূন্যতা হেতু, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ও সকল শ্রেণিস্থ লোকের

সুখ-শান্তি-জনক নহে। যাহার হৃদয় ভক্তিতে সতত ঢলঢল ও ভাব-বিহ্বল, এবং ভগবৎ-পাদপদ্মে গড়াইয়া পড়িবার জন্য লালায়িত, জ্ঞান-গভীর বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার জন্য সম্পূর্ণ ধর্ম্ম নহে। উহা যে, ভক্তির লীলাস্থল-রূপিণী ভারত-ভূমিতে জন্ম-লাভ করিয়াও, ভারত-বর্ষে দীর্ঘকাল তিষ্ঠিয়া রহিতে পারে নাই, ইহাই তাহার মূল। কিন্তু খ্রীষ্ট-প্রতিষ্ঠিত ভক্তির ধর্ম্ম, এ অংশে পৃথক্ পদার্থ। আমার কথা আমি স্পষ্ট বলিতে পারি যে, আমি ঋষি-প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত ধর্ম্মে আর খ্রীষ্ট-প্রতিষ্ঠিত প্রেম-ভক্তির ধর্ম্মে কোন বিষয়েও পার্থক্য দেখি না।

অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে * এইরূপ প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন যে, খ্রীষ্টদেব তাঁহার প্রথম বয়সে ইজিপ্ত ও এসিয়াখণ্ডের স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তত্ত্বচিন্তা করিয়াছিলেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় অনুমান করিতে হইবে যে, এই শৈল-সাগর-পরিবেষ্টিত, সহস্র-বিধ লতা-পাদপ-পরিশোভিত, ভারত-ভূমি তদীয় অনুপ্রাণনার আদি ভূমি। ভারতগুরু ঋষিরা বলিয়াছেন,—'আনন্দরূপমমৃতম্।' খ্রীষ্টদেব বলিয়াছেন God is Love অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম প্রেম। ঋষিরা বলিয়াছেন 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'; খ্রীষ্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এইক্ষণ মন্ত্র রচনা হইয়াছে,—"The True, the Good, the Beautiful" অর্থাৎ তিনি সত্য, তিনি শিব, তিনিই সুন্দর। ঋষিরা বলিয়াছেন, "ঈষাবাস্যমিদম্ সর্ব্বম্" খ্রীষ্ট বলিছেন,—'In Him we live and move and have our being' অর্থাৎ আমরা তাঁহারই বিশ্বব্যাপি সত্তার সমুদ্রে জীবিত রহিয়াছি, তাহারই মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি। ঋষিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মুখ্য অনুষ্ঠান সর্ব্বজনীন প্রেম। খ্রীষ্টপ্রোক্ত ধর্ম্মেরও মুখ্য অনুষ্ঠান সমস্ত মনুষ্যে, সুখ-স্বার্থ-সম্পর্ক-নির্ব্বিশেষে, প্রেমময় ভ্রাতৃভাব। সে খ্রীষ্টীয় অগ্নি এখন কি হইয়াছে, তাহা চাহিয়া দেখ।

খ্রীষ্টদেব, শৈলশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া, দেবতার অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠে উপদেশ দিয়াছেন,—যে তোমাকে ঘৃণা কিংবা বিদ্বেষ করে, তুমি তাহাকে ভালবাসিও;—যে তোমাকে অভিসম্পাত করে, তুমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিও;—আর যে ব্যক্তি অশেষ-প্রকারে তোমার অপকার করে, তুমি অশেষপ্রকারে তাহার উপকার করিয়া মনুষ্যকে বিশ্বাসীর প্রেমের মাহাত্ম্য দেখাইও। পক্ষান্তরে, যাঁহারা খ্রীষ্টীয় যজ্ঞের অঙ্গার কুড়াইয়া,—গায়ে সাম্প্রদায়িকতার অঙ্গার মাখিয়া, সাম্প্রদায়িক উৎসাহে, দেশে বিদেশে জয়-পতাকা উড়াইতেছেন, তাঁহারা কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উপদেশ করিতেছেন,—যে তোমাকে ভালবাসে অথবা ভয়ে ভয়ে তো-

* ফরাশি দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত মঁসিয়ু রেঁণা ( M. Renan ), ইংলণ্ডের মীড—( G. R. S Mead, B. A, M. R. A. S, author of Fragments of a Faith forgotten &c. &c. ) এবং আমেরিকার ডক্টর বুচানন প্রভৃতি বিদ্বদ্বর্গ।

মার নিকট করযোড়ে দাঁড়ায়, তুমি মনে প্রাণে তাহাকে ঘৃণা করিও;—যে অনন্য-গতিক হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে, তুমি অন্তরের সহিত তাহাকে অভিসম্পাত করিও, এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নেও তোমার কোন রূপ অপকার চিন্তা না করে, তুমি তাহার শান্তির কুটীরখানি শত প্রকার আঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিও।

শুধু ইহাই নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত থাকা দৃষ্ট হয়, যে খ্রীষ্ট যখন অন্ধকে পদ্ম হস্তে স্পর্শ করিতেন, সে তখনই দৃষ্টি-শক্তি লাভ করিয়া আশার অচিন্তিত সার্থকতায় কৃতকৃত্য হইত। * বধির তাঁহার স্পর্শে শ্রুতি লাভ করিত; পঙ্গু পাদ-চারণে সমর্থ হইয়া আহ্লাদে নাচিত; এবং উন্মাদ-গ্রস্ত, প্রকৃতিস্থ হইয়া, হৃদয়ের উদ্বেল আনন্দে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিত। যাঁহারা সেই খ্রীষ্টীয় অগ্নির অঙ্গারে লিপ্ত কিংবা বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়া, এইক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে নিবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সুকোমল স্পর্শে কি হইতেছে, তাহাও একবার আলোচনা কর। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার উৎসাহে একটুকু বেশী অগ্রগণ্য, —অঙ্গারত্বের প্রকার-প্রকর্ষে একটুকু বেশী মান্য, তাঁহারা হাত বাড়াইয়া মনুষ্যকে স্পর্শ করেন, আর অমনি মনুষ্য চক্ষু সত্বেও অন্ধ, শ্রুতি সত্বে বধির, এবং পাদচারণার শক্তি সত্বেও পঙ্গুর মত হইয়া, তাঁহাদিগের পদতলে লুটাইয়া পড়ে;—প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, উন্মত্তবৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, আর্ত্তনাদ করিতে থাকে; এবং হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ মনুষ্যও, মুহূর্ত্তের মধ্যে, নিরয়-ক্লিষ্টের মত নিগৃহীত হইয়া, নয়নজলে ভাসে। * আমি যখন চক্ষে এ সকল দেখি, তখন মনে মনে ভাবি, হা খ্রীষ্টদেব! হা দীন-

* এ সকল ঘটনা অলৌকিক হইলেও অস্বাভাবিক অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে। যাহাকে Faith-healing অর্থাৎ বিশ্বাস-সিদ্ধ আরোগ্য-বিধান অথবা Miraculous Cure বলে, ইংরেজীতে তাহার অসংখ্য গ্রন্থ আছে। পাঠক Goodrich Freer প্রণীত Psychic Healing ও Saint Columba নামক প্রবন্ধ দ্বয়, এবং Dr. Wyld প্রণীত Christian Theosophy নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পাইবেন যে, খ্রীষ্টের অবদান-পরম্পরা যত কেন আশ্চর্য্য হউক না, উহার প্রত্যেকটিই প্রাকৃত-নিয়মে অনুশাসিত। ঐ প্রকার Miracle অর্থাৎ মহাদ্ভুত ঘটনা, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ও পরে, শত শত লোকের দৃষ্টি-গোচরে, অন্যান্য সিদ্ধ-পুরুষের দ্বারাও সম্পাদিত হইয়াছে।

* উপরি লিখিত কথা গুলি আমার মনঃকল্পিত নহে। আমেরিকার রাজ্যনিচয় যখন, দুরিত-দুর্গন্ধি দাসত্ব-প্রথার উন্মূলন-উপলক্ষে, দুই দলে বিভক্ত, এবং পরস্পরের রক্তপাতে কলঙ্কিত, তখন কতিপয় পদস্থ ও প্রতিপত্তিশালী ধর্ম্ম-যাজক, খ্রীষ্টের নাম লইয়া ও বাইবল হইতে বাক্য সংগ্রহ করিয়া, দাস-ব্যবসায়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন;—এবং

হীন দুর্ব্বলের বান্ধব, পবিত্রতার প্রতিকৃতি! তুমি এখন কোথায়? তুমি এ পৃথিবীতে যে অগ্নির আভা দেখাইয়া মনুষ্যজাতিকে স্বর্গরাজ্যের জন্য উন্মাদিত করিয়াছিলে, সেই অগ্নিই কি এইক্ষণ এইরূপ অন্তঃশোষক অঙ্গার হইয়া, মনুষ্যের সমস্ত আশা বিনষ্ট করিতেছে!

বুদ্ধ আর খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হন নাই, —মনুষ্য যখন বুদ্ধদেবের অহিংসার ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টদেবের ঈশ্বরানুগত্য-মূলক উচ্চতর ধর্ম্ম-বিষয়ে কোন কথাই জ্ঞাত হয় নাই, তখন আমাদিগের এই দেশে,—এই প্রশান্ত-প্রকৃতি ভারতবর্ষে, একটি আশ্চর্য্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সে ধর্ম্মের নাম ভাগবত ধর্ম্ম। আর, যিনি শ্যাম-সলিলা যমুনার তটে, শ্যাম-সুন্দর রূপে প্রকট হইয়া, সেই ভাগবত ধর্ম্মের প্রেমোজ্জ্বল অগ্নি জ্বালিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ভগবান্ কৃষ্ণ।

আমি এইস্থলে সেই কৃষ্ণোক্ত ভাগবত ধর্ম্মের সকল দিক্ লইয়া আলোচনা করিতে যাইতেছি না। তবে, ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, কিবা নির্ব্বাণ-পরম বৌদ্ধধর্ম্ম, কিবা নির্ম্মল-ভক্তি-পরম খ্রীষ্ট ধর্ম্ম,—কিবা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মই, ধর্ম্মের সার-নিষ্কর্ষে, কৃষ্ণোপদিষ্ট ভাগবত ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই পৃথিবীর কোন ধর্ম্মে জ্ঞানের প্রাধান্য, কোন ধর্ম্মে ভক্তির প্রাধান্য, এবং কোন ধর্ম্মে কর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রাধান্য। কৃষ্ণোক্ত ভাগবতধর্ম্মে এই তিনেরই সমান প্রাধান্য, অথচ অতি সুন্দর সামঞ্জস্য। এই পৃথিবীর কোন ধর্ম্মে চিত্তোৎ-কর্ষ, কোন ধর্ম্মে বা চরিত্রোৎকর্ষ;—কোন ধর্ম্মে ঐহিক শান্তি, কোন ধর্ম্মে বা পার-লৌকিক সুখের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি। কৃষ্ণোক্ত ভাগবত ধর্ম্মে চিত্ত ও চরিত্র, ইহকাল ও পর-কাল, প্রত্যেকের প্রতি সমান দৃষ্টি, এবং সকলের অতি সুন্দর সমন্বয়। কিন্তু সেই জগদ্দুর্ল্লভ ভাগবত ধর্ম্মের এখন অবশিষ্ট আছে কি? আছে কতকগুলি বিলাস-রস-বিলোলা, বিদগ্ধ-ভাব-বিহ্বলা লালসাময়ী কবিতার ললিত লহরী, আর সাম্প্রদায়িকতা-রূপ অঙ্গারের ছেঁড়া ঝুড়ী।

হিমাদ্রির ধবল গিরি অথবা গৌরীশঙ্কর নামক শৃঙ্গ, শৈল-শৃঙ্গ-নিচয়ের মধ্যে, অতি বড় উচ্চ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণোক্ত ভাগবত ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগনিষ্ঠ মহাতত্ত্বে, এবং চিত্ত, চরিত্র, ইহকাল ও পরকালের রহস্যসংক্রান্ত নিগূঢ়ত্বে, সেই ধবলগিরি ও গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ হইতেও অধিকতর উচ্চ। যদি ভারতবর্ষের বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-তন্ত্র, এবং মধুর ও গম্ভীর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য সমুদ্রের জলে ভাসিয়া যায়, ভারতীয় সভ্যতা তথাপি ঐ ভগবদ্গীতার আশ্রয়ে সংসারে অক্ষুণ্ণ রহিবে; এবং ভারতবর্ষের সমাজ ও সাহিত্য, ঐ ভাগবত ধর্ম্মকেই ভবসাগরে ভেলার মত আশ্রয় করিয়া, আবার শক্তি ও

---

পর-দুঃখ-কাতর পুণ্যাত্মা ধর্ম্মবীর পার্কার্ তখন, এমনই অনেক কথা কহিয়া, আপনার বক্তৃতায় আধুনিক খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের অধঃপাত ও বিড়ম্বনা দেখাইয়াছিলেন।

শান্তির আশ্রয়-কূল প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগ্য, আমরা সেই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহের জন্য ভগবদ্গীতার আশ্রয় লই না,—আশ্রয় লই যাত্রাওয়ালা ও রঙ্গাভিনয়ের; এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, অথবা শঙ্কর, শ্রীধর ও আনন্দগিরি প্রভৃতি তত্ত্বদর্শি ভাষ্যকারেরও শরণ লই না, শরণ লই কবিওয়ালার ও কামিনী-কণ্ঠ-কুহরিত কল-সংগীত-সখী-সংবাদের।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, ঋষিরা করিতেন অগ্নির উপাসনা; আর আমরা—আজিকালিকার এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৃদ্ধ, সুখ-সম্মান-সমৃদ্ধ, শূন্যাভিমান-দগ্ধ, সুসভ্য আমরা—করিতেছি শুধুই অঙ্গারের উপাসনা। কিন্তু অঙ্গার কি কখনও কোনস্থানে আর জ্বলিবে না? সেই যে পুরাতন অভিসম্পাত রহিয়াছে,—"অঙ্গারঃ শত-ধৌতেন ন জহাতি মলিনতাং"—ইহার কি কিছুতেই আর ব্যত্যয় কিংবা ব্যতিক্রম ঘটিবে না? সাম্প্রদায়িক-মত্ততার শোচনীয় অঙ্গার কি আবার কখনও ইন্ধনের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সংসারের কার্য্যে লাগিবে না? পূর্ণমঙ্গল প্রেমময়ের এই অনন্ত-বৈচিত্র্যময় বিশ্বধামে অঙ্গার সম্বন্ধেও একবারে নিরাশ হইবার কথা নহে। ভারতের এক ভক্ত-কবি, বুঝি বা সকল প্রকার অঙ্গারেরই ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, গদ্গদ ভাষায় কহিয়াছেন,——

সদ্‌গুরু পাওয়ে,—
ভেদ্ বাতাওয়ে,—
জ্ঞান করে উপদেশ;
কয়লাকো ময়লা ছোটে—
যব্ আগ্ করে প্রবেশ।

দেব-পুরুষেরা, যে অগ্নির প্রসাদে, সময়ে সময়ে, গিরি-নগর-বন-ব্যাপি দাবাগ্নি সৃষ্টি করিয়া, জগতে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত, অথবা যুগ-ধর্ম্মের বিশেষ মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন, মনুষ্যমাত্রেরই আত্মায় সে অগ্নির অল্প বা অধিক ভাগ বিদ্যমান আছে; এবং একটুকু অগ্নি-সম্পর্ক আছে বলিয়াই, মনুষ্য পশু-পক্ষী হইতে পৃথগ্‌জাতীয় জীব অথবা ঊর্দ্ধ-ধামের যাত্রী রূপে সর্ব্বত্র পূজা পাইতেছে। যাঁহাদিগের আত্মায় সে আনন্দময় অগ্নির অংশ একটুকু বেশী, এবং অগ্নি, প্রধূমিত না রহিয়া, সর্ব্বজনীন-প্রীতিস্নেহের সুখাবহ জ্যোতিতে কতকটা সমুজ্জ্বল, তাঁহারাই ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অথবা সদ্‌গুরু রূপে পূজাস্পদ। তাঁহাদিগের মুখ্য সম্পদ্ উদারতা;—মুখ্য উদ্দেশ্য মনুষ্যের শিক্ষা, শান্তি ও উন্নতি; এবং মুখ্য লক্ষণ নম্রতা, মধুরতা ও নিরভিমান-ধীরতা। অঙ্গার, তাঁহাদিগের স্পর্শ লাভ করিতে পারিলেই, স্থানে স্থানে,—সময় ও অবস্থার আনুগুণ্যে,—পুনরায় প্রজ্বলিত হয়, এবং প্রজ্বলিত মূর্ত্তিতে জগতের কিছু কিছু মঙ্গল সাধন করে।

শ্রীমদ্‌জ্ঞানানন্দ শর্ম্মণঃ।

মহাকবি মাঘকৃত

# শিশুপাল-বধ। ১

## প্রথম সর্গ।

(কৃষ্ণনারদ সম্ভাষণ।)

( ৪২ )

"হিরণ্য কশিপু নামে দৈত্যবর
ছিল পূর্ব্বকালে দিতির তনয়,
ইন্দ্রপদহারী, তেজেতে ভাস্কর;
নাহি ছিল তার কভু শক্র-ভয়।

( ৪৩ )

"পর শুভদ্বেষী, অসুর-প্রধান
নিরাসিয়া সুরে 'অসুর' আখ্যান
করিল সার্থক, প্রথম সে বার
করি সুরমাঝে ভয়ের সঞ্চার।

( ৪৪ )

"ত্যজি ইন্দ্র আদি দিক্‌পালগণ
ভজিলা তাহারে ধনদা তখন;
সে অবধি হ'ল জগতে প্রচার
'চঞ্চলা' বলিয়া অখ্যাতি তাঁহার।

( ৪৫ )

"নিরমিলা তার ভয়ে দেবদল
শোভারূপী পুরে পরিখা প্রাচীর; ২
শাণি অস্ত্র, বাড়াইলা সেনাবল
অভেদ্য কবচে ঢাকিয়া শরীর।

( ৪৬ )

"যাইত যে দিকে যবে ত্রিভুবনে
লক্ষ্মীর আশ্রয় সে অসুর-পতি,
মস্তকে অঞ্জলি বাঁধি দেবগণে
ত্রিসন্ধ্যা সে দিকে করিত প্রণতি। ৩

( ৪৭ )

"নরসিংহ রূপে বধিলে তাহারে
(উড়াইয়া মেঘ কেশ-আস্ফালনে)
বিদারিয়া হৃদি কোমল নখরে—
ভঙ্গুর প্রেয়সী-বক্ষ-পরশনে। ৪

২ তৎপূর্ব্বে দেবগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেন। ইহা আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে প্রথম সংঘাত অনুমিত হয়।

৩ পূর্ব্বে দেবগণের পুরীতে সৈন্য ও অস্ত্রাদি শোভাস্বরূপ ছিল। এখন শক্র বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে,ঐ সমস্ত যুদ্ধের উপযোগী করা হইল।

৪ সেই সময়ে নারায়ণের কোমল নখ, সিংহের কঠিন নখর রূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কেশর সমূহের ঘন সঞ্চালনে আকাশে মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়াছিল।

১ রঘুবংশের অনুবাদক শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত। পূর্ব্বে প্রকাশিত ১ম খণ্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর।

( ৪৮ )

"বীরদর্পে পুন দেবসনে রণ
করি প্রশমিতে ভুজ উত্তেজন, ৫
দশানন রূপে জন্মিল সে আসি
ভীষণ আকারে, স্বর্গ শান্তি নাশি!

( ৪৯ )

"ত্রিভুবন-প্রভু হ'তে লঙ্কেশ্বর
শেষমুণ্ড যবে কাটিবারে চায় ৬
শিব হ'তে পেয়ে মনোমত বর
সাহসের বাধা গণিল তাহায়। ৭

( ৫০ )

"তুলিল সে বলে কৈলাস ভূধর
ভয়েতে চকিতা করিয়া উমায়,
ভবেশের কণ্ঠগ্রহণ—তৎপর,
দিল সুখ তাঁরে বর-মূল্যপ্রায় ৮।

( ৫১ )

"বন্দি ইন্দ্রসহ রক্ষেন্দ্র রাবণ
রোধিল অমরা, লুটিল রতন,
হরি দেবাঙ্গনা ভাঙ্গিয়া নন্দন
কৈল দিবানিশি ত্রিদিব-পীড়ন।

( ৫২ )

"পলাইলা রণে যবে সুরপতি,
ভুলি সভঙ্গিম ঐরাবত-গতি,
ভুলি উচ্চৈঃশ্রবা বিচিত্র চলন,
প্রশংসিলা শুধু ত্বরিত গমন। ৯

( ৫৩ )

"সূর্য্যরশ্মি-ভীত উলুকের প্রায়
সহিতে না পারি তার দরশন,
লুকায়ে বাসব সুমেরু গুহায়
যাপিতেন দিবা কাতর-নয়ন।

( ৫৪ )

"জগতের প্রভু হইল রাবণ;
পাষাণ-কঠিন কণ্ঠেতে তাহার
ঠেকিয়া বিমুখ হ'ল সুদর্শন,
অগ্নিকণ-রাজি করিয়া উদ্গার।

( ৫৫ )

"মদমত্ত-গজ সম দশানন
ভাঙ্গি শঙ্খ, করি পুষ্পক হরণ,
কুবেরের মন করিল কম্পিত
মনঃসর প্রায় ক্ষুব্ধ বিলোড়িত। ১০

---

৫ ক্ষণ মধ্যে নৃসিংহ কর্ত্তৃক নিহত হওয়াতে দৈত্যপতি নিজের বাহুবল দেখাইতে পারে নাই। সেই বীরত্ব-সম্ভূত ভুজ-কণ্ডূতি পর-জন্মে রাবণরূপে যুদ্ধের দ্বারা প্রশমিত করিয়াছিল।

৬ নয়টী মুণ্ডচ্ছেদনের পর।

৭ শেষ মুণ্ড কাটিয়া ভক্তি ও সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে না পারায় দুঃখ মনে করিল।

৮ পার্ব্বতী ভীত হইয়া কণ্ঠ ধারণ করাতে শিবের যে আনন্দ লাভ হইয়াছিল, তাহা যেন তৎকৃত বর প্রদানের প্রতিমূল্যস্বরূপ হইয়াছিল।

৯ পলায়নের সময়ে ঐরাবত হস্তী ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের দ্রুতগামিতাই প্রশংসার বিষয় হইল।

১০ শঙ্খ—কুবেরের রত্ন, মনঃসরোবরের পক্ষে কম্বু. পুষ্পক,—পুষ্প রথ; অন্য দিকে পদ্ম পুষ্পাদি; মদস্রাবী হস্তী যেরূপ মনঃ-সরোবরের এবম্ভূত উপদ্রব জন্মায়, মদমত্ত রাবণ সেইরূপ পুষ্পাদি হরণে কুবেরের মন ক্ষোভিত করিয়াছিল।

( ৫৬ )

"ছাড়িলা বরুণ রণে নাগ-পাশ ;
শুনি রাবণের সরোষ হুঙ্কার
ফিরি নাগদল পাইয়া তরাস
জড়াইল আসি কণ্ঠে প্রহর্ত্তার। ১১

( ৫৭ )

"যমের বাহন মহিষ ভীষণ,
শৃঙ্গযুগ তার উপাড়ি রাবণ,
নিরমিল ধনু ; ভার হীন শির
বহিল মহিষ লজ্জা ভারে ধীর। ১২

( ৫৮ )

"নিদাঘেও রবি তার অন্তঃপুরে
সঙ্কুচিত কর প্রসারি শঙ্কায়,
সাজাতেন তার রমণী নিকরে
অমুষ্ণ ঘর্ম্মের মুকতা-মালায়। ১৩

( ৫৯ )

মানিনীর মান-নিরাস-কুশল ১৪
প্রতিনিশি শশী ষোড়শ কলায়
শোভিতার ঘরে বাড়ান কেবল
বিলাস-বাসনা, নর্ম্ম-সখা প্রায়।

( ৬০ )

"গড়িতে প্রিয়ার কর্ণের ভূষণ
গণেশের এক দন্ত দশানন
উপাড়ি লইল বিক্রমে দুর্ব্বার
সে দন্ত আজিও উঠে নাই তাঁর। ১৫

( ৬১ )

"কুল রমণীর উড়ায়ে বসনে
দোষী বায়ু, তবু তোষি রক্ষোবরে-
( লোলুপ তাদের রূপ-দরশনে )
মাগিতেন কৃপা দেব-বন্দী তরে। ১৬

( ৬২ )

"ম্রিয়মাণ হ'য়ে আপনি অনল
সর্ব্বজয়ী তেজো-মহিমায় তার,
মনোদুঃখে ছাড়ি শ্বাস অবিরল,
করিতেন ধূম দ্বিগুণ উদ্গার।

( ৬৩ )

আরাধিতে সেই তেজস্বী রাবণে
ত্যজি দংশনাদি মরম-পীড়ন,
লভিয়া শ্রবণ, সরল গমনে
ধরে শান্ত ভাব যত ফণিগণ। ১৭

( ৬৪ )

"ভঙ্গ দিয়া রণে গজ সনে তার
শুষ্ক-মদধার দিগ্‌গজ সকল

১১ নাগ পাশের সর্পসমূহ বরুণ-কণ্ঠে জড়াইল।

১২ শৃঙ্গ ভার না থাকিলেও যেন লজ্জায় নত।

১৩ সূর্য্য যেন রাবণের অন্তঃপুর কামিনী-দিগের প্রসাদন কার্য্যে রত। কর—হস্ত, ও সূর্য্যরশ্মি। লঙ্কাপুরে গ্রীষ্মকালেও সূর্য্যরশ্মি প্রখর ছিল না। ১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

১৪ চন্দ্রোদয়ে মানিনী স্ত্রীর মান খণ্ডিত হয়।

১৫ একদন্ত গজানন-প্রসিদ্ধি।

১৬ পবন এই কৌশলে রাবণের প্রিয়পাত্র হইয়া বন্দী দেবগণের উপকার করিতেন।

১৭ সতর্কতা পরিচায়ক, সফণ সর্প সকল কৌটিল্যাদি নিজ স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছিল।

ধায় চারি দিকে, না ফিরিল আর—
'দিগ্‌গজ' এনাম করিল সফল।

( ৬৫ )

"বন্দী দেবাঙ্গনা নিশ্বাস পবনে
পাইত যে সুখ, কামুক রাবণ,
সচন্দন-জল মৃদুল ব্যজনে
হেন সুখ তার হ'ত না কখন।

( ৬৬ )

"যোগায়ে কুসুম সদা লঙ্কাপুরে
সেবিত তাহারে মিলি ঋতুগণ,
গ্রীষ্ম বরষায়, বসন্ত শিশিরে
হেমন্ত শরতে হইল মিলন। ১৮

( ৬৭ )

অমানব তুমি রাম রূপে তারে
জন্মিলা বধিতে, জেনেও সীতারে
না দিলা ছাড়িয়া মানী দশানন;
মানীর যে মান প্রাণাধিক ধন!

( ৬৮ )

"জনমিয়া তুমি দশরথ ঘরে
কাননে বনিতা-হারী দশাননে
বধিলা লঙ্কায়; চলোর্ম্মি সাগরে
বাঁধি মহাসেতু, পড়ে কিহে মনে?

( ৬৯ )

"ছলন-চতুর সেই দেব-অরি
নটপ্রায় এবে রূপান্তর ধরি ১৯
শিশুপাল রূপে জন্মিল ধরায়,
গোপি আত্মরূপ, চেনা নাহি যায়।

( ৭০ )

"শৈশবে তাহার ছিল ত্রিনয়ন।
চারি ভুজ আর পূর্ণেন্দু বদন;
প্রতাপে তপন এবে সে যৌবনে
পরাজিয়া তেজে সর্ব্ব রাজগণে।

( ৭১ )

"নিজ তেজে সেই দেবে কি দানবে
কৃপা ও পীড়ন করিতে সক্ষম,
গর্জ্জিয়াছে এবে রাবণাদি সবে
ইষ্টদেব-বরে যাদের বিক্রম। ২০

( ৭২ )

"জয়ী শিশুপাল বীর মদ ভরে
পূর্ব্বের মতন পীড়িছে ধরায়
সুস্থিরা প্রকৃতি জনম অন্তরে
ছাড়ে না পুরুষে সতী নারী প্রায়। ২১

( ৭৩ )

লঙ্ঘিয়াছে সেই বিধির শাসন;
পাঠাও তাহারে শমন-সদন;
নিজ পাপ-ফলে মরে হে দুর্জ্জন,
নিমিত্ত কেবল হন সাধুজন। ২২

( ৭৪ )

পূজিবেন তবে দেব পুরন্দর
অরিনাশে স্থির-হৃদয়ে আপন,

১৮ লঙ্কাপুরে চির-বসন্ত বিরাজমান।

১৯ পট পরিবর্ত্তনে যেরূপ অভিনয় হইয়া থাকে।

২০ রাবণাদির প্রতাপ ইষ্টদেবতার বর-মূলক ছিল। শিশুপালের বিক্রম নিজ তেজ-সম্ভূত, সুতরাং তাহা অধিক গৌরবের বিষয়।

২১ সতী স্ত্রী কদাপি স্বামীকে ত্যাগ করে না। পুরুষের পক্ষে প্রকৃতিও তদ্রূপ।

২২ সাধুব্যক্তি তজ্জন্য দায়ী নহেন।

প্রেমপুলকিতা শচী-সুধাকর
প্রেমের উচ্ছ্বাসে করি আলিঙ্গন।
( ৭৫ )
এ বলি উঠিলা ঋষি নভে শশী প্রায়,
তথাস্তু বলিলা কৃষ্ণ, রুষি শিশুপালে;
শত্রু-নাশ-হেতু কেতু ভৃকুটী রেখায়,
দেখাদিল যেন, রোষ-কলুষিত ভালে। ২৩

ইতি মহাকবি মাঘকৃত শিশুপাল-বধ
মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদ কৃষ্ণনারদ
সম্ভাষণ নামে প্রথমসর্গ।

শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।

# ব্রাহ্মণ-সমস্যা।

গত শ্রাবণ মাসের "আরতি" পত্রিকায় সুসঙ্গের মহারাজা শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ সিংহ শর্ম্মা মহোদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে যে সুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়,—তাঁহারা আমাদের শিরোভূষণ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, তাঁহারা যে ঘোরতর দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছেন, তাহা দেখিলে, কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির প্রাণে আঘাত না লাগে? প্রতি বৎসর পূজার কিছু পূর্ব্ব হইতেই, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, স্কন্ধে নামাবলী এবং মুখে দুই চারিটি সংস্কৃত শ্লোক সম্বল করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থ বহির্গত হন। এই ব্রাহ্মণগণের সকলেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে এইরূপ ভিক্ষার প্রণালী প্রচলিত আছে কি না, জানি না। যাহা হউক, উন্নতিশীল বিক্রমপুরের ইহা বড় গৌরবের বিষয় নহে। জগতের চক্ষে ভিক্ষুকের ন্যায় হেয় ব্যক্তি বুঝি আর দ্বিতীয় নাই। কোনও ব্যক্তি যে মুহূর্ত্তে ভিক্ষার্থী হইয়া অন্যের দ্বারে উপস্থিত হন, সেই মুহূর্ত্তেই, তিনি তাঁহার মনুষ্যত্ব হীনতার পরিচয় প্রদান করেন। পাশ্চাত্য প্রদেশে ভিক্ষুকের অন্য নাম Vagrant Vagabond;—এই জন্য ভিক্ষুকের আইনানুসারে দণ্ড হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও ভিক্ষুকগণ যে সাধারণের নিকট বড় সম্মান পাইয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় না। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতগণ এইরূপ ভিক্ষায় বাহির হইয়া পান কি?—কোথায়ও দুই আনা, কোথায়ও চারি আনা; প্রায় স্থলেই অর্দ্ধচন্দ্র। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার ত এই ভিক্ষাবৃত্তির সাথের সাথী—তা সে দুই আনা চারি আনা মিলিলেও। হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের এরূপ

২৩ কৃষ্ণের ললাটের ভৃকুটী রেখা শিশুপালের বিনাশসূচক কেতু রূপে লক্ষিত হইল

দুর্দ্দশা কোন ক্রমেই সমাজের কল্যাণকর নহে। তাঁহাদের এই দুরবস্থার অবসান না হইলে, কখনও হিন্দুসমাজের.উন্নতি হইবে না। পাশ্চাত্য প্রদেশে গরিব-সমস্যার (Poor problem) ন্যায়, আমাদের দেশে এই ব্রাহ্মণ-সমস্যা হিন্দু মাত্রেরই চিন্তনীয়।

ব্রাহ্মণগণ এই ঘৃণিতবৃত্তি অবলম্বন কেন করেন? এ প্রশ্নের একটি উত্তর ভিন্ন দুইটি উত্তর নাই। ইহার উত্তর হইতেছে,—দরিদ্রতা। কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণ ভিক্ষাকেই একটি ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য করেন। তাঁহাদের এই মত সমর্থনের জন্য, আবার শাস্ত্রের দোহাই দেন। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, এ কথা যেন শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কতদূর ভ্রান্ত! অবশ্য পূর্ব্বকালে ভিক্ষায়ই ব্রাহ্মণজীবনের একপ্রকার আরম্ভ এবং ভিক্ষায়ই উহার পরিসমাপ্তি হইত। ব্রাহ্মণ উপনয়নের সময় দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াই, "ভবতি! ভিক্ষাং দেহি!" বলিয়া ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া উপস্থিত হইতেন। আবার চতুর্থাশ্রমে উপস্থিত হইয়াও একমাত্র ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য এবং ভিক্ষুকাশ্রমে অবস্থান সময়ে ভিক্ষা দূষণীয় হইত না। প্রথম অবস্থায়, ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী; তখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে উদর পোষণের জন্য, অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। আজ কালও টোলের ছাত্রগণ গুরুগৃহে অন্নবস্ত্রাদি পাইয়া থাকেন। আবার সেই চতুর্থাশ্রমেও ব্রাহ্মণ বিষয়বাসনা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত। তাঁহার কর্ম্মশেষ হইয়াছে; তিনি সংসার-বন্ধন-মুক্ত হইয়া একমাত্র পর-ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার এইরূপ অবস্থায় উদর পোষণের জন্য অন্যের নিকট অগ্রসর হওয়া স্বাভাবিক। এই দুই অবস্থায়ই ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করা হিন্দু-সমাজের একটি গুরুতর দায়িত্ব। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেও যে, তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। যে ব্রাহ্মণ গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি জানিয়া শুনিয়াই নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের ভার নিজের ঘাড়ে লইয়াছেন। তখন বৈধ উপায়ে, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নিজের এবং স্ত্রী পুত্রাদির ভরণপোষণ করাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। ভিক্ষা করিয়া পরিবারের প্রতিপালন যে নিতান্ত ঘৃণিত, তাহা ভগবান্ মনু ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি "মৃত" বিশেষণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন।—("ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা"—৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক)। তিনি অন্য সদ্বৃত্তির অভাবে এই হেয় বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমী ব্রাহ্মণের ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য, এ কথা যুক্তিতে আসে না, শাস্ত্রেও পাই না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে বাহির হন, তাঁহাদের অধিকাংশই গৃহী, কদাচিৎ কেহ বিদ্যার্থী।

ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণগণ সকলেই দরিদ্র। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের

দারিদ্র্য চিরপ্রসিদ্ধ। যাঁহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী, তাঁহাদের প্রায় কাহারও ভূসম্পত্তি নাই। প্রায় সকলেরই পৌরোহিত্য এবং গুরুতা ব্যবসায়। ইহাই তাঁহাদের উপার্জ্জনের একমাত্র পথ। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা সমধিক খ্যাতি-সম্পন্ন, তাঁহারা ধনী লোকের গৃহে শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে, নিমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন। আজ কাল পৌরোহিত্য এবং গুরুতায় আয় নিতান্ত কম হইয়া পড়িয়াছে। অনেক গৃহস্থ আজ কাল পূজা অর্চ্চনা ছাড়িয়া দিয়াছেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় পূজা অর্চ্চনাদিতে অর্থ ব্যয় অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য করেন। তাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে,—'টাকা করা'—আর নিজেদের ও গৃহিণীদিগের বাবুগিরিতে কিছু কিছু ব্যয় করা। একজন সবজজের কথা শুনিয়াছি,—তিনি বেশী টাকা খরচ করিতে হইবে ভয়ে, মাতৃশ্রাদ্ধের জন্য ছুটী না নিয়া স্বীয় কার্য্য-স্থলে কলাগাছের খাট ইত্যাদি দ্বারা, মোটমাট পাঁচ টাকার মধ্যে, মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আর একজন উচ্চসমাজ-নিবাসী খুব উচ্চপদস্থ বাবুকে জানি। একদিন একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার নিম্ন লিখিত রূপে আলাপ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ বেলা দুই প্রহরের সময় সেই বাবুর বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য উপস্থিত। সে দিন বাবুটির কন্যার বিবাহ। বিবাহ অবশ্য খুব ধুমধামের সহিত হইবে।—সহরশুদ্ধ লোক তাঁহার বাসায় নিমন্ত্রিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বাবু! আমি কিছু ভিক্ষা চাই,—আমি ব্রাহ্মণ।"

বাবু বলিলেন,—"কি? আপনি ব্রাহ্মণ? এত বড় কথা? আপনি নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিতেছেন? আমি ত এই ভারতবর্ষের হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম হইতে কোয়েটা পর্য্যন্ত ঘুরিয়াছি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটিও ব্রাহ্মণের দর্শন পাই নাই।"

বাবুর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ত চক্ষু স্থির। তিনি সেখানে কিছু মাত্র পাওয়ার আশা নাই দেখিয়া উঠিয়া গেলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী একটি উকীলের বাসায় গিয়া আহার করিলেন।

আজ কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই হিন্দু নাম গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন না, যতক্ষণ তাহাতে পয়সা খরচের সম্ভাবনা না থাকে। আজ কাল ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা কম হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে অনুষ্ঠানকারী হিন্দুর সংখ্যা বাড়ে নাই। দীক্ষা গ্রহণ ত শিক্ষিত সমাজ হইতে একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। ইহার এক কারণ বিশ্বাসের অভাব, অন্য কারণ ব্যয়কুণ্ঠা। অনেকে বিবাহাদি ব্যাপারে ধুমধাম জাক-জমক করিয়া সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতেছেন; কিন্তু পুরোহিতের দক্ষিণার বেলায় তাঁহাদের হাত একেবারেই গুটাইয়া আসে। বিবাহে ব্যয় করিলেন হয় ত চারি হাজার টাকা, পুরোহিত পাইলেন মাত্র চারি টাকা, কি আট টাকা। ধনী ব্যক্তির ধন ক্রমশঃ স্তূপের পর স্তূপে পরিণত না হইয়া, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, দেশের মধ্যে কিছু কিছু ব্যয়িত হয়, এটা মন্দ কথা নহে। আমাদের

সমাজে পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়াই, পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায়, এখানে ক্রোরপতির বিলাস-ভবনের পার্শ্বেই দীনহীন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকের হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদ বড় বেশী শুনা যায় না। পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজারা মধ্যে মধ্যে রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। তদ্দ্বারা তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থরাশি সমাজের সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে, ন্যূনাধিক পরিমাণে, পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। তাহাতে দেশের অর্থরাশি ব্যক্তিবিশেষের গৃহে পর্ব্বত-প্রমাণে সঞ্চিত না হইয়া, সকল শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে, সুচারুরূপে বিভক্ত হইবার অবসর পাইত। ইহাতে অবশ্য দেশে ক্রোর-পতি কুবেরের সংখ্যা কম হয়, কিন্তু অন্য-দিকে আবার নিরন্ন দরিদ্র লোকের সংখ্যাও কমে। পাশ্চাত্য সমাজে অর্থবিভাগের এই-রূপ কোন সুব্যবস্থা নাই বলিয়াই, সেখানে গরিব লোকদিগকে লইয়া সমাজের মহাচিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। গরিবদল ক্ষেপিয়া উঠিয়া মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার অশান্তি, অত্যাচার, উৎপীড়ন, এমন কি সামাজিক বিপ্লব ঘটাইতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা কখনও হয় নাই। আমাদের গরিব শ্রেণীর জন্য কখনও এত ভাবিতেও হয় নাই। কিন্তু, এখন নানা কারণে,সেই ভাবনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা বলিতেছিলাম, বর্ত্ত-মান সময়ে, আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিরা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে অপরিসীম অর্থব্যয় করিয়া, সেই অর্থরাশি নানা শ্রেণীর শিল্পী ব্যবসায়ীর মধ্যে বাঁটিয়া দেন, তাহাতে সেই সেই শ্রেণীর উপকার হয় সত্য। * কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বেলায় তাঁহারা কৃপণতা করেন, ইহাই নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। এই সকল কারণে, পূর্ব্ববঙ্গবাসী ব্রাহ্মণগণ নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন।

এতদ্ভিন্ন জীবিকানির্ব্বাহ এখন বহুব্যয়-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। জিনিস পত্র সকলই দুর্ম্মূল্য। শুধু মোটা ভাত খাইয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করাই এখন কঠিন ব্যাপার হইয়াছে। এই সকল নিত্য আবশ্যকীয় খরচ ভিন্ন পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়, এ সকল আছে। ইহার কোন একটা দায় উপস্থিত হইলেই, এখনকে ঋণ করিতে হয়। তখন আবার ঋণ-দায় উপ-স্থিত হয়। এই রূপে অভাবের উপর অভাব উপস্থিত হইলে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে থাকেন। তখন কোথায় থাকে আত্মমর্য্যাদা, আর কোথায় থাকে মনুষ্যত্ব! তখনই ব্রাহ্মণ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভিক্ষার জন্য বাহির হন।

কেহ কেহ বলেন, সকল ভিক্ষুক ব্রাহ্মণই যে যথার্থরূপে অভাবগ্রস্ত এরূপ নহে, কা-হারও কাহারও অভাব কল্পিত। উহা এক-রূপ আত্মকৃত ব্যাধি। এ কথা কতক অংশে

* তবে কথা এই, দেশী শিল্পজাত দ্রব্য অপেক্ষা বিলাতী দ্রব্যের আদর অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে। সে জন্য এই সকল বিবা-হাদি ব্যাপারে দেশীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ীর আশানুরূপ উপকার হয়, এ কথা বলা যায় না।

সত্য হইতে পারে। যেমন হয়ত কোন অর্থশালী উকীল কিংবা হাকিমের কিংবা জমিদারের কন্যার গায়ে সোনার গহনা দেখিয়া, আমাদের পণ্ডিত ঠাকুরও তাঁহার মেয়েকে বিবাহের সময়, ঐরূপ এক সেট্‌ গহনা দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন। কোন ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহার পাড়ার কোন ধনী গৃহিণীর একখানা বোম্বাই শাড়ী দেখিয়া সেইরূপ একখানা শাড়ীর জন্য আবদার করিলেন; এবং ব্রাহ্মণও সর্ব্বদা মুখ ঝাঁক্‌টা খাওয়া, অসহ্য বোধ করিয়া, সেইরূপ একখানা শাড়ী কিনিয়া আনিয়া ব্রাহ্মণীর মানভঞ্জন করিলেন। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয়, এইরূপ কল্পিত অভাব এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচলিত হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই তাঁহাদের পূর্ব্বকালীন "Plain living and high thinking" অর্থাৎ সামান্যভাবে জীবনযাপন ও অসামান্য চিন্তাপোষণ, এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কথিত আছে, এক দিন নবদ্বীপের কোন প্রধান নৈয়ায়িকের পত্নীর হস্তে কুশের বলয় দেখিয়া নবদ্বীপাধিপতির রাণী উপহাস করিয়াছিলেন। তদুত্তরে সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী নিরতিশয় তেজের সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমার হাতের এই কুশের বালা যে দিন খসিয়া পড়িবে, সে দিন নবদ্বীপ আঁধার হইবে। সুখের বিষয়, এখন পর্য্যন্তও পণ্ডিতগণের গৃহে এইরূপ তেজস্বিনী রমণীর অভাব ঘটে নাই। বিষয়ী বিলাসশীল লোকদিগের অনুকরণে যৎকিঞ্চিৎ বিলাসিতা কোন কোন ব্রাহ্মণের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু তাহা একটু সংযম ও দৃঢ়তার অভ্যাসেই সংশোধিত হইতে পারে। কিন্তু যে অভাবের মূলে চির-দরিদ্রতা তাহা দূর করিবার উপায় কি?

কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিক্ষাবৃত্তিকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন; এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ভিক্ষা করিতে না হয়, সে জন্য তাঁহাদের ছেলেদিগকে ইংরেজী পড়াইয়া চাকরী বা ওকালতী প্রভৃতি বৈষয়িক কার্য্যে প্রবেশ করাইতে ইচ্ছা করেন। দরিদ্রতা নিবারণের এই উপায় প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। কারণ, ইহার মূলে আত্মনির্ভরতা রহিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা ইহার সমর্থন করিতে পারি না। এ ব্যবস্থা কিরূপ?—না, রোগ-যন্ত্রণা নিবারণের জন্য আত্মঘাতী হওয়ার মত! ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান ইংরেজী পড়িয়া যেই বিষয় কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেন, অমনিই তিনি আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থাকিলেন না; তিনি সম্পূর্ণ আর এক শ্রেণীর পদার্থে পরিণত হইলেন! বিষয় কর্ম্মে প্রবেশ করিলে, তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা ঘটিতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যগতিকে তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহার ফলে, অল্প দিন মধ্যে, আমরা দেখিতে পাই, যিনি ছিলেন সংযমপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সরলপ্রকৃতি, উদার-হৃদয়, ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ, তিনি হইলেন যথেচ্ছচারী, মিথ্যাবাক্, খলস্বভাব, সংকীর্ণমনাঃ, নাস্তিক বিষয়ী। ইহাকে আত্মহত্যা বলিব না, তবে

কি বলিব? প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানেরই সেই মহামূল্য ভগবদুক্তি স্মরণ করা কর্ত্তব্য— "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" স্বধর্ম্মে থাকিয়াও, তাঁহারা ভিক্ষা না করিয়া মোটা ভাত মোটা কাপড়ে চলিতে পারেন,—যদি তাঁহারা তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত না হন,—যদি তাঁহারা তাঁহাদের স্বধর্ম্মে প্রকৃতই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

ব্রাহ্মণ, আপনি কে তাহা ভুলিয়াছেন কি? সমগ্র পৃথিবী যখন অজ্ঞান-তিমিরের ক্রোড়-দেশে সুষুপ্ত ছিল, তখন কে জ্ঞানালোকের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া জগজ্জনকে প্রথম জাগাইয়াছিল? কাহার জ্ঞানালোক-ভাতি পূর্ব্বগগনে সভ্যতার তরুণ-অরুণচ্ছটা বিকিরণ করিয়াছিল? কাহার তপঃসিদ্ধ মানস-আকাশে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের পাবক-শিখা স্বতঃপ্রস্ফুরিত হইয়া সমগ্র জগৎ আলোকিত করিয়াছিল? ব্রাহ্মণ, আপনার পূর্ব্বগৌরব একবার স্মরণ করুন। আপনি যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বশিষ্ঠ, শুক, সনকাদি ব্রহ্মকল্প ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষিগণের বংশধর, তাহা একবার স্মরণ করুন। যে তপঃ-প্রভাবে, এক সময়ে, রাজাধিরাজের কনক-কিরীট আপনার কুটীরবাসী পূর্ব্বপিতামহ-গণের চরণ-রেণু চুম্বনে কৃতার্থ হইত, সেই তপোমহিমা একবার স্মরণ করুন। আপনার এখন অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, স্বীকার করি; কিন্তু এখনও আপনার অন্তরে যে মহামূল্য বস্তু লুক্কায়িত আছে, তাহা জগতে আর কোন জাতির মধ্যে নাই। তাহা কি?—না তপস্যা। আপনার সেই সকল পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মগণের তপোবল বংশ-পরম্পরা ক্রমে আপনার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। সত্য বটে, সেই মহাবস্তু এখন বিনা যত্নে, বিনা অনুশীলনে আপনার মধ্যে লুপ্ত প্রায় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে বস্তু যে এখনও আপনার মধ্যে রহিয়াছে, তাহার কোন ভুল নাই। কেন না, তাহা না থাকিলে আপনার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হইবে কেন? দীপ্ত-কান্তি কনক-কণা এখন আবর্জ্জনারাশির মধ্যে পড়িয়া মলিন হইয়া রহিয়াছে। এখন অনুশীলন-অগ্নিতে দগ্ধ করিলেই, উহার দীপ্তি আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ এখন চিরসঞ্চিত ভস্মরাশির তলে পড়িয়া লুকাইয়া আছে। এক ফুৎকারে ভস্ম উড়াইয়া ফেলিয়া, উহাকে জ্বালাইলেই আবার সেই অগ্নিশিখা, হোমাগ্নির ন্যায়, আকাশ ভেদ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিবে। আপনার সেই তপোবল সাধনা দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হইলেই, আপনি আপনার স্বপদে, স্বগৌরবে, স্বধর্ম্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। এখন আপনি যে সকল বিষয়ী লোকের নিকট ভিক্ষার জন্য যাইয়া পদে পদে লাঞ্ছিত হইতেছেন, তখন আবার তাঁহারাই আপনার কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য, আপনার শরণাগত হইবেন—তখন আবার তাঁহারাই আপনার চরণ-তলে উপবিষ্ট হইয়া বলিবেন।—

"অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি!"

তখন আপনি আবার সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাযোগী দণ্ডাচার্য্যের মত, এলেক্

ভাণ্ডারের ন্যায় মহারাজচক্রবর্ত্তীর রাজপ্রাসাদকেও উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন!

আমি যে তপস্যার কথা কহিতেছি, তাহার সাধনের জন্য দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ করিতে হইবে না। পুত্র কলত্রাদি ত্যাগ করিয়া বনগমন করিতেও হইবে না। ব্রাহ্মণের সহজাত ধর্ম্মই সেই তপ। গীতার ১৭শ অধ্যায়ে তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

দেবদ্বিজ গুরু প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে ॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥
মনঃ প্রসাদং সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাব সংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥"

এই তপ ত্রিবিধ;—কায়িক, বাচিক, ও মানসিক। দেব, দ্বিজ, গুরু, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সৎকার, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা ইহাই কায়িক তপস্যা। লোকের মনে যাহাতে কষ্ট না হয়, এরূপ সত্য অথচ প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগ এবং বেদাভ্যাস, ইহাই বাচিক তপস্যা। আর চিত্তের সন্তোষ, সৌম্যতা, মৌনভাব, আত্মসংযম ও ভাবশুদ্ধি ইহাই মানসিক তপ। কেবল ব্রাহ্মণের কেন, হিন্দুসন্তান মাত্রেরই এই ত্রিবিধ তপঃসাধন করা কর্ত্তব্য। এই তপস্যাই চরিত্রগঠনের উৎকৃষ্ট ভিত্তি। আজ কাল স্কুল কলেজে নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য কত কত লোক মাথা ঘামাইতেছেন। আমার বিবেচনায়, এই তিনটি শ্লোকে যে যে কর্ত্তব্য সূচিত হইয়াছে, তাহা অভ্যাস করিলে, আর কোন নীতিশিক্ষার প্রয়োজন থাকে না। জগতের সমগ্র Moral philosophy,—নীতিবিজ্ঞান যাহা শিখাইতে না পারে, এই কয়টি কথার মধ্যে তাহা নিহিত রহিয়াছে। ফলতঃ এই তপস্যাই মনুষ্যত্বের মূলভিত্তি। ইহাই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ। এই তপস্যাহীন হইয়া ব্রাহ্মণগণ বিষহীন সর্পের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তপোধর্ম্মের অনুশীলন করিলে, আবার তাঁহারা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাঁহাদের দারিদ্র্যদুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুসমাজের এখনও এতদূর দুরবস্থা ঘটে নাই যে, তাঁহারা প্রকৃত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিতে পারেন। এই ঘোর নাস্তিকতার দিনেও হিন্দুসন্তান ব্রহ্মনিষ্ঠার আদর করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। এখনও সমাজে ধর্ম্মশাস্ত্র উপদেষ্টার যথেষ্ট আদর আছে, এখনও ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে, হিন্দুসন্তানগণ দলে দলে তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন। ব্রহ্মপ্রবণতাই হিন্দুচিত্তের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ-লাভের বীজ সেই ব্রহ্ম-প্রবণ-চিত্তে নিহিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ চেষ্টা করিলেই সেই বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তাহা হইতে অমৃতময় ফল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

আজকাল দেশ মধ্যে ইংরেজীশিক্ষার ন্যায় সংস্কৃত শিক্ষার স্রোতও প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এখন ব্রাহ্মণ সন্তানগণ দলে দলে টোলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করিতেছেন। ইহা বড়ই আনন্দের

বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে তপঃসাধনাও করিতে হইবে। যাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের এখন সময় অতীত হইয়াছে; তাঁহাদিগ হইতে কোন আশা নাই। তাঁহারা ভিক্ষা করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবেন। কিন্তু নব্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে অনুরোধ করি।—

(১) বিনা আহ্বানে কাহারও দান পরিগ্রহ করিব না।

(২) পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা না থাকিলে, দারপরিগ্রহ করিব না।

(৩) তপঃসাধনে যত্নশীল হইব।

ব্রাহ্মণ সন্তানগণ এই তিনটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাহা পালন করিতে যত্নশীল হইলে, আবার এ দেশে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আবার ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট আদর্শে সমগ্র হিন্দুজাতি গৌরবান্বিত হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

# আমার স্বপ্ন।

## ( ক্ষুদ্র গল্প )

( ১২ )

নসীরাম ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, —"এখানে দেঁড়্য়ে ভাব্‌চা কি? চল এই ব্যালা যেয়ে ছোট নাতনীকে আবার তোমাকে দ্যাখয়ে দিই। এবারড়া তাকে ভাল করি দ্যাখ্‌লে, দ্যাখ্‌বো কেমন করি আবার তুমি পেলয়ে যাও! এস মোর সঙ্গে এস। তোমারি তো ঘর বাড়ী। তবে অমন চোরের মত কি দ্যাখ্‌চা?"

আমি নসীরামের সঙ্গে চলিলাম। নসীরাম আমাকে একটি দোতালা ঘরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল,— "এইখানে, এই জান্‌লাডার পাশে চুপ ক'রে দেঁড়্য়ে থাক।" আমি সে সময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি, যেন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, নসীরাম যেমন বলিল, তেমনই করিলাম। সে আবার আমাকে বলিল,—"অই জান্‌লাডার মধ্য দিয়ে দ্যাখ! ছোট নাতনী আর বড় নাতনী দুজনেই বোসে রয়েছে।" আমি দেখিলাম, দুই জন রমণী সম্মুখের প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া কথোপকথন করিতেছে। দুজনেরই পিঠ আমার দিকে ছিল। সুতরাং তাহাদের মুখ দেখিতে পাইলাম না। তবে এইমাত্র বুঝিতে পারিলাম, দুজনেরই রঙ্‌ বড় পরিষ্কার, দুজনেরই বড় বড় কালো চুল, আর দুজনেরই গঠন বড় সুন্দর, আর সম্ভবতঃ দুজনেরই গঠনের মত মুখও সুন্দর।

তবে দুজনের মধ্যে এই একটা প্রভেদ দেখিলাম যে, এক জন কিছু স্থূলাঙ্গী, অপরা কৃশাঙ্গী। স্থূলাঙ্গী রমণী বলিতেছিলেন,—"তোর গুমোর রাখ্ উষা, আর একটা গান গা। গাইতে জানিস্ ব'লে বুঝি এমনি ক'রে গুমোর ক'র্‌তে হয়। কত সাধ্যি-সাধনার পর একটি গান ক'র্‌লেন, আর অমনি ওঁর মাথা ধ'র্‌লো?"

অপর রমণী বলিল,—"না দিদি! মাইরি ব'ল্‌চি! আজ আমার বড় মাথা ধ'রেছে!"

"তা মিথ্যে কথা কেন বল্‌চিস্ যে মাথা ধরেছে? পষ্ট কথা বল্‌লেই তো হয় যে, তোর বিরহ জ্বালা ধরেছে! এতক্ষণ তোর বর আস্‌বে বলে আশা ক'রেছিলি, সে এখনও এল না, তাই প্রাণটা ছট্‌ফট্ কর্‌চে! কেমন?—এখন মনের কথাটা টেনে বার করেছি কি না? আমার কাছে আবার উনি উড়্‌চেন? বলি ওলো, হাজার হোক, আমি তোর চেয়ে দু বছরের বড়। তা যা হোক, আমার নাতি ছোঁড়াটা কি অরসিক? এত দিন পরেও যদি আজকের দিনটায় এমন বাদলার সময়টায় ছোঁড়া এসে পড়্‌ত।"

"যাও দিদি, তোমার কেবল ঠাট্টা। আর ওসব ফাঁকা ঠাট্টা রোজ রোজ ভাল লাগে না বল্‌চি! যাও এখন! বোস্‌জা মশার ঘুম ভাঙ্গবার সময় হ'য়েছে। এখন একবার তাঁর কাছে যাও।"

"তোর সে জন্যে অত মাথা ব্যথা কেন বল্ দিকি? এখন আর একটা গান গা। আমার মাথা খাস্ উষা! তোর সেই পরীর গানটা একবার গা! ভাবনা কিলো? সে আজ না হয়, কাল নিশ্চয় আস্‌বে।"

কৃশাঙ্গী রমণীর অমৃতময় কণ্ঠ হইতে আবার গীতিধ্বনি উঠিল।—

সখি! সাধ আমার! *
এ জনমে যদি এ পাপ ধরায়, দেখিতে তাহারে
পাইরে আবার।
পরী হ'য়ে সখি! উড়িব আকাশে,
লইব তাহারে বাঁধি বাহুপাশে,
কলঙ্ক গঞ্জনা, বিরহ যাতনা,
রহিবে কোথায় আর?

হেরি মুখ তার, বাহু রাখি গলে,
সুধাকর-পাশে বসিয়া বিরলে,
মাখাব আদরে, তার সে অধরে,
সুধা রাশি অনিবার।

কলঙ্কী শশীরে কলঙ্ক সঁপিব,
বিনিময়ে তার সুধা চাহি লব,
চাঁদের আলোকে, প্রাণের পুলকে,
চুমিব বদন তার।

জাগিয়া স্বপন হেরিব দুজনে,
সুধাস্রোতে ভাসি পারিজাত বনে,
হাসিতে হাসিতে হরষিত চিতে,
পরাব সোহাগ হার।

কালো মেঘ যবে চাঁদেরে ঘেরিবে,
নিবিড় আঁধারে অশনি ডাকিবে,
সচকিত মনে, প্রেম আলিঙ্গনে,
লুকাব হৃদয়ে তার।

* রাগিণী বেহাগ,—তাল একতালা।

গীত শেষ হইবামাত্র রসিকবর বৃদ্ধ নসী-রাম একবার নিজের গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল "ওহো!—বলি ও ছোট নাতনি। একবার এই দিকে চেয়ে দ্যাখ, জান্‌লার আড়ালে দাঁড়ুয়ে, কেডা তোমাকে যে দ্যাখ্‌চে!"

"মর মিন্‌সে!" বলিয়া নসীরামের দুই নাতিনীই জানালার দিকে মুখ ফিরাইল। কি দেখিলাম!—আবার এ কাহাকে দেখিলাম!—দেড় বৎসর পূর্ব্বে যে মোহিনী মূর্ত্তি স্বপ্নে, সুপ্তাবস্থায়, কল্পনা-নয়নে, তারপর আবার জাগ্রতে, সচেতন দেহে, স্বচক্ষে, দেখিয়া পাগল হইয়াছিলাম, যাহার সঙ্গে মিলন অসম্ভব মনে করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, সেই স্বপ্নলোকের সুন্দরী, সেই আকাশের পরী, আজ আবার অবনীতলে! আবার দুজনে দুজনকে দেখিলাম! আবার সে দিনের মত দুজনের চারি চক্ষু মিলিল। আজ আবার সে চাহনীতে সে দিনের মত, যেন কত যুগ-যুগান্তরের প্রেম উথলিয়া পড়িল! আবার সে দিনের মত তাহার অধরে সেই মৃদুহাসি দেখা দিল! আজ আবার সে দিনের মত তেমনি করিয়া সে পরীর ন্যায় চঞ্চল চরণে, চলিয়া গেল! তখন তাহার পার্শ্বে যে রমণী বসিয়া ছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম! ইনি কে?—আমার মত মূর্খ আজ, এত-কাল পরে, জানিতে পারিল, ইনিই আমার নূতন চাঁদ্‌দিদি! চাঁদ্‌দিদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সহাস্যমুখে আমার নিকটে আসিলেন। আমি তাঁহার সেই সরল, সুন্দর, পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আমার মনে হইল, আমি কি নরাধম! আমি এত দিন ইহাকে কলঙ্কিনী মনে করিয়াছিলাম! এই পাপস্পর্শশূন্যা পবিত্রা রমণীকে আমি এত কাল পতির বিশ্বাসঘাতিনী রমণী মনে করিয়াছিলাম! জানি না, আমার পাপের জন্য কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে? চাঁদ্‌দিদি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন—"তাইত? এ আবার কি? আজ যে দেখ্‌চি আকাশের চাঁদ হঠাৎ একেবারে ভূতলে নেমে এল?"

আমি ভক্তিভরে, তাঁহার পদধূলি লইয়া, কর-যোড়ে বলিলাম—"আমার অপরাধ হয়েছে।"

চাঁদ্ দিদি হাসিয়া বলিলেন,—"শুধু অপ-রাধ হয়েছে ব'লে পাশ কাটাবে মনে ক'র্‌চ তা হবে না! শুধু কি একটা অপরাধ! যত অপরাধ ক'রেছ, তার এক একটি ক'রে দেখিয়ে দিব। তার সবগুলির তোমাকে জবাব দিতে হবে। আর সে সব অপরাধের কি কি শাস্তি হবে, তাও দেখ্‌তে পাবে। ছি ভাই! তুমি এমন অরসিক, আমি তো স্বপ্নেও তা মনে করি নাই। তুমি কিনা আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বে শুনে, আমার এই পরীর মত বোন্‌টিকে তোমাকে নজর দিব মনে ক'রে, আগে থাক্‌তে সাজিয়ে গুজিয়ে, মন্দিরে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌লেম। তার পর সে দিন কিনা সে একলা উঠানে গিয়ে তোমার সামনে দাঁড়ায়ে রইল। তুমি কি না তার সঙ্গে কথা কওয়া দূরে থাকুক, আমার সঙ্গেও একবার দেখা না

ক'রে একেবারে নিরুদ্দেশ হ'লে? তা ছাড়া আরও কত অপরাধ ক'রেছ, তাও সব এক একটি ক'রে ব'লব। তা এসব অপরাধের জন্য যে কত সাজা পেতে হবে তাকি জান?"

"যখন অপরাধ করেছি, তখন অবশ্যই সাজা পেতে হবে।"

ঠান্‌দিদি বলিলেন, "বেস কথা!" এখন খাওয়া দাওয়া কর, তারপর তোমাকে ডেকে নিয়ে আমি, উনি আর তোমার ঠাকুর দাদা এই ক'জন একত্র ব'সে, তোমার কোন্ অপরাধের জন্য কি সাজা দিতে হবে, তা ঠিক কর্‌ব। তবে আমি তোমার ঠাকুর দাদাকে জাগিয়ে দিই গে। তিনি ভাই! যে কুম্ভকর্ণের বর পেয়েছেন, কিলটা চাপড়টা না হ'লে, আর কিছুতেই তাঁর ঘুম ভাঙ্গে না।" নূতন ঠান্ দিদি সহাস্যমুখে, নিতাই দাদাকে জাগাইতে গেলেন। আমি আবার নীচে গিয়া নসীরামের আড্ডায় বসিলাম।

( ১৩ )

নসীরাম আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"বলি আজ আবার ভাল কোরে দেখ্‌লে তো? আবার তো পেল্যে যাবা না?" আমি বলিলাম,—"নসীরাম! এ সকল কথা তুমি আমাকে পূর্ব্বে কিছু না ব'লে মিথ্যা কথা ব'লে কেন অকারণ প্রবঞ্চনা ক'রেছিলে?"নসীরাম একটু গরম হইয়া বলিল,—"তুমি যখন স্যাই বাগানডার মধ্যে আস্‌লে, মুই তো তখনি সব কথা তোমাকে বল্‌লাম; আরও বল্‌লাম মোর নাতনীকে ভাল ক'রে দ্যাখে নাও। এখন নিজের দোষডা না ধোরে, মোরিই ঘাড়ে চাপ দোব! তুমি যে পেল্যে গিয়ে দ্যার বছর লুকিয়ে রইলে, স্যাও কি মোর দোষ নাকি?" নসীরামের সঙ্গে বৃথা তর্ক বিতর্কে কোন ফল নাই দেখিয়া, আমি বলিলাম—"কই, নিতাই দাদার তো এখনও দেখা নাই?"

"মুই তাঁকে ডেকে-আন্‌চি!" বলিয়া নসীরাম হুঁকো, কলকে লইয়া নিতাই দাদার নিকটে গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, নিতাই দাদাকে আমার এত দিনের বিচিত্র ব্যবহার সম্বন্ধে কি উত্তর দিব? আবার কিছু ক্ষণ পরেই যখন ঠান্‌দিদির নিকটে গিয়া, আমার সমস্ত অপরাধের এক একটি করিয়া কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, তখনই বা তাঁহাকে কি বলিব? সে সকল অপরাধের তো কেবল একটি মাত্র উত্তর। ঠান্‌দিদিকে আমি সে উত্তর কেমন করিয়া শুনাইব? কিছু ক্ষণ পরে নিতাই দাদা নসীরামকে সঙ্গে লইয়া নীচে আসিলেন। আমি বাল্যকাল হইতেই নিতাই দাদাকে দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু আজিকার মত তাঁহার শুষ্ক ও বিষণ্ণ মুখ আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই! আমার বাল্যকাল হইতে, তিনি আমাকে দেখিতে পাইলে, আমাকে সহর্ষে আলিঙ্গন করিয়া, কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কত কথায় আমাকে কতবার, কত রকম বিদ্রূপ করিতেন! কত কথায় আমাকে কত রকম সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন! আজ তিনি আমাকে দেখিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন;——

"সতীশ যে! কতক্ষণ আসা হ'য়েছে?" আমি বলিলাম,—"এই বারটার গাড়ীতে। আমি আপনার নিকট অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি। কিন্তু তার কারণ জান্‌তে পার্‌লে, আপনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন!"

নিতাই দাদা আবার গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"সে সকল কথা আমাকে বল্‌বার কোনও আবশ্যক নাই। যা কিছু বল্‌তে হয়, তোমার ঠান্‌দিদিকে বলিও। আমি জানি, তোমার দোষ নয়, আজ কালকার ইংরেজী শিক্ষার দোষ!" সেই রাত্রিতে নিতাই দাদার সঙ্গে একত্র আহার করিতে বসিলাম। ঠান্‌দিদি পরিবেশন করিতে লাগিলেন। তখনও তিনি একটি কথাও বলিলেন না। কেবল একবারমাত্র ঠান্‌দিদিকে বলিলেন,—"এত সাধ্য সাধনা ক'রে তোমার নাতিকে আনালে, তা দেখিও, আবার যেন পালিয়ে না যায়!"

ঠান্‌দিদি সহাস্যমুখে বলিলেন,—"তোমার সে জন্য ভাবনা ক'র্‌তে হবে না। আমি, আর আমার নাতি, আমরা দুজনে সে সব বোঝা পড়া ক'রে নিব! কি বল ভাই নাতি?"

( ১৪ )

সে রাত্রিতে আমার ঘুম হইল না। হর্ষ ও বিষাদের চিন্তায় সমস্তরাত্রি কাটিয়া গেল। এতদিন পরে, আমার সে অপূর্ব্বস্বপ্ন সত্য হইবে! আমার সাধের পরী এখন আমার হইবে! আবার নিতাই দাদার কথা মনে করিয়া অনুতাপে আকুল হইলাম। তিনি যে আমার উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাঁহার এত কালের এত স্নেহের, এত অকৃত্রিম ভালবাসার কি উপযুক্ত প্রতিদানই আমি তাঁহাকে দিয়াছি! তবে হয় ত তাহার কারণ জানিতে পারিলে, তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তিনি ত সে সকল কথা শুনিবেন না। ঠান্‌দিদিকে বলিতে হইবে! কিন্তু কেমন করিয়া,—লজ্জা ও ঘৃণায় জলাঞ্জলি দিয়া, ঠান্‌দিদির নিকট সে সকল কথা বলিব? তিনি শুনিয়া কি মনে করিবেন? কত লজ্জিতা হইবেন! কিন্তু তাহা বই আর ত কোন উপায় নাই! অবশেষে অনেকক্ষণ ভাবিয়া স্থির করিলাম, মনকে দৃঢ় করিয়া লজ্জা ও ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া, নিতাই দাদার অকৃত্রিম স্নেহের ও সত্যের অনুরোধ পালন করিব! অকপটপ্রাণে, আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ঠান্‌দিদিকে বলিয়া দিয়া তাঁহার নিকট ও তার পর নিতাই দাদার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব।

আমি জানিতাম, আমি নিজে গিয়া, কোন কথা না বলিলেও, ঠান্‌দিদি, নিশ্চয়ই কোন না কোন সময়ে, আমার অপরাধ সম্বন্ধের বিচারে প্রবৃত্তা হইবেন। কখন তিনি আমাকে হাজির হইতে বলেন, জামিন মুক্ত আসামীর ন্যায়, আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। জানিতে পারিলাম, প্রভাতে তিনি গৃহ কাজে ব্যাপৃতা ছিলেন, সেই জন্য অবকাশ পাইলেন না। দুই প্রহরের পর,

আহারাদি সমাপন করিয়া, একাকী বসিয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ উপরের বারাণ্ডার উপর অলঙ্কার শিঞ্জন শব্দ শুনিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, ঠান্‌দিদি অবগুণ্ঠনবতী উষার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠান্‌দিদি আমাকে বলিলেন "বলি ওখানে একলা ব'সে কি ভাব্‌চো? উষা যে একবার ভাল ক'রে, তোমার কাছে ব'সে, তোমাকে দেখ্‌বে ব'লে তোমাকে ডাক্‌চে!" উষা ঠান্‌দিদির নিকট হইতে পালাইবার অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু তাঁহার হাত ছাড়াইতে পারিল না। আমি তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঠান্‌দিদি বলিলেন,—"এখানে দাঁড়্‌য়ে থাক্‌লে তো হবে না। এই ঘরের ভিতর চল। তোমার সঙ্গে আমাদের দুজনের অনেক কথা আছে। আর তোমার সমস্ত অপরাধের এক একটি ক'রে জবাব দিতে হবে, মনে আছে তো?" আমি ঠান্‌দিদির সঙ্গে কক্ষের ভিতরে আসিলাম। তিনি উষার হাত ধরিয়া একটা পালঙ্কের উপর বসিলেন এবং উষাকে তাহার নিকটে বসাইয়া তাহার হাত ধরিয়া রাখিলেন। উষা তাঁহার হাত ছাড়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু ঠান্‌দিদি কিছুতেই ছাড়িলেন না দেখিয়া, সে ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া লইয়া মুখ হেঁট করিয়া, চুপ্‌ করিয়া বসিয়া রহিল।

ঠান্‌দিদির আদেশমত আমি সম্মুখবর্ত্তী অপর পালঙ্কে বসিলাম।

( ১৫ )

ঠান্‌দিদি আমার দিকে চাহিয়া, মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন।—

"তবে এখন ভাই! এক একটি ক'রে তোমার অপরাধ শুনিব কি জবাব দিবে, দাও। প্রথম অপরাধ আমি তোমাকে তোমার ঠাকুর দাদারে দিয়ে কত অনুনয় বিনয় করে, তোমাকে দেখ্‌ব বলে, আর তোমার সঙ্গে দু'দিন আমোদ আহ্লাদ কর্‌ব বলে, মোহনপুরে আনালেম, আর তুমি আমার সঙ্গে দেখাও না ক'রে, পাল্‌য়ে গেলে! এর কি জবাব দিতে চাও, দাও। তার পর এক একটি ক'রে আর সব অপরাধের কথা বল্‌চি!"

আমি বলিলাম "আমার সমস্ত অপরাধের জবাব, একেবারে এক সঙ্গেই দিচ্চি!"

"সে তো বেশ কথা! তাতে ক্ষতি কি? কি বলিস্‌লো উষা? তা বল না কি জবাব দেবে? চুপ করে, ঘাড় হেঁট করে, ব'সে রইলে যে?"

আমি একটু অপ্রস্তত হইয়া, কি বলিয়া, কোন্‌ কথার, জবাব দিতে আরম্ভ করিব, চিন্তা করিয়া, ভূতলের দিকে চক্ষু রাখিয়া, আমার সমস্ত অপরাধের একসঙ্গে জবাব দিতে আরম্ভ করিলাম। যে দিন নিতাই দাদা আমাদের কলিকাতার বাটিতে গিয়া আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন,—তখন তাঁহার সঙ্গে আমার নূতন ঠান্‌দিদির সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম ও তাহার পরে যে স্বপ্ন দেখিলাম,

সেখান হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথা এক একটি করিয়া বলিতে লাগিলাম। আমার কাহিনী আরম্ভ হইলে, ঠান্‌দিদি প্রথমে অধর দংশন করিতে করিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্তিম হইল। ক্রমে তিনি হাসি বন্ধ করিবার জন্য অঞ্চলে মুখ বন্ধ করিলেন। ক্রমে আমার কাহিনী যত অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাসিও আরও বাড়িতে লাগিল। তিনি হাসি বন্ধ করিবার জন্য, মুখ মধ্যে অঞ্চল দিয়া, উষাকে দুই হাতে ধরিয়া, তাহার কাঁধের উপর মুখ রাখিলেন। উষা বন্ধন মুক্তা হইয়া, দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন ঠান্‌দিদি,—"তার-পর কি হ'ল?" বলিয়া আরও কয়েকটা কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে পালঙ্কে শয়ন করিয়া, বালিসে মুখ চাপিয়া, হাসি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তারপর মুখ চাপিয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিয়া উষাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন "ও উষা, এমন সব মজার কথা ছেড়ে, কোথায় পালালিলো? না ভাই ঢের হয়েছে, আর যে হাস্‌তে পারি না। আর তোমার জবাব দিতে হবে না। তোমার ঠাকুর দাদাকে কথাগুলো ঠিক এমনি ক'রে শুনাইও।"

ঠান্‌দিদি আবার হাসিতে হাসিতে নিতাই দাদার শয়ন-কক্ষের দিকে চলিলেন। আমি বলিলাম—"ঠান্‌দিদি, এখন নিতাই দাদাকে ওসব কথা ব'লে কাজ নাই।" ঠান্‌দিদি আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিতাই দাদার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের দ্বার খোলা ছিল। আমি বারাণ্ডা হইতে দেখিলাম, ঠান্‌দিদি সুষুপ্ত নিতাই দাদার পালঙ্কের এক পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠের উপর মুখ রাখিয়া কিছুক্ষণ সাধ মিটাইয়া হাসিলেন। তারপর হাসিরত হাসিতে নিদ্রিত নিতাই দাদার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন "বলি, ওঠ না ছাই, হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে যে দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। একলা আর কত হাস্‌ব?" পুনঃ পুনঃ চপেটাঘাতে নিতাই দাদার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন,—"কি হয়েছে? অত হাস্‌চ কেন?"

"এমন মজার কথা কখনও শোন নি।" এই কয়টা মাত্র কথা বলিয়া, ঠান্‌দিদি পূর্ব্বের মত নিতাই দাদাকে চাপড় ও কিল মারিতে মারিতে হাসিতে লাগিলেন। নিতাই দাদা আবার বলিলেন,—"কি হয়েছে, তাই বলই না ছাই!" কিন্তু ঠান্‌দিদির হাসিও থামে না, কিল চাপড়ও বন্ধ হয় না! আমি ঠান্‌দিদির কিল চাপড়ের ও হাসির শব্দ শুনিতে শুনিতে নীচে চলিয়া আসিলাম। কতক্ষণে ঠান্‌দিদির হাসি বন্ধ হইল ও কিল চাপড় থামিল, বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে, নিতাই দাদা বারাণ্ডায় আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বলি, ও হে ভায়া! পালয়ে গেলে কেন? একবার শীঘ্র এখানে এস। তোমার ঠান্‌দিদি তোমাকে ডাক্‌চে!"

( ১৬ )

আমি আবার উপরে বারাণ্ডায় গিয়া দেখিলাম, ঠান্‌দিদি নিতাই দাদার, পশ্চাতে তাঁহার কাঁধের নীচে মুখ রাখিয়া একহাত তাঁহার কাঁধের উপর রাখিয়া, অপর হাতে উষাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমার বোধ হইল, এখনও তাঁহার হাসি ভালরূপ বন্ধ হয় নাই। আমি সহর্ষে দেখিলাম, নিতাই দাদার মুখ কাল্‌ যেমন ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়াছিলাম, আজ আর সেরূপ নহে। তাঁহার চিরদিনের স্ফূর্ত্তি আজ আবার তাঁহার সরল কান্তি মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে! নিতাই দাদা সহাস্যমুখে বলিলেন,—"তবে সতীশ ভায়া! তোমার ঠান্‌দিদির জন্য যে এত ব্যাকুল হ'য়েছিলে, সে কথাটা এতদিন আমাকে জানাতে পার নি? আমি তা হ'লে তোমাকে কেমন সুন্দর উপায় দেখিয়ে দিতেম! তা এখনও রাজি হওত এস, একটা কাজ করা যাক্‌। আমি রাজি আছি, এখন তুমি রাজি হ'লেই হয়! কি বল?"

"কি কাজটা তাই বলুন না?"

"এস তবে বদলাবদলি করাযাক্‌! কি বল, রাজি আছ?" ঠান্‌দিদি নিতাই দাদার কাঁধ হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া বলিলেন "তাই তো! আশা তো কম নয়! না ভাই নাতি! তুমি ভাবনা করিও না! যে যার উপযুক্ত তার ভাগ্যে সেই রকম যুট্‌লেই ঠিক হয়। কথায় ব'ল্‌চি, দাঁড়কাক যদি মাকাল ফলটা পায়, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট; গাছপাকা আঁবটির দিকে তার লোভ হ'লে চ'ল্‌বে কেন? আমি ভাই! অনেক যত্নে, অনেক দিন হ'তে, পাকা আঁবটি তোমার জন্য তুলে রেখেছি; তা সে সব কথা এখন থাক, এখন তোমার ঠাকুর দাদাকে বল, আর দেরি না করে, দিনটা ঠিক করা হোক্‌।" নিতাই দাদা বলিলেন "তবে এই শ্রাবণ মাসে একটা দিন ঠিক থাক্‌। আমরা এই আষাঢ় মাসের শেষেই, সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে যাব, আর শ্রাবণ মাসে মোহনপুরে বিবাহ হবে।"

ঠান্‌দিদি নিতাই দাদার সম্মুখে আসিয়া, তাঁহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া, সরোষে, ভ্রূ-ভঙ্গি সহকারে, বলিলেন "তা বই আর কি! আ মরে যাই; কি কথাটাই ব'ললেন! শ্রাবণ মাসে ওঁর মোহনপুরে গিয়ে, তারপরে বিয়ে হবে; আমি ব'ল্‌চি শোন। দুদিন বড় জোর তিন দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে; দিন ঠিক কর্‌তে হয়, তো এই ব্যাগ পাঁজি দেখে নাও। সরস্বতীর কাছে এখনি লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে দাও। আর মেসো মশায়কে এখানে আসবার জন্য এখনি তারে খবর পাঠিয়ে দাও। আপনার কাজটির বেলা কেমন তাড়াতাড়ি; পরের বেলায় তা মনে থাকে না।"

নিতাই দাদা বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরের ভিতর হইতে পাঁজি লইয়া আসিয়া চশমা চোখে দিয়া দিন দেখিতে বসিলেন। আমি সেই অবকাশে বাহিরে আসিয়া, সহর দেখিবার জন্য মির্জাপুরের সুরম্য প্রস্তর-সৌধমালা-

শোভিত, গঙ্গাতীরে পদচারণা করিতে করিতে চলিলাম। হঠাৎ পকেটের মধ্যে হাত দিয়া দেখিলাম, কাশী হইতে আসিবার সময় যে আফিম আনিয়াছিলাম, তাহা এখনও পকেটে রহিয়াছে। গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিব বলিয়া আফিমের কৌটা হাতে তুলিয়া লইলাম। তখনি মনে পড়িল, অহিফেণ নিতাই দাদার বড়ই প্রিয় সামগ্রী। আবার সেই কৌটাটি পকেটে রাখিয়া দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, নিতাই দাদার নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, তিনি বড়ই ব্যস্ত। কাগজ ও দোয়াত কলম লইয়া, নসীরামকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কত রকম ফর্দ্দ লিখিতেছেন। আমি আফিমের কৌটা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন,—"দাদা! লাকটাকা দিলেও এত আহ্লাদ হ'ত না! আমি এইমাত্র আফিমের ডিবেটা খুলে দেখেছিলেম, আফিম সব ফুরিয়ে গিয়েছে! তোমার ঠান্‌দিদি পরশু রাত্রি এগারটার সময় বিবাহের দিন ঠিক্ কর্'লে! তা তোমাকে আজই আবার কাশীতে যেতে হবে! পরশু আবার বর সেজে, বর যাত্রীদিগের সঙ্গে ফিরিয়া এখানে আসতে হবে। এখানকার পাঁড়েজি এইমাত্র কাশীতে দুজন লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর গুণের কথা আর কত ব'ল্‌ব? তিনি বল্‌লেন, সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি নিজে কর্‌বেন। আজ থেকেই তিনি তাঁর বড় বাড়ীখানা বরযাত্রীদের জন্য আর বিবাহের আসরের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। বিবাহের পর ত্রয়োদশীর দিন প্রভাতে, আমরা সকলে বর কন্যা সঙ্গে নিয়ে কাশীতে তোমার মার কাছে যাব!" আমি পাঁড়েজিকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম। তিনি মির্জাপুরের অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত। তাঁহার মত অমায়িক, উদারহৃদয়, সত্যব্রত পরোপকার-প্রিয় ও মনস্বী সাধু ব্যক্তি এ জগতে অতি বিরল। তাঁহার প্রকৃত নাম কি জানি না, কিন্তু তাঁহার নানাগুণে মোহিত হইয়া সকলে তাঁহাকে "রাম অবতার" বলিয়া থাকে। তিনি এই বিবাহের সংবাদ পাইয়া, স্বয়ং স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সকল বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমি আবার কাশীতে ফিরিয়া গেলাম।

( ১৭ )

সেই আষাঢ়ের শুক্ল ত্রয়োদশীর প্রভাতের সঙ্গে আমার নবজীবনের প্রভাত হইল। সেই দিন যখন অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, উষা সস্মিত মুখে অবনী তলে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে, আমার অনন্ত জীবনের উষা-কমল পরিমলে প্রাণ পুলকিত করিয়া, আমার হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। সেই উষালোকে আমি ও আমার উষা নিতাই দাদা ও নূতন ঠান্‌দিদির সঙ্গে মার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার চারিদিকে রমণীগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, শঙ্খধ্বনি করিতেছিল। অনেক দিনের পর আজ আবার মার মুখে হাসি দেখিলাম। ঠান্‌দিদির আদেশ মত আমি ও উষা মাকে

প্রণাম করিলাম। মা প্রীতি-বিস্ফারিত নয়নে, উঁহাকে দেখিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া,সহাস্য মুখে তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। ঠান্‌দিদি মাকে বলিলেন,—"এই ক'দিন থেকে তোমার ছেলেকে কাণ মলা দিতে দিতে আমার হাতে কড়া পড়ে গেল, তবুতো ওকে ঠিক কর্‌তে পার্‌লেম না। অই ছাখ, গাঁট ছড়াটা এই কতক্ষণ শক্ত ক'রে বেঁধে দিলেম, আবার এখনি খুলে ফেল্‌চে।" ঠান্‌দিদি আমার কান মলিয়া দিয়া, আবার শক্ত করিয়া গাঁট ছড়াটা বাঁধিয়া দিলেন। নসীরাম এতক্ষণ কোথায় ছিল দেখিতে পাই নাই। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"ও বড় লাতনি, ও আবার কি কর্‌চো? গাঁট ছড়াটা খুলে দাও। নইলি বল্‌চি, ছোট লাতনী পরী হোয়ে, ছোট লাত জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আকাশির মধ্যে উড়ে যাবে।"

নসীরামের কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। সকলে হাসিতেছে দেখিয়া, নসীরামও হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাপ্ত।

# বাসুদেব দত্ত।

বাঙ্গালা দেশের কোন নদীর স্রোত কখনও উড়িষ্যায় যায় নাই। কিন্তু বঙ্গের প্রেমের স্রোত প্রবল তরঙ্গে উৎকল ভাসাইয়া দিয়াছে। জলের স্রোত নিম্নগামী। কিন্তু প্রেমের স্রোত উর্দ্ধ ও অধঃ সকল দিকেই সমান ছুটে। উচ্চ নীচ, ধনী নির্দ্ধন, জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপী পুণ্যবান্, কাহাকেও উপেক্ষা করে না। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যা নবদ্বীপ ভাসাইয়া, শান্তিপুর ডুবাইয়া, বারাণসী সিক্ত ও দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করিয়া, নীলাচলে যাইয়া পড়িয়াছিল। জল-স্রোত যেমন পরিণামে সমুদ্রেই মিলিত হয়, এই ভাব-স্রোতও তেমনি ভাব-সমুদ্র,—জগন্নাথে মিশিয়াছিল। কিরূপ ছুটাছুটি করিয়া, কিরূপ আঁকুপাঁকুর সহিত, কিরূপ প্রবলবেগে, সহস্র সহস্র নদী নালা এই স্রোতের সঙ্গে মিলিত হইয়া আপনাদিগকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া মিশাইয়া দিয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

মহাপ্রভু নীলাচলে লীলা করিতেছেন। শান্তিপুর ও নবদ্বীপের ভক্তগণের অবস্থা ব্রজবিহারী গোপাল-বিরহিত ব্রজরাখাল ও ব্রজগোপীগণের অবস্থার অনুরূপ হইয়াছে। পার্থক্য এই যে, ইহারা অনেকে মিলিয়া, বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া নীলাচলে যাইয়া, গৌরাঙ্গমুখ দর্শন করিতে পান এবং বৎসর অন্তে পুনরায় দর্শন করিবেন, এই আশায় দিন গণিয়া জীবন ধারণ করেন।

সেই মিলন ও বিদায়কালীন হর্ষশোকের কিসের সহিত তুলনা করিব?—যাঁহার যেরূপ সৌভাগ্য, তিনি তাহা হৃদয়ে তদনুরূপ অনুভব করিবেন। উহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার বিষয় নহে।

আজ বিদায়ের দিন। মহাপ্রভু একে-একে ভক্তগণের গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে কাঁদিয়া আকুল হইলেন। জনে জনে আপনআপন আবেদন নিবেদন প্রভুচরণে জানাইতেছেন। মহাপ্রভু বাঞ্ছাকল্পতরুরূপে প্রেমস্নেহ বিতরণ করিতেছেন। ভাব, শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে সকলের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। বাসুদেব দত্ত মহাশয়, ক্লেশপূর্ণ হৃদয় ও অশ্রুপূর্ণ নেত্র লইয়া প্রভুর চরণে একটি প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন,—"দয়াময়, জগতের পরিত্রাণ জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ, তোমাকে আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে অনায়াসে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইতে পারে। তুমিই ইহা পূর্ণ করিতে সমর্থ। জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। হে প্রভো, তুমি সর্ব্বজীবের পাপ-ভার আমার মস্তকে অর্পণ কর। জীবের পাপ লইয়া আমি নরক ভোগ করি এবং এইরূপে জগজ্জীবের ভবরোগ তুমি ঘুচাইয়া দাও।" *

মানব রসনায় কোন যুগে, কোন দেশে, কখনও এরূপ বাক্য উচ্চারিত হইয়াছে কি না, জানি না। এই বাক্য শুনিয়া স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইয়াছিল কিনা, বলিতে পারি না। কিন্তু শুক্তি যেমন স্বাতিনক্ষত্রের বারিবিন্দু সাগ্রহে টানিয়া লইয়া আপনি রত্নবতী হয়, বসুন্ধরা যে সেইরূপে সেইভাবে এই বাক্যবিন্দু পান করিয়া, সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাসুদেবের প্রার্থনার মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য্য বুঝিতে হইলে, কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবে। আমি একেএকে সে সমস্তের আলোচনা করিতে যত্ন করিব। আমরা যে সমস্ত কথা বলি, তাহার মধ্যে কতকগুলি বিচার ও বিবেচনা করিয়া বলি এবং কতকগুলি প্রাণের টানে বলিয়া ফেলি। প্রাণের টানে যাহা বলি, তাহাই প্রকৃত আমাদের কথা। আমাদের প্রকৃত ওজন পরিমাণ সেই কথায় লিখিত থাকে। বিচার ও বিবেচনা করিয়া যাহা বলি, তাহা আমাদের পোষাকী পরিচ্ছদ, তাহার কোনটা ধারকরা, কোনটা কৃত্রিম বা রংকরা। বাসুদেবের প্রার্থনা ধারকরা নহে। কারণ, তাঁহার

* জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার॥
করিতে সমর্থ তুমি হও দয়াময়।
তুমি মনে কর তবে অনায়াসে হয়॥
জীবের দুঃখ হেরি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা আমি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥
চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৫শ অঃ

পূর্ব্বে কেহ কখনও এরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। যোগিবর ঈশা, জগতের পরিত্রাণের জন্য নিদারুণ ক্রুশকাষ্ঠে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছেন। খৃষ্টীয় মণ্ডলীর এই বিশ্বাস যদি সত্যের প্রতিকৃতি হয়, তথাপি বাসুদেবের স্বার্থত্যাগের সহিত উহার পার্থক্য অনেক। পরের জন্য প্রাণ দেওয়া অতিশয় মহৎ কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব জাতির গৌরবের কথা এই যে, তাহাদের জাতীয় ইতিহাসে বিভিন্নদেশে বিভিন্নযুগে এরূপ মহৎ কার্য্যের দৃষ্টান্ত অপ্রচুর নহে। ভারত ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের দৃষ্টান্তও দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একটি কুকুরের জন্য স্বর্গভোগ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মহাকবি তাঁহার নায়ককে কি কঠোর পরীক্ষায়ই ফেলিলেন! কুকুর হিন্দুর অস্পৃশ্য অতি নিকৃষ্ট জীব। আবার সেই কুকুর অল্পকাল মাত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে এইরূপ একটি হীন প্রাণীকে পরিত্যাগ রূপ দোষ, অন্যদিকে স্বর্গলাভ, প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন ও বান্ধববর্গের সঙ্গলাভ, এই উভয় অবস্থার মধ্যস্থলে কবি তাঁহার নায়ককে দণ্ডায়মান রাখিয়া, মানবচরিত্রের বল পরীক্ষা করিলেন। মনে হয় যেন, একদিকে মত্ত হস্তী অসীম-বল শুণ্ড দ্বারা পদ্মকোরক ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে, অপরদিকে সুকোমল মৃণালসূত্র তাহাকে আপনার দিকে টানিয়া রাখিতে চাহিতেছে। মর্ম্মতত্ত্ব অতিশয় নিগূঢ়। মৃণালসূত্রের নিকট হস্তীশুণ্ড পরাস্ত হইল। সূত্রবলের নিকট করিবল হারি মানিল। রাজা যুধিষ্ঠির মানবইতিহাসের একস্তর ঊর্দ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহা কবি-কল্পনা মাত্র। কিন্তু কবিকল্পনাও ত একটা অনৈতিহাসিক বস্তু নহে। উহা ত মানবের মনোরাজ্যেরই ইতিহাস। মানুষের সুখ ও দুঃখ, হাস্য ও রোদনে অতি অল্পই প্রকাশিত হয়। সুখভরে বা দুঃখভারে হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে, বাহিরে যতটুকু উছলিয়া পড়ে, তাহারই আমরা বাহ্যস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। যদি ততটুকুকে মাত্র ইতিহাস বলি, তবে মানবজাতির ইতিহাস বস্তুটা বড়ই সামান্য হইয়া পড়ে। স্বর্গারোহণ পর্ব্বের অলৌকিক ত্যাগস্বীকার যুধিষ্ঠিরের কৃত প্রকৃত অনুষ্ঠানই হউক, অথবা ব্যাসের কবিকল্পনাই হউক, উহা যে তৎকালীন হিন্দুহৃদয়ের অপূর্ব্ব ইতিহাস, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ইহার সহিতও বাসুদেব দত্তের ত্যাগস্বীকারের পার্থক্য অনেক।

পৃথিবীতে যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সৎ বলিয়া সচরাচর পরিচিত। তাঁহাদের আচার আচরণ দেখিলে, মনে হয়, তাঁহারা যেন ইহকাল ও পরকালের মধ্যে একটা সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান রাখিয়া চলিতেছেন। তাঁহারা পর-হিত-ব্রতে ব্রতী হইয়া ইহকালের সমস্ত সুখ স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইতে দেখিয়াও, পারলৌকিক স্বার্থের এক

বিন্দু ঢালিয়া দিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহকাল তাঁহাদের ক্ষেত খামার, পরকাল তাঁহাদের গোলাবাড়ী। ইহকাল তাঁহাদের দোকান ঘর, পরকাল তাঁহাদের লোহার সিন্দুক। ইহকালের কার্য্যকলাপ দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া, পরকালের তহবিলে জমা দেওয়াই সমস্ত জীবন-ব্যাপারের চরম লক্ষ্য। কোন গৃহস্থ আপনার সুখের ষোল আনা বন্দোবস্ত রাখিয়া উদ্বৃত্ত বস্তুদ্বারা যদি পরের সেবা করেন, হৃদয়-রাজ্যে তাঁহার যে স্থান, পূর্ব্বোক্ত নীতিশীল ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের স্থান তাহা অপেক্ষা উচ্চতর কি না, বলিতে পারি না। আপন বাঁচাইয়া যাঁহারা পরোপকার করেন, সজ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, তাঁহাদের সেবাবৃত্তির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বণিগ্‌বৃত্তি লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু পরের অশ্রুজলে যাঁহাদের সমগ্র হৃদয় গলিয়া যায়, তাঁহারা ইহকাল পরকাল বিসর্জ্জন দিয়া ঐ অশ্রু মুছাইতে যত্ন করেন, অথবা তাঁহাদের কাতর প্রাণ ইহকাল পরকালের কথা ভাবিতেই অবসর পায় না। এইরূপ হৃদয়বান্ ব্যক্তিরাই নরলোকের দেবতা এবং বাসুদেব দত্ত মহাশয় এই দেবতাদিগের মধ্যে দেবরাজ।

বাসুদেবের প্রার্থনার গাম্ভীর্য্য ও মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে, আরও কয়েকটি কথা ভাবিতে হইবে। বাসুদেব যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি অদৃশ্য, অমুমেয়, তটস্থ লক্ষণাশ্রিত ঈশ্বর নহেন; তিনি বাসুদেবের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমান্ অন্তর্য্যামী ভগবান্। তিনি প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সংশয় বা অবিশ্বাস নাই। তিনি অন্তর্য্যামী; সুতরাং তাঁহার নিকট ছলনা বা কপটতা করার সাধ্য নাই। তিনি মূর্ত্তিমান্; সুতরাং এখনই "তথাস্তু" বলিতে পারেন। তিনি ভগবান্; সমস্ত শক্তিই তাঁহাতে আছে। অতএব জগজ্জীবের পরিত্রাণের জন্য বাসুদেবকে নরকে পাঠাইবার শক্তি তাঁহার আছে। এতটা বিশ্বাস লইয়া, বাসুদেব প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং বাসুদেবের প্রার্থনা একটা কথার কথা নহে। আজকালকার লোকেরা নরক বলিতে যাহা বুঝেন, বাসুদেব তাহা বুঝিতেন না। তিনি সে কালের লোক, চতুরশিতী সহস্র নরককুণ্ডে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। রৌরব, কুম্ভীপাক প্রভৃতির ভীষণ চিত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। বৈতরণীর অগ্নিময় স্রোত সন্তরণে পার হইতে হইবে, তিনি ইহা জানিতেন। এতটা জানিয়া শুনিয়া, বিশ্বাস করিয়া, বাসুদেব দত্ত জগজ্জীবের ক্লেশ নিবারণ জন্য আপনার প্রত্যক্ষদেবতার নিকট কাতরপ্রাণে নরক ভিক্ষা মাগিয়াছিলেন।

কে বলে বঙ্গবাসীর পশ্চাতে দেখিবার কিছু নাই? * কেবল বাহুবলই কি মানুষের

* রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কোন কোন প্রসিদ্ধ বক্তা বলেন, ইতিহাসে বাঙ্গালীর গৌরব করিবার কিছুই নাই। তাহার আশা সম্মুখে।

সর্ব্বস্ব? রাজনৈতিক স্বাধীনতাই কি মানবের সর্ব্বোচ্চ সম্পদ্? যদি তাহা না হয়, তবে বাঙ্গালার ইতিহাসে যাহা আছে, জগতের কোথাও আর তাহা আছে কি না, বলিতে পারি না। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ যে "অনর্পিতপূর্ব্ব" দেব-দুষ্প্রাপ্য ধন জগতে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা দুর্ভাগ্য বঙ্গবাসী আজিও তাহার রস আস্বাদন করিতে শিখিলাম না। রস-আস্বাদন ত দূরের কথা আজিও আমরা তাহার মর্ম্ম বুঝিলাম না!

জ্ঞানে ও ভক্তিতে, বৈরাগ্যে ও পরার্থপরতায়, পুণ্য ও প্রেমে, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতায় মনুষ্য কেমন করিয়া কল্পনাতীত অবস্থা লাভ করে, শ্রীগৌরাঙ্গ স্বাঙ্গোপাঙ্গ সহ অবতীর্ণ হইয়া লীলার ছলে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সেই উদ্বেলিত মহাসমুদ্রে যে অসংখ্য তরঙ্গ খেলিয়াছিল, বাসুদেব দত্ত তাহার একটি তরঙ্গ মাত্র। বঙ্গবাসি, যদি স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা, আত্মদান শিক্ষা করিতে চাও, চাহিয়া দেখ, তোমার পশ্চাতে বাসুদেব দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ হৃদয়কে আদর্শ করিয়া কঠোর তপস্যা কর, অহঙ্কার যশোলিপ্সা, সূক্ষ্ম-স্বার্থ-সাধনার হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়া তৎসমস্ত ভস্ম করিয়া ফেল। যদি বাসুদেবের শতাংশের একাংশ পুণ্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, জানিও তোমার দ্বারা অসম্ভব সম্ভব এবং স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। শ্রীমনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা।

# ভারতে কিসের অভাব?

ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোক-প্রাপ্ত নূতন সভ্য, অতীত ঊনবিংশ শতাব্দীকেই সভ্যতার চরম উন্নতির কাল মনে করিয়া, গর্ব্বে স্ফীত-বক্ষ হইয়া থাকেন। ভারতে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, গণিত, জ্যোতিষ, শরীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সঙ্গীত ও সাহিত্য প্রভৃতি বিদ্যা বর্ত্তমান সময়েই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস। যে ভারতে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি ষড়্দর্শন, বাল্মীকি ব্যাস এবং ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতির কাব্য, আর্য্যভট্ট ও বরাহ মিহিরের জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত, লীলাবতীর গণিতশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ এবং একমাত্র মুক্তির উপায় স্বরূপ যোগশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল; অপিচ বেদ, তন্ত্র, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র যে ভারতের অক্ষয় কীর্ত্তি, সেই প্রাচীন ভারতকে নগণ্য মনে করিয়া, বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যভারতকে চরমোন্নত বলিয়া নির্দ্দেশ করা, অদূরদর্শিতার পরিচয়, সন্দেহ নাই। প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতা এইক্ষণ অস্তগামী প্রভাকরের ন্যায়, স্তিমিতভাবাপন্ন। সুতরাং, খদ্যোতের ক্ষীণ জ্যোতিও আমাদের চক্ষে প্রখর মার্ত্তণ্ড দীপ্তি বলিয়া

অনুভূত হইবে, বিচিত্র নহে। যাঁহারা প্রাচীন ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান-গরিমা ও মহত্ব প্রভৃতি অনবগত, দিবালোক-ভীত পেচকের ন্যায়, তাঁহাদের এইরূপ দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? কথায় বলে, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"। এই মহৎ বাক্যটির ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে," বলিলেও কোন অংশে সত্যের অপলাপ হইবে না। পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে দেখিতে গেলে, প্রাচীন ভারতের উপমা স্থূল জগতে অতি বিরল। ভীষ্ম, আচার্য্য ও অর্জ্জুনের বীরত্ব, কপিলের দৈবী প্রতিভা, বশিষ্ঠের ক্ষমা ও বিশ্বামিত্রের তপোবল ভারতেই সম্ভবে। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক রাজা, শুকদেবের ন্যায় তপোবলসম্পন্ন সাধক, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ন্যায় বিশ্বাসপরায়ণ ভক্ত এবং শাক্য সিংহ ও শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহাপুরুষগণ ভারতেই অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়! সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী ভারতভূমি আজি অধঃপতিত, পাদ-দলিত ও সর্ব্বথা গৌরব-ভ্রষ্ট!

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা এইক্ষণ কালচক্রের আবর্ত্তনে বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছে। অধুনা বিদেশী সভ্যতাই আমাদের আদর্শ। প্রতীচ্য সভ্যতার অনুকরণই আমরা উন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করি। এখন বেদের পরিবর্ত্তে বাইবেল, দর্শনের পরিবর্ত্তে লজিক, গীতার পরিবর্ত্তে মিলের আদর সর্ব্বত্র। সংস্কৃত ভাষা-বারিধি মন্থন করিলে, কত অমূল্য রত্ন সংগৃহীত হইতে পারে, তৎপ্রতি ভ্রমেও আমাদিগের দৃষ্টিপাত ঘটে না। আমরা স্বজাতি-দ্রোহী ও স্বধর্ম্মদ্বেষী।—আমরা অমূল্য মণিমাণিক্য, ভস্মস্তূপ বিবেচনায় উপেক্ষা করিয়া কাচখণ্ড লাভের জন্য লালায়িত হই! শুধু ধর্ম্ম বলিয়া কথা নহে;—শিক্ষায়, দীক্ষায়, আহারে, পরিচ্ছদে, সভ্যতায় ও সামাজিকতার সকল বিষয়েই, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইয়া, পর-পদ-লেহনকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহা অপেক্ষা অভাবনীয় ঘটনা আর কি সম্ভবপর হইতে পারে? বিজিত জাতির মধ্যে এরূপ জেতার দোষভাগের অনুকরণের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। অনুকরণ মাত্রই দূষ্য নহে। ইউরোপীয়দিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, সাহস, অধ্যবসায়, একাগ্রতা অধঃপতিত ভারতবাসীর সর্ব্বথা অনুকরণীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অন্ধের ন্যায় গুণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া দোষের অনুকরণেই আমরা বিশেষ পটু। এই অনুকরণ-প্রিয়তার ফলে সমাজতরুতে বিষময় ফল ফলিয়াছে। আজ যদি প্রাচীন ভারতের কোন মহাত্মা প্রেতলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া, নব্য ভারত পরিদর্শন করেন, তিনি, বোধ হয়, চিনিতে পারিবেন না যে, আজিকার এই বৃটিশ ইণ্ডিয়াই সেই প্রাচীন ভারত; এবং নব্য বাঙ্গালী সেই আর্য্যকুল ধুরন্ধর মহাত্মাদিগের বংশধর। এ গভীর মর্ম্মবেদনা, হায়! জানাইব কাহাকে?

ভারতে কোন বিষয়েই অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ভারতের প্রকৃতি বিচিত্রময়ী। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ষড় ঋতুর এখানে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড-কিরণ, বর্ষার অবিরল বারিধারা, শীতের প্রচণ্ড হিমানী এবং বসন্তের মৃদুমন্দ মলয়ানিলে ভারত চির পরিসেবিত। কোকিল, পাপিয়া, ও শ্যামার সুমধুর-স্বর-লহরীতে ভারত-কানন প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত। ভ্রমর-গুঞ্জনে ভারতের প্রতি পুষ্পোদ্যান অহরহ গুঞ্জরিত। এরূপ স্থান আর কোথায় সম্ভবে? গ্রীষ্মপ্রধান, শীতপ্রধান এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ নিচয় ভারতে সখ্যভাবে আলিঙ্গন-বদ্ধ। যদি শৈত্য উপভোগ করিতে চাও, তবে হিমালয় ও নাইনিতাল প্রভৃতি স্থানে গমন কর। প্রাবৃটের নয়নাভিরাম শ্যামল-সৌন্দর্য্য ও সলিলপূর্ণ বসুন্ধরা দেখিতে হইলে, পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া আইস। এবং গ্রীষ্মের প্রখর মার্ত্তণ্ড-তাপ উপভোগে যদি বাসনা থাকে, তবে মান্দ্রাজ প্রদেশে গমন কর। দেখিবে, বৈচিত্র্য সত্বেও ভারতে প্রকৃতির শোভা কেমন মনোহারিণী! ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপ বার মাস কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন এবং বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাতে চির-অভিষিক্ত। সেখানে উজ্জ্বল নীলাকাশে সূর্য্যের প্রচণ্ডমূর্ত্তি প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময়ই স্ফূর্ত্তিহীন উজ্জ্বলতাহীন ধূসর বর্ণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে প্রকৃতির বিষাদ মাখা মূর্ত্তি প্রকট! এ দিকে, ভারতে উজ্জ্বল-নক্ষত্র-শোভিত-নীলাকাশ, নিদাঘের নবনীরদকান্তি ও শারদীয় শশধরের বিমল কৌমুদীতে দিগ্বলয় উদ্ভাসিত! প্রকৃতির এরূপ বিচিত্রতা আর কোথায় সম্ভবে?

ভারতভূমি শস্যশালিনী। নানা জাতীয় ফুল ফল ও গোধূম ধান্য প্রভৃতি শস্য সম্পত্তিতে চির শোভাময়ী। ভারত-উদ্যানে বিবিধ জলজ ও স্থলজ এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যবিশিষ্ট সুগন্ধি কুসুম এত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে যে, এরূপ কুসুম-সুষমা অন্য দেশের পক্ষে কল্পনার অতীত। সৌন্দর্য্যের তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমা সৃষ্টির ন্যায়, আতর ও গোলাপজল সৃষ্টির প্রথা বিলাসী মুসলমান বাদসাহদের সময়েই প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহাও ভারতের পুষ্পপ্রাচুর্য্যেরই নিদর্শন। এখানে নানা জাতীয় সুস্বাদ ও উপাদেয় ফল এরূপ প্রচুর পরিমাণে জন্মে যে, কেহ ফলমূল ভক্ষণেই সুস্থদেহে চিরজীবন অতিবাহন করিতে পারেন। কোন এক বৈদেশিক পর্য্যটক ভারতের প্রশংসা কীর্ত্তনচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, যে দেশের ভাগ্যে বিধাতা দুই টুকরা রুটী ও এক পেয়ালা জল বৃক্ষশিরে স্থাপন করিয়াছেন, সে দেশ সৌভাগ্যশালী নয় ত কি? শীত, গ্রীষ্ম ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশবাসিগণের বিবিধ প্রকার খাদ্য,—ফল, মূল ও শস্য প্রভৃতির ভারতে এরূপ প্রাচুর্য্য রহিয়াছে যে, আহার্য্য সংগ্রহের জন্য ভারতবাসিদিগের কদাপি অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। নানা জাতীয় উদ্ভিদ,—তরু, লতা, তৃণ, গুল্ম প্রভৃতি ভারত-কাননে এত অপর্য্যাপ্ত

পরিমাণে জন্মে যে, অভিধানের বনৌষধিবর্গ অনুসন্ধান করিলেও, এ দেশে অপ্রাপ্ত উদ্ভিদের সংখ্যা বড় অধিক দেখা যায় না। বস্তুতঃই ভারত, প্রকৃতির প্রিয় আবাস-ভূমি।

যাহার পাদ-মূল বিধৌত করিয়া গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি পূতসলিলা প্রবাহিণী তর তর ধারে প্রবাহিত,হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরি যাহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ রূপে অচল ও অটল ভাবে দণ্ডায়মান, যে ভারতে বদরিকাশ্রম, পঞ্চবটী, সিদ্ধাশ্রম ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি পুণ্যাশ্রম বিরাজমান, যে ভারত পৃথ্বীবিখ্যাত মহাত্মাদিগের পদচিহ্ন বহন করিয়া নীরবে তাঁহাদের যশোগানে নিরত, সে ভারত স্বর্গভূমি, ইহাতে আর কথা কি? অন্য দেশে নদী আছে—গঙ্গা নাই; পর্ব্বত আছে—হিমালয় নাই; পাখী আছে—কোকিল নাই; ফল আছে—আম্র নাই; ফুল আছে—গন্ধ নাই; ভাষা আছে—সংস্কৃত নাই; তীর্থ স্থান আছে—বারাণসী নাই; ভারতের সহিত কি সে সমস্ত দেশের তুলনা সম্ভবে? অন্য দেশে অতিথিশালা ও পান্থ-নিবাস নাই; দান ধর্ম্ম নাই; দীন ভিখারীর পক্ষেও মুষ্টি ভিক্ষা দানের ব্যবস্থা নাই; গুরুসেবা ও মাতৃসেবা নাই; সে দেশ কি পুণ্যভূমি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য? অন্য দেশে ঋষি তপস্বী নাই * যতি ব্রহ্মচারী নাই, দণ্ডী পরম হংস নাই, বিধবার ব্রহ্মচর্য্য নাই, সতীত্বের আদর্শ নাই, সে দেশ কি ভারতের সহিত উপমেয়? ভারতে এই সকলেরই পূর্ণ সমাবেশ। এই ধর্ম্মপ্রাণতার জন্যই ভারতভূমি অদ্যাপি স্বর্গভূমি বলিয়া গৌরবান্বিত।

সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব ভারতের বিলুপ্ত গৌরবের অন্যতম নিদর্শন। যে সঙ্গীতের মনোমোহিনী শক্তিতে জগৎ বিমুগ্ধ, যাহার বিলাস-বিহ্বলতা মদিরা অপেক্ষাও মত্ততাজনক, সেই সঙ্গীতের মূল উপাদান দুইটি;—স্বর-চাতুর্য্য ও শব্দ-চাতুর্য্য। যে কথা সামান্যতঃ বলিলে, কোনরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস হয় না, কণ্ঠভঙ্গীর গুণে তাহাতে প্রেম, বিরহ, শোক, বাৎসল্য, ভক্তি প্রভৃতি নানাভাব শত গুণে বিকশিত হইয়া পড়ে। এই কণ্ঠভঙ্গীর চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কাব্যে যেমন নবরস, সঙ্গীতে সেই-

* সুবিজ্ঞ লেখক অবশ্যই ইটালীর অন্তর্গত আসিসি-নগর-নিবাসী, জগৎপূজ্য ঋষি সেণ্ট ফ্রান্সিসের নামকীর্ত্তি এবং তপঃপদ্ধতির সমস্ত বিবরণ অবগত আছেন। পৃথিবীর বহু লক্ষ লোক অদ্যাপি তাঁহাকে দয়াধর্ম্ম ও দৈবী শক্তির অবতার বলিয়া পূজা করেন। কিন্তু ( Fancis dassisi ) ফ্রান্সিস্-ডাসিসি, অনার্য্য ঋষি-তাপসদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য লোক হইলেও, একমাত্র তাপস বলিয়া পরিচিত নহেন। তিনি যেমন উপাসনার সময়ে যোগ-জনিত আনন্দের অধ্যাত্ম-শক্তিতে দুই চারি হাত শূন্যে উত্থিত হইতেন, এবং মুমূর্ষু রোগীকেও স্পর্শ মাত্রে নবজীবন দান করিতেন, ইয়ুরোপের আরও অনেকে সেইরূপ যোগ-শক্তির অলৌকিক মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন। লেখক এই শ্রেণীর মহাতাপসদিগকে ঋষি কিংবা তপস্বী বলিতে সম্মত হইবেন না কি?——বান্ধবসম্পাদক।

রূপ স্বরবৈচিত্র্য। অর্থবোধক না হইলেও তাহাতে মানসিক ভাবের তরঙ্গ প্রবল-বেগে উচ্ছ্বসিত হয়। এই শব্দময় সুরের সমষ্টিই রাগ রাগিণী। এক একটি রাগিণী এক এক রূপ মানসিক ভাবের অভিব্যক্তি বিশেষ। এই গুলিরই শ্রেণী বিভাগ ও শৃঙ্খলা করিতে গিয়া ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা কত দূর নিপুণতার পরিচায়ক, সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের তাহা উপলব্ধির বিষয় নহে। দিবসে, নিশীথে, সন্ধ্যায়, কোন্ সময়ে কোন্ রাগিণীর আলাপ শ্রুতিসুখকর, তাহাও বিনির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে রাগ রাগিণী মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতেন। মেঘ মল্লারে বারিবর্ষণ ও দীপক রাগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত। এরূপ শ্রুত হওয়া যায়। এ কথাটি কল্পনা কলুষিত হইলেও প্রকৃষ্টতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। সুতরাং, সে কালে রাগ রাগিণীর চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছিল, বলিতে হইবে।

সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুতি বিদ্যা আর দ্বিতীয় সম্ভবে না। যে অমানুষিক ক্ষমতা বলে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই উদ্ভাবনী শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সঙ্গীত শাস্ত্র অতীব জটিল ও দুরবগাহ। অশিক্ষিত ও অদীক্ষিতের পক্ষে ইহার প্রবেশদ্বার লৌহ-অর্গল-বদ্ধ। প্রতিভাশালী ভিন্ন সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। সঙ্গীত-বিদ্যা ভারতের অক্ষয় কীর্ত্তি। মুসলমান রাজত্ব কালে ভারতের অধঃপতন হইয়া থাকিলেও সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তানসেন, শরী মিঞা, গোপাল নায়ক ও আমীর খসরু প্রভৃতি সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদগণ বিদ্বজ্জন-মণ্ডলি পরিবৃত আকবরের মহাসভা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের অসীমপ্রতিভাবলে রাগরাগিণীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সঙ্গীত সম্বন্ধে ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয়। অন্যান্য সভ্যতম দেশ ইহার প্রতিযোগিতা করা দূরে থাকুক, পদানুসরণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট।

অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন মানসিক ভাবের পরিস্ফুটতা জন্মে না; এবং ছন্দোবন্ধে গ্রথিত না হইলে, তাহা চিত্তাকর্ষক হয় না। সুতরাং শব্দচাতুর্য্যের জন্য অর্থযুক্ত ও ছন্দোনিবদ্ধ বাক্যের প্রয়োজন। ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়াই কাব্যের সৃষ্টি। এ স্থলে সঙ্গীত ও কাব্য এক সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গীত স্বরচাতুর্য্য ও শব্দ-মাধুর্য্যময়। সুতরাং কবিত্ব সম্বন্ধে কাব্য ও সঙ্গীত অভিন্নভাবাপন্ন। ভারতীয় সঙ্গীত বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বাই, খেম্‌টা, কলাবৎ, যাত্রা, কবি, পাঁচালী, হাফ্ আখড়াই, কীর্ত্তন, পরমার্থ বাউল সঙ্গীত ও হরি-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি কতরূপ সঙ্গীত ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ভারত সঙ্গীতের একমাত্র লীলাভূমি। ক্রমশঃ

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

# ছায়াদর্শন।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

### উপক্রম।

যাঁহারা বিগত বৈশাখের বান্ধব পড়িয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই, ফ্রেডারিক মিয়ার্স প্রণীত "Human Personality and Its Survival of Bodily Death." অর্থাৎ মানবীয় আত্মার পৃথগস্তিত্ব এবং উহার পারলৌকিক জীবন নামক বিখ্যাত গ্রন্থের কথা লইয়া মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়াছেন। আমরা মিয়ার্সের সেই চতুর্দ্দশ-শতপৃষ্ঠাত্মক বিশাল গ্রন্থের সমস্ত কথা বান্ধবের চারিটি পৃষ্ঠায় পাঠককে বুঝাইতে পারিব, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মিয়ার্স্, বহুসংখ্য বিজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে, বহু পরিশ্রমে, পারলৌকিক অস্তিত্বের যে সকল প্রমাণ-পরীক্ষিত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, আজি পাঠককে তাহারই একটি আমরা উপহার দিব। এ সকল বৃত্তান্তে উপন্যাসের রস-বৈচিত্র্য নাই,—পর-পর-ঘটনা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য-সৃষ্টিরও অবকাশ নাই। কিন্তু, আছে প্রামাণিক-তত্ব,—আছে তাদৃশ বিজ্ঞান-গ্রাহ্য অপরিহার্য্য কঠোর সত্য, যাহা অবিশ্বাসীর বুদ্ধিকেও, আপনার বলে, বিশ্বাসের দৃঢ়-ভূমিতে আকর্ষণ করিতে সমর্থ। এইরূপ একটি বৃত্তান্তও যদি সরল ও সত্য-প্রিয় ব্যক্তির হৃদয়ে একবার দৃঢ় মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে, তাঁহার মনে মানব-জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, কস্মিন্ কালেও, কোন প্রকার সংশয় থাকিতে পারে না;—মানুষ, দেহত্যাগের পর, দিগন্তবিস্তারিত অন্ধকারে মিশিয়া যায়, না সে তাহার অতীত-জীবনের ভাল ও মন্দ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মজনিত সুখ-দুঃখময়ী স্মৃতির বোঝা বুকে লইয়া, আর একটা প্রকৃত অথচ পৃথগ্বিধ জীবনে প্রবেশ করে, সে বিষয়ে চিত্তে কখনও আর কোনরূপ সন্দেহ প্রবেশ-পথ পায় না।

---

### আত্মিক-কাহিনী।

রুষের দুইটি ভূম্যধিকারীর কথা। এক জনের নাম ( M. N. G. Ponomareff ) পনোমারেফ; আর এক জনের নাম (Baron Basil Driesen.) বাসিল ড্রায়িসেন। পনোমারেফ বৃদ্ধ, ড্রায়িসেন প্রৌঢ় যুবা। উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পনোমারেফের প্রিয়তমা কন্যা বাসিলের প্রাণ-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী। কিন্তু সম্পর্কের এইরূপ নৈকট্য সত্বেও, উভয়ে বড় অসৌহার্দ্দ। পনোমারেফ তাঁহার জামাতাকে একবারেই ভালবাসিতেন না; এবং জামাতার উপর, বিনা কারণেও, বিবিধ দোষের আরোপণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এ অসৌহার্দ্দের কারণ কি? দুই-ই

ভূম্যধিকারী। সুতরাং দুইয়ের মধ্যে বিষয়-ঘটিত বিরোধ থাকা অসম্ভব নহে। দুই-ই উচ্চ পদবীরূঢ় সম্ভ্রান্ত সামাজিক,—সম্ভবতঃ কতকটা অভিমান-ভ্রান্ত। অভিমানের উত্তেজনাও অসৌহার্দ্দের কারণ হইতে পারে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, তাহা বাহিরে অপ্রকাশিত।

পনোমারেক দীর্ঘকাল হইতে নানা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি মুমূর্ষু, এবং তদীয় গ্রামীণ-নিকেতনে অবস্থিত। তিনি যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার আর বেশী সময় বাকী নাই, তখন পুত্র, কন্যা ও জামাতা প্রভৃতি সকলকেই সমক্ষে ডাকাইয়া আনিলেন। জামাতা ও কন্যা, কএক দিন পূর্ব্ব হইতেই, আপনাদিগের নগর-নিবাস পরিত্যাগ করিয়া, পনোমারেফের গ্রামীণ-প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারাও সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

পনোমারেফ, এ সময়ে, শান্ত সুস্থির ও সমাধিস্থবৎ। শরীর অতি অবসন্ন হইলেও, কণ্ঠে স্বর-স্ফূর্ত্তি আছে। তিনি একে একে পরিবারস্থ সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। জামাতা চির দিনই অপ্রীতিভাজন। কিন্তু তাঁহাকেও তিনি কাছে ডাকিয়া মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। যখন, এই ভাবে, জনে জনে, আশীর্ব্বাদ-বিতরণ পরিসমাপ্ত হইল, তখন তিনি কিছুক্ষণ নয়ন মুদিয়া নিষ্পন্দ পড়িয়া রহিলেন। এই যে তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন, আর উহা মর্ত্ত্য দেহে মেলিলেন না। তাঁহার শূন্য তনু শয্যায় পড়িয়া রহিল। তিনি হৃদয়ের রোষ, তোষ, অভিমান ও উচ্চ আস্পর্দ্ধা, এবং সুখ-সম্পদের অধিকার হইতে চির-দিনের তরে বিদায় লইলেন।

আমাদের এ দেশে যেমন কুল-পুরোহিত, ইয়ুরোপে সেইরূপ কৌলিক অথবা পারিবারিক ধর্ম্মযাজক। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত কুল অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিতই কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মযাজকের বিশেষ সম্বন্ধ। তিনি সেই কুল অথবা সেই পরিবারের নিয়ত উপদেষ্টা। পনোমারেফ-পরিবারেরও ঐরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মযাজক ছিলেন। তাঁহার নাম ( Basil Bajenoff ) বাসিল বাজিনফ। ধর্ম্মযাজক বাজিনফ, পনোমারেফের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া,—পরিবারস্থ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া, মৃতব্যক্তির পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে, মৃত্যুর দিবস হইতে নবম দিবসে, শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থা করিলেন।

বঙ্গীয় পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা একটু বেশী প্রাচীন কল্পের লোক, তাঁহারা, ইয়ুরোপের সুদূরপ্রান্তে, অনার্য্যজাতীয় অবরধর্ম্মা ভদ্র-পরিবারের মধ্যে, শ্রাদ্ধ-শান্তির কথা শুনিয়া, মনে মনে হাসিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে হাসিবার কোন কথা নাই। যাহা ঈশ্বরের সত্য, তাহা, এই অনন্ত জগতের সকল স্থলে, সকল জাতিরই সমান ও সার্ব্বভৌমিক সত্য। ঈশ্বরের চন্দ্র-সূর্য্য যেমন সকল জাতিকেই আলোক দান করে, ঐশী শক্তির অনুপ্রাণনাও সেইরূপ পৃথিবীর

সকল জাতিকেই ঐহিক ধর্ম্মে ও পারত্রিক সত্যে, অধিকার-ভেদে, শিক্ষা দান করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, পারলৌকিক অস্তিত্ব সকল ধর্ম্মেরই সার সত্য ; এবং যদিও হিন্দুই শ্রাদ্ধ-শান্তির প্রথম-পথ-প্রদর্শক, তথাপি কোন না কোনরূপ শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠান সকল জাতিরই অবশ্য-কৃত্য। যাঁহারা পরলোকে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সকল দেশেই, পরলোক-গত পিতা মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের শান্তি ও সদ্গতির জন্য, প্রার্থনা ও দানাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

পনোমারেফের পুত্র কন্যা, যাজক বেজিনফের উপদেশ অনুসারে, নবম দিবসেই শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন ; এবং নিকটস্থ বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী ও প্রজামণ্ডলীকেও শ্রাদ্ধস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া, আপনাদিগের পিতৃভক্তি ও উদারতার পরিচয় দিলেন। পাঠকের মনে আছে জামাতা বাসিল ড্রাম্বিসেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই, পনোমারেফের প্রাসাদে উপস্থিত। তিনি শ্রাদ্ধীয় বাসরের পূর্ব্ব দিবস, রাত্রি একটা হইতে দুইটার মধ্যে, তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীও সেই প্রকোষ্ঠেই শয়ানা, কিন্তু পৃথক্ শয্যায়। রাত্রি গভীর। চারি দিক্ নিস্তব্ধ। ড্রাম্বিসেন, শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, কিছুক্ষণ গস্পেল গ্রন্থ অর্থাৎ ইয়ুরোপীয়দিগের ধর্ম্মগীতা পাঠ করিলেন। তার পর, শয়ন-গৃহের দীপটি নিবাইয়া, নিদ্রা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু নিদ্রা, সে সময়ে, ড্রাম্বিসেনের নয়নে আতিথ্য গ্রহণ করিবার অবসর পাইল না। ড্রাম্বিসেন যেই দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শুইতে যাইতেছেন, অমনি কানে মনুষ্যের পদ-সঞ্চার-শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, চমকিয়া উঠিলেন। তিনি স্পষ্ট শুনিলেন, কে যেন চটি পায়ে দিয়া, ধীরে ধীরে হাঁটিয়া, তাঁহার শয়ন-গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। তিনি ডাকিলেন,—পরিস্ফুট-স্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওখানে কে?" কোন উত্তর নাই। একটা ম্যাচ-বাক্স নিকটে ছিল। তিনি তাহা হইতে একে একে দুইটা দীপ-শলাকা বাহির করিয়া লইয়া দীপ জ্বালাইলেন। গৃহ যখন আলোকময় হইল, তখন তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন, পনোমারেফ স্বয়ং সেই শয়ন-গৃহের রুদ্ধ-দ্বারের সান্নিধ্যে, গৃহের মধ্যে, সুস্পষ্ট দণ্ডায়মান। দ্বার যেমন রুদ্ধ ছিল, তেমনই রুদ্ধ রহিয়াছে ; কিন্তু যিনি এতক্ষণ দ্বারের বহির্দ্দেশে পদ-চারণা করিতেছিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি এইক্ষণ, দ্বারের এদিকে, শয়ন-কক্ষে দৃষ্ট হইতেছে।

ড্রাম্বিসেন মূর্ত্তি দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনে কোনরূপ ভয় হইতেছে না। তাঁহার ভয় যেন একবারে উন্মূলিত হইয়া গিয়াছে। তিনি নির্ভয়-চিত্তে ও নিস্পন্দ-নয়নে তাকাইয়া দেখিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, এ কি তবে তিনিই? হাঁ নিশ্চয়ই তিনি। এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পনোমারেফ বাহিরে যাইবার সময়ে একটা নীল রঙের গাউন পরিতেন। এই মূর্ত্তির অঙ্গেও ঠিক সেই নীল রঙের গাউন,—গাউনের

প্রান্তরেখা চিরপরিচিত কাঠ-বিড়ালের মসৃণ চর্ম্মে আবৃত, এবং বোতামগুলিও ঠিক সেই-রূপ অর্দ্ধ-বিন্যস্ত। অপিচ, বক্ষঃস্থলে ঠিক সেই শাদা ওয়েষ্টকোট, এবং কটির নিম্নে সেই কালো পায়জামা। এ মূর্ত্তি নিঃসংশয়ই তাঁহার মূর্ত্তি। তিনিই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় দর্শন দান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি জন্য, এইরূপ অসময়ে, এ ভাবে আসিয়া দর্শন দান করিতেছেন? তাঁহার আত্মা কি তবে পরলোকে যাইয়া শান্তি পায় নাই?

বাসিল ড্রায়িসেন, শ্বশুরের প্রতি পূর্ব্বে বিরক্ত থাকিলেও, তাঁহার হৃদয়ে এইক্ষণ আর কোনরূপ বিরাগ কিংবা বিকার নাই। তিনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এখানে কি জন্য উপস্থিত হইয়াছেন?—আমার কাছে কি চান?"

পনোমারেফ, প্রশ্ন শুনিয়া, সম্মুখের দিকে দুই পদ অগ্রসর হইলেন; এবং জামাতার শয্যার নিকটে দাঁড়াইয়া, এক হস্তে ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ও আর এক হস্তে ক্ষমা-প্রার্থনার ভাব প্রদর্শন করিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"( Basil Feodorovitch ) বাসিল ফিয়োডরোভিচ্, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। তোমার নিকট ক্ষমা না পাইলে, ঊর্দ্ধধামে আমি শান্তি পাইব না। অতএব তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

পনোমারেফের এইরূপ কাতর-উক্তিতে বাসিল ড্রায়িসেনের প্রাণটা একবারে দ্রব হইয়া গেল। নিতান্ত শত্রুও যখন সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, মনুষ্যের প্রাণ তখন আর্দ্র না হইয়া যায় না। যিনি ড্রায়িসেনের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষমা চাহিতেছেন, তিনি শত্রু নহেন, সম্পর্ক-গৌরবে পরম মিত্র; পিতৃবৎ পূজাস্পদ;—এক সময়ে অতুল সম্পদের অধিকারী হইলেও, ইদানীং পরলোক-গত, শূন্য-হস্ত ও সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত। বাসিল ড্রায়িসেন আর তিষ্ঠিয়া রহিতে পারিলেন না। তিনি, শয্যা হইতে দ্রুত নামিয়া, শ্বশুরের তুষার-শীতল হাতখানি, হাত বাড়াইয়া, আপনার হাতে দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করিলেন; এবং অতি বড় আকুল প্রাণে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"নিকোলাস ঈভানোভিচ্, ( Nicholas Ivanovitch ) ঈশ্বর আমার সাক্ষী। আপনার বিরুদ্ধে আমি কোন কালেও আমার চিত্তে কোন প্রকার বিকার পোষণ করি নাই; এইক্ষণ বিকার-বিদ্বেষের লেশমাত্রও নাই।"

ছায়ামূর্ত্তি, বাসিলের এইরূপ মনঃপ্রীতি-জনক মধুর কথা শুনিয়া, যেন বড়ই প্রীত হইলেন; এবং আপনার হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া,—প্রীতির ভাবে মাথা নোয়াইয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। বাসিলের শয্যা-গৃহের পরের কোঠা বিলিয়ার্ড-রুম। মূর্ত্তি প্রথমতঃ সেই বিলিয়ার্ড রুমে প্রবেশ করিলেন, এবং সেখান হইতে একবারে অদৃশ্য হইলেন। বাসিল ড্রায়িসেন এতক্ষণ তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। যখন দেখিলেন যে,

দেখিবার জন তিরোহিত হইয়াছেন, তখন তিনি আপনার বুকের উপরে কর-ন্যাস-প্রক্রিয়ায়, ক্রুশের চিহ্ন অঙ্কিত করিলেন; * তার পর, দীপটি নিবাইয়া, হৃদয়ের প্রগাঢ় আনন্দে, নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমাইয়া পড়িলেন। স্বর্গগত শ্বশুরের সহিত আর কোন অংশেও বিকার রহিল না, ইহাতেই তাঁহার প্রগাঢ় শান্তি ও আনন্দ।

পাঠক দেখিয়াছেন যে, পরলোক-প্রত্যাগত পনোমারেফ তাঁহার জামাতাকে সম্ভাষণ করিয়াছেন বাসিল ফিওডরোভিচ্ নামে, এবং জামাতা বাসিল শ্বশুরকে সম্ভাষণ করিয়াছেন নিকোলাস ঈভানোভিচ্ নামে। এই নাম-দ্বয়ের মধ্যে একটু নিগূঢ় অর্থ আছে। ইহা সকলেই জানেন যে, ভারতীয় নর-নারীরা, তাঁহাদিগের পুরাতন গৌরবের দিনে, নিজ নিজ নাম অপেক্ষাও, পিতৃ-নামে পরিচিত হইতে অধিকতর গৌরব মনে করিতেন। দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র দাশরথি-রাম বলিয়াই আত্ম-পরিচয় দিতে ভালবাসিতেন। সীতার নাম জানকী অথবা বৈদেহী। পাণ্ডব-মহিষী কৃষ্ণা, দ্রৌপদী নামেই, সর্ব্বত্র পরিচিত। এ রীতি সুন্দর কি কুৎসিত, তাহা লইয়া তর্ক করিতে যাইতেছি না। রুষজাতীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা অদ্যাপি এই রীতির অনুবর্ত্তনে বড় বেশী অনুরাগী। তাঁহারা একে অন্যকে আদর ও অভ্যর্থনার সময়ে পিতৃ-নামে সম্ভাষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন। বাসিলের পিতৃ-নাম ফিয়োডরো। পনোমারেফ লোকান্তরে যাইয়াও তাহা ভুলেন নাই; এবং দেশের চির-প্রসিদ্ধ রীতি-পদ্ধতি বিস্মৃত হন নাই। তাই তিনি বাসিলকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন ফিয়োডরোভিচ্ অর্থাৎ ফিয়োডরোকুমার বলিয়া; এবং বাসিলও তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন ঈভানোভিচ্ অর্থাৎ ঈভানো-নন্দন বলিয়া। পনোমারেফ যেমন, বাসিলকে একজন প্রকৃত ব্যক্তি জ্ঞানে, দেশের প্রচলিত বিধানে, আদর করিয়াছিলেন; বাসিল ড্রাগিসেনও, সেই ছায়া-মূর্ত্তিকে সেইরূপ প্রত্যক্ষ পনোমারেফ মনে করিয়া,—যেন তদীয় দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা একবারে বিস্মৃত হইয়া, তম্মুহূর্ত্তের জ্ঞান-বিশ্বাসে, তাঁহাকে ঈভানোভিচ্ বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

বাসিল ড্রাগিসেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু রাত্রির অতি অল্পভাগ অবশিষ্ট ছিল, সুতরাং অল্প সময় পরেই রাত্রি-প্রভাত হইল। বাসিল ড্রাগিসেন রাত্রি-প্রভাতে সহধর্ম্মিণী ও শ্যালক প্রভৃতির সাক্ষাৎকার-লাভে সুখী হইলেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না। সে স্মরণীয় রাত্রির সুখ-

* আমরা যেমন অকস্মাৎ ভয় পাইলে অথবা হৃদয় একটুকু অতিরিক্ত মাত্রায় আলোড়িত হইলে, ভগবানের কোন না কোন নাম উচ্চারণ করি, কিংবা অঙ্গে নাম লিখি; ইয়ুরোপীয়েরা সেইরূপ, ললাটে অথবা বক্ষঃস্থলে, ক্রুশের চিহ্ন অঙ্কিত করেন। তাঁহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, যে দেহ ক্রুশ-চিহ্নে অঙ্কিত হয়, সংসারের কোন আপদ বিপদই সে দেহ স্পর্শ করিতে পারে না।

বিস্ময়াবহ কথা,—সে বিস্ময়াবহ দৃশ্য এবং অধিকতর বিস্ময়াবহ আলাপ তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটি সংগোপ্য সত্যবৎ লুক্কায়িত রহিল।

যাঁহারা শ্রাদ্ধীয় অনুষ্ঠানে আহূত হইয়াছিলেন, সেই আত্মীয় প্রতিবেশী ও প্রজাবর্গ, ক্রমে ক্রমে সেখানে আসিয়া, একত্র হইলেন; এবং পারিবারিক ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড বাসিল বাজিনফও কিছুকাল পরেই আগমন করিলেন। যখন সর্ব্বজন-সমক্ষে শ্রাদ্ধীয় প্রার্থনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠাননিচয় সুসম্পন্ন হইল, তখন যাজক বাজিনফ, বাসিল ড্রায়িসেনের সম্মুখীন হইয়া, স্বকীয় মুখশ্রীতে একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া, ধীর-স্বরে বলিলেন,—"বাসিল ফিয়োডরোভিচ্, আপনার নিকট আমার বিশেষ কিছু কহিবার আছে। কিন্তু সে কথা আমি নিভৃতে কহিব, আপনি নিভৃতে শুনিবেন।"

যাজক যে কালে এইরূপ কহিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে ড্রায়িসেনের পত্নী অর্থাৎ পরলোক-গত পনোমারেফের কন্যাও সেই স্থানে আসিয়া অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। বাসিল ড্রায়িসেন তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"আচার্য্য বাজিনফ, আপনার যাহা বলিবার আছে, আপনি দয়া করিয়া তাহা বলুন। আমরা পতি-পত্নী এক-হৃদয়। একে অন্যের কাছে কোন কথা গোপন করি না। আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমরা দুই জনেই এখানে এক সঙ্গে শুনিব।"

তখন ধর্ম্মযাজক বাসিল বাজিনফ, অতি গদ-গদ-কণ্ঠে, গাম্ভীর্য্য-সহকারে বলিলেন,—"আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা বড় বিচিত্র কাহিনী। আমি গত কল্য রাত্রি তিনটার সময়ে, আপনার স্বর্গগত শ্বশুর নিকোলাস ঈভানোভিচ্ পনোমারেফকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তিনি ছায়ামূর্ত্তিতে আমাকে দর্শন দান করিয়াছেন, এবং যাহাতে তিনি আপনার অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধালাভ করিতে পারেন, আমাকে সেই কার্য্য করিবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রার্থনা জানাইয়াছেন।"

বাসিল ড্রায়িসেনের মনে পূর্ব্বেও কোন সন্দেহ ছিল না; এখনও কোন সন্দেহ জন্মিল না। কিন্তু তিনি যখন জানিলেন যে, পনোমারেফ তাঁহাকে যখন দর্শন-দান করিয়াছেন তাহার কিছুক্ষণ পরেই ধর্ম্মযাজক বাজিনফকেও আবার দেখা দিয়াছেন; তখন তিনি একদিকে যেমন বিস্ময়ে অভিভূত, আর একদিকে পরলোক-বাসীর প্রাণের বেদনা অনুভব করিয়া তেমনই ক্লেশিত হইলেন। ইহার ক্ষণপরেই, পনোমারেফের পুত্রগণ এবং সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীরা সেখানে আসিয়া জুটিলেন; এবং জামাতা ও ধর্ম্মযাজক উভয়েরই দর্শন, শ্রবণ ও ছায়ামূর্ত্তির সহিত কথোপকথন-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সকলেই পুনঃপুনঃ জগদীশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেন।

মিয়ার্সের সংগৃহীত এই বৃত্তান্তটি তাত্ত্বিকের চক্ষে, কোন্ অংশে, কি জন্য বিশেষ-মূল্য বিশিষ্ট, তাহা বিজ্ঞ পাঠক সহজেই

বুঝিতে পারিতেছেন। ছায়ামূর্ত্তি সাধারণতঃ এক জনেরই চক্ষে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখানে দ্রষ্টা, দুইটি বিভিন্ন স্থলে, দুই ব্যক্তি। অপিচ, তাঁহারা শুধুই চক্ষে দেখেন নাই; তাঁহারা চক্ষে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন; কানে, আগে সেই মূর্ত্তির পাদ-চারণ-শব্দ, তার পর তার মুখের কথা, স্পষ্ট শুনিয়াছেন; এবং পরিশেষে, চারি চক্ষে মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, পৃথিবীর পদ্ধতিতে, প্রকৃত মনুষ্য বোধে, কথোপকথন করিয়াছেন। ইহার পর বাকী থাকে এক স্পর্শের সাক্ষ্য। এ কাহিনীতে সে সাক্ষ্যেরও অভাব নাই। কেন না, জামাতা বাসিল, পনোমারেফের ক্ষমা-যাচনায় উত্তেজিত হইয়া, তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলেন; এবং সে হস্তে তুষারশীতল শৈত্য অনুভব করিয়া, প্রাণে শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। যদি একই মূর্ত্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ-সম্পর্কে, পৃথক্ পৃথক্ স্থানে, পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এইরূপ অভ্রান্ত সাক্ষ্য দান করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে, একান্ত অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ অথবা অভিমানের উন্মাদগ্রস্ত জ্ঞানান্ধ মূর্খ ভিন্ন আর কে সে প্রকাশের কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে?

ইহা বলা বাহুল্য যে, এ কাহিনী-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত লইয়া, রুষের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। পণ্ডিতবর সলোভভো (Solovovo) সবিশেষ জানিবার জন্য ব্যারণ বাসিল ভন ড্রায়িসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বাসিল ড্রায়িসেন, সমস্ত ঘটনা বিবরিয়া বলিয়া, অবশেষে বলিয়াছিলেন যে, "কল্য যদি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, তিনি মৃত্যুর চরম মুহূর্ত্তেও, উল্লিখিত রূপ মূর্ত্তি-দর্শন-সম্পর্কে, শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্যদান করিতে প্রস্তুত। * সলোভভো, ইহাতেও পরিতৃপ্ত না রহিয়া, ধর্ম্মযাজক বাজিনফেরও সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সে সাক্ষ্য এক খানি সুদীর্ঘ পত্র। উহা মিয়ার্সের গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। যাজক-বর্য্য বাজিনফ উহার শেষ অংশে লিখিয়াছেন যে, "পনোমারেফ, তাঁহার ছায়ামূর্ত্তিতে, আমার নিকটও দেখা দিয়াছেন; এবং আমার নিকটও সেই ক্ষমা-ভিক্ষার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।" †

অধ্যাত্ম-তাত্ত্বিকেরা, অশেষ যত্নে, অনেক উচ্চশ্রেণীস্থ দেবাত্মার উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছেন। সে উপদেশের সার মর্ম্ম ঈশ্বরে তদ্গত ভক্তি, মনুষ্যে স্নেহমধুরা প্রীতি, জীবে দয়া, জীবনের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে নম্রতা, পবিত্রতা ও অমল উদারতা। কিন্তু তাঁহারা, সঙ্গে সঙ্গে, একটি বড় গুরুতর কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা এইরূপ উপদেশ করেন যে, মনুষ্য,

* "He stated to me that if he were going to die to-morrow, he should still be ready to swear to the fact of his having seen the apparition."—Solovovo.

† "I may add that to me also did he appear at the same time and with the same request."—Basil Bajenoff, Priest of Trinity Church.—July 23rd 1891.

স্ত্রী পুত্র পরিজন প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ অথবা আপনার অধীন ও অনধীন, সম্পর্কিত ও অসম্পর্কিত, এবং ছোট ও বড় যে কোন মনুষ্যসম্পর্কে, বাক্যে কিংবা ব্যবহারে, যে কোনরূপ অপরাধ করে, লোকান্তরে অবশ্যই তাহার ক্ষতিপূরণ অথবা তদর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়। কারণ, যাহার সম্পর্কে অপরাধ ঘটিল, সে যত দিনে না সরল-হৃদয়ে ক্ষমা করে, তত দিন পর্য্যন্ত পরলোকে প্রাণে শান্তি ঘটে না। পনোমারেফের দর্শনদান এই কথারই প্রমাণ নয় কি?

কিন্তু আমরা অতি হতভাগ্য। আমরা চক্ষে দেখিতেছি, কানে শুনিতেছি, এবং শত প্রকারে সেই সম্মুখবর্ত্তি পারলৌকিক-জীবনের অস্তিত্ব ও বিচার-ব্যবস্থার প্রমাণ পাইতেছি। তথাপি আমরা, মনুষ্যত্বের পথ লইয়া, আপনার মঙ্গল ও মনুষ্যের সুখ-শান্তিসাধনে যত্নবান্ হইতেছি না। আমরা ক্রোধে কিংবা অভিমানে,—ঈর্ষ্যা, দ্বেষ অথবা লোভ ও লালসার উত্তেজনে, প্রতি-মুহূর্ত্তেই পরের প্রাণে, অল্প বা অধিক পরিমাণে, আঘাত করিয়া, আপনার জন্য কিরূপ দুঃখ-দুর্গতির অন্ধকূপ খনন করিতেছি, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আমাদিগকে এক সময়ে, কত লোকের পায়ে লুটাইয়া, কাঙ্গালের মত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা মুহূর্ত্তের তরেও চিন্তা করি কি?

পনোমারেফ পৃথিবীতে আসিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, আর পাঁচ জনে সেইরূপ আসিতেছেন না কেন? এই পুরাতন প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলিলেই প্রচুর হয় যে, আসিতেছেন না শক্তির অভাবে; আসিতেছেন না সুযোগ পান না বলিয়া। আমরা সকলেই ত বিদ্যুতের শক্তি, গতি ও ক্রিয়া সম্পর্কে বহু গ্রন্থ পড়িয়াছি, এবং তোতার মত বহু কথা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কয়জনে সেই বৈদ্যুতিক তারে, স্ব-কর-নৈপুণ্যে, দেশান্তরে সামান্য একটি সংবাদ-প্রেরণে সমর্থ? তারের আফিসে, সাধারণ একটি শিক্ষানবিশ যে কার্য্য করিতে সমর্থ বিদ্যুদ্‌বিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিতও, তাহার সাহায্য ভিন্ন, স্বয়ং সে কার্য্য করিতে অসমর্থ হন কেন? ইহারই এই অর্থ যে, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার কার্য্যদক্ষতা যেমন শিক্ষা, পরীক্ষা এবং অবস্থা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ, পরলোকবাসী আত্মিকদিগের পৃথিবীতে দর্শন-দান প্রভৃতি কার্য্যও সেইরূপ শিক্ষা, পরীক্ষা এবং অবস্থা ও অভ্যাসের নিয়মাপেক্ষ। যাহা এক জনে সহজে পারে, অন্যে তাহা পারে না। যাহা এক জনে যত্ন করিয়া শিক্ষা করে, অন্যে তাহা প্রবৃত্তি, শক্তি অথবা সুযোগের অভাবে শিখিতে চাহে না। ফল কথা, মনুষ্যের জীবনে এখানে যেমন শতপ্রকার নিয়মের আধিপত্য, মনুষ্য সেখানেও সেইরূপ নিয়মের শত-বিধ সূক্ষ্ম সূত্রে জড়িত। করুণার নিধি অনন্তদেবের নিয়ম-সংস্থান উভয়ত্রই মনুষ্যের উন্নতি ও মঙ্গলের অনুকূল, অথচ উভয়ত্রই অনুল্লঙ্ঘনীয়।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। অভিষেক-প্রশস্তি। শ্রীযুক্ত বাবু বসন্ত কুমার রায় এম এ বি এল প্রণীত। ইহা এক খানি সংস্কৃত খণ্ডকাব্য; এবং চব্বিশটি সুখ-শ্রুত, সুললিত শ্লোকে পরিসমাপ্ত। বাবু বসন্তকুমার রায় সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি পাণিনির সূত্র ও ভট্টোজি-দীক্ষিতের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধান্ত-সঞ্জীবনী নামে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায়, দুই তিন খানি ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন; এবং ইহা আমরা বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত বলিতে পারি যে, তিনি সে সকল পুস্তক রচনার দ্বারা বঙ্গীয় নব্য-বৈয়াকরণদিগের মধ্যে প্রকৃতই সম্মানের আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বৈয়াকরণ-সমুচিত বিজ্ঞ-বিচক্ষণতা এক কথা, আর বিদগ্ধ-মধুরা বাগ্বিন্যাস-চতুরা কবিত্বশক্তি আর এক কথা। সুবিজ্ঞ বৈয়াকরণ, একখানি মড়া কাঠ সম্মুখে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।" অবিজ্ঞ কবি, সেই কাঠটুকু দেখিয়াই, ডগ-মগ হৃদয়ে বলিয়াছিলেন,—"নীরস-তরুরয়ং পুরতোভাতি।" আমরা অভিষেক-প্রশস্তি পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, বৈয়াকরণ বসন্তকুমার বিশেষ প্রশংসার্হ কবি। আমরা নিম্নে তাঁহার একটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। আমাদিগের ভরসা আছে, পাঠক ইহা পড়িয়া তাঁহার সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করিতে উৎসুক হইবেন, এবং তাঁহাকে সুকবি বলিয়া আদর করিবেন।

> গৃহে গৃহে মঙ্গল-তূর্য্যনাদাঃ
> ধ্বজৈর্বিচিত্রৈরুষিতঞ্চ সদ্ম।
> সুগন্ধমত্তভ্রমরাভিলীনং
> বিলম্বিতং বর্ত্মসু রম্যমাল্যম্॥"

২। "দিল্লীকা দশ্ রাজা। শ্রীগিরীশ-চন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত।" ইহাও একখানি অভিষেক-কাব্য এবং গ্রন্থকারের গুণপণার পরিচায়ক। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয় এই একই গ্রন্থে সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজী এই তিনটি ভাষায় আপনার আধিপত্যের পরিচয় দিয়াছেন; এবং অতি সুখ-শ্রুত সুমধুর হিন্দী কবিতা রচনার দ্বারা অধুনাতন বাঙ্গালির গৌরব বাড়াইয়াছেন। বঙ্গদেশে এখনও হিন্দী কবিতার রচনা ও আলোচনা হয়, ইহা আমরা জানিতাম না। লাহিড়ী মহাশয়ের সংস্কৃত কবিতাও বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। কোন কোন কবিতার দুই একটি পংক্তি দেখিলে প্রতীতি হয় যে, কালিদাসের রসোচ্ছলা কবিতা যেন তাঁহার কণ্ঠে গাঁথা রহিয়াছে। যথা—

> "অথার্দ্ধ-পৃথ্বী-পরিপালিকায়া
> ভিক্টোরিয়ায়াঃ তনুজং নরেশং।"

অথবা,

> "রাজ্যাভিষেকে নৃপপালকস্য
> ভূয়াদ্ধরিত্রী বহু-শস্য-পূর্ণা।"

উপরিস্থিত পংক্তি দ্বয়ে নৃপ-পালক শব্দটি আমাদিগের নিকট সুপ্রযুক্ত বোধ হয় নাই। নৃপ-পালক বলিলে কি বুঝিব?

৩। "সেবিকার অর্ঘ। সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র অধিপতি মহামতি রাজ-রাজেশ্বর সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড ও মহারাণী এলেক্জণ্ডার অভিষেক উপলক্ষে কোন মহিলার ভক্তি-গাথা। শ্রীমতী জগৎতারিণী দাসী প্রণীত।" ঘৃত-বহুল পলান্ন-খিচুড়ী ও কোরমা-কালিয়ার পর, মল্লিকা ফুলের মত মনঃপ্রীতিকর দুটি ভাত আর একটুকু মাছের ঝোল যেমন বাঙ্গালির বড় ভাল লাগে, সেবিকার অর্ঘও আমাদিগের কাছে সেইরূপ ভাল লাগিল। সেবিকা জগৎতারিণী বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষিতা কি না, জানি না। কিন্তু তদীয় কবিতার প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতেই শব্দ-গ্রন্থন-নৈপুণ্য ও 'টুকটুকে' কবিত্বের পরিচয় আছে। বস্তুতঃ, অর্ঘের বহু কবিতাই উদ্ধৃতি-যোগ্য, এবং ভক্তি ও করুণাদি রসে পরিপূর্ণ। পড়িবার সময় মনে লয়, যেন কোন অযোধ্যাবাসিনী সহৃদয়া রমণী, সীতার অভিষেক উপলক্ষে, কবিতার অর্ঘ লইয়া রাজদ্বারে দণ্ডায়মানা হইয়াছেন; এবং কোকিলার কল-কণ্ঠে কবিতা গাইয়া, মেয়েলি মঙ্গলাচরণে যোগ দান করিতেছেন। বঙ্গীয় কুল-কামিনীরা এ কবিতা-পুস্তক খানি পাঠ করিলে সুখী হইবেন। আমরা ইহার কএকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"ঝাপটা, তাবিজ, নথ, বেলে মুক্তামালা,
চরণে চরণ্ চাঁদ,
দেখে কেঁদে যেত চাঁদ,
চুড়ি, তাড়, তাগা, সিঁথি, চিক ফুলে বালা!
পাঁচ রঙা ফুলে গাঁথি সরস্বতী-হার—
দিতাম দুলায়ে গলে,
দেখিতে মা পলে পলে,
নয়ন ফিরাতে সাধ হ'তো না তোমার!
শাঁকা, নোয়া, রুলি, সিঁথে ভরিয়ে সিঁদুর,
দিয়ে নিজে ধন্য মানি—
টুকটুকে পা দুখানি,
আল্তা পরায়ে—মনোব্যথা হ'ত দূর।"

২। "গন্ধবণিক্-তত্ত্ব। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীবটকৃষ্ণ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য কথা গ্রন্থের নামেই সূচিত রহিয়াছে; এবং যাঁহারা বিবিধ-শাখা-বিভক্ত ভূভারত-ব্যাপ্ত হিন্দুজাতির • জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে ভালবাসেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদিগের দেখিবার ও শিখিবার কথা অনেক আছে। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার লেখাও সুখ-পাঠ্য। তিনি তাঁহার এই গ্রন্থে যেমন বিচার-নৈপুণ্য, তেমনই বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, এবং কিবা গন্ধবণিক্, কিবা গুণ-বণিক্, সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু মড়া গাঙে যেমন স্রোত বহে না;– জোয়ার ও ভাটা খেলায় না; মৃত সমাজেও সেইরূপ সমাজ-শোধনী শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় না। গন্ধবণিকেরা এইক্ষণকার এই গণতাবদ্ধ গর্ব্বগন্ধি অন্ধসমাজে তাঁহাদিগের অভিলষিত আসন অত সহজে পাইবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড ] আষাঢ়, ১৩১০। [ ৩য় সংখ্যা।

# বান্ধব

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

( পুনঃপ্রচারিত। )

বৈশাখ হইতে চৈত্রে বর্ষ-গণনা।

৩

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।



ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা।

# বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয়
## নিয়মাবলী।

---

অগ্রিম।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩৲ | ।৵০ | ৩।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২৲ | ৶০ | ২৶০ |

পশ্চাদ্দেয়।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৪৲ | ।৵০ | ৪।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২॥০ | ৶০ | ৩॥৶০ |

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব-কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারী সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইলে কার্য্যাদি সম্পর্কে আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হইবে না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা হয়, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৶০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲. এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

ঢাকা,
বান্ধব-কুটীর।
১৩১০ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীহরকুমার বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু তিনকড়ি সরকার মহাশয় বান্ধবের এজেন্ট হইয়া যাইতেছেন, গ্রাহকগণ বান্ধবসংক্রান্ত সকল বিষয় ইঁহার নিকট জ্ঞাত হইতে পারিবেন। মূল্যাদি আমাদের নিকট পাঠাইবেন। বান্ধবের প্রথম খণ্ড প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল, যাঁহারা প্রথম খণ্ড হইতে গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা পরস্পর সংবদ্ধ প্রবন্ধগুলির আগা গোড়া মিলাইয়া পড়িবার সুবিধা পাইবেন। আমি এক মাস কাল কলিকাতা থাকায় বান্ধব বাহির হইতে বিলম্ব হইল।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

# কিশোর গৌরাঙ্গ।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

### বিদ্যাবিলাস ও আত্মবিশ্বাস।

---

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"গুরো গৃহে সংবসতা মহাধিয়া
সমস্ত-বিদ্যাঃ স কৃতার্থতাঃ কৃতাঃ।
ক্ষণেন তস্মিন্ বিবিশুশ্চ তাঃ স্বয়ং
পয়োনিধৌ নদ্য ইবোৎসুকা ভৃশং॥
( ইতি কবিকর্ণপূর-প্রণীত-শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-মহাকাব্যে।)

গৌরাঙ্গ, যে সময়ে, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়িতেন, সেই সময়ে, সুদর্শন আচার্য্য এবং বিষ্ণু মিশ্র নামক দুইটি বড় পণ্ডিত নবদ্বীপে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুদর্শন ও বিষ্ণু মিশ্র ব্যাকরণ-ব্যবসায়ী ছিলেন না, ইহা খাটী কথা। কিন্তু, তাঁহারা সাহিত্য ও অলঙ্কার পড়াইতেন, না বাদার্থ * অথবা স্মৃতির অধ্যাপনা করিতেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। জগন্নাথের সহিত গঙ্গাদাসের যেমন প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল, সুদর্শন ও বিষ্ণু মিশ্রের সহিতও সেইরূপ বিশিষ্ট সৌহার্দ্দ থাকা জানা যায়। কারণ, মিশ্রপুরন্দরের বাড়ীতে যখন যে কোন ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, সুদর্শন ও বিষ্ণু উভয়েই তাহাতে আত্মীয়বৎ উপস্থিত হইতেন; এবং শচীও, সময়ে সময়ে, তাঁহা-দিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া, পুত্রের সমুচিত শিক্ষাবিষয়ে, নানারূপ আলাপ করিতেন। আমরা, গৌর-চরিত-সংক্রান্ত সুপরিচিত গ্রন্থ-পত্র আলোচনা করিয়া, মোটামুটি যাহা বুঝিতে পাইয়াছি, তাহাতে আমাদিগের এই প্রকার মনে লয় যে, গৌরাঙ্গদেব গঙ্গাদাসের কাছে ব্যাকরণের বিভিন্ন উচ্চ গ্রন্থ এবং টীকা ও পঞ্জীবিষয়ে পাঠ গ্রহণ করিতেন; অথচ সময় পাইলেই, সুদর্শন আচার্য্য ও বিষ্ণু ভট্টা-চার্য্যের নিকটে যাইয়া, ব্যাকরণাতিরিক্ত বিবিধশাস্ত্রের উপদেশ লইতেন।

কিন্তু, গৌরাঙ্গের প্রধান অবলম্ব ব্যাকরণ শাস্ত্র,—প্রধানতম অধ্যাপক গঙ্গাদাস। যিনি সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনাদি-শাস্ত্রে প্রবেশ

* বাদার্থশাস্ত্র বঙ্গে পুরাতন বস্তু। চিন্তামণি দীধিতির টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কারের দ্বারা ইহার বিশেষ উৎকর্ষবৃদ্ধি হইয়াছে, নূতন সৃষ্টি হয় নাই।

করিতেছেন, ব্যাকরণই তাঁহার প্রধান অবলম্ব, এ কথার অর্থ কি? পাঠক পুরাতন বঙ্গের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-বিষয়ক চির-প্রতিষ্ঠিত প্রথার সামান্য একটুকু আলোচনা করিলেই বুঝিতে পাইবেন যে, এ কথার একটুকু বিশেষ অর্থ আছে।

এ দেশে এইক্ষণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের তেমন আদর নাই; এবং ব্যাকরণে পঠন-পাঠনা লইয়াও তেমন আলোচনা নাই। অনেকে ইদানীং, ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন না হইয়াও, ন্যায়ের প্রাধান্য লাভ করেন এবং বৈয়াকরণেরা তাঁহাদিগকে পরিহাস করিয়া বলিয়া থাকেন যে, —"অস্মাকীনাং নৈয়াকুনাং অর্থনি তাৎপর্য্যঃ, শব্দনি কোশ্চিন্তা।" কিন্তু, প্রতিভার অলৌকিক-বিগ্রহ গৌরাঙ্গ যে সময়ে গঙ্গাদাসের, টোলে নয়ন-মনোহর ছাত্ররূপে উপবিষ্ট তখন বঙ্গে ব্যাকরণ শাস্ত্রের বড় বেসী সম্মান ছিল;—আর, যাহারা ব্যাকরণে দুর্ব্বল, তাহারা শত সহস্র শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সভাজন-হৃদয়-মোহনে সমর্থ হইলেও, সকলে তাহাদিগকে মূর্খ বলিয়া ঘৃণা করিত। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, সে ব্যাকরণ শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ কলাপ।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ সকল স্থানেই, বহুকাল হইতে, কথিত কলাপ ব্যাকরণ বিশেষ প্রচলিত; আর যাঁহারা বিতর্ক-বিদ্যার্ণব দুর্গসিংহের বৃত্তি ও টীকা, এবং শ্রীপতি দত্তের পরিশিষ্ট প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থের সহিত এই ব্যাকরণের আদ্যোপান্ত শিক্ষা করেন, তাঁহারা অদ্যাপি বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রধান বৈয়াকরণ বলিয়া সম্মানিত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের বালকেরা, এ দেশে পূর্ব্বে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময়েই, এই ব্যাকরণের সূত্র-বৃত্তি কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করিত; এবং যাঁহারা, দশ পনর বৎসরের পরিশ্রমে, ইহার আদ্যোপান্ত আয়ত্ত করিয়া, অতি-বিচক্ষণ বৈয়াকরণ বলিয়া পরিচিত হইতেন, স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িকদিগের শাস্ত্রীয় বিচারেও তাঁহাদিগের জন্য মধ্যস্থতার আসন-লাভ-রূপ সম্মান ঘটিত।

জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্ব নিবাস যখন শ্রীহট্ট, তখন তাঁহার ঘরে, পূর্ব্ব-বঙ্গ-প্রচলিত কলাপ ব্যাকরণেরই আধিপত্য থাকা সম্ভব। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, গৌরাঙ্গের সময়ে, বঙ্গের পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, সকল স্থানেই কলাপ-ব্যাকরণের সমধিক প্রচলন। সে সময়ে বোপদেবের মুগ্ধবোধ বঙ্গদেশে আসন লাভ করে নাই, এবং বেদ-বেদান্তের ক্রীড়া-ভূমি-রূপিণী বারাণসী ভিন্ন আর কোথাও পাণিনি-ব্যাকরণের প্রচলন থাকা জানা যায় না। সুতরাং এ দেশের গ্রন্থ-পত্রের মধ্যে বিচার-বিতর্ক-ঘটিত ফাকি-সিদ্ধান্ত অথবা কূট-প্রশ্নের অক্ষয়-তূণীর-স্বরূপ কলাপ-ব্যাকরণই যে, শিশুকাল হইতে গৌরাঙ্গের কণ্ঠস্থ বস্তু হইয়া, কৃতার্থতা লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

অপিচ, গৌর-প্রসঙ্গ-বিষয়ক গ্রন্থ-প্রণেতৃ-দিগের মধ্যে চরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী স্বয়ং অতি প্রবীণ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনিও তাঁহার পুস্তকে,

একস্থানে প্রকারতঃ, এবং আর এক স্থানে, গৌর-সম্ভাষণে, বিদেশীয় বড় পণ্ডিতের মুখে স্পষ্টতঃ, বলিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গ কলাপ ব্যাকরণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়াই তদীয় কিশোর জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের মধ্যে, বৈয়াকরণ গঙ্গাদাস ভিন্ন আর কোন পণ্ডিতের সহিত গৌরাঙ্গের গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকা চরিতামৃত পাঠে প্রতীত হয় না। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে,—

"গঙ্গাদাস পণ্ডিত পাশে পড়ে ব্যাকরণ।
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্র-বৃত্তি-গণ।
অল্প কালে হৈলা পাঁজি টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।"

উপরিধৃত পংক্তি-চতুষ্টয়ে ঐ যে সূত্র, বৃত্তি ও গণ এবং পাঁজি ও টীকার কথা লিখিত হইয়াছে, ইহা কলাপ-ব্যাকরণেরই বিশেষ পরিচায়ক। কিন্তু, কবিরাজ গোস্বামী, ইহার পরে, স্থানান্তরে, কলাপ-ব্যাকরণের কথা একবারে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—

"ব্যাকরণ পড়াও,নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম,
বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম।
ব্যাকরণ মধ্যে জানি পড়াও কলাপ;
শুনিল ফাকিতে তোমার শিষ্যের প্রতাপ।"

গৌরাঙ্গ, আহার, বিহার ও বিশ্রামের সময় ছাড়া, প্রায় সমস্ত দিবারাত্রিই শিষ্য-বৎসল গঙ্গাদাসের টোলে অবস্থান করিতেন; এবং সেখানে, হয় অধ্যয়ন, না হয় অধীত বিষয় লইয়া বিচার-বিতর্কে, সময় কাটাইতেন। বিচারের জয়-পরাজয়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। কেবা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এবং তিনিই বা কাহাকে আক্রমণ করিলেন, সে কথা লইয়াও তিনি চিন্তা করিতেন না। তাঁহার মুখ্য উৎসাহ বিচার-যুদ্ধে,—মুখ্য আনন্দ বিচার-জনিত আমোদ-কোলাহলে। ব্যাকরণ ও বাদার্থের কূট-কথা লইয়া কোনরূপ একটা বিচার-মল্লতার সুযোগ পাইলেই, তিনি তাহাতে একবারে মত্ত হইতেন; এবং অনেক ইতিহাস-বিশ্রুত অলোক-সাধারণ অস্ত্রবীর, যুদ্ধের ফলাফলের জন্য ক্ষণকালও উদ্বিগ্ন না রহিয়া, শুধু যুদ্ধের আমোদেই যেমন ডুবিয়া রহিয়াছেন, তিনিও শাস্ত্র-যুদ্ধের সেই একপ্রকার নির্ব্বিকার আনন্দে তেমনই ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন।

গৌর-চরিত্রের এই ভাবটুকু বস্তুতঃই বড় মধুর ছিল। বাল্মীকির কুশীলব, বয়োবৃদ্ধ এবং বিশারদ-বীর-পুরুষদিগকে দেখিলেও, যেরূপ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, তাঁহাদিগের কাছে, যেন যুদ্ধরূপ খেলার আমোদে, ধনুর্ব্বাণ লইয়া উপস্থিত হইতেন; গৌরাঙ্গও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিমাত্রের নিকটই, ঠিক সেইপ্রকার অমায়িক আমোদে, অতিমাত্র ডগ-মগ হৃদয়ে, তাঁহার বাছা বাছা কঠিন প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইয়া, একবার তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে চাহিতেন।

প্রাচীনদিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গের এইরূপ ব্যবহারকে ঔদ্ধত্য, অশিষ্টতা ও উচ্ছৃঙ্খলচারিতা মনে করিয়া চিত্তে একটুকু

বিরক্ত রহিতেন। কেহ কেহ মুখের উপর তাঁহাকে কটু বলিতেন। কিন্তু, গৌরাঙ্গের প্রীতি-স্নেহপূর্ণ, রস-রাগ-মগ্ন সদানন্দ প্রকৃতিতে ঔদ্ধত্য প্রভৃতি ভাবের অণুমাত্রও মিশ্রণ ছিল না; আর, তিনি আত্মহৃদয়ে কখনও কোন প্রকার মন্দ ভাবে পরিচালিত হইতেন না বলিয়া, ঐরূপ বিচার-মল্লতায় কখনও তাঁহার লজ্জা কিংবা বিষাদ হইত না।

যাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে শাস্ত্রানুরাগের সহর্ষ উন্মত্ততা, তাহাই অনেকের কাছে আগে ঔদ্ধত্যের চপলতা বলিয়া অনুভূত হইত; এবং তাঁহার সহিত একটুকু গাঢ় পরিচয় হইলেই শেষে এই ভ্রম দূর হইয়া যাইত। পাঠক ইহা পশ্চাৎ জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার সহিত প্রথম বয়সে যাঁহাদিগের যত বেশী শাস্ত্র-যুদ্ধ গিয়াছে, পরিণত বয়সে তাঁহারাই তাঁহার তত বেশী ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁহার প্রাণটার মধ্যে কত মধু লুক্কায়িত ছিল, তাহা সেই সকল লোকেই প্রথম বয়সের প্রণয়-কলহে বিশিষ্টরূপে জানিতে পাইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ এই সময় তাঁহার সহযোদ্ধা সহাধ্যায়িদিগের মধ্যে কিরূপ প্রীতিপ্রদ প্রফুল্ল-মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট রহিতেন, চৈতন্য-ভাগবতে তাহার বড়ই একটি সুন্দর চিত্র আছে। যথা,—

"না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক একক্ষণ,
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন।
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর,
শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব্ব মনোহর।
স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত,
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্য দন্ত।
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল নয়ন,
কি বা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ বসন।
যেই দেখে সেই এক দৃষ্টে রূপ চায়,
হেন নাহি ধন্য ধন্য বলি যে না যায়।"

গৌরাঙ্গ, তখন রূপে যেমন সকলেরই নয়ন-রঞ্জন, গুণেও সেই সময়ে, সমস্ত নবদ্বীপে, তেমন এক অভিনব আভরণ। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে, পরবর্ত্তী বহুকাল পর্য্যন্ত, বিদ্যার্থিদিগের মধ্যে অনেকে, অল্প বয়সেই, প্রতিভার আশ্চর্য্য স্ফুরণ দেখাইয়া, বঙ্গদেশকে চমকিত করিয়াছেন। বিশ্বরূপ অতি অল্প বয়সেই উচ্চ অঙ্গের পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন; এবং পাঠকের মনে থাকিতে পারে, আলোক ও গোলোক নামক সে দিনকার বালক-দ্বয়ও, বাল্য এবং যৌবনের সন্ধিসময়েই, বঙ্গদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপ-চন্দ্র গৌরাঙ্গ, যে বয়সে, যেরূপ পাণ্ডিত্য এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিদ্যার রস-বিলাসে যেরূপ প্রগাঢ় স্বাদগ্রাহিতা দেখাইয়াছেন, নবদ্বীপে আর কখনও কেহ সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

"হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর,
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর।
সকল সভার মধ্যে আপনে ধরিয়া,
বসায়েন গুরু সর্ব্ব প্রধান করিয়া।
গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়,
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দৃঢ়।

প্রভু বলে তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে,
ভট্টাচার্য্য পদ কোন্ দুর্ল্লভ তাহারে।
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌর সুন্দর,
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর।
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন,
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
কেহ যদি কোন রূপে না পারে স্থাপিতে,
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সুরীতে।
কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে,
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে।"

দেখিতে দেখিতে গৌরাঙ্গের বয়স ষোল বৎসর হইল। গৌরাঙ্গ উপনয়নের সময় হইতে এই পর্য্যন্ত গঙ্গাদাসের টোলেই অবস্থিত আছেন; এবং প্রধান ছাত্রের পদ পাইয়াও, গঙ্গাদাসের কাছেই অধ্যয়ন করিতেছেন। ছাত্র সমাজে তাঁহার এই প্রাধান্য কিরূপে কার্য্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হইল, বৃন্দাবন তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—চৈতন্য ভাগবতে, গঙ্গাদাসের টোলের বিবরণে,—

"গৌরাঙ্গ সুন্দর বেশ মদন মোহন,
ষোড়শ বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন।
বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য পরকাশ,
স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে তারে করে হাস।"

"পুঁথি চিন্তা" বিষয়টা কি, তাহা এক্ষণকার কালের পাঠককে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। টোলের ছাত্রদিগের মধ্যে, পূর্ব্বকাল হইতেই একটি বড় সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে। ছাত্রেরা সকলেই অধ্যাপকের শিষ্য; সুতরাং অধ্যাপকের নিকটই তাহারা পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু, সেই পঠিত-বিষয়ের পুনরালোচনার সময়ে, অধ্যাপক তাহাদিগকে সাহায্য করেন না,—সাহায্য করিবার সুযোগ কিংবা সময় পান না। সে সাহায্যের ভার টোলের প্রধান ছাত্রদিগের উপর। ইহাতে প্রধান ছাত্রদিগের পরিশ্রম আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উপকারও আছে। কারণ, তাঁহারা অধ্যাপকের চক্ষের সান্নিধ্যেই এইরূপে আবার অধ্যাপকতায় শিক্ষা লাভ করেন; এবং যে সময়ে অধ্যয়ন, সেই সময়েই অধ্যাপনার সুবিধা পাইয়া, ভাবি-জীবনের জন্য সুন্দররূপে প্রস্তুত হন। গঙ্গাদাসের টোলে গৌরাঙ্গই তখন সর্ব্বপ্রধান ছাত্র। সুতরাং, গুরুর ইঙ্গিত-ক্রমে, সমস্ত ছাত্রেরই পুঁথি চিন্তার ভার গৌরাঙ্গের হাতে গড়াইয়া পড়িল, এবং এই প্রকার নিয়োগের দ্বারাই ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার প্রধানত্ব রীতিমত স্বীকৃত হইল।

গৌরাঙ্গের উল্লিখিতরূপ গুণ-সংবর্দ্ধনায় অনেকেরই আপত্তি। তাঁহার বয়স তখন সবে ষোল বৎসর। ষোল বৎসর বয়সের বালকের কাছে বসিয়া পুঁথি চিন্তা করা কাহারও প্রীতিকর নহে। গৌরাঙ্গের সহাধ্যায়িদিগের মধ্যে মুরারি গুপ্ত সে সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন; গঙ্গাদাসের এই ব্যবস্থা তাঁহার নিকটে একেবারেই ভাল লাগিল না। তিনি অমন একটি বালকের কাছে পাঠ-চিন্তা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করায়, গৌরাঙ্গ তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়া শাসন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক অক্ষরই হাস্য-রসে

পরিপূর্ণ; অথচ,গৌরাঙ্গের প্রমোদ-রসিকতার পরিচায়ক। যথা,—চৈতন্য ভাগবতে—

"প্রভু বলে বৈদ্য তুমি ইহা কেন পড়,
লতা পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দৃঢ়।
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি,
কফ-পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নহে ইতি।
মনে মনে চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা,
ঘরে যাহ তুমি, রোগী দৃঢ় কর গিয়া।"

কলাপ-ব্যাকরণের পরিশিষ্ট-রচয়িতা, বৈদ্য-কুল-তিলক, বিখ্যাত-নামা বৈয়াকরণ, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত, তখন পর্য্যন্ত জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন কি না, নিশ্চয় জানি না। শ্রীপতিদত্ত-প্রণীত পরিশিষ্ট প্রকাশের পর, শাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যদিগকে কেহই ব্যাকরণ শাস্ত্রের নাম লইয়া এই প্রকার পরিহাস করিতে সাহস পাইত না। যাহা হউক, গৌরাঙ্গের এই পরিহাস-বাক্যে মুরারি কোন অংশেও ব্যথিত হইতেন না। কারণ, মুরারি তখন পণ্ডিত হইয়াছেন। ভিতরে প্রকৃত পাণ্ডিত্য থাকিলে, পরের ব্যঙ্গবিদ্রূপ ততটা ক্লেশকর হয় না। উহা বাহিরেই পড়িয়া থাকে, অথবা তৈল-পটের উপর প্রক্ষিপ্ত-জলের মত, অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই ঝরিয়া পড়ে; প্রাণে যাইয়া ঠেকে না। বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ যাহাকে যাহা বলিতেন, তাহাতে প্রীত-প্রফুল্লতার একটু অপূর্ব্ব গন্ধ থাকিত। এই হেতুই, লোকে তাঁহার ঐরূপ কথায় তাদৃশ ক্লেশ অনুভব করিত না। এক দিন মুরারি আর সহিতে না পাইয়া বলিলেন,——

"নিমাই, তুমি বালক হইলেও ব্রাহ্মণ; আমি পরিহাসের প্রত্যুত্তরে তোমাকে পরিহাস করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু, আমি আমার অধীত বিষয়ে কি কি কথা বুঝি নাই, তাহা তুমি আমায় বুঝাইয়া দেও দেখি।"

দুইয়ের মধ্যে কথায় কথায় ঘোরতর তর্ক বাধিল, এবং বহুক্ষণের বাদ-বিতর্কের পর মুরারিরই আজি জয় হইল। মুরারির এই প্রকার জয়-লাভ বিচিত্র নহে। কারণ, গৌর-সুন্দর বিশ্বম্ভর কখনও বিচার-যুদ্ধে বিগর্হিত পথ অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু বিচিত্র গৌরাঙ্গের উদারতা এবং আত্মপর-ভেদ-শূন্য অমায়িক প্রেমিকতা। কেন না, মুরারির এই অচিন্তিত জয়-লাভে মুরারির যত না প্রীতি, গৌরাঙ্গ তাহা অপেক্ষাও গাঢ়তর প্রীতি লাভ করিলেন। গৌরাঙ্গ মুরারির মুখে শাস্ত্রার্থের অতি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা শুনিয়া, প্রীতিতে একবারে গলিয়া গেলেন; এবং তাঁহার স্বাভাবিক সারল্যে, মুরারিকে প্রিয় জনের ন্যায় গলায় জড়াইয়া গাঢ় আলিঙ্গনে তৃপ্ত করিলেন। মুরারি, এই হইতে তাঁহার জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত, গৌরাঙ্গের পরম বন্ধু,—পরম ভক্ত। গৌরাঙ্গের চরিত্রে এমনই একটুকু অনন্য-সাধারণ আকর্ষণী ছিল যে, যে উহার টানে পড়িত, সেই তাহার প্রাণটা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া চির-জীবনের তরে তাঁহার হইয়া রহিত।

যাঁহাদিগের প্রকৃতিতে, অল্প বা অধিক পরিমাণে, উল্লিখিতরূপ আকর্ষণী শক্তি

থাকে, তাঁহারা চিরদিনই জগতে স্বয়ম্প্রতিষ্ঠিত প্রভু। প্রশান্ত-ভক্ত বিশ্বরূপের প্রকৃতিতে এ শক্তি একেবারেই পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু, আনন্দ-বিহ্বল গৌর-চরিত্রে, ইহা শিশুকাল হইতেই অমেয় এবং প্রায় সকল স্থলেই অনতিক্রমণীয়। মুরারি, বহুদিন অবধি বাক্য-যন্ত্রণায় বিদ্ধ হইয়াও, মুহূর্ত্তের মধ্যেই যে গৌর-প্রেমে প্রাণ ও মন সমর্পণ করিল,—তাঁহার মোহিনী দৃষ্টি ও মোহন স্পর্শে, চৌম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায়, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, ইহাতে বিস্মিত হইবার কথা নাই।

মুরারি গুপ্তের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট। গৌরাঙ্গ শ্রীহট্টীয় উচ্চারণের অনুকরণ করিয়াও, মুরারির উপর অনেক সময় উৎপীড়ন করিতেন। নবদ্বীপে সে সময়ে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের যে সকল ছাত্র অবস্থান করিতেন, গৌরাঙ্গ তাহাদের অনেকের সঙ্গেই উচ্চারণের ভঙ্গী লইয়া এইরূপ পরিহাস ও রসিকতা করিয়া পরস্পরের কৌতুক জন্মাইতেন। কিন্তু তিনি নিজেও পিতৃসম্পর্কে শ্রীহট্টীয়; সুতরাং তিনি যেমন পরিহাসচ্ছলে, পরের উচ্চারণে দোষ দেখাইতেন, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের ছাত্রবৃন্দও, তাঁহার জন্মস্থানের পরিচয় দিয়া, সর্ব্বদাই তাঁহাকে সেইরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেন। তবে মুরারি, এখন হইতে, ঐরূপ পরিহাস ও রসিকতা একবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মনে গৌরাঙ্গ সম্পর্কে কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। ষোল বৎসরের একটি বালকের উপর তাঁহার অন্যপ্রকার ভক্তি জন্মিল। তিনি গৌরাঙ্গের কাছে, এখন হইতে, যথারীতি পাঠ-চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।—

"চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়,
প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নয়।
এতাদৃশ পাণ্ডিত্য কি মনুষ্যের হয়,
হস্ত স্পর্শে দেহ হলো পরানন্দময়।
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লজ্জা নাই,
এমন সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাই।" (ভা)

পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোল বড় বৃহৎ ছিল। তাঁহার টোলের কতক ছাত্র তাঁহার বাড়ীতেই অবস্থান করিত। বাড়ীতে সকলের সংস্থান ও সংকুলন হইত না বলিয়া ছাত্রদিগের মধ্যে কতকটি, গঙ্গাদাসের বাড়ীর অদূরে, নবদ্বীপের অন্যতম সমৃদ্ধ কায়স্থ মুকুন্দ সঞ্জয়ের * বাস-ভবনে অবস্থান করিত। গঙ্গাদাসের ব্যবস্থা মতে, গৌরাঙ্গ এই সময়েই অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং

* আমাদিগের এইরূপ মনে পড়ে যে, গৌর-চরিত লেখকদিগের মধ্যে, কোন কোন বিজ্ঞ লোক, সম্ভবতঃ অপ্রণিধান হেতু, মুকুন্দ সঞ্জয়কে এক ব্যক্তি মনে না করিয়া, মুকুন্দ ও সঞ্জয় নামক দুই ব্যক্তি মনে করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ মুকুন্দ সঞ্জয় এক ব্যক্তি, এবং "সঞ্জয়" শব্দ ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি শব্দের ন্যায়, বংশপরিচায়ক। যথা চৈতন্যভাগবতে—স্থানান্তরে,—

"আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে,
আসিয়া বসিলা চণ্ডী মণ্ডপ ভিতরে।"
"পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈল কোলে,
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নয়নের জলে।
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ,
পরম আনন্দ হৈল মুকুন্দ ভবন।"

গঙ্গাদাসের যে সকল ছাত্র মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে থাকিয়া অধ্যয়ন করিত, তাহাদিগকে লইয়াই তিনি প্রথম তাঁহার টোল খুলিলেন।

মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাড়ীতে বড় একটি চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। ঐ চণ্ডীমণ্ডপেই গৌরাঙ্গের টোল হইল; এবং মুকুন্দ সঞ্জয়ের প্রিয়তম পুত্র শান্তচরিত্র পুরুষোত্তম সঞ্জয়ও, গৌরাঙ্গের পাদপীঠে ছাত্ররূপে উপবিষ্ট হইয়া, সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। গৌরাঙ্গ যে সময়ে, বঙ্গীয় জগতে নয়নানন্দ নক্ষত্রের ন্যায়, নূতন অভ্যুদিত, সেই সময়ে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিন জাতিই বিশেষ আগ্রহের সহিত সংস্কৃত শিখিত; এবং যদিও ব্রাহ্মণের সহিত কোন বিষয়েই কাহারও তুলনা নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুকরণে কায়স্থ ও বৈদ্যেরাও তখন সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিত; সংস্কৃতে পত্র লিখিত,—সুবিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত সংস্কৃতে আলাপ করিয়া নিজ নিজ শিক্ষা-সম্পদের পরিচয় দিত। মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র কায়স্থ হইয়াও এই নিমিত্তই গৌরাঙ্গের টোলে প্রসিদ্ধ ছাত্র।—

"মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহা ভাগ্যবান্,
যাহার আলয়ে বিদ্যাবিলাসের স্থান।
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়,
তাহারাও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্ব্বথায়।
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তাঁর ঘরে,
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তার ধরে।
গোষ্ঠী করি তথায় পড়ান দ্বিজরাজ,
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ।"

পিতৃহীন গৌরাঙ্গ, ষোল বৎসর বয়সের সময়েই অধ্যাপক হইয়া, শত শত ছাত্রের মধ্যে সম্মানের উচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন, এই দৃশ্য, নবদ্বীপের অনেকের চিত্তেই বিস্ময় জন্মাইল। শচীর প্রাণটুকু, নূতন জোয়ারের জল-রেখা-সিক্ত শুষ্ক পুষ্করিণীর ন্যায়, আবার যেন কি এক আনন্দে ভরিয়া উঠিল। বিশ্বরূপ নাই, জগন্নাথ নাই—শচীর সংসার এক্ষণ অন্ধকার। অনাথা শচী তাঁহার এই অসহায় ও অনাথ বালকটিকে এত দিন কিরূপ অকথ্য কষ্টে লালন পালন করিয়াছেন, তাহা কিরূপে বর্ণিত হইবে? তাঁহার অন্ধকার-গৃহে আবার প্রদীপ জ্বলিল। তিনি আবার মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলেন। গৌরাঙ্গের যশঃসমাকৃষ্ট ছাত্রবৃন্দ ও অধ্যাপকবর্গের অহরহ যাতায়াতে তাঁহার অন্তঃপুর ও বহিঃপ্রাঙ্গণ নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। শচী, কাহাকেও না জানাইয়া, অতি গোপনে, অঙ্গুলে কর গণিতেন। তাঁহার মনে ষোল বৎসরের কথাটা বড়ই একটা শঙ্কিত কথার মত লুক্কায়িত রহিয়াছিল। ভগবানের কৃপায় সেই শোক-স্মৃতি-জড়িত শঙ্কিত ষোল বৎসর পার হইয়া গেল। যে বয়সে বিশ্বরূপ, জনক-জননীর হৃদয়ে বিষের আগুন জ্বালিয়া দিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গ সেই বয়স অতিক্রম করিয়া, অধ্যাপনার অভিনব আনন্দে সংসারী হইলেন।

# সন্ধ্যার তারা।

আমি সন্ধ্যার তারা—
অই দেখ চেয়ে আসিছে রজনী
তিমির-বাসে,
সন্ধ্যা-কিরণ লুকায়ে পড়িবে
গগন-পাশে,
দিবসের যত প্রমোদ-উৎসব,
উৎসাহের গান, আনন্দের রব,
রজনীর সনে হইবে নীরব।
হে পথিক পথ-হারা;
সারাটি জগত নীরব হইবে,
শুধু নীলাকাশে জাগিয়ে রহিবে
নিদ্রাহীন ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী,
আর নিঝরিণী নব-বলে বলী
কল কল রবে ছুটিতে চাহিবে
ভাঙ্গিয়া পাষাণ-কারা।

তিমির বরণে মলিন করিয়া
গগন-প্রান্ত,
আসিছে যামিনী লও বাস খুঁজি
পথিক-শ্রান্ত,
ক্ষীণ আলো এবে যাইবে নিবিয়া,
ঘোর অন্ধকার বেড়াবে ছুটিয়া,
ঝিল্লী মুখরা যামিনীর গান—
দূর স্বপ্নালোকে বাশরীর তান
শ্রবণে পশিবে, নিশীথ তিমিরে
অন্ধ সমীরণ চির বাঞ্ছিতেরে
খুঁজিবে পাগল-পারা।

শুধু অশ্রুজল, শুধু দীর্ঘশ্বাস,
বহিবে এখন, নিশীথ আকাশ
করুণ হৃদয়ে নীরবে শুনিবে
জগতের দুঃখ, আপনি কাঁদিবে
ঝরিবে শিশির-ধারা।

সংসার-সাগরে জীবন-তরণী
ঝটিকা মুখে,
ক্লান্ত আরোহী, সরে না বচন
দারুণ দুখে,
কুহকিনী আশা কহিবে তাহারে,—
"অই মেঘ মাঝে সাগরের পারে
বসতি আমার, চপলা-চমকে
সমীর-তরঙ্গে, বেড়াই পুলকে
অনন্ত জগত, অশরীরী আমি,
কিন্তু আলো মম স্বর্গ-মর্ত্ত্য-গামী
যাও পান্থ ধীরে এ আলোক ধ'রে
ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সংসার-সাগরে
তরণী বাহিয়ে চল,
অগ্রসরি আমি দেখাইব দিক,
অনন্ত কালের অনন্ত পথিক
চলেছে যে রূপে কহিব তোমারে;
অসম্ভব কিছু নাহি এ সংসারে,
তুমিও হাসিবে, তুমিও গাইবে
জীবন-তরণী আবার ছুটিবে
দলিয়া তরঙ্গদল"।

নিদ্রা-সুখ-তৃপ্ত বিপুল বসুধা
ঘুমায়ে রবে,
শুধু ভগ্ন প্রাণ অশান্তি-শিখায়
জ্বলিবে যবে,
উদাসিনী স্মৃতি আসি ধীর পায়
কহিবে তাহারে স্নেহ-সান্ত্বনায়—
"এ জগতে যারে হারায়ে ফেলেছ,
এ জগতে যারে অনেক খুঁজেছ,
এস মম সাথে দেখাব তাহারে,
স্বপন-রচিত পুরীর মাঝারে
শুনিবে তোমার পরিচিত বাণী,
ক্ষণিক মিলন,—তবুও এমনি
অমৃত-পরশ, অমৃত-শীতল
এ জগতে হায় একান্ত বিরল,
হেথা আছে শুধু করুণ বিলাপ,
আছে হেথা শুধু বৃথা পরিতাপ,
আছে শুধু অশ্রু জল!

কবে কোন দিন কোন শুভক্ষণে
উঠেছিল কার জীবন-কাননে
মঞ্জরিয়া তরু বসন্ত বাতাসে,
সুখ-সূর্য্য কার উঠেছিল হেসে,
সোহাগ স্বপনে শরত-যামিনী
কেটেছিল কার,—সে সব কাহিনী
গাইয়া চলিব অফুরন্ত পথ,
নীরব নিশীথে ভ্রমিব জগত,
নাহি অন্য সুখ, নাহি কিছু চাই
উদাসীন প্রাণে ভ্রমিয়া বেড়াই
এই আশা অবিরল"।

আশার আহ্বান পশিবে যখন
ব্যথিত-প্রাণে,
অতীত কাহিনী জাগিয়া উঠিবে
স্মৃতির গানে,
ভাবিয়া জীবনে কেবলি ছলনা
চলিবে তটিনী বিষণ্ণ-বদনা,
শ্বাপদ-সঙ্কুলা হইবে ধরণী,
নৈশ-বিহগের কর্ণভেদী ধ্বনি
তন্দ্রামগ্ন-ধরা-শ্রবণে পশিবে,
অলস নয়ন বারেক মেলিবে,
উচ্চ মহীরুহ উর্দ্ধশির করি
দাঁড়াইয়া যেন ধরার প্রহরী
হেরিবে অম্বর-তল,
তিমিরে আবৃত হবে দশদিক,
লও বাস খুঁজি বিপন্ন পথিক,
রজনী ঘনায়ে এল।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুরঞ্জন ঘোষ।

# গারোজাতির বিবরণ।

১৩। শিশুপালন ও চিকিৎসা প্রণালী। গারোরমণীগণ গর্ভাবস্থায় যথারীতি শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে, এবং তাহাদের প্রায়শঃ বিকৃত প্রসব হয় না। সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে, নানা প্রকারে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনবশতঃ বিকৃত প্রসবের বাহুল্য দেখা যায়। অত্যধিক বিলাসিনী রমণীগণই প্রসব-সময়ে বিপদ্গ্রস্তা হইয়া থাকেন। সন্তান

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, পুত্র হইলে, পাঁচ দিন এবং কন্যা হইলে সপ্তাহ পর, গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহার কেশ ছেদন করাই গারোদের নিয়ম। শিশুকালে ইহাদের মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। বাল্যাবস্থায় গারোগণ অতিশয় রুগ্ন থাকে। কিন্তু বয়োবৃদ্ধিসহকারে ইহারা ক্রমে দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। দন্তোদ্‌গমের পর হইতে, শিশুকে অন্ন (ভাত) খাইতে দেওয়া হয়। সেই সময় হইতেই তাহাকে মদ্য পান অভ্যাস করান রীতি। অনেক সময়, মাতা নিজে ভাত চর্ব্বণ করিয়া, নরম হইলে, তাহা নিজ সন্তানকে ভক্ষণ করায়। কোন প্রকার গৃহকর্ম্ম কিংবা কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকার সময়, মাতা সন্তানকে এক খণ্ড বস্ত্রে জড়াইয়া স্বীয় পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত করিয়া রাখে। এই সময়ে, সূর্য্যের প্রখর কিরণ-জাল অথবা অজস্র বৃষ্টি-ধারা শিশুর গাত্রে পতিত হইতে থাকে। ইহাতে সে ক্রমে Sun এবং Waterproof অর্থাৎ শীতাতপসহিষ্ণু হইয়া উঠে। অতি বৃষ্টি সম্পাতে বালকের আবরণস্বরূপ একখানা পাতিদ্বারা ( ছত্র নির্ম্মাণার্থ এক প্রকার তৃণ বিশেষ ) নির্ম্মিত ছত্র ব্যবহার করা হয়। শিশু পীড়াগ্রস্ত হইলে, তাহারা কোন প্রকার ঔষধ সেবন করায় না। রোগ-নিবারণ জন্য অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে বিধান দিয়া থাকে। বিধান দেওয়া কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, অতএব সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

শিশু পীড়িত হইলে, গ্রামস্থ একব্যক্তিকে ( যে দেবতা আহ্বানে পটু ) আহ্বান করিয়া তাহা কর্তৃকই বিধান দেওয়া হয়। 'দেও' আহ্বানার্থ আগতব্যক্তি প্রথমতঃ একটি বংশনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ধনুকে সূত্র বিলম্বিত করিয়া দেখিবে যে, সূত্রটি দোদুল্যমান হয় কি না। যদি তাহা হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন, অর্থাৎ দেবতা পূজোপহার গ্রহণে অভিলাষী এবং রোগ-শান্তি সুনিশ্চিত। দেবতা প্রসন্ন হইলে, একটি পশু ( ছাগ শূকর প্রভৃতি ) হনন করিয়া বিধান দিলেই রোগের উপশম হয় বলিয়া গারোদের বিশ্বাস। এতদর্থে হত পশু ভক্ষণ করা পাপজনক; অতএব তাহা কেহ গ্রহণ করে না। রোগ-শান্তির জন্য আমরাও অভীষ্ট দেবতার নিকট ছাগ ও মহিষ বলি দান করিয়া থাকি। ইহাকে মানসিক বলা হয়। ইহাতে দেবতা কত দূর সন্তুষ্ট হন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা ক্ষুদ্র মানব, তাহার কি বুঝিব ? সম্প্রতি সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে যেমন আহার, বিহার ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, চিকিৎসা-প্রণালী সম্বন্ধেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অধুনা অনেক তথাকথিত সভ্য গারো ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। আমরা বলি, রোগ-শান্তি উপলক্ষে বিধান দেওয়াতেই যদি অভীপ্সিত ফল লাভ হয়, তবে তাহা নিন্দনীয় হইবে কেন ? যে কোনও উপায়েই হউক, রোগের উপশম হইলেই যথেষ্ট।

## ( ১৪ ) মৎস্য ধরা ও শিকার।

গারোগণ বিবিধ উপায়ে মাছ ধরিয়া থাকে। ফলতঃ এবিষয়ে জগতে যত প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, বোধ হয়, আর কোন বিষয়েই তদ্রূপ হয় নাই। কি সভ্য কি অসভ্য, সর্ব্ব-অবস্থার মানবই মৎস্য ধরার জন্য নিয়ত সচেষ্ট। গারোগণ নানা প্রকার জাল, ছিপ, খরাই ( এক প্রকার লৌহাস্ত্র ) প্রভৃতি মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু জলে নিমজ্জিত হইয়া মৎস্য ধৃত করার কৌশলটিই বিস্ময়জনক। এক এক জন ডুবুরী গারো প্রায় ৪।৫ মিনিট, কি ইত্যধিক কাল জলে নিমগ্ন থাকিয়া, অদ্ভুত উপায়ে মাছ ধরিয়া ভাসমান হয়। দেখিলে মনে হয়, ডুবুরী বুঝি, অতল জলে চিরতরে বিলীন হইল। কিন্তু সহসা মৎস্যসহ তাহাকে উত্থিত হইতে দেখিয়া সে ভ্রান্তি দূর হইয়া যায় এবং চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা মাছ ধরার জন্য জলে নিমজ্জিত হওয়ার সময়, একটি জালের থলিয়া সঙ্গে নিয়া যায়, এবং সেটি জলনিমগ্ন প্রস্তরের গর্ত্তমুখে ধারণ করতঃ তৎস্থিত মৎস্যকে হস্তদ্বারা কৌশলে থলিয়া মধ্যে নিয়া মুখ বন্ধ করে, এবং তৎসহ জল হইতে উত্থিত হয়। এ দৃশ্য বিচিত্র। গারোগণ ক্রমাগত তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই উপায়ে মৎস্য ধরিয়া থাকে। মৎস্য ব্যতীত গারোগণের আহার ঘটে না। তবে অভাবে সকলই সম্ভবে। কারণ "বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্।" মাছ ধরার জন্য গারো স্ত্রী পুরুষ উভয়েই প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। এখন শিকার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করার ইচ্ছা করি। গারোগণ প্রায়শই বল্লম (Spear) দ্বারা শূকর ইত্যাদি বধ করে। বন্য শূকরগুলি তৃণ দ্বারা এক প্রকার বাসা প্রস্তুত করিয়া বাস করে। তদবস্থায় গারোগণ সহজেই বল্লম দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হয়। ইহারা তীর ধনুকের চালনে তত পটু নহে। আজকাল কেহ কেহ বন্দুক ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিয়াছে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দ্বারা হত শূকর হরিণ ইত্যাদি আহরণ করিয়া ইহারা ভক্ষণ করে। হিংস্র পশু দেখিলে গারোগণ ভীত হইয়া পলায়নপর হয়। ইহারা পলায়ন বিষয়েও বৃক্ষারোহণে অতিশয় পটু। শিকার ব্যাপারে গারোগণ বিশেষ প্রশংসার্হ নহে। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বক্তব্য নাই।

### উপসংহার।

গারোজাতির বিবরণ প্রসঙ্গে প্রায় সমস্ত বক্তব্য বিষয়ই সংক্ষেপে বলা হইল। এই প্রবন্ধ পাঠকবর্গের প্রীতিজনক হইয়াছে কি না, তাঁহারাই বলিতে পারেন। তবে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, ফলাফল সর্ব্বনিয়ন্তার হস্তে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, যদি প্রবন্ধে কোন প্রকার ভ্রম ও প্রমাদ লক্ষিত হয়,তবে পাঠকগণ অনুকম্পা পুরঃসর মার্জ্জনা করিবেন। প্রবন্ধে গারোদের পশুচালন সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিয়াই পাঠকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

গারোগণ দুগ্ধবতী গাভী পালন করে না; আজ কাল কেহ কেহ করিয়া থাকে। আহারার্থ ষণ্ড পালন করে। অধুনা কেহ কেহ হলচালনের জন্য বলীবর্দ্দ পালন করিয়া থাকে। ইহারা রসনাতৃপ্তি ও উদর পূরণের জন্য শূকর, কুক্কুট, হংস পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাংএর (বাসগৃহের) নিম্ন দেশে একটি স্থান বংশাদি দ্বারা সুদৃঢ়-রূপে বেষ্টিত করিয়া তাহাতেই রাত্রিকালে পালিত পশ্বাদি রক্ষা করে। সম্প্রতি কেহ কেহ মহিষও পালন করিতেছে। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। অতএব এই স্থানেই প্রবন্ধ শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি এ,
(মহারাজা সুসঙ্গ)

# ভারতে কিসের অভাব?

এ দেশীয় সঙ্গীতে সামান্যতঃ কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে। তন্মধ্যে সাধন-সঙ্গীত বা বন্দনা-গীতি সমস্ত সঙ্গীতের মুখবন্ধ। ভক্ত-জন-বাঞ্ছিত পরমার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্তির কামনা সাধন-সঙ্গীতের একমাত্র লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে রামপ্রসাদ ও দাশরথির মালসী, সকলের আদর্শ স্থানীয়। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীত ভক্তির মহা-উৎস স্বরূপ, অথবা পরমার্থ তত্ত্বের চরম নিদর্শন। তাহা শ্রবণ করিলে, পাষাণ-কঠিন প্রাণেও দ্রবময়ীর লীলা-তরঙ্গের ন্যায় ভক্তির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়। দাশরথির মালসীতে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পূর্ণ সমাবেশ। কবিত্বের আলোকে ভক্তির কুসুম কিরূপ প্রস্ফুটিত হয়, উহা তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অধ্যাত্ম-সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে রামমোহন রায় অন্যতম। তাঁহার রচিত অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সঙ্গীতনিচয় সর্ব্বাংশে অতুলনীয়। এরূপ পরমার্থ সঙ্গীত অন্য দেশে নিশ্চয়ই সুদুর্ল্লভ। রামপ্রসাদ ও দাশরথির গান অদ্যাপি লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। জল বুদ্বুদের ন্যায় কত রাজ্যের উত্থান পতন হইতেছে, কিন্তু উহার অখণ্ড রাজত্ব কদাপি বিচলিত হইবার নহে। ভক্তির উৎস যে পর্য্যন্ত মানবের হৃদয়-কন্দরে প্রবাহিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এ অমর-সঙ্গীতের বিনাশ সম্ভাবনা নাই।

রাধা কৃষ্ণের অনন্ত-প্রেম-কাহিনী ভারতীয় সঙ্গীতের অস্থিমজ্জা। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দ দাস ও বলরাম দাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ এই প্রেম-গাথা রচনা করিয়া প্রেমের উৎস ছুটাইয়া দিয়াছেন। বিলাস-রসের রসিক বাঙ্গালী সেই আদি রসের তরল-সঙ্গীতে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া, আত্মহারা হইয়াছিলেন। সুতরাং, তদীয় ছন্দানুবর্ত্তনে যে প্রেম-সঙ্গীত রচনার বাহুল্য হইবে, বিচিত্র কি? রাম বসু,

হরুঠাকুর, নিতাই দাস, সাতু রায়, সীতা নাথ মুখোপাধ্যায়, পরাণ চাঁদ, নিধু বাবু ও শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রেম-সঙ্গীত প্রেমের জীবন্ত প্রবাহিণী! ইহার আবেগ উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ-ভঙ্গ ও অবিরামবাহি সজীব ধারায় তাপদগ্ধ বাঙ্গালীর মনঃপ্রাণ সুশীতল করিয়াছিল। প্রেম, বিরহ, মিলন, পূর্ব্বরাগ, বয়ঃসন্ধি প্রভৃতি প্রেমবৈচিত্র্যের যত প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইতে পারে, উল্লিখিত আদর্শ-সঙ্গীতে তাহা অতি সুচারু বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়াছে। প্রেম-সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে রাম বসু ও নিধু বাবু সর্ব্বাগ্রে পুষ্পাঞ্জলি পাইতে অধিকারী। পীযূষ-বর্ষি মধুর সঙ্গীত-ধারায় ইহাঁরা এক সময় বঙ্গভূমি মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। এক আদি রস সম্বন্ধেই কত ভাবের কত সঙ্গীত এ দেশে রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। একমাত্র পারস্য ভাষায় রচিত প্রেম-গাথা ভিন্ন ভারতীয় প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতের উপমাস্থল জগতে অতি বিরল। সমুদ্রের লহরী গণনা করা সহজ, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। অন্য দেশীয় অনেক ভাষার কাব্যে যাহা নাই, ভারতীয় প্রেম-সঙ্গীতে সেই সমস্ত অপূর্ব্ব কবিত্ব ও ভাবুকতা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। ইহা সামান্য স্পর্দ্ধার কথা নহে।

মহাকাব্যের আদ্যোপান্ত যেরূপ একটি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক ঘটনার সূত্রে নিবদ্ধ থাকে, যাত্রার পালা গানও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাশরথি রায়, গোপাল উড়ে, গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতের ন্যায় যাত্রার পালা রচনায়ও দাশরথি রায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় দেশময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অলঙ্কার সমাবেশে কবিত্বের সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয় কি না, এ সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দিহান হন, তাঁহারা একবার বিদ্যাসুন্দর যাত্রা পাঠ করিয়া দেখিবেন। অশ্লীলতা ব্যঞ্জক বলিয়া আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহা ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। রুচি সম্বন্ধে ইহা সত্য হইলেও সঙ্গীতের লালিত্য মাধুর্য্য ও কাব্যাংশে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই। জীবিতকালে সমাজে যশোলাভ করা অনেক গ্রন্থকারের ভাগ্যেই ঘটে না। কিন্তু গোপাল উড়ে ও দাশরথি রায় তাহাতে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। নীলকণ্ঠের সরল, তরল ও কবিত্বপূর্ণ সঙ্গীত সর্ব্বথা কবি লেখনীর উপযোগি, সন্দেহ নাই। গোবিন্দ অধিকারী এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালা গান বিবিধ ছন্দ ভূষণে ভূষিত হইলেও, ভাষা সংস্কৃতের ছন্দানুবর্ত্তিনী ও অনুপ্রাস-বহুলা। এই হেতু সাধারণ শ্রোতার পক্ষে কিঞ্চিৎ মাত্রায় দুর্ব্বোধ হইলেও, উহা কাব্যাংশে উচ্চ স্থানীয়। সুতরাং কখনও উপেক্ষার জিনিষ নহে। আধুনিক বাক্‌সর্ব্বস্ব যাত্রা গানের ন্যায়, উল্লিখিত

সঙ্গীত কবিত্ব-সম্পদ-বিহীন অথবা লালিত্য-মাধুর্য্য-শূন্য নহে।

ভারতীয় সঙ্গীতের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে সাধন-সঙ্গীত ও প্রেম-সঙ্গীতের ন্যায় জাতীয় সঙ্গীত, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব দেহতত্ব সামাজিক ও ঐতিহাসিক সঙ্গীত এবং আগমনী ও বিজয়া প্রভৃতি কত ভাবের কত সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া উঠে। এই সমস্ত সঙ্গীত কবিত্ব সম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য, সন্দেহ নাই। সামান্য ভিক্ষার্থী বৈরাগী দ্বারে দ্বারে খঞ্জনী বাজাইয়া মুষ্টিভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহার মুখেও উচ্চ পরমার্থ তত্ত্বের সঙ্গীত শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বস্তুতঃ, ভারতকে সঙ্গীতশালা নাম দিলে, নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

প্রাচীন কালে কাব্য গ্রন্থাদি রচনার প্রথা প্রচলিত ছিল না। কবিগণ আপনাদের মানসিক ভাবের উচ্ছ্বাস সঙ্গীত-স্রোতে ঢালিয়া দিয়া শ্রোতার হৃদয় বিমুগ্ধ করিতেন। শাদা কাগজে কালির আঁচড় দেওয়া সেকালে প্রথা ছিল না, সুতরাং, উহাও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিত। সেই সমস্ত প্রাচীন আদর্শ-সঙ্গীত গুলির অধিকাংশই বিলুপ্তপ্রায়। অধুনা ভারতীয় সঙ্গীতের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার কল্পে যে সমস্ত মহাত্মা প্রাচীন সঙ্গীত-সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বাংশে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

এইরূপ নৃত্য সম্বন্ধেও ভারতে বহুল বিচিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। নৃত্যে কিরূপ মনোজ্ঞ অঙ্গভঙ্গী ও কত রূপ ভাবের বিকাশ হইতে পারে, যাঁহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নৃত্য পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই উহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। "নৃত্যে কখনও নর্ত্তকীর করদ্বয়ে ডমরু বেণুরব-প্রোৎসাহিত গম্ভীর ভুজঙ্গ ফণায় ধীর মৃদু চাপল্য অভিনীত হয়। কখনও বাহুদ্বয়ে, উড্ডয়ন-চতুর ক্রীড়মান পক্ষীর পক্ষের নানা প্রকার লীলা বিধুনন অভিনীত হইতে থাকে। * * * নর্ত্তকী কভু নারীর পুষ্পাবচয়ন অভিনয় করে, কভু লজ্জাবতীর দেহের সলজ্জ ভাব,চরণের সলজ্জ গতি কভু যুবতী বিলাসিনীর বিলাস-ভাব, বিলাসগতি, কভু খণ্ডিতার ক্রোধ, কভু নবযৌবন চপলার নানা ছন্দে বক্ষলগ্ন করতল শয্যাশায়ী শিশু-সোহাগ অভিনয় করে।" * নৃত্য কোমল ও মনোজ্ঞ-ভাব-ব্যঞ্জক। পুরুষের নৃত্য দেখিলে দর্শকের মনে কেমন একটা বিসদৃশ ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, মাধুর্য্য কি কোমলতার লেশ মাত্রও অনুভূত হয় না। যখন নব-কুসুমিতা ব্রততী মৃদু মারুত-হিল্লোলে মন্দ মন্দ নাচিতে থাকে, সে দৃশ্য কত মধুর! আর যখন রত্নাভরণা তন্বঙ্গী রূপের ছটা বিকাশ করিয়া লীলা মধুর পাদক্ষেপে ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে, সে দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার না নয়ন পরিতৃপ্ত হয়? সুতরাং, নৃত্যস্থলে পুরুষকে রমণী বেশে না

* বঙ্গদর্শন চতুর্থ খণ্ড, নৃত্যশীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

সাজিলে অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে এ দেশে কোনরূপ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে দেশীয় কোন্ কোন নৃত্যে অশ্লীলতার ছায়া আছে বলিয়া, অনেকেই তৎপ্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করেন। অনেকে আবার সুরুচির ধূয়া ধরিয়া দেশীয় নৃত্যের নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ইহা কি সঙ্গত? দেশীয় নৃত্য যাহাতে অশ্লীলতা পরিশূন্য হইয়া সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত হইতে পারে, তৎপক্ষে সচেষ্ট হওয়াই উচিত। মনোমোহকারিতা গুণে ভারতীয় নৃত্য সর্ব্বাংশে অতুলনীয়। অন্য দেশীয় নৃত্য ইহার তুলনায় বিকট অঙ্গভঙ্গী মাত্র। গন্ধর্ব্বকণ্ঠানুকারি সঙ্গীত ও অপ্সরীর ন্যায় নৃত্য ভারত-ভূমি ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবে না। শ্বেতাঙ্গিনী মহিলাদের নৃত্য সন্দর্শন করিলে মনে প্রথমতঃ এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, ইহা নৃত্য না ব্যায়াম? বস্তুতঃ, বিবিধ-লীলা-তরঙ্গময় দেশীয় নৃত্য সন্দর্শনে মনে কোমল ভাবের যে উচ্ছ্বাস জন্মে, ইউরোপীয় মহিলাদিগের নৃত্যে তাহা কিছুতেই আশা করা যায় না। বরং ব্যায়াম ক্রীড়ায় যেরূপ অঙ্গ-সঞ্চালন সম্ভব, উল্লিখিত নৃত্য তাহারই পরিস্ফুট দৃশ্য বিশেষ। সুতরাং, সুরুচিসম্পন্ন ভাবুকের মনে ইহাতে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ, সঙ্গীতের ন্যায় নৃত্য সম্বন্ধেও ভারত একমাত্র আদর্শস্থানীয়।

এ দেশে কতরূপ বাদ্য যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তন্মধ্যে শ্রুতি-বিনোদন সঙ্গীতের উপযোগি যন্ত্রেরই এ দেশে বাহুল্য। সেতার, এস্রার, বীণ্, বেণু, সুরবাহার, শরদ, সারঙ্গী, একতারা তানপুরা, রবাব্, ঢোলক, তবলা, পাখোয়াজ, খঞ্জনী, ডমরু প্রভৃতি সুমধুর বাদ্যযন্ত্রনিচয় সঙ্গীতের উপযোগী। আবার সঙ্গীতের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতে বিভিন্ন রূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ভারতে চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সভ্যতম ইউরোপীয় সমাজে সঙ্গীতের উপযোগি যন্ত্র বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। সে দেশে যে সমস্ত বাদ্য-যন্ত্র-সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই রুধির-ধারা-বিহারিণী রণ-রঙ্গিণীর প্রধান সহচর। সঙ্গীতের সহিত তাহার কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। বিবিধ তানলয়-সংযোগে সুমধুর বাদ্য শ্রবণে কোথায় হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবে, না—জয়ঢাক্, দামামা, দুন্দুভী, ভেরী, তূরী, বিগল্ প্রভৃতির কর্ণপটহভেদকারী গভীর গর্জ্জনে হৃদয় ভয়ে অবসন্ন ও আতঙ্কে চমকিত হইয়া উঠে! বস্তুতঃ ইউরোপীয় অধিকাংশ বাদ্যযন্ত্রগুলি রণক্ষেত্রের যেরূপ উপোযোগি, আমোদ প্রমোদ বা নৃত্য গীতের তেমন সহযোগি নয়। ভারত এ সম্বন্ধে তুলনারহিত। বাদ্যযন্ত্রের এরূপ চরমোৎকর্ষ সাধন, অন্য দেশে নিশ্চয়ই সুদুরপরাহত।

( ক্রমশঃ )

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

# অভিশাপ।

## ( উপন্যাস। )

---

### উপক্রমণিকা।

### দৈববাণী।

নিদাঘের মধ্যাহ্ণ। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, মধ্য-গগনে, ভৈরবমূর্ত্তিতে বিরাজমান। প্রখর কিরণ ও দারুণ উত্তাপে দগ্ধ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। বৃষ্টি অভাবে কৃষককুল ধানের বীজ বপন করিতে পারে নাই। কেবল এখানে সেখানে, দুই চারি খানি ক্ষেতে, হরিদ্বর্ণ ইক্ষুগাছগুলি কিরণ-ক্লিষ্ট নয়নে ঈষৎ একটু শান্তি দান করিতেছে। কোন কোন স্থানে, বৃহৎ পাদপের শীতলচ্ছায়ায়, আতপ-ভীত গাভীর পাল শয়ন করিয়া, নয়ন মুদিয়া রোমন্থনে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কোথাও, দুই একটি কৃশকায় কৃষক মস্তকে কাঠের বোঝা লইয়া মাঠের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আকাশের গায়, কোন স্থানে, মেঘের একটি সূক্ষ্ম রেখাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। গ্রীষ্ম-পীড়িত ক্লান্ত জগৎ নীরব ও নিস্তব্ধ।

একটি পথিক, পল্লী গ্রামস্থ মাঠের কাঁচা পথে, নগ্নপদে ও অনাবৃতমস্তকে, রৌদ্র-মাখা ধূলিরাশি অতিক্রম করিয়া, ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছেন। পথিক বড় পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত। সম্মুখে, অদূরে, বড় বড় গাছের আশে পাশে, কএকখানা চালা ঘর দেখা যাইতেছে। উহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঐ গ্রামের পার্শ্বে, মাঠের ধারে, তাল-বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত একটি জলাশয়। জলাশয়ের অধিকাংশই পানা ও শৈবালে আচ্ছাদিত। কিশোরবয়স্ক দুটি বালক পুষ্করিণীর তটে বসিয়া মাছ ধরিতেছে। একটি ক্ষুদ্র বালিকা তাহাদিগের নিকটে। বালিকা, সেই নিদাঘ-মধ্যাহ্ণে বাপীতীরে বসিয়া, সুন্দর মুখমণ্ডলের উভয় পার্শ্বে লম্বমান অলকগুচ্ছ দোলাইয়া দোলাইয়া খেলা করিতেছে, আর এক এক বার উভয়ের ধৃত মৎস্যগুলি গণিয়া গণিয়া কাহার কটা বেশী হইল, তাহা ঠিক করিয়া লইতেছে।

ভ্রমণ-শ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্তকলেবর, পিপাসিত পথিক, ঐ পুষ্করিণীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ধীর-পাদ-বিক্ষেপে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিয়া, অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিলেন; এবং কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া লইবার প্রত্যাশায় সরোবর-তটে বসিয়া, বালক বালিকাদিগের সরল কথোপকথন শ্রবণ ও মৎস্য শিকার দর্শন করিতে লাগিলেন।

বালক দ্বয়ের মধ্যে একজন একটা শফরী শিকার করিল। বালিকা দেখিয়া করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল ও কহিল—"আবার একটা উঠেচে। বড়দাদা দুটো হেরে গেলে, আমাদের পনরটা হ'ল।"

দাদা বলিল;—"আচ্ছা তোর সতীশ দাদা ত বেলে মাছ ধর্‌তে পারে নি!"

সতীশ।—বেলেও আবার মাছ, আমি মনে কর্‌লে কত ধর্‌তে পারি!

বালিকা।—আমাদের ত দুটো বেসী।

এই সময় বালিকার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপেক্ষাকৃত একটা বড় মৎস্য গাঁথিল। বালিকা নিস্তব্ধভাবে একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল এবং মনে মনে যেন বলিল,—"এইবার সতীশ দাদাকে হার্‌তে হ'ল।" সতীশচন্দ্র হাসিয়া বলিল,—"হিরণ, আমাদের সেই মাছটা নলীনের ছিপে খেয়েছে।"

নলীন বলিল,—"হাঁ তোমাদের ছিপ মনে ক'রে, ভুলে আমার টোপ খেয়েছে।"

এই কথা বলিতে বলিতে মাছ খুলিয়া গেল।

হিরণ্ময়ী, "কেমন বড়দাদা খুলে গেছে ত," এই বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পথিক বিনা বাক্যব্যয়ে এই দৃশ্য দেখিলেন। বালিকার প্রতিই তাঁহার মনোযোগ বেসী। তিনি অনেক ক্ষণ, স্থির দৃষ্টিতে, বালিকার সূর্য্যালোক-উদ্ভাসিত, কোমল ও প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া কত কি ভাবিলেন, তৎপর বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।—

"মা, এ স্বর্গকান্তি নিয়ে কেন এ পাপ পৃথিবীতে এসেছ? তোমার অন্তরের মহত্ব সংসারের কয় জন লোকে বুঝ্‌বে? আজ তুমি যে সহচর বালককে এই নিষ্ঠুর ক্রীড়ায় জয়ী হ'তে দেখে এত আনন্দ কর্‌চো, ঐ বালকই পরে তোমার মৃত্যুর কারণ হ'বে। জীবনে আশা বাসনা বহু, কিন্তু মিট্‌বে না।" বলিতে বলিতে পথিকের নয়নপ্রান্তে এক বিন্দু অশ্রু গলিয়া ললাটস্রুত স্বেদ-বিন্দুর সহিত মিশিয়া গেল। পথিক মুখ ফিরাইয়া সতীশের পানে চাহিয়া কহিলেন,—"আর সতীশ, তোমার ললাটলিপিও এইরূপ। তুমি এই শিশু বালিকাকে বড় ভালবাস। তুমি জান্‌তেছ না, বুঝ্‌তেছ না, অজ্ঞাতসারে জীবনের সকল সাধ,—সমস্ত আশা, থরে থরে এই শিশুর জীবনের সহিত গেঁথে ফেল্‌চো। কিন্তু সাবধান, এই বালিকাই একদিন তোমার মৃত্যুর কারণ হ'বে। যতদূর পার, দুজনে পৃথক্ থাক্‌তে চেষ্টা ক'রো। কিন্তু, হায়! তা পার্‌বে কি?"

হিরণ্ময়ী শিশু। সে এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিল না। ডাগর চোখ দুটিকে আরও ডাগর করিয়া পথিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সতীশ বলিলেন;—"ঠাকুর তুমি কি ভবিষ্যৎ বল্‌তে পার?—পিপাসা পেয়েছিল, জলপান করেচ, বেস, এখন আপন পথে সোজা চলে যাও।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আমি পথিক। এখনই চ'লে যাচ্ছি। বৎস! তুমি বালক, সামান্য জ্ঞানে আমার কথায় অবজ্ঞা করো না,

এক দিন হয় ত, আমার কথা মনে ক'রে অনুতাপে দগ্ধ হ'তে হবে।”

আগন্তুক চলিয়া গেলেন। বালকদ্বয় ও বালিকা পূর্ব্ববৎ সকৌতুকে মৎস্য শিকারে ব্যাপৃত রহিল।

---

## প্রথম খণ্ড।

### প্রথম পরিচ্ছেদ।

### কর্ত্তার পরলোক-প্রাপ্তি।

বৃদ্ধ কবিরাজ রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট কবিরাজ মহাশয় কিয়ৎকাল নীরব ও নিস্পন্দ ভাবে রোগীর প্রতি স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া, গভীরভাবে কি চিন্তা করিলেন। তৎপর ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া, রোগীর পার্শ্ব হইতে কিছু দূরে যাইয়া, শচীকান্ত বাবুকে মৃদুস্বরে বলিলেন,—“তীরস্থ করিবার এই ঠিক সময়।”

এই সংবাদ অন্তঃপুরস্থ রমণীগণের কর্ণে প্রবেশ করিতে বিলম্ব হইল না। কর্ত্তার জীবনের সকল আশা যে ফুরাইয়া গিয়াছে, সকলেই ইহা বুঝিল; এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দনের রোল দ্বিগুণ করিয়া তুলিল। কন্যা লীলাবতী একবারে অধীরা হইয়া, পিতার মুখের উপর পড়িয়া “বাবা! বাবা গো!— আমাদেরে ফেলে কোথা যাও বাবা। একবার কথা কও বাবা,”—ইত্যাদি বলিয়া, উন্মাদিনীর মত কাঁদিতে লাগিল। কর্ত্তার একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ শৈশবেই মাতৃহীন হইয়াছিলেন। সুতরাং, সে শোক তখন তিনি অনুভব করিতে পারেন নাই। এই তাঁহার জীবনের প্রথম শোক। তিনি পিতার অবস্থা দেখিয়া আকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন। শচীকান্ত দাদা ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। তিনি সংসারের কোন বিষয়ে কোন খবর লইতেন না। আজি সেই দাদা বিপন্ন। পিতৃসদৃশ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত চির-বিয়োগের সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া, তিনি চক্ষে আঁধার দেখিলেন এবং বসনে মুখ ঢাকিয়া, গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া, বালকের মত, রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধগণ পর্য্যন্ত, যাহার সহিত যে সম্বন্ধ, সে তাহাই বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বাটীস্থ সকলেই শোকাচ্ছন্ন।—কে কাহাকে প্রবোধ দিবে, কে কাহাকে নিবারণ করিবে?

দেখিতে দেখিতে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-বর্গে বাটী পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেই—‘হায়! হায়’ করিতে লাগিল। রায় মহাশয়ের নিকট উপকৃত এবং তাঁহার অধীন ও আশ্রিত জনেরা তাঁহার সদ্‌গুণরাশির উল্লেখ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অকারণ তীরস্থ করার সময় নষ্ট হইতেছে ভাবিয়া, প্রাচীনেরা সকলকে চুপ করিতে বলিলেন। শচীকান্ত বাবু ধীর-প্রকৃতির লোক, তিনি অতি কষ্টে সর্ব্বাগ্রে ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং পরিজন আত্মীয়বর্গকে কিঞ্চিৎপরিমাণে শান্ত করিয়া, সময় উচিত অনুষ্ঠানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাটীর কর্ত্তা,—মুমূর্ষু রমাকান্ত রায় শচীকান্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর। গ্রামের লোকে,

রমাকান্ত রায়কে রায় মহাশয় বা বড় বাবু বলে। গ্রামের নাম মাণিক নগর। মাণিক নগরের রায় পরিবার বনিয়াদি ঘর ও বড় জমিদার। রায় মহাশয় সাধারণতঃ ধার্ম্মিক ও দয়ালু বলিয়া বিখ্যাত। গ্রামস্থ দুঃখী দরিদ্রদিগকে সাহায্য ও সহানুভূতি দান করিতে, মধ্যস্থ বা সালিসরূপে লোকের বিবাদ মিটাইতে, হাস্য পরিহাস ও প্রিয়-সংলাপে লোককে আপ্যায়িত করিতে, তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি, মাণিক নগরের মধ্যে, আর দ্বিতীয় একটিও নাই বলিলেও অন্যায় হয় না। কোন না কোন প্রকারে রায় মহাশয়ের নিকট ঋণী নহে, এরূপ লোক ঐ ক্ষুদ্র নগরে এক জনও ছিল কি না, সন্দেহ। এই হেতু, আজ সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, সকলের মুখেই হাহাকার।

রমাকান্তের সংসারে, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র বা পুত্র কন্যার সংখ্যা অধিক না হইলেও, দূরসম্পর্কিত আত্মীয় কুটুম্বের অভাব নাই। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার মৃত্যু সময়ে, রমাকান্তের বয়ঃক্রম মাত্র ত্রিংশৎ বৎসর ছিল। তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার কএক বৎসর পরেই, সাধ্বীপত্নী কন্যা লীলাবতী ও পুত্র সত্যেন্দ্র নাথকে পতির হস্তে সঁপিয়া দিয়া, স্বর্গারোহণ করেন। রায় মহাশয় ইহার পরে আর বিবাহ করেন নাই। এক্ষণ তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ষাট বৎসর, পুত্রের বয়স একবিংশতি। কন্যা, সত্যেন্দ্র অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট। রায় মহাশয়ের কিছু-রই অভাব নাই। পুত্র লেখা পড়া শিখিয়া-ছেন; বিষয় কর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ। তাঁহার কেবল একটি আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি পুত্র-বধূর মুখ দেখিয়া মরিবেন, মনে মনে এইরূপ আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা আর হইল না। বিবাহের শুভ-সম্বন্ধ একপ্রকার স্থির হইয়াছিল, এমন সময়, কোথা হইতে, এই কাল-ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল!

যখন কবিরাজ মহাশয় রায় মহাশয়ের নাড়ীর অবস্থা ও অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া তীরস্থ করিবার পরামর্শ দেন, তখন সন্ধ্যা আ-গতপ্রায়। তীরস্থ করিবার সকল আয়োজন শেষ হইতে, রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। মাণিক নগর হইতে গঙ্গা প্রায় সার্দ্ধতিন-ক্রোশ দূরে। শ্রাবণমাস। প্রাবৃট্ বারি-ধারার নিবৃত্তি নাই। সেদিন কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী। গাঢ় তমসাবৃত সেই দুর্য্যোগের রজনীতে বাহির হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ভা-বিয়া, সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এদিকে সৌভাগ্য বশতঃ রোগীর অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল বোধ হইতে লাগিল। বিজ্ঞেরা নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"এখন নাড়ীর অবস্থা ভাল বোধ হচ্চে, এখন কোন চিন্তা নাই। কাল প্রাতে যা হয়, দেখা যাবে।" শেষে প্রাতে লইয়া যাওয়াই স্থির হইল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় রায় মহা-শয়ের চেতনা পুনঃ ফিরিয়া আসিল। তিনি

আবার সজ্ঞানে কথা কহিতে লাগিলেন। তখন গৃহ মধ্যে কঠিন-মর্ম্মর-মণ্ডিত অনাবৃত মেজেয় লীলা নিদ্রিত ছিল। রোগীর শিয়রে শচীকান্ত ও রায়পরিবারের চিরবিশ্বস্ত প্রাচীন কর্ম্মচারী মাধব ঘোষ বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। রমাকান্ত একটু দুগ্ধ পান করিতে চাহিলেন। শচীকান্ত অমনি গৃহান্তর হইতে অগ্ন্যুত্তাপে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ একটু আনিয়া দাদাকে পান করাইলেন। রায় মহাশয়, ক্ষণেক পরে শচীকান্ত ও মাধবকে বলিলেন,—"আমি এখন ভাল আছি, তোমরা একটু বিশ্রাম কর গে। সত্যকে ডেকে দাও, সে একবার আমার কাছে এসে বসুক।"

শচীকান্ত বলিলেন,—"আপনি সে জন্য ভাব্‌বেন না। আমাদের কোন কষ্ট নাই। সত্যেন ছেলে মানুষ, সেই একটু বিশ্রাম করুক।"

রমাকান্ত ইহাতে ঈষৎ একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিলেন। সুতরাং শচীকান্ত আর আপত্তি করিলেন না, মাধব ঘোষকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে অন্যত্র গমন করিলেন এবং সত্যেন্দ্রনাথকে পার্শ্বের গৃহ হইতে কর্ত্তার কক্ষে পাঠাইয়া দিলেন। সত্যেন্দ্র একাকী বসিয়া পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে সবে মাত্র তন্দ্রাভিভূত হইতেছিলেন, চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সত্যেন তখন পিতাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং ধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, এখন কেমন আছেন?"

রমাকান্ত।—এখন অনেক ভাল আছি, কোন কষ্ট নাই। কিন্তু শরীর ক্রমে অবসন্ন হ'য়ে আস্‌চে। বেশী কথা কহিতে কষ্ট হয়।

সত্যেন্দ্র।—কথা কওয়ার আবশ্যক নাই।

রমাকান্ত।—না, বাবা সত্যেন, আমার শেষ সময় উপস্থিত। তোমায় ক'টা কথা বল্‌বার জন্যই ডেকেছি।

রমাকান্ত ইহা বলিয়া পুত্রকে একটু জল দিতে বলিলেন এবং জল পান করিয়া ক্ষণেক পরে, আবার বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! চিরকালটা সুখেই কাটিয়েছি, আমার এখন যাবার সময় হয়েচে, ইহাতে দুঃখের কথা কিছুই নাই। কিন্তু, বাবা, মনে হ'লে বুক ফেটে যায়, সে আজ অনেক দিনের কথা, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি মহা অনিষ্ট করেছিলেম।" এই কটি কথা বলিতে তিনি ক্লান্তি বোধ করিলেন। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সে ব্রাহ্মণের অভিশাপ আজও ভুল্‌তে পারিনি। আমি এ জন্য, পরে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলাম। ভট্টাচার্য্য আমায় একখানি কবচ দেন, আর মৃত্যু সময়ে কবচ খানি তোমায় দিয়ে যেতে বলেন। আজ, বাবা, সেটি তোমায় দেবো মনে করেচি। আমার হাত বাক্সে দুটি মাদুলী আর যে ছোট কবচ খানি আছে, তুমি সেই কবচ খানি হাতে বেঁধে রেখো। আর ভগবান্ যদি দেন, তবে তুমিও আবার উহা তোমার ছেলেকে দিয়ে যেও। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। প্রায়শ্চিত্ত করেচি; আমি ব্রহ্মশাপের ফল দেখ্‌-

লেম না বটে, কিন্তু আমার কেবলই মনে হয়, সে প্রায়শ্চিত্ত উপযুক্ত হয় নাই। ভগবান্ কিসে তোমাদিগের মঙ্গল কর্‌বেন জানি না"—এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধের অপাঙ্গ বহিয়া অশ্রুধারা গলিয়া পড়িল। প্রদীপের আলোকে সত্যেন তাহা দেখিলেন এবং বস্ত্রের দ্বারা উহা মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বাবা আর ও সব কথায় প্রয়োজন নাই। মনে মনে ঈশ্বর চিন্তা করুন।"

রমাকান্ত অনেক কষ্টে, অনেক সময়ে, এই কথাগুলি সত্যেনকে বলিলেন। তাঁহাকে আরও অনেক কথা এবং দুই একটি উপদেশ বাক্য বলিতেও ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সমস্ত বলিতে পারিলেন না। অতি ধীরে অস্পষ্ট স্বরে এই মাত্র বলিলেন,—"সে ব্রাহ্মণের নাম হরীশ চৌধুরী। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কাছে বসন্তবাটী গ্রামে বাস করিত। যদি সে থানে—কিংবা—অন্য—কোন স্থানে—তার পুত্র—পরিবারের কোন—সন্ধান—পাও—তবে তাদের ভরণ পোষণের—উপযোগি—একটা বৃত্তি—করিয়া দিও—আর—পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করো।—আর—পারি—না।"—

সত্যেন পিতার আজ্ঞাপালন করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। ইহার পর প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা নীরবে অতিবাহিত হইল। সত্যেন্দ্র দেখিলেন, ক্রমে আবার পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে। পিতার মুখপানে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। নেত্রদ্বয় মুদ্রিত, কিন্তু অশ্রু পতিত হইতেছে। কম্পিত-কণ্ঠে সত্যেন ডাকিলেন,—"বাবা"। কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরপি ডাকিলেন,—রায় মহাশয় একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। এবং অস্ফুটস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"লীলা—শচীন—সব—ডাক—তীরস্থের যোগাড়—কর—"

সত্যেন ব্যগ্রভাবে পিতৃব্যকে ডাকিয়া আনিলেন। বাটীর সকলেই জাগরিত হইলেন। মহিলাদিগের রোদন-ধ্বনি নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল।

এখনও নিশাবসানের প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব আছে। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল; আর ভীষণ গর্জ্জনের সহিত চপলা চমকাইতেছিল। গঙ্গাযাত্রার সমস্ত আয়োজন হইতে হইতে, পূর্ব্বগগনে আলোক প্রকাশ পাইল।

সকলে ধরাধরি করিয়া রায় মহাশয়কে বাটীর প্রাঙ্গণে, পূজার দলানের সম্মুখে, নামাইলেন। প্রাঙ্গণ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। অনেকেই রায় মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। অনেকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে হরিনাম শুনাইতে লাগিলেন। পুরবাসিনী রমণীগণের হৃদয়বিদারক করুণক্রন্দনে দিক প্রতিধ্বনিত হইল। এ অদ্ভুত শোক-দৃশ্যের বর্ণনা অপেক্ষা অনুমানই সহজ। আত্মীয় স্বজনেরা শোকার্ত্ত-হৃদয়ে, কর্ত্তাকে,একে একে দেবালয়ের সকল দেব দেবীর মন্দিরের সম্মুখে, একবার করিয়া রাখিয়া, চিরদিনের তরে বাটী হইতে লইয়া চলিল। লীলা আলুলায়িতকেশে বাটীর

বহির্দ্দেশের নিকটে আসিয়া একেবারে আছ-ড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। গ্রামের সমস্ত লোকই বিষাদ-বিস্ফারিত নেত্রে, যতক্ষণ দেখিতে পাইল, চাহিয়া রহিল।--কেহ বলিল,—"এমন লোক আর হয় না!" কেহ বলিল,—"আহা, মানুষের মত মানুষ!"

গঙ্গা যাত্রার এই শোকার্ত্ত মিছিল বেলা অনুমান আটটার সময়, সুবর্ণপুরের ঘাটে যাইয়া পহুঁছিল। ঐ দিন অপরাহ্ণেই বেস সজ্ঞানের সহিত জমিদার রমাকান্ত রায় ইহ-ধাম পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ধামে গমন করিলেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### সত্যেন্দ্রনাথের কলিকাতা গমন।

রায় মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তির দশ দিন পরে, বহু অর্থ ব্যয়ে ও মহাসমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কাঙ্গালী ও দরিদ্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে আহারীয় ও অর্থ দান করা হইল। সকলেই এক বাক্যে বলিল,—এরূপ শ্রাদ্ধ এ প্রদেশে আর কখনও হয় নাই।

জগৎ পিতা তাঁহার এই বিশাল রাজ্যমধ্যে এমন কোন মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করেন নাই, যাহা কালরূপ মহৌষধির শক্তিতে আপনি প্রশমিত না হয়। শচীকান্ত, লীলাবতী, ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতির শোক কালে অনেকটা কমিয়া আসিল। শচীকান্ত এখন কর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। পূর্ব্ববৎ আবার সমস্তই চলিতে লাগিল।

অশৌচ গত হইলে, শ্রাদ্ধের গোলমাল মিটিয়া গেলে, সত্যেন সর্ব্বপ্রথমেই, পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ একটি শুভদিন দেখিয়া কবচ হস্তে ধারণ করিলেন। শচীকান্তও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুকালীন নিদেশ পালন সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মনে করিয়া, বসন্ত বাটী গ্রামে হরীশ চৌধুরী বা তাঁহার পুত্র পৌত্রের অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্ট হেতু সেখানে কেহই তাঁহাদের কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিল না। সুতরাং, রমাকান্তের মৃত্যুকালীন আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইয়া শচীকান্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন।

নায়েব, মুহরি প্রভৃতি পুরাতন আমলাবর্গের সাহায্যে, সত্যেন্দ্রনাথ, খুল্লতাত অপেক্ষাও, জমিদারীর কার্য্য অধিকতর মাত্রায় দেখিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ মাধব ঘোষ রায়দের বাটীতে কর্ম্ম করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছেন। তিনি জমিদারী কার্য্যে যার-পর-নাই অভিজ্ঞ ও নিপুণ। তিনিই সত্যেনের প্রধান সহায়। সত্যেন পিতৃব্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া, বৈষয়িক ব্যাপারে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কাজ কর্ম্ম দেখিতেছেন ও শিখিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে পূর্ব্বের ন্যায় স্ফূর্ত্তি নাই। মুখে আর সে হাসি দেখিতে পাওয়া যায় না। আট নয় মাস গত হইল, পিতা পরলোকবাসী হইয়াছেন। শোকের অবসানে কোথায় ধীরে ধীরে আবার পূর্ব্বকার প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিবে, না

ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন তাঁহার বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ খানি অধিকতর কালিমাময় হইয়া উঠিল। তিনি এখন আর বন্ধুবান্ধবের সহিত বড় বেশী বাক্যালাপ করেন না। কেবল এক অমরনাথের সহিত, সময়ে সময়ে, দুই চারিটি কথা বলিয়াই যেন প্রাণে একটু শান্তি অনুভব করেন।

অমরনাথ তাঁহার প্রতিবেশী, শৈশবের বন্ধু। তাঁহার বয়ঃক্রম সত্যেন অপেক্ষা কএক মাস মাত্র কম। অমরনাথ বাল্যকাল হইতেই, প্রতিবেশী সম্বন্ধে সত্যেনকে 'সত্যেন দা' বলিয়া ডাকেন। রায়দের বাটীর সকলেই অমরকে, আপনার জন জ্ঞানে, আদর করিয়া থাকেন।

শচীকান্তের সন্তানসন্ততি হয় নাই। সুতরাং, সত্যেন্দ্রনাথই বাটীর মধ্যে একমাত্র সন্তান,—রায় পরিবারের একমাত্র বংশধর ও ভাবী উত্তরাধিকারী। সত্যেন্দ্রনাথ সকলেরই একান্ত আদরের ধন। সেই সত্যেন অমন বিষণ্ণ। ইহা দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত রহিতে পারে? শচীকান্ত ও তাঁহার পত্নী সত্যেনকে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। শচীকান্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। সত্যেন এমন হইল কেন? পিতৃ-শোক ইহার কারণ, না তাঁহাদের কোনরূপ যত্ন ও আদরের ত্রুটি হেতু তাঁহার চিত্ত ক্লিষ্ট ও মলিন। শচীকান্ত বাবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না। সত্যেন নিজেই নিজের ভাব বুঝিতেছেন না, অন্যকে আর কি বুঝাইবেন?

এক দিন শচীকান্ত বাবু অমরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"অমর! সত্যেনের কি হয়েচে বল্‌তে পার? সে দিন দিন এমন মলিন হয়ে যাচ্চে কেন?"

অমর।—আমিও সেটা লক্ষ্য করিচি, সত্যেন দাকে এ কথা দুই তিন দিন জিজ্ঞাসাও করিচি। সে বলে, কি হ'য়েছে কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। মনের ভিতর যেন সর্ব্বদাই হু—হু করে। এ যে কি বস্তুতই বল্‌তে পার্‌চি না ভাই।"

শচীকান্ত ইহা শুনিয়া অধিকতর চিন্তিত হইলেন। কিছুক্ষণ মনে মনে কি ভাবিয়া অমরকে বলিলেন,—"অমর, বাবা, তুমি সর্ব্বদা সত্যেনের কাছে কাছে থেকো, যাতে ওর মনটা একটু ভাল থাকে, তারই চেষ্টা করো।"

অমর।—সে কথা আপনার বলাই বাহুল্য। আমি সত্যেন দাদার জন্য সর্ব্বদা ভাবি। আমার মনে লয়, দিন কতকের জন্য অন্যত্র যাইলে হয় ত মন অনেকটা ভাল হইতে পারে।

শচীকান্ত।—যদি তাহাই ভাল বিবেচনা হয়, তবে না হয়, কিছুদিন, কলিকাতায় থাকুক। আমি সব ঠিক ঠাক ক'রে দেবো। কিন্তু বাবা তোমাকেও সত্যেনের সঙ্গে যেতে হবে।

অমর।—আমি একবার বাবার অনুমতি গ্রহণ ক'রে কাল আপনাকে বল্‌ব।

শচীকান্ত।—তুলসীকে আমিই বল্‌ব। সে আমার কথায় কদাচ অমত করবে না।

অমরের পিতার নাম তুলসীদাস ঘোষ। তিনি রায়মহাশয়দিগের একান্ত অনুগত। শচীকান্ত বাবু তাহাদিগকে সবিশেষ বলিয়া, কিছু দিবসের জন্য অমরের সত্যেনের সহিত, কলিকাতায় থাকার প্রস্তাব করিলেন। তুলসীদাস প্রীতমনে উত্তর করিল।—"ছোট বাবু, এ কথা আবার আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌চেন কেন? অমর আপনাদেরই।"

অমরেরও কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইল। সত্যেন্দ্রনাথ বালক নহেন। শচীকান্ত বাবু তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—কলিকাতায় কিছুকাল থাকিলে নূতন স্থানের নূতন দৃশ্য দেখিয়া মনের অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। সত্যেন ও এই প্রস্তাবে যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

শীঘ্রই কলিকাতায় একখানি বাড়ী ভাড়া করা হইল। শচীকান্ত বাবু সত্যেন, অমর, মাধবলাল ও সত্যেনের খুড়ীমাতা এই কএকজনকেই উপযুক্ত দাস দাসী ও পরিচারক সহ কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের পাছে কোনরূপ কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় আপন পত্নীকেও সঙ্গে দিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

# ছায়া-দর্শন।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### উপক্রম।

কৃষ্ণোক্ত গীতা যাঁহাকে জীবের কর্ম্ম-সাক্ষী, কর্ম্ম-নিরত ও কর্ম্ম-ফল-বিধাতা জগন্নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি লোক-লোচনের অপ্রত্যক্ষ হইলেও, সত্য বস্তু। তাঁহার করুণার্দ্র দৃষ্টি, সকল সময়েই, এ সংসারে সকলের উপর নিপতিত রহিয়াছে; এবং তাঁহার বজ্র-কঠোর হস্ত সকল স্থলেই দুষ্কৃত দুরাচারদিগকে দমিত করিবার জন্য উদ্যত হইতেছে। যাঁহারা আজিকার উপহৃত কাহিনীটি মনোযোগ করিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই হৃদয়ে ইহা অনুভব করিবেন যে, ঈশ্বরাশ্রিত এই অনন্ত জগতের মধ্যে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীও মুহূর্ত্তের তরে নিরীশ্বর নহে; আর পার্থিব জগতের ভাল মন্দ কোন কার্য্যই ঐশিক সাম্রাজ্যের বহিঃস্থিত পদার্থ নহে। তবে আমরা সে মহান্ সত্য সম্যক্ প্রকারে মনে ধারণা করিতে পারি না কেন? পারি না, আমরা দুধের শিশু বলিয়া। কোথায় অর্দ্ধ-শতাব্দী-মাত্র জীবী অবোধ মনুষ্য; আর কোথায় অনন্ত কাল-বিহারী অনন্ত দেব! মনুষ্য কিরূপে পঞ্চাশ বৎসর অথবা পঞ্চাশ সহস্র বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এই বিশাল

বিশ্বরাজ্যের নিয়তি ও পরিণতি বিষয়ে সকল কথা অবগত হইবে? কিন্তু সমস্ত কথা বুদ্ধির অগম্য হইলেও, এইক্ষণ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন যে, আমাদিগের এই মানব জীবন "নিশার স্বপন" নহে; আর আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও, মহা নিদ্রা অথবা মহানির্ব্বাণ নহে। যদি জীবনের নাম স্বপ্ন, এবং দেহপাতের নাম দুঃস্বপ্নের পরিসমাপ্তি বলিয়া অবধারিত হইত, তাহা হইলে, যাহাদিগের প্রামাণিক কথা লইয়া আজি আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি, তাহাদিগের জীবনের সুখ-দুঃখময় ইতিবৃত্ত অধ্যাত্ম তত্ত্বের ইতিহাসে একটি আলোচনার যোগ্য অধ্যায়রূপে পরিগৃহীত হইত না।

## আত্মিক-কাহিনী।

ব্রিড্‌পোর্ট (Bridport) ইংলণ্ডের একটি ক্ষুদ্র নগর,—ডরসেট শায়রে,—ইংলিশ সাগরের উপকূলে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র নগরে,—সাগর-সমীর-সুখ-সেবিত একটি প্রান্ত-পল্লীতে, মেরী মেডোজের বাস-ভবন। মেরীমেডোজ্ (Mary Maedows) ব্রিড্‌পোর্টের কোন সুপরিচিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সাদর-সংবর্দ্ধিতা সুশিক্ষিতা কন্যা।

মেরীর পিতা ও মাতা উভয়েই জীবিত আছেন। মাতা মমতার খনি ও প্রীতির উৎসস্বরূপিণী। কিন্তু পিতা ঠিক তেমনটি নহেন। তিনি স্নেহশীল হইয়াও, একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বিষয়ী। তাঁহাদিগের অন্য কোন সন্তান নাই। সুতরাং, স্নেহের পুতুল মেরীই, তাঁহাদিগের আঁধার ঘরের আলো,—মেরীই তাঁহাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব। মেরী পিতা মাতার অপরিসীম স্নেহ, যত্ন ও আদরে লালিত-পালিত হইয়া, এক্ষণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে।

মায়ের দুলালী মেরী, যৌবনেও শিশুর-মত, মায়ের গলায় গলায় লাগিয়া থাকিতে ভালবাসে। পিতার প্রতিও তাহার মমতা বা প্রাণের টান কম নহে। সে সকল বিষয়ে সততই পিতার আজ্ঞাধীনা। কিন্তু তথাপি, ভিতরে কি যেন একটু বাধো বাধো ছিল; সে পিতার সহিত তত মিশামিশি করিয়া চলিতে সাহস পাইত না;—দূর হইতেই পিতৃ-স্নেহের সুস্নিগ্ধ সৌরভে সন্তুষ্ট থাকিত।

মেরী বুদ্ধিমতী,—ধীর ও স্থির; অথচ বড়ই নম্র, বড়ই মধুর। তাহার মত আলা ভোলা অথচ গভীর স্বভাবের মেয়ে প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন প্রকৃতি, তেমনই আকৃতি। মেরী সর্ব্ব-অবয়বে সুন্দরী। বয়োবৃদ্ধিসহকারে, তাহার সেই রূপরাশি, অভিনব মাধুরীতে, উছলিয়া পড়িল। স্ফুরিত-যৌবনা মেরী, এক্ষণ প্রস্ফুট গোলাপের মত, যার-পর-নাই মনোহারিণী।

মেরীর বিবাহ হয় নাই। বিবাহের কথা সে মনেও একবার ভাবে নাই। কোন রূপ-পিপাসু চক্ষু, অলক্ষিতে, তাহার প্রতি বদ্ধ-লক্ষ্য হইয়াছে কি না, অথবা কোন গুণ-মুগ্ধ প্রাণ, আত্মবিনিময়ের জন্য, কোনদিকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট রহিয়াছে কি না, সে তাহা জানে না। সরলা মেরী, এখনও

কচি বালিকার মত, সে অংশে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। তাহার স্নেহ-ঢল-ঢল বিমল প্রাণ, এখনও পিতা মাতার বাৎসল্যেই ডগ-মগ,—পিতা মাতার মুখের দিকে চাহিয়াই পরিতৃপ্ত।

জেমস্ মেসন (James Mason) মেরীর প্রতিবেশী যুবা। জেম্স্ সম্পত্তিশালী। জেমসের পিতা মেরীর পিতার প্রাণ-প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন। জেম্সের সহিত মেরীর আলাপ পরিচয় আছে। কিন্তু সে আলাপ ও পরিচয় সামাজিকতার শিষ্টাচার মাত্র। তাদৃশ আলাপে ও তেমন নাম মাত্র পরিচয়ে প্রীতি বা অপ্রীতির কোন সম্পর্ক নাই। জেম্স্, সাধারণ প্রণালীতে শিক্ষিত হইলেও, সুশিক্ষিত নহে। সে স্বভাবতই একটু পরুষপ্রকৃতি, শঠ ও স্বার্থপর। কিন্তু তথাপি মেরীর পিতা যুবক জেম্সের বড় পক্ষপাতী।

মেরীর পিতার ভালবাসার বস্তু জগতে মাত্র দুটি, এক মেরী, আর "মানি" (ধন)। তিনি ধনবানের দোষ দেখিতেন না;—যেখানে ধন থাকে, সেখানে কোনরূপ দোষ থাকিতে পারে, এ কথা তাঁহার কল্পনাতেও স্থান পাইত না। জেম্সের রূপ নাই, গুণ নাই, চরিত্রগত কোন সম্পদ নাই,—কিন্তু ধন আছে। অতএব, তাঁহার বিবেচনায় জেম্সই মেররী মত সুশীলা ও সুন্দরী মেয়ের উপযুক্ত বর। তিনি মনে মনে সুহৃৎ-পুত্র জেম্স্কেই মেরীর ভাবী বর সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যখন তখন জেম্স্কে আদর করিয়া আপন গৃহে ডাকিয়া আনেন, এবং যাহাতে মেরীর সহিত কোন প্রকারে তাহার একটু প্রণয়-সঞ্চার হয়, তদর্থ অশেষ-বিশেষে যত্ন করেন।

পিতার মনের কথা দীর্ঘকাল চাপা রহিল না। তিনি, এই ভাবে, কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, এক দিন স্পষ্টাক্ষরে জেম্সের সহিত মেরীর পরিণয়-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মেরী পিতাকেই আপনার ক্ষুদ্র জীবনের একমাত্র কর্ত্তা ও বিধাতা বলিয়া জানিত। সে এখনও ভূত-ভবিষ্যৎ বুঝে না, ভাল মন্দ বিচার করিতে চাহে না; বিশেষতঃ, এখন পর্য্যন্ত তাহার চিত্তে, কাহারও সম্পর্কে, কোনরূপ অনুরাগ কিংবা আসক্তির সঞ্চার হয় নাই। মেরী বুঝিত, পিতা ভাল বুঝিয়া যাহা করিবেন, তাহাই তাহার পক্ষে ভাল। সুতরাং, মেরী পিতার প্রস্তাবে কোনই আপত্তি করিল না। মেরীর মাও স্পষ্টতঃ পতির কথায় কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না। কিন্তু এমন স্নেহের পুতলিকে অমন কাঠ-কঠোর চোয়ারের গলায় গাঁথিয়া দিতে তাঁহার চিত্ত একবারেই অগ্রসর হইল না। তিনি নানাবিধ মেয়েলি কৌশলে, পতির প্রস্তাবিত বৈবাহিক অনুষ্ঠানে, কাল-বিলম্ব ঘটাইতে লাগিলেন।

জেম্স্, এখন দিবসে দশবার, মেরীকে দেখিতে আইসে এবং মেরীর মন পাইবার মানসে নানারূপ চাতুরী খেলাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু, কিবা তাহার আকৃতি, কিবা তাহার প্রকৃতি, কিছুতেই মেরীর মনে কিছুমাত্র প্রীতির সঞ্চার হয় না। জেম্স্ আসিলে, কতক্ষণে সে চলিয়া যাইবে,—কত-

ক্ষণে ভাবী বরের বিরস-সম্ভাষণের হাতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে, মেরী কেবল তাহারই সময় ও সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়।

কিছু দিনের মধ্যেই, চতুর জেম্‌স্‌ বুঝিতে পাইল যে, বিবাহে অসম্মতি না থাকিলেও, মেরী তাহাকে ভালবাসে না। সে ইহাও বুঝিয়া লইল যে, মেরীর সহিত কোন কালেও তাহার কোনরূপ মনোমিলনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মনের সহিত মনের মিলন তাহার বিবেচনায় একটা মনগড়া কথামাত্র। না হয় মনোমিলন না-ই বা হইল, তথাপি এ রূপরাশি উপেক্ষার বস্তু নহে। মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, কপটচতুর ও ধূর্ত্তমতি জেম্‌স্‌ মেরীর মন বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিল। সে পূর্ব্বরাগের কৃত্রিম অভিনয়ে, নিত্য নূতন রঙ্‌ ফলাইয়া, মেরীর মন না পাইলেও মেরীর পিতার মনস্তুষ্টি-বিধানে যত্নপর রহিল। যত্ন বিফল হইল না। পিতা সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু কন্যা যেমন ছিল, তেমনই রহিয়া গেল। খাটি সোনা কৃত্রিম সোহাগায় গলিল না।

পিতা পারিলে, এই দণ্ডে মেরীকে জেম্‌সের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু মাতা অগ্রসর হইতেছেন না। পরিণয়ে কালবিলম্ব জেম্‌সের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। জেমস্‌ রূপ-মোহে উন্মাদিত। বহু পরিশ্রমে, নাটক নভেল হইতে, ভালবাসার যে সকল গত সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল, সে একে একে সে সমস্ত গতই গাইয়া ফেলিয়াছে। পুরাতন গীতের পুনরুক্তি, এখন আর তাহার কাছেও ভাল লাগিতেছে না। সে আর আশায় আশায় বসিয়া থাকিতে প্রস্তুত নহে।

এই সময়ে, জেমসের আশার পথে এক অভাবনীয় অন্তরায়, ও অতি গুরুতর বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বিঘ্ন মেরীর নয়ন-পথে উইলিয়ম্‌ মার্‌ষ্টোন ( William Marstone ) নামক নির্ম্মল-মূর্ত্তি নবীন যুবার আকস্মিক অভ্যুপগম। একদিন ঘটনাক্রমে, পিতৃনিবাসে, উইলিয়ম মার্‌ষ্টোনের সহিত, মেরীর চারিচক্ষে দেখা শুনা হইল।

উইলিয়ম ভদ্রবংশ-সম্ভূত, মার্জ্জিতচরিত্র ও সুশিক্ষিত তরুণ যুবা। উইলিয়মের পিতা বর্ত্তমান। তিনি লণ্ডনে বৈষয়িক ব্যাপারে সংলিপ্ত। উইলিয়ম ব্রিজ্‌পোর্টে স্বগৃহে অবস্থিত। উইলিয়ম দীর্ঘকায় ও সুগঠিত-অবয়ব, সুপুরুষ। তাঁহার নেত্রদ্বয়, তত আয়ত না হইলেও, উজ্জ্বল এবং প্রীতিস্নেহে উচ্ছল। প্রসর ললাটে প্রতিভার ছটা। দৃষ্টিতে ঔৎসুক্য ও দৃঢ়তার ভাব স্পষ্ট পরিস্ফুট। মুখচ্ছবি প্রফুল্ল অথচ আবেগপূর্ণ। যুবা সর্ব্বাংশেই প্রিয়দর্শন ও প্রকৃত প্রস্তাবে রমণীমোহন।

মেরীর পিতা উইলিয়মের শিষ্টমধুর মিষ্ট আলাপে প্রীতিলাভ করিলেন, এবং ভদ্রতার রীতি অনুসারে দয়িতা ও দুহিতার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিছু ক্ষণ পরে, উইলিয়ম, যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া, চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়, তিনি বারংবার

মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া কাহাকে যেন দেখিয়া লইলেন। মেরীর মা কিছুক্ষণ এক-দৃষ্টিতে তাঁহার গতি-পথে তাকাইয়া থাকিয়া যেন মনে মনে ভাবিলেন,—"আহা, এই উইলিয়ম যদি আমার মেরীর বর হইত।"

মেরীর মনে আজি কেমন একটা নূতন ভাবের আবেশ হইল। সে বুঝিল না, উহা কি? অমনটি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তাহার হয় নাই। উইলিয়ম যতক্ষণ সম্মুখে ছিলেন, মেরী তৃষিত অথচ সলজ্জ দৃষ্টিতে ততক্ষণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছে। অনন্যচিত্তে তাঁহার মধুর কণ্ঠের কথা শুনিয়াছে। তাহার মনে লইয়াছে, যেন এই আগন্তুক তাহার পর নহেন,—বহু দিনের পরিচিত, নিতান্তই আপনার জন। মেরী ভাবিল,—উইলিয়ম যদি আরও কিছুক্ষণ, তাহাদের বাটীতে থাকিতেন, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। বুঝি তাহার তৃষিত প্রাণটা তাঁহার সরল আলাপে একটু শীতল হইত। তাঁহার সহিত ফিরিয়া আর দেখা হইবে কি?

দেখা হইল। এই দিন হইতে, উইলিয়ম প্রতিনিয়তই, ঐ পল্লীতে বেড়াইতে আসিতেন। যখন সুযোগ ঘটিত, মেরীর পিতার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এই উপলক্ষে মেরীর সহিতও তাঁহার দেখা শুনা হইত। বলা বাহুল্য, এই ভাবে ক্রমে ক্রমে মেরীর সহিত তাঁহার বেস একটু ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। দুটি প্রাণ যেন একই ছাঁচে ঢালা, একই মাটীতে গড়া। দুটি প্রাণ, কাহাকেও কিছু না বলিয়া,কাহারও মতামতের অপেক্ষা না করিয়া, আপনা আপনি মিলিয়া মিশিয়া এক হইতে লাগিল। এই পরিচয়, আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা, অবশেষে, পরস্পর অতি প্রগাঢ় ভালবাসায় পরিণত হইল।

মেরীর পিতা, প্রথম অবধিই, এই ঘনিষ্ঠতায়, মনে মনে ঈষৎ একটু বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু, উইলিয়মের প্রাণস্পর্শি সৌজন্য ও প্রীতিমধুর প্রিয় ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। মাতা মনে মনে যার-পর-নাই প্রীত ও আশান্বিত। তিনিও তাঁহার মনের ভাব মুখে প্রকাশ করিলেন না; পরোক্ষভাবে কন্যার পক্ষ সমর্থনে যথাশক্তি যত্নবতী রহিলেন।

জেম্‌স্ এখন আপনাতে আপনি কুপিত-ভুজঙ্গবৎ। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দুদিনেই সমস্ত অবস্থা বুঝিয়া লইল। কিন্তু ঠেলিয়া ফেলিলেও সে সরিয়া যাইবার পাত্র নহে। তাহার ক্রূরবুদ্ধি, এক্ষণ অলক্ষিতে নিরপরাধ উইলিয়মের প্রতি বিষ উদ্গিরণে প্রবৃত্ত হইল।

উইলিয়ম ও মেরী, উভয়েই নবীন অনুরাগের নূতন স্ফূর্ত্তিতে আত্মহারা। অথচ স্বাভাবিক ধীরতা হেতু কোন অংশেও উদ্বেল কিংবা উচ্ছল নহে। মেরী শান্ত, ধীর ও স্থির। উইলিয়মও প্রশান্ত এবং ধীর-গম্ভীর। কিন্তু মেরীর চক্ষুলজ্জা * বড় বেসী। সুতরাং সে ঈষৎ একটু দুর্ব্বল-হৃদয়া। উইলিয়মও ঈষৎ একটু (Sensitive) সূক্ষ্মচর্ম্মা। এই হেতু

* বাঙ্গালায় চক্ষু শব্দে বিসর্গের প্রয়োগ নাই।

তাঁহার অযত্ন-লব্ধ ধীরগাম্ভীর্য্যে, এক এক সময়, হঠাৎ যতিভঙ্গ ঘটিত। যাহা হউক, মেরী ও উইলিয়ম, পরস্পর বিশুদ্ধ প্রীতি ও অনাবিল ভালবাসার বিনিময়ে, উৎফুল্ল ও সুখী।

প্রতিদিন, অপরাহ্নে উইলিয়ম মেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দুইজনে কত কথা হইত; কখনও কখনও উভয়ে মিলিয়া কিছু ক্ষণ সাগর-তটে বা প্রসর মাঠে বেড়াইয়া বেড়াইতেন। ইহা এক্ষণ তাঁহাদিগের নিত্যকার প্রিয় অনুষ্ঠান। দিবা অবসান হইয়া আসিলেই, মেরী উইলিয়মের আগমন-প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকিত। আজিও মেরী উইলিয়মের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু আজি সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ভ্রমণের সময় অতীত-প্রায়, এখনও উইলিয়ম আসিতেছেন না। মেরী একটু অধীর হইল। 'তাঁহার কোন অসুখ হয় নাই ত'? ইহা ভাবিয়া মনে মনে একটু বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে, উইলিয়ম, ধীরে ধীরে, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি মেরীর সমস্ত ভয় ও ভাবনা দূর হইয়া গেল। আনন্দময়ী মেরী, প্রফুল্ল মুখে, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু নিকটে যাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আর কোনরূপ স্ফূর্ত্তির লেশমাত্রও রহিল না।

মেরী দেখিল, উইলিয়মের মুখ খানি আজি বড় বিষণ্ণ। নয়নদ্বয় আকুল ও আনত; কি যেন একটা বিষাদমাখা গাম্ভীর্য্য, কি যেন একটা দুঃখাবহ ভাবনা তাঁহার হৃদয় ও মন ছাঁইয়া ফেলিয়াছে! মেরীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—'উইলি, একি!—আজি তোমাকে এমন দেখিতেছি কেন?—বলি, কোন অসুখ হয় নাই ত?"

উইলিয়ম, মেরীর অধীর চক্ষুর দিকে চাহিয়া, ধীর ভাবে কহিলেন,—"না—কোন অসুখ নয় মেরী—কিন্তু অসুখ ত, ইহা অপেক্ষা শত গুণ ভাল ছিল।" উইলিয়ম ইহা কহিয়া পকেট হইতে এক খানি চিঠি বাহির করিয়া মেরীর হাতে দিলেন।

মেরী চিঠি খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। পাঠ করিয়া অধিকতর আকুল কণ্ঠে, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কহিল,—"তবে কি তোমাকে আজই লণ্ডন যাত্রা করিতে হইবে?" উইলিয়ম কহিলেন,—"আজ নয়,—এখনই? সমস্ত প্রস্তুত, কেবল তোমার অনুমতির অপেক্ষা।"

মেরী কহিল,—"কত দিনে লণ্ডন হইতে ফিরিবে?" উইলিয়ম কহিলেন,—"অনিশ্চিত। ছ মাস, চারি মাস, বৎসরেক, দুবৎসর, এমন কি, চারি পাঁচ বৎসরও হইতে পারে। অথবা এই বিদায়, চির বিদায় হওয়াও অসম্ভব নহে।"

মেরী কহিল,—"উইলি, অমন কথা বলিও না। ঈশ্বর, ইচ্ছায়, তোমার পিতা আরোগ্য লাভ করিলেই ত তুমি আবার ব্রিড্‌পোর্টে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।" উইলিয়ম কহিলেন,—"তুমি আমার অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পার নাই, মেরী। পিতা

আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ধূর্ত্ত এটর্ণির দুরভিসন্ধিতে যে আমাদের সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে, তার কি হইবে, মেরী? যদি বিষয়ে বঞ্চিত হই, তাহা হইলে, আমরা একবারে পথের ভিখারী হইব। তাহা হইলে, আর ফিরিয়া আসিব না। তোমাকেও আর মুখ দেখাইব না।"—বলিতে বলিতে উইলিয়মের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে আত্মসংবরণ করিয়া, উইলিয়ম অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে কহিলেন,—"তাই বলিতেছিলাম,—হয় ত আজিকার এই দেখাই শেষ দেখা।—এই বিদায়ই চির বিদায় —নিরন্ন ভিক্ষুক আর কি বলিয়া তোমাকে মুখ দেখাইবে, মেরী?"

মেরী আগ্রহের সহিত উইলিয়মের হাত দুখানি ধরিল, এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল "এ—না না—কখনই না। এ বিদায় কখনও চির বিদায় নহে। উইলি, প্রিয়তম, তুমি যদি ইচ্ছা করিয়া আমায় ত্যাগ না কর,—ইচ্ছা করিয়া ভুলিয়া না যাও, অথবা ঠেলিয়া না ফেল, তাহা হইলে, তুমি রাজরাজেশ্বরই হও, আর পথের কাঙ্গালই হও,খাটি জানিও, মেরী তোমার সুখ-দুঃখ-ভাগিনী।"এই বলিয়া বালিকা অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িল।

কিছুকাল উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। উইলিয়ম, মেরীর এই উক্তি শুনিয়া, এই ঘোর বিপদ-সময়েও, প্রাণে যেন একটু আশ্বাস পাইলেন। বলি বলি করিয়াও এতদিন মুখ ফুটিয়া যাহা বলিতে পারে নাই, মেরীও, আজি প্রাণের আবেগে, তাহা বলিয়া ফেলিয়া, যেন চিত্তের ভার একটু লঘু করিয়া লইল। উইলিয়ম অতি ধীর ও দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন,—"মেরী, প্রাণাধিকা, তোমার প্রীতি ও ভালবাসাই আমার প্রাণের একমাত্র সম্বল। আমি আজি এই সম্বল লইয়াই বিপদ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চলিলাম যদি প্রাণে বাঁচিয়া থাকি, এবং কখনও পরিণয়সূত্রে সম্বন্ধ হই, তোমারই সহিত হইব। উইলিয়ম তোমারই মেরী,ইহা কখনই ভুলিও না"। এই বলিয়া পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন,—"আর বিলম্ব করিব না। আসি তবে এখন। ট্রেণের সময় নিকটবর্ত্তী।"

মেরী উইলিয়মের মধুর-কণ্ঠ-নিসৃত অমৃত পানে বিবশার ন্যায় ছিল। সে এই শেষ কথাটি শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। এবং গভীর নিশ্বাস সহকারে কহিল,—"হা—তাই ত—যাবেই ত!—যাও তবে প্রিয়তম। জগদীশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন। কিন্তু, উইলি, মেরীকে মনে রাখিও। সর্ব্বদা চিঠি পত্র লিখিও। জান ত এক দিন তোমাকে না দেখিতে পাইলে,"—বলিতে বলিতে মেরীর আরক্তিম গণ্ডে দুটি ধারা গড়াইয়া পড়িল। অধরে আর কথা ফুটিল না। ঠোঁট দুখানি একটু নড়িল। উইলিয়ম রুমালে চোখ মুছিয়া কহিলেন,—"আমি, নিয়মিতরূপে সপ্তাহে দুইবার তোমার নিকট চিঠি লিখিব। ইহা ছাড়া, যখন সময় পাই বা প্রয়োজন ঘটে, তখনই আবার লিখিব। তুমিও সপ্তাহে অন্ততঃ দুখানি চিঠি আমার কাছে লিখিও।"

উইলিয়ম এইরূপে, বিদায়-বিষাদে প্রীতির অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া মেরীর নিকট বিদায় লইলেন। মেরীও নয়নজলে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল। শরীরের নিকট শরীর বিদায় গ্রহণ করিল। হৃদয় হৃদয়ের বন্ধন হইতে বাহিরে যাইতে পারিল না। উহা যেমন এক সূতায় গাঁথা ছিল, তেমনই রহিয়া গেল। মেরী, তৃষিতা চকোরীর মত, যত দূর দৃষ্টি চলিল, হৃদয়-বল্লভের পানে চাহিয়া রহিল।

উইলিয়ম, লণ্ডনে পঁহুছিয়া দেখিলেন, —পিতা মুমূর্ষু। সমস্ত সম্পত্তি শত্রু-কবলিত! লণ্ডনে, তাঁহাদিগের আত্ম-পরিবারে সম্পত্তি ঘটিত একটা গুরুতর স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল। উইলিয়ম প্রভৃতির পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার ভার কোন এটর্ণির হাতে ন্যস্ত থাকে। দুর্বৃত্ত এটর্ণি, অর্থলোভে, বিপক্ষের নিকট আপন মক্কেল উইলিয়মদিগের স্বার্থ বিক্রয় করিয়াছে। এই বিপদ হইতে সম্পত্তি উদ্ধার-কামনায়ই উইলিয়মের পিতা লণ্ডনে ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি আপনার দেহ-প্রাণ লইয়াও বিপন্ন!

অল্পদিন পরেই উইলিয়মের পিতা পরলোক-গত হইলেন। উইলিয়ম পিতার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবারও অবকাশ পাইলেন না। তাঁহাকে নিদারুণ পিতৃশোক বুকে চাপিয়া রাখিয়া, বিপক্ষের বিষম ষড়যন্ত্র ভেদে প্রাণপণ করিতে হইল। তিনি অচিরেই বুঝিতে পাইলেন যে, বিপক্ষগণ, পারিলে তাঁহার প্রাণনাশেও প্রস্তুত। অতএব, তিনি বিশেষ সতর্কভাবে চলা একান্ত আবশ্যক মনে করিলেন। কোথায়, কোন্ দিন, কি অবস্থায় থাকেন, কাহাকেও তাহা জানিতে দেন না। ভাল মতে, পরখ না করিয়া কোন আহার্য্য গ্রহণ করেন না। একখানি শাণিত ছোরা ( Dagger ) সর্ব্বদা কটিতে লুকাইয়া রাখেন। এই ভাবে উইলিয়ম পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের কার্য্যে নিরত রহিলেন।

উইলিয়মের একমাত্র সুখ ও শান্তি মেরীর পত্র। মেরীর পত্র, প্রাণভরা ভালবাসার অনন্ত কথা লইয়া, সপ্তাহে, কখনও দুইবার, কখনও বা তিনবার আসিয়া, তাঁহার প্রাণ জুড়াইত,—তাঁহার অবসন্ন প্রাণে নূতন বলের সঞ্চার করিয়া দিত। তিনিও বারংবার মেরীর কাছে মনের কথা লিখিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া লইতেন।

এইভাবে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। উইলিয়ম, ভগবানের দয়া, আপনার কার্য্যকুশলতা ও প্রাণান্ত পরিশ্রমে, অপহৃত সম্পত্তির অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করিলেন। অবশেষে, তাঁহাকে সম্পত্তি ঘটিত কতকগুলি, অতিপ্রয়োজনীয় দলিল পত্র সংগ্রহার্থ, সুদূর ইষ্ট ইণ্ডিসে ( East Indies ) সমুদ্র-যাত্রা করিতে হইল।

উইলিয়ম মনের আনন্দে, বিত্ত-উদ্ধারের শুভ সংবাদ মেরীর কাছে লিখিলেন। ভাবিলেন এই সংবাদ শুনিয়া মেরী, না জানি কতই সুখী হইবেন! প্রত্যুত্তরে কতই প্রীতি প্রকাশ করিবেন! কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল, মেরীর কোন উত্তর আসিল না।

এই হইতেই, মেরীর চিঠি পত্র বন্ধ। উইলিয়ম, নানা অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বারংবার পত্র লিখিলেন। কোন পত্রেরই উত্তর পাইলেন না। অবশেষে, তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠাকুল-চিত্তে ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভগ্ন-উৎসাহে সমুদ্র-যাত্রা করিলেন।

মেরী, উইলিয়মের নিকট কিরূপ বাক্য-বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, মেরীর মাতা তাহা জানিতেন; পিতা জানিতেন না। মেরীও তাঁহাকে তাহা জানিতে বা বুঝিতে দিত না। মেরীর সহিত উইলিয়মের ঘনিষ্ঠতা, প্রথমেই তাঁহার নিকট ভাল লাগে নাই। উইলিয়ম চলিয়া যাওয়াতে, তিনি মনে মনে যেন একটু সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু, জেম্সের অবস্থা অন্যরূপ। সে বুঝিল উইলিয়ম যাইয়াও যায় নাই। দূরে রহিলেও মেরীর মনের উপর তাঁহারই পূর্ণ আধিপত্য। জেম্স মাঝে মাঝে আসিয়া মেরীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে; বেসী কিছু বলে না; মেরীর মনের গতি ও কার্য্যকলাপ নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চলিয়া যায়।

পিতা স্থির করিলেন,—একটি বৎসর অতীত হইয়াছে, উইলিয়ম চলিয়া গিয়াছেন। এই দীর্ঘ সময়ের অদর্শনে, বালিকা মেরী অবশ্যই তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছে। অতএব তিনি জেম্সের সহিত মেরীর পরিণয়-প্রস্তাব পুনঃস্থাপনে কিছু মাত্র ইতস্তত করিলেন না। তিনি মেরীকে, যখন ইচ্ছা হইত, আপনার নিকটে ডাকিয়া, অতি মিষ্ট কথায় ঐ প্রস্তাব করিতেন। মেরী শুনিত; হাঁ বা না, কিছুই বলিত না, চুপ করিয়া রহিত। আর, মা কাছে থাকিলে, এক এক বার, অতি কাতর চক্ষে, মায়ের স্নেহ-মাখা মুখ খানির দিকে তাকাইত। মা মেয়ের প্রাণের খবর রাখিতেন। তিনি পতির ঐ অশুভ প্রস্তাবে তত গা মাখাইতেন না।

মেরীর এক্ষণ সকল সুখ ও শান্তির এক মাত্র সম্পদ উইলিয়মের পত্র। সে পত্রের প্রতীক্ষায় ডাকের পথ চাহিয়া থাকিত। পত্র পাইলে, তৃষিত-চিত্তে উহা বারংবার পাঠ করিত; এবং যতটুকু পারা যায়, স্নেহবতী মায়ের কাছে মনের কথা কহিয়া, মাতার সস্নেহ সহানুভূতিতে সুস্থির থাকিত।

কিন্তু মেরীর এই সামান্য সুখের পথেও কাঁটা পড়িল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উইলিয়ম সম্পত্তি উদ্ধারের শুভ সংবাদ বড়ই আগ্রহের সহিত মেরীর কাছে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু মেরী সে চিঠি পায় নাই। সেই অবধিই চিঠি পত্র বন্ধ। উইলিয়মও মেরীর চিঠি পাইলেন না। মেরীও আর উইলিয়মের চিঠি পাইল না। মেরী কত পত্র লিখিল, পত্রে কত অশ্রু ঢালিল। কিছুতেই কিছু হইল না। কোন চিঠিরই উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু তাহাদের মধ্যেই এইরূপ ঘটিল এমন নহে। মেরী অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পাইল, উইলিয়মের বাটীর লোকেরাও তাঁহার কোন চিঠি পত্র পাইতেছে না।

এক, দুই, তিন করিয়া, ক্রমে তিনটি বৎসর চলিয়া গেল, উইলিয়মের কোন সংবাদ আসিল না। হয় ত, তাঁহার কোনরূপ শারী-

রিক অমঙ্গল ঘটিয়াছে, প্রথম এই সন্দেহের উদ্রেক হইল। পরে, সন্দেহ সিদ্ধান্তে পরিণতি পাইল। সকলেই শুনিল,—উইলিয়ম প্রাণে জীবিত নাই।

সুজনের সকলই স্বজন। উইলিয়মকে যে জানিত, যাহার সহিত তাঁহার সামান্য একটু আলাপ পরিচয় ছিল, সে ই তাঁহার জন্য অশ্রুপাত করিল। মেরীর সম্পর্কে আর কথা কি?—মেরী একবারে অর্দ্ধমৃতার ন্যায় অবসন্না হইয়া পড়িল। সে কাহারও সহিত বেশী বাক্যালাপ করিত না; আহারে বিহারে স্ফূর্ত্তি পাইত না। যখন বড় অসহ্য হইত,—মায়ের গলা ধরিয়া, নির্জ্জনে আকুল প্রাণে কাঁদিত। এই ভাবে মেরীর সুদীর্ঘ দিন অতি কষ্টে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই অবস্থায়, আরও দুটি বৎসর অতিবাহিত হইল। মেরীর আশামুগ্ধপ্রাণে, সময় সময়, দুরাশার যে একটু ক্ষীণরশ্মি মুহূর্ত্তের তরে খেলা করিত, ক্রমে তাহাও নিবিয়া গেল। মেরীর এক্ষণ দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহার উইলিয়ম নাই। ইহ জীবনে সে আর তাঁহার দেখা পাইবে না। মাতাও খাটি বুঝিলেন,—উইলিয়ম জীবিত নাই। মেরীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি প্রাণে বড় আকুল হইলেন।

জেম্‌স্ তাহার প্রণয়ের অভিনয়ে ধীরে ধীরে আবার অগ্রসর হইতে লাগিল! সরলপ্রাণা মেরী জেম্‌সের কাছে, মনের কথা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিল। উইলিয়ম ভিন্ন, সে আর কাহাকেও ভাল বাসে না। উইলিয়মের নিকট সে কোন্ সময়ে, কি ভাবে, কিরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া, একবারে তাঁহারই হইয়া রহিয়াছে, মেরী সমস্ত খুলিয়া বলিল;—কোন কথা গোপন রাখিল না। কিন্তু কিছুতেই জেম্‌স্ পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার লোক নহে। সে প্রণয় কিংবা ছাই ভালবাসার কোন ধার ধারে না। ত্যাগস্বীকার কাহাকে বলে স্বপ্নেও সে তাহা জানে না। দুরন্ত ভোগলিপ্সা বা সুখ-তৃষ্ণায় অষ্টপ্রহর আহুতি যোগানই, তাহার জীবনের একমাত্র কর্ম্ম। সে মেরীর প্রেমের ভাব বুঝিল না। অথবা বুঝিয়াও তাহা লক্ষ্য করিল না। ভাবিল,—"কণ্টক দূর হইয়াও হয় নাই; যেরূপে হউক, ঐ পাপকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।"

পিতা আর কাল বিলম্ব করিবেন না। যত সত্বরে সম্ভব, জেম্‌সের সহিত মেরীর পরিণয় উৎসব সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাই এক্ষণ তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। মাতা আশার অন্তর অবলম্ব অভাবে, নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। পিতার আগ্রহ, মাতার বিষণ্ণ বদন ও আত্মীয়স্বজনের দৃঢ় অনুরোধ, মেরী প্রকৃতই ফাঁপড়ে পড়িল। বিপন্না মেরী আর কি করিবে? বহু পীড়াপীড়ির পরে, পিতৃআজ্ঞাধীনা সুশীলা অবলা পিতার আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হইল। একান্ত অনিচ্ছায়, নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া, দুর্ব্বলপ্রাণা বালিকা জেম্‌সের সহিত বিবাহে সম্মতি প্রদান করিল। পিতা প্রফুল্লচিত্তে বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে উইলিয়ম ইষ্ট ইণ্ডিস্ হইতে

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন। সম্পত্তি উদ্ধারের অবশিষ্ট কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, তিনি চিত্তে যার-পর-নাই অবসন্ন। প্রাণে সুখ-স্ফূর্ত্তির লেশমাত্রও অনুভূত হইতেছে না। কত দিন, কত মাস, কত বৎসর অতীত হইল, মেরীর কোন চিঠি পান নাই। তাঁহার কোন সংবাদই অবগত নহেন। তবে কি তাঁহার মেরী ইহলোকে নাই? এক একবার এই কল্পনা করিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছেন। আর বার, সেই প্রণয়, সেই প্রতিশ্রুতি, আর এই দীর্ঘব্যাপি বিস্মৃতি!—ইহা ভাবিয়া হৃদয়ে দুঃসহ জ্বালা অনুভব করিতেছেন। ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল, দুষ্ট চক্রীদিগের দুরভিসন্ধি ও কূটচক্রের ভয়ঙ্কর চাল দেখিয়া দেখিয়া, মানুষের উপর তাঁহার বিশ্বাস একটু টুটিয়াছে। তিনি যার-পর-নাই সন্দিগ্ধচিত্ত ও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিক্ষিপ্তমনা হইয়া উঠিয়াছেন। মেরী অবিশ্বাসিনী, এই সন্দেহ এক একবার তাঁহাকে ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তুলিতেছে। তিনি সঙ্কল্প করিলেন,—আগে ব্রিড্‌পোর্টে যাইয়া, মেরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, মেরীর মন বুঝিবেন, তাহার পর অন্য কর্ম্ম।

জেম্‌সের সহিত, যে রাত্রিতে, মেরীর বিবাহ হইবার কথা, ঘটনাক্রমে, সেই দিনের সন্ধ্যার ট্রেণেই উইলিয়ম ব্রিড্‌পোর্টে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার বেসী বিলম্ব নাই। সমস্ত প্রস্তুত। হোটেলের দরোজায় ষ্টেশনে যাইবার জন্য, ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। উইলিয়ম, মেরীর চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে, উৎকণ্ঠাকুল-প্রাণে গাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। এই সময়, কোথা হইতে একটি অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি চিঠি দিল। চিঠি দিয়া সে আর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিল না; দ্রুতপদে, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে চলিয়া গেল। উইলিয়ম তৎক্ষণাৎ চিঠি খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন উহাতে লেখকের নাম নাই। গাড়ীর আলোকে চিঠিখানি পাঠ করিলেন। চিঠির মর্ম্ম এইরূপ।—

"আপনি লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহা শুনিতে পাইয়া, মেরী মেডোজ্ আপনার হাত হইতে চির-অব্যাহতি লাভের প্রত্যাশায়, কল্য অপরাহ্ণে, তাহার প্রকৃত ভালবাসার পাত্র অন্য এক ব্যক্তির সহিত পরিণয়-পাশে সম্বদ্ধ হইয়াছে। ব্রিড্‌পোর্টে, এই নূতন দৃশ্য আপনার প্রীতিকর হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। এক্ষণ আপনার ব্রিড্‌পোর্টে যাওয়া উচিত কি না, একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।—আপনার চির-হিতাকাঙ্ক্ষী জনৈক বন্ধু।"

পত্র পাঠ করিয়া, উইলিয়মের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার ধীরতা, স্থিরতা, বিবেক ও বুদ্ধি সমস্তই যেন একসঙ্গে লোপ পাইল। তিনি অগ্র পশ্চাৎ ভাবিলেন না। ভাল মন্দ বিচার করিলেন না। তাঁহার আংশিক অপ্রকৃতিস্থ বিকল-চিত্ত সহসা একবারে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া

উঠিল। তিনি যাহার জন্য, এত কষ্ট সহিয়া, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, সম্পত্তি উদ্ধার করিলেন, তাঁহার সেই প্রাণাধিকা, সেই প্রণয়-মধুরা মেরী এমন! সে এত অবিশ্বাসিনী! এ কল্পনার বোঝা, তিনি আর বহিতে পারিলেন না। একবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি অমনি কটি হইতে শাণিত ছোরা বহির্গত করিলেন। শত্রু-হস্তে আত্মরক্ষার্থ যে ছোরা পাঁচ বৎসরকাল, তাঁহার নিত্য সঙ্গী ছিল, আজি সেই ছোরাই আত্মবিনাশে উত্তোলিত হইল। তিনি বিনা সঙ্কোচে, বিনা বাক্য ব্যয়ে, ছোরা আপনার বক্ষে বসাইয়া দিলেন। উহা বক্ষোভেদ করিল। উইলিয়ম কম্পিত কলেবরে মাটীতে পড়িয়া গেলেন। যন্ত্রণা ক্লিষ্ট প্রাণ-বিহঙ্গ তখনই দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অনন্তের পথে উড্ডীয়মান হইল।

আজি মেরীর বিবাহের দিন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। নিমন্ত্রিত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা একে একে মেরীর পিতৃ-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। মেরীর পিতা উৎসাহে উৎফুল্ল। তিনি পত্নীর সহিত প্রীত-মনে সমাগত ব্যক্তিদিগের আদর অভ্যর্থনা করিতেছেন। জেম্‌স্ মেসন আমোদে অধীর। সে আপনার সজ্জাগৃহে বর-বেশে সজ্জিত হইতেছে।

আর দুঃখিনী মেরী! তাহার আর আমোদ উৎসব কি? তাহার প্রাণে অসহ্য জ্বালা, নয়নে জ্বালাময়ী জল-ধারা। মেরী বৈবাহিক সজ্জায় সজ্জিত হইবার ছলে, এক নির্জ্জন কুঠরীতে প্রবেশ করিয়াছে। সে আজি নির্জ্জনে বসিয়া, তাহার প্রাণাধিক প্রিয়তম উইলির জন্য, দুই ফোঁটা অশ্রুপাত করিবে। আজিকার এই কাল-নিশা-প্রভাতে, প্রণয়ের নামে, সামান্য অশ্রুতর্পণেও আর তাহার অধিকার থাকিবে না। অতএব, সে আজি অতীতের অনন্তকথা স্মরণ করিয়া, শেষ-কান্না কাঁদিয়া লইবে। মেরীর ইহাই বিবাহের আয়োজন;—ইহাই তাহার বৈবাহিক সজ্জা!

মেরী, প্রথমতঃ সেই কোঠায় কেহ কোথাও আছে কি না, চারিদিকে চাহিয়া, তাহা দেখিয়া লইল। তার পর, জানু পাতিয়া উপবেশন করিল। প্রার্থনা মনে আসিল না। উইলিয়মের সেই বিদায়কালীন কাতর মুখ খানি, আর সেই প্রাণভরা ভালবাসার কথা মনে পড়িল। প্রায় ছয় বৎসর হইল, যে প্রিয়মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রতিনিয়ত প্রীতির উপচারে পূজা করিয়াছে, মেরী আজি, জন্মের মত, সেই মূর্ত্তিকে হৃদয় হইতে তুলিয়া লইয়া, বিস্মৃতির অন্ধকারে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে। মেরী ইহা পারিল না। এমন কঠোর সাধনা, অমন স্নেহ-কোমলা কুমারীর পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব। মেরী দুই হাতে মুখ ঝাঁপিয়া ফুকুরিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই রূপে, কিছুক্ষণ কাঁদিবার পরে, মনের ভার একটু লঘু হইলে,—সে, উইলির উদ্দেশে, কর-পুটে প্রাণের অনন্ত কথা, আপনি আপন মনে কহিতে প্রবৃত্ত হইল। সে কথাও ফুরায় না; নয়নের সে জলধারাও শুকায় না!

মেরী এই অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময়, সহসা কে যেন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল! পদ-শব্দ শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিয়াছিল, এখন দেখিয়া দ্বিগুণ চমকিত হইল! যাহা দেখিল, তাহা কি প্রকৃত?—সে তাড়াতাড়ি চখের জল পুছিয়া লইয়া, ভাল করিয়া চাহিল। দেখিল—আর কেহ নয়,—প্রকৃতই তাহার উইলি, তাহার আদরের ধন, তাহার আরাধ্য বিগ্রহ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান!—কিন্তু মুখখানি পিঙ্গলবর্ণ, বড় নিষ্প্রভ, বড়ই বিষণ্ণ! চক্ষু দুটি স্থির দৃষ্টিতে তাহার চখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। ডান হাতখানি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, যেন তীব্র তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাহার পানে সঞ্চালিত হইতেছে। বাঁম হাতখানি বুকের উপরে চাপা। ইহা দেখিয়া মেরী আর স্থির থাকিতে পারিল না;—বেগে গাত্রোত্থান করিয়া কহিতে লাগিল,—"কে—তুমি—প্রাণাধিক—উইলি—এত কাল পরে কি তোমার দুঃখিনী মেরীর কথা মনে পড়িয়াছে?"—বলিতে বলিতে আকুল প্রাণে বাহু প্রসারিয়া, আলিঙ্গন করিতে ছুটিল। কিন্তু! এ কি! মেরী যত অগ্রসর হইতেছে, সে মূর্ত্তিও তত সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু মেরী তখন আনন্দে আত্মহারা। সে পাগলিনীর মত তীর-বেগে ছুটিয়া একবারে ঐ মূর্ত্তির উপরে যাইয়া পড়িল। কিন্তু আলিঙ্গন করা হইল না। উহা জড় কায়া নহে,—ছায়া। মেরী ছায়াকে কোল দিতে পারিল না। দেখিল সে ছায়া মূর্ত্তিও আর সেখানে নাই।—একবারে অদৃশ্য। বালিকা আকস্মিক আতঙ্কে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া, চারিদিক হইতে লোক জন, সেই দিকে দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া দেখিল, সংজ্ঞাশূন্যা মেরী আলু থালু বেশে ধূলায় লুটাইতেছে! দেহে প্রাণ আছে কি না, বুঝা যাইতেছে না!

প্রায় অর্দ্ধরাত্র অতীত হইয়া গেলে, বহু যত্ন, চেষ্টা ও শুশ্রূষার পরে, মেরীর মৃত প্রায় অসাড় দেহে, ধীরে ধীরে, চেতনা সঞ্চার হইল। মেরী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। দেখিল সে শয্যাতলে শায়িত রহিয়াছে। পিতা ও মাতা শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট। অদূরে বর-বেশে সজ্জিত জেম্‌স দণ্ডায়মান। মেরী জেম্‌স হইতে মুখ ফিরাইয়া মায়ের কাতর মুখ পানে তাকাইল এবং মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। পিতা বারংবার, যার-পর-নাই ব্যগ্রভাবে মেরীর পিঠে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া কহিতে লাগিলেন,—"মেরী, বাছা, এমন করিয়া কাঁদিও না। তোমার কি হইয়াছিল, কেন হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে, বলিতে পার কি মা?"

মেরী পিতার আগ্রহে আর চুপ করিয়া রহিতে পারিল না। পিতার পায়ে লোটাইয়া পড়িয়া, সমস্ত কহিল। উইলিয়মের প্রতি ভালবাসা, পরস্পর বিবাহের প্রতিশ্রুতি,—কোন কথাই গোপন রাখিল না। অবশেষে ঐ দিন, যে অবস্থায়, ছায়া-মূর্ত্তির

দর্শন পাইয়াছিল,—যে ভাবে, যে কারণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাও অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করিল। পিতা শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। মাতা রোমাঞ্চিত দেহে মেরীকে বুকে টানিয়া লইলেন। জেম্‌স্‌ আর একটি কথাও কহিল না। সে কি ভাবিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। সে রাত্রিতে বিবাহের কথা আর কেহই মুখে আনিল না।

মেরীর পিতা, পত্নীর অনুরোধে একান্ত বাধ্য হইয়া, উইলিয়মের সম্বন্ধে আর একবার অনুসন্ধান করিতে সম্মত হইলেন। এ জন্য তাঁহাকে বেশী শ্রম স্বীকার করিতে হইল না। দুই এক দিনের মধ্যেই, উইলিয়ম-কৃত আত্মহত্যার শোকাবহ কাহিনী ব্রিড্‌পোর্টে প্রচারিত হইল। উইলিয়মের মৃতদেহের পার্শ্বে বেনামী চিঠি খানি পাওয়া গিয়াছিল। পরে ঐ বেনামী চিঠি কাহার লিখিত ও কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাও গোপনে রহিল না। সকলেই জানিল, উহার লেখক ও প্রেরক জেম্‌স্‌ মেসন্‌ এবং ঐ পত্রবাহক পিয়নও জেম্‌সের পরিচারক বা চর। অনুসন্ধানে ইহাও জানা গেল যে, যে সময়ে,উইলিয়ম লণ্ডনে আত্মহত্যা করেন, তাহার কিছুক্ষণ পরেই, মেরী তাহার নিভৃত কক্ষে উইলিয়মের ছায়া মূর্ত্তি দেখিতে পায়।

ক্রমে ক্রমে সকল রহস্যই বাহির হইয়া পড়িল। দুষ্টমতি জেম্‌স্‌,পোষ্টাফিসের যোগে, কএক বৎসর ব্যাপিয়া, কিরূপে উইলিয়ম ও মেরীর লিখিত সমস্ত চিঠিগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল।—কি কৌশলে উইলিয়মের অলীক মৃত্যু সংবাদ ব্রিড্‌পোর্টে রটাইয়া দিয়াছিল, সমস্তই প্রকাশ পাইল। জেম্‌সের নামে লোকে ছি, ছি, থু, থু,করিতে লাগিল। মেরী ও মেরীর মাতার ত কথাই নাই, মেরীর পিতাও এখন জেম্‌স্‌কে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন।

লোক-গঞ্জনা অসহ্য হইয়া উঠিল। জেম্‌স্‌ আর দেশে থাকিতে পারিল না। যেখানে কেহ তাহাকে চিনে না, জানে না;—যেখানে কাহারও, তাহার নামটি পর্য্যন্তও, জানিবার সম্ভাবনা নাই, জেম্‌স্‌, মনের জ্বালা জুড়াইবার নিমিত্ত, তাদৃশ কোন দূর দেশে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। দুঃখ ও দুর্গতি সে দূর-দেশেও তাহার অনুসরণ করিল। অপরিমিত অপব্যয়ে পৈতৃক সম্পত্তি পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে তখন সর্ব্বতোভাবে নিঃস্ব ও দরিদ্র। বিদেশে, বিপাকে, অভাবের অসহ্য তাড়না ও অনুশোচনার অকথ্য যাতনায় অচিরেই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। অবশেষে, নানা রোগে অশেষ ক্লেশ ভোগের পর, কোন অপরিচিত দীন-নিবাস বা অনাথ-আশ্রমে, জেম্‌সের জীবন-তরী অকালে ডুবিয়া গেল। এইরূপে বিধি-নির্দ্দেশে, ইহ লোকেই, জেম্‌সের আত্মকৃত দুষ্কৃতির কঠোর প্রায়শ্চিত্ত হইল।

মেরী আর বিবাহ করিল না। পিতা মাতার আদরের ধন স্নেহের পুতলী রূপসী, জীবনের সকল সাধে বিসর্জ্জন দিয়া, যৌবনে

যোগিনী সাজিয়া, সন্ন্যাসীর মঠে আশ্রয় লইল। প্রিয়তমের প্রিয়মূর্ত্তি খানি হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রেম-তাপসী প্রেমের তপস্যায় মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিল। মেরীর প্রেমাশ্রু ও শোকাশ্রু, সুখ-লালসা ও স্বার্থের আবিলতা, পরিহার করিয়া, পুণ্যময়ী করুণার দ্রবধারায় উছলিয়া পড়িল। তাহার নির্বিকার সরল প্রাণে, পরিণত বয়সে, উইলিয়মের জন্যও শোক রহিল না, জেম্‌সের জন্যও বিকার-বিরক্তি বা ক্রোধ ঠাঁই পাইল না। মেরী উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া জেম্‌স্‌কে ক্ষমা করিল। পীড়িতের শুশ্রূষা, বিপন্নের আশ্বাস এবং শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, ইত্যাদিক নিষ্কাম পর-হিত-ব্রতে দুঃখিনী মেরী প্রাণের জ্বালা জুড়াইল; এবং অবশিষ্ট জীবন, পৃথিবীর হিসাবে সুখী না হইলেও, প্রকৃত শান্তিতে অতিবাহিত করিল।

# বেদান্ত * সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাইসেনের মত।

আত্ম-প্রশংসা সকল সময় পক্ষপাতশূন্য নহে। কিন্তু পরের মুখে সুখ্যাতিবাদ নিরপেক্ষ বলিয়া অধিক মূল্যবান্। সেই জন্যই আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত হিন্দুর বেদান্ত সম্বন্ধে ডাইসেন ( Deussen ) নামক কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অনুকূল মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই মনীষী উন্নত জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতী কীল ( Kiel ) বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। মোক্ষমূলার প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষ ইঁহার প্রিয়ভূমি। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন এবং বেদান্ত সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহামতি কান্টের (Kant) শিষ্যগণ প্রথমে প্রাচ্য দর্শন আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। শোপেনহর (Schopenhauer বলিতেন যে কেবল মাত্র সাংখ্য দর্শনের ত্রিবিধ দুঃখবাদেই ( Pessimism ) প্রকৃত বিশ্বরহস্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনের নির্ব্বাণবাদ ( Absorption ) শ্লায়রমেশরের ( Schleirmacher ) বিশেষ প্রিয় ছিল। উল্লিখিত অধ্যাপক ডাইসেন বেদান্তকে অতি উচ্চ চক্ষে দেখেন। তিনি বেদান্তের উল্লেখ কালে একস্থলে বলিয়াছেন;—

"This fact may be for poor India in so many misfortunes a great consolation; for the eternal interests

* বেদান্ত বলিতে তিনি শাঙ্করমতই বুঝেন, কারণ বৈদান্তিকগণের তিন চতুর্থাংশ ঐ মতাবলম্বী। রামানুজ, বল্লভ বা মধ্বাচার্য্যের মত এ দেশে আদর পায় নাই।

are higher than the temporary ; and the system of the Vedanta—* * * * equal in rank to Plato and Kant—is one of the most valuable products of the genius of mankind in its search for the eternal truth—"

অর্থাৎ, দুর্দ্দশাপন্ন ভারতের বেদান্তই একমাত্র সান্ত্বনা; কেন না পার্থিব প্রয়োজন অপেক্ষা অপার্থিব প্রয়োজন উচ্চতর এবং প্লেটো ও কাণ্টের দর্শনের সমতুল্য এই বেদান্ত শাস্ত্র শাশ্বত সত্য অন্বেষণে মানব মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অমূল্য।

তিনি নিম্নলিখিত সমালোচনাদ্বারা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চারিটি তত্ত্ব লইয়া দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি যথা:—

(১) ব্রহ্মতত্ত্ব ( Theology )

(২) বিশ্বতত্ত্ব ( Cosmology )

(৩) আত্মতত্ত্ব ( Psychology )

(৪) পরলোকতত্ত্ব ( Eschatology )

তন্মধ্যে প্রথম তিনটি তত্ত্ব কাণ্টের Transcendental Dialectic ( অতীন্দ্রিয় বিচার ) নামক গ্রন্থে অজ্ঞেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ব্রহ্মের অন্বয়ী জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র "নেতি" "নেতি"—ইহা নয় ইহা নয়—এইরূপ ব্যতীরেকী জ্ঞান সম্ভবে। তিনি নিতান্তই

"অবিজ্ঞাতং বিজানতাং
বিজ্ঞাতং অবিজানতাং।"

বেদান্ত উপনিষদের এই বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, অধিকন্তু বলিয়াছেন যে তিনি জ্ঞানাতীত হইলেও "অনুভাবনীয়"। এই অনুভূতি অনুভবকারী ভিন্ন আর কাহারও নিকট বুঝাইবার উপায় নাই। আত্মার এই অবস্থা কতকটা শেলিং ( Schelling ) যাহাকে "intellectual intuition" বলিয়াছেন সেইরূপ। ইহা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ও সমাধি সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ব তত্ত্ব সম্বন্ধে কারণ মায়ার সৃষ্টি, বেদান্ত "জগন্মিথ্যা," এই বাক্য বলিয়াছেন। প্লেটো এবং কাণ্টও এই অপ্রাকৃত বাদ ( Idealism ) প্রচার করিয়াছেন। তবে কাণ্টের এই বিশেষ গুণ যে, তিনি তাঁহার "Transcendental Æsthetic" ( অতীন্দ্রিয় দর্শন ) নামক গ্রন্থে মনোবৈজ্ঞানিক যুক্তিদ্বারা জগতের উপাদান দিক্ ও কাল এতদুভয়ের অপ্রকৃতত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

ইহারা মনের উপাধি ( forms ) মাত্র। বেদান্ত কিন্তু জগৎ সৃষ্টির এক নৈতিক কারণ ( Moral necessity ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা কর্ম্মফল।* প্রতি কল্পান্তে সঞ্চিত কর্ম্মই নূতন কল্পোদ্ভবের কারণ। এই কর্ম্মবাদ হিন্দুর নিজস্ব; পাশ্চাত্য দর্শনের কোথাও ইহার উল্লেখ নাই।

তৃতীয়তঃ, বেদান্ত আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন গ্রাহ্য বিবেচনা করিয়াছেন এবং আত্ম-

* কিন্তু প্রথম কর্ম্মের উৎপত্তি অথবা দুরূহ মায়া-সমস্যার কথা ডাইসেন উল্লেখ করেন নাই।

জ্ঞান সম্ভব বলিয়াছেন। অধ্যাপক ডাইসেন বলেন যে, বেদান্ত কথিত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ অনেকটা ডেকার্টের (Descartes) "Cogito ergo sum" (আমি চিন্তা করিতেছি ইহা নিশ্চিত, অতএব আমার সত্তা আছে, ইহাও নিশ্চিত) এই যুক্তির মত। কিন্তু কাণ্ট তাঁহার পূর্ব্বোক্ত Transcendental Dialectic নামক গ্রন্থে এই যুক্তি প্রমাদসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহাতে Petitio Principii (অন্যোন্যাশ্রয় দোষ) বিদ্যমান। ডাইসেনের এই উক্তির প্রত্যুত্তরে আমরা শুধু বলিতে চাই যে, বেদান্তকথিত আত্মজ্ঞান সাধারণ ব্যবহিত জ্ঞান (Mediate intellection) নহে, বরং অব্যবহিত বোধ (immediate intuition) স্বরূপ। সুতরাং উহার অন্য তর্কমূলক প্রমাণ অনাবশ্যক। "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" কেবল আপনাকে দেখিতে পান। সেই আপনিই ব্রহ্ম—"ব্রহ্মৈবাস্মি।" বেদান্তের এই সর্ব্বব্রহ্মবাদ (Pantheism) হেতু আত্মতত্ব ব্রহ্মতত্বে পরিণত হইয়া যায়।

শেষতঃ পরলোক সম্বন্ধে বেদান্ত বলিয়াছেন যে, সত্য জ্ঞান, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানই পুনর্জন্ম হইতে মুক্তির একমাত্র উপায়। ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির কারণ নহে, বরং ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। উপনিষৎ বলিতেছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মক্ষয় হইয়া যায়, তাঁহার আর মৃত্যু নাই——

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি।"

তিনি জীবিত থাকিলেও জীবন্মুক্ত, কেননা, অনাসক্তি হেতু তাঁহার আর কর্ম্ম-সঞ্চয় হয় না। "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং" ... "ময়ি মদ্য চান্যৈরেকো বিষ্ণুঃ" এই উপলব্ধি হেতু তাঁহাকে আর চেষ্টা করিয়া পরোপকারনীতি (altruism) শিখিতে হয় না। তিনি জীবনেই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। মৃত্যুর পর

—"বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ।
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥"

এই বৈদান্তিক নির্ব্বাণ ও বৌদ্ধ নির্ব্বাণে প্রভেদ আছে। নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিকসূত্রানুসারে নির্ব্বাণ আত্মার সম্পূর্ণ "লয়" বা বিনাশ। যোগাচার, সৌত্রান্তিক প্রভৃতি সেশ্বর বৌদ্ধশাখানুসারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আত্মা পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় অনন্ত সলিল সাগরে মিশাইয়া যায়। যথা, স্যর্ এড্উইন্ আর্নল্ড্ (Sir Edwin Arnold) তাঁহার "Light of Assia" (এসিয়ার আলোক) নামক বুদ্ধদেবের জীবনীতে লিখিয়াছেন:—

"The dew is on the lotus, rise
great sun,
Lift the leaf and mix me in
the wave;
*One mani padmi hum* the
sunrise comes.
The dewdrop slips into the
shining sea."

বৌদ্ধ শ্লায়র মেশর (Schleirmacher) ও তাঁহার নির্ব্বাণকে "absorption" (মিশ্রণ)

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৈদান্তিক নির্ব্বাণে কিন্ত জীবাত্মাস্বরূপ সেই পরম ব্রহ্মই কেবল নাম, রূপ ইত্যাদি মায়োপাধি হইতে বিমুক্ত হয়েন। বৌদ্ধ নির্ব্বাণে ভৌতিক (Physical) মিশ্রণের ভাব যেন অধিক প্রবল।

পূর্ব্বোক্ত বেদান্তের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য "নিগুণ বিদ্যা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—মানবের "পরমার্থিকা অবস্থার" উহা উপযোগী। আর লৌকিক বা "ব্যবহারিকী অবস্থার" জন্য উহার স্থূল ব্যখ্যা বা "সগুণ বিদ্যাও" আছে। এতদুভয় লইয়া বেদান্ত কেন সমগ্র হিন্দুধর্ম্মই গঠিত।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর, লেখক হিন্দুদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক এক প্রাণস্পর্শী উপদেশ দিয়াছেনঃ—

"And so the Vedanta in its unfalsified form is the *strongest* support of pure morality, is the greatest consolation in the sufferings of life and death,—Indians, keep to it!" অর্থাৎ,

সুতরাং প্রকৃতরূপে বুঝিলে বেদান্তদর্শন উচ্চনীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, এবং জীবন ও মরণের বিবিধ তাপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সান্ত্বনা;—হে ভারতবাসিগণ তোমরা উহার পথ অনুসরণ কর!

শ্রীনীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

# শোকাশ্রু।

(কোনও আত্মীয় বিয়োগে)

( ১ )

তুমিও চলিয়া গেলে!
জন্মভূমি পুণ্যালোক নিবিয়াছে হায়!
নিবিয়াছে ভক্তি, শ্রদ্ধা, জ্যোৎস্নাপ্রীতির!
সেই হিংসা রঙ্গালয়ে,
আত্মহত্যা অভিনয়ে,
আছিল হৃদয় তব প্রেমপারাবার
মরুভূমে সরোবর শীতল সুধার।

( ২ )

নয়ন করুণা সিক্ত শীতল সজল;
অধরে প্রীতির হাসি সজল শীতল।
সে বরুণা, সেই অসি,
কি পবিত্র বারাণসী,
সৃজেছিল সুপবিত্র হৃদয়ে তোমার।
জন্মভূমি অঙ্কে নাহি তুলনা তাহার।

( ৩ )

ধীর, স্থির, অমায়িক বিচার আসনে,
গৃহে স্নেহময় পিতা, পতি প্রেমময়,
সমাজে মধুর ভাষী,
অধরে সস্নেহ হাসি,
চলে গেলে সেই হাসি অধরে লইয়া,
কাঁদিল একটি দেশ আকুল হইয়া।

( ৪ )

এই ত কহিতেছিলে কত কথা হায়!
এই ত হাসিতেছিলে আনন্দে, আদরে।
অধরে থাকিতে কথা,
নয়নে পলক তথা,
অকস্মাত একি বজ্র হইল পতিত
বিনা মেঘে! ফুরাইল আনন্দের গীত।

( ৫ )

তুমি বজ্রাহত ভাই! হইলে নিদ্রিত,
আমি বজ্রাহত হায়! রয়েছি জীবিত।
আমার দক্ষিণ অঙ্গ পড়েছে ভাঙ্গিয়া,
অর্দ্ধ দগ্ধ তরু, তবু রয়েছি বাঁচিয়া।

( ৬ )

আষাঢ়ের অমাবস্যা হইল প্রভাত;
আমাদের অমাবস্যা হইল সঞ্চার।
দিনে তুমি কতবার,
করিতে যে নমস্কার;
মানুষ মানুষে ভক্তি করে না এমন।
অন্তিমেও এ ভক্তিতে ত্যজিলে জীবন।

( ৭ )

ভ্রাতা-পুত্র-প্রিয়তম সুহৃদ আমার;
বিপদে ভরসা; শান্তি সন্তাপে শীতল;
তুমি জন্মভূমি তারা,
তোমার নয়ন তারা,
আমার নয়ন তারা আছিল যুগল,
তোমার বিহনে আমি অন্ধ, দুর্ব্বল।

( ৮ )

বর্ষিলাম অর্জ্জুনের শোকে শান্তি জল।
আজি সেই শোকে মম দহে অন্তস্থল।
নারায়ণ! অন্তর্যামি!
বুঝি পারি নাই আমি
সেই পুত্র শোক চিতা করিতে নির্ব্বাণ,
জ্বালাইলে এ হৃদয়ে তাই এ শ্মশান!

( ৯ )

না, না, ভাই! নাহি মৃত্যু তোমার কখন
তুমিই ত বীর মত কহিতে সতত
"নাহি মম মৃত্যু ভয়,
আমাদের মৃত্যু হয়,
পাব জীবনের উর্দ্ধ স্তর দুই জন।"
তুমি পাইয়াছ; আমি পাব কি তেমন?

( ১০ )

বসি সেই উর্দ্ধতর জীবন সোপানে,
দেব আশীর্ব্বাদ তব করিও বর্ষণ।
আঁকিয়া কর্ত্তব্য রেখা,
দেখাইও সেই লেখা
যুগল ভ্রাতায়, দুই অনাথ সন্তানে।
বড় ব্যথা পাইয়াছি, দিও শান্তি প্রাণে।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "অরুণ; শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ৪১নং সুকিয়স-ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" ইহা এক খানি কবিতা-পুস্তক। ইহাতে 'বঙ্গভাষার প্রতি,' 'প্রার্থনা,' 'মলয় ও কোকিল,' 'মহাশক্তি,' 'মুক্তি কামনা,' 'ভ্রমরের চুম্বন-মদিরা,' 'চোক গেল,' 'মুখরা প্রকৃতি,' 'বিদায়' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে

ত্রিশটি কবিতা-কোরক আছে; এবং সমস্ত কবিতাতেই, অল্প বা অধিক পরিমাণে, গ্রন্থকারের নবীন আশা ও নবোদ্গত কবিত্ব-শক্তির পরিচয় রহিয়াছে। গ্রন্থকার, তরুণ যুবা হইলেও, হৃদয়িক পুরুষ। বোধ হয় তাই আপনি আপনার অমল হৃদয়ের আদরে ফুলিয়া গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন অরুণ। এ নাম, আমাদিগের বিবেচনায়, কোন অংশেও অনুপযুক্ত হয় নাই। আমরা তাঁহার প্রথম কবিতাটি এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পড়িয়া পাঠক লেখকের শক্তি, শব্দস্ফূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্যানুভূতির একটু পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন।—

"দুরাশায় আসিলাম তব কুঞ্জ গেহে,
উষার মধুর আলো, বড় যে লেগেছে ভালো
পাগল মলয় যে গো লাগিয়াছে দেহে,
দুরাশায় আসিয়াছি তাই কুঞ্জ গেহে।

আমি এই নানা ফুলে গাঁথিয়াছি মালা!
সভয়ে এসেছি দ্বারে—দাঁড়ায়েছি এক ধারে
লহ তুলি'—নিবাইয়ে হৃদয়ের জ্বালা—
যত্নে গাঁথা ছোট মোর এই ফুল-মালা।"

আমরা এই তরু-লতা-ভূষিতা, পুষ্প-পল্লব-শোভিতা চন্দ্র-তারাময়ী জগতীকে যে মহা প্রকৃতির পরিস্ফুট মূর্ত্তি বলিয়া সংজ্ঞা করি, তিনি কাহারও পক্ষে সুচারুহাসিনী সলজ্জ-মধুর-মৃদুভাষিণী দেব-রমণী, কাহারও চক্ষে বিকট-ভয়ঙ্করা বজ্র-কঠোরা নৃমুণ্ডমালিনী। দেবকুমার, যেন দেবতার বরে, জীবনের স্রোতে, মরালের মত ভাসিতেছেন, এবং এখন পর্য্যন্ত উল্লিখিত কবি-কল্পিত দেব-রমণীর মন ভুলানো মধুর হাসি দেখিয়াই মোহিত রহিয়াছেন। সুতরাং কাব্যে যাহা মধুর, মনোহর ও মনঃশীতল, তাঁহার এই 'অরুণ' তাহা লইয়াই আত্মহারা। ইহাতে কবিতার এক দিক্‌ই ফুটিয়াছে, দশ দিক্‌ ফুটিতে পারে নাই। তিনি যে দিকে চাহেন সেই দিকেই—

"লাবণ্য ঝরিছে অবিরত
এ বিশাল ভবে,
চারি দিকে পূর্ণ, মনোমত—
হেরি যেথা যবে।"

আমাদের আশা আছে এই অরুণ-কবি, যখন তরুণ যৌবনের সুখ-সীমা অতিক্রম করিয়া, প্রকৃতির সুবিশাল গ্রন্থকে জ্ঞানের চক্ষে পাঠ করিতে পারিবেন, তখন তাঁহার কবিতা আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিবে।

২। "কুরুক্ষেত্রে দশ দিন।—কাব্য, শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মুরশিদাবাদ, সৈদাবাদ হিতৈষী প্রেসে মুদ্রিত।" কাশীদাসের মহাভারতে যাহার নাম ভীষ্ম পর্ব্ব, 'কুরুক্ষেত্রে দশ দিন' তাহা লইয়াই আধুনিক বাঙ্গালায় এবং এখনকার আদৃত বিবিধ ছন্দের মালায়, অভিনব কাব্যে পরিবর্ত্তিত। এ পুস্তক খানি মোটের উপর সুন্দর হইয়াছে, এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কথা কোন দিনও যাঁহাদিগের নিকট পুরাতন হয় না, এ পুস্তকের স্থানে স্থানে তাদৃশ সহৃদয় হিন্দুর সুখ-সেব্য সামগ্রী অনেক আছে। গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ মুদ্রিত হয় নাই। ইহা বড়

দুঃখ। আর এক দুঃখ ইহাতে কৃষ্ণচরিত্র এবং আরও কতকগুলি উজ্জ্বল চরিত্র আশানুরূপ চিত্রিত হয় নাই। গ্রন্থকার 'ত্রিদীব' লিখিতে দীর্ঘ ঈকার ব্যবহার করেন; তাঁহার 'সসব্যস্ত' দন্ত্য-সকার-যুক্ত। 'সহস্ত' শব্দে 'ব' ফলা লাগে না। এ সকল ভুল-ভ্রান্তি, মুদ্রাকর প্রমাদ বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য হইলেও, গ্রন্থের গৌরব নাশক। গ্রন্থে একটুকু রসস্ফূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্য আছে। তাই আমরা দুই একটিমাত্র দেখাইয়া দিলাম। কিন্তু ঐরূপ ভুল ভ্রান্তি অসংখ্য। ভরসা করি গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ সময়ে যতীন্দ্র বাবু বিশেষ সাবধান হইবেন।

৩। "শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী। (শ্রীপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-প্রভু-প্রণীত 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক প্রবন্ধ এবং তাহার বিবিধ সমালোচনা প্রভৃতি। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস-ঘোষ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।" যাঁহারা বঙ্গীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের বিবিধ বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, এই পুস্তকখানি তাঁহাদিগের প্রয়োজনে লাগিবে। পুস্তকের মুখ্য কথা শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জাতি নির্ণয়। কেহ বলেন, ঈশ্বরপুরী জন্মসম্পর্কে শূদ্র, কেহ বলেন ব্রাহ্মণ। ইহার কোন্ কথা সত্য? গ্রন্থকার গোস্বামিমহাশয় ব্রাহ্মণত্ব পক্ষ প্রতিপাদনে যত্নপর হইয়াছেন, এবং আপনার সে সদুদ্দেশ্য সাধনে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন।

আজি-কালিকার দিনে, সাম্প্রদায়িক কথা লইয়া, বিচার করিতে যাওয়া বড় বিড়ম্বনা। কারণ, যাঁহারা সম্প্রদায়-বিশেষের আশ্রয় কিংবা আশ্রিতরূপে দণ্ডায়মান হইয়া শাস্ত্রীয় কথার মীমাংসায় অগ্রসর হন, তাঁহারা, অনেক সময়ে, সত্যানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া, স্বমত-সমর্থনের জন্যই উন্মত্ত রহেন। কিন্তু অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিমহাশয় অন্য শ্রেণীর পণ্ডিত। তিনি সম্প্রদায়-বিশেষের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, উদার-স্বভাব ও অসাম্প্রদায়িক; এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও, বালকের ন্যায় সরল, মধুর-স্বভাব ও সত্যানুরাগী। সুতরাং সকলেই তাঁহার মত ব্যক্তির সিদ্ধান্তে নির্ভয়ে নির্ভর করিতে পারে। কিন্তু, তিনি চৈতন্যচরিতামৃত হইতে যে প্রকারের প্রমাণ সঙ্কলন করিয়া পুরী মহাশয়ের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, সে প্রকারের প্রমাণ, বিশেষ কোন ব্যক্তির নামমুদ্রায় মুদ্রিত না থাকিলেও, উপেক্ষার বস্তু নহে।

কবিবর বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের এক স্থানে আছে,—

"অদ্বৈত বলেন বাপ তুমি কোন্ জন,
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন।
বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম,
দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ।"

উপরিধৃত লেখায় ঐ যে 'শূদ্রাধম' পদটি রহিয়াছে, উহাই ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বলিয়া প্রতিপাদন করিবার এক মাত্র অবলম্ব। গোস্বামি-মহাশয় শূদ্রাধম পদকে ক্ষুদ্রাধম বলিয়া পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন। 'ক্ষুদ্রাধম' এই পাঠ সুসঙ্গত হউক আর না হউক, গোস্বামি মহাশয় যে ভাবে ঈশ্বরপুরীর জাতি সংক্রান্ত সমস্ত কথার আলোচনা করিয়াছেন,

তাহাতে পুরী মহাশয় বৈষ্ণবোচিত দৈন্য নম্রতায় আপনাকে আপনি শতবার শূদ্রাধম বলিলেও, কেহই তাঁহাকে শূদ্র মনে করিতে সাহস পাইবে না। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গের অমিত-তেজঃপ্রভাবে অনেক কায়স্থ, বৈদ্য এবং শূদ্রও কালক্রমে ব্রাহ্মণের গুরুপদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গের সমকালবর্ত্তী অথবা পরবর্ত্তী লোক। গভীর-সত্ব ঈশ্বরপুরী গৌর-প্রেমের অলৌকিক প্রভাব-প্রবর্ত্তিত ভক্তিবিপ্লবের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তাঁহার সময়ে, বঙ্গীয় জাতিভেদের বন্ধন কোন অংশেও শ্লথ হওয়া সম্ভব নহে। উপরিধৃত 'শূদ্রাধম' পদের দ্বারা প্রতারিত হইয়া পুরী মহাশয়কে আমরাও এত কাল শূদ্র মনে করিয়াছি। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে আমরা মুহূর্ত্তের তরেও কুণ্ঠিত নই যে, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহাশয়ের এই পুস্তক পাঠে আমাদিগের সেই সংস্কার একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে।

৪। "পুরী যাইবার পথে। ডাক্তার রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, এম্, বি, এফ্, সি, এস, সঙ্কলিত ও ১৩১০ সালের ২৭শে বৈশাখ রবিবারে 'সাহিত্য-সভায়' পঠিত।" রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর স্বদেশে ও বিদেশে বৈজ্ঞানিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি কিমিতি বিজ্ঞানে (Chemistry) অর্থাৎ রসায়ন শাস্ত্রে অসামান্য পণ্ডিত, এবং বিজ্ঞানের আরও বহু শাখায় বহুসংখ্য বিজ্ঞ লোকের নিকট আচার্য্য বলিয়া পূজিত। এইরূপ ব্যক্তিরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুসরণে অগ্রসর হইলে, সাহিত্য ও সমাজ কত প্রকারেই যে উপকৃত হইতে পারে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের সম্পর্কে সাধারণের একটা কুসংস্কার আছে। সাধারণের মধ্যে অনেকেরই মনে এইরূপ একটা ধারণা যে, বিজ্ঞান আর কাব্য পরস্পর-বিরুদ্ধ। সুতরাং যাঁহারা বিজ্ঞানে যে পরিমাণে প্রগাঢ়, তাঁহারা কাব্য-রসে সেই পরিমাণে দরিদ্র। এ ধারণা নিতান্তই অমূলক, এবং ইহার প্রমাণ টিণ্ডেল, হক্স্লি ও ফিস্কে প্রভৃতি বিশ্রুত-কীর্ত্তি পণ্ডিতদিগের প্রবন্ধমালা। টিণ্ডেল ও ফিস্কের লেখায় স্থানে স্থানে প্রকৃত কবিত্বের মাধুরী এমন উচ্ছলিত রহিয়াছে যে, পড়িবার সময়ে বুদ্ধি চমকিত ও হৃদয় আর্দ্র না হইয়া পারে না। রায় চুণীলালের লেখায়ও প্রকৃত চিত্তহারি কবিত্ব আছে। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল ও মধুর; বর্ণনা যেমন বিজ্ঞতা তেমনই ভাবুকতার পরিচায়ক।

'পুরী যাইবার পথে' একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই শিখিবার কথা অনেক আছে। ইহা পাঠ করিলে মনে আপনা হইতেই এই সংস্কার জন্মে যে, লেখক ভক্তকবি ও ভাবুক পর্য্যটক। তিনি কবি ও ঐতিহাসিকের চিত্ত ও চক্ষু লইয়া পুরী যাইবার পথে পরিভ্রমণ করিয়াছেন; এবং সে পথে যাহা কিছু সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ, তাহা সমস্তই তুলিতে আঁকিয়া তুলিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুরীদর্শন নামক প্রবন্ধ পড়িবার জন্য উৎসুক রহিলাম। বসুজ মহাশয় স্থানে স্থানে পরিসর অর্থে 'প্রশস্ত' এবং

অপরিসর অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ অর্থে 'অপ্রশস্ত' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রশস্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ উত্তম, শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালায় 'প্রশস্ত ললাট', 'প্রশস্ত পথ' প্রভৃতি প্রয়োগে, প্রশস্ত শব্দের যেমন অসঙ্গত প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহার লেখায়ও, সেইরূপ দৃষ্ট হইল। ইহা বিচার-সম্মত কি না, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন।

৫। "আলোক-চিত্রন বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা, দ্বিতীয় সংস্করণ। ভারতীয় শিল্প সমিতির সম্পাদক, এ, এচ, ইনষ্টিটিউসনের ভূতপূর্ব্ব শিল্প-শিক্ষক, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনীর শিল্প পরীক্ষক এবং ছায়া-বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এস্ লাল এণ্ড ব্রাদার্স দ্বারা প্রকাশিত।" আমরা শিল্পী না হইলেও, শিল্পানুরাগী, এবং সূক্ষ্ম শিল্পের সুচারু বিকাশের সহিত, জাতীয় সাহিত্যের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আলোক-চিত্রনের রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় একই আধারে বিখ্যাত শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক। সুতরাং সাহিত্যসেবী ব্যক্তি মাত্রেরই সাদর-পূজাস্পদ সুহৃৎ। এ দেশে, ইদানীং, বাঙ্গালির জাতীয় সাহিত্যের একটি বিরাট প্রতিমা ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছে। মন্মথনাথের ন্যায় সূক্ষ্ম শিল্পীরা আলোক-চিত্রন প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারা সূক্ষ্ম শিল্পের যে সকল তত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন, তাহা সে প্রতিমার বিশেষ অঙ্গ সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিবে। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্ররূপে ফটোগ্রাফি অর্থাৎ আলোক-চিত্রন শিক্ষা করা সকলের অদৃষ্টে না ঘটিতে পারে। কিন্তু যে সকল সৌখীন যুবা ঘরে বসিয়া শিল্প শাস্ত্রের এ আনন্দময় প্রক্রিয়ার বিবিধ শাখা শিক্ষা করিতে ভালবাসেন, মন্মথনাথের এই পুস্তক তাঁহাদিগের উপকারে আসিবে গ্রন্থকার ফটোগ্রাফির মহিমা চিন্তায় এক স্থলে ভাব-গদ-গদ হইয়া বলিতেছেন—

"ফটোগ্রাফে এখন না হইতেছে, এমন কাজ নাই। গ্রহ নক্ষত্রাদি চিত্রিত হইতেছে, বন্দুকের গোলা-গুলি ছুটিবার সময়ে চিত্রিত হইতেছে, চক্ষুর অগোচর পদার্থেরও প্রতিরূপ চিত্রিত হইতেছে। প্রেত-তত্ত্ববাদীরা ভূত প্রেতের পর্য্যন্ত ফটোগ্রাফ তুলিতেছেন। সম্প্রতি আবার ফরাসী বৈজ্ঞানিক বরদক্ চিন্তিত পদার্থের বা চিন্তা স্রোতেরও চিত্র উত্তোলন করিতেছেন। এক কথায় ফটোগ্রাফে অসাধ্য সাধন হইতেছে।"

গ্রন্থকার এই বাক্যটিতে আপনার আরাধ্য বিদ্যার অসাধ্যসাধনী শক্তি সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সমস্তই সত্য। কিন্তু তাঁহার কএকটি শব্দে আমাদিগের আপত্তি আছে। স্বর্গগত পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পিতৃপুরুষদিগকে ভূত প্রেত না বলিয়া আত্মিক ও আত্মিকা, অথবা পুরাতন ঋষিদিগের ভাষায় সূক্ষ্মদেহী কিংবা সংহিত বলিলেই ভাল হয়; আর, যে তত্ত্ব তাঁহাদিগের পারলৌকিক জীবনের কথা লইয়া ব্যাপৃত, সে পবিত্র তত্ত্বকে অধ্যাত্মতত্ত্ব অথবা আত্মিক-বিজ্ঞান প্রভৃতি শ্রদ্ধাব্যঞ্জক নামে উল্লেখ করিলেই ভাষার গৌরব রক্ষা পায়। যাঁহারা শিল্পকারের শ্রমসাধ্য ব্রতে প্রবিষ্ট হইতে অনিচ্ছুক, এই গ্রন্থে তাঁহাদিগেরও শিখিবার কথা অনেক আছে। গ্রন্থকার যে প্রক্রিয়াকে 'প্রস্তুত কৌশল' কিংবা 'প্রস্তুত প্রণালী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে প্রস্তুতি-

কৌশল কিংবা প্রস্তুতি-প্রণালী বলিলেই সঙ্গত হয় না কি ?

৬। "আনন্দী বাঈ। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত।" পণ্ডিতবর সখারাম দেউস্কর কলিকাতার সাহিত্যিকদিগের নিকট সুপরিচিত ব্যক্তি। কিন্তু ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার তেমন পরিচয় নাই। তিনি সকলেরই পরিচয় যোগ্য; আমরা তাই তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে আগে দু'টি কথা কহিব। পণ্ডিত সখারাম জাতিতে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ; ইদানীং বঙ্গে উপনিবিষ্ট, এবং বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত বলিয়া সহৃদয় বাঙ্গালির অতি ঘনিষ্ঠ। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা যেমন চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থানিক উপাধিতে অলঙ্কৃত; মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ দেউস্কর প্রভৃতি স্থানিক উপাধিতে অভিহিত হইয়া থাকেন। সখারামের নামের সহিত ঐ যে গণেশ শব্দটি সংযোজিত রহিয়াছে, উহা তাঁহার পিতৃনামের পরিচায়ক। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এ রীতি সর্ব্বাংশেই রুষজাতির নাম-ব্যবহার-পদ্ধতির অনুবৃত্তি। আমরা ইতঃপূর্ব্বে, বান্ধবের অতীত কোন সংখ্যায়, দেউস্কর মহাশয়ের দু'খানি পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছি। আজি তাঁহার এই আনন্দী বাঈ পাঠ করিয়াও, আমরা আনন্দপ্রফুল্লচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি যেমন সুলেখক, তেমনই সহৃদয় সামাজিক। তাঁহার গ্রন্থপত্রের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গীয় সমাজ উভয়েরই উপকার হইবে।

আনন্দী বাঈ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে, ৩১শে মার্চ দিবসে, পুনা নগরীতে, যমুনা বাঈ নামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং আপনার বিদ্যাবুদ্ধি, পরোপকার-পরায়ণতা এবং পবিত্রতা প্রভৃতি অসামান্য গুণ-সম্পদে পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া, ১৮৮৭ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী দিবসে। তিনি তেইশ বৎসর বয়সে, পরলোকে প্রস্থিত হন। এই অল্প সময়ের মধ্যে, কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে, বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, পরিশেষে আমেরিকায় যাইয়া এম, ডি উপাধি লাভ করেন, এবং যুবতী হইলেও কিরূপে আপনার চারিত্র-গৌরবে জন-সমাজে পূজিত হন, এই নবতি পৃষ্ঠাত্মক গ্রন্থে তাহার সুন্দর বিবরণ আছে। বঙ্গীয় পুরললনারা নাটক নভেল পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ মহিলা-চরিত-পাঠ করিলে প্রকৃতই দেশের উপকার এবং দেউস্কর মহাশয়ের মত দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের শ্রম সফল হইবে। আমরা আর এক গ্রন্থের সমালোচনায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেউস্কর মহাশয়ের বাঙ্গালা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। এই পুস্তকের রচনায়ও সেই বিশুদ্ধি ও প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি গুণ পরিলক্ষিত হইল। তবে, এখানে সেখানে দুই একটি শব্দে সামান্য একটু অসাবধানতার পরিচয় আছে। আমাদিগের ভরসা আছে, লেখকের দৃষ্টি পড়িলেই এ সকল দোষ আপনা হইতেই অপসৃত হইবে। যথা, তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন আনন্দী "অসাধারণ চরিত্র বলে ভারতীয় মহিলা-সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।" এখানে মুখোজ্জ্বল শব্দ দ্বয়ে সন্ধি না করিয়া, মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন বলিলেই সকল দিকে সুন্দর হয় না কি? আর এক স্থলে শিশুর আখুটি ও আব্দার দৌরাত্ম্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ দেশেও অনেকে সময়ে সময়ে দৌরাত্ম্য শব্দকে ঐরূপ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষা পুস্তকে শব্দের ঐরূপ অপব্যবহার না হওয়াই সুখ-প্রীতিকর ও সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় খণ্ড ] শ্রাবণ ভাদ্র, ১৩১০ । [ ৪র্থ ৫ম সংখ্যা ।

# বান্ধব ।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন ।

( পুনঃপ্রচারিত । )

বৈশাখ হইতে চৈত্রে বর্ষ-গণনা ।

৪ । ৫

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ।



ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা ।

## বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয়
## নিয়মাবলী।

### অগ্রিম।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩৲ | ।৵০ | ৩।৵০ |
| বাণ্মাসিক | ২৲ | ৶০ | ২৶০ |

### পশ্চাদ্দেয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৪৲ | ।৵০ | ৪।৵০ |
| বাণ্মাসিক | ২॥০ | ৶০ | ৩।৶০ |

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব-কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারী সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইলে কার্য্যাদি সম্পর্কে আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হইবে না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা হয়, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৶০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

ঢাকা,
বান্ধব-কুটীর।
১৩১০ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীহরকুমার বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

৺ শারদীয় পূজা নিকটকবর্ত্তী। বান্ধব-সংক্রান্ত দেনা পাওনাদি সমস্ত এই সময় পরিষ্কার করিতে হইবে, অতএব যাঁহারা একাল পর্য্যন্ত বান্ধবের মূল্যাদি দেন নাই, দয়া করিয়া এ সময় উহা পাঠাইয়া আমাদিগের বিশেষ উপকার করিবেন।

নানা কারণে এবার বান্ধব প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল, এখন হইতে গ্রাহকগণ যাহাতে মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে বান্ধব পাইতে পারেন, তদ্বিষয় বিশেষ যত্ন করিব।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু ম্যানেজার।

# দাতার প্রাণ।

দৃশ্য বস্তুর মধ্যে "দলিতাঞ্জন-পুঞ্জ"-প্রতিম দৃপ্ত-বিগ্রহ-স্বরূপ পর্ব্বতেরই বড় নাম। এই পৃথিবীর কোন্ পদার্থ পর্ব্বতের মত উচ্চ? কীর্ত্তিলিপ্সু মনুষ্য, পর্ব্বতের অনুকরণে, পিরামিড গড়িয়া, আপনার প্রভাব-চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু, যে একবার, অভ্রভেদি পর্ব্বত-শৃঙ্গ দর্শন করিয়া, তার পর পিরামিড দেখিতে গিয়াছে, সে নিশ্চয়ই পিরামিডের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতা, এবং সঙ্গে সঙ্গে, মনুষ্যশক্তির দরিদ্রতা চিন্তা করিয়া, মনের বিষাদে দীর্ঘ শ্বাস ফেলাইয়াছে।

পর্ব্বত যেমন উচ্চতায় বড়, সমুদ্র তেমন, এ সংসারের সমস্ত বস্তুর মধ্যে, গভীরতায় বড়। সমুদ্রের গভীরতা অতল ও অমেয়। সমুদ্র দৈর্ঘ্যে এবং বিস্তারেও মহত্ত্বের অপরূপ প্রতিবিম্ব। কিন্তু, জ্ঞানীরা তথাপি উহার গভীরতার চিন্তা করিয়াই, চিত্তে প্রাকৃতশক্তির অভাবনীয় মহিমা অনুভব করিতে যত্ন পাইয়া থাকেন।

কিন্তু আমার এই উদ্দাম-চিন্তাকুল 'উধাও' হৃদয়ে দাতার প্রাণ, উচ্চতায় পর্ব্বত হইতেও অধিকতর উচ্চ, এবং গভীরতায় সমুদ্র হইতেও শত সহস্র গুণ অধিকতর গভীর। ভগবান্ অনন্তদেবের এই অনন্তবিভূতিময় বিশ্বধামে দাতার প্রাণের মত বস্তু আর কিছু আছে কি? এক দিকে, এই জড় জগতের সমস্ত বস্তুর স্তূপীকৃত বোঝা, আর এক দিকে দাতার প্রেমময় প্রাণ। যদি গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি কর, তবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা তোমার কাছে গুরুতর বোধ হইবে?

যাহারা বিশেষ কোন স্বার্থ কিংবা অভিসন্ধি সাধনের জন্য দান করে, কেহই তাহাদিগকে দাতা বলে না। তাহাদিগের উল্লিখিতরূপ দান ব্যাধের বাগুরা-বিস্তার-সদৃশ। যে, বুদ্ধির দোষে, সেই বাগুরাজালে জড়িত হয়, সে-ই কালে বিপন্ন হইয়া পড়ে। জ্ঞানগুরু কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে সম্ভাষণ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন,——

"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥"

ইহার এই তাৎপর্য্য, যাহারা প্রতিদানে প্রত্যুপকার পাইবার জন্য, অথবা বিশেষ কোন ফলের উদ্দেশ্যে, যার-পর-নাই মনঃক্লেশে, দান করে, তাহাদিগের সে দান প্রকৃত দান নহে; উহা রাজস দান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এরূপ দানে, দাতা ও গৃহীতা কাহারও প্রাণেই, কোনরূপ আনন্দসঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত উভয়েরই চিত্ত দান-সময়ে, অথবা দানের স্মৃতিতে, দীর্ঘকাল ক্লিষ্ট রহে।

পুনশ্চঃ—

"অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং॥"

ইহার এই তাৎপর্য্য,—যাহারা অনুপযুক্ত দেশে, অনুপযুক্ত কালে, অপাত্রে দান করে, এবং যাহাদিগের দান অসংকৃত অর্থাৎ সংকার-বিহীন ও ভক্তিশূন্য, এবং অবজ্ঞাত অর্থাৎ ঘৃণা, অবজ্ঞা কিংবা অবমাননার ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাদিগের সে দানও প্রকৃত দান নহে। উহা সর্ব্বতোভাবেই তামস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণের উল্লিখিত উপদেশ অনুসারে দৃষ্ট হইতেছে যে, তুমি যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা কর, সে যদি আর্ত্তি, অভাব কিংবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণে দানের উচিত পাত্র না হয়, আর ঐ দান-সম্পর্কে তাহার প্রতি তোমার নিরাবিল দয়া, অথবা প্রাণের নিঃস্বার্থ ভালবাসা না জন্মে; এবং তুমি অল্প বা অধিক যাহা কিছু দিতে যাইতেছ, তাহা যদি অকৃত্রিম ভক্তির সহিত দিতে না পার, তাহা হইলে সে দানের কোন মহিমা নাই। যাঁহারা এই পৃথিবীতে গুরুগম্ভীর দাতা বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও, গৃহীতাদিগকে সাধারণতঃ দুঃখক্লিষ্ট অথবা দরিদ্র জ্ঞানে, মনে মনে, অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের মতে এই অবজ্ঞার ভাব দান-ধর্ম্মের মর্ম্মবিঘাতক মহাপাতক, অথবা মহৎ অন্তরায়। যে আপনাকে ধনসমৃদ্ধ বিবেচনায় গৃহীতাকে তুচ্ছ লোক বলিয়া উপেক্ষা করে; তাহার দান-ধ্যান সমস্তই বৃথা। তবে প্রকৃত দাতা কে? পুরুষোত্তম কৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তরে উপদেশ করিয়াছেন,—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে—কালে চ—পাত্রে চ তদ্দানং
সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥"

অর্থাৎ, যাঁহারা দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায়,—দানের প্রয়োজন-জ্ঞানে—আপনার পবিত্র প্রাণের অনন্তোন্মুখ প্রেমের টানে—অনুপকারী জনেও সাহায্য দান করেন, তাঁহারাই দাতা; এবং তাঁহাদিগের তাদৃশ দান, প্রীতি-স্নেহ ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রভৃতি সত্ত্ব-গুণসম্ভূত বলিয়া, সাত্ত্বিক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। যে কোন দিনও তোমার উপকার করে না,—পারিলে বরং অপকার করে, কিন্তু উপকার করিবার কথা মনেও ভাবে না,—সেও যদি কখনও অভাবে পড়িয়া, আশ্রয়প্রার্থী হয়; অথবা অন্য প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া, তোমার কাছে উপকার চায়, কৃষ্ণের ব্যবস্থা অনুসারে তাহাকে উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে, মনুষ্যবিশেষের দুঃখনাশ কিংবা মানব-জাতির সমষ্টিগত মঙ্গল-মননে, সমুচিত সাহায্য প্রদান সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যাহারা যশঃস্পৃহার সুখ-স্ফুরণ কিংবা সানন্দ-কণ্ডূয়নে, সময়ে সময়ে, ঢাক-ঢোল অথবা মৃদঙ্গ-মুরজ বাজাইয়া মুক্তহস্তে দান করে, তাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে, দাতা নহে; অপিতু দীন দরিদ্র। কেন না, তাঁহাদিগের দান সকল প্রকারেই বাণিজ্য-লক্ষণাক্রান্ত, এবং আদানেরই আর এক প্রক্রিয়া মাত্র। তাঁহারা

দক্ষিণ হস্তের দ্বারা দান করে, বাম হস্তের দ্বারা তাহার প্রতিদান গ্রহণ করিয়া থাকে। শুধু ইহাই নহে, তাহারা তিলের পরিমাণে দান করিয়া, তালের পরিমাণে প্রতিদান গ্রহণেও, অপরিতৃপ্ত রহে। তাহাদিগের তথাবিধ জয়োল্লাস-বিঘোষিত দান-সম্পর্কে দেশান্তরের এক দেবপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দুই সহস্র বৎসর পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কৃষ্ণোক্তিরই অনুবৃত্তির মত। * তিনি দানকে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত না করিয়া, মোটের উপর কহিয়াছেন যে, মনুষ্য যখন এক মাত্র সেই অন্তর্যামীর প্রতি দৃঢ়মতি স্থাপন না করিয়া, মনুষ্যকে দেখাইবার জন্য দান করে, সে দান কোন অংশেও তাহার জন্য মঙ্গলজনক না হইয়া, শুধুই তাহার পাপের বোঝা বৃদ্ধি করে।

ভক্তিভোগ্য নিঃস্বার্থ দান আর এক বস্তু। সে দানের বিলাস-স্থান মনুষ্যের প্রাণ। সম-দুঃখ-বেদনা উহার বীজ, সহানুভূতিতে উহার অঙ্কুর-উদ্গম, প্রীতি-স্নেহের মধুর মিশ্রণে উহার পুষ্টি, এবং প্রেমের পূর্ণ বিকাশে উহার পরিপূর্ণতা। যাঁহারা এই প্রকার সুখ-সম্পদের সম্ভার লইয়া দান-ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্য আত্মায় আকুল, আমি তাঁহাদিগকেই দাতা বলিয়া পূজা করি এবং তাঁহাদিগের প্রেমময় প্রাণকে দাতার প্রাণ বলিয়া ধ্যান করিয়া, প্রাতে ও অপরাহ্নে তদুদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে ভালবাসি।

আকাশের ঐ সূর্য্য-প্রণামে পুণ্য আছে পুণ্য আছে বলিয়াই পূত-চরিত্র ভারত-সন্তান প্রাতঃসময়ে উদ্ধনেত্র হইয়া সূর্য্য-দেবকে প্রণাম করে। কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহা হইতেও অধিকতর পুণ্য, দাতার পবিত্র প্রাণকে স্মরণ ও মননের দ্বারা হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়া, তদুদ্দেশ্যে প্রীতি ও ভক্তির সহিত প্রাত্যহিক প্রণামে। অগষ্ট্ কোম্‌টি যে ভাবে ও যে উদ্দেশ্যে মনুষ্যের পূজা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, দাতার প্রাণকে স্মরণ, মনন ও সকৃতজ্ঞ অভিবাদনের দ্বারা পূজা করাও, সেই ভাব ও সেই উদ্দেশ্যেরই অন্তর্গত।

* "সাবধান! সাবধান! লোক দেখাইবার নিমিত্ত লোকের সাক্ষাতে দান করিও না। সে দানের জন্য স্বর্গস্থ পিতার নিকট পুরস্কার নাই। কপট-কুশল ভণ্ড শঠেরা, লোকের কাছে প্রশংসা পাইবার জন্যই দেবালয়ে কিংবা রাজপথে দাঁড়াইয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া দান করে। সত্যই বলিতেছি, তাহারা তাহাদিগের যোগ্য পুরস্কার পাইয়াছে। তুমি কখনও তাহাদিগের মত শিঙ্গা বাজাইও না। তুমি যখন দান করিবে, তখন এমন ভাবে কাজ করিও যে, তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করিতেছে, তাহা যেন তোমার বাম হস্তও জানিতে না পারে। তুমি এইরূপে, লোকচক্ষুর অগোচরে মনুষ্যের মঙ্গলার্থ দান করিলে, যাঁহার চক্ষু সকল স্থলের সকলই দেখিতে পায়, তিনি প্রকাশ্যভাবে তোমার পুরস্কার করিবেন।"

কারণ, জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্য সংসারের যে বস্তুকে যে পরিমাণ ভালবাসে, সে সেই বস্তুর সহিত সেই পরিমাণে সারূপ্য অথবা তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকে। এ কথা সত্য হইলে, দাতার প্রাণকে নিরন্তর অন্তরে পূজা করিয়া, অতি অল্প পরিমাণে হইলেও, সেই মহত্ব, সেই মাধুর্য্য, সেই আনন্দময় উচ্চতা ও সেই শক্র-মিত্র-নির্ব্বিশেষ উদারতা লাভের জন্য যত্নবান্ হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে কি ?

দাতার প্রাণ যে সত্য সত্যই মানবজাতির স্মৃতি অথবা ইতিহাসের আরাধ্য ধন, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। মনুষ্য, পৃথিবীর সকল দেশেই সত্বগুণালঙ্কৃত দাতাকে দেবতা বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। কিন্তু দান-ধর্ম্মশীল ভারতীয় হিন্দু, দাতাকে শুধুই সম্মান করে না; সে দেবতার নামের ন্যায় দাতার নামকেও মঙ্গল্যজ্ঞানে প্রাতঃসময়ে বারংবার উচ্চারণ করে; এবং যদি কোন 'অতি কৃপণ' * কিংবা অকৃতী অধম অবরেণ্য ব্যক্তির নাম, ভ্রম-ক্রমে অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ, প্রাতঃসময়ে তাহার কানে পশে, কিংবা জিহ্বায় আসে, তাহা হইলে সে, পাতক-স্পর্শ জ্ঞানে প্রাণে শিহরিয়া, যেন প্রায়শ্চিত্তের জন্য, পুণ্য-শ্লোক প্রসিদ্ধ দাতাদিগের নাম পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিতে থাকে।

কুরুকুল-কর্ণধার মহারথ কর্ণ, রণক্ষেত্রে অনেক মন্দ কার্য্য করিয়া, অর্দ্ধরথ নামে নিন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি দাতার প্রাণ লইয়া জন্মিয়াছিলেন; তাই মনুষ্য অদ্যাপি তাঁহাকে দাতা কর্ণ বলিয়া স্মরণ করে, এবং তাঁহার দান-জন্য কীর্ত্তিকলাপের উপর মানস-কুসুমের অঞ্জলি দিতে ভালবাসে। ইউরোপের আর এক বীর,—আর এক অতিরথ পুরুষ, মৃত্যুর মুহূর্ত্ত কাল পূর্ব্বে, আপনার পানীয় জলটুকু, আর একটি পিপাসার্ত্ত সৈনিককে দান করিয়া, মনুষ্যজাতির ইতিহাসে ভক্তির যে প্রকার উচ্চ আসন পাইয়া গিয়াছেন, তাহা দেবতারও সহজ লভ্য নহে। তিনি আপনি শক্রর সাংঘাতিক গোলার আঘাতে সমরাঙ্গণে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, এবং পিপাসার অসহ্য প্রদাহে দগ্ধবৎ হইয়া, "জল —জল" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু যেই তাঁহার জন্য কাচ-পাত্র-পূর্ণ সুশীতল ও সুপেয় জল সম্মুখে আনীত হইল, অমনি উহার প্রতি আর একটি অধিকতর ক্লেশিত, ভূলুণ্ঠিত ও অস্ত্রাহত সৈনিকের দৃষ্টি পড়িল। যে অলোক-সাধারণ পুরুষের কথা কহিতেছি, তিনি ইহা দেখিতে পাইলেন; এবং দেখিতে পাইয়া, অমনি ইতিহাসের চিরস্মরণীয় একটি মহাবাক্য উচ্চারণ করিলেন। বলিলেন,—"Brother, thy necessity is greater than mine,"—"ভাই! তোমার প্রয়োজন আমার প্রয়োজন অপেক্ষাও বহুগুণে অধিক। এই জলটুকু তুমিই খাও।" দাতা ও গৃহীতা দুই ই চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দাতার সেই মহাপ্রাণ,—

* "নামাতিকৃপণস্যচ" ইত্যমুচ্চার্য্যগণনায়াম্।

সেই মহাবাক্য, আজও মর্ত্ত্যলোকে, অদৃশ্য শক্তির ন্যায় বিদ্যমান রহিয়া, অবিরত কার্য্য করিতেছে।

ইতিহাস খুঁজিয়া দাতার নাম করিতে হইলে, সে নামের তালিকা দীর্ঘ হইবে; এবং বোধ হয়, এক ভারত-ভূমিই সে তালিকার বৃহৎ এক ভাগ অধিকার করিয়া বসিবে। কেন না, যে দেশে দাতার নাম দধীচি,—দানের আদর্শ দয়াধর্ম্মময়-শিবি রাজার স্বকীয় দেহমাংসের অংশ-দান, সে দেশে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রকৃত দাতার সংখ্যাও, অতি অল্প হওয়ার কথা নহে। আমি তাই, কতকগুলি দাতার নাম উচ্চারণ না করিয়া, এখানে দানের প্রকার সম্বন্ধে দুই একটি বিশেষ কথা কহিব।

অনেকে এইরূপ মনে করেন যে, যাহার অর্থ নাই, বিত্ত নাই,—আশে পাশে অসংখ্য দাস-দাসী নাই—ঘরে অন্নবস্ত্রের আশানুরূপ সংস্থান নাই, সে অন্যকে দান করিবে কি? যে আপনি, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, আপনার পুত্রকন্যাকেও দিনান্তে দুঃস্থ-জন-যোগ্য শাকান্ন যোগাইতে কষ্ট অনুভব করে, সে আবার দান করিবে কি বস্তু? উত্তর—দান করিবে—আপনার প্রাণ। দান করিবে—সেই প্রাণের পীযূষ-সিক্ত ভালবাসা; এবং ভালবাসার মধুরাক্ষরা ও মনঃপ্রাণ-শীতলা, পীযূষ-বর্ষিণী ভাষা। আর, সে যদি উচ্চ শ্রেণির মনুষ্য হয়,—সে যদি মনুষ্যত্ব ও মনঃশক্তির যথোচিত বিকাশে আপনার আত্মা ও অধ্যাত্মসম্পদের পরিচয় পাইয়া থাকে, তাহা হইলে দান করিবে 'আশীর্ব্বাদ', * যাহা তীর, তারা ও উল্কা হইতেও অধিকতর দ্রুতগতিতে প্রধাবিত হইয়া, প্রিয়জনের মঙ্গল সাধন করে,—প্রিয়জনকে রোগে ঔষধের মত আরোগ্য যোগায় ও আপদে-বিপদে অভেদ্য কবচের মত আবরিয়া রাখে;—এবং দান করিবে অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার আনন্দ-স্নিগ্ধ সাধুবাদ ও গুণানুরাগিণী ভক্তির অমিয়-স্নিগ্ধ ধন্যবাদ, যাহা মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের বিশ্বাস জন্মায়, মনুষ্যের নির্ব্বাণপ্রায় প্রতিভাকেও স্বর্গীয় জ্যোতিতে সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলে। শুধু অর্থই কি এই মানব-জগতে মনুষ্য সম্পর্কে দেয় বস্তু? যদি সত্য সত্যই তাহা হইত, তবে নিয়তির গতি এ জগতে অনেক দয়ার অবতার দেব-পুরুষের আত্মাকেও দীন-হীন দরিদ্র অথবা নিরাশ্রয় নিঃসম্বলের মত দানের অনুশীলনে এবং তজ্জনিত অমল সুখের রসাস্বাদনে বঞ্চিত রাখিত।

নবদ্বীপের নয়ন-মণি শ্রীগৌরাঙ্গ, গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া, কিছুকাল আপনার আত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত দান-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি তখন যাহার উপর অতিমাত্র কৃপান্বিত হইতেন, তাহাকেই আকুল প্রাণে বুকে টানিয়া লইয়া, প্রগাঢ়

* পাঠক, আশীর্ব্বাদের প্রকার, প্রক্রিয়া ও পরিণাম-মঙ্গল মহাফলের সবিশেষ জানিতে ইচ্ছুক হইলে, দয়া করিয়া বিগত আশ্বিন-কার্ত্তিকের বান্ধবে প্রকাশিত আশীর্ব্বাদ-শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।

আলিঙ্গনে কৃতার্থ করিতেন, এবং বলিতেন,—"ভাই! আমার যাহা আছে, তোমায় তাহা দিলাম।" দানানুগৃহীত ভাগ্যবান্ পুরুষেরাও, তন্মুহূর্ত্তেই প্রাণে কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়া, প্রেমের আবেশে অশ্রুজলে ভাসিত, এবং প্রেমের অদম্য আবেগে উচ্চৈঃস্বরে কহিত,—"প্রভো! আমি আর চাহি না,—আর চাহি না, আমি আজি হইতে তোমার হইলাম।" *

আর একটি মহাপুরুষ, একবার এক দেবমন্দিরের নিকট, একটি ভীতি-জড়ীভূত ভিক্ষুপঙ্গুকে সম্মুখে দেখিয়া, স্নেহে গলিয়া বলিয়াছিলেন,—"ভাই! সোনা আর রূপা আমার নাই। আমি তাহা তোমায় দিতে পারিব না। কিন্তু আমার যাহা আছে, তাহা আমি তোমাকে অমায়িক প্রাণে দান করিব।" † তিনি এই বলিয়া, পঙ্গুর সর্ব্বাঙ্গে আপনার পুণ্যময় হস্ত খানি বুলাইয়া তাহাকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং সেই পঙ্গু তন্মুহূর্ত্তেই দেহ-প্রাণে কেমন এক দৈবী শক্তির আশ্চর্য্য সঞ্চার অনুভব করিয়া, পাদচারণায় সমর্থ হইল। উল্লিখিত মহাপুরুষের এ দান কি দান নহে? *

কিন্তু যাহারা দেবপুরুষ অথবা মহাপুরুষ নহে, তাহাদিগেরও দিবার বস্তু অনেক আছে। মনুষ্য যদি অকপট ও আনন্দময় প্রাণে, আপনার প্রাণ ঢালিয়া, দুটি মিঠা কথা কহে, তাহাতে দানের কার্য্য যেরূপ সুসম্পন্ন হয়, বোধ হয়, অপরিমিত অর্থদান ও বিত্তদানেও তাহা সকল সময়ে হয় না। সেই যে পুরাণ কথা মানুষের স্মৃতিতে গাঁথা আছে, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে।—

"নানা দানং ময়া দত্তং রত্নাদি বিবিধানি চ
ন দত্তং মধুরং বাক্যং তেনাহং বিকৃতাননঃ।"

আমি মনুষ্যকে নানা রূপ বস্তু দান করিয়াছি,—নানা রূপ রত্ন দানে সুখী করিতে যত্ন পাইয়াছি; কিন্তু কোন দিনও কাহাকে একটি মধুর কথা দান করিতে পারি নাই; তাই এখন,এখানে, এইরূপ বিকৃতানন হইয়া বসিয়া আছি।

কবি ও ভাবুক দার্শনিকেরা চিরকালই অমৃতের জন্য লালায়িত। তাঁহারা অমৃতের

---

* অনুগত আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
করুণ অরুণ ভেল গৌর-কলেবরে॥
প্রেম দিল প্রেম দিল ডাকে আর্ত্তনাদে।
শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম-পরসাদে॥
তৎকাল পাইল প্রেম—কম্প কলেবর।
পুলকিত ভেল অঙ্গ—নয়নেতে জল॥
হরিবে করয়ে গুণ-নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখিয়া সকল লোক অতি হৃষ্টমন॥"
(চৈতন্যমঙ্গল)

† "Silver and gold have I none; but such as I have, give I thee."

* এইরূপ অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পঙ্গুর আরোগ্য লাভকে অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু আমি একটি বাতব্যাধিগ্রস্ত এবং উত্থান-শক্তি-রহিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহিলাকে এক বৎসরের দুঃখ-দুর্ভোগের

উদ্দেশ্যে, কল্পনার মোহময় আবেশে, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের দেশে দেশে, অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। আমি অমৃতের অন্বেষণ করি দাতার প্রেম-বিভলা দৃষ্টিতে,—দাতার মধুমাখা মুখ-শ্রীতে। যাহারা জগদীশ্বরের কৃপায়, জীবের দুঃখমোচক ও জগতের সুখ-শান্তি-বর্দ্ধনের জন্য, দাতার প্রাণ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত অমৃতপাদপ। তাঁহাদিগের সকলই অমৃতময়। বসন্তের মৃদুহিল্লোলিত মলয়-মারুতে মনুষ্যের দেহমাত্রই শীতল হইয়া থাকে। কিন্তু দাতার সুস্নিগ্ধ সাহচর্য্যে মনুষ্যের দেহ ও প্রাণ উভয়ই এক সঙ্গে সুশীতল হয়। দাতার নয়ন-প্রান্তে, দৃষ্টির সেই নয়নানন্দ মোহন-ভঙ্গীতে, যে প্রকার অমৃত ক্ষরে, নভোভূষণ পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল দৃষ্টিতেও সেরূপ অমৃত ক্ষরে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।

প্রত্যক্ষবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্য যত দিন আপনার প্রাণে Altruistic Sentiment অর্থাৎ পরার্থা প্রীতি অথবা পরপ্রীণনী মতি পোষণ করিতে অসমর্থ রহে;—সে যত দিন আপনার প্রাণটারে তিল তিল করিয়া বিলাইয়া দিয়া, সেই প্রাণের আকর্ষণে পরকে আপনার করিয়া লইতে না শিখে, তত দিন পর্য্যন্ত সে মনুষ্য নহে; সে পশু। তাঁহারা যাহাকে Altruistic Sentiment বলিয়াছেন, বাঙ্গালির বাঙ্গালায়,—সোজা কথায়—তাহারই নাম দাতার প্রাণ। কারণ দাতা সকল সময়েই আপনাকে দান করিবার জন্য,—আপনার আত্মার সমস্ত বৈভব লইয়া পরের সেবা অথবা পরকীয় চিত্ত-তর্পণের জন্য ডগ-মগ ভাবে প্রস্তুত। দাতা আতিথেয়,—উদার-চরিত্র—সদ্‌গুণের সমুচিত যশঃকীর্ত্তনে একে এক শত,—সদানন্দ প্রতিবেশী, স্বার্থত্যাগী সুহৃৎ, ক্ষমাশীল শত্রু, এবং পারিবারিক ধর্ম্মে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-প্রভৃতি সকলের জন্যই সুখ-প্রীতির প্রস্রবণ স্বরূপ।

পর, শুধু আশীর্ব্বাদের শক্তিতে তিন চারি দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তিনি একটি লক্ষপতি ভূম্যধিকারীর পূত-চরিত্রা পুত্রবধূ। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। কিন্তু যাঁহার প্রসাদে অথবা আশীর্ব্বাদে ঐরূপ অভাবনীয় আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বর্গগত হইয়াছেন। তিনি রোগিণীর মস্তকের উপর তাঁহার হস্ত স্থাপন করিয়া, অতি গভীর কণ্ঠে এইমাত্র বলিয়াছিলেন,—"মা! তোমার কোন রোগ নাই,—ওঠ—দাঁড়াও—চলিয়া বেড়াও।" রোগিণী প্রথম দিন তৎক্ষণাৎই উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দ্বিতীয় দিন, আগে ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে,—তারপর প্রকৃতিস্থবৎ পদ-সঞ্চারে—হাঁটিতে লাগিলেন; তৃতীয় দিন হইতে তিনি রোগ-মুক্ত ও নির্ভয়। আমরা বহু ভদ্র লোকই দেখিয়া বিস্ময় মানিলাম। আমরা প্রথম দিবস আশীর্ব্বাদকের স্থির দৃষ্টি এবং গভীর কণ্ঠ-স্বরে ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি তাঁহার দেহপ্রাণের সমস্ত শক্তিই যেন রোগিণীকে পিতার প্রাণে দান করিতেছেন। বান্ধব-সম্পাদক।

সে নিজের বুকে সহস্র বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা সহিয়া লইতে পারে; তথাপি কখনও কোন কারণে, পরের বুকে অতি সামান্য পরিমাণেও আঘাত করিতে সমর্থ হয় না। পরের মুখ খানি মলিন দেখিলেই তাহার প্রাণটা পুড়িয়া পুড়িয়া দগ্ধ হয়। সে, এই হেতু, কিছুতেই পরের অন্তর-দাহনে অথবা অবমাননায় উৎসাহ পায় না। সে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানে দীক্ষিত না হইলেও, স্বভাব-গুণে সুজন,—স্বভাবতঃ সদাশয় এবং অন্যদীয় কার্য্যের সদর্থ-ব্যাখ্যাতা। তাহার সার সুখ পরের সুখে,—তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মূল মন্ত্র,—পরের মঙ্গল—পরের প্রীতি সাধন।

শ্রীমৎ কল্যাণ ভট্টঃ।

# চারিত্রিক ইতিকথা।*

বিখ্যাত-নামা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবা মাত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাবান্ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত না। তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী ও শান্ত স্বভাবের অন্তরালে অসামান্য ক্ষমতা চিরদিন লুক্কায়িত থাকিত। আলাপ পরিচয়ে ঘনিষ্ঠতা ও বিষয় বিশেষের আলোচনায় বিশিষ্টরূপ মনোনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাব ফুটিয়া উঠিত।

আমরা যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র, সেই সময়ে, একদিন একটি গ্রাম্য মকদ্দমার ফলাফল দেখিবার জন্য আমাদের বারাশতের ফৌজদারি আদালতে সমপাঠী বালকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম। সে দিনকার সে স্মৃতি আজ এই পরিণত বয়সেও সম্পূর্ণরূপে নূতন রহিয়াছে। নাতিস্থূল শুভ্রোজ্জ্বল দেহের কান্তি সমগ্র আদালত গৃহ আলোকিত করিয়াছে। তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান পক্ষাপক্ষ ও উকিল মোক্তারগণের কাহাকেও আর সুপুরুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র একাকী শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় পার্শ্ববর্ত্তী তারকারাজীর শোভা ও সৌন্দর্য্য ম্লান ও মন্দীভূত কারিয়া আপনার প্রভাবে সমগ্র গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ তাঁহার কথা শুনিবে, কি তাঁহার সৌন্দর্য্য শোভা দেখিবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। ইহার উপর রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনুকরণে বাব্‌রি কাটা চুলের শোভাই বা কত! সেই লম্বমান কেশদাম-ধৃত মুখ কমলের শোভা

* আমরা, বান্ধব-সম্পাদকের ব্যবস্থানুসারে Anecdote অর্থে, বাঙ্গালায় 'ইতি কথা' শব্দ ব্যবহার করা সঙ্গত মনে করি। 'ইতিবৃত্ত', 'ইতিহাস' শব্দের ন্যায়, 'ইতি কথা' শব্দ সুপ্রযোজ্য, সুখ-ব্যবহার্য্য। প্রবন্ধ-লেখক।

পরিণত বয়সের বঙ্কিমচন্দ্রে কিছুই ছিল না। "পাখীর মধ্যে আরসুলার মত," যে দিন আমি কোন বন্ধুকর্ত্তৃক সাহিত্যসেবীরূপে সেই সাহিত্য-সম্রাট্ সমীপে নীত হইয়াছিলাম, সেই দিন পরিচয় অন্তে আমি বিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই মকদ্দমার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার সেই যত্ন-রক্ষিত কেশ-শোভা ও যৌবনসুলভ সৌন্দর্য্যরাশির অভাব উল্লেখ করিবামাত্র, তিনি সরল শিশুর ন্যায় হাসি-ভরা মুখে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "সে যে আজ বিশ বৎসরের কথা, এখন যে চলে যাইবার সময় আসিয়াছে।"

স্বাস্থ্যরক্ষার কথা উঠিবামাত্র বলিলেন, "পঁচাশী বৎসর বয়সে গ্লাড্ষ্টোন সাহেব কুড়ুল দিয়া গাছ কাটিতেছেন, লর্ড সলস্‌বরি টেনিস খেলিতেছেন, ইঁহারা রাজ্য সংক্রান্ত গুরুতর বিষয় সকলের নেতা ও পরিচালক হইয়াও, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগি ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত হইতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, আমরা এ বয়সে ছেলেদের সঙ্গে বা ছেলেদের মত খেলা করিতে গেলে এ দেশে মানসম্ভ্রম রক্ষা হওয়া ভার।" ইহার পরেই আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আমি, রমেশচন্দ্র মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ব্যক্তি সকল মিলিত হইয়া গড়ের মাঠে একটা খেলিবার স্থান নির্দ্দেশ করিলে, এ দেশে সেটা কি আলিপুরের চিড়িয়াখানার মত একটা দেখিবার জিনিস হয় না?" পঞ্চাশের পূর্ব্বেই শরীর এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গের কথা উত্থাপিত হইবামাত্র বলিলেন, "শরীরের অপরাধ কি? দেশীয় রীতিপদ্ধতি ও নীতি-ধর্ম্মকে খর্ব্ব করিয়া ইংরাজী ঢংয়ে বিদেশী চাল চলনে চলিয়া ফিরিয়া যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট, পঁচিশটি বৎসর হইতে চলিল, রক্ত জল করিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকুরি করিলাম। নানা দেশ ও নানা স্থানের জল বায়ুর প্রভাব শরীরের উপর দিয়া গিয়াছে। তাহার উপর নিজেরও ভুলভ্রান্তি ও কত প্রকার ত্রুটি হইয়াছে, তাহাতেও স্বাস্থ্যের হানি হইয়াছে। ইহার উপর নিজের সখের লেখা পড়ায় রাত্রি জাগরণ ও অসীম শ্রম, এই নিত্যক্লান্ত শরীরের উপর দিয়া দিনের পর দিন চলিয়াছে, এতেও যে সবটা ক্ষয় না গিয়া এখনও আছে, ইহাই যথেষ্ট। এরূপ বিবিধ বিষয়ক শ্রমের উপযোগি খাদ্যের অভাব ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থার ব্যতি-ক্রম ঘটিলেও যাহা থাকা সম্ভব, কেবল তাহাই আছে।"

* * *

বিদ্যারণ্যের গগনস্পর্শী পাদপ-গৌরব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় যেমন এক দিকে গাম্ভীর্য্যের আলয় ছিলেন, আবার ঠিক সেইরূপ বালকের ন্যায় সরল ও স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় সুরসিক ছিলেন। একদা বৈদ্যনাথ প্রবাস কালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। বিবিধ বিষয়ক কথাবার্ত্তার মধ্যে, প্রসঙ্গ ক্রমে, মিত্র মহোদয় শাস্ত্রী মহা-

শয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের উপাসনা মন্দিরে নাকি মেয়েদের আব্রু রক্ষার জন্য জেনানার বন্দোবস্ত করিয়াছ! মেয়েদের স্বাধীনতার ( Emancipation ) উকিল হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মের স্থানে আবার পর্দ্দার ব্যবস্থা করিয়াছ কেন?" শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—"দুই প্রকার ব্যবস্থাই আছে। যাঁহারা পর্দ্দার বাহিরে বসিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, তাঁহাদের জন্য পর্দ্দার ব্যবস্থা আছে।" উত্তরে মিত্র মহোদয় বলিলেন—"ভারতবর্ষে ধর্ম্ম কর্ম্মে ও ধর্ম্মস্থানে কোথাও ত এরূপ পর্দ্দার ব্যবস্থা নাই। প্রয়াগ ও কাশী, বৈদ্যনাথ ও কালীঘাটে হিন্দুকুল-ললনাগণের দেবদেবী-দর্শনের সময় বা কোন পূজা প্রণালীতে কোথাও কি পর্দ্দার ব্যবস্থা দেখিয়াছ? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের এটা উন্নতি না অবনতি? এক পা এগুলে না এক পা পেছুলে? ধর্ম্মমন্দিরে আবার পর্দ্দা কেন?"

একদা আমি কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংস্রব আছে জানিতে পারিয়া সরল শিশুর ন্যায় হাসিমুখে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "The founder of your religion that great man the Raja was the maker of our modern India" বলিয়াই পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু তাই বলিয়া এই তেত্রিশ কোটী দেবতার উপর তোমরা আবার আর একটি বাড়াইবার চেষ্টায় আছ, সে কাজটা বড়ই অন্যায়।" আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম সত্য, কিন্তু তখনই তাঁহাকে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রত্যুত্তরে মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"রামমোহন রায়ের নামে বাৎসরিক সভা কেন? এই তোমাদের দলপতিরা আমার নিকট আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছি বাঁধনের অভাব নাই, দুই একটা খসাইতে পারিলে বাঁচি, আর বাড়াইতে পারিব না। মানুষকে বাড়াইতে গিয়া, মানুষ মানুষকে, এতই বাড়াইয়াছে যে, আর নাগাল পাওয়া যায় না, ক্রমে সেই অসামান্য গুণসম্পন্ন মানুষগুলি দেবতার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানব-সমাজ আদর্শে হীন ও জীবন-সংগ্রামে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। আমি চিরদিনই এরূপ কর্ম্মের বিরোধী, তাই রামমোহন রায়ের বাৎসরিক সভায় যোগ দিতে সম্মত হই নাই। কিন্তু তেমন মানুষ আমাদের নাই, আর হবে কি না, বলিতে পারি না।"

* * *

প্রথিতনামা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধপক্ষ ছিলেন। এই সময়ের গভর্ণমেণ্ট রাজার নিকট নিমকির দেওয়ানের জন্য এক জন উপযুক্ত লোক চাহিয়া পাঠান। রাজা প্রিন্স দ্বারকানাথের বিদ্যা বুদ্ধি ও কর্ম্মপটুতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার উদার হৃদয় চিরদিনই পক্ষাপক্ষ বিচারশূন্য হইয়া গুণগ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিত। বিরুদ্ধপক্ষ হইলেও, রাজা দ্বারকানাথের

অজ্ঞাতসারে তাঁহাকেই ঐ পদের উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, গৃহে ফিরিবার সময়ে, যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া প্রিন্সের নিকট আপনার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। দ্বারকানাথ রাজার আগমন সংবাদ পাইবামাত্র স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আপন বৈঠকখানায় লইয়া গেলেন। এরূপ অসময়ে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকেই উপরিউক্ত বৃহৎ কর্ম্মের উপযুক্ত মনে করিয়া রাজা তাঁহাকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য বলিয়া আসিয়াছেন, তখন রাজার বিরাট হৃদয়ের পূজা করা ভিন্ন তাঁহার অন্য উপায় রহিল না। দ্বারকানাথ সেই দিন হইতে রাজার সৌহার্দ্দবন্ধনে চিরদিনের তরে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। কূটবুদ্ধি সমালোচক, রাজার কার্য্যে কূটনীতির আবিষ্কারে ব্যস্ত হইলেও, আমরা জানি গুণের সমাদরে রাজার দলাদলি, শত্রুমিত্র, পক্ষবিপক্ষ বিচার ছিল না। গুণের সমাদরে তিনি চিরদিন মুক্তহৃদয় ছিলেন।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ভারতে কিসের অভাব ?

ভাষা-গৌরবে ভারত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের অধিকারী। কলনাদিনী তরঙ্গিণীর লীলা-তরঙ্গের ন্যায় যে ভাষার স্রোত তরতর ধারে প্রবাহিত এবং যাহা মধুর ও উদাত্ত ভাবপূর্ণ, সে সংস্কৃত, দেবভাষা সন্দেহ নাই। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সেই সংস্কৃতের লীলা-নিকেতন। পৃথিবীতে অন্যূন সহস্রাধিক ভাষা প্রচলিত। কিন্তু কোন ভাষাই সংস্কৃত অভিধানে অভিহিত হয় নাই। সংস্কৃত অর্থ—পরিশোধিত, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ। বস্তুতঃ দেবভাষা বলিলে, সংস্কৃতই বুঝায়। এরূপ সুমধুর, কোমল, কমনীয় ভাষা আর দ্বিতীয় সম্ভবে না। যে সংস্কৃতের গৌরব-গীতি সাগর, মরুভূমি, কানন, কান্তার, অতিক্রম করিয়া সুদূরবর্ত্তী ইউরোপ প্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—অথচ ভারত এবং ইংলণ্ডের ন্যায় তথায় জিত জেতা সম্বন্ধ নাই; সে ভাষার মহীয়সী শক্তি জগতে অতুলনীয়। যে ভাষায় মেঘদূত, শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব ও উত্তর-চরিত প্রভৃতি কাব্য এবং পাণিনি, কলাপ ও মাহেশ প্রভৃতি ব্যাকরণ এবং সাহিত্য দর্পণ, কাব্যাদর্শ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল; সে ভাষা রত্ন-প্রসবিনী, সন্দেহ নাই। শুদ্ধ ইহাই নহে,—জ্ঞানের অতল সিন্ধুগর্ভে নিমগ্ন হইতে হইলেও সংস্কৃত ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

ষড়্দর্শন ভারতীয় জ্ঞান-গৌরবের অক্ষয় প্রস্রবণ। যে দর্শন-শাস্ত্র কার্য্যকারণ সম্বন্ধ

নির্ণয়রূপ জগতের সৃষ্টিরহস্য উদবাটনে এক-মাত্র অবলম্ব, জ্ঞানের অগোচর অতীন্দ্রিয় পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় যাহার চরম লক্ষ্য, সেই ন্যায়, সাঙ্খ্যাদি ষড়্‌দর্শন জ্ঞানের অনধিগম্য অপার অতলস্পর্শ জলধি।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, সৃষ্টি রহস্যের মূলসূত্র। "যাহার অভাবে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতাই কারণত্ব"। * "কারণ তিন প্রকার, সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ। যাহা সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে, তাহাকে সমবায়ি কারণ বলে। ঘটের সমবায়ি কারণ কপালদয়; পটের সমবায়ি কারণ তন্তুনিচয় [illegible] কার্য্যোৎপাদনার্থে সমবায়িকারণের যে সংযোগ ঘটে, তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে। কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের অসমবায়ি কারণ; তন্তুনিচয়ের সংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ। সমবায়ি ও অসমবায়ি ব্যতিরিক্ত অন্য কারণের নাম নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার, চক্র ও দণ্ড ঘটের নিমিত্ত কারণ; তন্তুবায়, তন্ত ও তুরি পটের নিমিত্ত কারণ বলিয়া কথিত।" †

কুম্ভকারের জনক না থাকিলে কুম্ভকার জন্মিত না, এবং চক্র ও দণ্ডের নির্ম্মাণকর্ত্তা না থাকিলে চক্র দণ্ডের উদ্ভব হইত না; সুতরাং তদভাবে ঘটও জন্মিত না। এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে দূরবর্ত্তি কারণও কার্য্য সাধনের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু, কার্য্যোৎপত্তিকালে উল্লিখিত কারণের অভাব হইলেও, কার্য্যসাধনের ব্যাঘাত ঘটে না। ঘটোৎপত্তির সমকালে কুম্ভকারের পিতার অভাব সত্বেও ঘট জন্মিবে। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এইরূপ দুর্জ্ঞেয় জটিল সমস্যাপূর্ণ।

কারণসংযোগ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কাষ্ঠে অগ্নি-সংযোগ না হইলে দহনক্রিয়া ঘটে না। ভূমিতে বীজ বপন না করিলে, অঙ্কুরোৎপাদিত হয় না। সুতরাং, কারণ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিয়া কার্য্যবিশেষ উৎপাদন করে। কিন্তু কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ব্যভিচার স্থলে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, তাহা কারণ রূপে পরিগণিত হয় না। "দিবা, রাত্রির অথবা রাত্রি, দিবার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। অথচ একটি অপরটির কারণ নহে।" ‡ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধশূন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার কারণত্ব কল্পনা হইতেই অস্মদ্দেশে অনেক কুসংস্কারের সৃষ্টি। প্রাচীন সম্প্রদায়ের অনেকে ইষ্টকালয় স্থাপন, সরোবর খনন কি গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যও পরবর্ত্তী আকস্মিক বিপদের কারণ স্বরূপে মনে করিয়া থাকেন। তিথি, বার, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিকে মূলকেন্দ্র করিয়া যাত্রার শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে; এবং বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নাশন প্রভৃতি সংস্কারেও তাহাই একমাত্র কারণ মনে করিয়া শুভলগ্ন অবধারিত হয়। পরবর্ত্তি কালে কোনরূপ বিপদ্‌পাত হইলে উহা

* ভাষা পরিচ্ছেদ।

† রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ-ন্যায়পদার্থ-তত্ত্ব গ্রন্থ।

‡ ন্যায়পদার্থতত্ব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গ্রহ নক্ষত্রাদির অশুভ দৃষ্টির ফল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। এইরূপ দেশবিশেষে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি সংঘটন হইলেও তত্তাবৎ উল্লিখিত কারণ-সম্ভূত বলিয়া অনুমিত হয়। বস্তুতঃ জটিল দার্শনিক তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটনে অসামর্থ্য হেতু, সরল বিশ্বাসের ফলে যে এইরূপ ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত মতের উৎপত্তি হইবে আশ্চর্য্য কি ? ইহাও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাব জনিত ফল। কালে বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে এই সমস্ত কুসংস্কার সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

"কারণের অভাব হইলেই কার্য্যের অভাব হয়।" * কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড ও মৃত্তিকা এবং ঐ সমস্ত পদার্থের পরস্পর সংযোগ, ইহার একটি কারণের অভাব সত্ত্বে ঘটোৎপত্তি সম্ভবে না। এইরূপ কারণের অনন্ত শৃঙ্খল পরম্পরা ধরিতে গেলে, জগৎস্রষ্টাই সকল কারণের আদি কারণ রূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু তাই বলিয়া ঈশ্বরকে ঘট, পট, মঠ নির্ম্মাণের কারণ বলা অপসিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় অথবা ঐশী শক্তি বলে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে; ঘটের উপাদান মৃত্তিকাও জন্মিয়াছে। কিন্তু কুম্ভকার, মৃত্তিকা ও চক্র-দণ্ডের অভাবে কখনও ঘটোৎপত্তি হয় না। সুতরাং, উল্লিখিত কারণগুলি ঘটোৎপত্তি সম্বন্ধে একমাত্র প্রধান সাধন। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের ব্যভিচার কুত্রাপি কল্পনা করা যায় না। উৎপন্ন বস্তু মাত্রই ধ্বংসশীল;—কালে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, কালে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্ত্তার শিল্পচাতুরী; সুতরাং ইহাও কার্য্য-পদ বাচ্য। যাহা অনাদি অথবা যাহার আদি আছে, এরূপ প্রমাণে সিদ্ধ হয় না, তাহাকে কার্য্যকল্পনা করা অবৈধ। গোলাকার পদার্থের যেরূপ আদি অন্ত নিরূপিত হয় না, অনাদির আদি অনুসন্ধান—জগৎ স্রষ্টার স্রষ্টা নিরূপণ চেষ্টাও সেইরূপ উন্মাদ-কল্পনা। বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতাই একমাত্র অনাদি পুরুষ। তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ জন্যই মানব-বুদ্ধির অতীত দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি। সেই ভারতীয় ষড়্দর্শন পৃথিবী[illegible] যাবতীয় দর্শনের মূল-ভিত্তি।

* বৈশেষিক দর্শন।

যোগ-বিদ্যা ভারতের অন্যতম গৌরব। যে মেস্‌মেরিজিয়াম্ ( Mesmorism ) লইয়া আজ কাল পাশ্চাত্যদেশে আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাও ভারতীয় যোগ-বিদ্যার নিকৃষ্ট অংশের ছায়া বিশেষ। এ দেশে যোগ-বিদ্যার কিরূপ অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগসিদ্ধির ফলে কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা আরব্য উপন্যাসের ঘটনা অপেক্ষাও সমধিক বিস্ময়জনক! যোগ-বিদ্যায় সিদ্ধকাম হইলে মানব-শরীরেই অমানুষিক শক্তিলাভ করা যায়। খেচর জীবের ন্যায় আকাশ-মার্গে বিচরণ এবং জলচর ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় সলিল

অথবা ভূগর্ভে অবস্থান করিবার ক্ষমতা জন্মে। যোগিগণ যোগ-প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড করতলস্থ আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁহাদের জ্ঞানের সম্পূর্ণ আয়ত্ত। তাঁহারা বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ;—যাহা সত্য সেই অভ্রান্ত অবিচলিত বাক্যই তাঁহাদের বাগিন্দ্রিয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। যোগীপুরুষদিগের ক্ষমতা অপরিসীম। হরিদাস সাধু মৃত্তিকার নিম্নে মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত সমাহিত থাকিয়াও সুস্থ দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। কুম্ভক-বলে শূন্য-মার্গে আরোহণ করিতে [illegible]র, এরূপ লোক নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গ স্বামীর যোগ-বিদ্যার প্রভাব যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথিত সেই সমস্ত আশ্চর্য্য কিংবদন্তি শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নির্ব্বাণ-উন্মুখ প্রদীপের ম্লান জ্যোতির ন্যায় অধঃপতিত ভারতে যোগ-বিদ্যার ক্ষীণালোক এখনও নিবু নিবু ভাবে জ্বলিতেছে। তবে অধিকাংশ স্থলেই যোগ-বিদ্যা এখন ভেল্কী-বুজরুকী মধ্যে গণ্য; অথবা প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের প্রসর পথ। কালে কি না ঘটে?—দেবমন্দির শূকর-শালায় পরিণত হয়! নন্দন-কাননেও পিশাচ বাস করে! এবং পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীও মলমূত্রে কলুষিত হয়!

ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও এইরূপ। উত্তুঙ্গ শৈল-শিখরে যেমন প্রথম সূর্য্যালোক নিপতিত হয়, রোমের মাতৃগর্ভে অবস্থানেরও বহু পূর্ব্বে, ভারতভূমি তেমনি ধর্ম্মের বিমলালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যদেশ এখনও ভারতের পদানুসরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্মের জীবন্ত উপদেশ অন্য দেশে মৃত বর্ণমালায় পর্য্যবসিত। কিন্তু, এ দেশে লোকের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায়, ধর্ম্ম ও জীবনের স্রোত একীভূত ধারায় মিশিয়াছে। গীতায় যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ-মালা নিহিত, তাহার সারবত্তা ভারতবাসী ভিন্ন অন্য দেশীয় লোকে অদ্যাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। খ্রীষ্ট শিষ্যগণের মধ্যে কাহারও উত্তরীয় অপহৃত হইলে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহাকে পরিধেয় প্রদানের পরিবর্ত্তে, মুষ্টি প্রয়োগে কিরূপে অপহরণকারীর পরলোকের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। অপিচ চন্দন কাষ্ঠ যেরূপ ছেদকের কুঠারকে সুবাসিত করে, সেইরূপ অপকারি ব্যক্তির উপকার করাও ভারতীয় সাধু, পবিত্রাত্মা ধর্ম্ম-প্রাণ মহাত্মাদিগের মধ্যে নিতান্ত বিরল নহে। অদ্যাপি হিংস্র-পশু-সমাকুল গভীর অরণ্যে, পর্ব্বত-কন্দরে, প্রাচীন ঋষি তাপসের ন্যায় দু'চারিটি মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন, যাঁহারা মনুষ্য দেহেও সম্পূর্ণ দেবভাবসম্পন্ন। অন্য দেশের পক্ষে এরূপ সাধু ও সন্ন্যাসাশ্রমী মহাত্মাদিগের অস্তিত্ব-কল্পনাও সম্ভবে না। হায়! সেই দেবভূমি সদৃশ ভারত এখন ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য বিজাতীয় ও বিদেশীয়দিগের পদানত!!

সতীত্ব-ধর্ম্ম ভারতের একমাত্র অক্ষয় গৌরব। প্রাচীন কালে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও শকুন্তলা এবং আধুনিক ক্ষত্র-কুল গৌরবিণী পদ্মিনী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণের পক্ষে ভারতভূমির ন্যায় পুণ্য-ভূমিই একমাত্র লীলাক্ষেত্র। বালারুণ-রশ্মির ন্যায় তাঁহাদের যশঃপ্রভায় সাগরাম্বরা বসুন্ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পুষ্পশূন্য উদ্যান, প্রাণশূন্য দেহ অথবা বারিশূন্য সরোবরের ন্যায়, সতীত্ববিহীন নারী-জীবন অসার ও অকর্ম্মণ্য। তাহা পশু-জীবন অপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নহে। সতীত্ব-রত্ন ভারতীয় ললনাগণের মহামূল্য আভরণ। "হে ধ্রুবনক্ষত্র! তুমি যেমন অচল, আমিও যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।" এইরূপ বৈবাহিক মন্ত্র রমণি-কুল-শিরোমণি ভারত-কুল-ললনার পাণি গ্রহণেরই উপযোগি। বিবাহ গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বন,—"মোক্ষলাভের সুপ্রশস্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী। জল যেমন জলে মিশিয়া যায়, বায়ু যেমন বায়ুতে মিশায়, অগ্নিশিখা যেমন অগ্নিশিখাতে মিশিয়া যায়, পুরুষ তেমনই স্ত্রীতে, এবং স্ত্রী তেমনি পুরুষে মিশিয়া যায়। * * * হিন্দু বিবাহে পতি পত্নীর যেরূপ একত্ব মিশ্রণ হয়, এরূপ একীকরণ পৃথিবীতে আর কোন জাতি কল্পনা করে নাই।" * আর্য্য-বিবাহে আত্মায় আত্মায় অনন্ত কালের জন্য অচ্ছেদ্য বন্ধন। ইহ জীবনে তাহা শেষ হয় না। পরলোকে দৃঢ়-বিশ্বাসী আর্য্য-সন্তানের বিবাহে, পতি পরম গুরু, পত্নী ধর্ম্মপত্নী বা সহধর্ম্মিণী,—বিবাহের নিম্নগ্রাম আর্য্য-বিবাহের লক্ষ্য নহে। সুতরাং হিন্দু-রমণীর পতিভক্তি, পতিপ্রীতি, পতি-সেবা, পারিবারিক নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই সমস্ত পবিত্র ভাবের সংমিশ্রণে তাঁহাদিগকে দেবীর ন্যায় সম্পূজনীয়া করিয়া তুলে। মহামূল্য সতীত্বের তুলনায় তাঁহাদের জীবন অতি তুচ্ছ —অকিঞ্চিৎকর। সতীত্বের বিনিময়ে হেলায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। ইদানীন্তন কালেও, সতীত্বের অতুলনীয় গৌরব—রাজ-পুত-ললনাগণের 'জহরব্রত,' ইতিহাসের পত্রেপত্রে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অন্য দেশে ইহার অনুকৃতির ছায়াপাতও হয় নাই। হিন্দু-ললনার ন্যায় সতীত্বের এরূপ উচ্চতম আদর্শ অন্য দেশীয় সাহিত্যে নাই, কবিত্বে নাই, ধর্ম্মে নাই, সমাজে নাই। এই সতীত্ব গৌরবেই ভারতভূমি আজও জগতে পুণ্য-ভূমি নামে অভিহিত।

এইরূপে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহাতেই ভারত-মহিমার জলন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মে সাকার ও নিরাকার উপাসনা প্রভৃতি উপাসনা-প্রণালীর ক্রমপর্য্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অশিক্ষিত এবং অজ্ঞানীর জন্য বৃক্ষ প্রস্তরাদি স্থূল বস্তুতে ঈশ্বর উপাসনার আরম্ভ। আর যাঁহারা জ্ঞানের পথে সবে মাত্র প্রবেশ

* বাবু চন্দ্রনাথ বসু লিখিত "হিন্দু বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সাকার উপাসনা প্রশস্ত। বিবিধ দেবদেবীর মৃণ্ময়, হিরণ্ময় অথবা দারুময় মূর্ত্তি গঠন করিয়া, বলি-হোম-নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা সাকার উপাসনার অঙ্গ। ইউরোপীয় এবং মুসলমানগণ ইহাকেই পৌত্তলিকতা বলেন। অপিচ, জ্ঞানী ও সাধন-তৎপর মহাপুরুষ-দিগের জন্য নিরাকার উপাসনার বিধি। তবে বর্ত্তমান সমাজে সেরূপ তত্বজ্ঞানী মহাত্মাগণের বড়ই অভাব। সুতরাং, অবনতির সহিত ভারতের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই উল্লিখিতরূপ পৌত্তলিকতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। কারণ, ইহা তাঁহাদের জ্ঞান এবং অধিকারের উপযোগি। শাস্ত্রানুশাসিত হিন্দু-সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লম্ফন বড় অধিক দেখা যায় না। শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য্য জ্ঞানে সকলে নীরবে আপনার গন্তব্য পথের অনুসরণ করিতেছে। কাজেই নিরাকার উপাসনার ঢক্কা নিনাদ বড় অধিক শুনিতে পাওয়া যায় না। আজ কাল যে পৌত্তলিকতার এত নিন্দাবাদ ঘোষণা হইতেছে, উপাসনা-তত্বে অনধিকার ও অজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ। বাইবেল পড়িয়া হিন্দু-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ, যেরুজিলেম্ তীর্থ দর্শনে বারাণসী দর্শনের ফল কামনা, অনেকেরই মনোগত অভিপ্রায়। ফলও হইতেছে কাজে কাজেই অশ্ব-ডিম্ব! সুতরাং, পৌত্তলিকতা ঘোরতর কুসংস্কার ও নিরাকার উপাসনা আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেরই একমাত্র অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। হিন্দু-সমাজে এরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব মুসলমান রাজত্ব সময়েও সংঘটিত হয় নাই। ইহা বিজাতীয় সভ্যতার জঘন্য অনুকরণের ফল! কারণ, সাকার উপাসনা কখনও উপাসনার শেষ সীমা নহে;—ক্রমোন্নতির নিয়মে সোপানের পর সোপান আরোহণের পন্থা বিশেষ। তাহাতে সিদ্ধকাম হইলে নিরাকার উপাসনায় অধিকারী হওয়া যায়; ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি। আর্য্যমহর্ষিগণ এইরূপ স্তরের পর স্তর নির্দ্দেশ করিয়া, অধিকারী-ভেদে, উপাসনার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। উপাসনা-প্রণালীর এরূপ ক্রমবিকাশ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য দেশে কুত্রাপি নিয়মিত হয় নাই।

ভারতে ধর্ম্মপ্রাণতার ফলে ভক্তিমার্গ নিরূপণ জন্য উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্র, এবং মুক্তির একমাত্র অবলম্বস্বরূপ যোগশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। সেই সমস্ত শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষিগণের গগনস্পর্শি প্রতিভার তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী সম্ভবে না। কিন্তু শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া—অন্যকে উপদেশ দিয়াই তাঁহারা অবসর গ্রহণ করেন নাই। ধর্ম্মই তাঁহাদের জীবনের মুখ্য সাধনরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। তাঁহারা ঐহিক সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া পর্ণকুটীরে বাস, ফল, মূল ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণ এবং সংসারের সমস্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে আজীবন অতিবাহন করিয়া গিয়াছেন। তাপসিক-জীবন-লাভে কৃতকার্য্য হইলে, রোগ, শোক, জরা, বার্দ্ধক্য, অকাল মৃত্যু

প্রভৃতির হস্ত হইতে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন মহর্ষিগণ সকলেই ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ন্যায় ধর্ম্মপিপাসু জাতি বোধ হয় জগতের ইতিহাসে আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। মহাত্মা বশিষ্ঠমুনি শত-পুত্র-হন্তা শত্রুকেও ক্ষমা করিয়া জগতে ক্ষমার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। মহামুনি শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অপোগণ্ড বয়সেই বনগামী হইয়াছিলেন। বেদ চতুষ্টয়ের বিভাগকর্ত্তা মুনিপুঙ্গব বেদব্যাস আজন্ম দারপরিগ্রহে বিমুখ ছিলেন। উল্লিখিত মহাত্মাগণ সাধনতত্ত্বে সিদ্ধিলাভ করিয়া পরলোকে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা ভারতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া অভিহিত। আকাশেই নক্ষত্র ফোটে, সরোবরেই কমল বিকশিত হয়, মধুচক্রেই মধুর অবস্থান সম্ভবে। সুতরাং পুণ্যভূমি ভারতেই উল্লিখিত মহাপুরুষগণের অভ্যুদয়। অন্যদেশে যাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ভারতীয় মহাপুরুষগণের সহিত তাঁহাদের তুলনা সম্ভবে না। তাঁহাদের রচিত উপদেশমালা, যাহা তত্তদ্দেশে ধর্ম্মগ্রন্থ—কোরাণ, বাইবেল বা জেন্দ আবেস্তা নামে পরিচিত, তাহাও ভারতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রভৃতির নিকট নিতান্তই হীনপ্রভ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। গীতার অমূল্য উপদেশমালা—যাহার তুলনায় বিদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সিন্ধুর পক্ষে বিন্দু অথবা হিমালয়ের তুলনায় উপলখণ্ড সদৃশ! হিন্দু-শাস্ত্র-সিন্ধু আলোড়ন করিলে, এরূপ কত অমূল্য রত্ন সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অন্য কথা দূরে থাকুক, তুলসীদাস ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্ম্মোপদেশনিচয় এরূপ অনন্ত দৃষ্টান্তপূর্ণ যে তুলাদণ্ডে ওজন করিলে বিদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা গুণ-গৌরবে কোন অংশেই ন্যূনতর বলিয়া উপেক্ষিত হইবার নহে। ইদানীন্তনকালেও এরূপ মহাপুরুষগণের অভ্যুদয় পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র কল্পনা করা যায় না।

অধুনা ভারত অধঃপতনের সংকীর্ণ বর্ত্মে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেও, ইহার পতনের বহুবিলম্ব আছে। ধর্ম্মের ক্ষীণালোক এখনও ভারত-শ্মশানে নিবুনিবু ভাবে জলিতেছে। সুসভ্য ইউরোপ, উন্নত আমেরিকা বাহুবল অথবা বিজ্ঞান-বলে বলীয়ান্ হইলেও, ধর্ম্মজীবনলাভে ততদূর অগ্রসর হয় নাই। এ দিকে ভারত শৌর্য্য-বীর্য্য আধুনিক জ্ঞান-গৌরবে এইক্ষণ জগতের চক্ষে ঘৃণিত ! কিন্তু এই অধঃপতনের কালেও ধর্ম্মের মোহিনীমূর্ত্তি হৃদয়-পট হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় নাই। দীনহীন বিপন্ন ভারতে এখনও অতিথিশালা, পান্থনিবাস রহিয়াছে। অতিথিকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান ভারতবাসিগণের নিকট পরমধর্ম্ম। দেবার্চ্চনা অথবা পারলৌকিক কার্য্যে নিমন্ত্রিত অথবা অভ্যাগত প্রভৃতিকে ভূরি ভোজন করান মহাধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। আমোদ উৎসবে নৃত্য

গীত প্রভৃতি দ্বারা পরিজন, প্রতিবেশী অথবা গ্রামস্থ দূরস্থ লোকের মনোরঞ্জন করা তাঁহাদের নিত্যব্রত। ভিক্ষুককে মুষ্টি ভিক্ষা দিতে, অথবা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য দানে এখনও তাঁহারা মুক্তহস্ত। ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও অর্থ-নীতির উপদেশ অথবা ইংরেজী সভ্যতার মূলমন্ত্র—আত্মসুখ প্রিয়তার দুর্দ্দম প্রলোভনেও ভারতবাসিগণের মতি গতির সম্যক্ পরিবর্ত্তন অথবা মজ্জাগত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সমূলোচ্ছেদ হয় নাই। সুসভ্য ইউরোপীয় সমাজে পান্থনিবাস অথবা অতিথিশালার কথা দূরে থাকুক, বিবাহিতা কন্যাও তথায় পিতৃপরিবারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন না। "অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের ন্যায় তিনিও পিতার গৃহে অতিথি মাত্র। অপরাপর অতিথির ন্যায় তাঁহার নামেও ভিজিটের হিসাব থাকে;" * এবং রীতিমত 'বিল' প্রস্তুত হয়। তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে বিলের টাকা আদায় করিতে বাধ্য। তত্তদ্দেশে মাতা, পিতার পরিবার বলিয়া গণ্য। তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য করা সামাজিক রীতি-বিরুদ্ধ। এইত ইউরোপীয় সমাজের অবস্থা! ভারত এখনও ততদূর উন্নত ও সভ্য হয় নাই; এবং কোনও কালে যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। চশ্‌মাহীন চক্ষে দেখিতে গেলে এই পরার্থপরতা ও নিঃস্বার্থ ভাবই ভারতীয় আর্য্যগৌরবের চরম নিদর্শন। এই অধঃপতনের ঘোরতর দুর্দ্দিনে ধর্ম্মবলে এখনও ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয়। যত দিন ধর্ম্মের এই স্তিমিত প্রদীপ একবারে নিবিয়া না যায়, ততদিন ভারতে কিসের অভাব?

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

# ব্রাহ্মণ-সমস্যা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় 'ব্রাহ্মণ-সমস্যা' বিষয়ে বান্ধব পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। বর্ত্তমান সময়ে ইহা প্রধান আলোচনীয় বটে, কিন্তু সিংহ মহোদয়, কেবল ভিক্ষাবৃত্তি লইয়া এত কথা বলিলেন কেন? ব্রাহ্মণ-মর্য্যাদার নানা ত্রুটি ঘটিতেছে। পূর্ব্বাপর ইতিহাস ক্রমে তাহার আলোচনা করিতে হইবে। সিংহ মহাশয় এই আগুন উস্কাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইবেন না, এই প্রার্থনা করি।

সম্প্রতি ব্রাহ্মণ-সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা বলিয়া অনুভূত হয়। ভারতে ব্রাহ্মণের অভাব নাই, কিন্তু ব্রহ্মণ্যের সম্পূর্ণ অভাব। প্রতি হিন্দুগৃহস্থের ঘরেই কোন কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান হয়। এক এক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম্য ক্রিয়ার ঘটায় নগরে ও গ্রামে হৈ হৈ পড়িয়া যায়। ইহার মধ্যে ব্রহ্মণ্য কোথায়, তাহা খুঁজিয়া পাই না। এক্ষণে মনুষ্যের সুখশান্তির নিমিত্ত দুইটি প্রধান শক্তি কার্য্য

* ইংরেজ চরিত গ্রন্থ।

করিতেছে। এক যন্ত্র-বিদ্যা, দ্বিতীয় রাজা বা গবর্ণমেণ্ট বা তাঁহাদের দণ্ডনীতি। যন্ত্রবিদ্যা বস্তুতঃ অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে; রাজারও অখণ্ড প্রতাপ দেখা যাইতেছে; কিন্তু ইহাদের দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিপোষণ বা ব্রহ্মণ্যের পরিবর্দ্ধন, এ সম্বন্ধে কোন সাহায্যই হইতেছে না।

ব্রহ্মণ্য কিসে সুরক্ষিত হয়? সমুচিত পরিপোষণ ভিন্ন রক্ষার উপায় নাই। রক্ষার কথা কি বলিব? ব্রহ্মণ্য বা ব্রাহ্মণত্বের ক্ষোভ বা বিপর্য্যয় দেখিয়া হাহাকার করিতে হইতেছে। ব্রাহ্মণত্বের অভাবে ভারতবর্ষ ঢলিয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মণ যদি স্বপদে ও স্বকীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, তাহা হইলে, এমন বলা যায় যে, কেবল ভারতবর্ষে কেন, সমস্ত পৃথিবীতে যে ছোট বড় অশান্তি ও বিদ্রোহিতা চলিতেছে, তাহারও কতেক প্রতিকার হইত।

সে ব্রাহ্মণ কোথায় গেলেন? সে ব্রহ্মণ্যের উপচয় কিসে হইবে? পৃথিবীর আর কেহ কি এই ব্রহ্মণ্যের অভ্যুদয়ে সাহায্য করিবেন? আর কোন জাতি, কোন পরিবার কি ব্রাহ্মণের আদর্শে গঠিত হইতে পারে? ব্রাহ্মণ-সমস্যার মধ্যে এত কথা আছে যে, এ সমস্যা পৃথিবীর সকল সমস্যা অপেক্ষা কঠিনতর ও দুরধিগম্য।

সর্ব্বদিগ্‌দর্শী সুপণ্ডিত মনীষী লোকেরাই এই কঠিন সমস্যার পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন। আমাদের পক্ষে কেবল আলোচনা করিবার অধিকার আছে, তাই আমরা কএকটি কথা বলিতে চাই।

সিংহ মহাশয় ব্রাহ্মণের প্রাচীন মহিমা বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সে কালের সেই হোমাগ্নির তেজ,—সেই তপস্যার বল পৃথিবীতে তুলনীয় বটে। কিন্তু কেবল তাহার স্মরণে পুনরভ্যুদয়ের পথ পাওয়া যাইবে না। আমাদের বর্ত্তমান পতন কি প্রকারে ঘটিল, তাহাই অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহা দেখিলে প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে, তাহা সহজে বিদিত হওয়া যাইবে।

ইতিহাসে প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম, পরে তান্ত্রিকধর্ম্ম এবং তাহার পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণেরা হতপ্রভ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় কায়স্থেরা দেখাইতেছেন যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের প্রবলতায় এ দেশের কায়স্থেরা উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বেদ ও যজ্ঞ ত্যাগ করিলেন, সুতরাং যজ্ঞসূত্রের আর প্রয়োজন রহিল না। ইহার পূর্ব্বে হউক বা পরে হউক, বৈষ্ণব দলের সৃষ্টি হয়। তাঁহারাও বেদ ও যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ মণ্ডলী হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই দুই দলকে পোষণ করিবার উপদেশ দেখা যায়। ৬১।১১।১১।৪২।৪৩। আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্র্যে, * * বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকৃত্যা—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে অতিথি সৎকারে এবং বৈষ্ণবদিগকে বন্ধু ব্যবহারে পরিতুষ্ট করিবে। এ সময়কার ব্রাহ্মণদিগের পুনরভ্যুদয়ের পরিচয়

পাওয়া যায়। কিন্তু গীতা-শাস্ত্রের টীকাকারেরা ভক্ত সম্প্রদায়ের লোককে পাপনিমিত্তক স্মৃতি-সম্মত প্রায়শ্চিত্তের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিবার জন্য, যেরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ [illegible] প্রকাশ পায়। গীতার নবম অধ্যায়ে ত[illegible]ণে সুদুরাচারো—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা [illegible] দুরাচার অর্থাৎ অতি পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যদি ভগবদ্ভক্ত হয়, অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণ বা বিষ্ণু বা নারায়ণের ভজনা করে—শিবের নয়, দুর্গারও নয়—তবে তাহাকে সাধুই বলিতে হইবে। সে কতক পাপী, কতক সাধু এমনও বলিতে পাইবে না। যখন এই "জবরদস্ত" বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দলবলের বৃদ্ধি হইতেছিল, তখন ব্রাহ্মণদিগের প্রভাব কি ছিল, বলুন দেখি? এই বৌদ্ধ, তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মচর্চ্চার শেষ ফল এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের ব্যবহারে দেখা যাইতেছে।

এতকাল ধরিয়া যে ব্রাহ্মণ-গৌরব খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে, তাহা কি আর উদয়োন্মুখ হইবে? তবে আর ব্রাহ্মণ-মর্যাদা সমুন্নয়নের চেষ্টা কেন? এই অবসাদের যুগে—এই ঘোর কলিকালে আর কি তাহা সম্ভবে?—না।—চতুর্দ্দিকে অনেক প্রতিধ্বনি পাইবে,—সম্ভব নয়—সম্ভব নয়। সকলের অগ্রে ব্রাহ্মণেরাই বলিবেন,—আমাদের আর উদ্ধার নাই, কারণ, ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে; অতএব গড়াইতে গড়াইতে যে দিকে যাইতেছি, যাইতে দেও। প্রায় সকলেরই এই উক্তি, আমাদের অজ্ঞান, আলস্য, ঔদাস্য, নিশ্চেষ্টতা, পরভাগ্যোপজীবিত্ব দুঃখে সুখের অভিমান,—কত গুণে এই অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহার কি গণনা হয়?

তবে আশা আছে, তাই কথা কহিতে হয়। এক দিন কায়স্থেরা উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। আজি ব্রাহ্মেরা সেই বিষয়ে সমুদ্যত হইলেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বৈষ্ণবেরা শূদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া এক ধাপ উপরে উঠিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকে অধঃকৃত করিতে পারিলেন না। তবে ব্রাহ্মণে কোন শক্তি আছে, এবং সেই শক্তির কোন আবশ্যক কর্ম্মও আছে, ইহা প্রতীতি হয়।

ব্রাহ্মণত্বের সম্বর্দ্ধনার্থ ব্রাহ্মণের চারিটি মর্য্যাদার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

১। ভারতের চারিখণ্ডে অনেক ছোট ছোট ধর্ম্মসম্প্রদায় ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহার গূঢ় কারণ কি? গূঢ়কারণ,—এই—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বর্গ সাধক ব্রাহ্মণের সামাজিক নীতি বা স্মার্ত্ত-বিধি। অন্তর্বলবিহীন হইলেও এই সামাজিক বিধিতে যে মঙ্গল আছে, তাহা আর কোথাও নাই। ব্রাহ্মণ নিঃসম্বলে বিদ্যাচর্চ্চা করিবেন, সমাজের সকলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবেন, এই বিধি সেই মর্য্যাদার মূল। ব্রাহ্মণ কস্মিন্‌-কালে রোমের পোপ, বা মক্কার পীরের পদবী পাইবেন না। পরন্তু চিরদিন পর্ণ-

কুটীরে থাকিয়া বিনা "বুজরুগে" লোকের অজ্ঞান ও স্বার্থপরতাদি পাপধ্বংসের মন্ত্র আলোচনা করিবেন—ইহাতেই ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা। ইহাতেই জনসমাজের কল্যাণ। এখনও দেখা যায়,—প্রভূত ধনাশা ত্যাগ করিয়া এই মর্য্যাদাকেই ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রার্থনীয় জ্ঞান করেন। তাই বলি যে আশা আছে। ব্রাহ্মণের এই প্রথম মর্য্যাদা ইতিহাসের পত্রে জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। ইহা কেহ ভুলিতে পারিবেন না।

২। এক প্রকারে বিবেচনা হয়, ব্রাহ্মণদিগের ঘর হইতেই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মমতের প্রসার হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া যখন পশুহিংসায় মত্ত হইয়াছিলেন, এবং ক্রিয়া কাণ্ডকেই পরম পুরুষার্থ সাধক জ্ঞান করিতেন,—যখন গুপ্ততান্ত্রিক কুৎসিত ক্রিয়ার আধিক্য হইয়াছিল,—যখন প্রায়শ্চিত্ত বিধির উৎপীড়নে লোকেরা বড়ই অশান্তি অনুভব করিতেছিল, সেই সেই সময় তদ্‌বিপরীত লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। যখন শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের নাম গন্ধও এ দেশে ছিল না, তখনই ব্রহ্মোপাসনার উদ্দীপনার্থ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা অথবা ব্রাহ্মণপ্রমুখ লোকেরাই এই প্রতিক্রিয়া সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে দেখা যায়, যে অপর পক্ষের সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আপনাদের দোষ ত্যাগ ও পরগুণ গ্রহণে তৎপর হইয়া, এই প্রতিকূল স্রোত মন্দীভূত করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণকার আর্য্যসভা, হরিসভা, ও থিওসফিষ্ট সম্প্রদায় উক্ত লক্ষণাক্রান্ত। এরূপ কার্য্য ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় মর্য্যাদার বিষয় বলা যাইতে পারে।

৩। তৃতীয়তঃ, বিবেচনার বিষয়, ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণের মর্য্যাদা। শম, দম, তপ, শৌচ ইত্যাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। তাঁহার কর্ম্ম—বেদাভ্যাস, শাস্ত্রচর্চ্চা। এই মর্য্যাদা যাঁহারা ঠিক রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহারা, প্রজাপালন ও ধনোপার্জ্জনাদি ব্রাহ্মণেতর বর্ণের কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিবেন। ইহা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। ইহা এক প্রকার আপদ্ধর্ম্ম। আমাদের এক্ষণে আপৎকালই চলিতেছে। অতএব ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বত্র ভিক্ষাবৃত্তি ও চাকুরী করা প্রভৃতি আপৎকালিক কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম হইয়াছে। ইহাতেও ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হইবে না, শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে। বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণ জমিদার ও ধনাঢ্য গোস্বামিগণ এই বিধানে ব্রাহ্মণত্বে হীন গণ্য হইবেন না। তাঁহাদের দ্বারা একটি অভাব পূরণ হইতে পারে। আমি সেই কথা বলিব।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবধি ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণ টলিয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত দায়তত্বজ্ঞ সুবিচারক ব্রাহ্মণ নাই, এই সিদ্ধান্তে স্যার উইলিয়ম জোন্স এবং কোলব্রুক্ সাহেবের ব্যবস্থা মান্য হইয়াছে। তদবধি ব্রাহ্মণ-শক্তিতে অনেক "নাই" শব্দের যোজনা হইতেছে। এক্ষণে ইংরাজী লাটিন্ প্রভৃতি ভাষায় সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সমস্ত সভ্য সমাজের রাজনীতি বিষয়ে অ-

ভিজ্ঞ হইতেছেন। তাঁহারা পিতৃপিতামহের তপস্যা ও ত্যাগধর্ম্মের কতক অংশ ভাগী হইলেই, ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণের মর্য্যাদা এক এক প্রকারে পুনঃস্থাপন করিতে পারিবেন। আমরা দেখিতে পাই, গ্রামে ও নগরে এখনও বহু ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের বাক্য মান্য হয়। অপক্ষপাতী সদাশয় ব্রাহ্মণের বিচার সর্ব্বোপরি সম্মানিত হইবে।

৪। চতুর্থতঃ, বিবেচনার বিষয়, দেশের সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষকের মর্য্যাদা। সামাজিক বিধিতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক, দীক্ষাগুরু, পুরোহিত এবং দৈনিক দেবপূজক,—এই চারি প্রকারে ব্রাহ্মণেরা মর্য্যাদা পাইতেছেন। এ ভিন্ন তাঁহাদের আর এক মর্য্যাদা আছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই বালকদিগের পাঠশালায় গুরু ছিলেন। কায়স্থেরা সেই পদ কতক অধিকার করিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধদিগকে যেমন, ধর্ম্মোপদেশ দিতে হয়, বালকবালিকাদিগকেও তেমনি প্রথমাবধি ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ করিয়া রাখিতে হয়। ধর্ম্মাচার্য্য, দীক্ষা গুরু ও পুরোহিত তিনেরই পক্ষে প্রথমটি যেমন কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়টিও তেমনি কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় কর্ম্মটি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এ পর্য্যন্ত বালকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্কুলে ও কলেজে নানা জল্পনা হইতেছে, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে গুরু ও পুরোহিতের কার্য্য। অন্য কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণেরা সমুদ্যত না হইলে আর নিস্তার নাই। সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার দায়িত্ব স্কন্ধে লইলে উর্দ্ধ, মধ্য ও নিম্ন সর্ব্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের অধিক পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইবে। তাহাতে তদ্রূপ মর্য্যাদাও থাকিবে। এই দুঃখ দুর্দ্দিনে—এই পরাধীনতার কালে ঈদৃগ্‌বিধানে ধর্ম্মরক্ষা অতীব পুণ্য ও গৌরবজনক, সন্দেহ কি?

কর্ম্ম না করিলে দোষ গুণ জানা যায় না। কর্ম্ম না করিলে বলাধান হয় না। কর্ম্ম না করিলে অন্ন পাওয়া যায় না। আর বাক্য রচনার কাল নাই। অতএব যোগ্যতায় হউক, অযোগ্যতায় হউক, এই কার্য্যের কথাগুলি বলিয়া ফেলিলাম।

এই সকল বিবেচনায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ সমস্যা যেমন কঠিন হউক, তাহার পূরণ আবশ্যক। কেবল ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিত হইবেন, আর সকলে মূর্খ থাকিবে,—এ বিধান পূর্ব্বে ছিল না, এখনও থাকিবে না। যে স্ত্রী শূদ্রাদির নিমিত্ত মহাভারতাদি বিপুল গ্রন্থরচিত হইয়াছে, তাহাদের নিমিত্ত বেদ ও উপনিষদের অনুবাদ করা অযোগ্য কর্ম্ম নহে। আর এক কথা, ব্রাহ্মণের অসৎ কর্ম্ম একবারে মার্জ্জনীয়, এ বিধান পূর্ব্বে প্রবল ছিল না, এখনও থাকিবে না। পরন্তু পূর্ব্বের ব্যবস্থা মতে পাপ নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে অধিকতর দণ্ডযোগ্য বিবেচনা করিতে হইবে। ব্রাহ্মণেরা আত্মদোষক্ষালনে দৃঢ়ব্রত হইবেন, আপনাদের বিদ্যা বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনে অধ্যবসয়ারূঢ় হইবেন এবং পরের গুণ-গ্রহণে তৎপর হইবেন। এই তন্ত্রে তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বে হইয়াছে, এখনও হইবে। এই

বুদ্ধিপ্রভাবে বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও বৈষ্ণবেরা হিন্দু নাম ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই প্রকরণে ব্রাহ্ম, আর্য্য ও অন্যান্য নামধারী সামাজিকেরা ব্রাহ্মণদিগের সহিত একতায় কার্য্য করিতে থাকিবেন। একতায় বল, সম্মিলনে সিদ্ধি। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক জ্ঞান বিজ্ঞানে-উন্নত হইতেছেন। ব্রাহ্মণেরা উদার ভাবে তাঁহাদের সাহায্য করুন। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দান করুন। সদ্ভাবে সম্মিলিত হউন। তাঁহারা সমাজ-শরীরের উত্তমাঙ্গ বলিয়াই মর্য্যাদা পাইতে থাকিবেন। তাহাতে তাঁহারা আপনারা সুরক্ষিত হইয়া জনসমাজকেও রক্ষা করিতে পারিবেন

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু

# চঞ্চলা প্রকৃতি।

আঁধার চিকুর দুলায়ে প্রকৃতি
ফেলিয়াছে সব ঢাকিয়া,
চঞ্চল আবেগে, চলে সমীরণ,
স্বন্ স্বন্ রব করিয়া।
ঘুমায়েছে চাঁদ—লুকাল তারকা,
মলিন অম্বর বিষাদে ;
পুঞ্জে পুঞ্জে সাজি, নীলিম বরণে,
ব্যাপিল গগন নীরদে।
উথলি উঠিল তটিনীরা সব
চল্ চল্ রবে পুলকে,
ক্ষণেকের তরে বিকাশি সুষমা,
চকিতে তড়িৎ চমকে।
আকুল হৃদয়ে, তরু লতা গণ,
এ উহার কাছে আসিয়া
রাখিয়া মরমে মরম বেদনা,
পড়িতে লাগিল ঢলিয়া।
কত আশাভরে, জেগেছিল ফুল,
হাসি হাসি মুখ খুলিয়া,
বিকাশ না হ'তে, নবীন জীবন,
বিষাদে পড়িল ঝরিয়া!

উত্তরপাড়া। শ্রীমতী মরকত দেবী।

* শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় ব্রাহ্ম শব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগকে মনে করিয়াছেন। আমিও সেই ধারণায় ব্রাহ্ম নামে কিছু লিখিলাম। পরন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃতি ভিন্ন প্রকার। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের উৎকর্ষ নিমিত্ত এই সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত উহাদ্বারা ব্রহ্মণ্যের কতদূর পোষণ হইতেছে, তাহা সময়ান্তরে আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল। লেখক

---

# স্বর্গ-প্রয়াণ।

( উচ্ছ্বাস। )

"খোল খোল দ্বার,— খোল দ্রুত গতি,
হিরণ্ময় জ্যোতি দ্বার" ;—
বলিয়া বীণায়, যে দিতে ঝঙ্কার,
খুলিল স্বর্গের দ্বার!

আজি সে অমর কবি হেমচন্দ্র
আপনি স্বর্গের দ্বারে ;
বীণার-ঝঙ্কারে সে দ্বার তেমনি
কে দিবে খুলিয়া তাঁরে!

( উদ্বোধন। )

আঁধারি এ বঙ্গ, হে বঙ্গ-ভাস্কর,
ভব-লীলা করি শেষ,—
গেলা যদি চ'লে, সে অমর-ধামে,
শোকেতে পূরিয়া দেশ!

কে তবে 'শিখরে' * দাঁড়াইয়া আর,
জলদ-নিঃস্বনে ছাড়িয়া হুঙ্কার,
গাইবে গম্ভীরে ভারত-মাতার
অতীত গৌরব-গাথা!

ফুকারি বিষাণ সে ভৈরব রাগে,
দেখাইয়া পথ কে যাইবে আগে,
কার হুহুঙ্কারে মৃত দেশ জেগে
আবার তুলিবে মাথা!

কার সে সঙ্গীতে, পবন গর্জ্জিয়া,
দিগ্‌দিগন্তরে চলিবে ছুটিয়া ;—
তটিনী-তরঙ্গ তট উল্লঙ্ঘিয়া
বহিয়া যাইতে চাবে!

কে মেঘ-মল্লারে দীপক মিশায়ে,
কুলিশ-নির্ঘোষে বাদিত্র বাজায়ে,
কোটি নর-নারী-হৃদয় মাতায়ে
"ভারত সঙ্গীত" গাবে!

কে যাচিবে ভিক্ষা দুঃখিনী মাতার,
যুবরাজ হেথা আসিলে আবার ;
অতীতের পানে রাখিয়া নয়ন,
গৌরবের সহ করিবে জ্ঞাপন
ভারতের যত দুখের কথা!

কার 'কাল ভেরী' উঠিবে বাজিয়া,
নর-রক্ত লোভী দুর্ভিক্ষ দেখিয়া ;
সে করুণ রবে চির সুখীজন,
রম্য হর্ম্ম্য মাঝে মুছিবে নয়ন ;
পাষাণ ভেদিয়া নয়নের জল
ছুটিবে—বহিবে,— তরল—প্রবল,
দানব হৃদেও লাগিবে ব্যথা!

অনূঢ়া কুলীন বালার লাগিয়া,
কাহার হৃদয় কাঁদিয়া গলিয়া,
আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদ্গিরণ,

* "শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,"

লেখনীর মুখে করিবে ভীষণ,
সমাজের গ্লানি সমাজের পাপ
নাশিতে করিবে কে সে বীর-দাপ
তাদের মরম বেদনা লিখি ?

ঢল ঢল ঢল শিশিরে মাখান,
স্ফুটিত গোলাপ টগর কাঞ্চন,
কুমুদ কহ্লার, যুঁই বেলা জাতী,
তুলিয়া যতনে মালা শত গাঁথি,
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমেতে গলিয়া
আপনি মাতিয়া সবে মাতাইয়া
দিতে বাণী গলে কতই সুখী।

কে আর গাইবে এ দেশে সে গান,
মৃত দেহে যাহে ফিরে আসে প্রাণ,
যে গানে মানব আপনা ভুলিয়া
দিতে পারে প্রাণ পরের লাগিয়া ;
যে গানে মরত স্বরগে মিশায়,
দেবত্ব সুরত্ব যে গানে শিখায় ;
যে গানের সনে সুর মিশাইয়া
নদী নদ যায় গাইয়া বহিয়া,
সে অমৃত গান জলদ-গম্ভীরে,
কে আর গাইবে ভারত ভিতরে,
তব সনে কবি, পাইল লয় !

তোমার বিহনে হে কবি-ভূষণ,
হের বঙ্গ-মাতা হের অচেতন ;
এক এক করি হায় অভাগিনী,
হারাইলা তার নয়নের মণি ;
নাহি সে বিদ্যার অগাধ জলধি,
দয়ার যাহার না ছিল অবধি ;
নাহি সে বঙ্কিম রাজেন্দ্র, অক্ষয়,
ল'য়েছে কাড়িয়া কাল নিরদয় ;
মধুহীন করি মধু গেছে চলি,
গেছে দীনবন্ধু কোকিল কাকলী ;
তোমরা আছিলা গুটিকত তার
মুছাইতে মার নয়নের ধার,
তাহাতেও আহা যমের ভয় !

( আরম্ভ। )

হে বঙ্গ-গৌরব কবি,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
না হইতে অবসান জীবনের বেলা,
কেন হেন ম্লান ভাবে,
কি ভাবিয়া—কি অভাবে,
আঁধারে ডুবায়ে বঙ্গ অস্তাচলে গেলা !

( আরতি। )

হিমালয় মাঝে যথা শোভার ভাণ্ডার
উন্নত ধবল গিরি,
ব্যোম-দেশ ভেদ করি,
পবিত্র মস্তক উর্দ্ধে তুলেছে তাহার ;
শত ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাতে,
সহস্র বিপদ পাতে,
বিনাশ হয় নি যার কণা মহিমার !
তুমিও সেরূপ কবি,
উর্দ্ধে তুলি দীপ্ত ছবি,
রাখিয়া গিয়াছ যেই মূর্ত্তি প্রতিভার
কালের কুঠারাঘাতে,
ঝড় জল বজ্রপাতে,
এ জগতে ধ্বংস নাহি হইবে তাহার,
পবিত্র সে কীর্ত্তিস্তম্ভ মণ্ডিত তুষার !

সেবিলে মা বঙ্গভাষা ভরিয়া জীবন,
সেখানে পাইলে যাহা করি আহরণ।
প্রথম প্রতিভা তব,
অনুকরণেতে নব
স্ফুরিল,—উষায় যথা পূরব গগন ;
অনুবাদে ধীরে ধীরে,
সে প্রতিভা প্রাচী শিরে
দেখা দিল ;—কি সুন্দর সাধক-জীবন !
পূর্ণতায় সে সাধনা,
লভিল যে উদ্ভাবনা,
ভাতিল তা যেন দীপ্ত মধ্যাহ্ন-তপন !
সেবিলে ত্রিভাবে কবি বাণীর চরণ।

কি গাম্ভীর্য্য—কি সৌন্দর্য্য তব কবিতায়!
কি যে মাদকতা দিয়া,
রাখিয়াছ তা লিখিয়া,
পড়িলে তাড়িত ছোটে শিরায় শিরায়।
কোন স্থানে ঢল ঢল,
যেন নদী ভরা জল,
ঈষৎ তরঙ্গ তুলি নাচিয়া বেড়ায় !
কোথা সে সাগর সম,
গভীর—গভীরতম,
কোথা বা পর্ব্বত সম উচ্চ মহিমায় !
কোথা শিখী কেকারব,
কোকিলার মহোৎসব,
বসন্তের ফুল বনে ঝিল্লী মূর্চ্ছনায় !
বীণার বিষাদ-তানে,
কোথা বা হৃদয়ে আনে,
মুমূর্ষুর যন্ত্রণা কি যে বলা নাহি যায়।
হাসাইতে—কাঁদাইতে,
নাচাইতে - মাতাইতে,
তুমিই পারিতে দিতে প্রাণ কবিতায়
সকল রাগিণী রাগ বাঙ্গায়ে বীণায় !

শুধুই সুকবি তুমি নহ কবিবর ;
কি কবিত্বে—কি চরিত্রে,
যে সৌন্দর্য্য তব চিত্রে,
রেখে গেলে বঙ্গদেশে,—হবে না অন্তর।
বিজন কান্তারে ফুটি',
বিপদে কভু না টুটি',
আপনা উপরে করি আপনি নির্ভর ;
মস্তক তুলিয়া শেষ,
সৌরভে পূরিলে দেশ,
খনির তিমির-গর্ভে জন্মি মণিবর,—
স্বজাতি মুকুটে স্থান লভিলে সুন্দর !

তুমি কবি নহ এই মরতের কেহ ;—
তোমার হৃদয় ভরা,
ছিল শোক-তাপ-হরা,
অমিয় মধুর প্রেম অতুলন স্নেহ ;
উদ্বেল সাগর প্রায়,
সতত তরঙ্গ তায়,
খেলাইয়া—দুলাইয়া ভাসাইত দেহ।
দেখিলে দুঃখের ছবি,
অমনি কাঁদিতে কবি,
দিতে তার ক্ষত স্থানে শান্তি অবলেহ,—
তুমি কবি, নহ এই মরতের কেহ।

তুমি কবি হবে কোন স্বর্গের দেবতা ;—
কি সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি,
প্রতিভার কি বা স্ফূর্ত্তি,

ছলনা চাতুরী শূন্য নগ্ন-সরলতা।
স্বর্গের হৃদয়ে কবি,
এঁকেছ দেবের ছবি,
কি মহত্ত্ব—কি মাধুর্য্য—কি বা উদারতা!
কি বা তেজ—কি বা গর্ব্ব,
কি শান্তিতে পূর্ণ সর্ব্ব,
ঝটিকার পূর্ব্বে যথা স্থির গম্ভীরতা!
উত্তাল তরঙ্গ সম,
সে আহত-পরাক্রম,
গর্জ্জিয়া ধাবিত হয় দর্শিতে ক্ষমতা!
কঠোর বজ্রের মত,
অথচ কোমল কত,
সে বৈষম্য ভাবে শোভে কি বা মধুরতা!
তব ইন্দ্র দেব-পতি,
প্রকৃতই মহারথী,
স্পর্শে নি সে দেব-দেহে কলঙ্ক নীচতা!
চন্দ্র-সূর্য্য-শনৈশ্চর,
বরুণ ও বৈশ্বানর,
দেবতা তেত্রিশ কোটি উপরে প্রভুতা,
যে জন হেলায় করে,
কিরূপ সে বল ধরে,—
কি বা ওজস্বিতা কি বা চারিত্র উচ্চতা!
দেখায়েছ আঁকি কবি,
স্ফুট বর্ণে দিব্য ছবি,
এত দিনে বুঝিলাম ইন্দ্র কি দেবতা,
পড়িয়া তোমার 'বৃত্র-সংহার' বারতা।

দেবেন্দ্রের উপযুক্ত শচী দেবেন্দ্রাণী;
হেন চিত্র কোন কাব্যে আছে কি না জানি;
স্বর্গ হ'তে বিদূরিত,
বিতাড়িত—বিড়ম্বিত,
নৈমিষ অরণ্যে একা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
নাহি সে ত্রিদশালয়,
পারিজাত পুষ্পচয়,
ঐশ্বর্য্য সম্পদ হারা হায় বিষাদিনী!
অরণ্যের ফল-মূলে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে ভুলে,
কঠিন মৃত্তিকা'পরে দিবস যামিনী!
তাহাতেও পরমাদ,
ঐন্দ্রিলা সাধিল বাদ,
দাসী ক'রে সেবাইতে চায় পা দুখানি,
লইয়া ইন্দ্রের স্বর্গে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!!

সে দুর্দ্দিনে শচী তব কানন-বাসিনী,
দেখাইলা যে আশ্চর্য্য,
আত্ম-গরবের কার্য্য,
স্তম্ভিত জগত হ'ল শুনে সে কাহিনী।
না গেলা আশ্রয় তরে,
উমা, কমলার ঘরে,
না গেলা ব্রহ্মাণী কাছে সে অভিমানিনী!
পাছে অনাদর ক'রে,
তারা না আলাপ করে,
ভাবিয়া পৌলমী এবে আশ্রয়-প্রার্থিনী।
সে যে ঘোর অপমান,
স'বে না থাকিতে প্রাণ,
পরের দ্বারস্থ হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী!
যা থাকে কপালে হবে,
শচী তা সকলি সবে,
ত্রিদশ-ঈশ্বরী তবু হবে না কখনি,—
কে যে সে তা ভুলে গিয়ে—পর-প্রত্যাশিনী!

সার্থক কল্পনা-তুলি তব কবিবর!
যখন আঁকিলে যাহা,
কাব্যের আদর্শ তাহা,
আদর্শ সমাজ-চিত্রে—পবিত্র সুন্দর!
অমল হিন্দুর প্রাণে,
ডুবিয়া হিন্দুর ধ্যানে,
হিন্দুর আরাধ্য দেব আঁকিলে শঙ্কর।
'হা রে বৃত্রাসুর!' বলি,
সংহার ত্রিশূল তুলি,
মহা ক্রোধে মহাদেব!—মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর!
দেখাইলে কি যে দৃশ্য!—কাঁপিছে অন্তর!

আবার হিন্দুর প্রাণে পশি তপোবনে
দেখাইলে আঁকি যেই তাপস-রতনে।
কি প্রশান্ত—কি পবিত্র,
কি যে জ্যোতির্ম্ময় চিত্র,
কি বা সর্ব্বত্যাগী—সর্ব্ব-মঙ্গল-সাধনে;—
আর্য্য চিত্রে দ্যুতিমান্,
দধীচির অস্থি দান,
জগত জানে না যাহা,—চিন্তে না স্বপনে,
চিত্রিলা সে দেব-চিত্র উজ্জ্বল বরণে!

আঁকিলা অদ্ভুত দেব-শিল্পালয়
কল্পনাও যেথা যেতে পায় ভয়;—
কি ঘোর ঘর্ঘর উঠিতেছে রব
সৃষ্টি—বিধ্বংসিনী শক্তির উৎসব!
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলিছে তড়িৎ
জ্বালাময় পিণ্ড প্রভায় স্ফুরিত!
কাব্য ও বিজ্ঞান সুখ-সম্মিলিত,
সৃজিলে দম্ভোলি জগত স্তম্ভিত
বিস্ময়ে দেবেন্দ্র চাহিয়া রয়!

আঁকিলা বিশ্বের প্রকৃতি উমায়,
শিব-প্রেমারাধ্যা পূর্ণ করুণায়;
জীব দুঃখে যিনি সন্তাপিত প্রাণে
উচ্চারিলা বাণী সংসার কল্যাণে—
"জয়ারে, কি হেতু জগতী-মণ্ডলে
পর-চিত্তে পীড়া দেয় প্রাণী দলে?"
কেন হিংসা দ্বেষ জগতময়!

বৃত্রের অদৃষ্ট খণ্ডিতে আবার,
জগতে যে চিত্র রাখিলা তাহার;
জ্ঞানের আদর রবে যত দিন,
তত দিন তাহা না হবে মলিন;
না হবে মলিন সত্ত্ব রজঃ তম,
ত্রিগুণের যোগ কি যে অনুপম,
প্রাক্তনের গতি করিতে লঙ্ঘন,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিমূর্ত্তি মিশ্রণ;—
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিবে সবে।

পুত্রশোক স্মরি গর্জ্জি সে আহবে,
জয়ন্তের সনে বধিতে বাসবে,
শিব-দত্ত শূল দৈত্য দিলা ছাড়ি,
আসে মহাবেগে অম্বর উজাড়ি,
সহসা দানব কৈলাসের পথে,
'শ্বেত বাহু'এক হেরিলা চকিতে,
শূল মধ্য দেশ করি আকর্ষণ
ল'য়ে গেলা; ভক্ত বিবাদে তখন
"হা শম্ভু! তুমিও বাম" মোর প্রতি
কহিলা কাতরে; কি যে সেই গীতি
ভক্ত হৃদয়ের!—গাইলা ভবে।

সমুদ্র-মন্থনে সত্যে তুলিলা যেমন
পারিজাত ইন্দিরায়,
গজ বাজী দেবতায়,
তুমিও মথিয়া কাব্য-সমুদ্র তেমন,
তুলিলে যে রত্নরাজি,
তাহে ধন্য বঙ্গ আজি,
ঘুচিল সে সুধা পিয়ে সন্তাপ-দহন ;—
ইন্দিরা এ ইন্দুবালা,
হাতে ল'য়ে সুধা থালা,
করিলা যে স্নেহামৃত সবে বিতরণ,
পর দুঃখে অশ্রু জল,
সে অমৃত সুতরল,
পবিত্রিল দেশ যথা হইল পতন !
তোমার ইন্দিরা ইন্দু স্নেহে অতুলন ।

তব "দশ মহাবিদ্যা" পুষ্প পারিজাত ।
কি বা পদ—কি বা ছন্দ,
কি পবিত্র—কি সুগন্ধ,
যেন নন্দনের সেই বসন্ত প্রভাত ;
যোজন—যোজন যুড়ে,
সে সুগন্ধ ল'য়ে ঘুরে,
তরঙ্গে—তরঙ্গে ধীরে সে মলয় বাত ।
দশ-স্বর্গে কি যে তার,
দেখাইলা চমৎকার,
বিহ্বল নারদ ঋষি করে প্রণিপাত !
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী,
দর্শিলা কল্পনা বলে আঁকিয়া সাক্ষাৎ ।
তব "দশ মহাবিদ্যা" পুষ্প পারিজাত ।

( অবসান । )

হে বঙ্গ-গৌরব কবি,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি,
না হইতে সমাপন জীবনের খেলা,
কেন হেন ম্লান ভাবে,
কি ভাবিয়া—কি অভাবে,
আঁধারে ডুবায়ে বঙ্গ অস্তাচলে গেলা

( বিষাদ । )

বসি মা ভারতী কবিতা-নিকুঞ্জে
বীণাটি লইয়া করেতে তাঁর,
দীপক আলাপ করিতে আছিলা
হঠাৎ পড়িয়া ছিঁড়িল তার ।

কি যেন করুণ ক্রন্দনের ধ্বনি
ছিন্ন বীণা তারে উঠিল গেয়ে,—
"আর কত দিন অন্ধ পুত্র তোর
থাকিবে জগতে এ দুঃখ সয়ে !"

প্রতি তারে তারে সে করুণ সুর
কি যেন বিলাপি গাইল গান,
প্রতি শব্দে তার—প্রতি মূর্চ্ছনায়
কাঁদিয়া উঠিল মায়ের প্রাণ !

'বা তোরা' বলিলা ডাকি পুত্রগণে
"আর ত হৃদয়ে সহে না ব্যথা ;
"আর ত পারি না শুনিতে শ্রবণে,
"হেমের অসহ্য দুখের কথা !

"হারে ও কমলা, সপত্নী বলিয়া
"এতই কি বাদ সাধিবি মোর,

"প্রিয়তম হবে সন্তান যাহারা,
"বিষের নয়নে পড়িবে তোর!

"তব অত্যাচারে কবিতা নিকুঞ্জ,
"শ্মশান বলিয়া মনেতে লয়;
"কুহরে না পিক—ফুটে না কুসুম,
"সকলই যেন বিষাদময়!

( উপসংহার। )

ধাইলা শ্রীমধু বঙ্কিম অক্ষয়
পাইয়া মায়ের আদেশ-বাণী
সহচর হেমে আনিতে যতনে
শূন্যেতে রাখিয়া বিমান খানি।

ধরা ধরি করি যতনে তুলিয়া
কবিবরে নিয়া স্থাপিলা রথে;
দিক্ উজলিয়া—সৌরভে পূরিয়া
ছুটিল পুষ্পক স্বরগ-পথে।

ছাড়ি জল স্থল পর্ব্বত কানন,
সবিতৃ-মণ্ডল কিন্নর-দেশ,
ব্যোম পরে ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া
পুষ্পক উঠিল স্বরগে শেষ!

ছয় রাগ সনে ছত্রিশ রাগিণী,
অমনি বাজিল মধুর রবে;
পুষ্প মালা ল'য়ে দিগঙ্গনাগণ
চারি দিকে আসি দাঁড়াল সবে!

দেবের পরশে 'দিব্য-চক্ষু' পেয়ে,
ঘুচিল কবির বিষাদ-জ্বালা;
নমি বীণাপানি আরম্ভিলা পুনঃ
কবিতা-কুসুমে গাঁথিতে মালা।

কল্পনার বলে যে স্বর্গ আঁকিয়া,
দেখাইলা কবি, সকলে ভবে;
সেই দেব-পুরী রম্য নিকেতন—
সাধনায় যাহা সুকৃতী লভে!

ভারতী জননী তোমার লাগিয়া
এবে নিরূপিত করিলা কবি,
দেবতার সনে—স্বরগে থাকিয়া
বঙ্গে ভুলিও না—হে বঙ্গ-রবি!

বিজ্ঞান-গায়ত্রী রচয়িতা

বঙ্গের হেম বঙ্গ-ভারতীকে নয়ন জলে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রার্থনা করি, নবীনের মনোমাদিনী বীণা এবং রবীন্দ্রের মধুস্রাবিণী ত্রিতন্ত্রী সুদীর্ঘ কাল সজীব শক্তিতে অনুপ্রাণিত রহিয়া মায়ের চিত্ত সন্তর্পণ করুক। কলিকাতার সাহিত্যসম্মিলন ও সাহিত্যপরিষদের অনুগ্রহে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন বিরাট সভায় হেমচন্দ্রের জন্য শোকাশ্রুর অঞ্জলি লইয়া তর্পণ করিবার সুবিধা পাইয়াছি। এই হেতু, তৎপ্রসঙ্গে এই ক্ষণ আবার পৃথক্ প্রবন্ধ প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করি নাই। কিন্তু উপরি-মুদ্রিত কবিতাটিতে আমাদিগের অনেক কথারই গভীর সহানুভূতির পরিচয় পাইয়া আমরা উহা প্রীতির সহিত পত্রস্থ করিয়াছি। এই শোক-গাথা যাঁহার লেখনী-সম্ভূত, তিনি সাহিত্য-সমাজে এই ক্ষণ অপরিচিত; কালে সুপরিচিত হইবেন। বান্ধব-সম্পাদক।

# স্বামী না ত কি ?

## দুই সখীর কথা।

### নবন্যাস।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুভাষিণীর দ্বিতীয় পত্র।

শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরঃ

শরণম্।

রবিবার।

৺কাশীধাম।

প্রাণাধিক সরযু,

প্রাণ-সখি, আজি পোনর দিন হইল তোমার কাছে পত্র লিখিয়াছি। আমার সে পত্রের অবশিষ্ট অংশটুকু লিখিতে, এক দুই তিন করিয়া, পোনরটি সুদীর্ঘ দিন অতিবাহিত করিলাম; তথাপি আমার হৃদয়ের সমস্ত কথা শেষ করিতে পারিলাম না। এবার পারিব কি না, সে বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ জন্মিয়াছে। যাহা হউক, ধীরে ধীরে,—ধীর-গাম্ভীর্য্য সহকারে, কবি-বর্ণিত ধীরার মত, যত্ন করিব; এবং যদিও লিখিবার কথা অনন্ত, তবু আমি, সেই অনন্ত ও উচ্ছৃঙ্খল কথা গুলির সার অংশটুকু সংকলন করিয়া, যেরূপে পারি, তোমায় উপহার দিব।

আমি আমার শেষ পত্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিম্নস্তরেরই দুই চারিটি কথা মাত্র লিখিয়াছি। আজি সে রমণীমোহন, রসিক-হৃদয়-রঞ্জন, পৃথ্বী-বিস্তারিত প্রসিদ্ধ সভ্যতার উৰ্দ্ধ স্তরের বিবিধ কথাই তোমার ও আমার আলোচ্য। সে সকল কথার তত্ত্ব বিচ্ছেদ করিতে হইলে, আমার সামান্য শক্তিতে কুলাইবে কি না, এবং তোমার সহিষ্ণুতাও আগা-গোড়া সমান থাকিবে কি না, তাহাও সংশয়ের বিষয়। তথাপি বলি, এস আমরা, সাহস ও সত্যপরায়ণতার উপর নির্ভর করিয়া, একবার প্রকৃত তত্ত্বের সম্মুখীন হই। আমরা দুটি অবহুদর্শিনী অপূর্ণ-বয়স্কা আর্য্য-কুল-বধূ ইউরোপ ও আমেরিকার অযুত-কোটি উচ্চাশয়া, উচ্চসভ্যতাভিমানিনী, পূর্ণবয়স্কা রমণীর জীবন-রহস্য লইয়া বিচার করিব! কথাটা মন্দ নহে।

আমি আমার শেষ পত্রের উপসংহার-স্থলে যাহা লিখিয়াছি, তাহার দুই চারিটি পংক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিব। তুমি আমার এই চর্ব্বিত-চর্ব্বণে বিরক্ত হইবে না ত? ভাই, তুমি আর আমি শিশুকালে পরস্পরের চর্ব্বিত-চর্ব্বণে বড়ই প্রীতি লাভ করিতাম। এখন তোমাকে লইয়া একটা চর্ব্বিত কথার,

পুনশ্চর্ব্বণ করিব তাহাতে এতই ভয় কি? আমি লিখিয়াছি,—

"কিন্তু স্বামিত্বের কিরূপ ব্যবস্থায়, রমণীর প্রকৃত সুখ, স্বত্ব ও সম্মান পৃথিবীর কোন্ দেশে কিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে সমস্ত কথার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে হইবে। আমি, এ প্রসঙ্গে, ইহার পর, তোমার কাছে যাহা লিখিব বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া, তুমিও সরু চমকিয়া উঠিবে; এবং যদিও রাম নাম লওয়া তোমার অভ্যাস নহে, তুমিও, নিশ্চয়ই, রাম রাম বলিয়া কানে হাত দিবে।"

প্রাণ-সখি সরু, তোমায় সত্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি তোমার জীবনে কোন দিনও ভাই, ভক্তির সহিত রাম নাম লইয়াছ কি? যদি না লইয়া থাক, তাহা হইলে, আজি ভাই, প্রস্তুত হও। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে,—তালশূন্য রাগিণীর মত তিলক-ত্রিপুণ্ড্রকশূন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের অম্বরণী গৃহিণী। আমি, আমার পত্রোক্ত কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই, আমার সে ব্রহ্মণ্য তেজে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমার আজিকার এ পত্র পাঠেও, যদি তোমার অভিমান-কুঞ্চিত অমিয়মধুর অধরে, বাল্মীকির প্রাণারাধ্য রাম নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত না হয়, তাহা হইলে, আমি—অর্থাৎ আমি সুভাষিণী দেবী তোমার সখীপতির সহিতও এক মাস কাল কথা কহিব না;—এবং ঐ সময়ের মধ্যে, ভুলিয়াও কখনও রাগিণী-বিশেষের সুললিত নাম জিহ্বায় আনিব না।

আমার প্রথম কথা একটি প্রশ্ন। প্রশ্ন আমার, যেন ভয়ে ভয়ে, তোমারই গায়ে যাইয়া ঠেকিতেছে। তুমি ডবল এম এ; দেশ-বিখ্যাত শিক্ষিত যুবতী। তোমাকে পুঁথি পত্রের,—বিশেষতঃ ইংরেজী গ্রন্থের, কথা লইয়া প্রশ্ন করিতে হইলে, সত্যই ভাই, লেখনী লজ্জিত হয় এবং প্রাণটা ভয়ে শিহরিয়া উঠে। তথাপি প্রশ্ন করি,—তুমি বিশ্রুত-নামা গ্রেন্‌ভিল মারের সমাজ-চিত্র সংক্রান্ত গ্রন্থগুলি পড়িয়াছ কি? গ্রেন্‌ভিল মারে (E. C. Grenville Murray) আমোদ-বিহ্বল ঔপন্যাসিক অথবা আবেগ-বিহ্বল দার্শনিক নহেন। তিনি সুধীর-স্বভাব সমাজ-সমালোচক। তাঁহার সামাজিক ফটোগ্রাফ * নামক গ্রন্থ লইয়া ইংলণ্ডে কিরূপ আন্দোলন হইয়াছিল, তাহা তুমি জান না কি?

গ্রেন্‌ভিল মারে "সাধারণ-তন্ত্র ফ্রান্স-রাজ্যের সমৃদ্ধ-জীবন" নামে যে গ্রন্থ † রচনা করেন, আমি আজি তাহারও কোন প্রসঙ্গ তুলিব না। ফ্রান্সের সহিত আমাদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধ থাকিলেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। পর্ত্তুগালের প্রান্তরেখা হইতে আরম্ভ করিয়া,—স্পেন্ ও ফ্রান্সকে মধ্যে লইয়া,—ইতালীর অন্তসীমা পর্য্যন্ত যে বিশাল ভূভাগ পড়িয়া রহিয়াছে,

* Under the Lens: Social Photographs.

† High Life in France under the Republic.

তাহাকে মোটের উপর মদালসা ভিনাসের উদ্দাম আনন্দ-নিকেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও দোষ হইবে না।

বস্তুতঃ, যে সকল দেশের বিভ্রম-বিলাসিনী কুল-কামিনীরা, বায়রণ হেন * সমাজ-দ্রোহী কবির চক্ষেও, মনুষ্যসমাজের বহির্ভূত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছেন, আমি আর তুমি সে সকল দেশের নাম উল্লেখ করিতে যাইব কেন ? স্বামী, যে সকল দেশে, সোহাগিনী ভার্য্যাকে বহুনায়কের প্রমোদ-সঙ্গিনী দর্শন করিয়া, অহোরাত্র অশ্রুবিসর্জ্জনের পরিবর্ত্তে, প্রীতির উচ্ছ্বাসে ডগ-মগ হয় ; আর স্ত্রী যেখানে আপনার তানবিক-বাণিজ্য-লব্ধ স্ত্রী-ধনের অংশ দ্বারা, স্বামীকে সুখে পালন করিতে পারিলে, সমাজে সহস্র প্রকারে ধিক্কৃত না হইয়া, সম্ভ্রান্ত রমণীরূপে আদর পাইয়া থাকে, সে দেশের রমণীকে তুমি অমরাবতীর উর্ব্বশী-নিন্দিনী অপ্সরা, আর পুরুষকে জায়াজীব কিম্পুরুষ প্রভৃতি যে কোন প্রকার অদ্ভুত জীব বলিয়া বর্ণনা কর, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু, স্বামিস্ত্রীর সুখ-সম্বন্ধের বিচার-কথায়, তাহাদিগের কথা বৃথা উত্থাপন করিব কেন ?

আমি এইহেতু, তোমার নিকট পর্ত্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও ইতালীর কোনরূপ সমাজ-চিত্র প্রদর্শন না করিয়া, আধুনিক ভারত-রমণীর আদর্শস্থানীয় ইংলণ্ডের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিব ; এবং গ্রেন্‌ভিল মারে ইংলণ্ডীয় সমাজের উপর "পার্শ্বিক আলোক-সম্পাত" ( Side Lights On English Society ) নামক গ্রন্থে রমণী-জীবনের যে আশ্চর্য্য চিত্র দিয়াছেন, তাহাই তোমার মন-সাধের মনোর সাহায্যে, একটুকু বিশেষ 'মনোযোগের' সহিত, দর্শন করিতে অনুরোধ করিব।

তোমার মত বিচার-ক্ষমা রমণীকে আমার বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক যে, মারের এই শেষোক্ত গ্রন্থ খানি বড়ই একটা মূল্য-বিশিষ্ট বস্তু। গ্রন্থকার দেশ-হিতৈষী, সমাজ-শুভাভিলাষী, সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক, সে কথা পৃথক্। কিন্তু তিনি তাঁহার এই ভয়ানক গ্রন্থখানি পুণ্যময়ী ভিক্টোরিয়ার নামে উৎসর্গ করিয়া, ও তাঁহার গ্রন্থ-প্রদর্শিত পট-গুলি ইংলণ্ড-সমাজের প্রকৃত চিত্র কি না, এ কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য, দেশের ছোট বড় সকলকেই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া, গ্রন্থের একটা বিশেষ গৌরব বাড়াইয়াছেন, —সমাজ-চিত্রের গ্রন্থকে সমাজ-বিজ্ঞানের উচ্চ আসনে তুলিয়াছেন ; এবং তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপের বর্ণনা-নিচয়ও যে বস্তুতঃ তাঁহার নয়ন-জলে লিখিত, তাহা সর্ব্বাংশে সপ্রমাণ করিয়া আপনার সাধু লক্ষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। আমি তাই পুনরপি অনুরোধ করি, তুমি আমার হৃদয় লইয়া, অথবা আমার হইয়া, এই গ্রন্থ খানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ কর ;— এবং মারের কথা কোন অংশেও তোমার

* "Byron's Letters", published by his friend Moore, and "Court Life in France" by Frances Elliot.

মনের উপর কার্য্য করে কি না, সে কথা আমায় মন খুলিয়া বল।

সতী লক্ষ্মী ভিক্টোরিয়া অবধি ইংলণ্ডের সুপণ্ডিত ও সমুন্নত ব্যক্তি মাত্রই যখন মারের 'আলোক-চিত্রকে' ইংলণ্ডীয় রমণী-জীবনের অভ্রান্ত চিত্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তখন তোমাকে সখি, স্বীকার করিতে হইবে যে, রমণীর যাহা প্রকৃত সুখ, প্রকৃত সম্পদ্ ও প্রকৃত সম্মান, তাহা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, আমাদিগের এই অসভ্য ভারত-ভূমিতেই কিয়দংশে বিদ্যমান রহিয়াছে; ইংলণ্ড কিংবা ইয়ুরোপের সামাজিক-অবস্থা, অথবা ইয়ুরোপীয় সভ্যতা এখন পর্য্যন্তও সে সুখ, সে সম্পদ ও সে সম্মানের উপযোগিনী হয় নাই।

আমি পূর্ব্বেও তোমাকে বলিয়াছি, এবং এখনও পুনরুক্তির অপবাদ ভয় না করিয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যে সকল অবলা, ইলংণ্ড কিংবা উহার প্রতিবেশি-দেশ-নিচয়ে, আধুনিক সভ্যতার সহস্রবিধ শক্তি-সংঘর্ষের মধ্যে থাকিয়াও, অনিন্দ্যপ্রকৃতি পুণ্যবতী রূপে বিকশিত হন, তাঁহারা প্রকৃতই অবনীতে দেবতা;—যৌবনে যোগিনী এবং জীবজগতের মঙ্গল-রূপিণী! তাঁহাদিগের মূর্ত্তি-দর্শন অথবা নাম-উচ্চারণেও পুণ্য আছে। তাঁহারা, নিজ নিজ স্বভাব ও শিক্ষার মহিমায়, অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণ হইতেও সহস্র গুণে অধিক সমুজ্জ্বল। তাঁহারা আছেন বলিয়াই, ইয়ুরোপীয় সভ্যতা, উহার নানারূপ কলঙ্ক সত্বেও, এ মহীমণ্ডলে মহাশক্তির ন্যায় কার্য্য করিতেছে; এবং মনুষ্যজাতির হৃদয় ও মনকে উহার পার্থিব বৈভবে মোহিত করিয়া, দিগ্‌দিগন্তরে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। কিন্তু হায়! ঈদৃশী অমল-স্বভাবা ও স্বভাব-ধন্যা, জগন্মান্যা দেব-রমণীর সংখ্যা বড় বেশী নহে।

পক্ষান্তরে, যাহারা আজিকার সমুচ্ছ্রিত ইংলণ্ড ও উহার সন্নিহিত দেশনিচয়ে সাধারণতঃ সুসভ্য রমণী—অর্থাৎ Fashionable Lady—বলিয়া পরিচিত, তাহারা আর এক প্রকার পদার্থ। গ্রেন্‌ভিল মারের মতে এই ফ্যাসন-রসিকাদিগের পোনে ষোল আনাই প্রেমের হাটে পন্ন-বিলাসিনী। পণ্য নয় গো সই,—পন্ন। শব্দটার অর্থ তোমার সতত-সন্নিহিত সজীব অভিধানকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইও। পন্ন-বিলাসিনীরা, সমৃদ্ধ-পুরুষের সোহাগ লাভের জন্য, রূপের পসরা সাজাইয়া, পাঁচ শত প্রকারে পন্ন-চাতুরীর আশ্রয় লয়; এবং পরিশেষে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও নিগৃহীত হইয়া, জীবনের চরম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, চিত্ত-নিহিত তুষানলে জর্জ্জরিত হইতে রহে।

যে সকল কুসুম-কোমলা কুল-ললনা, জীবনের সংগ্রাম অথবা জাতীয় সভ্যতার অকথ্য তাড়নে, ছলনার পথে প্রেরিত হইয়া, সমাজের বিবিধ অভিনয়-মঞ্চে স্বামি-ধরার ফাঁদ পাতিতে এবং সুতরাংই আপনার কুঞ্চিত কুন্তল, কমনীয় কটাক্ষ, করুণ-মধুর কণ্ঠস্বর, কুন্দ-নিন্দি দন্ত-পংক্তি প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু লইয়া, রীতি মত দোকানদারি

করিতে শিখে, অথবা ঐরূপ দোকানদারিকেই রমণীজীবনের একমাত্র ব্রত ও ব্যবসায় বলিয়া বুঝে, গ্রেন্‌ভিল মারে এবং তাহার সমান-ধর্ম্মা সমালোচকদিগের অভিধানে তাদৃশ সুখ-সোহাগিনী অভাগিনীদিগের নাম (Flirt) ফ্লার্ট—অর্থাৎ ফুলেলা * অথবা ফুল-দোলা। ইহারা সকল সময়েই রসের উল্লাসে ফুলের মত ঢলিয়া পড়ে, অথবা সুখ-স্বার্থ-লালসায় নিরন্তরই দক্ষিণে ও বামে ছলিত ও এলায়িত হয়। সুতরাং, এই উভয় নামই ইহাদিগের উপযুক্ত।

শব্দশিল্পী মারে এই ফুল-কামিনীদিগকে শিক্ষা, সমাজ ও সাংসারিক-জীবনের অবস্থাভেদে, নানা † শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া, ইংলণ্ডীয় সভ্যতার অন্তর্দ্দাহি ও আতঙ্কজনক রুগ্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং ইংলণ্ডীয় সুন্দরী, স্বামিধরার সুখ-সোহাগময় চাতুরীতে, আপনি ফাঁদ পাতিতে যাইয়া, কত প্রকার ফন্দিতে বিপন্ন হয়,—কত সূত্রে বিপত্তির জালে জড়িত হইয়া পড়ে, এবং জীবনের একটুকু সামান্য ভোগ অথবা জীবিকা লাভের জন্য, আপনাকে কত প্রকারে, কত লোকের কাছে, বিক্রয় করিতে অথবা বাঁধা দিতে বাধ্য হইয়া থাকে, তাহাও স্ফুট বর্ণে চিত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। মারের লেখা পড়িবার সময় মূর্খের হাসি পাইতে পারে। কিন্তু যাহার সামান্য একটু মনুষ্যত্ব অথবা মনঃশক্তি আছে, তাহার হৃদয় তুষের আগুনে ভস্ম হয়। সে যদি ভারতীয় ভদ্র-পরিবারের ঝী বউ হয়, তাহা হইলে, তাহার নিশ্চয়ই এই মনে লয় যে, বরং সাত কোটিযুগ সভ্যতার সকল সম্পদে বঞ্চিত রহিয়া, অবগুণ্ঠনবতী কুল-যুবতীর ন্যায়, পতির পদ-সেবা করিব,—পতিকে সর্ব্বাংশে স্বামি-জ্ঞানে ভক্তি করিয়া, তাঁহার মন যোগাইতে, মন পাইতে এবং মনের মত ধন হইতে যত্নবতী হইব; তথাপি অমন 'মাকাল'-সভ্যতার মোহে পড়িয়া, আপনার এ দেহ-প্রাণকে দুরিত-দুর্গন্ধি বিলাস-লালসার কটাহ-দাহে দগ্ধ করিতে সম্মত হইব না।

ভারতীয় পুর-মহিলারা, পশু-স্বভাব স্বামীর বাক্য-যন্ত্রণায়, সময়ে সময়ে ক্লিষ্ট হয় বটে। তা জানি। কেন না, চিত্তের অমিয়-মাধুর্য্য, চরিত্রের মধুরতা এবং জিহ্বার মধুক্ষরতা উপার্জ্জন করা, কি বা স্ত্রীলোক, কি বা পুরুষ,

* ফুলেলা এই নাম ভবদেবের পৌত্রী শ্রীমতী সুভাষিণীর লেখনীমুখেই প্রথম প্রচারিত, না ইহা বঙ্গবাসীর যোগেন বাবুর সৃষ্টি, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না। ভরসা করি, ভবিষ্যবংশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসায় অগ্রসর হইবেন। শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ।

† যথা,—"The Ecclesiastical Flirt, The Sea-side Flirt, The Regimental Flirt, The Sentimental Flirt, The Tourist Flirt, The Country-house Flirt, The Town-house Flirt, The Studious Flirt. The Flirt from example and precept."

সকলের পক্ষেই সুদুশ্চর-তপোলভ্য সৌভাগ্য-বিশেষ। কিন্তু ভারত-বধূ কখনও কোথাও বেত্রাঘাত, কিংবা বেত্র হইতেও অধিকতর ক্লেশকর, চাবুকের আঘাতে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, হা জগদীশ্বর বলিয়া চীৎকার করে কি? যদি সদাশয় মারেকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে যে, ইংলণ্ডীয় আভিজাতদিগের মধ্যেও এমন বিকট ঘটনা একবারে বিরল নহে। ভারতীয় কুল-বধূরা, অনেক সময়, অনিচ্ছা-সত্বেও, পিতৃগৃহের সুখশান্তি পরিত্যাগ করিয়া, পতি-গৃহের বিবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামী কখনও, তাহা-দিগের প্রতিকূলে, দৈত্য-দানবের উৎসাহে, দাম্পত্য-স্বত্বের মোকদ্দমা করিয়া, ঢাক ঢোল বাজাইয়া, ডিক্রি জারি করে কি? ইংলণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত-রমণীও যে, এইরূপ ঢাক-ঢোল-বিঘোষিত ডিক্রী-জারিতে, চোর কিংবা দস্যু, অথবা ঘোটকী ও হস্তিনীর ন্যায়, হাতে পায়ে ধৃত হইয়া, পতির প্রাসাদে নীত হইয়াছেন, মারের মত অসংখ্য প্রামা-ণিক পণ্ডিত তাহার সাক্ষী আছেন।

ভারতীয় কুল-বধূরা, দুঃস্থ ও দুর্দ্দশা-গ্রস্ত স্বামীর উপকারার্থ, অথবা স্বামীর সাংসারিক-সাহায্য-উদ্দেশ্যে, কচিৎ কদাপি কোন সমৃদ্ধ আত্মীয়ের গৃহে, তদীয় কন্যা কিংবা ভ্রাতৃবধূর ন্যায়, অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু বলিব কি,—সে কথা তোমার কাছে বলিতেও জিহ্বা ঘৃণায় ও লজ্জায় যেন জড়ী-ভূত হয়,—তাহারা কখনও, সুসম্পন্ন সৌখীন স্বামীর সর্ব্বপ্রকার সখের বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, আপনাকে তাঁহারই ইঙ্গিতে, কিংবা তাঁহারই ছি-ছি-থুৎকার-যোগ্য অশ্রো-তব্য অনুরোধে, অন্যদীয় অপসেবায় উৎসর্গ করিয়া, মনুষ্যের কাছে মুখ দেখাইতে সাহস পায় কি? আর যদি কোন স্থলে প্রকৃতই এই প্রকার পৈশাচিক নিকৃষ্ট-সাহস প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে এ দেশের সামাজিকেরা, তাদৃশ গুণ-পুরুষ স্বামী ও গুণবতী সোহাগিনীর মাথা মুড়াইয়া, সে মুণ্ডিত মস্তকের উপর গোময় কিংবা ঘোল না ঢালিয়া, নিবৃত্ত হয় কি? ইংলণ্ডীয় ফুলেলা-কুলবালার মধ্যে অনেকেই যে, এই প্রকার সৎসাহসে (!) সাহসিনী হইয়া ও সমাজ-শাসনের দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া, দাম্পত্য-ধর্ম্মের মর্ম্মাস্থি পর্য্যন্ত দাঁতে চিবাইয়া উদরস্থ করিয়া থাকে, মারে তাহার প্রতিকৃতি আঁকিয়া চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইয়াছেন, এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক রহস্য প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত প্রমাণ দিয়াছেন।

ভাই সরযূ, আমি তাই বলিতেছি, সভ্য-তার কথা ছাড়িয়া দেও। যে সকল অশিক্ষিত অথবা অর্দ্ধশিক্ষিত বঙ্গ-সুন্দরীরা, আপনা-দিগের 'ছালুন-চাখা' বিদ্যার অভিমানে, সভ্যতার নামমাত্র শ্রবণেই উন্মাদিত হই-তেছে, এবং রমণী-জীবনের প্রকৃত সম্মান বিসর্জ্জন করিয়া, স্রোতের জলে, বহু নাসা-ঘ্রাত বাসিফুলের মত, ভাসিয়া যাইতেছে, আমি তাহাদিগের সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। তাহারা যেমন বুঝিয়াছে, তেমন

বুঝুক,—যেমন চলিতেছে, তেমনই চলুক। তাহারা কালে এক দিন শিক্ষা পাইবে। কিন্তু তুমি সরযুবালা ঘোষজায়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিত; এবং যাঁহারা সমাজ-তত্বের সকল-প্রকার তন্নতন্নচ্ছেদ করিয়া সত্য-সংকলনে সমর্থ, তাঁহাদিগেরই মত সুপণ্ডিত। তুমি কেন বাহিরের চটক দেখিয়া বিস্মিত হইবে; এবং বহ্নিশিখার বিচিত্র-বিলোল-রূপ-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, উহাতে পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁপ দিয়া পড়িবে।

প্রাণ-সখি, আমি এই পর্য্যন্ত লিখিয়া, ধ্যানস্থা তাপসীর ন্যায়, তোমার চূর্ণকুন্তল-পরিশোভিত ও চিত্ত-দর্পণ-প্রতিভাসিত প্রতিভাময় ললাট, আর সেই পদ্ম-পলাশ-তুল্য চক্ষু দু'টি আমার মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি,—তোমার যোগ-ভঙ্গ নামক অপাঙ্গে ক্ষণিক ক্রোধের কিরূপ রঙ্গাভিনয় ও সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে, তাহাও যেন প্রত্যক্ষবৎ নিরীক্ষণ করিতেছি; এবং মনে লয় যেন কানে শুনিতেছি,——

"ছি সুবি, একটা সম্ভ্রান্ত-সমাজ ও সর্ব্ব-সম্মানিত-সভ্যতার এইরূপ অতিরঞ্জিত বর্ণনা তোমার যোগ্য হইতেছে না। আর, সমাজের যে সকল দোষ, ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, আপনা হইতে দূর হইয়া যায়, সে সকল দোষকে সমাজের শরীর-সংলগ্ন সুচিরস্থায়ি ব্যাধি জ্ঞানে বিলাপ করাও তোমাতে শোভা পাইতেছে না।"

কিন্তু ভাই, আমি তোমাকে কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি, আমার বর্ণনা কি প্রকৃতই অতিরঞ্জিত? এবং আমি ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপীয় সমাজের যে সকল ব্যাধির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, সে সকল ব্যাধির সমুন্মূলন কি প্রকৃত প্রস্তাবেই সাময়িক-শিক্ষা-সাপেক্ষ? তোমাকে আগেই ত কহিয়াছি যে, আমি স্পেন, ইতালী ও ফরাশি দেশের নামও লইব না। রমণী, ঐ সকল দেশে, পুরাতন ভালোয়া ও বুরবণ-বংশীয় রাজা ও রাজ-পুরুষদিগের সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত, কত সহস্র প্রকারে, প্রকৃতির নিয়ম ও সমাজ-সমুচিত সাধারণ-শিষ্টাচারের উপর সবলে পদাঘাত করিয়া, নাগরিক হতভাগিনীদিগকেও লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে বাধ্য করিয়াছে, আমি সে সকল প্রসিদ্ধ কথার পুনরুক্তি করিয়া তোমার সময়ের উপরে অত্যাচার করিতে যাইব না। কিন্তু তুমি যে সকল দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নত এবং সভ্যতার উচ্চস্তরে সংস্থিত বলিয়া জান, আমি সেই সকল দেশেরই দুই একটি সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিব।

জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য এবং উহার সন্নিহিত অন্যান্য রাজ্যনিচয়ে Morganatic marriage অর্থাৎ বাঁ-হাতা বিবাহ নামে কেমন একটা বিবাহ-পদ্ধতি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তুমি, তাহা জান ত ভাই? সে পদ্ধতি কি আজ পর্য্যন্তও কোন অংশে পরিবর্ত্তিত কিংবা পরিশোধিত হইয়াছে? এবং যে সকল বিলাস-লোলুপা ললিত-ললনা, ঐ রূপ অপপরিণয়ের নামে, আপনার ইহকাল ও পরকাল উৎসর্গ

করিয়া, বিনা মূল্যে বিকাইয়া যাইতেছে, ইয়ুরোপে তাহাদিগের অশ্রুবর্ষণ ও আর্ত্তনাদ আজপর্য্যন্তও কি নিবৃত্তি পাইয়াছে ?

ছাড়িয়া দাও তোমার ইয়ুরোপের কথা। চল এইক্ষণ কণ্টিনেণ্টাল ইয়ুরোপ পরিত্যাগ করিয়া আবার আমরা ইংলণ্ডে যাই ; এবং সাময়িক-শিক্ষার ফল-পরীক্ষার উদ্দেশ্যে, অতীতকালের পুরাতন কথা পরিত্যাগ করিয়া, আবার আমরা আজি-কালিকার উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতিশীলা কথা লইয়াই একটু আলোচনা করি। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও,—বেশী দিন নয় গো সই, বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যেও,—ইংলণ্ডের Free Love Party অর্থাৎ স্বাধীন-প্রেম-সম্প্রদায়ীরা কিরূপ একটা বিষম কাণ্ডকারখানা করিয়াছিল; এবং সমাজ-শোধনের নামে শত শত সুকুমার-মতি কুল-কুমারীর সর্ব্বনাশ করিয়া, দেশে কিরূপ একটা হাঁহাকার-চীৎকার তুলাইয়াছিল, তাহা আমার সখীমণি তুমি জান কি ? অপিচ, উহাদিগের সমাজ-বিজ্ঞান-সূত্র—Elements of Scial Science—নামক গ্রন্থ পার্লিয়ামেণ্টের বিখ্যাত-নায়ক পণ্ডিতবর ব্রাড্‌ল (Charles Bradlaugh M. P.) আর তদীয় পৃষ্ঠপোষক ডব্‌লিউ ষ্টুয়ার্ট (W. Stuart.) প্রভৃতির দ্বারা বহ্নিমুখী হুড়ার ন্যায় বৃটিশ রাজ্যের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়া, কত শত পরিবারের পবিত্র সুখ-শান্তি পোড়াইয়া ভস্ম করিয়াছিল, সে সংবাদ আমার সোনার প্রতিমা সয়মুর কাছে পঁহুছিয়াছে কি ?

তুমি এবার, নিশ্চয়ই মুখ বাঁকাইয়া, এবং তোমার মধুমাখা ঠোঁট খানি ফুলাইয়া, মধুর-গম্ভীর "মনোরঞ্জন" কণ্ঠস্বরে বলিয়া উঠিবে, উহারা (Secularist) সেকুলারিষ্ট,—অর্থাৎ সংসার-সুখ-ধর্ম্মী বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত। উহাদিগের অন্তঃসার শূন্য অমূলক কথায় আসে যায় কি ? আসে যায় অনেক। তুমি যদি ইংলণ্ডীয় সেকুলারিষ্ট অর্থাৎ সংসার-সর্ব্বস্ব সামাজিকদিগের শেষ-শতাব্দীর ইতিবৃত্তের উপর শুধু একবার নয়নাবর্ত্তন করিয়া যাও, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, হউক যেন উহারা একবারে অন্তঃসার-শূন্য, উহাদিগের সেই অন্তসার-শূন্য অমূলক কথায়ও, অনেকের জন্যই আসিয়াছে কিংবা যুটিয়াছে অনেক, এবং অনেক হতভাগ্যেরই আবার হৃদয়-পিঞ্জর শূন্য করিয়া উড়িয়া গিয়াছে অনেক। কিন্তু আমি তথাপি মনে করিয়াছি যে, উহাদিগের—অর্থাৎ এই সংসার-সেবী সেকুলারিষ্টদিগের কথা আজি তর্কের অনুরোধে, পরিত্যাগ করিয়া, তোমাকে লইয়া, মুহূর্ত্তকাল, বিশিষ্ট একটি সংসার-সুখ-বিরাগী, সানুনাসিক-শব্দপ্রিয়, সতত-উর্দ্ধনেত্র, 'অতিমাত্র-পবিত্র,' উৎকট-চরিত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সারোদ্ধার-তত্ত্ব-কথা শুনিব ;—এবং ইয়ুরোপ হইতে অধিকতর উন্নত, সভ্যতা বিষয়ে উন্নতির শেষসীমা-প্রাপ্ত, শত-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল আমেরিকা, স্বর্গীয় ধর্ম্মেরই নাম লইয়া, এবং সেণ্ট পল প্রভৃতি ধর্ম্মগুরুদিগের দোহাই দিয়া, অসংখ্য শিক্ষিত রমণীকেও কিরূপে সশরীরে নরকের জলন্ত

জিহ্বায় আহুতি দিয়াছে, তোমার কাছে আজি সে শোচনীয় কথার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত "কানে কানে" কহিব।

কানে কানে ভাই, কানে কানে। সে সকল কথা সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থ-পত্রে জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এবং সর্ব্বত্র শত শঙ্খনাদে বিঘোষিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি হিন্দু-কুল-ললনা কি হেতু আপনার প্রাণ-প্রিয় সখীজনের কাছেও, তাহার কোন একটি কাহিনী "কানে কানে" ভিন্ন অন্য প্রকারে কহিতে সাহস পায় না, তাহা এ পত্রের আর দুই একটি পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই তুমি সম্যক্ পরিগ্রহ করিতে পাইবে।

কথা প্রকৃতই বড় ভয়ঙ্কর। যাহারা একবারে অবোধ ও হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য, তাহারা অবশ্যই মনুষ্য-সমাজের উন্নতি, অবনতি এবং সামাজিক-জীবনের শেষ-পরিণতির গভীর রহস্য লইয়াও রস-রঙ্গ-বিভোর হৃদয়ে নানারূপ আমোদ করিতে পারে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা আছে, আমার এ পত্রের কোন কোন অংশ পাঠ-সময়ে, তোমার প্রাণটা পুড়িয়া যাইবে,—তোমার নয়নে অশ্রু ঝরিবে, এবং সমাজ-বিজ্ঞানের সমস্ত কথা যে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান হইতেও গুরুতর তত্ত্ব,তোমার হৃদয়ে সে বিশ্বাস আপনা হইতে জন্মিবে।

এখন এস তবে সে কথা,—সে প্রতিশ্রুত, প্রথিত কথা আরম্ভ করি। তুমি, ব্রতচারিণীর ন্যায় হাতে দূর্ব্বা লইয়া, সংযতচিত্তে শুনিতে থাক; আমি ধীরে ধীরে কহিয়া যাই;—এবং যাঁহাকে পিতা-মাতার ব্যবস্থাপিত ধর্ম্মাদান ও ধর্ম্মবিধান-অনুসারে স্বামি-জ্ঞানে ভজনা করিতে শিখিয়াছি, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া, স্বাধীন-প্রেমের অন্বেষণ করিলে, সমাজ কিরূপ বিপন্ন অথবা বিধ্বস্তবৎ হয়, তাহার কিছু নমুনা দেখাই হায়! সই, সেই কথাই কথা। স্বামী না ত কি? আর সে যদি সর্ব্বতোভাবে স্বামী হইল, এবং আমি তাহার সহধর্ম্মিণী হইলাম, তবে তাহাকে ছাড়িয়া আবার ধর্ম্ম অথবা কর্ম্ম করিতে যাই কোথায়?

ভাই, তুমি (Ann Lee) আন্ লীর নাম শুনিয়াছ কি? যাঁহাকে ঐতিহাসিকেরা (Shakerism) শেকারিজম্ নামক সাম্প্রদায়িক-খৃষ্টীয়-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং পবিত্র-প্রেমের আধুনিক-প্রধান-নেত্রী বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন, তাঁহার সবিশেষ বিবরণ জান কি? আন্ লী ইংলণ্ডের অন্তর্গত ল্যাঙ্কেসায়র প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন; এবং কতকগুলি স্ত্রীপুরুষের উপর মাতাজী নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পুরাতন কোয়েকারদিগের অনুকরণে, শেকার নামে এক নূতন সম্প্রদায় সংস্থাপিত করেন। তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র নির্ব্বিকার প্রেম, এবং মূল উদ্দেশ্য নিঃসন্তান-গৃহস্থালী! স্ত্রীলোক আর পুরুষ, পরস্পরের প্রেমে সতত আকুল রহিবে,—প্রেমের উচ্ছলিত আকুলতায় একে অন্যের কণ্ঠলগ্ন হইয়া, ও যোড়ায় যোড়ায় বাহু-যুগলের বিমল-সম্মিলনের দ্বারা মণ্ডলী গাঁথিয়া, উন্মত্তের মত নৃত্য করিবে;—অথচ সেই প্রেমকে কখনও পরিণয়ের সীমায় পঁহুছিতে দিবে না;—প্রেম

যাহাতে পুত্র-কন্যারূপ পুষ্পিত সম্পদে পরি-শোভিত হয়, প্রেমিককে কখনও সে পথ লইতে অধিকার দিবে না।

কোয়েকারেরা যেমন, কথা কহিবার সময়, পাছে কোন কথা কোন অংশে মিথ্যা হয়, এই পাপ-স্পর্শ-ভয়ে, থর থর কাঁপে; শেকারেরাও সেইরূপ, কিবা নৃত্যে, কিবা কথোপকথন-সময়ে, সমস্ত শরীরে কম্পিত হইতে থাকে। এই জন্যই উহাদিগের নাম কোয়েকার, অর্থাৎ কম্পিতাঙ্গ সাধু; আর ইহাদিগের নাম শেকারা, অর্থাৎ সুকম্পিত সাধক। পরিচ্ছদবিষয়েও দুইয়ে বিশেষ সাদৃশ্য। কিন্তু যদিও কোয়েকারেরা, কিছু কাল, কুৎসিত কামনার অত্যাচার-শূন্য জীবন যাপন করিয়া, সমাজে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে; শেকারেরাও সেইরূপ সুকীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিয়াছে কি? অন্ততঃ আমেরিকায় নহে। আমেরিকার অনেক সুশিক্ষিতা সুন্দরী, স্বামিত্বের সামাজিক শৃঙ্খলকে পাপের শৃঙ্খল মনে করিয়া, শে-কার-সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইয়াছেন; এবং সুরূপ ও সতত-ভাব-বিহ্বল শেকার-যুবক-দিগের সহিত, কিছু কাল, যুগল-ভাবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, শেষে গলায় আর এক প্রকার শিকল পরিয়াছেন। শেকারিণী রমণীদিগের স্বর্গলালসা ও স্বাধীন-প্রেমের ইতিহাস কি এখনকার নব্য-শিক্ষিতা ভারত-রমণীকে কিছুই শিক্ষা দেয় না?

তাই সরযু, তুমি তোমার চিরটা জীবন, করে দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণ লইয়াই, সুখ-স্বচ্ছন্দে যাপন করিলে; সামাজিক-শক্তির উত্থান ও পতন অথবা উন্নতি ও অধোগতির দিকে একবারও অতিনিবেশের সহিত দৃষ্টি-পাত করিলে না। তোমার মত শিক্ষিতা রমণীও যদি সমাজ-শৈলের বিবিধ স্তরগুলি বৈজ্ঞানিকের চক্ষে পর্য্যবেক্ষণ না করে, তাহা হইলে, এ কার্য্য করিবে কে? আমি তো-মাকে, ইংলণ্ডের সমাজ-সম্পর্কে, গ্রেন্‌ভিল মারের কএকখানি প্রামাণিক গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। এই ক্ষণ তো-মাকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক (William Hepworth Dixon) ডিক্‌সনের নূতন আমেরিকা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিও পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমেরিকায়, বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, শেকার-পরি-প্লবের সৌরভযুক্ত কিরূপ লোক-ভয়ঙ্কর ধর্ম্ম-বিপ্লব, প্রেম-বিপ্লব অথবা সমাজ-বিপ্লব, যেন ধরণীর বক্ষঃস্থলকে বিদীর্ণ করিয়া, একটা সজীব শক্তির ন্যায় সময়ে সময়ে সমুদ্ভূত হইয়াছে; এবং তার পর, অতি শঙ্কাজনক মূর্ত্তিতে, শোঁ শোঁ শব্দে, দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে, ঘূর্ণডের বেগে বহিয়া গিয়াছে, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমার পরিজ্ঞাত থাকা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়।

বড় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই আমে-রিকার এ সকল অদ্ভুত বিপ্লবের ইতিহাস লিখিয়াছেন। কিন্তু এই বিপ্লব-ঝটিকা ডিক্‌-সনের ঐতিহাসিক-গ্রন্থনিচয়ে যেরূপ অসা-মান্য শিল্প-নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হই-য়াছে, বোধ হয় আর কোন ঐতিহাসিকের

গ্রন্থে তেমনটি হইতে পারে নাই। আমি তাই তোমাকে পুনরপি অনুরোধ করিতেছি, তুমি ডিক্‌সনের গ্রন্থগুলি বিশেষ 'মনোযোগের' সহিত পড়। আমি আমার এই পত্রে বারংবারই মনোযোগের কথা বলিতেছি। 'মনোযোগ' শব্দ আমার প্রাণ-সখী সরযূবালার সোহাগের অভিধানে কতরূপ মধুর ও মনোরোচক অর্থের দ্যোতক ও প্রবাচক, তাহা বোধ হয়, আমায় এখন আর, বলিয়া দিতে হইবে না।

ডিক্‌সন ও তাঁহার সম-কালবর্ত্তী লেখকদিগের গ্রন্থপত্রে দেখিতে পাইবে যে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ক্রমে কএকটি বৎসর, আমেরিকার সমাজ একটা অচিন্তিত-পূর্ব্ব প্রেম-ধর্ম্ম-বিপ্লবে পরিপ্লাবিত হয়; এবং সে বিপ্লবের বন্যা, গ্রামের পর গ্রাম ও নগরের পর নগর ভাসাইয়া, পরিশেষে আমেরিক-সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এ বিপ্লবকে কেহ বলিয়াছেন প্রেমের উচ্ছ্বাস, কেহ বলিয়াছেন ধর্ম্মের উচ্ছ্বাস; কেহ আবার মধ্যস্থতা করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা প্রেম ও ধর্ম্ম উভয়ের মিলিত উচ্ছ্বাস। কিন্তু উহার সর্ব্ববিধ বেগ-ভয়ঙ্কর মাধ্বীক-মহিমা সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী ডিক্‌সন বলিয়াছেন যে, অতীত কালের কোন বিপ্লব কিংবা কোন প্রকার ভাবোচ্ছ্বাসই, কালের স্থায়িতা, স্থানের পরিমাণ ও ভাব-বিহ্বলতার প্রভাবে এই বিরাট-বিপ্লবের সমকক্ষ নহে। *

যখন ফরাশিরা রাষ্ট্র-বিপ্লব লইয়া উন্মত্ত, তখন তাঁহাদিগের জপ-মন্ত্র হইয়াছিল সাম্য আর স্বাধীনতা। আমেরিকার উল্লিখিত ধর্ম্ম-বিপ্লবে জপ-মন্ত্র হইল স্বর্গরাজ্য এবং স্বাধীন-প্রেমের পবিত্র-সুখ ও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা। বিপ্লবের মূর্ত্তি-দর্শনে, মনুষ্য মাত্রেরই মনে বিচিত্র বিস্ময়ের ভাব জন্মিল। সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত যুবা, সহস্র সহস্র সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী যুবতী, আকস্মিক-প্রেমোন্মাদে আত্মহারা হইয়া, কোথায় স্বর্গরাজ্য,—কোথায় সুপবিত্র-স্বাধীন-প্রেম, এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; এবং § প্রত্যুষ-মুহূর্ত্ত হইতে গভীর-রাত্রি পর্য্যন্ত, দলে দলে মিলিয়া মিশিয়া, —স্ত্রী-পুরুষে, একসঙ্গে, প্রেম-ভক্তির প্রবল বন্যায় ভাসিয়া, প্রার্থনা, আরাধনা, নৃত্য-গীত, পাপের যন্ত্রণায় হাহাকার, এবং পবিত্র-প্রেমের জন্য চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। গির্জায় আর লোক ধরে না। গ্রাম ও নগর, নগরের কণ্ঠলগ্ন উপবন, এবং পরিশেষে গহন বন পর্য্যন্ত, লোকে লোকারণ্য হইয়া, একটা বিশাল ভজনাগৃহের মূর্ত্তি ধারণ করিল। ‡

যখন প্রেমের উচ্ছ্বাসে সকলেই এইরূপ

* "No revival in the past could vie, in either length of time, in width of area, or in strength of passion, with this Great Revival." Dixon.

§ "Men and women panting for a living brook—from early dawn until long past midnight every day. Heaven was assailed by multitude of souls." D

‡ "Every place that would hold a congregation became a church." D.

উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত, উদ্ভ্রামিত, উন্মাদিত,—যখন ধর্ম্ম-বিহ্বলা যুবতীরা ধর্ম্ম-জীবন যুবকদিগের অঙ্গের উপর ঢলিয়া পড়িয়া, অল্প অল্প নাচিতেছে আর কাঁদিতেছে, যুবকেরা তাহাদিগকে কণ্ঠে বেষ্টন করিয়া, অনুতাপের অন্তর্দ্দাহে নয়ন-জলে ভাসিতেছে, তখন ধর্ম্ম-গুরু রেভারেণ্ড-যাজকদিগের মুখে নানারূপ রস-মধুর আশ্চর্য্য কথা ফুটিতে লাগিল। নির্ম্মল-চরিত্র নয়েশ, ( Rev. John H. Noyes as Leader and Expositor ) তাঁহার ভাবময়ী বক্তৃতায় নির্ভয়ে বলিলেন যে, মুক্তহৃদয় সাধু সর্ব্বপ্রথমেই তাহার আরাধ্য স্বর্গ এবং স্বর্গসঙ্গিনী ইভাকে খুঁজিয়া লয়।—"When a man becomes conscious that his soul is saved, the first thing that he sets about is to find his Paradise and his Eve."

ভাই সরযূ,—আমার প্রাণাধিকা সখী, পবিত্র-হৃদয় ও প্রেমের-গুরু-পারফেক্‌সনিষ্ট ( Perfectionist )—পূর্ণ-প্রেমিক-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য, পণ্ডিতবর * নয়েশের অধর-নিসৃত এই পীযূষময়ী বাণী কোথায় যাইয়া পঁহুছিল,—কত হৃদয়ে কি আনন্দ ও ঔৎসুক্য জন্মাইল,—কত, প্রাণে কিরূপ অচিন্তিতভাবে প্রেমের নূতন আগুন জ্বালিল, তাহা তোমার প্রতিভাময়ী বুদ্ধি আপনা হইতেই বুঝিয়া লইবে না কি?

ধীর-মতি ধর্ম্ম-যাজকদিগের মধ্যে, এক দুই করিয়া এক শতেরও অধিক ব্যক্তি, § নির্ভীক নয়েশের ঐ কথাকে নানারূপে সুত্রিত, সম্প্রসারিত ও পল্লবিত করিয়া, শত শত সুদীর্ঘ-বক্তৃতার প্রস্রবণ খুলিয়া দিলেন। মন্দিরে স্থান কুলায় না বলিয়া, তাঁহারা হাটে, ঘাটে, মাঠে,—গাছের গোড়া ও গো-যান ‡ প্রভৃতির উপরে দাঁড়াইয়া, ধর্ম্মের অনুনাসিক স্বরে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। বিবাহিতা রমণীদিগের মধ্যে, অনেকেই, প্রথমে সংশয়-দোলায় দোলায়িত হইয়া, শেষে বুঝিয়া মনের মত জন পাইবার জন্য পাগল হইল। "Each man appeared to be yearning for some woman, each woman appeared to be moaning for some man." Dixon.

* রেভারেণ্ড নয়েশ শুধু ধর্ম্মযাজক নহেন। তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শেষ জীবনে নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের পারফেক্‌সনিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন প্রেমের তুফান বহিল, তখন স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই আপনার পুরাতন দাম্পত্য-জীবনে বিরাগযুক্ত হইয়া নিজ নিজ

§ The Rev. James Boyle, The Rev. Luther Meyrick, The Rev. Hiram Sheldon, The Rev. Abram, The Rev. C. Smith, The Rev. J. Rider, The Rev. H. Foot, The Rev. E. Stone প্রভৃতি অসংখ্য। D.

‡ "A cart became a pulpit, a tent a chancel, the stump of a tree an alter;" D.

লইলেন যে, * তাঁহাদিগের ঐ বিবাহ-বন্ধনই ভব-যন্ত্রণার ভয়ানক বন্ধন, ও বিবাহ-বিহিত-পুরাতন-প্রথার স্বামীই সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন-প্রেমের অন্তরায় ;—আর যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক অথবা ধর্ম্মে প্রবীণ, তাঁহাদিগের মধ্যেও, প্রায় সকলেই, এই এক নূতন-প্রতীতি লাভ করিলেন যে, যেখানে প্রেমের স্বর্গ, সেখানেই প্রত্যক্ষ-চতুর্ব্বর্গ, এবং বিবাহের শিকলি ভাঙ্গিয়া ফেলানই সে স্বর্গ অথবা চতুর্ব্বর্গ লাভের প্রধান উপায়।

ইহা বলা বাহুল্য যে, সুশিক্ষিতা ও সৌন্দর্য্য-গর্ব্বিতা যুবতীরাই পারফেক্‌সনিষ্ট-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রধানা পোষ্ট্রী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন ; এবং অনিন্দ্য-মূর্ত্তি, অপরূপ-সুন্দরী মিস্ লুসিনা ( Miss. Lucina Umphreville ) আপনার রূপ, গুণ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির পতাকা উড়াইয়া, এই সুন্দরী সেনার সম্মুখভাগে অগ্রণী রূপে দণ্ডায়মানা হইলেন। লুসিনা যেমন ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত, তেমনই ছিলেন প্রেমের ফোয়ারা। তাঁহার সঙ্গলাভে, স্বর্গীয়-প্রেমের প্রচারকেরা, যেন হাতে হাতে স্বর্গ পাইয়া, আহুতি-সন্ধুক্ষিত অগ্নিবৎ, শত-গুণ-সংবর্দ্ধিত শক্তিতে বাড়িয়া উঠিলেন ; এবং অধিকতর ওজস্বিতা ও আনন্দ-স্ফূর্ত্তির সহিত আপনাদিগের মত-প্রচার-কার্য্যে পাগলের মত আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

লাবণ্যময়ী লুসিনা, বহু লোকের ললিত-স্তবে এবং আপনার রূপ ও হৃদয়ের রস-ভাব-বৈভবে, দেখিতে দেখিতে আর এক ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। তিনি, এক জনের পর আর এক জন এইরূপ করিয়া, সেল্‌ডন, ষ্টোন ও রাইডার প্রভৃতি ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে অনেককেই আপনার নিষ্পাপ-প্রেমের নির্ম্মুক্ত সাথী বলিয়া প্রাণে টানিয়া লইলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোনরূপ গ্লানি কিংবা গৌরবের হানি নাই। কেন না, তিনি স্বপ্নে, সহজ-জ্ঞানে ও সানন্দ-অনুপ্রাণনায় নানারূপ আদেশ পান ; § এবং রমণী ও পুরুষ, পাপ-লালসার সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, মুক্তির রাজ্যে অথবা মুক্ত অবস্থায় কিরূপ স্বাধীন-ভাবে চলিবে—একে অন্যের কণ্ঠলগ্ন রহিয়া, অথবা সময়-বিশেষে পবিত্র-প্রেমালিঙ্গন ও পবিত্র-মুখ-চুম্বনের দ্বারা ‡ পরস্পরের চিত্তসন্তর্পণ করিয়াও, সংসারের শাসন ও শারীর-বৃত্তির সঙ্কুক্ষণ হইতে কিরূপে নির্লিপ্ত রহিবে, সে বিষয়ে সকলকেই সতত উপদেশ দেন।

লুসিনার উল্লিখিতরূপ অমৃত-নির্ঝরবৎ

* "Married women grew dubious as to their line of duty." Dixon.

§ "Lucina claimed to have visions, intuitions, inspirations, on many points of faith ; more than all others, on the relations of the two sexes in the Redeemer's kingdom." D.

‡ "And grant to their beloved the solace of holy kiss. But the love was to be wholly pure and free." D.

অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশে, আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটা যুগান্তর ঘটিল। সুরূপা, ও স্বর্গ-লোলুপা বয়ঃস্থাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিবাহ-ধর্ম্মে ভয়ানক ঘৃণা জন্মিল; এবং যাহারা সই,—তোমার ও আমার মত,—না জানিয়া, না বুঝিয়া, না শিখিয়া, না চাখিয়া, এবং পুরুষ-হৃদয়ের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ও প্রেম-সম্পদ্ ভালরূপ না পরখিয়া, কোনরূপ একটা 'নমোনম' বিবাহ করিয়া বসিয়াছে, তাহারা বিবাহের সেই পাপ-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, স্বাধীন-প্রেমের সুখ-সাগরে সন্তরণ করিবার জন্য, উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তরলমতি তরুণী-দিগের ত হইতেই পারে; যাহারা অতরল, অতরুণ,—কণ্টকিত-তরুর ন্যায় অকরুণ, এবং সুতরাংই অতি বড় পবিত্রস্বভাব ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত,—এমন কি, ধর্ম্ম-ভাব-শুদ্ধ বৃদ্ধ সজ্জনেরাও যাঁহাদিগকে ( Perfect Saints ) অর্থাৎ পূর্ণতপা ঋষি বলিয়া পূজা করিত, তাঁহাদিগের মধ্যেও সহসা একটা ভাবান্তর-প্রবাহ তর তর বেগে বহিল। তাঁহারা যে স্বর্গের জন্য লালায়িত, স্বগৃহে তাহার গন্ধও নাই, এবং স্বকীয় পরিণীতা স্ত্রী কোন অংশেও সে স্বর্গের সঙ্গিনী নহেন, এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়েও দৃঢ়বদ্ধ হইল। *

এ দিকে "অর্ব্বাচীন বিবয়ীরা" দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। তাঁহারা মিস্ লুসিনাকে (Miss. Anti-marriage অর্থাৎ) মিস্ বিবাহ-ভাঙ্গনী নামে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর এক জনকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিলে, আপনার অঙ্গলগ্ন বিষের জ্বালা দূর হইবে কেন? তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কন্যা-দায়ে ঠেকিয়াছেন, অর্থাৎ বয়ঃস্থা কন্যার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। কন্যা কহিতেছে—সে বিবাহ করিবে না,—সে এমন পাপে ডুবিবে না। কেহ, আপনার প্রাণাধিক পুত্রটিকে বিবাহ করাইয়া, একটি সোনার পুতুল ঘরে আনিয়াছেন। আজি সে সোনার পুতুল, সিংহীর মত গর্জ্জিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—সে তাহার সংসার-ভক্ত স্বর্গ-সুখ-বিরক্ত পাপ-স্বামীর মুখ দেখিবে না। তাহাদিগের অনুকরণে দেশের প্রায় সমস্ত যুবতীই, কখনও নিদ্রিত, কখনও বা জাগরিত অবস্থায়, নানারূপ স্বপ্ন দেখিতেছে,—স্বপ্নে নানারূপ উপদেশ পাইতেছে;—এবং কিবা স্বপ্নে, কিবা সহজজ্ঞানে, সকলে ঐ এক কথাই স্পষ্ট বুঝিতেছে যে, প্রেম আর পরিণয় পবিত্র-মুক্তি-বর্জ্জিত পৃথ্বীধামে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহারা কিছুতেই তাহার ছায়াস্পর্শ করিবে না।

আগুন যেমন, গ্রাম-নগর-ব্যাপি গৃহ-

* It is a very sad fact, which shows in what darkness men may grope and pine in this wicked world, that when these Perfect Saints were able to look about them in the new freedom of Gospel light, hardly one of the leading men among them could find an Eden at home, an Eve in his lawful wife." Dixon.

দাহের সময়, উহার লক-লক জিহ্বা প্রসারণের দ্বারা, এক ঘর ছাড়িয়া আর এক ঘর ধরে,—এক বাড়ী পোড়াইয়া আর এক বাড়ী পোড়াইতে আরম্ভ করে ; এবং অল্প সময়ের মধ্যেই, একটা আতঙ্কজনক বিরাট বহ্নিরূপে প্রজ্বলিত হইয়া, মনুষ্য মাত্রেরই মনে আতঙ্ক জন্মায়, প্রেমের গুরু নয়েশ এবং প্রেম-মদবিহ্বলা মিস্ লুসিনার প্রবর্ত্তিত স্বাধীন অথবা স্বর্গীয় প্রেমের অভিনব ধর্ম্মও সেইরূপ পল্লীর পর পল্লী, জন-পদের পর জন-পদ এবং প্রদেশের পর প্রদেশ গ্রাস করিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল ; এবং যে দেশে সকলে, আপনার স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র-পুত্রবধূ প্রভৃতি পরিজন লইয়া, সুখশান্তিতে নিশ্চিন্ত ছিল, দেখিতে দেখিতে সেই দেশ একটা বিশাল উন্মত্ত-নিবাসে পরিবর্ত্তিত হইল। ধীর-স্থির এবং বহুদর্শিবিচক্ষণ ব্যক্তিরও সাহস ও সহিষ্ণুতা টুটিল, —ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল।

ভাই সরযু, আমি আমার শরীরের বর্ত্তমান ক্লিষ্ট অবস্থায় যাহা লিখিয়া যাইতেছি, ইহা কি শুধুই সখী-সংবাদি ভাবের উচ্ছ্বাস, না একটা সমুন্নত ও সুশিক্ষিত দেশের প্রকৃত ইতিহাস ? তুমি যদি আপনার মনের সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, অন্ততঃ একটি মাসের জন্য তোমার নিত্য-পাঠ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থনিচয় এক দিকে সরাইয়া রাখিয়া, নূতন আমেরিকার ধর্ম্ম-বিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লব ঘটিত গ্রন্থগুলি মনোনিবেশের সহিত পড়িয়া লও। তোমার বুদ্ধি, সই, সর্ব্বগ্রাসিনী। তুমি ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সমাজ-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত লইয়া একটুকু বিশেষ আলোচনা করিলে, তাহাতে কেবল তোমার ও আমারই উপকার হইবে এমন নহে ; আমাদিগের এই রঙ্গবিহ্বল বঙ্গদেশের যে সকল অবোধ ও অর্দ্ধশিক্ষিত কুল-কুমারী, শুধুই "কি-যেন কি-যেন ধরণের" কবিত্ব ও "কি-জানি কি-জানি গোছের" কল্পনার উচ্ছ্বাসে, অথবা আপনার অভিমান-মুগ্ধ হৃদয়বৃত্তির অন্ধ-বিশ্বাসে, অজ্ঞাতকুল-শীল আগন্তুকের প্ররোচনার ন্যায়, অজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত বিদেশীয়-সভ্যতার বিপজ্জনক গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতেছে, তাহাদিগেরও প্রভূত উপকার হইবে। নয় কি সখি ?

যে সকল স্বদেশ-হিতৈষী (!) সমাজসংস্কারকেরা, সতত তোমার মতের পোষকতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত তোমাকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিবেন যে, ভ্রাতৃবর নয়েশ আর ভগিনী লুসিনা, প্রেমের পবিত্র-পিপাসায় পথ-ভ্রষ্ট হইয়া, বিপাকেই বা ডুবিল। ইহাতে নব্য সভ্যতার অথবা নূতন ধর্ম্মবিপ্লবের নিন্দা হইবে কেন ? কি জন্য নিন্দা হইবে আমি সেইটুকু তোমাকে আবারও বুঝাইয়া বলিতে চাহি।

রোগ যেমন সংক্রামক, মনুষ্যের দোষ ও গুণও তেমনই সংক্রামক ; এবং মনের ধারণা, হৃদয়ের ভাব এবং হৃদয় ও মনের ক্রিয়াজনিত মত ও বিশ্বাসও সমাজের সকল অবস্থাবই সেই প্রকার সংক্রামক। যেমন

একটি দীপ হইতে এক সহস্র দীপ মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়; তেমন একটা ভাব-বিহ্বল হৃদয় হইতেও, সহস্র হৃদয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত ও আবেশিত হইয়া থাকে। প্রমাণ রাজ-নৈতিক পুরাতন ফ্রান্স,—প্রমাণ সমাজ-নৈতিক নূতন আমেরিকা।

লুসিনার হৃদয় কোন্ ভাবে উন্মাদিত হইয়াছিল, তাহা তোমায় বলিয়াছি। একটি বৎসর যাইতে না যাইতে, আমেরিকার এখানে, সেখানে অথবা সকল স্থানেই, বহুসহস্র "বিভলা, বিলোলা" ও আবেগ-উচ্ছলা লুসিনার আবির্ভাব হইল; এবং সকলেই পুরাতন পার্থিব-স্বামীর প্রেমের বন্ধনকে পাপের বন্ধন মনে করিয়া, পবিত্র-প্রেম, পূর্ণ-বিকশিত প্রেম, অপার্থিব অমল-প্রেম, এবং স্বাধীন প্রেম ও স্বর্গীয় প্রেমের জন্য, লুসিনা, হইতেও অধিকতর ভাবাবেশে উন্মাদিত হইয়া, গলিত-নয়নে, স্খলিত-বসনে, বিষাদ-মলিন পাণ্ডুর বদনে, হা প্রেম বলিয়া ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিল।

যাঁহারা লুসিনার অনুবর্ত্তিনী, তাঁহাদিগের মধ্যে মিস্ মেরী লিঙ্কন, * মিস্ মেরাইয়া ব্রাউন, মিস্ আবী ব্রাউন, এবং মিস ফ্লাবিলা হাওয়ার্ড বিশেষ যশ ও মান লাভ করিলেন। মিস্ লুসিনার মুখে যে কথা, ইঁহাদিগেরও সকলেরই মুখে, যেন অধিকতর উৎসাহে, সেই কথা; এবং মিস্ লুসিনার প্রাণে যে পিপাসা, ইঁহাদিগেরও প্রত্যেকেরই প্রাণে, যেন অধিকতর অনুরাগে, সেই পিপাসা। ইঁহারা, অল্পসময়ের মধ্যেই, সুদূর-লক্ষ্য, সুদূর-লভ্য স্বর্গধামকে, সাধনার বলে, নভস্তর হইতে নামাইয়া আনিয়া, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন;—আর, পৃথিবীর পাপ-প্রেম ও পাপময় স্বামিত্ব-সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে উন্মূলন করিয়া, সকলেই আপনার প্রাণের সাথী প্রেম-পুরুষকে খুঁজিয়া লইলেন; এবং তাহার সহিত নিষ্পাপ স্বর্গীয়-প্রেমের স্বাধীন-সুখ উপভোগ করিয়া, পৃথিবীতেই পুষ্পিত-স্বর্গ-সুখের পূর্ব্বস্বাদ অনুভব করিতে রহিলেন।

এ সকল যুবতীদিগের মধ্যে মিস্ মেরী লিঙ্কনের বড় বেসী নাম। মেরী লিঙ্কন যেমন সুন্দরী, তেমন সুশিক্ষিতা; এবং পিতৃ-পরিচয়ে ও প্রাচীন বংশ-গৌরবে সর্ব্বত্রই সম্মানিতা। মেরী লিঙ্কন যখন, এত প্রকারের সামাজিক-সম্পদ লইয়া, অসংখ্য সুন্দরী যুবতীর সেনানায়িকারূপে পারফেক্সনিষ্ট (Perfectionist) অর্থাৎ পূর্ণপ্রেমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন, লুসিনার আবির্ভাব-উপলক্ষে একবার যেমন হইয়াছিল, এই সম্প্রদায়ের সাধু-সজ্জন ও (Saint) সেইণ্ট্ অর্থাৎ সিদ্ধ-মহাজনদিগের মধ্যে আবার সেইরূপ একটা আনন্দের তুফান ছুটিল। সকলেরই নয়নে প্রেমের

* "Miss Marry Lincoln daughter of the famous Dr. Lincoln. Miss Maria Brown, Miss Abby Brown and Miss Flabila Howard, all wellknown for the high education they had received." Dixon.

অশ্রু ঝরিল, প্রাণে প্রেমের উৎস উথলিয়া উঠিল। লুসিনা যেমন, সমাজ-শোধন ও সাংসারিক-স্বার্থ-পরতার মূলোচ্ছেদনের জন্য, কখনও নয়নজলে ভাসিয়া,কখনও বা প্রেমোন্মাদিনীর মত অট্টহাস্যে হাসিয়া, বক্তৃতায় অগ্নিবৃষ্টি করিতেন, রূপসীর শিরোমণি মেরী লিঙ্কনও সেইরূপ আনন্দবিহ্বল-প্রাণে, প্রাণপ্রিয় প্রেম-পুরুষের অন্বেষণে,বক্তৃতা করিতে লাগিলেন; এবং সময়ে সময়ে ভাব-বিহ্বলা প্রেমময়ীর মত, তরুণ-বয়স্ক সাধুদিগকে প্রেমের আলিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া, অথবা প্রেমের পবিত্র চুম্বনে উন্মাদিত করিয়া, পারফেক্‌সনিষ্টদিগের মধ্যে কেমন একটা মোহময় মদিরার প্রবাহ চালিয়া দিলেন।

কিন্তু, ইহাতেও মেরীর প্রাণে পরিতৃপ্তি নাই। হায়! সে প্রার্থিত-দুর্লভ, প্রশান্ত ও পরমা তৃপ্তি কোথা হইতে আসিবে সই?—কোথা হইতে কেমনে আসিবে?—

"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে।"

তোমায় বলিয়াছি, লুসিনা একে একে অনেক সাধু পুরুষকেই তাঁহার প্রাণের সাথীজ্ঞানে আদর করিয়াছিলেন। এইরূপ শুষ্ক আদরে মেরীর মত মনোমদ-প্রেমিকার প্রাণ শীতল হইল না। মেরী লিঙ্কন, তদীয় প্রাণ-সখী—(সরযুবালা—ছি ছি! শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণুঃ! হায়! কি লিখিতে কি লিখিলাম!) প্রাণসখী মেরাইয়া ব্রাউনের সহিত নির্জ্জনে বহু চিন্তা করিয়া, এইরূপ অবধারণ করিলেন যে, যদি পৃথিবীর এই পাপ-সমাজকে প্রেমের আগুনে পরিশোধন করা কর্তব্য হয়, তাহা হইলে, এমন কোন অভাবনীয় কার্য্য করা উচিত, যাহাতে পৃথিবীর বিষয়ী লোকেরা সে কার্য্যের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠে, এবং প্রেমিকদিগের মস্তকের উপর ক্রোধ ও কলঙ্কের বিষ-রাশি উদ্গিরণ করিতে বাধ্য হয়। *

যে কথা সেই কার্য্য। প্রেমময়ীরা, প্রেমের জন্য কলঙ্ক-অর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, এক দিন, নিঝুম নিস্তব্ধ গভীর রাত্রিতে, সাধুসজ্জনের অগ্রগণ্য, ব্রিম্‌ফিল্ডের সম্প্রদায়-মান্য, ভক্তিভাজন ভ্রাতা সাইমন লভেটের শয়নগৃহে গোপনে—অতিগোপনে—সংগোপনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন; এবং তাঁহাকে লইয়া বহুক্ষণ বাণ্ডলিং (Bundling) অর্থাৎ বিহ্বল-প্রেম-ভোগ নামক বিমল আনন্দে অতিবাহিত করিয়া, সত্য সত্যই কলঙ্কের সমুদ্রে সাঁতার দিলেন। বাণ্ডলিং বলিলে কি বুঝায়, তাহা সজীব ও নির্জীব কোন অভিধানে না খুঁজিয়া,—সখীর কাছেও জিজ্ঞাসা না করিয়া, ইংলণ্ডীয় বিবাহ-পদ্ধতির ইতিহাস-পুস্তকে অনুসন্ধান করিয়া লইও। §

* "They had often told each other they must do something great—something that would strike the World—*something that would bring upon them its wrath and scorn.*"

Dixon.

§ "They found their way into the Rev. Simon Lovett's room, awoke

মেরী লিঙ্কন আর মেরাইয়া ব্রাউন যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। তাঁহাদিগের এই গভীর নিশীথের গূঢ়রহস্য বাও্‌লিঙের কথা ব্রিম্‌ফিল্ড্‌ হইতে বোষ্টনে এবং বোষ্টন হইতে নিউইয়র্কে যাইয়া পঁহুছিল; এবং আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম, চারি দিকে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। যদিও পারফেক্‌সনিষ্ট অর্থাৎ পূর্ণ-প্রেমিক-সম্প্রদায়ের নবীন-বয়স্ক সাধু মহাশয়েরা এ শুভসংবাদেও জয়-জয় ধ্বনি তুলিলেন; তথাপি সম্প্রদায়ের বহির্ভূত, সংসার-বন্ধনাসক্ত, শত-সহস্র বিধর্ম্মি-দুর্জ্জনের হুঙ্কারে ও ধিক্কারে, মেরী লিঙ্কন ও মেরায়া ব্রাউনের মহিমময় প্রাণও মুহূর্ত্তের তরে দমিয়া পড়িল। পারফেক্‌সনিষ্ট হইলেও অবলার প্রকৃতিসিদ্ধ লজ্জা ত সই কর্পূরের মত উড়িয়া যায় না।

ইহা বলিয়াছি যে, মেরীর পিতা সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অত্যধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, ডক্‌টর লিঙ্কন নামে তদানীন্তন আমেরিকার সকল স্থলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি যখন মেরীর কাছে যাইয়া, মাথায় হাত দিয়া, ম্লান-মুখে বসিলেন, তখন মেরী তাঁহাকে গর্জ্জিয়া বলিল যে, তিনি সয়তানের দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বর্গীয় প্রেমের প্রতিকূলতা করিতেছেন। বলিতে বলিতে মেরীর সে স্বর্গীয়-ভাব অনলবহ্নির মত ধক্‌ ধক্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মেরী, তাহার পিতার দেহ হইতে সে ধর্ম্ম-দ্রোহী সয়তানের আত্মাকে দূর করিবার জন্য, সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার মুখের উপর সজোরে এক চপেটাঘাত করিল। *

তুমি হয় ত হাসিয়া কুটপাট হইবে, এবং বলিবে অভাগিনী মেরী পাগল হইয়াছে। তা নয় সরযু, তা নয়। অমন সুন্দরী ও সুপণ্ডিতা যুবতী সহজে পাগল হয় না; এবং পাগল হইলেও আপনার প্রকার-প্রাণালীটুকু পরিত্যাগ করে না। মেরী লিঙ্কন যখন তাঁহার তাদৃশ উচ্চপদবীরূঢ় বৃদ্ধ পিতার মুখের উপর চপেট আঘাত করিল, তখন মেরাইয়া ব্রাউন, আবী ব্রাউন, ফ্লাবিলা হাওয়ার্ড, এবং আরও অসংখ্য সুশিক্ষিতা সুন্দরী, মেরীর এই অতুল স্বর্গীয়-সাহস-দর্শনে উৎসাহিত হইয়া, মেরীকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল; এবং সকলে হাতে হাতে মণ্ডলী বাঁধিয়া, পরস্পর-চুম্বন ও প্রেমালিঙ্গনের পবিত্র আনন্দে, প্রেমের জয়-গাথা গাইতে গাইতে, নৃত্য করিতে লাগিল !!

আমি শুনিয়াছি, তোমাদিগের কলিকাতায় অমৃতলাল নামক কে এক বৃদ্ধ নট-কবি, মেরী লিঙ্কনের পিতার ন্যায়, এইরূপ স্বর্গীয়

him from his sleep, and suffered themselves to be taken in the act."
Dixon.

* "Mary told these sisters in the Lord, that her father was possessed by a devil; and when he came to see and talk with her in Mrs. Tarbell's house, she smote him on the face in order to cast it out." D.

প্রেমের পরিপন্থী হইয়া, এবং নিশ্চয়ই উল্লিখিতরূপ নূতন ছাঁদের প্রেমের পথে নানারূপ কাঁটা দেওয়ার মন্দ উদ্দেশ্যে লাগিয়া পড়িয়া, নাটক ও প্রহসন লিখিতেছেন। মেরীর পিতা চপেট-আঘাতেই পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। যদি শুভ্রশীর্ষ সহর্ষ অমৃতলাল সদলবলে মেরীর সেখানে সশরীরে উপস্থিত থাকিতেন, হায়! তবে তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটিত, আমি তাহা বলিতে পারি না!

যে দিন মেরী, আপনার পিতাকে ঐরূপ শিক্ষাদান ও শাসন করিয়াও, স্বর্গ-সঙ্গিনীদিগের নৃত্য-গীত-মহোৎসবে সংবঞ্চিত হইল, তাহার তিন দিন পরেই তাহার আর এক প্রকার বুদ্ধি জন্মিল। সে ফ্লাভিলাকে তাহার সঙ্গে লইয়া, গভীর রাত্রিতে, গ্রামের বাহির হইল। গ্রামের বহিঃস্থিত মাঠ ও বিল তুষাররাশিতে আচ্ছাদিত। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ জীব-জন্তুও সে তুষার-রাশির উপর দিয়া পাদ-চারণা করিতে সমর্থ হয় না। মেরী আর ফ্লাভিলা, পায়ের পাদুকা অপসারণ করিয়া, শরীরের বস্ত্রাদিও প্রায় সমস্তই দূরে ফেলাইয়া, দুটি অৰ্দ্ধ-বিবসনা প্রেমোন্মাদিনীর আলু থালু বেশে, আলুলায়িত কেশে, সেই তুষার-রাশির উপর দিয়া, প্রেমের গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল; এবং প্রান্তরের সীমাস্থিত পর্ব্বতের সানুদেশে জানুপাত করিয়া, স্বাধীন-প্রেমিক-সম্প্রদায়ের মঙ্গলার্থ, দৈন্যগদ্‌গদ দয়াস্নিগ্ধ প্রার্থনায় আপনাদিগের দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হইল। হা প্রেম!—হা প্রেম!—হা প্রেম!—হা প্রেম!—

সই, যথেষ্ট হইয়াছে, আর না। আর লিখিতে পারি না। যাহা লিখিয়াছি, তাহাই তোমার মত বুদ্ধিমতীর জন্য সর্ব্বাংশে প্রচুর। আমি স্পষ্টই ত তোমার নিকট লিখিয়াছি যে, ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা, স্বামিত্বের বন্ধন-বিরাগে অথবা স্বাধীন-প্রেমের উদ্ভ্রান্ত অনুরাগে, উন্মাদিত হইয়া, কিরূপ বিপথগামী হইয়াছে, তাহা কানে শুনিলেও তুমি রাম নাম লইয়া প্রাণ জুড়াইবে। সে রাম নাম, ভাই, আজি লইবে, না আমার আর এক পত্রের অপেক্ষায় থাকিবে? ফল-কথা, আমি তোমার চারুহসিত চন্দ্রমুখে রাম নাম না লওয়াইয়া নিবৃত্ত হইব না। আমি সে প্রসঙ্গে আমার শেষ পত্রে যাহা লিখিব, তাহা শুনিয়া তুমি,—ধীর-গম্ভীরা ও বিজ্ঞান-প্রখরা তুমি সরযূও, মুড়ো ঝাঁটা হাতে না লইলেই রক্ষা পাই। তুমি কি, এ সকল প্রামাণিক ঐতিহাসিক বৃত্তান্তকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াও, ভারতীয় পারিবারিক-জীবনের পবিত্র-নিকেতনে সহসা কোন মৌলিক পরিবর্ত্ত ঘটাইতে সাহস পাইবে? আর ভারতীয় কুলললনারা স্বামীকে সাংসারিক জীবনের আশ্রয় এবং সর্ব্বতোভাবে ও সকল অর্থে স্বামী জানিয়া, যেরূপ নির্ম্মল সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করিতেছে, তাহার বিঘ্ন জন্মাইতে প্রাণে কোনরূপ উৎসাহ লাভ করিবে?

ভাই, এবার আর আত্মকথা অধিক কিছু লিখিব না। যতই দিন যাইতেছে, ততই দীনবন্ধুর ইচ্ছায় নারীজীবনের পরম-লক্ষ্য

ও চরম-পরীক্ষার সন্নিহিত হইতেছি। তুমি হৃদয়ের সহিত আমায় আশীর্ব্বাদ করিও; আর যদি আমার সখীপতির সাহচর্য্যে, ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা করিতে শিখিয়া থাক, তাহা হইলে, আমার জন্য সতত প্রার্থনা করিও। তাঁহাকে ঈশ্বর, বিশ্বেশ্বর, ভক্তবৎসল হরি অথবা ভাব-বিহ্বল শিব-শঙ্কর, যে কোন নামে সম্ভাষণ কর, সকল নামেই, তিনি সেই এক অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ অনন্তদেব। তিনিই তোমার সেই—Unknown and Unknowable Reality—অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় পরমতত্ব, এবং প্রাচীন-ঋষিদিগের "অবাঙ্‌মনসোঽগোচর" পূর্ণানন্দ। আমি যখনই তাঁহাকে প্রাণে অনুভব করি, তখনই তাঁহার কাছে আমার প্রাণ-সখীর সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকি। এখানে সকলেই সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ করেন, এবং সতত তোমাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

তোমার চির-জীবন-সঙ্গিনী
সখী সুভাষিণী।

# রসিকিনী।

ঝুলনের আসরে ঝুমুর বাজিতেছে;—রাঢ়-দেশের কীর্ত্তনওয়ালী, ঝুমুরের তালে তালে, আপনার অলক্ত-রঞ্জিত ও ঘুঙুর-মণ্ডিত পা দু'খানি মৃদু দোলনে নর্ত্তিত করিয়া, জ্ঞান-দাস ও গোবিন্দ দাস প্রভৃতির অনুকরণে, অথচ মধু কানের ধরণে, পদ গাইতেছে। অনুকরণ বলিবার একটুকু তাৎপর্য্য আছে। মূল পদ মহাজন-কবিদিগেরই বটে। কিন্তু কীর্ত্তনওয়ালী, যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছে, সে তদনুসারে, পুরাতন মহাজন-পদাবলীকে কতকটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া, এবং কুত্রচিৎ অভিনব পদ-পূরণের দ্বারা কিয়দংশে নূতন করিয়া লইয়া, আপনার মনোমত সুরে গাইয়া যাইতেছে;—

"ধীরে যায় রাই গরবিণী,—
শ্যাম-প্রেম-সোহাগিনী, শ্যাম-রস-রসিকিনী।
শ্যাম নব-জলধর,
রাই যেন তার চাতকিনী।
ধীরে ধীরে যায়, ইতি উতি চায়,
ধীর-মন্থর-গামিনী।

যেখানে গান হইতেছিল, সে আসরে অনেক সুশিক্ষিত যুবা, সংগীত-রস-পিপাসু-হৃদয়ে, উৎসুক-কর্ণে উপবিষ্ট ছিলেন। যুবজনদিগের মধ্যে দুই একটি প্রৌঢ়-যুবা সুপরিচিত সাহিত্যিক। তাঁহারা কেহ উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিয়াছেন; কেহ কেহ, সাময়িক-সাহিত্য-পত্রে কাব্য-সমালোচনার প্রবন্ধাদি লিখিয়া, সুহৃৎস্বজনের চিত্ত সন্তর্পণ করিয়াছেন। কীর্ত্তনওয়ালী যখন, আসরের চারি পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সকলের চক্ষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, বড়ই সুখ-মধুর-স্বরে, উহার ঐ "শ্যাম-রস-রসিকিনী" পদটিরে, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল, তখন উল্লিখিত শ্রোতৃবৃন্দের

মধ্যে একটি উচ্চশিক্ষিত অথচ উদার-স্বভাব সাহিত্যসেবীর একান্তই ধৈর্য্যচ্যুতি হইল তাঁহার আর ভাল লাগিল না। তিনি একটুকু বিরক্তির সহিত বলিলেন,——

হাঁ গা বাছা, ও আলাৎ-পালাৎ মাথা-মুণ্ড তুমি কি গাইতেছ? 'রসিকিনী' এ শব্দ ত বাঙ্গালা শব্দ নয়। বাঙ্গালা ভাষায় কোথায়ও কি 'রসিকিনী' এমন শব্দের প্রয়োগ আছে? আমরা শুনিয়াছি যে, তুমি সুশিক্ষিতা গায়িকা, তাই আমরা তোমার গান শুনিতে আসিয়াছি। তুমি এমন উদ্ভট শব্দ কার কাছে কোথায় শিখিলে?

কীর্ত্তনওয়ালী প্রথমতঃ একটু থত মত খাইল। তার পর, যুক্তকরে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বাবুটিকে সম্ভাষণ করিয়া, বিনয়ের কণ্ঠে বলিল,——

"আঁজ্ঞে, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য; 'রসিকিনী' এমন পদ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু আমরা অশিক্ষিত মূর্খ; বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আমরা কি জানি? আপনি দয়া করিয়া আমাকে সুশিক্ষিতা বলিয়াছেন; কিন্তু আমি প্রকৃত প্রস্তাবে সুশিক্ষিতা নই। বাঙ্গালার নাটক-নভেল ও অন্য পাঁচ প্রকারের গ্রন্থপত্র কিছু কিছু না পড়িয়াছি এমনও নহে। তবে, পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি আমরা গণ্ডমূর্খ। আমরা শুধু বই পড়িয়া কি করিব? কি বুঝিব? 'রসিকিনী' এই পদ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, অথবা তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী মহাজন কবিরা কোথায়ও প্রয়োগ করিয়াছেন কি না, ঠিক বলিতে পারি না। করিলে করিয়াও থাকিতে পারেন। বিশুদ্ধ গদ্য এক বস্তু, আর ছন্দের শিকলে বাঁধা সংগীত কিংবা পদ্য আর এক বস্তু। আপনারা সকলেই ত জানেন যে, গীতে কিংবা পদ্যে, অনেক স্থলেই, ছন্দের অনুরোধে, শব্দের নানারূপ মূর্ত্তিপরিবর্ত্ত ঘটিয়া থাকে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 'চাতকিনী।' যাঁহারা ছন্দ মিলাইবার জন্য, 'চাতকিনী' লিখিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহারা, ইচ্ছা হইলে, 'রসিকিনীও' লিখিতে পারেন। কিন্তু যেখানে ছন্দের কোন সম্পর্ক নাই,—ছান্দন-দড়ি, বান্ধন-দড়ির কোনই প্রয়োজন নাই, সেখানেও যখন, পাঁচ জনে, মনে লয় যেন মধুরতারই প্রয়োজনে, 'অনাথিনী,' 'অনাশ্রয়িণী' এবং 'নির্দ্দোষিণী' ও 'নিরপরাধিনী' প্রভৃতি পদ অহোরাত্র প্রয়োগ করিতেছেন, তখন 'চাতকিনীর' পাশে 'রসিকিনী' আসিয়া মিশিবে, ইহাতে এমনই বা দোষের কথা কি?"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রশ্নকর্ত্তা প্রফুল্ল-প্রকৃতি সদাশয় লোক। শুধুই সদাশয় নহেন; কতকটা সাদা-সিধা গোছের সাধু ব্যক্তি, এবং ছোট-বড় ও উচ্চ-নীচ, সকলের সম্পর্কেই সদ্‌গুণ-গ্রাহী। তিনি প্রশ্ন করিবার সময় এইরূপ সওয়াল জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কীর্ত্তনওয়ালীর শিষ্টালাপে ও সদুত্তরে, এবং ঐ প্রকার সুন্দর কথকতার প্রকৃতই একটুকু প্রীত হইলেন। তাহার শব্দবিন্যাসে অনুপ্রাসের ছটা দেখিয়াও আনন্দ অনুভব করিলেন। তাই এবার,

যেন একটুকু প্রীতির ভাষায়, দুই তিন বার বলিলেন,—"বটে! বটে!"

তখন কীর্ত্তনওয়ালীর কতকটা সাহস বাড়িল; কণ্ঠে দুটি বেসী কথা ফুটিল। কণ্ঠস্বরেও একটু পরিবর্ত্ত ঘটিল। কীর্ত্তনওয়ালী, বর্ষীয়সী না হইলেও, বচন-রচনা ও ব্যবহারের পরিপক্কতায়, বিজ্ঞলোকের আলাপ-যোগ্যা,—বাঙ্গালাভাষায় প্রকৃতই শিক্ষিতা। সে প্রথম বয়সে, কিছুকাল, থিয়েটারে অভিনেত্রী ছিল; এবং অভিনয়-শিক্ষার উপলক্ষে, বাঙ্গালার সমস্ত নাটক-নভেল এক প্রকার কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। ইহার পর, বুঝি শিক্ষানুরাগেই, একটি বৃদ্ধ পণ্ডিতের সহায়তায়, ব্যাকরণের কিছু কিছু পড়িয়া, সহজ-বোধ্য দুই চারি খানি সংস্কৃত পুস্তক, কতকগুলি সুখ-শ্রুত ও সুললিত শ্লোক, মহাজন-কবিদিগের সমগ্র পদাবলী, এবং বাঙ্গালার ভাল মন্দ অসংখ্য গদ্য ও পদ্য পুস্তক আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। সে এবার একটু মুচ্‌কে হাসি হাসিল; বেসী সাহস করিয়া বলিল,—

"মহাশয়, নব্যবাঙ্গালা আপনাদিগেরই সৃষ্টি। আপনারা যাহা কহেন, তাহারই নাম বাঙ্গালা; আপনারা যাহা কিছু লিখিয়া মুদ্রিত করেন, তাহারই নাম বাঙ্গালা গ্রন্থ। আমরা ত আপনাদিগের লেখা পড়িয়াই মানুষ। যখন প্রথম বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন মনে বড় ভয় ছিল। গুরু যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা একটা সম্ভ্রান্ত ভাষা; বাঙ্গালায় কিছু বলিতে কিংবা লিখিতে হইলে, উহার শব্দ-প্রয়োগে সাবধান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তার-পর, যখন আপনাদিগের মত সুযোগ্য ও সৌখীন গ্রন্থকারদিগের মুখে শুনিতে লাগিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় কোন ব্যাকরণ নাই,—বাঁধুনী নাই,—কোনরূপ পরিচিত নিয়মের শাসন নাই,—যিনি যাহা লিখিয়া প্রকাশ করিবেন, তাহাই উৎকৃষ্ট পুস্তক; এবং তাহার শিরোভাগে সুশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, কোন একটি দয়াধর্ম্মপরায়ণ পরোপকারী লোকের একখানি সার্টিফিকট সংযোজিত থাকিলেই, তাহা অপূর্ব্ব কাব্য অথবা আশ্চর্য্য সন্দর্ভ; তখন আমিও একবারে নির্ভয় হইলাম। তখন ভাবিলাম যে, এমন বেওয়ারিশী বিশৃঙ্খল ভাষায় শব্দপ্রয়োগে আর ভয় কি? সম্মানিত গ্রন্থকারেরা যখন, সমাজে থাকিয়াও, শব্দপ্রয়োগে কোনরূপ শাসন মানিতে চান না; তখন যাহারা আমাদিগের মত সমাজের বহিস্কৃত এবং সর্ব্বপ্রকার সুশাসনের বহির্ভূত, তাহাদিগের আর ভয় থাকিবে কেন?"

দুইয়ের মধ্যে কিছুক্ষণ এইরূপ আলাপ হইল। আলাপের আরম্ভ-সময়ে, কীর্ত্তনওয়ালী একটুকু থত-মত খাইয়াছিল; আলাপের অবসান-সময়ে, প্রশ্নকর্ত্তাই কিঞ্চিদংশে থত-মত খাইয়া অব্যাহতির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কেন, কুক্ষণে ঝুলনের আসরে যাইয়া, সামান্যা একটা কীর্ত্তনওয়ালীর সহিত শব্দশাস্ত্রের বিচারে

অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা মনে করিয়া ঐ একপ্রকার অবসাদে একবারে জড়সড় হইলেন; এবং আপনাকে আপনি, মনে মনে, পুনঃ পুনঃ, ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার একটি সম্ভ্রান্ত সুহৃৎ সম্মুখে ছিলেন। তিনি, রীতিমত সাহিত্যসেবী না হইলেও, সাহিত্যরসে রসিক ও সদানন্দ-স্বভাব। শব্দশাস্ত্রেও তাঁহার গাঢ় বিদ্যা আছে। তিনি বলিলেন, —"হা গা, তুমি যাহা বলিলে, তাহা একটুকু অত্যুক্তি নয় কি ?"

কীর্ত্তনওয়ালী এত আলাপের পর এখন একবারে নির্ভয়। সে বলিল,—"মহাশয়, আপনারা বড় পদস্থ বিষয়ী; আপনারা দেশের ভাষা অথবা দশের ব্যবহার, ইহার কিছুরই কোন সংবাদ রাখেন না,—সংবাদ লইতে ইচ্ছাও করেন না। সুতরাং আপনারা জানিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যোগ্য হইয়াও, প্রকৃতপ্রস্তাবে কিছুই জানেন না। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার ইদানীং অহরহঃ যেরূপ অপরূপ বিড়ম্বনা ঘটিতেছে, তাহাতে বিজ্ঞ লোকের কথা দূরে থাকুক, আমরাও লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া থাকি। বাঙ্গালা সাহিত্যে, সম্প্রতি সকলেই লেখক, সকলেই লেখিকা; এবং আপনার সাড়ে-সাত-জন অনুগতস্তাবকের কুণ্ডলী অথবা মণ্ডলী-মধ্যে, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহোদর কিংবা সহোদরা। আপনারা একটা 'রসিকিনী' শব্দ শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। ইহা আমার অদৃষ্টের ভোগ। কিন্তু এখনকার নূতন বাঙ্গালায়, নূতন আমদানীর শত শত সুরসিক ও সুরসিকিনী লেখক ও লেখিকার গুণ-গৌরবে, শুষিকিনী, মুষিকিনী, পুষিকিনী, নাশিকিনী এবং চতুরিণী ও মধুরিণী প্রভৃতি কত প্রকারের কিনী-রিণী-প্রত্যয়ান্ত অপূর্ব্ব শব্দ এবং কত নূতন নূতন পদ রুণু ঝুনু নিঃস্বনে নূপুর বাজাইয়া, নিত্য চলিয়া যাইতেছে, তাহা আপনারা শুনিতে চাহিবেন কি?"

কথা চলিতে লাগিল। কীর্ত্তনওয়ালী আবার বলিল;—"আমরা কীর্ত্তন গাইয়া থাকি; এবং সুতরাংই মহাজনদিগের পদাবলী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখি। তাঁহাদিগকে আমরা সত্যই গুরু বলিয়া মানি। তাঁহারা বলিতেন, ব্রজের গোপী, বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা লিখেন, 'ব্রজগোপিনী'। 'গোপিনীর' সঙ্গে 'হেমাঙ্গিনী,' 'শ্যামাঙ্গিনী,' 'মাতঙ্গিনী,' 'বিহঙ্গিনী,' কুরঙ্গিণী, তুরঙ্গিণী এবং আরও কত রকমের অঙ্গিনী ও রঙ্গিণী অনায়াসে তরিয়া যাইতেছে, তাহার অবধিই নাই। মহাজনকবিরা শশী ও চন্দ্রমাকে চিরকাল পুরুষবাচক শব্দ বলিয়া জানিতেন। এখনকার নব্য বাঙ্গালায় 'শশী' সকল স্থলেই সুহাসিনী; এবং যখন মেঘাবৃত, তখন অবশ্যই অবগুণ্ঠনবতী, অলস-মধুরা ও অমিয়-মধু-বর্ষিণী। চন্দ্রমার সঙ্গে সঙ্গে গরিমা, মহিমা, মধুরিমা, কালিমা, নীলিমা এবং প্রথিমা প্রভৃতি আকারান্ত শব্দ মাত্রই, আকার-গৌরবে, মনোমোহিনী। পিতা, পাতা ও পরিত্রাতা প্রভৃতি আকারান্তেরা কেন এ নিয়মের বর্জ্জিত রহিয়াছেন, তাহা আমি বলিতে পারিব না।"

যিনি সাহিত্যসেবীর সুহৃৎ রূপে, এই অসাময়িক-শাস্ত্রালাপে, যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি আপনার স্বাভাবিক অমায়িকতায়, কীর্ত্তনওয়ালীকে বড়ই আদরের বস্তু মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ত দেখিতেছি ভাল লোকের কাছে শিক্ষা পাইয়াছ এবং সকলই বোঝ ; বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহারে কেন এইরূপ বিকৃতি ও বিড়ম্বনা ঘটিতেছে, তুমি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

কীর্ত্তনওয়ালী, আবার মৃদু মৃদু হাসিয়া, পূর্ব্বের মত কর-যোড়ে সম্মুখীন হইয়া বলিল,—"আঁজ্ঞে, কথাটা বলিতে ভয় হয়, কিন্তু কথাটা সত্য; প্রকৃত কথাটা এই—আমাদিগের জাতির প্রতি আপনাদিগের বড় বেসী স্নেহ ও অনুগ্রহ ; তাই যে সকল শব্দ মেয়েদের কানে মিষ্ট লাগিতে পারে বলিয়া আপনাদিগের মনের ধারণা, আপনারা সেই সকল শব্দই বাছিয়া বাছিয়া একটুকু বেসী প্রয়োগ করিতে ভালবাসেন।" সে ইহা কহিয়া পুনরপি বলিল যে, "অল্প দিন হয় একখানি বিখ্যাত মাসিক-পত্রের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে যে, উহাতে 'নানা-বিষয়িণী প্রবন্ধ' এবং নানাবিধ 'নূতন-ছন্দোময়ী একখানি অভিনব কাব্য' প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ ও কাব্যের পরিচয়ে 'বিষয়িণী' ও 'ছন্দোময়ী' প্রভৃতি বিশেষণগুলি উপরোক্ত কথারই প্রমাণ নয় কি? প্রমাণ যদি চান, তবে এইরূপ প্রমাণ কত যে সংকলন করিয়া দিতে পারি, তাহার শেষ নাই। পুরাতন বাঙ্গালায় একটা সুন্দর শব্দ ছিল 'মহত্ত্ব', আর একটা শব্দ ছিল 'মাধুর্য্য'। সে মহত্ত্ব হইয়াছে এখন মহত্ত্বতা, মাধুর্য্য হইয়াছে মাধুর্য্যতা ; এবং ইহারই অনুকরণে 'সখ্য' হইয়াছে সখ্যতা এবং 'সৌহার্দ্দ' হইয়াছে সৌহার্দ্দতা। এ সকল পুরাতন শব্দের এরূপ নূতন মূর্ত্তি স্ত্রীপ্রত্যয়ের অনুরোধে ভিন্ন আর কার অনুরোধে? তবে চপলা মিত্র ও চরণ-চুম্বিত চিকুর-রাশি প্রভৃতি কতকগুলি নূতন প্রয়োগে ইহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু সে ব্যতিক্রমের কারণ অন্য রূপ।

যখন সাহিত্যিকদিগের সহিত সেই কীর্ত্তনওয়ালীর এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন কএকটি টিকি-তিলক-শোভিত, নামাবলী-পিহিত বৃদ্ধ-বৈষ্ণবও, সেখানে উপবিষ্ট রহিয়া, সমস্ত কথা কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের কোন ধার ধারেন না। তথাপি তাঁহারা, সমস্ত কথার এইটুকু সার-উদ্ধার করিয়া, মোটামুটি বুঝিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রসিকিনী ও চতুরিণী প্রভৃতি শব্দগুলি বড়ই মধুর ; এবং ভক্তপ্রধান বৈষ্ণব-কবিরা যখন ব্যবহার করিয়াছেন, তখন এ সকল শব্দের সহিত প্রেম-রস ও গোপীভাব-মূলক নিগূঢ় ভক্তিরসের অবশ্যই কিছু সম্পর্ক আছে। তাই, তাঁহাদিগের এক জনে একটু অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়, তর্ক-বিতর্ক যথেষ্ট হইয়াছে, এখন রাখিয়া দিন। এখানে যে সকল ভক্ত ও বৃদ্ধ বৈষ্ণব বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেই ব্রজকথার কীর্ত্তন শুনিবার জন্য উৎসুকিনী ; কেহই

আপনাদিগের অসার ও অর্থশূন্য সাহিত্য-কথায় অনুরাগিণী নহেন।

বৃদ্ধের এই আনন্দময় অনুযোগে, সমস্ত বিচার-বিতর্ক বিচিত্র একটা হো হো হাসির হিল্লোলে ভাসিয়া গেল। যাহারা কথার সাথী নহে, তাহারাও হাসিয়া অধীর হইল। কীর্ত্তনওয়ালী, অবসর বুঝিয়া, তাকিকদিগকে নমস্কার করিল; এবং 'গরবে' ফুলিয়া, গলা খুলিয়া, আবার গাইতে আরম্ভ করিল,—

"ধীরে যায় রাই গরবিণী,
শ্যাম-প্রেম-সোহাগিনী, শ্যাম-রস রসিকিনী।"

ঐ 'রসিকিনী' শব্দের পুনরাবৃত্তি শুনিয়া প্রশ্নকর্ত্তা সাহিত্যিক, ঈশ্বর গুপ্তের একটি কবিতা আওড়াইয়া, অস্ফুট স্বরে কহিতে লাগিলেন,——

"রাম বল বাঁচিলাম, ঘাম এল গায়,
লক্ষ্মীছাড়া কথাটার হ'য়ে গেল সায়।"

আপদ চুকিল, রক্ষা পাইলাম;—এমন রসিকিনীর সহিত আর যেন কোথায়ও সাক্ষাৎ না হয়।"

কথাটা যখন, পাঁচ জনের মুখে মুখে, পরিবর্ত্তিত, পরিশোধিত ও কুত্রচিৎ পল্লবিত হইয়া, উহার পঞ্চম সংস্করণে, আমার কাছে আসিয়া পঁহুছিল, তখন আমিও বলিলাম—"তথাস্তু; এমন বচন-চতুরিণী, মুখর-মধুরিণী রসিকিনীর সহিত সাক্ষাৎকার না হওয়াই ভাল।" * শ্রী গ—চ—কঃ

# ছায়া-দর্শন।

## চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

উপক্রম।

আমরা ছায়াদর্শন-সন্দর্ভের উপক্রমে, পাঠককে ক্রমান্বয়ে, অনেক কথা বলিয়া আসিতেছি; এবং পারলৌকিক-তত্ত্বের সারার্থ যাহা কিছু বুঝিয়াছি, তাহা অতি সহজ-বোধ্য প্রণালীতে বুঝাইবার জন্য যত্ন পাইয়াছি। কিন্তু আমাদিগের পরিশ্রম, এ অংশে, কত দূর সফল হইতেছে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

বঙ্গীয় পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই ছায়া-দর্শনের অন্তর্গত আত্মিক-কাহিনী পড়িবার জন্য একান্ত উৎসুক। এ কথা আমরা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, অনেক সুবিজ্ঞ পাঠকের মুখে শুনিয়া জ্ঞাত হইয়াছি; এবং অনেকের পত্র পাঠেও এইরূপ আন্তরিক ঔৎসুক্যের পরিচয় পাইয়াছি।

এইক্ষণ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, আত্মিক-কাহিনী সম্বন্ধে সকলেরই এ ঔৎসুক্য

* কীর্ত্তনওয়ালীর এ কাহিনী প্রকৃত আলাপ-ঘটিত-কথা। শ্রী প্রবন্ধলেখক।

কেন? কাহিনীগুলি উপন্যাসের মত হর্ষ-বিষাদ, বিস্ময় ও ভয় প্রভৃতি বিবিধ ভাবের স্ফূর্ত্তি-জনন-কথায় গ্রথিত থাকে বলিয়াই কি এত লোকের এই প্রকার ঔৎসুক্য? কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত,—অথবা যাঁহারা নিজ নিজ উদারতায়, আমাদিগকে সত্যের অন্বেষণ ও তত্ত্ব-সমালোচনে শ্রম-সহিষ্ণু বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা মানিয়া লইবেন যে, আমরা আজি পর্য্যন্ত ছায়াদর্শনের কোন একটি কাহিনীকেও, ঔপন্যাসিক-কাহিনী জ্ঞানে, তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত করি নাই।

ছায়াদর্শন-সংক্রান্ত সাহিত্য, ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের অসংখ্য পণ্ডিতের অক্লান্ত পরিশ্রমে, ইদানীং একটা সমুদ্রের মত বিশাল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; এবং ইহার মৌলিক সত্য, তত্ত্ব-বিদ্যার কত শাখায় বিভক্ত হইয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কত পুরাতন ও ভ্রমমূলক সিদ্ধান্তকে পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহারা নিতান্তই বালকের ন্যায় চপল-বুদ্ধি, তাঁহাদিগের কাছে ছায়াদর্শনের সকল কথাই ভূত-প্রেতের ভয়াবহ কথা। ইহার অধিক আর কি সম্ভবে? কিন্তু চিন্তাক্ষম বৈজ্ঞানিকেরা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, এ প্রসঙ্গের সমস্ত কথাই, প্রকারতঃ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম-কথা। কেন না, পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একটি বালুকণাও যদি, জড়-জগতের পরিজ্ঞাত শক্তি ভিন্ন, কোন একটি অজ্ঞাতশক্তির অভিনব-প্রয়োগে, অবনীর পৃষ্ঠ হইতে একটুকু উর্দ্ধে নীত, অথবা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে চালিত, হইতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মাধ্যাকর্ষণের শক্তি হইতেও উচ্চতর শক্তি এ জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং সে শক্তি এবং তৎসংক্রান্ত-নিয়মের সহিত মনুষ্যজীবনের বিশেষ সম্পর্ক আছে। *

আমরা আজি পাঠকের নিকট যে কাহিনীটি লইয়া উপস্থিত হইতেছি, তাহার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিতে পাইবেন যে, মনুষ্যের আত্মা, লোকান্তরে যাইয়া, অধ্যাত্ম-জীবনের উপযোগি উচ্চতর শক্তি উপার্জ্জন করিলে, উহা জড়-জগতের জল-বায়ু প্রভৃতি সমস্ত বস্তু লইয়াই আপনার ইচ্ছানুসারে খেলা করিতে পারে; এবং মনুষ্যের হৃদয় ও মনের উপরও উহা নানা প্রকারে ক্রিয়া করিবার জন্য নূতন সুযোগ লাভ করিয়া থাকে।

এদেশে এলো-ভুলো নামে একটা শব্দ আছে। মানুষ যাইতে চায় উত্তরে, এলো-ভুলো তাহাকে লইয়া যায় দক্ষিণে। সে পত্র লিখিতে ইচ্ছা করে যাদবের নিকট, এলো-ভুলো, তাহার মনের উপর এক অপূর্ব্ব ক্রিয়া করিয়া, তাহার দ্বারা পত্র লিখায় মাধবের

* এ কথাটি আমাদিগের সামান্য-চিন্তা-প্রসূত নহে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ( Minot Savage ) মিনট স্যাভেজ, স্বপ্রণীত—(Psychics: Facts and Theories—নামক গ্রন্থে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন।

নিকট। আমরা এতকাল যাহাকে এলো-ভুলো বলিয়া জানিতাম, এখন ছায়াদর্শন পড়িয়া বুঝিতেছি যে, উহার আগা-গোড়া সমস্তই আত্মিক-শক্তির ক্রিয়া। সে ক্রিয়া কখনও প্রগাঢ় প্রীতি-স্নেহমূলক, কখনও বা অপ্রীতির পরিচায়ক। কিন্তু উহার সহিত আত্মিক-শক্তির অভাবনীয় ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুরই সম্বন্ধ নাই।

আমরা আজি পাঠকের নিকট যে কাহিনীটি লইয়া উপস্থিত হইতেছি, তাহারও আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই এলোভুলোর ক্রিয়া আছে; আর আছে, অচলা, উচ্ছলা, স্নেহের আবেগ-বিহ্বলা, অমিয়শীতলা পিতৃবৎসলতার ক্রিয়া।

কাহিনীর নিঃসংশয়-সত্যতা সম্পর্কে, আমরা পাঠককে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইংলণ্ডের সাহিত্যগুরু চার্লস্ ডিকেন্স্ (Charles Dickens) এবং বহুশাস্ত্র-বিশারদ বিখ্যাত চিত্রগুরু (Heaphy) হিফি ও তাঁহাদিগের অসংখ্য সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ইহার প্রামাণিকতার জন্য মনুষ্যজগতের নিকট দায়ী।

এ কাহিনী লইয়া লণ্ডনে কিছু কাল ভয়ানক আলোচনা হইয়াছিল। হইবার কথাও বটে। কেন না, এমন বিস্ময়াবহ কাহিনীতে মনুষ্য সহজে বিশ্বাস করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, বহুলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ ও বহুপ্রকার প্রমাণ আলোচনা দ্বারা, ইহার সকল কথাই বিশ্বাস করিয়া লইয়াছিলেন; এবং সাময়িক সাহিত্য-পত্রে ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের একাধিক সন্দর্ভ-পত্রেও ইহার প্রসঙ্গ লইয়া বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলেন।

আমরা যে ইংরেজি গ্রন্থ হইতে এই আশ্চর্য্য কাহিনীর সার-অংশ সংকলন করিলাম, তাহাতে ডিকেন্স্ ও হিফির কএকখানি পত্র আছে। * সে সকল পত্র মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, কাহারও মনেই কোনরূপ সংশয় থাকিতে পারে না;—আর, এরূপ কাহিনী সত্য হইলে, পারলৌকিক-জীবন যে পার্থিবজীবনের ন্যায়, সুখ-দুখ-শিক্ষাময় ক্রমোন্নতিশীল প্রকৃত জীবন, এবং পৃথিবীর ভালবাসাও যে, পরলোকের পুণ্যময় ধামে যাইয়া, সাগরাভিসারিণী ভাগীরথীর ন্যায়, শতগুণ বেশী সংবর্দ্ধিত হয় ও শতমুখে ছড়াইয়া পড়ে, সে বিষয়েও মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকে না।

## আত্মিক কাহিনী।

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় চিত্রবিদ্যার অপরিসীম আদর। ভারতেও, এক সময়ে, উহার প্রায় এমনই প্রশংসা ও আদর ছিল। কিন্তু ভারতের আজি দুঃখের দিন;—এখন আর এ দুঃখ-দগ্ধ ভারতে গুণের সে গৌরব

* "It only remains to add that no one has for a moment stood between us and Mr. H. in this matter. The whole communication is at first hand." Charles Dickens.

"I am the Mr. H., the living man, of whom mention is made. * * * I have it by me, written by myself, and here it is." Thomas Heaphy.

নাই ; গুণিজনের প্রাণেও স্ফূর্ত্তি কিংবা উৎসাহ নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায়, বড় চিত্রকর, ভদ্রসমাজে অন্ত প্রকারেও, বড় লোক ও সম্মানার্হ। প্রসিদ্ধ চিত্রকরদিগের প্রায় সকলেই, সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত ও সর্ব্বথা-সম্মানিত সামাজিক। কেহ কেহ, বর্ণ-তুলিকায় যেমন সিদ্ধহস্ত চিত্রকর, বর্ণন-তুলিকায়ও আবার তেমনই সুনিপুণ কবি।

ইংলণ্ডের হিফি ( Thomas. Heaphy ) এই শ্রেণীর একজন বড় চিত্রকর-কবি অথবা কবি-চিত্রকর ছিলেন। তিনি কোনরূপ রীতিসঙ্গত গদ্যকাব্য কিংবা পদ্যকাব্য গ্রন্থবদ্ধ অবস্থায় প্রকাশ করিয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার লিখিত পত্র ও প্রবন্ধাদি যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা পড়িয়া সকলেই তাঁহাকে সুকবি মনে করে। ফল-কথা হৃদয়ে কতকটা কবিত্ব না থাকিলে, কেহই চিত্রবিদ্যায় মৌলিক নৈপুণ্য লাভ করে না। কারণ, চিত্রপট মাত্রই এক এক খানি চিত্তহারি নীরব-কাব্য।

মে মাস,—গ্রীষ্মকাল। একদা প্রাতঃসময়ে, চিত্রকর হিফি, লণ্ডন নগরে, আপনার চিত্রশালায় বসিয়া, নিবিষ্টমনে কার্য্য করিতেছেন। এই সময়ে একটি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা, দর্শনার্থী রূপে, তাঁহার সম্মুখে সসম্ভ্রমে সমানীত হইলেন। ভদ্রলোকের নাম ( Mr. Kirkbeck ) মিষ্টার কার্কবেক ; মহিলা তাঁহার পত্নী। কার্কবেক-দম্পতি হিফির নিকট পরিচিত নহেন।

প্রথম-সম্ভাষণ ও আলাপ-পরিচয়ের পরে, হিফি জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুকেরা হিফির চিত্রিত একখানি ছবি দেখিয়া, যার-পর-নাই প্রীত ও মোহিত হইয়া, ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। হিফির দ্বারা, তাঁহাদিগের একখানি আলেখ্য চিত্রিত করাইয়া লওয়া, তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে, হিফির উপদেশ অনুসারে, চিত্রশালা-স্থিত বিভিন্ন আয়তনের কএকখানি ছবি যাঁচাই করিয়া দেখিয়া, কত বড় ও কি রকমের ছবি তাঁহাদিগের মনোমত হইবে, তাহা স্থির করিয়া লইলেন।

ইহার পর, চিত্রকার্য্যের পারিশ্রমিকাদিও অবধারিত হইল। হিফি, পরবর্ত্তী শরতে, আগন্তুকদিগের গ্রাম-নিবাসে যাইয়া, প্রস্তাবিত চিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। আগন্তুক-দম্পতি, হিফির কাছে আপনাদিগের নামের কার্ড রাখিয়া, প্রীতমনে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে, হিফি, হাতের কাজ সারিয়া, কার্ডখানি পাঠ করিলেন। দেখিলেন, উহাতে নাম আছে, ঠিকানাটি লিখিত হয় নাই। তিনি, ঠিকানাটি ঠিক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত, কোর্ট-গাইড নামক পুস্তক ভাল করিয়া খুঁজিলেন। কিন্তু উহার কোথাও 'কার্কবেক' নাম দেখিতে পাইলেন না। অতএব একটু বিরক্তির সহিত সেই অকর্ম্মণ্য কার্ড টাকে তাঁহার রাইটিং ডেস্কে ফেলিয়া রাখিলেন, এবং কার্কবেক-ঘটিত সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে, ইংলণ্ডে শরতের সমাগম হইল। হিকি, চিত্রকর্ম্মের কতিপয় নিয়োগ রক্ষার্থ, ইংলণ্ডের উত্তর-প্রদেশে গমন করিলেন। সেপ্টেম্বর মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এক দিন তিনি ( York) ইয়র্ক ও ( Lincoln shire ) লিঙ্কলন শায়রের প্রান্তবর্ত্তী একটি গ্রাম-গৃহে এক ভোজে আহূত হইলেন। ভোজ-ভবনে বহু নিমন্ত্রিতের সমাগম হইল। ভোজন-ব্যাপার শেষ হইয়া আসিলে, নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে, নানা প্রসঙ্গে, সাধারণভাবে গল্প আমোদ চলিল।

হিকির শ্রুতি একটু দুর্ব্বল। এক এক সময়, এই দুর্ব্বলতা এতদূর বাড়িয়া পড়িত যে, তিনি তখন কানে বড়ই কম শুনিতেন। দৈবাৎ ঐ দিন তাঁহার শ্রুতি ঐরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল। কে, কোন্ দিকে, কোন্ প্রসঙ্গে কি কথা কহিতেছেন, তিনি তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। চারিদিক্ হইতে কেবল শৃঙ্খলাশূন্য, অস্পষ্ট শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে।

এই শব্দস্রোতের মধ্যে হঠাৎ 'কার্কবেক' এই নামটি হিকির কর্ণে ধ্বনিত হইল। একটু দূরে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তি, কোন কথা প্রসঙ্গে, কার্কবেকের নাম করিয়াছিলেন। নাম শুনিবামাত্র কার্কবেক-কৃত চুক্তি-সংক্রান্ত সমস্ত কথা হিকির মনে পড়িল। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল, কার্কবেক নামে কোন ভদ্রলোক এই অঞ্চলে বাস করেন কি ?" উত্তর হইল,—ইয়র্কশায়রের প্রান্তস্থিত এক ক্ষুদ্র গ্রামে মিষ্টার কার্কবেকের বাস-ভবন ওখানে সকলেরই সুপরিচিত।

হিকি, পরদিন, ঐ ক্ষুদ্র গ্রামের ঠিকানায়, কার্কবেকের নামে একখানি চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। তিন দিন পরে, উত্তর আসিল। এই কার্কবেকই সেই কার্কবেক। ইনিই সস্ত্রীক তাঁহার চিত্রশালায় উপস্থিত হইয়া চিত্রকার্য্যের জন্য চুক্তি করিয়াছিলেন।

কার্কবেকের পত্র সৌজন্যে পরিপূর্ণ। তিনি বিশেষ প্রীতি ও আগ্রহের সহিত হিকিকে আহ্বান করিলেন। স্থির হইল, হিকি পরবর্ত্তী শনিবার, কার্কবেকের গৃহে গমন করিবেন। রবিবার সেই স্থানে অবস্থান করিয়া, সোমবার প্রাতে, কোন অপরিহার্য্য প্রয়োজনে, লণ্ডনে চলিয়া যাইবেন ; এবং এক পক্ষ পরে, পুনরায় কার্কবেকের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, চুক্তির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন।

এই বন্দোবস্ত অনুসারেই কার্য্য হইল। শনিবার, প্রাতরাশের পরে, হিকি কার্কবেকের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রাতঃকালে ইয়র্ক হইতে লণ্ডনে যে ট্রেণ যায়, হিকি সেই ট্রেণে উঠিলেন। এই ট্রেণ ডন্কাষ্টারে ( Doncaster ) কিছুক্ষণ থাকিয়া রেটফোর্ড ( Retford ) জংশনে যাইয়া থামিবে। এই জংশনে, লণ্ডন ট্রেণ-হইতে অবতরণ করিয়া, কার্কবেকের বাস-গ্রামে পঁহুছিবার নিমিত্ত, হিকিকে লিঙ্কন-লাইনের স্বতন্ত্র ট্রেণে আরোহণ করিতে হইবে।

আমাদিগের দেশে অগ্রহায়ণ ও ইংলণ্ডে

অক্টোবর, প্রাকৃতিক অবস্থায়, প্রায় এক-রূপ। এ দেশে, অগ্রহায়ণ মাসে, মেঘ বৃষ্টি থাকে না। আকাশ পরিষ্কার। পথ ঘাট শুষ্ক। যাতায়াতে বড়ই সুবিধা। ইংলণ্ডেও অক্টোবর মাসে এইরূপই হইয়া থাকে। হিফি যে দিন কার্কবেক-গৃহে যাত্রা করিলেন, অক্টোবর মাস হইলেও, সে দিন টা বড়ই কদর্য্য ছিল।

ইংলণ্ডে, অক্টোবার মাসে, এরূপ কুৎসিত কুদিন প্রায়শঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্দ্দিক্ গাঢ় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। নিকটের বস্তুও ভাল করিয়া দেখা যায় না। সুতীব্র শীতল-বাতাস শন্ শন্ রবে বহিতেছে। ঝুর্ ঝুর্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। সূর্য্য অদৃশ্য। এরূপ দিনে যাতায়াত সুবিধা-জনক নহে।

হিফির মত উচ্চশ্রেণীস্থ ভদ্রলোকেরা প্রথম-শ্রেণীর গাড়ীতেই যাতায়াত করেন। হিফি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর এক কামরায় উঠিয়া বসিলেন। ঐ কামরায় আর কেহই ছিল না। যথা সময় হইয়া আসিল, তখন ট্রেণ ছাড়িল, এবং কিছুক্ষণ পরে ডন্কাষ্টার-ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। এই ষ্টেশনে একটি অবগুণ্ঠনবতী পুরমহিলা, হিফি যে কামরায় উপবিষ্ট ছিলেন, ধীরে ধীরে সেই কামরায় প্রবেশ করিলেন। হিফি ইঞ্জিনের পশ্চাদ্ভাগে দরোজার সম্মুখস্থিত আসনে বসিয়াছিলেন। উহাই মহিলাদিগের-জন্য-নির্দ্দিষ্ট, সম্মান ও সুবিধার আসন। রমণী গাড়ীতে উঠিলেই, হিফি আপনার আসন ছাড়িয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। শিক্ষিত ও শিষ্টস্বভাব সুজনেরা সর্ব্বত্রই অসহায়া পুরমহিলার প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রদর্শনে আনন্দ অনুভব করেন।

হিফি অপরিচিতা পুর-সুন্দরীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন; এবং তাঁহাকে নিজের বসিবার স্থানে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিয়া,একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন; এবং যার-পর-নাই বিনীত ভাবে, বিপরীত দিকে, গাড়ীর এক কোণে, আপনার আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। কহিলেন,—"আপনি বসুন। আমি এই কোণেই আরামে থাকিব। এখানে বসিলে, বাহিরের শীতল বাতাসটুকু আমার গণ্ডে লাগিবে। উহা আমার পক্ষে আজি বড়ই প্রীতিকর।"

অপরিচিতা কথা কহিলেন। সে মৃদু-মধুর ললিত-কণ্ঠ হিফির কর্ণে কি যেন অশ্রুতপূর্ব্ব অমৃত ঢালিয়া দিল। কথা, স্বর-মাধুরীতে, হিফির প্রাণে যাইয়া স্পৃষ্ট হইল। তিনি বিস্মিত ও প্রীত-মনে, অপরিচিতার আনুক্রমিক কার্য্যপরম্পরা বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন।

ভালরূপে, গুছাইয়া বসিতে কএক মিনিট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। অপরিচিতা প্রথমতঃ তাঁহার প্রসর-দোলায়িত বিস্তৃত পরিচ্ছদ,—বিশেষতঃ গাউনের প্রান্তভাগ, বেস করিয়া সম্বরিয়া লইলেন। তার পর, গায়ের জামাটি নীচের দিকে টানিয়া দিলেন। অবশেষে হাতের দস্তানা একটু আটিয়া

বাঁধিলেন। আরামে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে, স্ত্রীলোকেরা, পক্ষিণীর পাখা গুটাইবার মত, যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, রমণী সেই সমস্ত কর্ম্ম, বিশেষ মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিয়া, আসন পরিগ্রহ করিলেন। মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত। এ অবগুণ্ঠন, অবশ্যই, বঙ্গের ঘোমটা নহে, —ইউরোপীয় মহিলার সূক্ষ্ম আবরণী। যদিও রমণীর মুখ-প্রভা, এই আবরণ ভেদ করিয়া, অল্প অল্প ফুটিয়া পড়িতেছিল, তথাপি হিফি, তাঁহার আকৃতি সম্বন্ধে, তখনও কোনরূপ সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন না।

রমণী, স্থির হইয়া বসিয়া, মুখের সূক্ষ্ম আবরণীটি টুপির পশ্চাৎ দিকে উঠাইয়া রাখিলেন। জ্যোৎস্নার ললাট হইতে, সহসা যেন, কুয়াসার ছায়া সরিয়া গেল। হিফি দেখিলেন, —অপরিচিতা জগন্মোহিনী সুন্দরী ও ফুটন্ত ।তী। বয়স বাইশ কি তেইশ বৎসরের বেসী নহে। কিন্তু তাঁহার অনতিদীর্ঘ দেহ, এবং সুগঠিত অবয়বের সুগোল ও সুকোমল গঠনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মনে লয়, বয়স বুঝি বা উহা অপেক্ষাও দুই তিন বৎসর কম হইবে। বর্ণ তুষারের মত শ্বেতও নহে, প্রস্ফুট পদ্মের মত রক্তিমাভও নহে,—এ দুইএর মাঝামাঝি। আবর্জ্জিত কেশ-রাশি মসৃণ, মনোহর ও উজ্জ্বল। ঢল-ঢল নয়ন-তারা ও সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল কৃষ্ণাভ। গণ্ড-দ্বয়, ঈষৎ-পাণ্ডুর হইলেও, স্বাস্থ্যের প্রফুল্ল জ্যোতিতে সুখ-দর্শন। দৃষ্টি সরল, সুমধুর, সততই যেন প্রীতির অমিয়-মাখা,—অথচ এমনই পবিত্র ও উদার যে, সে যুবতীকে কেহই মা কিংবা মেয়ে ভিন্ন অন্য কোন ভাবে মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিতে সাহস পায় না। প্রস্ফুট ও প্রসন্ন অধর-প্রান্তে দেবতার মত দৃঢ়তার ভাব সুস্পষ্ট অঙ্কিত।

হিফি, শিষ্টতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, যতটুকু পারা যায়, চিত্রকরের সূক্ষ্মদর্শি নয়নে, এই অপরিচিতা কুলকামিনীর কমনীয় কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন। রমণীর আকৃতি ও মুখচ্ছবিতে, অবয়বে অবয়বে, গঠনের তেমন সামঞ্জস্য ও শোভার তেমন চমক না থাকিলেও, কি যেন একটা অপরূপ মহিমা, অথবা কেমন যেন একটু মাধুরীর সুখ-প্রীতিকর বিচিত্র ভাব এমন নিহিত রহিয়াছে যে, দর্শনমাত্রই দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। অথচ সে আকর্ষণে, দ্রষ্টার মনে অতি অপূর্ব্ব একটা স্নেহমিশ্রিত ভক্তি আপনা হইতে উছলিয়া উঠে।

হিফি রমণীর দেব-জন-স্পৃহণীয় প্রশান্ত রূপরাশি-দর্শনে মোহিত হইলেন। তিনি বৃদ্ধ না হইলেও পরিণত-বয়স্ক। তিনি মনে করিলেন, যিনি তাঁহার কাছে বসিয়াছেন, তিনি যেন কত কালের পরিচিত আপনার জন। হিফি, কালি-কলমে এই রমণীর রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া, ইঁহাকে রূপের পুরাতন শাস্ত্রসম্মত-প্রসিদ্ধি অনুসারে নিখুঁত রূপসী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই; কিন্তু অপূর্ব্ব ও অপরূপ লাবণ্যময়ী বলিয়া সম্মান করিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিফি অতি বড় প্রসিদ্ধ

চিত্রকর। বহু রূপসী রমণী, বহু সময়ে, সাধ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূতা হইয়াছেন। কিন্তু কাহারও রূপ-রাশিতেই লাবণ্যের এমন প্রাণ-শীতল মাধুরী, ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও, তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে কি না, ইহা সন্দেহের বিষয়।

হিফি মনে মনে কহিলেন,—মা, তুমি কে? রমণীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিল; কিন্তু ভদ্র-রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া,পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না। হিফি চিত্রকরের তুলিকায় রমণীর যেরূপ মূর্ত্তিই অঙ্কিত করিয়া থাকুন না কেন, আমরা এই প্রবন্ধে, তাঁহার রেলওয়ে-সঙ্গিনীকে অপরিচিতা-সুন্দরী নামেই নির্দ্দেশ করিব।

হিফি সে অপরিচিতা সুন্দরীর শিশুভাবাপন্ন সুন্দর ও সরল মুখখানির পানে যতই স্থির নয়নে তাকাইলেন, ততই যেন তিনি, তাঁহার প্রাণে, অতি গভীর ও অকৃত্রিম বাৎসল্যের স্ফুরণে,প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি, জানিলেন না, বুঝিলেন না; অথচ তাঁহার মনটা যেন আপনা আপনি এই অপরিচিতার প্রতি একটু পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। তিনি অপরিচিতাকে মনে মনে কন্যার আসন প্রদান করিলেন। শিষ্টাচার-শুষ্ক ইংলণ্ডীয়-বৃদ্ধের হৃদয়ে স্নেহের এইরূপ আকস্মিক বিকাশ সাধারণতঃ অতি বিরল।

আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন। আজি বড়ই দুর্দ্দিন। সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ। একাকী চুপ করিয়া রেলের গাড়ীতে সমস্ত দিন বসিয়া থাকা, হিফির নিকট বড়ই ক্লেশকর বোধ হইতেছিল। এ অবস্থায়, এই পবিত্রমূর্ত্তি পুর-সুন্দরীর সাক্ষাৎকার ও সাহচর্য্য লাভে, হিফি বস্তুতই বড় প্রীত ও সুখী হইলেন।

সুন্দরীর সহিত হিফির নানাপ্রসঙ্গে আলাপ হইতে লাগিল। এখন আর পথের সেই নীরব-নীরসতা এক বারেই রহিল না। হিফি, অল্পক্ষণের আলাপেই বুঝিতে পাইলেন, সুন্দরী বয়সে নবীনা হইলেও আলাপে প্রবীণার ন্যায় অভিজ্ঞা। তাঁহার আলাপের একটি উক্তিও অনর্থক বা অসার নহে। অথচ উহাতে বেস একটু সজীবতা ও বিশেষ একটু মাধুরী পরিস্ফুট ছিল।

হিফির সহিত পরিচয় নাই। সুন্দরী তথাপি বিন্দুমাত্র শঙ্কিতা কিংবা সঙ্কুচিতা নহেন। কন্যা পিতার কাছে যেরূপ মনের সরল বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকে, সুন্দরীও সেইরূপ হিফির নিকটে নিঃশঙ্কচিত্তে উপবিষ্ট রহিলেন। কথায় বার্ত্তায় ধৃষ্টতার লেশ-মাত্রও অনুভূত হইতেছে না। বিনয় ও নম্রতাই যেন সুন্দরীর স্বভাবসিদ্ধ ভূষণ, শীলতা ও সলজ্জ-শিষ্টতাই যেন তাঁহার প্রিয় আবরণ।

কিছুক্ষণ আলাপের পর, হিফির এই ধারণা হইল যে, সুন্দরী তাঁহার অপরিচিত বটে; কিন্তু তিনি নামতঃই হউক, অথবা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপেই হউক, সুন্দরীর নিকট, পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত। হিফি যে সকল তত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ও অনুরাগী, সুন্দরী বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল প্রসঙ্গেই

আলাপ করিতে লাগিলেন। হিফি তাঁহার সুদূর-বিস্মৃত অতীত-জীবনে যে সকল কার্য্যে সংলিপ্ত ছিলেন, সুন্দরী কথায় কথায় তাহারও দুই একটির কথা উল্লেখ করিয়া বসিলেন। হিফি, ইহাতে যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন, এবং মনে মনে আবারও এই প্রশ্ন করিলেন,—বাছা তুমি কে? তুমি ত দেখিতেছি আমায় ভালরূপ চেন!

কএক ঘণ্টা পরে, ট্রেণ রেট্‌ফোর্ড ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিল। হিফিকে এখন লণ্ডন-ট্রেণ ছাড়িয়া অন্য ট্রেণে উঠিতে হইবে। তিনি সুন্দরীর নিকট বিদায় লইবার উদ্যোগ করিলেন। সুন্দরী সসম্ভ্রমে আপনার কুসুম-কোমল হাতখানি বাড়াইয়া দিলে, হিফি স্নেহের সহিত সেই করস্পর্শ করিয়া বিদায় লইলেন। সুন্দরী বলিলেন,—"আমি নিশ্চিত বলিতেছি, আপনার সহিত আমার অতি-শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎকার ঘটিবে।" হিফি একটু গভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"হাঁ তা ঠিক কথা। আমরা সকলেই এক পথের পথিক,—একদিন নিশ্চয়ই একত্র এক স্থানে যাইয়া মিলিত হইব।" এইরূপ বিদায়-সম্ভাষার পর সুন্দরী লণ্ডন-ট্রেণে লণ্ডন-অভিমুখে এবং হিফি লিঙ্কন-ট্রেণে কার্কবেকের গ্রাম-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সেদিনকার সেই কুয়াসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনে, অবশিষ্ট পথটা হিফির নিকট যার-পর-নাই দীর্ঘ হইয়া পড়িল। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর সেই সজ্জিত কামরাটিও যেন তাঁহার কাছে, কারাগৃহের ন্যায়, ক্লেশজনক হইয়া উঠিল। সঙ্গে একখানি পুস্তক ছিল, কিছুক্ষণ তাহাই পাঠ করিলেন। রেট্‌ফোর্ড ষ্টেশন হইতে একখানি টাইম্‌স্ (Times) পত্রিকা কিনিয়া লইয়াছিলেন; কিছু সময় সেই পত্রিকা লইয়া কাটাইলেন। অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটার সময়, ট্রেণ গন্তব্য ষ্টেশনে যাইয়া পঁহুছিল।

হিফি ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন। দেখিলেন, ষ্টেশনে তাঁহার জন্য একখানি বড় দরের ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। কার্কবেক, কোন বিশেষ ঠেকা প্রয়োজনে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। তাঁহারও ঐ ট্রেণেই ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আইসেন নাই। সম্ভবতঃ, আর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, ইহার পরের ট্রেণে, তিনি আসিতেছেন। এই সিদ্ধান্ত স্থির হওয়ার পর, শুধু হিফিকে লইয়াই গাড়ীখানি কার্কবেকের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

গাড়ী যখন কার্কবেকের বাটীতে পঁহুছিল, তখন কার্কবেক্-পরিবারের কেহই বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না। কার্কবেকের লোক জনেরা হিফিকে অত্যধিক সম্মান ও আদর সহকারে, তাঁহার অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া গেল। হিফি আপনার জিনিষপত্র সিজিল করাইয়া রাখিলেন; এবং এই অবসরে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন।

ভোজনের সময় সাতটা। সাতটার এখনও একটু বিলম্ব আছে। হিফি নিম্নতল-স্থিত স্যালন অর্থাৎ বৈঠকখানা ঘরে নামিয়া আসিলেন। ঘরে তখনও বাতি জ্বালান হয়

নাই। অদ্য কেহই সূর্য্যের মুখ দেখে নাই। আজ বড় শীত। শীত-নিবারণার্থ বৈঠকখানা ঘরে, ইয়ুরোপীয় পদ্ধতিতে “গার্হপত্য” অনল প্রজ্বলিত রহিয়াছে। সায়াহ্নকাল। বাহিরে অন্ধকার না হইয়া থাকিলেও, ঘরের ভিতরে অন্ধকার ঠাঁই লইয়াছে। কিন্তু জ্বলন্ত অনলে, অন্ততঃ সেখানকার, আলোর অভাব দূর হইতে ছিল। সমস্ত ঘর গার্হস্থ্য অনল-জ্যোতিতে আলোকিত। হিফি সেই আলোকে দেখিতে পাইলেন,—গাঢ় কৃষ্ণ কমনীয় পরিচ্ছদে সজ্জিতা একটি রমণী, অনল-কুণ্ডের বেষ্টনীর উপর আপনার গোলাপী রঙের রাঙা টুক্‌টুকে পা দুখানি যত্নে রাখিয়া, পায়ে অগ্নির উত্তাপ লাগাইতেছেন।

হিফি যে দরোজা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, রমণী সেই দরোজার দিকে পিছ দিয়া বসিয়াছিলেন। সুতরাং, হিফি প্রথমতঃ তাঁহার চেহারা দেখিতে পান নাই। কিন্তু তিনি কোঠার মধ্যদেশে উপস্থিত হইলেই, রমণী পাদুখানি সরাইয়া লইয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। হিফি দেখিয়া চিনিতে পাইলেন। এ রমণী আর কেহ নহেন,—তাঁহার রেলওয়ে-সঙ্গিনী সেই অপরিচিতা সুন্দরী! হিফি দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু সুন্দরীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন-মাত্রও লক্ষিত হইল না। সুন্দরী, সরল-স্বভাব-সুলভ প্রীতিপ্রফুল্লমুখে, হিফির পানে তাকাইয়া, মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“আমি ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, সত্বরেই আবার দেখা হইবে।”

হিফির মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। রমণী কোন্ পথে, কোন্ ট্রেণে, কেমন করিয়া এত দ্রুত ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, হিফি কোন ক্রমেই তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। হিফি ত ইহাঁকে লণ্ডন-ট্রেণে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইনি গাড়ীতে উপবিষ্টা ছিলেন, এবং ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল; ইহা ত হিফি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ঐ ট্রেণে পিটারবর্গে পহুঁচিয়া, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া, অন্য এক শাখাপথে এই গ্রামে আসা যায় সত্য। কিন্তু সে ত নব্বই মাইলের পথ। রমণী কিরূপে নব্বই মাইল-পথ নিমিষের মধ্যে অতিক্রম করিলেন, চিত্র-গুরু হিফি ইহা ভাবিয়া ক্ষণ কাল চিত্রার্পিত-বৎ চাহিয়া রহিলেন। তৎপর, যেন বলিবার আর কোন কথা নাই বলিয়া, বলিলেন,—“আমিও কেন তবে আপনার এই অপরি-জ্ঞাত সোজা পথে এখানে আসিলাম না!” রমণী একটু হাসিয়া হাসিয়া উত্তর করি-লেন;—“সে পথে যাতায়াত খুবই সোজা কথা নহে।”

এই সময়ে, আলোক হাতে লইয়া, একটি পরিচারক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। পরি-চারক উপযুক্ত স্থানে আলোক রাখিয়া কহিল;—“গৃহস্বামী কার্কবেক আসিয়া পহুঁ-চিয়াছেন। তিনি এখনই এখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।”

ভৃত্য চলিয়া গেলে, রমণী এক খানি পুস্তক বাহির করিলেন। ঐ পুস্তকে কএক খানি খোদিত মূর্ত্তি ছিল। রমণী, ঐ সকল

মূর্ত্তি হইতে বাছিয়া, একখানি উঠাইলেন; এবং হিফিকে উহা দেখিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,—"দেখুন দেখি, মহাশয়, এই মূর্ত্তিখানির সহিত আমার আকৃতির কোনরূপ সাদৃশ্য আছে কি না। একটু ভাল করিয়া দেখুন।"

হিফি মূর্ত্তিখানি হাতে লইয়া মনোযোগের সহিত দেখিতেছেন, এমন সময়ে, কার্কবেক ও তাঁহার গৃহিণী ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে, পরস্পর-অভ্যর্থনার আনন্দ উথলিল। সুতরাং, হিফি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশের অবকাশ পাইলেন না। কার্কবেক হিফির সহিত করাশ্লেষ করিয়া সাদরসম্ভাষণ জানাইলেন; এবং হিফির আগমন সময়ে, তিনি গৃহে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া বড়ই লজ্জিত ও দুঃখিত আছেন, এই বলিয়া বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে, কোন পুরমহিলা যখন বিশিষ্ট কোন পুরুষের সহিত কোথাও গমন করেন, তখন সে পুরুষের বাহুর উপর বাহু স্থাপন করিয়া যাওয়াই শিষ্টসম্মত ভদ্রনীতি। এই রীতিরক্ষার্থে, কোন পুরুষ অগ্রবর্ত্তী না হইলে, সম্ভ্রান্ত মহিলা, ইহা নিতান্তই অসম্মানজনক মনে করেন, এবং দুঃখিতচিত্তে গমনে বিরত থাকেন। গৃহাগত অতিথিকে বিশেষ ভাবে সম্মান করিতে হইলে, গৃহস্বামী সময়ে সময়ে, গৃহস্বামিনীকে ঐ ভাবে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, অতিথির উপর ভার অর্পণ করেন।

এই চির-পরিচিত রীতি অনুসারে কার্কবেক, হিফিকে গৃহস্বামিনীর বাহু অবলম্বনে ভোজন-গৃহে যাইতে, অনুরোধ করিলেন। হিফি সম্মানপ্রীতি ও আদর সহকারে কর্ত্রীকে আপনার বাহুর আশ্রয় দিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মনে ভাবিলেন, কৃষ্ণবসনা সুন্দরীকে স্বয়ং গৃহস্বামীই ঐ ভাবে লইয়া আসিতেছেন। হিফি একটু অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহস্বামিনী অপেক্ষা করিলেন না; শীঘ্রগতিতে ভোজন-গৃহের অভিমুখে চলিলেন। হিফি তখন দেখিতে পাইলেন যে, মিষ্টার কার্কবেক ঐ কৃষ্ণবসনা সুন্দরীর দিকে ভুলিয়াও একবার দৃষ্টিপাত করিলেন না। হিফি সে অপরিচিতা সুন্দরীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি হৃদয়ে একটু দুঃখিত হইলেন।

গৃহস্বামী কার্কবেক ও গৃহস্বামিনী এবং হিফি আর ঐ কৃষ্ণবসনা, এই চারি জনে একসঙ্গে আহারে উপবেশন করিলেন। টেবিলের শীর্ষ-দিকে গৃহস্বামী, বিপরীত দিকে গৃহস্বামিনী, এক পার্শ্বে হিফি এবং হিফির সম্মুখের দিকে,আর এক পার্শ্বে সেই সুন্দরী। ভোজন-কার্য্য যথারীতি চলিতে লাগিল। হিফি, কার্কবেক ও কার্কবেক-পত্নীর সহিত নানাবিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও হিফির সঙ্গেই কথা বার্ত্তা কহিলেন। কেহই সে কৃষ্ণবসনা রমণীর পানে ফিরিয়াও একবার চাহিলেন না। হিফি এই অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না! মনে

মনে সিদ্ধান্ত করিলেন,—সম্ভবতঃ এ সুন্দরী বাড়ীর গভর্ণেস কিংবা বালক-বালিকাদিগের শিক্ষয়িত্রী।

হিফি ইহাও লক্ষ্য করিলেন যে, সুন্দরী বেস তৃপ্তির সহিত মাংস ও মোরব্বা ইত্যাদি ভোজন করিতেছেন। ভোজনান্তে ক্ল্যারেট নামক সুস্বাদু মদ্য আনীত হইল। কৃষ্ণ-বসনা তাহাতেও উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন না। হিফি মনে করিলেন, রেলপথে পর্য্যটন-হেতু রমণীর বেস একটু ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকিবে। তাই তিনি এমন তৃপ্তির সহিত পানাহার করিলেন।

ভোজন সমাপ্ত হইলে, মহিলাবৃন্দ যথা-রীতি উঠিয়া গেলেন। ভোজনান্তে অল্প কিঞ্চিৎ স্বাদু মদিরা পান করা ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠিত প্রথা। হিফি ও কার্কবেক, বিরলে বসিয়া, পোর্ট ইত্যাদি পান করিলেন। ইহার পরে, তাঁহারা বৈঠকখানা ঘরে যাইয়া পুনরায় স্ত্রীলোকদিগের সহিত একত্র হইলেন। তখন, সেখানে আরও অনেকে আসিয়া যুটিলেন।

শিষ্টাচার-পটু কার্কবেক স্বগৃহ-সমবেত প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদিগকে ক্রমে ক্রমে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিত্রকর হিফির নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে কতিপয় বালক ও বালিকাসহ বাড়ীর গভর্ণেস্ অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়িনী মিস হার্ডউইকও হিফির সম্মুখে সমানীত হইলেন। হিফি কৃষ্ণবসনা সুন্দরীর পানে তাকাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, —ইনিত দেখি গভর্ণনেস্‌ও নহেন,—তবে ইনি কে? কেহইত আমার নিকট ইহাঁর পরিচয় প্রদান করিতেছেন না। ইহার অর্থ কি?

হিফির সহিত আলাপ পরিচয়ের কিছুক্ষণ পরে, প্রতিবেশীরা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। গৃহস্বামী কার্কবেকও আপনার বিশ্রাম-গৃহে যাইয়া স্থান লইলেন। কিন্তু সেই রেলওয়ে-সঙ্গিনী অপরিচিতা সুন্দরী ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন না।

সেদিন সকলের সঙ্গেই প্রধানতঃ চিত্র সম্পর্কে আলাপ হইয়াছিল। এক্ষণ হিফিকে একাকী পাইয়া, আলাপের ঐ সূত্র ধরিয়াই সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমার একখানি ছবি আঁকিতে পারেন কি?" হিফি কহিলেন,—"হাঁ, পারি বই কি?" সুন্দরী বলিলেন,—"তবে একবার আমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া রাখুন। আপনি আমার আকৃতি স্মরণ রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে লয় ত?"

হিফি সুন্দরীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন,—"হাঁ; আপনার চেহারা আমি কস্মিন্ কালেও ভুলিব না, ইহা নিশ্চিত।" সুন্দরী কহিলেন,—"আপনি এরূপ বলিবেন, ইহা আমি আগেই অনুমান করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু এই স্মৃতির সাহায্যে আমার ছবি আঁকিতে পারিবেন ত?" হিফি কহিলেন, —"যদি তেমন প্রয়োজন ঘটে, তাহা হইলে, চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। কিন্তু, আপনি, একটি বার ক্ষণকালও কি আমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইতে পারেন না?"

সুন্দরী বলিলেন,—"না—না—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা হইতেই পারে না। ভাল, আমি আপনাকে, আহারের পূর্ব্বে, যে মূর্ত্তিখানি দেখাইয়াছিলাম, সকলে বলে উহা নাকি আমারই মত। আপনি কি মনে করেন?"

হিফি কহিলেন,—"ঠিক আপনার মত নহে। উহাতে আপনার মুখের ভাব সম্যক্ ফোটে নাই। একটু সাদৃশ্য আছে মাত্র। আপনি একবার ক্ষণকাল আমার কাছে বসিতে পারিলেই ভাল হইত।" সুন্দরী কহিলেন,—"ইহা একবারেই অসম্ভব। কিরূপে ইহা হইতে পারে, কিছুতেই ত আমার বুদ্ধিস্থ হইতেছে না।"

সে কথা হিফিরও বুদ্ধিস্থ হইল না। কিন্তু কথায় কথায় রাত্রি একটু বেসী হইল। সুন্দরী যেন একটু ক্লান্তি বোধ করিলেন। খানিক পরেই সুন্দরী সহসা গাত্রোত্থান করিলেন, এবং একান্ত স্নেহ-গদ-গদ ভাবে হিফির দিকে চাহিয়া,—হিফির কর-স্পর্শ করিয়া, চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়, বড় বেসী মুরুব্বিয়ানা করিয়া, এই মাত্র বলিলেন—"আপনার সুগভীর নিদ্রা হউক। নিদ্রা আপনাকে সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তি প্রদান করুক।"

হিফি শয়ন করিলেন। ভাল ঘুম হইল না। বারংবার ঐ সুন্দরীর কথাই মনে পড়িতে লাগিল। সুন্দরী তাঁহাকে চিনেন ও জানেন, অথচ তিনি কখনও কোন স্থানে উহাঁকে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। কেহই তাঁহার নিকট উহাঁর পরিচয় প্রদান করিলেন না। কেহ উহাঁর সঙ্গে একটি কথাও কহিলেন না। সুন্দরীও আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না। বিদায় কালেও কাহারও সহিত সম্ভাষণ করিলেন না। সুন্দরী কেমন করিয়া, কোন্ পথে, লণ্ডন-যাত্রী ট্রেণে উঠিয়া, অত দ্রুত ঐ গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন! সুন্দরী কেনই বা তাঁহা দ্বারা একখানি প্রতিকৃতি আঁকাইয়া লইবার নিমিত্ত এত আগ্রহ করিলেন। আগ্রহ দেখাইলেন, অথচ এই উদ্দেশ্যে একবারের তরেও তাঁহার কাছে বসিতে সম্মত হইলেন না। স্মৃতির সাহায্যে অঙ্কিত করা হউক, এই বিচিত্র অনুরোধেরই বা তাৎপর্য্য কি? ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন সরলমতি হিফির মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি একটি প্রশ্নেরও মীমাংসা করিতে পারিলেন না। অবশেষে, কল্য প্রাতে উহার বিষয় অনুসন্ধান করা যাইবে, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাতর্ভোজের সময় উপস্থিত হইল। কিন্তু সে কৃষ্ণবসনার সহিত আর ফিরিয়া সাক্ষাৎ হইল না। প্রাতরাশের পরে, সকলে মিলিয়া গির্জ্জায় যাইয়া উপাসনা করিলেন। রবিবারের উপাসনা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, যথারীতি দৈনিক-কার্য্য সম্পাদন করা হইল। ক্রমে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল, সে সুন্দরী আর দেখা দিলেন না। হিফি সিদ্ধান্ত করিলেন,—রমণী সম্ভবতঃ কার্কবেকের কোন দূরসম্পর্কিত দরিদ্র কুটুম্ব; প্রভাতে অন্য কোন আত্মীয়ের গৃহে চলিয়া

গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে, কথা প্রসঙ্গেও, একবার কেহ সে রমণীর কথা উত্থাপন করিলেন না। হিফির মনে কেমন একটা ধোঁকা লাগিয়া রহিল।

পর দিন প্রভাতে, তাঁহার শয়ন-কক্ষে ভৃত্য আগমন করিলে, হিফি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শনিবার অপরাহ্নে আমাদিগের টেবিলে সেই যে আর একটি অল্প-বয়স্কা স্ত্রীলোক আহার করিয়াছিলেন, তুমি বলিতে পার তিনি কে?

ভৃত্য কহিল,—"আর একটি স্ত্রীলোক! অন্য স্ত্রীলোক আবার কে?—টেবিলে আমাদিগের বৃদ্ধা গৃহ-স্বামিনী বসিয়াছিলেন, এই ত জানি।

হিফি বলিলেন,—"হাঁ, তিনি ত ছিলেনই।—আরও একটি কাল-পোষাক-পরা স্ত্রীলোক আমার বিপরীত দিকে বসিয়াছিলেন; আমি তাঁরই কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

ভৃত্য কহিল,—"হয় ত গভর্ণেস্ মিস্ হার্ডউইক আপনাদিগের সঙ্গে বসিয়া থাকিবেন।"

হিফি বলিলেন,—"না মিস্ হার্ডউইক নহেন। তিনি আহারের বহুক্ষণ পরে, আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

ভৃত্য কহিল,—"আমি ত আমার চক্ষে আর কোন রমণীকে দেখিতে পাই নাই, মহাশয়।" হিফি বলিলেন,—"তুমি বল কি? —নিশ্চয়ই আর একটি স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার পরিধানে কাল পরিচ্ছদ। তুমি দেখ নাই বল কিরূপে? আমি এখানে পহুঁচিয়া, মিষ্টার কার্কবেকের আগমনের পূর্ব্বেই সে রমণীকে বৈঠকখানার কোঠায় সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই।"

ভৃত্য শুনিয়া বিস্মিত ও অবাক্ হইয়া রহিল। সে, একটু পরে, হিফির বুঝি বা বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, এইরূপ আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া,অধীর ভাবে উত্তর করিল।—"আমি ত এরূপ কোন স্ত্রীলোককে সে দিন এ বাড়ীতে দেখি নাই। আপনি দেখিয়া থাকিলে আমি কি করিব?" এই বলিয়া ভৃত্য দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

হিফির ধোঁকা দূর হইল না, বরং উহা আরও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িল। প্রাতরাশের কার্য্য দ্রুতগতি সম্পন্ন করিয়া লণ্ডন-যাত্রী ট্রেণ ধরিতে হইবে। সুতরাং হিফি সে দিন এ বিষয়ে আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধা পাইলেন না। হিফি যে উদ্দেশ্যে কার্কবেকের গৃহে আসিয়াছিলেন, তৎসংক্রান্ত অবশ্য-প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তায় সময় অতিবাহিত হইল। তিন সপ্তাহ পরে, পুনরায় চিত্র-কার্য্যের জন্য কার্কবেকের গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, এই বন্দোবস্ত করিয়া কার্কবেকের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রেলওয়ে-সঙ্গিনী সেই উপেক্ষিতা অথচ অপূর্ব্বদর্শনা রমণীর কথা তাঁহার মনে অবিশ্রান্ত জাগিয়া রহিল।

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে, হিফি কার্কবেকের বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। চিত্র-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু সে কৃষ্ণবসনা কামিনীর আর কোনই অনুসন্ধান পাইলেন না।

হিফি কার্কবেকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। কার্কবেক স্পষ্ট বলিলেন, তিনি ঐ শনিবার অপরাহ্নে ওরূপ কোন রমণীকে তাঁহার গৃহে দেখিতে পান নাই। আরও বলিলেন,—ভোজ-গৃহের চতুর্থ আসনে গভর্ণেস্‌কে বসিতে দেওয়া হইবে কি না, এ বিষয়ে, তাঁহার পত্নীর সহিত, সে দিন তাঁহার একটুকু কথা হইয়াছিল। অবশেষে বসিতে না দেওয়াই স্থির হয়। সুতরাং ঐ শনিবার ভোজ-গৃহের চতুর্থ আসনটি সম্পূর্ণই খালি ছিল। এইরূপ তর্ক হইয়াছিল বলিয়াই, ক্ষুদ্র কথা হইলেও কার্কবেক উহা ভুলিয়া যান নাই। হিফির ধোঁকা এবারও ভাঙ্গিল না। উহা আরও ঘনীভূত ও জটিল হইয়া স্মৃতির কক্ষে ভাবিবার একটা দুর্ব্বোধ সমস্যা হইয়া রহিল।

শীতকাল। খৃষ্টমাস নিকটবর্ত্তী। একদা হিফি, লণ্ডন-নগরে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে, স্বকীয় বাস-ভবনে উপবিষ্ট হইয়া, অপরাহ্নের ডাকে পাঠাইবার নিমিত্ত চিঠি লিখিতেছেন। শীত-সঙ্কুচিত দিবালোক নিবু নিবু হইয়া আসিয়াছে। ঘরের দরোজা তাঁহার পশ্চাৎ দিকে। দরোজার কপাট ভাজ করা। ঐ দরোজা দিয়া অন্য একটি কোঠায় প্রবেশ করিতে হয়। হিফির সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ঐ কোঠায় তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইত। হিফি নিবিষ্টমনে পত্র লিখিতেছেন, এমন সময়, তিনি অনুমান করিলেন, কে যেন, ঐ দরোজা দিয়া কোঠায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি ফিরিয়া চাহিলেন। চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার সেই রেলওয়ে-সঙ্গিনী অপরিচিতা সুন্দরী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।

হিফি চমকিয়া উঠিলেন। সুন্দরী, তাঁহার সেই সুপরিচিত স্নেহসিক্ত কণ্ঠে অভিবাদন করিয়া, একটুকু অপ্রতিভের ন্যায়, সসঙ্কোচে কহিলেন,—"মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে বড়ই বিরক্ত করিতেছি। আপনি আমার প্রবেশের শব্দ শুনিতে পান নাই কি?"

হিফি কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে তাঁহাকে একবার দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, সুন্দরীর আকৃতি যেন একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বের সে শিশুসমুচিত সরলতা যেন কতকটা কমিয়াছে। মুখশ্রী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রশান্ত ও নম্র, অথচ উহাতে কোনরূপ অবসাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। সরল-মতি ও তরল-প্রাণা যুবতীরা, বাগ্‌দান বা বিবাহের পরে, সহসা বয়োসুলভ সারল্য ও চঞ্চলতা ত্যাগ করিয়া যেরূপ ধীর, স্থির ও প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, সুন্দরীর এই পরিবর্ত্তও কতকটা সেই শ্রেণীর।

সুন্দরী, ক্ষণকাল পরে, চিত্রকর হিফিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার ছবি আঁকিবার জন্য, তিনি কোনরূপ যত্ন করিয়াছেন কি? হিফি বলিলেন যে, তিনি তৎসম্পর্কে কিছুই করেন নাই। এ কথায় সে অপরিচিতার সুন্দর মুখখানি বড়ই বিষণ্ন হইল। বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করিতে লাগিল। অপরিচিতা, অতি কাতর চক্ষে হিফির মুখপানে

তাকাইয়া, মৃদু অথচ একটু আকুলকণ্ঠে কহিলেন—"আমার বাবা আমার একখানি ছবির জন্য একবারে পাগল। আমি তাই আমার একখানি ছবি আঁকাইতে এত উৎসুক। হায়! কি করি, হায়! কি করি।"

অপরিচিতা সুন্দরী, আনতবদনে একটু নীরব থাকিয়া, আবার বলিলেন যে, তিনি একটি স্ত্রীলোকের একখানি খোদিত মূর্ত্তি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এই মূর্ত্তিখানি সম্মুখে রাখিয়া, এই আদর্শে চিত্র করিলে, তাঁহার আকৃতির অনুরূপ চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে। তিনি কার্কবেকের বাটীতে হিফিকে যে খোদাই মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, এখানি সেই মূর্ত্তিরই প্রতিরূপ। সকলে ইহা তাঁহারই চেহারার মত বলিয়া অনুমান করে। হিফি ইচ্ছা করিলে, অপরিচিতা সে ছবিটি তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন।

ইহার পর সুন্দরী, যার-পর-নাই ব্যগ্রতার সহিত, বালিকাটির মত, হিফির এক বাহুর উপর আপনার এক খানি হাত রাখিয়া, বড়ই কাতর ভাবে কহিলেন, "আপনি দয়া করিয়া আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিবেন কি? আপনি যদি আমার একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে প্রকৃতই আমি আপনার নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞ হইয়া রহিতাম।"

হিফি, স্বভাবতঃ বড় বেসী স্নেহশীল। তিনি সুন্দরীর এইরূপ আগ্রহ ও ব্যাকুলতায়, প্রকৃতই অন্তরে স্পৃষ্ট হইলেন; এবং আর কথাটিও না কহিয়া, তৎক্ষণাৎ পেন্‌সিল ও নক্‌সা পুস্তক (Sketch book) হাতে লইয়া, তখনকার সেই ক্ষীণ আলোকের সাহায্যেই, দ্রুতহস্তে সুন্দরীর একখানি আকৃতি অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা চিত্রবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, তাঁহারা একবার কিছু একটা দেখিতে পাইলেই, তাঁহাদিগের মন্ত্রপূত তুলী মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা আঁকিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। তবে, সে দেখাটুকু ভাল হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু কি বিচিত্র, সুন্দরী তাঁহার এই বহু-প্রার্থিত চিত্র-কার্য্যে, প্রয়োজনের অনুরূপ দর্শন-দান সম্বন্ধে, হিফির কোনপ্রকার সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং একটু একটু বিঘ্ন জন্মাইলেন। হিফি যেই তাঁহার পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন, তিনিও অমনই, গৃহ-লম্বিত ছবিগুলি দেখিবার মেয়েলী ছলনায়, মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া, যেন তাঁহার দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশ্যে, সরিয়া সরিয়া যাইতে থাকিলেন। হিফি, এই ঘুরাফিরার অবকাশে, বিদ্যুতের চমকের মত, সুন্দরীর মুখচ্ছবিখানি যতটুকু দেখিয়া লইতে সমর্থ হইলেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া, সায়াহ্নের অস্ফুট আলোকে, তাঁহার দুখানি নক্‌সা আঁকিয়া তুলিলেন; এবং সুন্দরী যে খোদিত প্রতিকৃতিখানি আদর্শস্বরূপ আনিয়াছিলেন, তাহা ও নক্‌সা দুটি একত্র করিয়া রাখিয়া দিলেন।

হিফি নক্‌সা পুস্তক বন্ধ করিলে, সুন্দরী আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলেন না; অমনি

চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তিনি এবার, পূর্ব্বের ন্যায়, বিদায়ি-সম্ভাষণে আর কিছুই না কহিয়া, হিফির হাতখানি আদর করিয়া ধরিলেন; এবং "আপনার মঙ্গল হউক" এই মাত্র আবেগ-ভরে বলিয়া, দরোজার দিকে অগ্রসর হইলেন। হিফি বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন।

সুন্দরী, দ্রুত-পদ সঞ্চারে, দরোজার বাহির হইলেন। কিন্তু সেখানে হিফির বড় বিস্ময় জন্মিল। হিফির অনুমান হইল, সুন্দরী যেন ঘরের বাহির হইয়াই অন্ধকারের অঙ্গে একবারে মিশিয়া গেলেন। হিফি সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি চক্ষে ধাঁধা দেখিয়াছেন। তাঁহার বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে।

হিফি তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মেইড অর্থাৎ পরিচারিকাকে ডাকিলেন, এবং সে কেন পূর্ব্বে তাঁহাকে এই রমণীর আগমন-বার্ত্তা, জানায় নাই, ইহা একটু ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচারিকা বুদ্ধিমতী। সে কহিল, কোন রমণী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, সে তাহার বিন্দু বিসর্গও টের পায় নাই। সে অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে, বিশেষ কোন প্রয়োজনে, বাহিরের বড় দরোজা খুলিয়া, ক্ষণকালের তরে সড়কে বাহির হইয়াছিল; সম্ভবতঃ সেই সময়েই রমণী দরোজা খোলা পাইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন।

এই ঘটনার অল্প কিছু দিন পরে, হিফি, চিত্রকার্য্যের জন্য, ( Leicester shire ) লিচেষ্টার শায়রের অন্তর্গত বট্‌স্‌ওয়ার্থফিল্ডের (Botsworth field) নিকটবর্ত্তী এক বাটীতে আহূত হইলেন। কর্ম্মজীবী ইংরেজই পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে সময়ের প্রকৃত মূল্য বুঝেন। সময়ের ব্যয়ে ইংরেজ, কঠোর-চিত্ত কুসীদ-ব্যবসায়ী অপেক্ষাও, অধিকতর কৃপণ। ইংরেজ এক মিনিট সময় বাঁচাইবার জন্য দশ টাকা ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। হিফিকে সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় ছবি লইয়া যাইতে হইবে। সেগুলি সঙ্গে লইয়া যাওয়া সুবিধা-জনক নহে। অথচ সেগুলিকে মালের গাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া, পঁহুচার অপেক্ষায়, কর্ম্মস্থলে দুই এক দিন নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকা, হিফির মত মানুষের পক্ষে মারাত্মক-ক্লেশকর।

এইরূপ বিবিধ-কারণে, হিফি, নিজে যাইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে, ছবিগুলি মালের গাড়ীতে গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। ছবি পাঠাইবার এক সপ্তাহ পরে, স্বয়ং বট্‌স্‌ওয়ার্থফিল্ডের নিকটবর্ত্তী সেই গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মনে বিশ্বাস, কর্ম্মস্থলে পঁহুচিয়াই তিনি ঐ সকল ছবি লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন;—একমুহূর্ত্ত-সময়েরও অপচয় ঘটিবে না।

হিফি ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যবস্থা করিলেন একরূপ, অদৃষ্টক্রমে ফল হইল অন্যরূপ। তিনি গন্তব্য স্থানে পহুঁচিয়াই জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রেরিত ছবিগুলি সেখানে পহুঁচে নাই। ষ্টেশনে অনুসন্ধান করিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার বিবরণ শুনিয়া কহিলেন,—"এই রকমের লগেজ এখানে আসিয়াছিল সত্য; কিন্তু কিরূপ এক অদ্ভুত ভ্রম-বশতঃ সে লগেজ লিচেষ্টারে চলিয়া

গিয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তাহা এখনও সেই খানেই আছে।”

সময়-গণন-পটু সরল-চিত্ত হিফি আবার সময়ের হিসাব করিলেন। লিচেষ্টার হইতে লগেজ ফিরাইয়া আনিতে ন্যূন কল্পেও তিন চারি দিনের প্রয়োজন। এই সময়টা বসিয়া কাটান যার-পর-নাই ক্ষতিকর। হিফি গৃহস্বামীকে বলিলেন,—“লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে, আমাকে (South Stafford) দক্ষিণ ষ্টাফোর্ড শায়রে কিছু কাজ করিয়া যাইতে হইবে। আমি এখনই ঐ কাজটুকু সারিয়া আসিবার নিমিত্ত দক্ষিণ ষ্টাফোর্ডে যাইতে ইচ্ছা করি। এই তিন দিন, আপনার গৃহে অলসভাবে বসিয়া না কাটাইয়া, যদি এই অবকাশে, উহা সম্পন্ন করিয়া আইসি, তাহা হইলে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।” গৃহস্বামী বিনা আপত্তিতে এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

হিফি, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ( Trent-velley Railway ) ট্রেণ্টভেলি রেলওয়ের ( Atherstone ) আথারষ্টোন ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তিনি ষ্টেশনে যাইয়া ব্রেডসা ( Bradshaw ) যাচাই করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাকে (Litchfield) লিচ্‌ফিল্‌ডে পহুঁচিয়া গাড়ী বদলাইতে হইবে। গাড়ী ৮ টার সময় লিচ্‌ফিল্ডে পহুঁচিবে। লিচ্‌ফিল্ড হইতে, তাঁহার গন্তব্য স্থানে যাইবার স্বতন্ত্র ট্রেণ ৮ টা ১০ মিনিটে ছাড়িবে। হিফি, পথের এই পরিচয় ঠিক করিয়া লইয়া, লিচ্‌ফিল্ডযাত্রীট্রেণে আরোহণ করিলেন। ট্রেণ তখনই ছাড়িয়া দিল।

হিফি যে হিসাব করিয়া ট্রেণে চাপিলেন, সে হিসাবে, ঐ রাত্রিতেই তিনি তাঁহার গন্তব্য স্থানে পহুঁচিতে পারিবেন, ইহাতে আর কোনই সংশয় বা সন্দেহ রহিল না। কিন্তু এ যাত্রায় তিনি কি কুক্ষণেই ঘরের বাহির হইয়াছেন, তিনি ভাবেন এক, হয় আর। তিনি যাইতে চাহেন দক্ষিণে, পহুঁচেন যাইয়া পশ্চিমে। তাঁহার ইচ্ছার গতি এক দিকে; কিন্তু কি যেন অদৃশ্য নিয়তি তাঁহাকে টানিয়া লইয়া যায়, আর এক দিকে।

ট্রেণ অবধারিত সময়ে, অভিলষিত স্থানে পহুঁচিল। হিফি গাড়ী হইতে নামিয়া অন্য ট্রেণের প্রতীক্ষায় প্লাটফরমে দাঁড়াইলেন। কিন্তু অন্য ট্রেণ আসিল না। তিনি অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, যদিও ঐ ষ্টেশনে দুই লাইনে কাটাকাটি হইয়াছে, তথাপি ঐ ষ্টেশন দিয়া অন্য লাইনের ট্রেণ যাতায়াত করে না। লিচ্‌ফিল্ড নগরের দুই পার্শ্বে দুটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এক পার্শ্বে ট্রেণ্টভেলি লাইনের লিচ্‌ফিল্ড ষ্টেশন, অন্য পার্শ্বে দক্ষিণ ষ্টাফোর্ড লাইনের লিচ্‌ফিল্ড ষ্টেশন। তাঁহার যাওয়া উচিত ছিল দক্ষিণ ষ্টাফোর্ড লাইনের লিচ্‌ফিল্‌ড ষ্টেশনে; কিন্তু না জানি কোন্ অলক্ষ্য শক্তির কিরূপ ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণে আসিয়া পড়িয়াছেন ট্রেণ্টভেলি লাইনের লিচ্‌ফিল্ড ষ্টেশনে।

এক্ষণ আর ঘুরিয়া সেই ষ্টেশনে যাইয়া ট্রেণ পাইবার সময় নাই। হিফি, অনন্তগতি

হইয়া, ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে, ঐ রাত্রি, ওখানকার কোন হোটেলে থাকাই স্থির করিলেন।

হিফি এই প্রথম লিচ্‌ফিল্ডে আসিয়াছেন। কিন্তু, নিজের ইচ্ছায় আইসেন নাই। কাহারও কর-ধৃত-সূত্র-চালিত পুতুলের মত, তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, এক দিক্ হইতে আর একদিকে চালিত হইতেছেন; এবং যেন কেমন এক 'এলোভুলোর' মোহে পড়িয়া, পুতুলের মত, লিচ্‌ফিল্ডের হোটেলে আসিয়া উপবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ স্থানেই তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। বিগত ছয় মাসের মধ্যে তিনি দুইবার লিচ্‌ফিল্ডে আসিবার জন্য ইচ্ছুক হন। কিন্তু আসিতে পারেন নাই। দুই বারই, কার্য্যান্তরে নিয়োগহেতু, এই অভিপ্রায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে। দুইবার স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াও যে স্থানে আসিতে পারেন নাই, আজ ইচ্ছা না করিয়াও, সেই স্থানে আনীত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার নিকট বড়ই বিচিত্র ও বিস্ময়জনক বোধ হইতে লাগিল।

হিফির আজ্ঞা অনুসারে হোটেলওয়ালা চা আনিয়া দিল। তিনি, ধীরে ধীরে, চা টুকু নিঃশেষ পান করিয়া, লিচ্‌ফিল্ড-নিবাসী একটি পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোকের নিকট চিঠি লিখিতে ইচ্ছা করিলেন। ভদ্রলোক যদি দয়া করিয়া হোটেলে আইসেন, তাহা হইলে, তাঁহার সহিত, পুরাতন প্রসঙ্গে, নানারূপ গল্প-আমোদে, কিছু সময় কাটাইতে পারিবেন, ইহাই হিফির উদ্দেশ্য।

হিফি পরিচারককে ডাকিলেন। পরিচারক উপস্থিত হইলে, হিফি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিষ্টার লিউট আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু। তুমি তাঁহাকে জান কি? তিনি কি লিচ্‌ফিল্ডে আছেন?" পরিচারক কহিল,—"হাঁ মহাশয়, তিনি এখানেই আছেন।" হিফি কহিলেন,—"তিনি ক্যাথিড্রেলের নিকটই থাকেন ত?" পরিচারক বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।" হিফি কহিলেন,—"আমি কি তাঁহার নিকট একখানি চিটি পাঠাইতে পারি?" পরিচারক বলিল,—হাঁ, নিশ্চয়ই পারেন।"

পত্র লিখিত ও প্রেরিত হইল। মিনিট কুড়ি পরে, একটি লোক ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকটির আকৃতি অতি উচ্চ শ্রেণির ভদ্রলোকের মত, পরিচ্ছদও তেমনই সম্ভ্রান্ত-ভদ্রোচিত, বয়স প্রৌঢ়তার প্রান্তবর্ত্তী। হিফির লিখিত চিঠিখানি তাঁহার হাতে। কিন্তু হিফি যাঁহার সাক্ষাৎকার-কামনায় পত্র লিখিয়াছিলেন, ইনি তিনি নহেন।

হিফি, বিশেষ মনোযোগের সহিত, আগন্তুকের পানে বারংবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, ইনি সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার অপরিচিত। তিনি জীবনে কখনও ইহাঁকে দেখেন নাই। ভদ্রলোক, একটু ভীত-চকিত দৃষ্টিতে, হিফির পানে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আমি মহাশয়ের নাম জানিতাম না। আপনি সম্ভবতঃ ভ্রম-বশতঃ আমার নিকট এই চিঠি পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

হিফি দেখিলেন,—তাঁহারই লেখা চিঠি খানি আগন্তুকের হাতে। অথচ হিফি আগন্তুককে একবারেই জানেন না। হিফি একটু অপ্রতিভ হইলেন। কহিলেন,—"হাঁ বটেই ত! বটেই ত! আমি কখনও আপনাকে এ চিঠি লিখি নাই। লিচ্‌ফিল্‌ডে মিষ্টার লিউট (Lute) নামে আর কি কেহ নাই?"

আগন্তুক কহিলেন,—"না—লিউট নামে, এখানে, আর কেহ আছেন বলিয়া ত বোধ হয় না।"

হিফি কহিলেন,—"লিউট আমার বন্ধু। তিনি আমাকে তাঁহার এই ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি এই ঠিকানায়, পূর্ব্বে আরও চিঠি পত্র লিখিয়া, উত্তর পাইয়াছি। তিনি এক জন শ্রীমান্ যুবা পুরুষ। তাঁহার খুল্লতাত, শিকারী কুকুরসহ শিকারে যাইয়া, নিহত হন। যুবক, খুড়ার মৃত্যুর পরে, তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর হইল, তিনি ফেয়ারবারণ (Fairbarn) নাম্নী একটি সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।"

আগন্তুক কহিলেন,—"ও!—আপনি (Mr. Clyne) মিষ্টার ক্লাইনের কথা বলিতেছেন। —হাঁ—তিনি ক্যাথিড্রেলের নিকটেই বাস করিতেন বটে—তা তিনি ত এখন আর এখানে নাই। তিনি স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।"

আগন্তুকের কথাই ঠিক। হিফি সবিস্ময়ে কহিলেন,—"হাঁ—হাঁ—হাঁ, তাঁহার নাম ক্লাইনই ত বটে। আমি এই চির-পরিচিত নামটি একবারে ভুলিয়া গিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে, অক্ষরে অক্ষরে, ঠিক আপনার নাম লিখিলাম কিরূপে?—এ কি বিচিত্র ব্যাপার!—কিসে আমার এই অদ্ভুত মতিভ্রম ঘটাইল!—সে যা হউক, মহাশয়, আমি আপনাকে অকারণ কষ্ট দিয়া বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। কি আশ্চর্য্য, আমি আমার পরিচিত বন্ধুর নাম ভুলিয়া গেলাম, এবং সেই বন্ধুর কাছে চিঠি লিখিতে বসিয়া, তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত যে ভুলিয়া গিয়াছি, ঘুণাক্ষরেও এরূপ সন্দেহ মনে পুষিলাম না! পক্ষান্তরে, আপনি একেবারেই আমার অপরিচিত, অথচ আপনার নামটি অক্ষরে অক্ষরে ঠিক করিয়া লিখিয়া পাঠাইলাম! এমন মনোবুদ্ধির অগম্য আশ্চর্য্য ভ্রম এ জীবনে আর কখনও করি নাই; এবং আজিকার মত, এরূপ অদ্ভুত 'এলোভুলোর' হাতে পড়িয়া, আর কখনও এমন বিড়ম্বিত হই নাই। আবারও বলি, মহাশয়, আপনি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।"

আগন্তুক বেসী কথাবার্ত্তা কহিতেছেন না। হিফি বুঝিলেন,—ইহাই তাঁহার স্বভাব! হিফিকে অত অনুনয় বিনয় করিতে দেখিয়া, আগন্তুক অতি প্রশান্ত ভাবে এই মাত্র কহিলেন,—"আপনি এ জন্য, এমন করিয়া, আমার নিকট বারংবার ক্ষমা চাহিতেছেন কেন? আমার প্রাণটা, যাঁহাকে দেখিবার জন্য, আজি কএক মাস অবধি, সর্ব্বদা অধীর

ও উৎসুক,দেখিতেছি আপনিই আমার সেই প্রার্থিত-দুর্লভ অতিথি—আপনি বিখ্যাত চিত্রকর মিষ্টর হিফি নন কি?—আমি আপনার দ্বারা আমার একটি প্রাণাধিকা কন্যার এক খানি ছবি আঁকাইয়া লইতে ইচ্ছা করি। আপনি যদি দয়া করিয়া আমার বাটীতে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে বস্তুতঃই আমি কৃতার্থ হইব।"

এই অপরিজ্ঞাত আগন্তুক, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অধীর, ইহা শুনিয়া হিফি আরও বিস্মিত হইলেন। ব্যাপার, যে ভাবে, যে দিকে যাইয়া গড়াইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপেই মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর, এবং সকল অংশেই ইচ্ছার অনায়ত্ত। হিফি, এ সময়ে, ওখানে, এ অচিন্তিত চিত্রকার্য্য হাতে লইতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি কিরূপ বিপাকে ঠেকিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং পর দিন ও সোমবার এই দুটি দিন ভিন্ন যে, তাঁহার হাতে আর সময় ছিল না, তাহা সমস্তই খুলিয়া বলিলেন।

কিন্তু আগন্তুক ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি এত দূর আগ্রহ ও ব্যাগ্রতার সহিত হিফিকে ধরিয়া পড়িলেন যে,হিফি, অবশেষে, ঐ দুই দিনেই তাঁহার অভিলষিত কর্ম্ম করিয়া দিতে, যেন বাধ্য হইয়া, সম্মতি প্রদান করিলেন; এবং আপনার 'সঙ্গীয়' দ্রব্যসামগ্রী হিজিল মত রাখিয়া, ঐ রাত্রিতেই আগন্তুকের সহিত, তাঁহার বাসভবনে চলিয়া গেলেন।

আগন্তুক, বাটী পহুঁছিয়াই, তদীয় কনিষ্ঠা কন্যার সহিত হিফির পরিচয় করাইয়া দিয়া, অন্য এক কোঠায় চলিয়া গেলেন;—কন্যা, আদর-সহকারে হিফিকে বসাইয়া, নিজেও অদূরে উপবেশন করিলেন।

বালিকার নাম (Maria Lute) মেরিয়া লিউট। মেরিয়া সুন্দরী ও প্রিয়দর্শনা। বর্ণ, প্রস্ফুট-গোলাপের মত, ঈষৎ রক্তিমাভ। কেশরাশি কম-চিকণ, ভ্রূযুগল কৃষ্ণাভ, নয়নতারা হৃদয়হারিণী। চক্ষু দুটি, তত বড় না হইলেও, ভাসা ভাসা। দৃষ্টি একটু বেশী কাতর-ভাবাপন্ন। নাসিকা সুগঠিত। গণ্ডযুগ নিটোল, কিন্তু রক্তিমরাগে তত উজ্জ্বল নহে। বালিকার সুন্দর মুখখানির উপর যেন বিষাদের একটুকু অস্ফুট ছায়া পড়িয়াছে। বয়স পনর বৎসরের কিছু কম। কিন্তু মেরিয়া আচার-ব্যবহারে বালিকার মত নহে; পঞ্চবিংশতিবর্ষ-বয়স্কা গৃহিণীর মত। বালিকা কি তবে মাতৃহীনা, এবং তাই এই কচি বয়সে বর্ষীয়সীর মত গৃহ-কার্য্য-নিপুণা?

হিফি, কি উদ্দেশ্যে, মেরিয়ার পিতৃভবনে আসিয়াছেন, কিংবা আনীত হইয়াছেন, মেরিয়া তাহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই অবগত নহে। সে এই মাত্র বুঝিয়াছিল, তিনি ঐ রাত্রির জন্য তাহাদিগের গৃহে আদরের অতিথি। বালিকা, অতিথির পানাহার ও শয়নাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করাইবার নিমিত্ত, হিফির নিকট বিদায় লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে বড়ই ব্যস্তত্রস্ত ভাবে, ফিরিয়া আসিয়া বলিল,——

"বাবার একটু অসুখ হইয়াছে। তাঁহার

সহিত এ রাত্রিতে আর আপনার দেখা হইবে না। তিনি এখন একটু বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইয়া, একা পড়িয়া আছেন। কল্য প্রাতে, কোন সময়ে, তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইতে পারিবে? আপনি এ বাটীকে আপনার নিজ-গৃহ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত অবস্থান করুন। যখন যাহার প্রয়োজন হয়, তৎক্ষণাৎ তজ্জন্য অনুমতি করিবেন। কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। বাবাকে দেখিতে ডাক্তার আসিতেছেন। আমার সেই স্থানে একটু বিলম্ব হইবে। আপনি এই অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া একটু আরামে থাকুন। পরিচারক প্রতীক্ষায় রহিল। আপনি যখন যাহা অনুমতি করিবেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহাই করিবে।"

মেরিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। এই বয়সে, আদর-অভ্যর্থনার ভাষার উপর, বালিকাদিগের যতটুকু আধিপত্য থাকা সম্ভবপর, মেরিয়ার অধিকার তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। সে অনায়াসে হিফির সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইল। মেরিয়া হিফির নিকট কোন প্রশ্ন করিল না, অথবা বৃথা কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া, কোন কথায়ই কোনরূপ বিরক্তি জন্মাইল না; অথচ অতি সুন্দর কৌশলে, হিফির আকস্মিক আগমনের সবিশেষ জানিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

হিফি বাড়ীর সাজসজ্জা ও ভৃত্যদিগের কর্ম্মনিপুণতা দেখিয়া, এইটুকু বুঝিয়াছেন যে, মিষ্টার লিউট ঐ প্রদেশে একজন বড় লোক; এবং বালিকা মেরিয়া মাতৃহীনা হইলেও বড় ঘরের চাল-চলনে সুদীক্ষিতা। তিনি বলিলেন যে, মেরিয়ার পিতা, সম্ভবতঃ মেরিয়ার অথবা তাহার অন্য কোন ভগিনীর একখানি ছবি আঁকাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া আসিয়াছেন।

মেরিয়া ইহা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইল। নীরবে কি যেন একটু চিন্তা করিল; এবং কিছুক্ষণ পরে, যেন কথাটা এতক্ষণে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, এরূপ ভাব প্রকাশ করিল। বালিকার বিষাদমাখা সুন্দর মুখখানি আরও একটু বিষণ্ণ, আরও একটু মলিন হইল। মেরিয়া কহিল ;——

"হাঁ, আমার একটি ভগিনী ছিলেন। তিনিই আমার একমাত্র ভগিনী,—এ মাতৃহীনার একমাত্র স্নেহের আশ্রয়, দিদীই আমার মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। আজি চারি মাস হইল, তিনি আমাদিগের মমতা ত্যাগ করিয়া, বয়সের প্রথম-বিকাশ-সময়েই, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। বাবা তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও বেসী ভাল বাসিতেন। আজি চারি মাস হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বাবার প্রাণে এমনই নিদারুণ আঘাত লগিয়াছে যে, তিনি এখনও সে যন্ত্রণা হইতে শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। বাবা, প্রতিনিয়তই, দিদীর একখানি ছবির জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। ছবির কথা ছাড়া তাঁহার মুখে অন্য কথা নাই,—মনে অন্য বিষয়ের ঠাঁই নাই। যদি কোন প্রকারেও দিদীর একখানি

ছবি প্রস্তুত হইতে পারিত, এবং বাবা উহা দেখিতে পাইতেন, বোধ হয় তাহা হইলে, তাঁহার শরীরটাও একটু সুস্থ হইত।"

এইপর্য্যন্ত বলিয়াই, বলিকা একটুকু ইতস্ততঃ করিল; কি যেন কহিতে চাহিল, কিন্তু কহিতে পারিল না। কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। গদ-গদ-স্বরে দুই একটি অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিয়া, আর সামলাইতে পারিল না। মুখে রুমাল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ অশ্রুপাতের পর, বুদ্ধিমতী বালিকা আপনিই আবার একটু প্রকৃতিস্থ হইল;—চোখ মুখ মুছিয়া স্থির হইয়া বসিল, এবং দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে একটু আকুল-স্বরে কহিল;——

"আপনি যাহা ক্ষণিক পরেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন, আপনার কাছে আর তাহা গোপন করিয়া ফল কি?—আমার বাবা উন্মাদগ্রস্ত। দিদী কেরোলিনার সমাধির দিন হইতেই বাবা পাগল হইয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সেই স্নেহের ধন কেরোলিনাকে দেখিতে পান। কিছুতেই তাঁহার এই বিষম মতিভ্রম দূর হইতেছে না। অবস্থা ভয়ানক। চিকিৎসকেরা বলেন,—তাঁহার অবস্থা আরও কত মন্দ হইতে পারে, তাহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না। ছুরি কাঁচি প্রভৃতি কোন মারাত্মক বস্তু তাঁহার ত্রিসীমায়ও রাখিতে দেওয়া হয় না। তিনি এই মুহূর্ত্তেও নানারূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ-উক্তি করিতেছেন। সুতরাং আজি আর আপনার সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারিতেছে না। আমার আশঙ্কা হয়, কালও হয় ত, এই অবস্থাই থাকিয়া যাইবে। আপনি রবিবার পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিতে পারিবেন ত? তিনি যাহা চাহেন, সে কার্য্যে আমি অবশ্যই আপনার কিছু সাহায্য করিতে পারিব।"

হিফি কহিলেন;—"তোমার ভগিনীর কোন ফটো কিংবা কোনরূপ নক্সা তোমাদের কাছে আছে কি?" মেরিয়া বলিল;—"কিছুই নাই।" হিফি জিজ্ঞাসা করিলেন;—"তোমার দিদীর আকৃতি কেমন ছিল, তুমি তাহা অবিকল বর্ণনা করিতে পার কি?"

মেরিয়া উত্তর করিল,—"বোধ হয়, তা পারি। দিদীর আকৃতির সহিত কতকটা মিলে, এমন একখানি ছবি আমাদিগের বাটীতে ছিল। কিন্তু উহা, সম্প্রতি কোথায়, কি ভাবে, অদৃশ্য হইল বলিতে পারি না।"

হিফি কহিলেন;—কোন প্রকারের একটা আদর্শ ভিন্ন, শুধুই বর্ণনা অনুসারে কার্য্য করিয়া, চিত্রে তোমার ভগিনীর প্রতিকৃতি ফলাইতে পারিব এমত আশা করি না। এরূপ অসুবিধায়ও, আমি ছবি না আঁকিয়াছি, এবং সময়ে সময়ে, কৃতকার্য্য না হইয়াছি, এমন নহে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমার যত্ন ও শ্রম একবারে পণ্ড হইয়া গিয়াছে। সুতরাং, যে বর্ণনা করিবে, তাহার বর্ণন-শক্তির উপরই কৃতকার্য্যতার সম্পূর্ণ নির্ভর।"

ডাক্তারের জন্য লোক গিয়াছিল, ডাক্তার আসিলেন। তিনি রোগী দেখিয়া চলিয়া গেলেন। হিফির সহিত ডাক্তারের সাক্ষাৎ হইল না। হিফি শুনিতে পাইলেন, পর

দিন ডাক্তারের পুনরাগমন পর্য্যন্ত, রোগীকে বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রহরা দেওয়ার জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। অমন সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সুরম্যভবনের তথাবিধ অবস্থা দেখিয়া, আর ঐ স্নেহশীলা পিতৃবৎসলা কচি বালিকার কাঁধে কি গুরুতর বোঝা আসিয়া চাপিয়া পড়িয়াছে, ইহা অনুভব করিয়া, হিক্সি যার-পর-নাই অপ্রফুল্ল-চিত্তে শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। হিক্সি প্রাতঃকালে শুনিতে পাইলেন, মেরিয়ার পিতা অনেকটা ভাল আছেন। তিনি নিজেই প্রত্যূষে বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুসন্ধান করিয়া সংবাদ লইয়াছেন যে, চিত্রকর তাঁহার গৃহে উপস্থিত আছেন, এবং চিত্রকার্য্য সংসিদ্ধ হইবে বলিয়া আশা দিয়াছেন। প্রাতর্ভোজের সময়, তিনি আপনা হইতে বলিয়া পাঠাইলেন যে,—তিনি ভরসা করেন, হিক্সি অবিলম্বেই তাঁহার কন্যার প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তিনি ইহাও ভরসা করেন যে, অদ্যকার দিনের মধ্যে তিনি অবশ্যই একবার হিক্সির সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবেন।

হিক্সি প্রাতঃকালে, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়াই, ছবি আঁকিতে বসিলেন। মেরিয়া, তাহার দিদীর আকৃতি বর্ণনা দ্বারা, তাঁহার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মেরিয়া বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে বর্ণনা করিল, তাহা ঠিক বটে; কিন্তু তাহা দ্বারা সমগ্র অবয়বের সম্মিলিত ভাব পরিস্ফুট হইল না।

হিক্সি, এই উপায়ে, একটার পর একটা নক্সা আঁকিয়া আঁকিয়া, শোক-মগ্ন রুগ্ন পিতার নিকট পাঠাইয়া দিতে থাকিলেন; আর তিনি 'কিছুই হয় নাই' বলিয়া বারংবার ফেরত দিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি পর-দুঃখ-কাতর করুণ-হৃদয় হিক্সির ক্লান্তি কিংবা বিরক্তি নাই। তিনি যথাশক্তি প্রয়াস পাইতে বিরত হইলেন না। বালিকা মেরিয়া ইহা লক্ষ্য করিল, এবং হিক্সি তাহাদের জন্য যে এত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞমনে পুনঃপুনঃ তাঁহাকে কহিল,—"আপনার কৃতিত্বের ও যত্নের ত ত্রুটি নাই। আমি ঠিক করিয়া বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিতেছি না, ইহা আমারই দোষ।"

মেরিয়া আবার একটু মনঃক্ষোভের সহিত বলিল;—"একটি স্ত্রীলোকের একখানি ছবি পাইয়াছিলাম। ছবিখানি ঠিক আমার দিদীর চেহারার মত। আমি উহা আঁটা দিয়া আঁটিয়া, যত্ন করিয়া আমার পুস্তকের মধ্যে যোড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। জানি না, তিন সপ্তাহ হইল, পুস্তকের ভিতর হইতে, সে ছবিখানি কোথায় উড়িয়া গেল! এত খুঁজিলাম, কোথাও আর উহা পাইলাম না। সে ছবিখানি থাকিলে, অনেকটা কাজ হইত, সন্দেহ নাই।"

হিক্সি কহিলেন যে, সে ছবিখানি কাহার, তাহা বলিতে পারিলে, তিনি সম্ভবতঃ লণ্ডন হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন।

মেরিয়া এ কথা শুনিয়া আগ্রহের সহিত কহিল,—"সে মহিলার নাম—'এম এ।" 'এম এ', এই অক্ষর কটির উচ্চারণমাত্রই, হিফি যেন শিহরিয়া উঠিলেন। একসঙ্গে সেই রেলওয়ে-সঙ্গিনী অপরিচিতা সুন্দরী, এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত কথা ও সমস্ত দৃশ্য হিফির স্মৃতিপথে জাগরিত হইল।

ভাগ্যক্রমে, হিফির 'সঙ্গীয়' পোর্টমেণ্টে, তদীয় নক্‌সা-পুস্তকে, সে অপরিচিতা সুন্দরীর দুখানি পেন্‌সিলে-আঁকা নক্‌সা অতি যত্নে রক্ষিত ছিল। সুন্দরী তাঁহার আকৃতির অনুরূপ বলিয়া যে আর একখানি ছবি দেখাইয়াছিলেন, তাহাও হিফির সঙ্গে আনীত হইয়াছিল। হিফি সে নক্‌সা ও ছবি সমুদয়ই তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া আনিয়া মেরিয়াকে দেখাইলেন।

বালিকা, ক্ষণকাল, চিত্রপুত্তলিকার মত, ঐ নক্‌সা দুটি ও ছবিখানির দিকে, একদৃষ্টিতে ও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে চাহিয়া রহিল। তৎপর হিফির পানে চক্ষু ফিরাইয়া, যার-পর-নাই বিস্মিত ও যেন একটু ভীত-ভীত ভাবে, ধীর-স্নিগ্ধ- স্বরে জিজ্ঞাসা করিল;—আপনি "এ সকল কোথায় পাইলেন!" বালিকা প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, অমনই আবার বলিল,—"আমি এখনই এ গুলি বাবার কাছে লইয়া যাই।"

মিনিট দশেক পরে, মেরিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার সঙ্গে এবার তাহার উন্মাদগ্রস্ত(!) পিতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া অভিবাদন প্রভৃতি কোনরূপ শিষ্টাচারেরই আর অপেক্ষা করিলেন না; কেমন একটু ব্যাকুলতা,—কেমন একপ্রকার অধীর উৎসাহের সহিত হিফির প্রতি তাকাইয়া কহিতে লাগিলেন;—

"হাঁ—ঠিক—সমস্তই সত্য; ইহাতে সংশয় বা ভ্রান্তির লেশ মাত্রও নাই। আমি এ পর্য্যন্ত আগাগোড়াই আমার কেরোলিনাকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইয়াছি। আপনি এই যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন, ইহা সেই কেরোলিনারই অবিকল প্রতিকৃতি। ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমার বর্ত্তমান জীবনের একমাত্র অবলম্ব এই শিশু মেরিয়া। মেরিয়া ভিন্ন আমার আর যাহা কিছু আছে, সে সমস্ত অপেক্ষা, এই নক্‌সা দুখানি আমার চক্ষে সহস্র গুণ অধিক মূল্যবান্‌।"

মেরিয়াও বলিল যে, এই ছবিখানিই তিন সপ্তাহ হইল, সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই বলিয়া তাহার পুস্তকের যে স্থানে উহা গমের আঁটায় যোড়া ছিল, হিফিকে তাহা দেখাইয়া দিল। আঁটার চিহ্ন পুস্তকে স্পষ্ট রহিয়াছে। হিফি ঐ চিহ্নের সহিত ছবির পৃষ্ঠে যে আঁটার চিহ্ন ছিল, তাহা মিলাইয়া দেখিলেন। দাগে দাগে ঠিক মিলিল; একটুকও এদিক্‌ ওদিক্‌ হইল না। শোকাকুল লিউট যে মুহূর্ত্তে ঐ নক্‌সা দেখিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি সুস্থ-শান্ত স্থির-গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, গৃহাগত অতিথির সহিত, বিজ্ঞ-বিচক্ষণ লোকের মত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার

সমস্ত রোগ, যেন কাহার কি মন্ত্রে, অকাল-মেঘের মত, উড়িয়া গেল; এবং তাঁহার প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দর্শনে, আশে পাশে সকলের মুখেই হাসি ফুটিল।

নক্সা দুখানি পেন্‌সিলে আঁকা। পাছে আবারও উহা কোন প্রকারে উড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায়, আনন্দ-বিহ্বল পিতা হিফিকে উহা স্পর্শ করিতেও দিলেন না। হিফি, ঐ নক্সা দুখানির আদর্শে, একবারে—একই উদ্যমে, তৈলচিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতা সর্ব্বক্ষণ চিত্রকর হিফির পার্শ্বে বসিয়া, কোথায় কোন্ রেখাটি টানিলে, কোন্‌খানে কোন্ পোঁচটি দিলে, ছবিটি ঠিক হইবে, তাহা বেস বুদ্ধিমত্তার সহিত দেখাইয়া দিতে লাগিলেন; এবং হিফিও শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সহিত তাঁহার উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে রহিলেন। লিউট এই সময়ে, হিফির সহিত অন্য পাঁচ প্রসঙ্গেও প্রফুল্ল মনে আলাপ করিতে সমর্থ হইলেন। হিফি তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ আর সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। তিনি এলোভুলোর আকর্ষণে যত কেন কষ্ট না পাইয়া থাকুন, তাঁহার আগমনে লিউটের মত একটি উন্নতপদবী-রূঢ় সম্ভ্রান্ত লোক অমন কঠিন উন্মাদ-রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি কৃতার্থম্মন্য।

মিষ্টার লিউট, ইতিপূর্ব্বে, আর কখনও তাঁহার উন্মাদ-প্রলাপের প্রকৃত-কারণ-সম্পর্কে, ভাল মন্দ কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু হিফি কি রূপে ঐ দুটি নক্সা আপনার ঘরে বসিয়া অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তিনি সে কাহিনীটি স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার ন্যায় যথাযথ বর্ণনা করিলেন; হিফি শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে আবার ডাক্তার আসিলেন। ডাক্তার হিফির অবলম্বিত এই অভিনব ও অদ্ভুত চিকিৎসাপ্রণালীর যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। রোগী যে আরোগ্যের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে এখন আর তাঁহার সন্দেহ নাই। থাকিবার কথাও নহে। ডাক্তার বলিলেন,—তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই উন্নতি স্থায়ি হইবে।

সে দিনটা এইভাবে অতীত হইয়া গেল। পর দিন রবিবার। হিফি গির্জ্জায় গেলেন। কন্যাবিয়োগের পর, ঐ দিনই প্রথম, পিতাও গির্জ্জায় যাইয়া, নয়নজলে ভাসিয়া, উপাসনা করিলেন। জলযোগের পর, মিষ্টার লিউট কিছুক্ষণ হিফির সহিত বেড়াইয়া বেড়াইলেন। ভ্রমণ-সময়ে আবার ঐ নক্সার কথা উঠিল। হিফির প্রতি সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করা সঙ্গত কি না, যেন এইভাবে, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া, মিষ্টার লিউট মনের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন,—

"আপনি লিচ্‌ফিল্‌ডের হোটেল হইতে, অন্যের নামে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা করিয়া, ভ্রমবশতঃ আমার নামে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহা কিরূপে হইল, এ সমস্যার মীমাংসা অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃতই বলিতেছি, হোটেলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই, আমি আপনাকে দেখিয়াছিলাম,

এবং আপনার পরিচয় পাইয়াছিলাম। যে ভাবে আমি আপনাকে দেখিয়াছিলাম, আমি সেই কাহিনীটা বিবরিয়া বলিতাম; আর আমার কাছে যাহারা থাকিত, তাহাদিগের জড়-বুদ্ধিজনিত অত্যাচারে অধিকতর উৎপীড়িত হইতাম। হা! এই আমার অবস্থা! এই অবোধ ও অজ্ঞান মূর্খেরা মনে করিত, আমি সত্যই পাগল হইয়াছি; এবং চক্ষে শুধুই ধাঁধাঁ দেখিয়া অস্থির রহিয়াছি। ফলতঃ আমি যাহা দেখিতাম, তাহারা তাহার কিছুই দেখিতে পাইত না। সুতরাং আমি কেবলই প্রলাপ-উক্তি করিতেছি, তাহারা এই সিদ্ধান্ত সার করিয়া চিকিৎসার নামে আমায় অশেষ যন্ত্রণা দিত। আমার উন্মাদ-অপবাদের মূল কারণ এখন বুঝিলেন ত?"

লিউট আবার কহিলেন,—"আমি নিশ্চিত বলিতেছি, বাছা কেরোলিনা, পরলোকগত হইবার পরে, প্রকৃতই আমার নিকট সজীব দেহে উপস্থিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। কিছুতেই তাহার এই দর্শনদানে ব্যাঘাত ঘটিত না। মৃত্যুর পরে, কিছু দিন যেরূপ বারংবার দেখিতে পাইয়াছি, এখন আর তেমন ঘন ঘন দেখা পাই না। এক দিন তাহাকে আমি রেলের গাড়ীতে দেখিতে পাই। সে দৃশ্য এখনও পরিষ্কাররূপে আমার মনে আছে। তাহাকে সে দিন রেলের গাড়ীতে বসিয়া তাহার বিপরীত দিকে উপবিষ্ট একটি প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়াছিলাম। আমি যেন তখন সেই পুরুষটির পশ্চাদ্দিকে দাঁড়াইয়া ছিলাম। সুতরাং তিনি কে, আমি ঠিক করিতে পারি নাই।"

"ইহার পরে আমি কেরোলিনাকে একটা ভোজের টেবিলে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। সেখানে আরও কএক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি নিশ্চিত বলিতেছি, তাঁহাদিগের মধ্যে, আপনাকেও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। পরক্ষণে দেখিলাম, কেরোলিনা একটা বড় কামরায়, বহু লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া, কএক ঘণ্টা ব্যাপিয়া, আপনার সহিত কি আলাপ করিতেছে। এই সময়টাই আমার উন্মাদরোগের অত্যন্ত উৎকট অবস্থারূপে গণ্য হইয়াছিল। কারণ, আমি এই ঘটনা দর্শনে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ভয়ানক প্রলাপ-উক্তি রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল।"

"আর একদিনও কেরোলিনাকে আপনার কাছে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, আপনি কি যেন লিখিতে কিংবা আঁকিতেছিলেন, কেরোলিনা আপনার পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি যেন দেখিতেছিল। আপনি তাহার পানে তাকাইতেছিলেন, আর সে সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল। ইহার পরে, আর একটিবার মাত্র আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিয়াছি। অবশেষে আপনার সঙ্গে ঐ হোটেলে আমার সাক্ষাৎকার। হা! এই দৈব-সংঘটিত সাক্ষাৎকার না ঘটিলে, আমার কি উপায় হইত?"

হিকি, লিউটের মুখে এই অভাবনীয়

কাহিনী শুনিয়া, ক্ষণকাল একবারে স্তম্ভিত ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ রহিলেন ; এবং ঈশ্বরের এই অনন্ত-শক্তি-সূত্রিত অসীম-জগতে কিছুই যে অসম্ভব নহে, ইহা চিন্তা করিয়া, মনের কেমন একটা ভাবে ক্রমে অবসন্নবৎ হইলেন। লিউটের মনে পাছে আবার সে প্রাণাধিকা কন্যার শোক নবীভূত হইয়া উঠে,—পাছে তিনি আবার সেইরূপ বিকল হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায়, হিকি প্রত্যুত্তরে কিছুই বলিলেন না।

হিকি, ক্রমান্বয়ে দুইটি দিন পরিশ্রম করিয়া, কেরোলিনার সুন্দর মুখখানি আঁকিয়া তুলিলেন ; শেষে লণ্ডনে যাইয়া প্রতিকৃতির অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করিলেন। এই সময়ে মিষ্টার লিউটের সহিত কএক বার পুনঃ পুনঃ তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল। লিউট সেই হইতে হিকির পরম বন্ধু। কিন্তু কিবা লিউট, কিবা হিকি, কেহই পুনরায় আর সেই পিতৃবৎসলা ও স্নেহবিহ্বলা কেরোলিনার দর্শন লাভ করিলেন না। কেরোলিনার দর্শন-দান ও ক্রীড়া-কৌশলময়ী দেবমায়া, বুঝি চিত্রসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই, চিরকালের তরে পরিসমাপ্ত হইল।

হিকির অঙ্কিত তৈল-চিত্র যার-পর-নাই যত্নের সহিত লিউটের শয়নকক্ষে স্থাপিত হইল। তৈলচিত্রের দুই পার্শ্বে হিকিকৃত নক্সা দুটিও দোলায়িত রহিল। নীচে লিখিত রহিল,—"C. L., 13th. September, 1858, aged twenty-two." অর্থাৎ "সি, এল, বাইশ বৎসর বয়স ;—১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ সাল।" মায়ারূপিণী কেরোলিনা নিজের সদৃশ-মূর্ত্তিজ্ঞানে, যে খোদাই ছবিখানি হিকিকে দেখিতে দিয়াছিলেন, উহাও ঐস্থানে আদরের আসন পাইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আজিকার এই আত্মিক-কাহিনী পাঠকদিগের নিকট বড়ই বিস্ময়াবহ বোধ হইবে। ইহা প্রকৃত পক্ষে, আমাদিগের নিকটও, যার-পর-নাই বিস্ময়াবহ বোধ হইয়াছে। কিন্তু, বিস্ময়াবহ হইলেও, আমরা ইহার সমস্ত কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। আমরা অধুনাতন ইংরেজী সাহিত্যের অনেক পুস্তক ও পত্রিকায় টমাস হিকির বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিচার-শক্তির অনেক প্রশংসাবাদ পড়িয়াছি। টমাস হিকির মত একটি সর্ব্বত্র-সুপরিচিত, সম্মানিত ব্যক্তি, যে কাহিনীকে, জগতের নিকট, শপথকারের মত দৃঢ় বাক্যে, সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সে কাহিনী অসত্য কিংবা অমূলক হইতে পারে, এমন কথা আমাদিগের মনে ঠাঁই পায় না। তবে ইহার বহু কথাই বুঝি না কেন ?—বহু কথারই উত্তর দিতে পারি না কেন ? পারি না, পারলৌকিক-জীবনের নিয়মাদি-সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না বলিয়া।

আমাদিগের এই ভারতবর্ষে, বহুকাল পূর্ব্বে, দেবমায়া নামে একটা শব্দ প্রচলিত ছিল। তখনকার লোকেরা দেবমায়া শব্দে যাহা বুঝিতেন, এখনকার অধ্যাত্মবাদী বৈজ্ঞানিকেরা—Psycholisation—সাইকলিজেশন শব্দেও ঠিক তাহাই বুঝিয়া থাকেন।

সাইকলিজেশন শব্দের অধুনাতন বাঙ্গালা নাম অধ্যাত্ম-মোহনী অথবা মায়িক-মোহন। ইহার এই তাৎপর্য্য যে, পরলোকবাসী সূক্ষ্ম-শরীরীরা, মনুষ্যকে মায়াশক্তিতে মোহিত করিয়া, যেখানে ইচ্ছা সেখানে লইয়া যাইতে পারেন,—যাহা ইচ্ছা তাহা দেখাইতে পারেন, এবং একই স্থানে, দশজনকে ধাঁধাঁর আঁধারে আবরিয়া রাখিয়া, এক জনকে মাত্র দেখা দিতে এবং শুধু তাহারই সহিত আলাপ করিতে পারেন। যাঁহারা উল্লিখিত দেব-মায়া অথবা মায়িক-মোহনে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগের নিকট এ অলৌকিক কাহিনীর কোন কথাই অবিশ্বাসের হইবে না। অলমতিবিস্তরেণ।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "বঙ্গভাষা। মাসিক পত্র। সম্পাদক কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্ম্মা। স্বাধীন ত্রিপুরা, আগরতলা রাজধানী হইতে প্রকাশিত। ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ।" এ দেশে, প্রতি বৎসরই, দুই এক খানি পুরাতন পত্রিকা কাল-স্রোতের প্রবল ভাঁটায় ভাসিয়া যায়; এবং দুই এক খানি নূতন পত্রিকা, জলোৎসৃষ্ট ফুলের মত, সেই স্রোতের প্রত্যাবৃত্ত জোয়ারে, নববিকশিত সৌন্দর্য্যে, ভাসিয়া ভাসিয়া, আশার একটুকু মধুর হাসি হাসিয়া, আবার সম্মুখে আসিয়া দেখা দেয়। যে সকল সাহিত্যপত্র,এই ভাবে, বাঙ্গালা ১৩১০ অব্দে, বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন প্রবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গভাষার নাম উল্লেখ-যোগ্য।

'বঙ্গভাষা' এই নাম শুনিয়া প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলাম যে, ইহা বাঙ্গালা ভাষার (Philological Research অর্থাৎ) শব্দ-বিজ্ঞান-ঘটিত বিবিধ তত্ত্বের সমালোচনা লইয়াই বিশেষরূপে ব্যাপৃত রহিবে। কিন্তু আমরা এখন পর্য্যন্ত ইহার যে কএক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে এইরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের অনুসরণ-চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে, ইদানীন্তন পাঠকবর্গের জন্য, ইহার সকল প্রবন্ধই নোটের উপরে শিক্ষাপ্রদ; কোন কোন প্রবন্ধ, অর্থবোধে জটিল হইলেও, সুশিক্ষার পরিচায়ক।

এই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার সুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা উন্নতমনা, উদার-হৃদয় ও উদ্যমশীল সাহিত্যসেবী;—ভোগ-বিলাসের বিবিধ সুখ-সামগ্রীতে বেষ্টিত রহিয়াও, সারস্বত ব্রতের শ্রম-দায়িত্ব অনুরাগী। তাঁহার যত্ন ও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রহিলে, ইহা কালে অধিকতর উন্নতি লাভ করিবে; এবং ইহার দ্বারা নিশ্চয়ই পুরাতন-কীর্ত্তিসম্পন্ন আগরতলার সাহিত্যিক গৌরব বাড়িবে।

সম্পাদক, বৈশাখের সংখ্যায়, সূচনায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আলোচনার যোগ্য অনেক ভাল কথা আছে; কিন্তু সকল কথা

সম্যক্ ফোটে নাই, এবং সুতরাংই তাহাতে আমাদিগের সহানুভূতি নাই। তাঁহার এই প্রবন্ধে সংস্কৃতমূলক শব্দের উপর সামান্য একটুকু কটুকটাক্ষ রহিয়াছে। কিন্তু,তাঁহার লেখার যেখানে যাহা পাঠ করা যায়, তাহাতেই দৃষ্ট হয় যে, তিনি স্বয়ং সংস্কৃত-মূলক-শব্দেই সমধিক অনুরাগী। যথা, তিনি আধুনিক বাঙ্গালার দুইটি বহমান স্রোতের মধ্যে একটির বর্ণনায় কহিতেছেন,—"একটি শুষ্ক সংস্কৃত-কুসুম হইতে সংস্কৃতস্পর্শী বৃক্ষ উৎপাদন করিতে প্রয়াসী।" আর এক স্থানে আছে,—"বৈধ উপায় অবলম্বনে সংস্কৃত ও কথিত বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় অন্যান্য ভাষা হইতেও উপাদান আত্মভূত করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য।" এই বাক্যে, আপনার করিয়া লওয়া, এই সোজা কথার পরিবর্ত্তে, আত্মভূত শব্দের প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় কি না, এবং আত্মভূত বলিলে, ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ পায় কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের গভীর সন্দেহ। কিন্তু সে কথা যেমন হউক, উপরিধৃত উভয় বাক্যই ঐ কটাক্ষ-প্রেক্ষিত ও উপেক্ষিত "শুষ্ক-সংস্কৃত-কুসুম"-ছিন্ন সুরভি পাপ্ড়িসমূহে সজ্জিত দৃষ্ট হইতেছে কি না, সহৃদয় সম্পাদক স্বয়ংই তাহার বিচার করিবেন।

সম্পাদক আর এক স্থানে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালার 'মন্থরগতি' বর্ণনায় কহিয়াছেন,—"ইহার আকরোৎস শুষ্ক প্রায়।" প্রথম কথা, আকর আর উৎস শব্দের অর্থগত পার্থক্য। যদিও আকর শব্দ, মৌলিক অর্থে, উৎপত্তিস্থানকে লক্ষ্য করে, তথাপি উহা প্রধানতঃ সোনারূপার খনি ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না; যথা অমরকোষে,"খনিঃ স্ত্রিয়ামাকরঃ স্যাৎ।" —পক্ষান্তরে, উৎস বলিলে শুধুই নির্ঝর বুঝায়। যথা, "উৎসঃ প্রস্রবণং বারিপ্রবাহো নির্ঝরো ঝরঃ।" সুতরাং, যাহা আকরে থাকে, তাহা উৎসে থাকে না; যাহা উৎস হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়ে, অথবা ধারায় নিঃসারিত হয়, তাহা আগ্নেয়গিরি ছাড়া আর কোথাও আকরে থাকিতে পারে না। অপিচ, উৎস শুষ্কপ্রায় হইতে পারে, কিন্তু আকর বোধ হয় কখনও শুষ্ক হয় না; এবং যেখানে আকরোৎসের শুষ্কতা প্রভৃতি বিশুদ্ধ শব্দ বিশেষ অনুরাগের সহিত প্রযুক্ত হয়, সেখানে নিশ্চয়ই সংস্কৃতানুরাগিনী বাঙ্গালার গতি-মন্থরতা প্রমাণিত হয় না।

ফল-কথা কুমার সুরেন্দ্র, তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে, প্রকারতঃ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। পুরাতন সংস্কৃত ও নূতন বাঙ্গালা উভয়ই আদরের বস্তু, উভয়ই আমাদিগের প্রাণ-প্রিয়। সংস্কৃতকে ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালার কিছুই থাকে না; আর বাঙ্গালা রচনায় যদি সুরুচির পরিচায়ক সহজবোধ্য বাঙ্গালা শব্দ যথেষ্ট ঠাঁই না পায়,তাহা হইলে, সে বাঙ্গালা, বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর প্রভৃতির মত, ব্যক্তিবিশেষের হাতে, অর্থবোধক হইলেও, প্রায়শঃ সুন্দর হয় না, এবং কখনও স্বাদ-গ্রাহী বাঙ্গালির হৃদয়হারিণী হইতে পারে না। কিন্তু, এই দুইয়ের সুচারু মিশ্রণ অবশ্যই একটু বেসী যত্নসাপেক্ষ।

আমরা বঙ্গভাষার সমালোচনায়, আজি স্থানাভাব-বশতঃ, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লইয়াই দুটি কথা বলিলাম। আর একবার, ইহার (Contributor অর্থাৎ) করদ-লেখকদিগের কথা কহিব। পাঠক, দয়া করিয়া মনে রাখিবেন যে, আমরা এখানে রাজকর অর্থে কর শব্দের ব্যবহার করি নাই। করদ শব্দের আর এক অর্থ করাবলম্বদাতা, অর্থাৎ পরিপোষক। বঙ্গভাষার করদ-লেখকদিগের মধ্যে অনেকে প্রায় সকল পত্রেই লিখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সুপরিচিত, কেহ কেহ সুপরিচিত না হইলেও সুলেখক।

২। "ধূমকেতু। মাসিক পত্র ও সমালোচনার সমালোচন। শ্রীনীরদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।" ধূমকেতু সম্বন্ধে আগে আমরা, একটু আত্মকথা কহিয়া, তার পর ধূমকেতুর কথা কহিব। আত্মকথা কহিবার প্রয়োজন আছে। ধূমকেতু, আমাদিগের গিরিশ-যন্ত্রে, গিরিশ-যন্ত্রের প্রিণ্টার শ্রীযুক্ত হরিহর নন্দীর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়; এবং গিরিশ-যন্ত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ ও বান্ধবের সহকারিসম্পাদক শ্রীমান্ বাবু উমেশচন্দ্র বসু প্রণীত প্রবন্ধাদিও উহাতে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ধূমকেতুর সহিত গিরিশ-যন্ত্রের এই সম্পর্ক দেখিয়া, স্থানীয় পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, উহার সহিত বান্ধব-সম্পাদকেরও কোন প্রকার সাহিত্যিক সম্পর্ক আছে। আমরা এই অহেতুক সংস্কারের উন্মূলনার্থ সকলকেই স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছি যে, ঢাকার এই অভিনব সাহিত্যপত্রের সহিত, বান্ধব-সম্পাদকের, সাহিত্যিক কিংবা সাংসারিক কোন সম্পর্ক নাই; এবং আমরা আজি পর্য্যন্ত একটি পৃষ্ঠা কিংবা একটি পংক্তি উপহার দিয়াও ধূমকেতুর অঙ্গ পুষ্টি করি নাই। সুতরাং, যাঁহারা, প্রকৃত কথা জানিবার জন্য যত্ন না করিয়া, আমাদিগকে ধূমকেতুলভ্য প্রতিপত্তির প্রধান একটা ভাগ উপহার দিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সে উদার আকাঙ্ক্ষা এ অংশে ব্যর্থ হইতেছে।

এখন ধূমকেতুর কথা। ধূমকেতুর লেখক, প্রকাশক, পৃষ্ঠপোষক ও সম্পাদক প্রভৃতি সকলকেই আমরা বহু দিন হইতে বিশেষরূপে জানি; এবং তাঁহারা দয়া করিয়া, এ অকৃতি-বান্ধব-সম্পাদকের প্রতি যার-পর-নাই প্রীতিশ্রদ্ধা ও সম্মাননার ভাব প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এই জন্যও আমরা তাঁহাদিগের নিকট একান্ত বাধিত আছি। সুতরাং, সৌহার্দ্দের এইরূপ ঘনিষ্ঠতা স্থলে, ধূমকেতুর সমালোচনায়, অপরিচিতের মত আলাপ করা আমাদিগের বিবেচনায় উপযুক্ত হয় না।

যিনি ধূমকেতুর সম্পাদক বলিয়া বিজ্ঞাপিত, তিনি ছোট ছোট শ্লেষ-কবিতার দ্বারা ধূমকেতুর সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়া থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রকাশক মাত্র। ইদানীং অনেক সাহিত্যপত্রেরই সম্পাদকেরা শুধু প্রকাশকের কার্য্য করিয়া পরিতৃপ্ত রহিতেছেন। ইহা সঙ্গত কি না, এ কথা লইয়া

আমরা বিচার করিতেছি না। কিন্তু, ইহাই আজি-কালি দেশের প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধূমকেতুর সম্পাদকও প্রকাশকতার অতিরিক্ত কোন কার্য্য করিতেছেন, এমন আমাদিগের বোধ হয় না।

অপিতু, যিনি ধূমকেতুর প্রকৃত সম্পাদক ও প্রধান লেখক, তিনি একটি উৎসাহপূর্ণ, উচ্চসংকল্প ও সমাজহিতৈষী সমৃদ্ধ যুবা; এবং বহুপ্রকার বিলাস-সম্পদে বেষ্টিত রহিয়াও, কুমার সুরেন্দ্রের ন্যায়, সাহিত্যসেবা ও সাহিত্য-সমালোচনের আনন্দে সতত মগ্ন। তিনি কি নিমিত্ত, আপনি পৃষ্ঠভূমিতে রহিয়া, সুখ-লভ্য যশোমানে উপেক্ষা দেখাইতেছেন, এবং পরের মুখে প্রাণের কথা কহিয়া, চিত্তে আনন্দ অনুভব করিতেছেন, ইহা আমাদিগের বোধগম্য হইতেছে না। তিনি, পুনঃ পুনঃই, ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে, বলিয়া আসিতেছেন যে, ধূমকেতুর প্রয়োজন অতি গুরুতর,—প্রয়োজন সমালোচনায় সত্য কথা বলা। সত্যই যদি ধূমকেতুর আরাধ্য বিগ্রহ, তাহা হইলে, উহার ব্রতধর্ম্ম-পরিপালনে, সর্ব্বপ্রথমে, আত্মসম্পর্কেই অসত্যের এইরূপ অনুষ্ঠান কেন? কিন্তু সত্য যেমন মনুষ্যের উপাস্য, প্রীতিও সেইরূপ তাহার আরাধ্য বস্তু। যেখানে সত্যের সহিত প্রীতির সুখ-সংমিশ্রণ সংঘটিত হয়, শঙ্কা অথবা লজ্জা কোন প্রকারেও সেখানে স্থান পাইতে পারে না।

ধূমকেতুর কবিতাগুলি সুন্দর হইতেছে। আমাদিগের ভরসা হয়, অর্দ্ধেন্দুরঞ্জন, বাঙ্গালা ও ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের প্রকৃতি পাঠ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার করিলে, কালে সুকবি হইবেন। তাঁহার কবিতা সুখ-বোধ্য, সবল, সরল ও মধুর; কখনও কখনও হৃদয়স্পর্শিনী। তিনি, আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যের বান্ধা গতের বাঁধনী এড়াইয়া, উচ্চ-আদর্শের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে যত্ন করিতেছেন না, ইহাতে আমরা দুঃখিত আছি।

ধূমকেতুর প্রবন্ধনিচয়ও একটুকু স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক। কিন্তু চিন্তা, কোন কোন প্রবন্ধে, স্তূপীভূত-প্রস্তর-প্রতিহত পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায়, 'গম্ভীর শব্দে মুখরিত' হইয়া, গড়-গড় গর্জ্জনে মনুষ্যের মনে ভাবান্তর জন্মাইয়াছে; অনবরুদ্ধ প্রবাহিণীর মত, আনন্দের ঢেউ খেলাইয়া, বহিয়া যায় নাই। ইহার দৃষ্টান্তস্থল 'মন্ত্রজাগরণ' নামক প্রবন্ধ। মনঃশক্তির প্রয়োগ আর মন্ত্রজাগরণ এক কথা নহে। মন্ত্রজাগরণের প্রকৃত অর্থ নিদ্রিত চিন্তার উদ্বোধন। ইংরেজী করিয়া বলিলে ইহাকে Awakening of Thought বলা যাইতে পারে। কিন্তু মন্ত্রজাগরণ প্রবন্ধের আগা গোড়া সকল কথাই মনঃশক্তির প্রয়োগ লইয়া ব্যাপৃত।

"বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্গমহিলা" নামক প্রবন্ধটিও মোটের উপর উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উহাতে দুই একটি নূতন কথা আছে। যথা, —"দরিদ্রের ভাল ছেলে যেমন সৌভাগ্য সূচনায় অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হয়, আমাদের বাঙ্গালা ভাষারও সেইরূপ অবস্থা হইতে চলিয়াছে।" কিন্তু লেখক, ইহার দুটি দুস্তর

পরেই, যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের দুঃখ বোধ হইয়াছে। আমাদিগের এইরূপ মনে লইয়াছে যে, তিনি সমালোচনায় যেরূপ অনুরাগী, শব্দ-গ্রন্থন-শিক্ষায় তেমন সাবধান নহেন। যথা,—"যাঁহারা অর্থে স্বচ্ছল (!) কিম্বা বেশী মাত্রায় গলাবাজী করিতে পারেন, তিনি (!) তাঁহার পতাকার তলে, স্তাবকের দল একত্র করেন।" লেখক তাঁহার এই স্বরচিত বাক্যটি দুই তিনবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই বুঝিতে পাইবেন যে, চিত্রকার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিতে হইলে, যেমন হাতে তুলী লইয়া, প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত, পরিশ্রম করিতে হয়; শব্দচিত্রণে নিপুণতা লাভ করিতে হইলেও, হাতে কলম লইয়া, সেইরূপ অথবা তাহা হইতেও প্রগাঢ়তর ভক্তির সহিত সুদীর্ঘ কাল পরিশ্রম করা আবশ্যক। ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক এডিসন এগারবার বার তাঁহার আত্মলেখার দোষগুণ পরীক্ষা করিতেন। অসামান্য চিন্তাশীল এমার্শন, তাঁহার কোন রচনাই, অন্ততঃ চল্লিশ বার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা না করিয়া, প্রেসে দিতেন না। এমন স্থলে, আমাদিগের মত লেখকেরা, আপনার লেখা লইয়া, চারি পাঁচ বার পরীক্ষা করিলে দোষ কি?

ধূমকেতুর তৃতীয় সংখ্যায় আত্মকথা নামক একটি প্রবন্ধে সরস-সচ্ছল-লিপিক্ষমতার পরিচয় আছে। কিন্তু উহার শব্দনির্ব্বাচনে সর্ব্বত্রই তাদৃশ সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও গুণপণার পরিচয় নাই। যথা—"সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যাঁহারা ধুরন্ধর লেখক।" এখানে ধুরন্ধর শব্দের অর্থ কি? যাঁহারা রাজনৈতিক শক্তি-প্রয়োগে একটা রাজ্য কিংবা মহারাজ্যের সুখ-দুঃখ-সংক্রান্ত ভার বহন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ধুরন্ধর পুরুষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই ভারবহন অর্থের ব্যাবৃত্তি ঘটাইয়া ধুরন্ধর শব্দকে লেখকের বিশেষণেও প্রয়োগ করা যায় কি? ধূমকেতুর এ সকল দোষ কালে থাকিবে না। থাকিবে উহার বিশেষত্ব অথবা উদ্দেশ্যের একাগ্রতা। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, সে অংশে উহা, এক সময়ে, সমুচিত সম্মান পাইবে; এবং উহা নব্য-সাহিত্যিকদিগের উচ্ছৃঙ্খল-চারিতার পথে নিশ্চয়ই কতকটা বাধা দিবে। ধূমকেতুর সমালোচনপদ্ধতি আমাদিগের সম্যক্ অনুমোদিত নহে। এ বিষয়ে আমাদিগের যাহা বলিবার আছে, তাহা আর এক সময় বলিব।

৩। "নবনূর। মাসিক পত্র ও সমালোচন। মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত।" বঙ্গদেশের মুসলমানেরা এত দিন বাঙ্গালা সাহিত্যের আনন্দময় বিকাশ ও অসামান্য বৈভবের সহিত সর্ব্বতোভাবে সম্পর্কশূন্য ছিলেন। নবনূরের মত সাহিত্য-পত্র প্রকাশের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাহাদিগের ধীরে ধীরে নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে, এবং তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া পূজা করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। ইহা দেশের সৌভাগ্য। সৌভাগ্যের আর একটি লক্ষণ এই, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই, সহৃদয়তার সুকোমল আবেশে, জাতিনির্ব্বিশেষে, ইহার লেখকতার কার্য্য করিতেছেন; এবং পরস্পর-সুখ-সংবর্দ্ধনার সহৃদয় শিষ্টাচারে সাহিত্য-সেবার গৌরব বাড়াইতেছেন। নবনূরে ছোট ছোট কবিতা, এবং ছোট ছোট উপন্যাসেরই একটুকু বেশী আধিক্য। লেখকেরা সাহিত্য-সমালোচনেও একান্ত অনুরাগী। ইহা সাধারণতঃ উপকারজনক। কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে

নূতন প্রবিষ্ট, তাঁহারা সাহিত্য-সমালোচন অপেক্ষা সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য পুষ্টির কার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হইলে, দেশীয় সাহিত্যের বেশী উপকার হয়।

মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলী এবং মৌলভী আবদুল করিম প্রভৃতি ব্যক্তিরা বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে কিরূপ শিক্ষিত, তাহা আমরা এখন পর্য্যন্তও ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ মহামান্য মৌলভী উপাধি, এবং তাঁহাদিগের মত অন্যান্য মুসলমান লেখকদিগেরও তাদৃশ মানাস্পদ উপাধি দর্শনে আমাদিগের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, তাঁহারা সকলেই ভারত-বিখ্যাত উর্দ্দু ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ও সুতরাং ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সাধারণতঃ প্রগাঢ় অনুরাগী। কারণ, উর্দ্দু ভাষার ব্যাকরণ এমনই সুচারু-গ্রথিত যে, যে একবার উহার অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হয়, সে কস্মিন্ কালেও আর ব্যাকরণ-শাস্ত্রের বুকের উপর বীভৎস পদাঘাত করিতে সাহস পায় না। কিন্তু, এইরূপ সুপণ্ডিত ও সদুদ্যম ব্যক্তিদিগের দ্বারা সম্পাদিত নবনূরের বহু স্থলেই, বাঙ্গালা ব্যাকরণের বর্ণবিন্যাস ও শব্দবিন্যাস সম্পর্কে, অতি ভয়ঙ্কর অত্যাচার দেখিয়া, আমরা অবশ্যই চিত্তে একটুকু দুঃখিত হইয়াছি।

প্রথম, বর্ণবিন্যাস ;—যথা তৃতীয় সংখ্যায়,—'তপস্তেজপূর্ণ' 'তদানিন্তন' 'ভ্রমশঙ্কুল' 'বিভৎস' 'ধনিষ্ট' 'শতাব্দি' ইত্যাদি। তার পর শব্দবিন্যাস,—যথা 'পিশাচিনী,' 'মহদেচ্ছা,' 'মজ্জার বিন্যাস' ইত্যাদি। বর্ণবিন্যাসের ভুল দেখাইতে যাওয়া বৃথা। কেন না, ইহা নিশ্চয়ই লেখক অথবা সম্পাদকের অসাবধানতার ফল। শব্দরচনার ভুল সকল সময়ে অসাবধানতার ফল নহে; সুতরাং সে বিষয়ে দুটি কথা বলিলে, তাহা উপেক্ষিত হইবে না। ১ম শব্দ 'পিশাচিনী।' ইহা, নব্যবাঙ্গালায় নূতন না হইলেও, অশুদ্ধ ও অপ্রামাণিক। ২য় শব্দ 'মহদেচ্ছা'। ইহা নব্যবাঙ্গালায়ও একবারে নূতন ; এবং বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ব্রজভাষা ও পালী প্রভৃতি সমস্ত সুপরিচিত ভাষার পুরাতনী রীতির সীমার বহির্ভূত। বাঙ্গালায় 'মহদ' নামে অকারান্ত কোন শব্দ নাই। সুতরাং সে মনঃকল্পিত অকারের সহিত সন্ধিসমাস করিয়া কোনক্রমেও 'মহদেচ্ছা' শব্দ সৃষ্টি করা যায় না। অপিচ, দেশের শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত কেহই এমন শব্দ ব্যবহার করে না। মহৎ শব্দের সহিত সন্ধি করিলে মহদিচ্ছা হইতে পারে। কিন্তু মহদিচ্ছা শব্দ চির-প্রচলিত সমাস-শাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। তবে এখানে কি লিখিতে হইবে? লিখিতে হইবে সোজা কথায় মহৎ ইচ্ছা, অথবা মহতী ইচ্ছা। যেখানে সোজা কথায় সহজে কাজ চলে, সেখানে অকারণ সন্ধিসমাস করিতে যাইয়া ভাষাকে বিপন্ন করিব কেন? তৃতীয় শব্দ 'মজ্জার বিন্যাস'। এখানে মজ্জা শব্দ সর্ব্বতোভাবেই অপপ্রযুক্ত ; কেন না, ইহা দ্বারা কোন অর্থেরই পরিস্ফুটতা হয় না।

নবনূরের প্রধান লেখকেরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ধর্ম্মানুরাগী, এবং স্বদেশের শুভাভিলাষী। তাঁহাদিগের শুভ সংকল্প সমাজের মঙ্গলে পরিণত হউক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাদিগের পরিশ্রমেও পুষ্টি লাভ করুক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

দ্বিতীয় খণ্ড ] আশ্বিন কার্ত্তিক, ১৩১০। [ ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা।

# বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

( পুনঃপ্রচারিত। )

বৈশাখ হইতে চৈত্রে বর্ষ-গণনা।

৬। ৭

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।



ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য দশ আনা।

## বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয়
## নিয়মাবলী।

### অগ্রিম।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩৲ | ।৵০ | ৩।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২৲ | ৶০ | ২৶০ |

### পশ্চাদ্দেয়।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৪৲ | ।৵০ | ৪।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২॥০ | ৶০ | ৩॥৶০ |

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারী সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইলে কার্য্যাদি সম্পর্কে আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়।

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হইবে না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা হয়, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৵০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲. এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

ঢাকা,
বান্ধব কুটীর।
১৩১০ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীহরকুমার বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা দুঃখের সহিত নিবেদন করিতেছি যে, আমাদিগের ভক্তি-ভাজন উপদেষ্টা বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর কিছুকাল রোগে ও দুঃসহ শোকে অভিভূত থাকা হেতু বান্ধব প্রকাশে এবার অনুচিত বিলম্ব ঘটিয়াছে। বান্ধবের গ্রাহকবর্গ আমাদিগের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমরা এবার আশ্বিন ও কার্ত্তিকের ডবল সংখ্যা নয় ফর্ম্মায় প্রকাশ করিলাম। গ্রাহকগণের প্রাপ্য অবশিষ্ট তিন ফর্ম্মা ইহার পর-পর-সংখ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। শ্রীউমেশচন্দ্র বসু ম্যানেজার।

# উড্ডীন পর্ব্বত।

প্রাচীন কবিরা, কল্পনার প্রথমোন্মেষ-সময়ে, পর্ব্বতকে পশুপক্ষী অথবা মনুষ্যের ন্যায় উচ্চশ্রেণির জীব বলিয়া জানিতেন; এবং উহা, জটায়ু, সম্পাতি কিংবা গগনবিহারী ভীম-শরীরিগণের সম্রাট্, শর্ব্বরতনু গরুড়ের মত, এক দেশ হইতে আর এক দেশে উড়িয়া যাইতে পারে,—একটা রাজ্য কিংবা রাজধানীর উপর অভাবনীয় শক্তিতে আপতিত হইয়া তত্রত্য সমস্ত জীব-জন্তুকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়, এইরূপ জ্ঞানে পর্ব্বত মাত্রকেই উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেন। তাঁহাদিগের সেই উড্ডীন পর্ব্বতেরা, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে, ছিন্নপক্ষ হইয়া, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, শোভা ও সামর্থ্যের সম্মিলিত-প্রতিমূর্ত্তিবৎ, পড়িয়া রহিয়াছে; সে অসংখ্য পর্ব্বত-রাজির মধ্যে এক মাত্র মৈনাক, গিরিরাজ-মহিষী মেনকার আদরে, দেবাদিদেব মহাদেব কিংবা অন্য কোন দেবতার বরে, আজিও উহার শিশুসমুচিত প্রাণটা ও সুরম্য পক্ষপুট লইয়া, সমুদ্রের অতল গর্ভে অক্ষুণ্ণ দেহে লুকাইয়া আছে।

মানব-জাতির পুরাতন কল্পনার সেই উড্ডীন পর্ব্বত-নিচয়, একটি একটি করিয়া, আর এক মূর্ত্তি ধারণের দ্বারা, অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে নামিয়াছে; কিন্তু আধুনিক উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার উড্ডীন পর্ব্বত, শোভা ও সামর্থ্যের অন্যপ্রকার অথচ উজ্জ্বলতর মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া, অদ্যাপি মনুষ্যের হৃদয় ও মনের উপর অহোরাত্র সজীব-শক্তির ন্যায় কার্য্য করিতেছে। সে উড্ডীন পর্ব্বত কোথায় রহিয়াছে,—কোথায় গেলে মনুষ্য উহার দর্শন লাভ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারে, তাহা বলিয়া দিতে হইবে কি? উহা কি বেবিলনের উদ্যানের মত বড়ই একটা দূরবর্ত্তি ও দুর্লভ বস্তু?

মনুষ্য বেবিলনের ইতিহাস-বিখ্যাত আশ্চর্য্য উদ্যান দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রীর ন্যায় ক্লেশ স্বীকার করিত। কিন্তু সে উদ্যানকে কোন ক্রমেই উড্ডীন উদ্যান বলা যাইতে পারে না। কেন-না উহা কখনও উড়ে নাই। উহাকে আকাশ-বিলম্বিত সামগ্রী বলিয়াও সম্মান করা অসম্ভব। কেন-না উহা কখনও আকাশিক পদার্থের ন্যায় আকাশে বিলম্বিত রহে নাই।* ঐতিহাসিকেরা উহার অতীত গৌরবের কথা লইয়া যতই কেন আন্দোলন না করুন, উহা প্রকৃত পক্ষে অতি সামান্য

---

* পাঠক, সে উদ্যানের সবিশেষ জানিতে ইচ্ছুক হইলে, (Charles Rollin) রলিন-প্রণীত আসীরিয়ান্ জাতির পুরাতন ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন।

বস্তু। অপিতু, আমি যে উড্ডীন পর্ব্বতের কথা কহিতেছি, উহা কাব্য ও জ্ঞান উভয়ের চক্ষেই অসামান্য, অথচ দর্শনে সুলভ। কিবা প্রাসাদ-বিলাসী প্রমদ-পুরুষ, কিবা কুটীর-চারী প্রশান্ত ভাবুক, উহা সকলেরই নিত্য-সঙ্গী। উহা তীর্থের ন্যায় দুরধিগম্য না হইয়াও অশেষ-বিধ উচ্চ ভাবের কাব্যতীর্থ। তাই আবারও জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে উড্ডীন পর্ব্বত, এই উদধিমেখলা বসুন্ধরার কোন্ প্রদেশে, কার কিরূপ ইঙ্গিতে, কি উদ্দেশ্যে, আকাশ-পথে অবস্থিত রহিয়া, মনুষ্যের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইবে কি?

দেখিতে চাও ত, চাহিয়া দেখ। মনুষ্যের ভাষা যাহাকে মেঘ বলিয়া বর্ণনা করে,—মনুষ্যের বিজ্ঞান যে মেঘমালার প্রকৃতি ও গতি-পদ্ধতির তত্ত্ব-পরিজ্ঞানের জন্য বিবিধ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে,—নিদাঘ-ক্লিষ্ট বালক-বালিকারাও গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, বলাকার মালাশোভিত নীলাঞ্জন আকাশে, যে প্রকার নিবিড়-কৃষ্ণ মেঘ-নিবহের নূতন-দর্শনে, বন-শিখীর ন্যায়, নাচিয়া নাচিয়া আনন্দ করিতে ভালবাসে, উহারা প্রত্যেকেই এক একটি উড্ডীন পর্ব্বত। পাখা নাই, তথাপি উহারা সতত উড্ডীন। উহারা আমাদিগের মাথার উপরে, অথবা চক্ষের সম্মুখে, ঊর্দ্ধগগনের চারি ধারে, উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এবং শ্বেত শ্যাম, নীল লোহিত, হরিৎ পীত অথবা পিঙ্গল ও স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভৃতি নানাবিধ নয়ন-মনঃশীতল ঝলঝল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছে, দক্ষিণ হইতে উত্তরে ধাবিত হইতেছে;—আর মাঝে মাঝে, বক্ষে বিদ্যুতের মালা পরিয়া, অথবা অধরে হৃদয়হারি বিদ্যুতের হাসি হাসিয়া, মনুষ্যের মনে ভয় ও বিস্ময়ের সহিত হর্ষ জন্মাইতেছে। উহারা প্রকৃতই উড্ডীন পর্ব্বত নয় কি?

মনুষ্য আজ পর্য্যন্ত গাঙের ঢেউ গণিয়া অঙ্ক পাত করিতে পারে নাই। সে কখনও ঊর্দ্ধচর-মেঘ-নিচয় অথবা উড্ডীন পর্ব্বত-মালার লীলাময় রূপের তরঙ্গ চিত্রকরের তুলিকায় আঁকিয়া তুলিতে, অথবা বর্ণনায় পরিব্যক্ত করিতে পারিবে কি না, তাহা জানি না। উহারা কতকটা মনুষ্যের মনোগত ভাবের অনুরূপ, অথবা কবি-কল্পনার অতিরিক্ত আর এক অর্থে * 'কামরূপ'; সুতরাং শিশুর চক্ষে এক, যুবার চক্ষে আর;—সুখ-সিক্ত সোহাগিনী অথবা সদানন্দ প্রেমিকের চক্ষে এক বস্তু, এবং দুঃখদগ্ধ বিরহিণী অথবা বিষাদ-মগ্ন বৃদ্ধের চক্ষে আর এক বস্তু। উহাদিগের অঙ্গে অঙ্গে ও স্তরে স্তরে কত ভাবের কত মূর্ত্তি এবং কতই কি লিখিত থাকে, কে আমায় তাহা বুঝাইয়া বলিবে?

শুনিয়াছি, শ্যাম-বিরহিণী রাই উন্মাদিনী—প্রেমোন্মাদের সেই অচিন্ত্য-তত্ত্বরূপিণী ব্রজকাব্য-বিলাসিনী রাধিকা যখন, সুদূর-ব্যবহিত শ্যামসুন্দরের বিরহসন্তাপে জর্জ্জরিত হইয়া, নয়নজলে ভাসিতেন, তখন ঐরূপ উড্ডীন পর্ব্বতের মাধুরী দর্শনে, তাঁহার মনে,

*—"কামরূপং মঘোনঃ"।

মহামোহময় ভাব জন্মিত। আমার এ প্রেম-শূন্য শুষ্ক হৃদয় যাহাকে উড্ডীন পর্ব্বত বলিয়াই পরিতৃপ্ত রহিতেছে, তিনি উহার প্রত্যেক পটলে শিখিপুচ্ছের আভা দেখিতেন; এবং সময়ে সময়ে, তাঁহার প্রেমারাধ্য নবঘনশ্যামের জগন্মোহন রূপের ঝলক দেখিতে পাইয়া, 'আহা কি দেখিলাম' বলিয়া, দেখিবার অতৃপ্ত পিপাসায় আকুল প্রাণে ছুটিয়া বাহির হইতেন। ভাব-বিভোর বৈষ্ণব কবিরা, মেঘ-দর্শনোন্মাদিতা আত্মবিস্মৃতা রাধার মনের কথা কহিতে যাইয়া মানুষকে কাঁদাইয়াছেন। বঙ্গের আধুনিক কবিও, রাই উন্মাদিনীর প্রেমময় প্রাণের কথা কতকটা অনুবাদ করিয়া, সেই ভাবেই কহিতেছেন,——

"চেয়ে দেখ, প্রিয় সখি, কি শোভা গগনে!
　　সুগন্ধ-বহ-বাহন,
　　সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দ গতি প্রেমানন্দ মনে!
　　ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি,
　　মেঘ-রাজ ধ্বজোপরি,
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে!"

*　　*　　*

"হায়রে কোথায় আজি শ্যাম জলধর!
　　তব প্রিয় সৌদামিনী,
　　কাঁদে নাথ একাকিনী,
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধা-মনোহর?
　　রত্নচূড়া শিরে পরি,
　　এস বিশ্ব আলো করি,
কনক উদয়াচলে যথা দিনকর!"

কবি কালিদাস, মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার সরস-মধুর কথা পর্য্যন্ত, প্রায় সকল কথায়ই প্রেমের গীত গাইয়াছেন,—যে প্রেম, সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া প্রাণে অতি দুঃসহ লালসায় পরিণত হয়, তাদৃশ প্রেমের চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি কোন দিনও, রাধার ভাবে প্রেমের আরাধনা করিয়া, প্রেম-ভক্তির অশ্রু বর্ষণ করিয়াছেন, এমন আমি জানি না। কিন্তু নবপ্রাবৃটের নেত্ররঞ্জন নূতন-মেঘ-দর্শনে, তাঁহার মনেও সেই রাধার ভাব কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিস্ফুরিত হইয়াছিল;—মেঘের প্রাণে প্রাণটা ঢালিয়া দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। মেঘ তাঁহার চক্ষে, প্রথম-দর্শনে পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হয় নাই; পর্ব্বত-সানুশ্লিষ্ট "বপ্রক্রীড়া-পরিণত গজ"বৎ প্রতীয়মান হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে ভাবের ঢেউ তুলিয়াছিল। যথা তাঁহার মেঘদূতে,——

　　আষাঢ়ের প্রথম দিবসে,
　　মহীধর-সানু-সুখাশ্লেষে,
　　　　নেহারিলা নবজলধর;
　　যেন তনু নোয়াইয়া,
　　দন্তে মহী উৎখাতিয়া,
　　　　ক্রীড়ারত মত্ত করিবর! *

এই নটবর-প্রকৃতি প্রমোদ-পটু করিবর,—এই "বপ্রক্রীড়া-পরিণত গজ," একটু

* "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়া-পরিণত-গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।"

প্রণয়-পরিচয়ের পর, এক দিন কালিদাসের চক্ষেও অকস্মাৎ পবন-প্রবাহিত অথবা পবনাপহৃত পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় প্রতীত হইয়া, তাঁহার প্রাণে কৌতুক জন্মাইয়াছিল। যথা পূর্ব্বমেঘে,—

পর্ব্বতের চূড়া বুঝি করিয়া হরণ,
বহিয়া লইয়া যায় বিলোল পবন,
চকিত-চকিত চোখে, চাহি সুখে ঊর্দ্ধমুখে,
নিরখিবে গতি তব সিদ্ধাঙ্গনাগণ। *

কিন্তু এই পবনাপহৃত আমোদজনক পদার্থ যদিও বহুক্ষণ আপনার পার্ব্বতীয় মূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারে নাই, উহা আমাদিগের মহাকবির কাছে সকল সময়েই উড্ডয়ন-ক্ষম বিহঙ্গের ন্যায়, নভোবিহারী এবং দেবতার ন্যায় কামচারী। এ দেশের সেকেলে ঝী বউ এবং সম্ভ্রান্ত পুরস্ত্রীরা এখনও মেঘকে দেবতা বলিয়া জানেন,—দেবতা নামে নির্দ্দেশ করেন। কালিদাসের মেঘও কিঞ্চিদংশে সেইরূপ দেবতা। সে মুখ ফুটিয়া কথাটি কহিতে না পারিলেও পরের মনের সকল কথাই বোঝে, এবং প্রার্থনার উত্তরে প্রত্যুত্তর-দানে অসমর্থ হইলেও, মহতের মত প্রার্থীর উপকার করিতে ভালবাসে। যথা কালিদাস-কল্পিত যক্ষের § মেঘ-সম্ভাষণে,—

পুষ্কর-আবর্ত্ত নাম ভুবনে বিদিত,
সেই মহাবংশজাত তুমি মেঘ-বর,—
কামনার অনুরূপ রূপে বিলসিত,
জানি তুমি মহেন্দ্রের মুখ্য অনুচর।

জানি তাই, করিতেছি তোমায় যাচনা,
বিধি বশে আজি আমি বন্ধু-বিরহিত।
শ্লাঘা,—মহতের কাছে নিষ্ফল প্রার্থনা,
অধম-প্রসাদে ইষ্টসিদ্ধিও ঘৃণিত। §

তবে পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আকাশের মেঘ সকলেরই মনের মত ধন,—মনের মত জন। উহার রূপ অনন্ত, গুণও অপ্রমেয়। উহাকে যিনি যে চক্ষে দর্শন করুন, যে ভাবে চিন্তা করুন, আমার চক্ষে উহা প্রায় সকল সময়েই প্রকৃতির এই অনন্তবিস্তৃত আভোগময়

---

* "অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিত-চকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।"

§ "জাতং বংশে ভুবনাবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ। তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাদ্দূরবন্ধু র্গতোঽহম্ যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

§ অল্প দিন হয় কালিদাস-ব্যাখ্যা নামক একখানি অভিনব গদ্য গ্রন্থে মূল শ্লোকটির ভাবানুবাদ পাঠ করিয়াছি। সে অনুবাদ এমনই সরল ও সুখপাঠ্য যে, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না।——

"আপনি বড় বংশে জন্মিয়াছেন, পুষ্কর আবর্ত্তক প্রভৃতি বড় বড় মেঘ আপনার পূর্ব্ব পুরুষ, আপনার বংশ পৃথিবীর সকলে বিখ্যাত। এত বড় বংশ কি আর হয়। তাহার উপর আপনি ইন্দ্রের এক জন বড় অফিসার। আপনি ইচ্ছামত দেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন; কখন বড় কখন ছোট হইতে পারেন। তাই আমি বড় দুঃখী, প্রিয়া-বিরহী—আপনার শরণাগত হইলাম। বড় লোকের কাছে যাচ্ঞা ব্যর্থ হইলেও, তাহাতে দুঃখ নাই। ছোট লোকের কাছে যাচ্ঞা সার্থক হইলেও মনটা ছোট হইয়া যায়।"

জগতে উড্ডীন-পর্ব্বত। আমি, পর্ব্বতের নিম্ন-ভূমিতে উপবিষ্ট রহিয়া, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর-জ্যোতিতে ও মুগ্ধা নিশীথিনীর মৃদুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় পর্ব্বতের 'ভয়ঙ্কর' সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি;—পর্ব্বত যেখানে শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রসারিত হইয়া, উহার কঠোর-কর্ক্কশ শ্যামল দেহে, সমুন্নত-দৈত্য-দানবের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এবং আপনার মাথার উপর বিকট জটাজুট-সদৃশী তরুরাজী অথবা শুভ্র-মুকুট-সন্নিভ তুষাররাশির বোঝা বহিয়া, উত্তাল-তরঙ্গায়িত চিত্রিত-মূর্ত্তিতে বেতাল-ভৈরববৎ দাঁড়াইয়া আছে, আমি সেখানে বহুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে বসিয়া রহিয়া, নয়নের সার্থকতা করিয়াছি। কিন্তু নিদাঘের নব-জলধর,—নব-বৈশাখের দিনান্তদৃষ্ট নূতন মেঘ, বহু দিনের অনাবৃষ্টির পর, দিগ্বলয়ের পশ্চিম প্রান্তে, উত্তরে দক্ষিণে বিলম্বিত হইয়া, এবং আপনার শত শত উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের দ্বারা নভোমণ্ডলের ঊর্দ্ধতম প্রদেশকেও যেন স্পর্দ্ধায় স্পর্শ করিয়া, আমার চক্ষে, উড্ডীন পর্ব্বতের মত, রূপের যে প্রকার অপরূপ আভায় ও অচিন্তনীয় ভঙ্গিতে, শোভা পাইয়াছে, পৃথিবীর কোন পর্ব্বতই কখনও সেইরূপ শোভিত হয় নাই।

পর্ব্বত সকল সময়েই নিষ্পন্দ ও নীরব; উড্ডীন পর্ব্বত কখনও ঘনীভূত প্রস্তর-রাশির মত তূষ্ণীম্ভূত, কখনও বাতাহত সমুদ্রের মত গর্জ্জনশীল। যাঁহারা, অতলান্ত সমুদ্রের আস্ফালন ও ঘোর-গভীর গড়-গড় গর্জ্জনে নিশ্চিন্ত রহিয়া, শিশুর প্রাণে নির্ভয়ে নিদ্রা-সুখ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে, উড্ডীন-পর্ব্বতের আতঙ্কজনক ও অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রুতিবিদারি অশনি-গর্জ্জনে শিহরিয়া উঠিয়া, জগন্নিবাস করুণাময়ের নাম স্মরণ করিয়াছেন।

পর্ব্বত-শিখরে অন্ধকার রাত্রিতে দাবানলের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। সুন্দর অথচ শঙ্কাজনক। উড্ডীন-পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ও সুবিশাল তনুর স্তরে স্তরে দামিনীর অনন্তরূপ ক্রীড়া, তাহা হইতেও অধিকতর সুন্দর নয় কি? সে ক্রীড়া সাধারণতঃ অঙ্গাভরণ ও অধরের হাস্যে স্ফুটিত হয়, তাহা আগে কহিয়াছি। কিন্তু, উন্মাদ-বিহ্বলা আকুলা দামিনী যখন, নৈশ-দাবানলের মত, লক-লক জিহ্বায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে;—সে অনুপম দ্যুতি যখন, অতি সূক্ষ্ম, অতি সুন্দর বক্কিরেখার মত, দিগন্তবিস্তারিত হইয়া, তখনই আবার লুকি দেয়;—যখন উহা, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, দূর-পরিলক্ষিত গৃহদাহের আগুনের মত দেখা দিয়া আবার যেন নিবিয়া যায়,—অথবা শ্মশান-শোভিনী (Ignis Fatuous) পিশাচ-দীপিকার মত একবার জ্বলে, একবার নিবে, এবং পুনঃ পুনঃই জ্বলিয়া জ্বলিয়া ও নিবিয়া নিবিয়া, জীবহৃদয়ে শঙ্কা ও সংশয় জন্মায়, তখন মনে লয় যে, দেব-কবির উদাস কল্পনা, আপনিই বুঝি দামিনী সাজিয়া, উড্ডীন-মেঘ-পর্ব্বতের বক্ষঃস্থলে আনন্দ করিতেছে; এবং মনুষ্য আপনার শেষ-গন্তব্য স্বর্গধামকে ভুলিয়া রহিয়াছে বলিয়া তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে, ক্ষণিক-

প্রভার নানারূপ লীলা-স্ফুরণে, সুর-জগতের আভা দেখাইতেছে। সে বিচিত্র দৃশ্য নিরন্তরই ত আমাদিগের নয়নের সান্নিধ্যে প্রদর্শিত হইতেছে। কিন্তু আমাদিগের নয়ন ও মন মুহূর্ত্তের তরেও তাহাতে আকৃষ্ট হয় না কেন?

পর্ব্বত অদ্যও যেমন, কল্যও তেমন, এবং বোধ হয় যুগ-যুগান্ত পরেও প্রায় তেমনই রহিবে। এ কথা অবশ্যই ভূতত্ত্ব-পণ্ডিতদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনুমোদিত নহে। কারণ, মানুষ আজি মনুষ্যদেহকে শত শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যেভাবে উহার গঠন-তত্ত্ব পরীক্ষা করিতেছে, ভূতত্ত্ব-পণ্ডিতেরা, পর্ব্বতের স্তর-নিচয়কেও প্রায় সেই ভাবে বিভক্তবৎ পরীক্ষা করিয়া, পাষাণ-তনুর দেহতত্ত্ব পাঠ করিতেছেন; এবং পর্ব্বতের শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া, উহার ক্রম-বিকাশ ও ক্রম-পরিবর্ত্ত-সম্পর্কে অশেষ কথা কহিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইহা জানিয়াছেন এবং জানিতে পারিয়াছেন বলিয়াই মনুষ্যকে ইহা নির্ভয়ে জানাইতেছেন যে, যেখানে এক সময়ে অগাধ সমুদ্র, উত্তুট-তরঙ্গে, উন্মত্ত-ভৈরবের ন্যায় তাণ্ডব-সুখে আস্ফালন করিত, সেই স্থানেই আজি, শত-স্কন্ধ-প্রসারিত শত-শীর্ষ-পর্ব্বত, উহার শৃঙ্গে শৃঙ্গে দেব-লোককে অভিবাদন করিয়া, দেব-কর-ধৃত দিগন্ত-বিতত মান-দণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; এবং উহা এত বড় বৃহৎ পদার্থ হইলেও, বট-বৃক্ষের ন্যায় ধীরে ধীরে বাড়িয়া,—ক্রমিক-পরিবর্ত্তনের নিয়মে, ধীরে ধীরে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বিস্তারিত হইয়া, উহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু পর্ব্বতের এইরূপ ক্রম-বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তনীয়তা, বিজ্ঞান-পরীক্ষিত সত্য হইলেও, মনোবুদ্ধির অগম্য। যাহারা সুখের শৈশবে পর্ব্বত দেখিয়াছে,—মায়ের কোলে শিশুর মত, পর্ব্বতের কোলে হাসিয়াছে কাঁদিয়াছে, নাচিয়াছে খেলিয়াছে, সেই প্রকৃতি-পালিত পার্ব্বতীয় শিশুরা, শত বর্ষ পরে, পার্থিবজীবনের পরিসমাপ্তি-সময়ে, তাহাদিগের সেই প্রমোদ-ভূমি-সদৃশ পর্ব্বতকে তেমনই দেখিয়া গিয়াছে। উহা যে কোন স্থানেও এক তিল বাড়িয়াছে, তাহারা এমন কথা অনুমান করিবার কারণ পায় নাই। পর্ব্বত এই হেতু অচল ও অটল, এবং সকলের চক্ষেই অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয়।

পক্ষান্তরে, আমার নিভৃত-কুটীরের নিত্য অতিথি উড্ডীন-পর্ব্বত, আবেগ-বিহ্বলা গোপ-বালার নয়নানন্দ নায়কের ন্যায়, 'নিতুই নব,' প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন। আমি উড্ডীন পর্ব্বতের বর্ণবৈচিত্র্য বুঝাইবার জন্য শ্বেত পীত, শ্যাম লোহিত প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণের নাম করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা ক্ষণকালও চিত্রকর রাফায়েল অথবা চিত্রকবি রস্কিনের চক্ষু লইয়া মেঘের চিত্র-বিচিত্র বর্ণ পাঠ করিতে যত্নশীল হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই হৃদয়ের উদ্বেলতায় বলিয়া উঠেন যে, সে বৈচিত্র্যের ইয়ত্তা নাই, অবধি নাই,—সে লীলাময় পরিবর্ত্তের প্রকার-বিষয়ে সীমা নাই। উহা এই

ছিল পাণ্ডুর, দেখিতে না দেখিতে হইতেছে পীত, আবার চাহিয়া দেখ উহা সেই মুহূর্ত্তেই সুকুমার পাটলের ন্যায় শ্বেত-লোহিত। অপিচ, উহা কোন কোন সময়ে, একই মূর্ত্তির উর্দ্ধে ও অধে * এবং অবয়বে অবয়বে, এত প্রকার বর্ণভেদে বিলসিত রহে যে, চক্ষু একবার তাহা দেখিলে আর ফিরিতে চাহে না।

মানুষ, তুমি কখনও জগন্ময়ী প্রকৃতির রূপের উপাসনায়, শোকের দাহ ও দুঃখের অরুন্তুদ বেদনা ভুলিতে পারিয়াছ কি? আমার প্রাণটা যখন পৃথিবীর শোকে দুঃখে অভিভূত এবং আপনার অন্তর্নিহিত চিন্তার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, আমি তখন আমার অধ্যয়ন-নিবাসের বহিরাবাসে ধ্যানস্থবৎ উপবিষ্ট রহিয়া উড্ডীন পর্ব্বতমালার অপরূপ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে থাকি; এবং উহারা, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, কত প্রকারের নূতন রূপ ধারণ করে,—কত কত নূতন-মূর্ত্তিতে চিত্রিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া অমূর্ত্ত-আনন্দময়ের মূর্ত্তমহিমা ও চিত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে থাকে, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মবিস্মৃত হই।

আকাশ যখন অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল রহে,—যখন আকাশের এক প্রান্তে সূর্য্যের হসিতরশ্মি গোলাপিরাগে ঝিকি-মিকি করে, এবং আর এক প্রান্তে ছোট ছোট মেঘ, ছোট ছোট উড্ডীন পর্ব্বত অথবা ক্রীড়াশীল পর্ব্বত-শাবকের মত, বায়ুর হিল্লোলে হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিতে থাকে, তখন উহাদিগের এক মূর্ত্তি; আর যখন উহারা পরস্পর-সংহত সম্মিলিত-তনুতে সায়ংসূর্য্যের বিহার-শকটের ন্যায় বিভাসিত হয়, তখন উহাদিগের আর এক মূর্ত্তি। এক দিন উহাদিগের এই-প্রকার অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি দর্শনে শিশুদিগের সহিত মিশিয়া, শিশুর প্রাণে করতালি দিয়া, একটি গীত গাইয়াছিলাম। আজি এ বৃদ্ধ কালে সে শিশু-সংগীতের দুই চারিটি পদ আমার কণ্ঠে স্ফুরিতেছে,——

দেখ্‌বি যদি আয়,
দেখ্‌বি যদি আয়রে তোরা,
দেখ্‌বি যদি আয়,
দেখ্‌বি যদি সোনার নদী,
খেলা ফে'লে চ'লে আয়।

সোনার নদী, সোনার জল,
তরল আভায় হায়! ঝল-মল—
কিবা ঢেউ খেলায়।
সোনার বরণ সাঁঝের তপন
তাহার মাঝে ডু'বে যায়।
দেখ্‌বি যদি আয়।

পৌরাণিকেরা কৈলাশ-শিখরে যাইয়া, তাঁহাদিগের মনসাধের মানস-সরোবর,—কলহংস-নিনাদিত কুমুদ-কহ্লার-কুবলয়-পরি-

* মনস্‌ ও যশস্‌ শব্দের ন্যায় অধস্‌ শব্দও, বাঙ্গালায়,—সন্ধিসমাসের অভাবস্থলে—ভারতচন্দ্র প্রভৃতির সময় হইতে, অকারান্তবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যথা,—'মনে দুঃখ,' 'যশে ঈর্ষ্যা,' 'উর্দ্ধে অধে অন্ধকার,' ইত্যাদি।

শোভিত টল-টল সরোজল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এবং পাশুপত-শস্ত্র-পুরস্কৃত পাণ্ডকুল-ধুরন্ধর মহারথ পার্থ, সশরীরে ইন্দ্রের অমরাবতীতে যাইয়া, স্বর্গগঙ্গায় তরল সোনার তর-তর প্রবাহ ও তরঙ্গভঙ্গী দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন। আমি আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, অভ্রলিপ্ত সান্ধ্যগগনে, মাঝে মাঝে ঐরূপ মানস-সরোবর ও স্বর্গগঙ্গার সোনার তরঙ্গ নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করি; এবং মনুষ্য কেন এরূপ মনোমদ-মনোহর প্রাকৃত দৃশ্যে উদাসীন হইয়া মুহূর্ত্তস্থায়ি বিরস-বিলাস ও বিষাদ-বিসংবদে ডুবিয়া রহে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে মানবজাতিকে ধিক্কার দেই।

আমরা 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা', বঙ্গভূমির নিম্ন প্রদেশে বাস করি। সুতরাং যে সকল উড্ডীন পর্ব্বত, সময়ে সময়ে, মানস-সরোবর ও পারিজাত-পরাগ-পিঞ্জলা মানসী মন্দাকিনীকেও মাথায় বহিয়া, আমাদিগকে আনিয়া দেখায়, তাহারা প্রায় সকল সময়েই, আমাদিগের মাথার বহু উপরে, অথবা চারিধারে—দূরে দূরে। কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ শৈল-ভূমির সমতল-শিখরে অবস্থিত থাকেন, উহারা যেমন তাঁহাদিগের মাথার উপরে, এবং দক্ষিণে ও বামে চক্ষের ধারে; তেমনই আবার, কখনও কখনও, নয়নের সুদূরলক্ষ্য নিম্নস্থলীতে, পর্ব্বতের নিম্নস্তরে।

গৃহলক্ষ্মী, দেবার্চ্চনার জন্য ফুল তুলিবার কামনায়, ফুলের সাজি হাতে লইয়া, উদ্যানে বেড়াইতেছেন; একটি ছোট্ট উড্ডীন-পর্ব্বত, আহ্লাদে পৌত্র কিংবা দৌহিত্রের ন্যায়, অকস্মাৎ তাঁহার কাছে আসিয়া,—যেন পরিহাস-রসিকতাতেই, পুরাতন আদরের সকল কথা ভুলিয়া, তাঁহার গায়ের উপর বর্ষিয়া যাইতেছে। ঐরূপ আর একখানি ছোট খাট উড্ডীন পর্ব্বত, আর একস্থলে, ঘরের দিকে উঁকি দিয়া চাহিয়া, সহসা সেখানে, ভিতরে ও বাহিরে জলরাশি ঢালিয়া দিয়া, হাসিতে হাসিতে হাসিতে দিগন্তরে সরিয়া পড়িতেছে।

এ সকল কথা এত দিন মেঘ-দূতের মদিরিক 'খেয়াল' অথবা শুধুই কবিকল্পনার কথা বলিয়া উপেক্ষিত ছিল। মেঘ-দূতের কবি তাঁহার উড্ডীন গজবরকে যেখানে সুর-যুবতীদিগের হীরক-মণ্ডিত কর-বলয়ের কান্তাসমুচিত আঘাতবিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন, সে স্থানটুকু পড়িয়া পুরসুন্দরীদিগের মধ্যে অনেকেই এতদিন মৃদু হাসি হাসিয়াছেন। যথা,—

সুর-যুবতীরা রঙ্গে অবশ্য তোমার অঙ্গে
খোঁচা দিবে, হাসি সবে, হীরার বালায়;
ঝর ঝর অবিরল ধারায় ঝরিবে জল,
শোভিবে তখন তুমি ফোয়ারার প্রায়। *

এখন আর সেরূপ হাসির সম্ভাবনা নাই। কেন না, যাঁহারা বৎসরের মধ্যে দুই একবার দারজিলিঙে যাইয়া বিশ্রাম করেন, তাঁহারা উড্ডীন পর্ব্বত-সমূহের এ সকল আমোদ ও কৌতুক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

* "তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।"

উড্ডীন পর্ব্বতেরা কবি ও ভাবুকের চক্ষে সচেতন পদার্থ হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে অচেতন। যাঁহারা ভাবোচ্ছ্বাসের ক্ষণিক মোহে উহাদিগকে মনুষ্যের প্রণয়-যোগ্য মনে করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারাও মনে মনে উহাদিগের চৈতন্যশূন্যতা চিন্তা করিয়া দীর্ঘ-শ্বাস ফেলাইয়াছেন। যথা মেঘদূতে,——

কোথা ধূম-জ্যোতিঃ আর সলিল-সমীর-
সম্মিলন-সমুদ্ভূত মেঘ—অচেতন!
কোথা বা প্রাণের কথা,—বার্ত্তারূপে যাহা
বহিয়া লইয়া যায় শ্রম-পটু জন! *

যদি উহাদিগের বস্তুতঃ কিঞ্চিন্মাত্রও চৈতন্য থাকিত, যদি উহারা মনুষ্যের একটি কথাও বুঝিত, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে পুনঃ-পুনঃ অভিবাদন করিতাম, আর বলিতাম,—দুটি বাহু তুলিয়া, আনন্দে উথলিয়া, হৃদয় খুলিয়া বলিতাম,—তোমরা মেঘ হও, কিংবা মরুৎপথের পথিকস্বরূপ উড্ডীন পর্ব্বত হও, মনুষ্য তোমাদিগকে যাহা কেন মনে না করুক, এ জগতে তোমরাই ধন্য,—তোমরাই সর্ব্বাংশে সকলের বরেণ্য; এবং তোমরা অন্তরীক্ষচারী দেবতার ন্যায় সর্ব্বদাই আমাদিগের শরণ্য। তোমরা বুকে প্রতিভার পবিত্র বহ্নি পোষণ কর, অথচ আপনার প্রাণটা নিরন্তরই নিঃস্বার্থ-প্রীতির দর-দরিত ধারায় ঢালিয়া দিয়া পৃথিবীর প্রাণ শীতল কর,—পৃথিবীস্থ সকলেরই শুভ সাধন করিতে ভালবাস। তোমাদিগকে ধন্যবাদ! সুহৃদ্বর তোমাদিগকে সাধুবাদ!!

জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন যে, ভূমণ্ডলের উপরিতল যেমন উড্ডীন-পর্ব্বত-প্রতিম বর্ণবিচিত্র মেঘ-মালায় অহোরাত্র আবৃত রহে, অনলদগ্ধি-পিণ্ডস্বরূপ সূর্য্যমণ্ডলের উপরিতলও সেইরূপ অসংখ্য উড্ডীন পর্ব্বতের দ্বারা সর্ব্বদা আবৃতবৎ অবলোকিত হয়। তবে, আকারে কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও,প্রকার, পরিমাণ ও পরিধির তারতম্যে দুইয়ে বড় প্রভেদ। ভূমণ্ডলের মেঘ-পর্ব্বতেরা, পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, পরমাণু-সমষ্টির গুরুত্বে প্রায়শঃ পর্ব্বত-সদৃশ নহে। কিন্তু সৌর-মণ্ডলের অতি ক্ষুদ্রতম উড্ডীন পর্ব্বতও, আকৃতির বিস্তারে ও ভারের গুরুত্বে, আমাদিগের এই সাগরাম্বরা ও সহস্রভূধর-সম্ভরা পৃথিবী হইতে বহুগুণে বড়। পৃথিবীর একটি উড্ডীন পর্ব্বত প্রস্তর-স্তম্ভবৎ বেগে পড়িলে, কতকগুলি পার্থিব গ্রাম ও পার্থিব নগর মাত্র ধ্বংস পাইতে পারে। যদি সৌর-মণ্ডলের একটি সুবৃহৎ উড্ডীন পর্ব্বত,উড়িতে উড়িতে, ঘুরিতে ঘুরিতে, পৃথিবীতে আসিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে, সমগ্র পৃথিবী এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক গ্রহ ও উপগ্রহ, তন্মুহূর্ত্তে কক্ষভ্রষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া, কালের অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। কিন্তু পৃথিবী ও সূর্য্য, চিন্তার অতীত দুর্ব্বহ জড়পিণ্ড হইয়াও, যে শক্তির অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে, শূন্য গগনে বিধৃত রহিয়া, এবং আপনার নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মরেখা হইতে অণুমাত্র-বহির্গমনেও সমর্থ না হইয়া,

* "ধূমজ্যোতিঃসলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ।
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।"

নিজ নিজ নিয়মিত কার্য্য করিতেছে; সৌর-মণ্ডলের উড্ডীন পর্ব্বতচয়ও, সেই শক্তিরই শাসন-ব্যবস্থায় স্ব স্ব স্থলে বিধৃত রহিয়া, নিজ নিজ কার্য্য করিয়া যাইতেছে। হায়! যাহারা সচেতন ও কিঞ্চিৎপরিমাণে স্বাধীন;—যাহারা ইচ্ছা করিয়া ভাল হইতে পারে,—ইচ্ছা করিয়া, অন্ততঃ কিছু কালের তরে, মন্দ পথে চলিতে পারে,—জ্ঞান ও বিজ্ঞান যাহাদিগকে জগতের চরম-সৃষ্টি বলে, এবং যাহারা যথার্থই কিঞ্চিদংশে জগতের অধিস্বামী, তাহারাও কেন বুঝিয়া সুঝিয়া,—আপনার ও পরের পরিণাম-মঙ্গলের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া,ঐরূপ উড্ডীন-পর্ব্বতের মত, নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের পথে নিত্য একই ভাবে অগ্রসর হয় না?—তাহারাও কেন, উঁহাদিগেরই অনুসরণে, পরার্থ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, শক্তি ও প্রতিভার সফলতা লাভ করে না?

কিন্তু আকাশের মেঘ-দর্শনে, আমোদ অথবা আত্মচৈতন্যের নানা কথার মধ্যে, পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ বৈজ্ঞানিক কথাটাই, একটা গুরুতর প্রশ্নের মত, উলটিয়া ও পালটিয়া আপনা হইতে পুনঃ পুনঃ মনে উঠে। যে সকল উড়ন্ত মেঘ, উড্ডীন পর্ব্বতের মত, পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে বিলম্বিত রহে, তাহার একখানিও কখনও, আমাদিগের মাথার উপর, সর্ব্বাবয়বে সম্যক্ ভাঙ্গিয়া পড়ে না কেন? উড্ডীন পর্ব্বত, আষাঢ়ের শেষ অথবা শ্রাবণের মধ্যভাগে, কোন কোন দিন, আকাশব্যাপী অনন্ত সমুদ্রের মত, গ্রাম, নগর ও জনপদকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিয়া, এবং জীব-হৃদয়ে প্রকৃতই আতঙ্ক জন্মাইয়া, জগৎ যুড়িয়া ঝুলিয়া রহে। উহা যদি তখন, ধারায় না বর্ষিয়া, ঠিক ঐ অবস্থাতেই, ঘনীভূত ভাবে,—ঐ অচ্ছিন্ন, অভিন্ন, অভাবনীয় বোঝায়, একবারে, এক-প্রপাতে, অবনীতে নিপতিত হয়, তাহা হইলে, হিমাদ্রির ধবলগিরিও, বোধ হয়, সেই অযুত-বজ্র-সম্পাতের আশঙ্কিত মিলিত আঘাতে কতকটা বিধ্বস্ত হইয়া যায়; এবং পৃথ্বীচর জীব-জন্তুর অনেকেই তখন, প্রকৃতি ও শিল্পের সর্ব্বপ্রকার সম্পদ-ভাণ্ডার লইয়া, প্রলয়ের করালগ্রাসে ঢলিয়া পড়ে। এইরূপ সর্ব্বগ্রাসি বিপত্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও, আমরা সততই যে, সুখ-সুপ্ত বালকের মত, সুখ-শান্তিতে রক্ষা পাইতেছি, অথচ উড্ডীন পর্ব্বতেরা, কোন অংশেও আমাদিগের অপকার না করিয়া, আমাদিগের উদ্যানস্থ তরুলতায় জলসেচন করিতেছে,—গুলাবের অধরে হাসি ফুটাইতেছে,—গন্ধরাজের সুগন্ধ লইয়া প্রণয়ীর মত খেলিতেছে,—যুই ও বেলার চক্ষের পাতা মেলিয়া দিতেছে,—তৃষিত-শস্যক্ষেত্রের তাপ-জ্বালা নিবারণ করিয়া, মনুষ্যকে অন্ন যোগাইতেছে, এবং শুষ্ক স্রোতস্বিনীকে সোহাগে ফুলাইয়া ও সুচঞ্চল লহরীতে দুলাইয়া দুলাইয়া, পৃথিবীর সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য ও সুখের বাণিজ্যে সহায়তা করিতেছে, ইহার অন্তস্তলে কোন অনন্ত করুণাময় সজীব-শক্তির ইচ্ছাকৃত অথচ অনন্ত-নিয়ম-সূত্রিত মঙ্গল্য ক্রিয়া সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয় না কি?

# অধ্যাপক সার্ উইলিয়াম ক্রুক্স্

আজকাল অস্মদ্দেশে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ক্রুক্সের নাম সুপরিচিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অল্প লোকেই সবিশেষ অবগত আছেন। তাই, "সায়েন্টিফিক্ আমেরিকান" নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মাসিকপত্রে সম্প্রতি তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে সার সংকলন করিয়া পাঠককে এই প্রবন্ধ উপহার দিতেছি।

সার্ উইলিয়াম ক্রুক্স্ একজন জন্ম-বৈজ্ঞানিক। তিনি তাঁহার বাল্যদশায় রসায়ন-শাস্ত্র লইয়া ক্রীড়া করিতেন; যৌবনে উহারই বিশেষ অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা, সময়ে সময়ে ইহার দরুণ, অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন; কেন না, তাঁহার পরীক্ষাপ্রয়োগের উৎপাতে, ঘরের জিনিসপত্র রক্ষা করা ভার হইত। তখন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার রাসায়নিক জ্ঞান উত্তরোত্তর ক্রমশই বর্দ্ধিত হইয়াছে; এবং উহা এইক্ষণ সুসভ্য জগতে একটা আলোকময়ী শক্তির মত শোভা পাইতেছে।

এখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৭১ বৎসর। তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬ বৎসর বয়ক্রম কালে, প্রসিদ্ধ ডাক্তার হফ্‌মানের ছাত্র-শ্রেণীভুক্ত হইয়া, রাসায়নিক "রয়েল কালেজে" প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি এতটা খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, অচিরাৎ কালেজের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক হফ্‌মানের সহকারী পদে নিয়োজিত হয়েন। তিনি ইহার পর, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, অক্স্‌ফোর্ডে স্থিত "র‍্যাড্‌ক্লিফ্ কালেজের" নভোবিদ্যাসম্বন্ধীয় রাজকীয়-বিভাগের পরিদর্শক-পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই পদটি বহু বাঞ্ছিত হইলেও, তিনি কিছু দিন পরেই, তাঁহার সমস্ত উদ্যম রসায়ন-শাস্ত্রানুশীলনে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশে, উহা পরিত্যাগ করেন।

কঠোর-বৈজ্ঞানিক-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, তিনি কবিজনোচিত কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন। তাই, তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি অতীব উজ্জ্বল ও বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে সমর্থ। তিনি একবার কোন বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাহা হইতে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না। তিনি মনে করেন, জ্ঞানদ্বার-প্রসারিণী গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া, বাধাবিঘ্নের ভয়ে, প্রতিকূল সমালোচনার ভয়ে সহসা বিরত হইলে, "বিজ্ঞানেরই উপর কলঙ্ক আরোপ করা হয়"।

তিনি, অতিমাত্র সাবধানে, পথ দেখিয়া দেখিয়া, একেবারে সিধা পথে চলিয়াছেন। কি দক্ষিণে, কি বামে, কি উর্দ্ধে, কি অধোদেশে, তাঁহার প্রজ্ঞা তাঁহাকে যেখানেই লইয়া যায়, তিনি সেইখানেই গমন করিয়া-

ছেন। এই অবিচল অধ্যবসায়ের ফলে তিনি "থ্যালিয়ম" নামক একটি মূল ধাতু ও তাহার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ১৮৬২ হইতে ১৮৭৩ পর্য্যন্ত, প্রায় ১১ বৎসর ধরিয়া তিনি এই নবাবিষ্কৃত ধাতুটির সম্বন্ধে পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রোয়েণ্টজেনের (এক্স্) X প্রভার ন্যায় অধ্যাপক ক্রুক্সের "থ্যালিয়মের" আবিষ্কারও অনেক পরিমাণে একটা আকস্মিক ঘটনার ফল। "সলফরিক এসিড্" প্রস্তুত হইবার পর যে অবশেষটি থাকিয়া যায়, তাহাই তিনি বর্ণচ্ছটা-বীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। হঠাৎ একটা উজ্জ্বল মারকত-হরিত রেখা প্রকটিত হওয়ায়, তাঁহার মনোযোগ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। এই রেখা পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। এই রেখাটিকে অনুসরণ করিয়া বিবিধ পরীক্ষা প্রয়োগের পর, তিনি একটি নূতন ধাতুকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় উপনীত করিতে সমর্থ হইলেন, এবং তাহার নাম রাখিলেন থ্যালিয়ম"।

এই নবাবিষ্কৃত মূল ধাতুর প্রথম খণ্ডটি, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের মহাপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। সেই সময় এইটির উপর সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার আণবিক গুরুত্ব যথারূপে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি নির্ব্বাত গোলকের মধ্যে উহা ওজন করিতে করিতে দেখিলেন, তৌলদণ্ডের কাঁটা বড়ই অস্থির। দেখিলেন, তপ্ত অবস্থা অপেক্ষা শীতল অবস্থায় উহার ভারাধিক্য হইয়া থাকে। তাহার হেতু এই নির্দ্দেশ করিলেন যে, নির্ব্বাত গোলকের অন্তর্বর্ত্তী যে পদার্থের তাপ বেশী, তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প-তাপবিশিষ্ট পদার্থ স্বতঃ-প্রতিক্ষিপ্ত হইবার দিকে উন্মুখ হয়। "থ্যালিয়মের" এই এই প্রকার নিয়ম বহির্ভূত অপূর্ব্ব ব্যবহার দেখিয়াই তিনি তাপ-বিকিরণ-মিতি যন্ত্র উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি প্রথমে মনে করিতেন, এই যন্ত্রটির দ্বারা আলোক অব্যবহিতরূপে উত্তাপে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু পরে জানিতে পারিলেন, তাপক্রিয়ার উপরেই উহার একান্ত নির্ভর।

ইহার পর, অতীব সূক্ষ্মীকৃত গ্যাসের মধ্যদিয়া যে তাড়িৎ বিমোচন হয়, এই ব্যাপারটির সম্বন্ধে এবং থ্যালিয়ম ধাতুর পরীক্ষা প্রয়োগ কালে তিনি জড়ের যে "চতুর্থ অবস্থা" অনুমান করিয়াছিলেন—তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে মনঃসংযোগ করিলেন।

"প্রভাময় উপাদান" ( radiant matter ) সম্বন্ধে ও মূলভূত সমূহের জন্মপ্রকরণ ও ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে যে সকল আশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার সহিত ক্রুক্সের নাম চিরকাল গ্রথিত থাকিবে। অতিসূক্ষ্মীকৃত নলের মধ্য দিয়া গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে তিনি এই অনুমানটিতে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কোন কোন ভৌতিক বস্তু অতি মাত্র বাষ্পীয় আকারে অবস্থিতি করে—সেই বস্তুর নাম তিনি "প্রভাময় উপাদান" রাখেন। জ্যোতিরিঙ্গন-জ্যোতি, চৌম্বকী

করণ প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপার সমূহের সত্তা সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, অতি-বাষ্পীয় অবস্থাতেই, ভৌতিকপদার্থ এই সকল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারটি বিজ্ঞান জগতের চিত্ত সবলে অধিকার করিয়াছিল, কেননা, ইহার প্রসর-ভূমি সুবিস্তৃত। আবিষ্কর্ত্তা অবিসম্বাদিতরূপে সপ্রমাণ করিলেন, কোন কোন প্রভাময় উপাদান যেমন অচল, সেইরূপ আবার ইহার অন্যান্য রূপগুলি প্রভাময় শক্তিরূপে অভিব্যক্ত; এই সন্ধিস্থলটিতে ভৌতিক বস্তু ও ভৌতিক শক্তি যেন পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক ক্রুক্সের এই আনুমানিক সিদ্ধান্তটিকে বৈজ্ঞানিক জগৎ প্রথমে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল; পরে যখন তিনি বহু পরীক্ষায় এই সত্যটিকে নিঃসংশয়িতরূপে সপ্রমাণ করিলেন, তখন সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল। প্রথম যখন ক্রুক্সের আবিষ্কারটি প্রকাশিত হয়, সে এক সময়—এখন আর এক সময়। মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তিনি গোড়ায় "আভাময় উপাদান" এই নাম দিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে "ইলেকট্রোন্" ( তাড়িতিকা ) এই নামে নামান্তরিত হইল। তাড়িতিকা কি?—না, তাড়িতের পৃথক্ পৃথক্ অংশোপাদান—এবং উহা ভৌতিক বস্তুরই ন্যায় আণবিক।

ডাক্তার জনসন্ এই তাড়িতিকার আবিষ্কর্ত্তা। তিনি এই আবিষ্কার করিয়া শুধু যে অধ্যাপক ক্রুক্সের আবিষ্কারটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন তাহা নহে; পরন্তু যে সকল সমস্যার নিষ্পত্তি পূর্ব্বে অসাধ্য বলিয়া মনে হইত, তাহাও ইহার দ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইল। তিনি পরীক্ষা সহকারে প্রদর্শন করিলেন, বিমুক্ত তাড়িতিকাগুলি গ্যাসের আকারে অন্তর্হিত হয় না, পরন্তু, অনেকটা কুয়াসার ন্যায় কাজ করে;—উহারা চলিষ্ণু, বায়ু প্রভাবে ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়, এবং যদি উহাদের কার্য্যে কোন বাধা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহারা অবশেষে, আধার গোলকের গায়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

কাল সহকারে ইহাই সপ্রমাণ হইল যে, অধ্যাপক ক্রুক্স্ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যে অনুমানটি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অলীক কল্পনা নহে; পরন্তু, উহা একটি অকাট্য তথ্য। উহা বৈজ্ঞানিক-গবেষণা-ক্ষেত্রে অপরিচিতপূর্ব্ব একটি অভিনব পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। অতিবাষ্পীয় আকারে ভৌতিক বস্তুর সত্তা, অণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ভৌতিক-বস্তু-কণিকার সত্তা, তাড়িতিকার সত্তা, মৌলিকভূত-সমূহের বিয়োজনক্রিয়া—এ সমস্ত যে একই সমজাতীয় সিদ্ধান্তের অধিকারভুক্ত, তাহা শ্রীমান্ ও শ্রীমতী (Currie) কুরির পরীক্ষা প্রয়োগে সপ্রমাণ হইয়াছে।

অধ্যাপক ক্রুক্স্ মূল-ভূত-সমূহের জন্মপ্রকরণ সম্বন্ধে যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা অমূল্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে সকল মূল-ভূত পূর্ব্বে অমিশ্র বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা অধ্যাপক কর্ত্তৃক মিশ্র বলিয়া

প্রতিপন্ন হইল। তিনি এই আবিষ্কারটি হইতে এই অনুমানে উপনীত হইলেন যে, সমস্ত মূলভূতই, এক সর্ব্বাদিম ভৌতিক বস্তু হইতে উৎপন্ন—তিনি এই বস্তুটির নাম দিলেন প্রোটাইল ( Protyle )

অধ্যাপক এই সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা শিল্পব্যাপারেরও অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। "সোডিয়ম" মিশ্রণ প্রকরণ দ্বারা কিরূপে অপরিস্কৃত খনিজ ধাতু হইতে, স্বর্ণ ও রৌপ্য বিযুক্ত করিতে হয়, তাহা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। M. Marssanএর কৃত্রিম হীরক প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি যে সকল পরীক্ষা প্রয়োগ করেন, তাহাতে হীরকের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। রন্ধন-কার্য্য, ছিট কাপড় ছাপানো, বীট চিনি প্রস্তুত করণ—এই সকল ব্যাপারে অধ্যাপক বিশেষ রূপে কৌতূহলী। মল-নির্গমন-প্রণালী ও কৃত্রিম উপায়ে ভূমির উর্ব্বরতা সাধন—এই দুই বিষয়ে যাঁহারা প্রমাণ বলিয়া খ্যাত, তন্মধ্যে আমাদের অধ্যাপকও একজন।

অধ্যাপক ক্রুক্‌স্, গ্রেটব্রিটেনের অনেক বিজ্ঞান-সভার সদস্য ও সভাপতি। তিনি বহুবিধ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া, বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সভা তাঁহাকে একটা স্বর্ণপদক ও ৩০০০ ফ্রাঙ্ক মুদ্রা প্রদান করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট্‌ব্রিটেনের রয়্যাল সোসাইটি হইতে (Davy) ডেভীনামীয় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পর চূড়ান্ত সম্মানস্বরূপ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক নাইট পদে অভিষিক্ত হয়েন।

অধ্যাপক ক্রুক্‌স্ আধ্যাত্মিক গবেষণা ও তদনুষঙ্গী ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী ও অনুসন্ধানপ্রিয়। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক তরঙ্গ প্রবাহের মধ্যে যাহাতে একটা যোগ-সেতু নিবদ্ধ হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। ইথার-তরঙ্গের সত্তা ও তাহার গূঢ়শক্তি, "মার্কনী" দৃঢ়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এক্ষণে এই বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত মস্তিষ্কতরঙ্গের সত্তা সপ্রমাণ করিতে যত্নবান্।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে "ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশান" সভায় উপস্থিত সদস্যবর্গ সমীপে তিনি যে সম্ভাষণী বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি এই আতঙ্কজনক সিদ্ধান্তটি উত্থাপন করেন যে, অনতিদূর ভবিষ্যতে জগতের সম্মুখে অন্নাভাব-সমস্যা নিশ্চিতই উপস্থিত হইবে। কেন না, লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে তাহাদের আহারের অভাব পূরণার্থ বর্ত্তমান গোধূমের বার্ষিক উৎপত্তি পর্য্যাপ্ত নহে। গম-শস্য বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বল্প পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। তিনি বুঝাইলেন, বায়ুমণ্ডলে যে অফুরন্ত-পরিমাণ যবক্ষার-জনন-বাষ্প আছে তাহা আহরণ করিয়া, ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বর্দ্ধনে প্রয়োগ করিতে পারিলে, এই

আসন্ন বিপদ নিবারিত হইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে "নাইট্রেট" প্রস্তুত হইবার আর বড় বিলম্বও নাই—উহা দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিয়াছে। সত্যনিষ্ঠা, অকপট শাদা সিধা ব্যবহার—ইহাই তাঁহার চারিত্রের মোহন-মাধুর্য্য। সত্যের প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস, এবং যাহারা তাঁহার নিকটে আইসে, তাহাদের সকলেরই সহিত তিনি অতীব সদয়ভাবে ও সৌজন্য-সহকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তাঁহার পরীক্ষাগারই তাঁহার বিরাম-স্থান, এবং সেইখানেই তিনি বিবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির মধ্যে থাকিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় যাপন করেন। সেই খানে তাঁহার একটি পুস্তকাগার আছে, তাহাতে সর্ব্ব-প্রকার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত। এই পুস্তকাগারটিকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

# বিজয়া।

( ১ )

উদিলে চন্দ্রমা, উথলে সাগর,—
জ্যোৎস্না মাখিয়া গায়,
নদ-নদী-নালা-হ্রদ-সরোবর,
সকলি উছলি ধায়।
মাতৃ-আবাহনে, মা-মুখ-দর্শনে,
মা-হারা শিশুর মত,
উদ্বেল জীবন, উৎফুল্ল আনন,
বঙ্গে ছোট বড় যত!
কি সুখ-শীতল জননীর কোল,
জগতে তুলনা নাই!
সাত কোটি প্রাণ এক সঙ্গে যেন
তাহে নিয়েছিল ঠাঁই।
ব্যাপি জলস্থল, স্থাবর জঙ্গম,
"মা—মা—মা" উঠিল গান;
গগনে বসিয়া, রবি-শশী-তারা
সে গানে ধরিল তান।
মরুর কঙ্করে পীযূষ-প্রবাহ,
পাষাণে প্রস্ফুট ফুল!
মায়ের পরশে, পে'ল যেন প্রাণ
মৃতদেহে জীবকুল!

( ২ )

মা নহে সে একা তোমার আমার,
জগ-মাতা তার নাম;
অন্তরে বাহিরে তনুতে অণুতে
মায়ের অমিয় ধাম।
জগতের প্রাণ-সিন্ধুর মন্থনে
উত্থিত অমৃত ধারা,—
মায়ের করুণা; মা-মন্ত্রে ভুবন
আপনি আপনা হারা!
মায়ের আনন্দ-মধুর-হিল্লোলে
দশ দিক ভেসেছিল,
কোথা সে উচ্ছ্বাস!—সে আনন্দ আজি
কোথায় লুকিয়ে গেল!

অতীত স্বপন, স্মৃতির শ্মশানে
গড়ায়ে পড়িল হায় !
"মা কোথা,""মা কোথা"-শূন্য প্রাণ পুন,
এ দুখ-সঙ্গীত গায়!
আবাহন সনে, একই সূতে গাঁথি,
কে রাখিল বিসর্জ্জন ?
উদয়ের ভালে অস্তের লাঞ্ছন
লিখে দিল কোন জন ?

( ৩ )

দেখিতে দেখিতে সকলি আবার,
শ্মশান-কালিমা মাখা!
শারদ-অম্বরে চন্দ্রবিম্ব পরে
নিবিড় নীরদ-রেখা!
নীরব সঙ্গীত,— মঙ্গল-বাজনা;
নিথর মঙ্গল-ধ্বজ।
অগরু চন্দনে ফুলে ফুলে আর
আবরে না পথ-রজ!
বিজয়ার হায় বিরল-বাজনা,
কে বাজা'ল এ সময় ?
কহে গিরিরাণী,—"উমা কি আমার
ছেড়ে যাবে হিমালয় ?"

( ৪ )

পুছিলা অঞ্চলে নয়নের নীর,
আলু থালু কেশ পাশ,
পাগলিনী প্রায় উঠিয়া দাঁড়ায়,
রাণী না সম্বরে বাস।
কহে,—"সহচরি, অই ত শুন লো
বিজয়া-দুন্দুভি বাজে,
আন যাত্রাঘট সিন্দুরে আঁকিয়া
আর না বিলম্ব সাজে।
ধান দূর্ব্বা আর দধি মধু ঘৃত
রজত কাঞ্চন আন।
যাতে সুমঙ্গল উমার আমার
কর তাই,—সবি জান।
করি কত মানা শুনে না ত আঁখি,
পুছে নাই অবসর।—
না জানি গো আছে, কত জল ওতে,—
কত সিন্ধু সরোবর!"

( ৫ )

কহিতে কহিতে পুছে দু নয়ন,
উমা পানে বেগে ধায়,
উছলে সমুদ্র, পলকে পলকে,
পোড়া আঁখি ভেসে যায়।
ডোবে সে প্লাবনে উমা-চাঁদ-মুখ,
শুধু হেরে অশ্রু-জল;
উতলা পরাণ করে আন্ ছান্
হাঁটু ভাঙ্গে টুটে বল!
অঞ্চলে নয়ন পুছি কহে,—"আঁখি
দৃষ্টিহীন হবি ?—হ'স্
উমা ধন যবে অদৃশ্য হইবে,
চির-অন্ধ হ'য়ে র'স্।"

( ৬ )

বেগে ছুটে যায়, মেনকা আবার,
আনে ক্ষীর-সর-ননী।
"একটু নবনী খাও মা, আমার
শুকা'ল বদন খানি।"
তুলে দেয় ননী, মেয়ের আননে
পুন নেত্রে ধারা বয়,—
"থাক থাক উমা, দুটি দিন আর,"
প্রাণ হ'তে রাণী কয়।

( ৭ )

দাঁড়া'য়ে গিরীন্দ্র, নীরব নিশ্চল,
পাষাণ-কঠিন-কায় ;
শত উৎস-মুখে, স্নেহ-ধারা তার
উছলি উছলি ধায়।
অদূরে শঙ্কর,—রজত-ভূধর,
ললাটে শশাঙ্ক দোলে,
জ্যোৎস্নাহীন আজি, আবরিত যেন,
বিষাদ-কুয়াসা জালে !
কাঁদে যথা প্রীতি, বাৎসল্য-ব্যথায়,
আত্মা যথা ম্রিয়মাণ,
ভোলা যার নাম, সেখানে তাহার
প্রফুল্ল কি থাকে প্রাণ ?
গলিল অনল,—এক বিন্দু জল,
ললাট-লোচনে ঝরে ;
মেনকার স্নেহ,—চির-মাতৃহীন
থেকে থেকে মনে করে।

( ৮ )

আনে মণিরত্ন, বসন ভূষণ,
ছিল যা হিমাদ্রি-ঘরে,
ভোজ্য দ্রব্য সনে, দেয় গুছাইয়া,
মেনকা নন্দীর করে।
বাহু প্রসারিয়া উমা কোলে নিয়া
আপনা পাসরে রাণী ;
মুখ পানে চাহে, প্রাণ-মন-হিয়া
নয়নে টানিয়া আনি।
সিন্দুর লইয়া সীমন্তে ছোঁয়ায়,
রক্ষা বাঁধি দেয় শিরে ;
ঝর ঝর ঝরে নয়নের নীর
আবার কহিছে ধীরে ;—
"দুখিনীর ধন বেঁচে থাক উমা,
চির আয়ুষ্মতী হও।
"মনে রেখো মায়, আসিও আবার,—
কবে, মা, আসিবে কও।"

( ৯ )

চুম দিলা রাণী ললাটে উমার,
ছল ছল তিন আঁখি।
ললিত-করুণ বীণার সুতানে
কহে উমা শশীমুখী।—
"তিলেকের তরে,তোরে ছেড়ে মাগো,
আমি না কখনো থাকি ;
স্মরিবি যখন, দেখিবি, সম্মুখে
দাঁড়াব মা ব'লে ডাকি।"

( ১০ )

সকলের আগে, অধোমুখে শিব
ধীরপদে করে গতি।
পশ্চাতে তাহার মেনকা-জীবন,—
চলে, পতি-পথে সতী।
মায়ের অঞ্চলে বাঁধা আছে হিয়া,—
ছায়া-কায়া অনিচ্ছায়,
যায় কি না যায়, ফিরে ফিরে উমা
মার মুখপানে চায়।
লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুপাশে দুজন,
দিদীমুখ নিরখিয়া,
এক পদ যায়, ফিরিয়া দাঁড়ায়,
কাঁদে পুন ফুকুরিয়া।

( ১১ )

ফুরাল উৎসব, ফুরাল আনন্দ
আঁধার হইল দিশা।
সোনার প্রতিমা ক্ষণে অদর্শন

দিবায় গ্রাসিল নিশা!
"উমা কৈ আমার"—কহি রুদ্ধকণ্ঠে
বৎসলা ভকতি-রাণী,—
সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িল ঢলিয়া
ভূতলে ত্রিদিব-মণি!

( ১২ )

আপনা পাসরি, মাতৃভাবে কিবা
জগত বিভোর ছিল,—
ভাঙ্গিল স্বপন, পুন আপনায়
হেরি সবে শিহরিল।—
আনন্দ চঞ্চল তরল সরল,
স্তম্ভিত শিশুর দল!
শিশুর আননে, ছায়া কালিমার,
বিকল কি যেন কল!
শোভিছে এখনো উৎসব সুবেশ,
যুবক যুবতী দেহে,
তাপ-শীর্ণ তবু, ফুল্ল ফুল যথা
সন্নিহিত দাব-দাহে।
প্রৌঢ় চিন্তামগ্ন, বৃদ্ধ হতাশ্বাস,
দুদিকে দুয়ের আঁখি;—
প্রৌঢ় চমকিল বিস্মৃত সংসার
আবার সম্মুখে দেখি;
বৃদ্ধ দেখে সেই সংসার ভেদিয়া
আছে পর-কাল চেয়ে,—
বিশুষ্ক পরাণ অস্থির পিঞ্জরে
আতঙ্কে উঠে কাঁপিয়ে।

( ১৪ )

ঐত অহঙ্কার,—"আমি ও আমার"
বাছনি করিছে ফিরে!
জাগিল লালসা,—কাল-ভুজঙ্গিনী,—
মণির মোহিনী শিরে!
হিংসা দাবানল, আবার প্রবল!—
চেও না ওদিক পানে।
স্মর মাতৃ-মুখ, উর্দ্ধ দিকে চাও
পরিণাম ভাব মনে।—
যেই আবাহন, সেই বিসর্জ্জন,
জগতের গতি এই।—
ঢাল প্রেম-জল নিবুক অনল;—
এস ভাই কোল দেই।

শ্রী——

## বিসর্জ্জন।

( বিজয়ার আশীর্ব্বাদ। )

ভাসে প্রতিমার তরি,—সারি সারি সারি,
নদ নদী খাল বিল নায়ে নায়ে ঢাকা,
বৈঠায় ঘুঙুর বাজে দাঁড়ী গায় শারি,
পত পত পত রবে উড়িছে পতাকা।
আগে যাও, আগে যাও, ডাক সবাকার,
মাঝি সাবধানে থেক', যেও পাশ কেটে;
আগ কাট যদি, তবে রক্ষা নাই আর,—
থাকে কি না থাকে শির বিজয়া-সঙ্কটে।

হৈ হৈ রৈ রৈ চারিদিক্ কোলাহলময়,
বিষাদে আনন্দে, কি বিচিত্র মিশামিশি!
তরীতে প্রতিমা,—প্রতিবিম্ব জলময়,
নাচে ফুল বেলপাত তাহে ভাসি ভাসি।

প্রতিমার প্রতিবিম্ব, শত-চন্দ্র-বিভা,
শারদ-সায়াহ্ন রবি, দশমীর শশী,
রোদমাখা জ্যোৎস্না জ্যোৎস্নামাখা রোদ কিবা,
ঢালিল সলিল-স্রোতে মিশ্র জ্যোতিরাশি!

বিষাদে ডুবিল রবি অরুণ বরণ,
তরল তবকে শশী রঞ্জিল সলিল;
আতস বাজীর ধূমে, সে চন্দ্র-বদন,
আবরিল ক্ষণে ক্ষণে সায়াহ্ন-অনিল।

সহসা সহস্র ঢোল বাজিয়া উঠিল,
জ্যোৎস্না কণা যেন, জল ছিটে চারি ধারে
নাই সে প্রতীমাশ্রেণি ডুবিল ডুবিল!—
ঝরে বিসর্জ্জন-বারি শিরে শিরে শিরে।

আমোদ আনন্দ সুখ, যেন বিসর্জ্জিয়া,
ধীরে ফিরে তরীদল মলিন-মূরতি!
হাসিল বিষাদ-হাসি নীরবে বসিয়া,
আঁধারের প্রতীক্ষায়, শশী অর্দ্ধরাতি!

ফুরাইল শুক্ল-পক্ষ, বুঝি চিরতরে,
শূন্য মন, শূন্য প্রাণ, শূন্য গৃহ দ্বার;
পশিল সকলে, হায়, নিজ নিজ ঘরে
জ্যোৎস্না ডুবাইয়া জলে, আহরি আঁধার!

বিসর্জ্জে প্রতিমা সবে তিতি অশ্রুনীরে,
নিরশ্রু-নয়নে করি আমি বিসর্জ্জন;
ক্ষুণ্ণ অবসন্ন সবে ঘরে এসে ফিরে,
আমার আনন্দ-হাটে, প্রীতি-আলিঙ্গন।

আমি ফেলে দেই জলে মাটীর পঞ্জর,
সাধের প্রতিমা ডোবে, ওরা ভাবে মনে;
হারায় বুকের মণি, মোহান্ধ অন্তর,
দেখে না সে প্রাণময়ী চির-গাঁথা প্রাণে।

সোনার প্রতিমা গড় ভকতি ছানিয়া,
স্নেহের অমিয়ে কিবা, ননীর পুতলি,
কিংবা গড় ফুলময়ী প্রীতি-মধু দিয়া,
পরিণাম-বিসর্জ্জন!—মোহে থাক ভুলি।

বিসর্জ্জন কভু জলে, কভু বা অনলে,
চলন্ত তরঙ্গে, কভু জ্বলন্ত চিতায়,
কখনো বিজয়ামোদে,—জয়-কোলাহলে,
অন্তিম সৎকারে কভু নয়ন-ধারায়।

এলে জলে বিসর্জ্জিয়া প্রতিমা যাহার,
পোড়ে না অনলে জলে ডোবে না সে ধন,
সে ত এ জগত-যোড়া প্রাণের আধার,
সলিল অনল তার বিভূতি-ভূষণ।

ভেবে দেখ,—বিসর্জ্জন, অলীক স্বপন,
অনন্তের অন্ত!—কোথা চেতনার লয়?
অনল তাহার চির-স্নিগ্ধ পদ্মাসন!
সলিল,—শয়ন তার চির সুখময়!

ভুলেছ আহুতি-মন্ত্র, বর শুধু চাও,
'দেহি দেহি দেহি' রবে জগত বিকল,
কামনায় ডোবা তাই কাম্যকে হারাও,
ঘোচে না মনের তৃষা নয়নের জল।

কেন চাও, দুখ পাও, দাও উৎসর্গিয়া
যা আছে তোমার, নম নম বলি তায়,
ছিঁড়ে দাও আঁখি, কেবা ভাসাবে কাঁদিয়া,
জ্বালাবে কে?—বেঁধে দাও মন রাঙা পায়।
অশ্রু দিয়া রচ ফুল, গাঁথ প্রীতি-হার,
মাথ তাহে আনন্দের অগুরু চন্দন;
যারে পাও দাও আশীর্ব্বাদ বিজয়ার,
পুছে ফেল আত্ম-পর প্রভেদ-লাঞ্ছন।

শ্রী——

# মোগলের অধঃপতন। *

অবতরণিকা।

এসিয়াখণ্ডে বিপুল বৈভবশালী বহু সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইয়াছে। এই সকল সাম্রাজ্য প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়তলে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভা ও বাহুবলই এসিয়াখণ্ডের লোক-বিশ্রুত সাম্রাজ্য সমূহের মূলাধার ছিল। তাহার অভাব হইলেই রাজশক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িত। ভারতবর্ষেও এই নিয়মবশে ভূতলে অতুল মোগল-সাম্রাজ্য উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়াছে। বাবরের অসাধারণ প্রতিভা ও অজেয় বাহুবলই, ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করে। হিন্দুজাতি তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার সিংহাসন তাহাদের হৃদয়তলে সংস্থাপিত হইতে পারিয়াছিল না। পরস্ব-লোলুপ মোগল-সেনানায়কগণই তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। বাবরের উত্তরাধিকারী হুমায়ুনের তাদৃশ প্রতিভা ও বাহুবল ছিল না। এজন্য বাবরের অভাবের সঙ্গে সঙ্গেই নব-প্রতিষ্ঠিত মোগল-সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে। হুমায়ুন শক্তিশালী শত্রুর প্রথম আক্রমণেই হিন্দুস্থান হইতে বিতাড়িত হন। তারপর সমদর্শী আকবর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বহু সাধনায় হিন্দু মোসলমান, তুর্কি, পাঠান, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি নানাজাতি,—নানা সম্প্রদায়কে ঐক্যসূত্রে

* 1. Elliot's History of India Vols VII & VIII.—2. Dow's History of Hindoostan.—3. Cuningham's History of the Sikhs.—4. Duff's History of Mahrattas.—5. Keen's Fall of the Moghul Empire.—6. Keen's Turks in India.—7. Elphinston's History of India.—8. Mallison's History of Afghanistan.—9. Todd's History of Rajsthan.10. Mallison's Decisive Battles of India.

আবদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার মোগল-সাম্রাজ্যের সংগঠন করেন। সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপি সাধনার পর আকবর সুগঠিত, সুশাসিত, সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত প্রবল প্রতাপ ছিল। কিন্তু রাজকুমার সেলিম (জাহাঙ্গীর) তাদৃশ অতুল প্রতাপান্বিত পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না। আকবরের পর-লোক-গমনের পর রাজকুমার সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সাম্রাজ্যাধিপতি হন। সেনাপতি মহাবত খাঁ ও রাজকুমার খরম (শাহজাহান) বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজকুমার খরম শাহজাহান নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক বিপুল বিক্রমে রাজ্য শাসন করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশাতেই তদীয় পুত্রগণ রাজ্য-লালসায় পরস্পরের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃ-রক্ত-রঞ্জিত-হস্তে পিতার মস্তক হইতে রাজমুকুট কাড়িয়া লইয়াছিলেন। পুত্রগণ পিতার অনুসরণ করিতে পারেন, এই ভয়ে আওরঙ্গজেব সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। ফলতঃ, মোগল-শাসন-কালে রাজকুমারগণের বিদ্রোহাচরণ সহজসাধ্য ছিল; ইহা মোগল-শাসনের মূলগত দুর্ব্বলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

মোগল-সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে ব্যাপকতার অভাব ছিল, বাদশাহ নিজে রাজ্যশাসন জন্য যে মন্ত্র গ্রহণ করিতেন, রাজপুরুষগণ তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন না। তাঁহারা সময় সময় স্বার্থপরতার একশেষ প্রদর্শন করিতেন। মোগল রাজকুমারগণের পক্ষে বিদ্রোহ অবলম্বন করা একরূপ নিয়মে পরিণত হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এজন্য উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন প্রকার স্থিরতা থাকিত না। ইহার ফলে রাজকার্য্যে অনেক সময় শৃঙ্খলার অভাব ঘটিত এবং রাজপুরুষগণ রাজাদেশ প্রতিপালনে অমনোযোগী হইতেন। মোগল-সাম্রাজ্যের অধীন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত অধিপতি ছিলেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ মোগল-রাজের অনুগত ছিলেন না; কেবল মাত্র বাহুবলের অভাবে মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সেনাপতিই জায়গীরভোগী ছিলেন। দিল্লীর আদেশ প্রতিহত করিতে পারিলেই তাঁহাদের স্বার্থ সিদ্ধ হইত।

এই সকল দৌর্ব্বল্যের অভ্যন্তরে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস-বীজ নিহিত ছিল। আওরঙ্গজেবের অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন এই ধ্বংস-বীজ উপ্ত হয়। তাঁহার হৃদয় বেগশালী ছিল না; তিনি সন্দিগ্ধ স্বভাবের জন্য রাজপুরুষগণের অপ্রিয় এবং ধর্ম্মবিদ্বেষ ও পরপীড়নের জন্য হিন্দুজাতির ঘৃণ্য ছিলেন। কর্ম্মক্লিষ্ট বাদশাহ বৃদ্ধ বয়সে কোন বিষয়েই শান্তি পাইতেন না। তাঁহার সঙ্গে কাহারও সহানুভূতি ছিল না। তিনি নিজেও, কি আত্মীয় স্বজন, কি রাজপুরুষ,—কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না; এবং তাঁহাদের মধ্যেও

কেহ তাঁহার প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। আওরঙ্গজেবের দুর্লোভ নিবন্ধন সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ইহার ইন্ধন সংগ্রহ করিতে অসংখ্য সৈন্য-ধ্বংস এবং রাজকোষ শূন্য হয়। তাঁহার ধর্ম্মবিদ্বেষ ও তন্মূলক অত্যাচার বশতঃ হিন্দুজাতির স্বাধীনতা-লাভ-বাসনা এবং ধর্ম্মবিদ্বেষ একসঙ্গে জাগরিত হইয়াছিল; ইহাতে তাহারা নববলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। এই সকল কারণে, মোগল রাজ-শক্তি ক্রমশঃ পতনোন্মুখ হইতে আরম্ভ করে। আওরঙ্গজেবের মনোবল, তেজস্বিতা, শাসন-পটুতা যথেষ্ট ছিল। এ জন্য তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁহার গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ফলতঃ, তাঁহার ইহলোক হইতে অপসৃত হইবার পূর্ব্বে, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দিন যে ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল না। *

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতের অক্ষয়ভূষণ মহাপুরুষ শিবাজি মহারাষ্ট্র জাতির হৃদয়ে অভিনব জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণগত সাধনার ফলে কৃষিজীবী মহারাষ্ট্রগণ অপূর্ব্ব বলদৃপ্ত সামরিক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এই বলদৃপ্ত সৈন্যের সহায়তায় মোগল সাম্রাজ্যের পার্শ্বেই এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কএক বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র দক্ষিণাপথে মোগলের বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। তত্রত্য শাসন-কার্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ ও মহারাষ্ট্র-শক্তি ধ্বংস করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে বাদশাহ জীবনের শেষ ভাগ দক্ষিণাপথে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এক কাশ্মীর ব্যতীত আর কোন হিমালয় প্রদেশে মোগলের আধিপত্য বদ্ধমূল ছিল না। একারণ, মোগল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসার্থিগণের পক্ষে পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে লোক-চক্ষুর অন্তরালে বল সঞ্চয় করিবার সুবিধা ছিল। পঞ্জাব প্রদেশে মহাপ্রাণ গোবিন্দসিংহের প্রতিভা বলে শিখগণ জাতিভেদ ভুলিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া যুদ্ধ-কৌশলে পটু হইয়া ধর্ম্ম-দীপ্ত সামরিক জীবন লাভ করে এবং মোগল-রাজ-শক্তির বিনাশ সাধনপূর্ব্বক তাহার অস্তগত গৌরব-রবির পশ্চাতে এক অভিনব রাজ্যের গঠন করিয়া শান্তি ও প্রেমের পূর্ণচন্দ্র সমুদিত করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ দুর্ব্বল-হৃদয় শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা রাজপুরুষদিগকে শক্তি সহকারে পরিচালনা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগকে শাসন কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য আত্মপরায়ণ ও কলহপ্রিয় মন্ত্রিসমাজের উপর নির্ভর করিতে হইত।

* After that ( death of Aurangzeb ) the Prince ( Bedar Bakt, grand son of Aurangzeb ) said to Murid Khan, "you all know that realm of Hindustan will now fall into anarchy. People did not know the value of the Emperor." Khafi Khan.

প্রজা বিদ্রোহপতাকা হস্তে দণ্ডায়মান, মন্ত্রী আত্ম-হিত-চিন্তায় মগ্ন, ইহাই শেষ দশায় মোগল-শাসনের অঙ্গ হইয়াছিল।

এই সকল কারণে, আওরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী দিল্লীর ইতিহাস কেবল মাত্র অধঃপতনের বিবরণে পরিপূর্ণ; কিন্তু সে বিবরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আদ্যন্ত নানা রসে আপ্লুত। এক্ষণে আমরা সে কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

### বাহাদুর শাহ।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের এক বিংশ দিবসে বৃদ্ধ আওরঙ্গজেব কাল-গ্রাসে পতিত হন। তিনি মৃত্যুকালে উত্তরাধিকারী নিয়োগ সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন না। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় মোয়াজিম বাদশাহের মৃত্যুকালে কাবুলের শাসন-কর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৃতীয় পুত্র আজিম শাহজাদা মোয়াজিমের সহোদর ভ্রাতা এবং বাদশাহের মৃত্যুকালে দক্ষিণাপথে রাজ-শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। চতুর্থ পুত্র আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহপতাকা উড্ডীন করিয়া, রাজপুতগণের সঙ্গে সম্মিলিত হন এবং তারপর স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে না পারিয়া, পলায়নপূর্ব্বক মক্কায় গমন করেন। ইহার পর, তিনি আর কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। পঞ্চম পুত্র কামবক্স বাদশাহের একান্ত প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার মৃত্যুকালে বিজাপুরের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

বাদশাহ ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে শাহজাদা আজিম অবিলম্বে আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা প্রচার করেন এবং সসৈন্যে আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হন। এদিকে শাহজাদা মোয়াজিমও পিতার পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া অলস রহিলেন না। তিনি কাবুল পরিত্যাগ করিয়া, সসৈন্যে লাহোরে আগমন করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া, স্বীয় বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুনিম খাঁর সঙ্গে মিলিত হইলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পুত্রকে আগ্রার দুর্গ অধিকার করিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং বহুসংখ্যক সৈন্য ও গোলন্দাজ লইয়া দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। দিল্লীর অধিবাসীরা তাঁহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিল। তিনি রাজকোষের প্রচুর ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, দলে দলে তাঁহার পতাকামূলে সমাগত হইতে লাগিল। অন্যদিকে আজিমের ধনলিপ্সা এবং তাঁহার পুত্র ও সেনাপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন জনসাধারণ বিরক্ত হইয়া উঠিল। মোয়াজিম দিল্লীনগরী পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় আগমন করিলেন। তিনি তথায় পঁহুচিয়া আজিমকে অর্দ্ধ সাম্রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। শান্তিপ্রিয় ও মৃদুস্বভাব মোয়াজিমের প্রস্তাবে তাঁহার ভ্রাতার অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইল। তিনি অবজ্ঞাভরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ভ্রাতৃ-রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিবার জন্য ক্ষিপ্রগতিতে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঢোলপুর ও আগ্রার মধ্য পথে উভয় সৈন্যে তুমুল সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। আজিম রণক্ষেত্রে শত্রু হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন; বিজয়-লক্ষ্মী মোয়াজিমের অঙ্কশায়িনী হইলেন। হত্যাকারী সেনা-নায়ক পুরস্কার লোভে আজিমের ছিন্ন শির মোয়াজিমের নিকট আনয়ন করিলেন। তিনি ভ্রাতার ছিন্ন শির দর্শনে অধীরচিত্তে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং ভ্রাতৃহন্তাকে তিরস্কার করিয়া মৃতদেহ রাজকীয় সমারোহে সমাধিস্থ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অতঃপর, শাহাজাদা মোয়াজিম বাহাদুরশাহ উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রথমেই আপন বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুনিমখাঁ কে "খানখানান" উপাধি ও প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। নূতন সম্রাট এই সঙ্কট-কালেও, সদাশয়, দয়ার্দ্রচিত্ত, অমায়িক ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শত্রুপক্ষীয় বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তিনি আজিমের পুরমহিলাগণের সঙ্গেও সদ্ব্যবহারের একশেষ করেন। বেগম খুদিসা জেব উন্নিসাকে পাদশাবেগম উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহার বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দেন।

রাজ-নীতি-বিশারদ মুনিম খাঁ অবিলম্বে রাজ্যের শাসন-প্রণালী সংস্কার করিতে মনোনিবেশ করিলেন। বয়োবৃদ্ধ বাদশাহ পিতামহ শাহজাহানের ন্যায় সাড়ম্বরে দরবারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাজ সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে তাঁহার সপ্ত দশ জন পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র আসন পরিগ্রহ করিতেন। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ দূরে বিজিত রাজকুমারগণ দণ্ডায়মান থাকিতেন। সভামণ্ডপ সর্ব্বদা বিচিত্র-পরিচ্ছদ-ভূষিত আমীর ওমরাহগণে পরিশোভিত হইয়া সমুজ্জ্বল থাকিত। বাদশাহ তাঁহাদিগকে, সময় সময়, নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করিয়া আপনার বৈভব ও দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেন। এক জন ইতিহাস লেখক লিখিয়াছেন, "কেমন করিয়া আমি সেই দিল্লী দরবারের সমুজ্জ্বল দৃশ্যের বর্ণনা করিব!"

বাদশাহ বহু রাজ-গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। যদি সমগ্র হিন্দুজাতি আওরঙ্গজেবের অবিমৃষ্যকারিতায় মোগল-শাসনে বীতস্পৃহ না হইত, তবে বাহাদুরশাহ অমায়িকতাগুণে হিন্দু বীরগণের সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের কৃতকার্য্যে হিন্দুজাতির মোসলমান-বিদ্বেষ ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিল। যদিচ তাঁহার শাসন-কালে এই বিদ্বেষ প্রকট হইতে পারিয়াছিল না, তথাপি উহা প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে ধূমায়মান হইতেছিল, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরই অবিলম্বে উহা প্রজ্জ্বল-আকার ধারণ করিল। আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই রাজপুত ও জাঠ জাতি মোগলের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তলন করিয়াছিল। এক্ষণ পঞ্চনদ ভূমির নবপ্রতিষ্ঠিত শিখ-শক্তি দিল্লীর ক্ষমতাস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিল।

কিন্তু এইসকল প্রকাশ্য শত্রু হইতে বাদশাহের প্রথম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল না। গৃহ-শত্রুই তাঁহাকে প্রথমে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনারোহণ কালে আওরঙ্গজেবের প্রথমপুত্র অস্থির-মতি কামবক্স বিজাপুরের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভ্রাতার সৌভাগ্য সন্দর্শনে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তিনি কখন কখন তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিতেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে বাদশাহের পক্ষাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাহাদিগকে অনর্থক শাস্তি দিয়া ও ভ্রাতাকে দাম্ভিকতা সূচক পত্র লিখিয়া অবসরকাল অতিবাহিত করিতেন। এই ভাবে বৎসরাধিক গত হইলে, বাদশাহ তাঁহাকে শান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া (১৭০৮ খৃঃ) তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাপথে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বিনা রক্তপাতে বন্দী করিয়া আনিতে মুনিম খাঁকে আদেশ দিলেন। কামবক্স তাঁহাদের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধার্থ রাজসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। এই সময়, আওরঙ্গজেবের প্রাচীন সেনাপতি জুলফিকর খাঁ দক্ষিণাপথে রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কামবক্সের মনোমালিন্য ছিল। তিনি সসৈন্যে রাজকুমারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মুনিম খাঁ তাঁহাকে বারণ করিয়া রাজাদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়, বাদশাহ আহারান্তে দিবা-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এজন্য রাজাদেশ পাইতে বিলম্ব হইল। জুলফিকর খাঁ রাজানুমতি গ্রহণ না করিয়াই, কামবক্সকে সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন। অগত্যা মুনিমখাঁও তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। রাজকুমার রণ-ক্ষেত্রে শৌর্য্য বীর্য্যের একশেষ প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু অস্ত্রাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল। তিনি অত্যধিক রক্তমোক্ষণে অচিরে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; জুলফিকর খাঁ তাঁহাকে তদবস্থায় বন্দী করিয়া রাজ-শিবিরে লইয়া গেলেন। এক জন সুবিজ্ঞ ইউরোপিয়ান চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অভিমানী কামবক্স কাহারও শুশ্রূষা অথবা কোনপ্রকার পথ্যগ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সন্ধ্যাকালে বাদশাহ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া, নিজের কোর্ত্তা দ্বারা তাঁহার দেহ আচ্ছাদন করিয়াদিলেন। ইহার পর স্নেহশীল বাদশাহ বলিলেন, "আমার ভ্রাতাকে যে এ অবস্থায় দেখিব, তাহা কখনও ভাবি নাই।" তদুত্তরে কামবক্স অপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "তৈমুরবংশীয় রাজকুমার যে কাপুরুষতা ও ভীরুতার অপবাদ মস্তকে লইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইবে, আমিও তাহা ভাবি নাই।" অতঃপর বাদশাহ স্বহস্তে তাঁহাকে মাংসের কিঞ্চিৎ তরল সার পান করাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বাষ্পাকুল-লোচনে বিদায়গ্রহণ করিলেন। এই রাত্রিতেই অভিমানী রাজকুমার কালগ্রাসে পতিত হন। ক্রমশঃ শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

# কিশোর গৌরাঙ্গ।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"একে একে ঝিকি মিকি, শুভ্র আলো ধিকি ধিকি,
ফুটিল নীলিমা কোলে।"

গৌরাঙ্গ যখন ছাত্রজীবনে অবস্থিত রহিয়াও গঙ্গাদাসের টোলে ঐরূপ নূতন অধ্যাপক, নবদ্বীপের নভোমণ্ডল তখন দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নবোদ্গত আলোকের ছটায় উদ্ভাসিত। নবদ্বীপবাসী সকলেই তখন, সেই নক্ষত্র দুটির অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিয়া, চমকিত হইয়াছে; এবং সেই জ্যোতির প্রতিফলিত আভা, সমস্ত বঙ্গেই তখন কিছু কিছু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ঐ নক্ষত্র দ্বয়ের একটির নাম রঘুনাথ, আর একটির নাম রঘুনন্দন। গৌরাঙ্গের সমসাময়িক নবদ্বীপ বিদ্যাবুদ্ধির বৈভবে কিরূপ সমুন্নত ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে, রঘুনাথ ও রঘুনন্দনকে একটুকু ভাল রূপে বুঝা আবশ্যক।

নবদ্বীপ কত কালের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থের সমাজ-ব্যবস্থাপক ক্ষত্রবীর বল্লালসেন * যখন বিক্রমপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তস্থিত প্রবল-প্রবাহ মেঘনাদ-নদের তরঙ্গ-ধৌত রামপাল নামক § রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, বর্ত্তমান মালদহের নিকটবর্ত্তী গৌড়নগরে, প্রিয়তম পুত্র লক্ষ্মণসেনের নামে, লক্ষ্মণাবতী–অভিধানে তাঁহার অভিনব রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন, নবদ্বীপের পুরাতন নাম বঙ্গের ইতিহাসে তখন হইতে নূতনবৎ শ্রূয়মাণ হইল। গৌড়ে

* বল্লাল যে বয়সের প্রথম ভাগে বিক্রমপুরে থাকিয়াই সমস্ত বঙ্গদেশের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, ইহার বিবিধ প্রমাণ আছে।

§ রামপাল গ্রামে এখনও বল্লাল দিঘীর চিহ্ন আছে। বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীর মুদির নাম ছিল রামানন্দ পাল। লোকে তাহাকে সাধারণতঃ রাম পাল বলিত। রাজপ্রাসাদের তণ্ডুলাদি যোগাইয়া, রাম পাল কালে সমৃদ্ধিশালী হইল, এবং বল্লালের রাজধানী হইতে খানিকটা দূরে বাড়ী করিয়া দেশীয় বণিক-সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিল। বল্লাল যখন দিঘী খনন করেন, তখন তাঁহার দিঘী ক্রমে সংবর্দ্ধিত হইয়া রাম পালের বাড়ীর নিকট গিয়া পঁহুচে, এবং রাম পালের শুভাদৃষ্টক্রমে রামপাল দিঘী নামে পরিচিত হয়। এ সম্পর্কে একটি গ্রাম্য গাথা আছে, তাহার প্রথম পংক্তি এই,—

"বল্লাল কাটায় দিঘী নামে রামপাল।"

থাকিয়া গঙ্গাদর্শন সুদুর্ল্লভ। বল্লাল, এই হেতু, নবদ্বীপে, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গম-স্থানে একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। প্রাসাদের অদূরে অতি বৃহৎ এক দিঘী কাটাইলেন, এবং বৎসরের অধিক ভাগই গঙ্গাবাসের সুখাভিলাষে নবদ্বীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপ এতদিন এক খানি সুন্দর অথচ সাধারণ গ্রাম মাত্র ছিল। কুলু-কুলুবাহিনী ভাগীরথীর অপরূপ শোভা,বদ্বীপের পশ্চি তট-শোভিনী শ্যামল-বৃক্ষমের অদূরে, একটি সুবৃহৎ প্রান্তর-নিচয়,এবং বণিগ্‌বৃত্তিকান্তি লাভ দিগের প্রমোদ-উদ্যান ও প্রাসাদমালা ভিন্ন নবদ্বীপের আর কোন বিশেষ সম্পদ ছিল না। বঙ্গেশ্বর বল্লাল যখন নবদ্বীপে নিকেতন স্থাপন করিলেন, তখন দেখিতে দেখিতেই উহা বঙ্গের রাজধানী হইয়া উঠিল। আইন আকবরী নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লাল সেন ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গদেশের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লাল, সিংহাসনলাভের ত্রিশ বৎসর পরে, তদীয় দানসাগর নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা দ্বারা যশস্বী হন। বল্লালের রাজত্ব, এইরূপ গণনায়, শ্রীগৌরাঙ্গের চারি শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তি কথা, এবং সেই সময় হইতেই বঙ্গদেশে নবদ্বীপের বিশেষ প্রতিপত্তি।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং তদীয় লোকান্তর-প্রাপ্তির পর তৎপৌত্র লাক্ষ্মণেয় * যখন নবদ্বীপকেই তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী করিলেন, নবদ্বীপের যশঃকীর্ত্তি ও বৈভবের ছটা বঙ্গদেশের সমস্ত নগরকেই

---

* বল্লাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৪১ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১১০৬ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরে গমন করেন। বল্লালের বিখ্যাতনামা পুত্র লক্ষ্মণ সেন সেই সময়েই যুবরাজ নামে পরিচিত। তিনি যখন পিতৃবিয়োগের পর রাজত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার বয়স, অতি কম হইলেও, চল্লিশ। তাঁহার দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠের নাম মাধব, কনিষ্ঠের নাম কেশব। থর রাজত্ব করিয়াছেন, এমন জানা যায় পরে তদীয় অনুজ কেশব সেন, তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া, ১১২৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির অল্প কিছু দিন পরে, অর্থাৎ ঐ ১১২৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে, তৎপুত্র লাক্ষ্মণেয় জন্মগ্রহণ করেন, এবং জন্মগ্রহণের পর মুহূর্ত্ত হইতেই, বঙ্গ-সাম্রাজ্যের রাজাধিরাজ নামে সর্ব্বত্র বিঘোষিত হন। যাঁহারা এ বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকের মত সম্পর্কে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দয়া করিয়া “ভক্তির জয়” নামক পুস্তকের উপর একটু দৃষ্টিপাত করিবেন। ফল-কথা, বঙ্গের শেষ রাজা লাক্ষ্মণেয় সেন যে, বল্লালের প্রপৌত্র এবং লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এতৎ সম্পর্কে যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

তখন আঁধারে ফেলিল। লোকের মনে লইল যে, বুঝি লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, এত কালের পর, উভয়েই চির-সঞ্চিত সাপত্ন্য-কলহ বিস্মৃত হইয়া, নবদ্বীপে আসিয়া, সোনায় সোহাগার মত সম্মিলিত হইলেন। তখন রাজকীয় বিচার-বিভাগের প্রধান-অধ্যক্ষ, বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ, তদীয় "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রচার করিয়া, বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে পরিচিত হইয়াছেন। তখন রাজ-সভার সভাসদ-কবি গোবর্দ্ধনাচার্য্য তদীয় "আর্য্যা সপ্তশতী" নামক অমিয়-ধ্যা-আমোদ-ধুরা কবিতাবলী প্রচার করিয়া কাব্য-রস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছেন। তখন রাজ-দানের তাম্রশাসন-লেখক কবি-কীর্ত্তিলিপ্সু উমাপতিধর, বঙ্গীয় পণ্ডিত-সমাজে, শুধু বচন-রচনার নৈপুণ্য গুণেই, গণ্য-মান্য হইয়া বসিয়াছেন। তখন রাজ-প্রসাদের অন্যতম পণ্ডিত "শরণ" নামক কবি, কাল-প্রতিষ্ঠিত পুরাতন কবিদিগের কীর্ত্তির আসন কাড়িয়া লইবার জন্য, নানাপ্রকার প্রয়াস পাইতেছেন। তখন মেধাবিগণের অগ্রগণ্য "ধোয়ী" নামক কবি, কবি-কল্পিত শুক-পক্ষীর ন্যায়, শুধু শ্রুতিধর হইয়াও, নবদ্বীপ-সভায়, কবিরাজ উপাধি লাভে অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছেন। অপিচ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, যাঁহার মধুর কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া, বঙ্গীয় কবিতায় প্রেম-ভক্তির মধু ঢালিয়াছেন,—যিনি ব্রজবিলাসের বিনোদ-রসে বিভোর হইয়া, বাঙ্গালিকে সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য শিখাইয়াছেন,—যিনি বিরলে, বৃক্ষের সুশীতল ছায়া-তলে, কৌপীন ও কন্থার দীন-আবরণে দেহ-প্রাণ রক্ষা করিয়া, প্রাণের মধ্যে প্রেম-রসময় কবিতার পীযূষ-সমুদ্র পুষিয়াছেন, বঙ্গের সেই অকাল-কোকিল, বিশ্রুত-কীর্ত্তি জয়দেব তখন, গুণানুরাগী লক্ষ্মণ ও লাক্ষ্মণেয়সেনের অনুগ্রহ-সংবর্দ্ধিত উচ্ছ্বসিত-হৃদয়ে, নবদ্বীপাগত তৃষিত বঙ্গবাসীকে গীত-গোবিন্দের প্রাণ-মোহিনী পদানদের তরঙ্গে, মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত রাখিয়া-ধানী পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাদিগের প্রাণারাধ্যা মাতৃ-নিকটবর্ত্তিনী, যাঁহাদিগের এই মাতৃরূপিনী দুহিতা, এই বহুপণ্ডিত-পূজিতা, বহুশক্তি-সমন্বিতা দেব-বালিকা বাঙ্গালাও তখন ধীরে ধীরে ফুটিতেছেন; এবং জয়দেব প্রভৃতি মহাজন-কবিদিগের নিকট "মধুর-কান্ত-পদাবলী" শিক্ষা করিয়া, "নদে-শান্তিপুরে" বাঙ্গালা নামে নূতন সোহাগে বাড়িয়া উঠিতেছেন।

নবদ্বীপে এই যে সারস্বত-সুখ-তৃষ্ণার তরঙ্গ বহিল, ইহা আর থামিল না। লক্ষ্মণ ও লাক্ষ্মণেয়সেনের রাজত্ব গেল,—লাক্ষণেয় সেনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর রাজ-মুকুট বঙ্গ-লক্ষ্মীর মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল;—হিন্দুর রাজ-সিংহাসন নবদ্বীপ প্রান্তবাহিনী গঙ্গার জলে বিলয় পাইল; নবদ্বীপের রাজধানী, যবনরাজের নূতন অধিকারে, পুনরায় গৌড়ে যাইয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু নবদ্বীপ, হিন্দুর রাজত্বসময়ে, সারস্বতসাধনার এক প্রধান তীর্থ বলিয়া যে পরিচিত হইয়াছিল, উহার সেই সম্পদ, সেই

গৌরব, সেই সমুচ্চ সম্মানের আসন, অক্ষুণ্ণ ও অক্ষত রহিল।

দেশ-দেশান্তরের লোক, বিদ্যাশিক্ষার জন্য, নবদ্বীপে আসিতে লাগিল। দেশ-দেশান্তরের লোক, গঙ্গাবাসের অভিলাষে, আগে নবদ্বীপে বাসাবাড়ীতে অবস্থান করিয়া, শেষে বিদ্যাব্যবসায়ের বিবিধ প্রলোভ-জনক আশায়, ঐ স্থলেই উপনিবিষ্ট হইল। নবদ্বীপের গলিতে গলিতে, অথবা ঘরে ঘরে, টোল বসিল। তদানীন্তন নবদ্বীপের পশ্চিম পারে, "কুলিয়া" গ্রামের অদূরে, একটি গ্রাম "বিদ্যানগর" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ, এক দিকে গঙ্গার স্রোতে এবং আর এক দিকে, জলঙ্গীর তরঙ্গাঘাতে, অংশতঃ বিলুপ্ত হইয়া, এক গভীর অরণ্যে পরিণত হইল। নূতন নবদ্বীপ, গঙ্গার উভয় তীরে পল্লী বসাইয়া এবং অসংখ্য টোল খুলিয়া, শাস্ত্রালোচনার কল-কল-কামধুর মুগ্ধগম্ভীর ধ্বনিতে সরস্বতীর স্তুতি-গীত গাইতে লাগিল।

নবদ্বীপে এইরূপে সারস্বত-বিলাসের সকল সম্পদই প্রতিষ্ঠিত হইল বটে; কিন্তু একটি বৃহৎ অভাব রহিয়া গেল। নবদ্বীপে তখন ব্যাকরণের টোল ঘরে ঘরে; কাব্য অলঙ্কার, স্মৃতি ও বাদার্থের টোল গলিতে গলিতে। নবদ্বীপের কুলবধূরাও তখন মনু ও পরাশর প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থা দেন। নবদ্বীপের গৃহস্থ মাত্রই সে সময়ে, ভাগবতাদি পুরাণশাস্ত্রের দুই চারিটি শ্লোক, পঠিতবৎ আবৃত্তি করিতে সমর্থ। নবদ্বীপে শাস্ত্রের সকল সম্পদই তখন আছে, নাই কেবল ন্যায়ের টোল ও ন্যায়-শাস্ত্রের আধিপত্য। ন্যায়ের আধিপত্য তখন মিথিলায়। ভারতবর্ষের যেখানে যে কোন ব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্রশিক্ষার জন্য অভিলাষী হন, তিনিই তখন মিথিলায় যাইয়া পাঠ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তখন ভারতবর্ষে মিথিলা ভিন্ন ন্যায়শাস্ত্রশিক্ষার আর স্থান নাই। মিথিলার পণ্ডিতেরা, ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ে আগন্তুক ছাত্রদিগকে রীতিমত উপদেশ করিতেন; কিন্তু শাস্ত্রীয়গ্রন্থের এক খানি ছিন্নপত্রও কোন ব্যক্তিকে বাড়ী লইয়া যাইতে দিতেন না। নবদ্বীপের রঘুনাথ মিথিলার এই অনন্যভোগ্য ভাগ্য ও অধিকার প্রতিভার বলে কাড়িয়া আনিলেন, এবং পুরাতন গ্রন্থ পাওয়া যায় না বলিয়া, চিন্তামণি-দীধীতি নামক চিরস্থায়ি ও চিরপূজনীয় নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া নব্যন্যায়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। রঘুনাথের উপর পিত্র্যাভিমানি (Patriotic) ও পণ্ডিতপ্রিয় বঙ্গের ঘরে ঘরে পুষ্পবৃষ্টি হউক।

রঘুনাথের জীবন-চরিত নাই। ভারতে কার আছে? যাঁহারা পুরাকালে ভারতমাতাকে মা বলিয়া ডাকিয়াছেন,—মা বলিয়া পূজা করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ অলোক-সাধারণ জীবনের দ্বারা জগতের অশেষ উপকার করিয়া থাকিলেও, জগতের কেহই আজি তাঁহাদিগের জীবন-চিত্রের আলোচনা করিয়া কৃতার্থ হইবার সুযোগ পায় না। জীবনের অনিত্যতাদর্শী ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত,

কোন দিনও ইতিহাস কিংবা জীবন-চরিত লিখিতে ভাল বাসিতেন না। তাই, বাল্মীকি ব্যাস, পাণিনি পতঞ্জলি, কালিদাস ও ভবভূতির মত ক্ষণজন্মা পুরুষদিগের জীবন-বৃত্ত সম্বন্ধেও এদেশে কেহ কিছু লিখিয়া যান নাই। সুতরাং, রঘুনাথের জীবন-সম্পর্কিত ইতিবৃত্তও যে কুত্রাপি লিপিবদ্ধ হয় নাই, ইহা কোন অংশেও বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু রঘুনাথ পুরুষের মধ্যে পুরুষ,—অদ্বিতীয় মনস্বী, অসাধারণ চিন্তাশীল, ভারতের অনন্তস্থায়ি কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইয়ুরোপেও ইদানীং তাঁহার নাম পঁহুচিয়াছে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যেও অনেকেই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যাঁহারা দার্শনিক বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন, রঘুনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং উচ্চসম্মানার্হ। রঘুনাথের রচনা, কপিল-কণাদ-প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের সংস্কৃতের ন্যায় প্রগাঢ়, পরিপক্ক ও পবিত্র, এবং সর্ব্বত্রই যার-পর-নাই গভীর, ঘন-সন্নিবিষ্ট ও পরিমার্জ্জিত। রঘুনাথের জীবন-চরিত না থাকিলেও জীবনের আখ্যায়িকাটি, অশেষবিধ (anecdotes) ইতিকথায় অংশতঃ রক্ষিত হইয়া, মহাকবি ও মহাযশস্বী পুরুষদিগের উপাখ্যানের মত লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে কতকটা প্রচারিত আছে।

নবদ্বীপের রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশের নাম অনেকে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। রামভদ্র বড় পণ্ডিত ছিলেন। এক সময়ে বঙ্গের সর্ব্বত্রই একপত্রী পণ্ডিতের মত তাঁহার অত্যধিক আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। রামভদ্রের পুত্রের নাম মহেশ্বর বিশারদ, এবং তদীয় অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে একটি ছাত্রের নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। আমরা, শচীর পিতা সদাশয় নীলাম্বরকে অনেক দিন হয় ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আজি, এই সুযোগে, পুনরায়, তাঁহার পুণ্যময় নামটি স্মরণ করিয়া সুখানুভব করিলাম। মহেশ্বর বিশারদ, পিতা রামভদ্র অপেক্ষাও, বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। শাদা সিধা নীলাম্বর তাদৃশ প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু, তিনি মহেশ্বর-বিশারদের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এই কথাটাই তাঁহার একটি সুখ্যাতিসূচক উপাধির মত হইয়াছিল। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে,—

"সার্ব্বভৌম কহে, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তার খ্যাতি।"

এই সার্ব্বভৌমই বিখ্যাতনামা বাসুদেব সার্ব্বভৌম। মহেশ্বর বিশারদের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ বাসুদেব; কনিষ্ঠের নাম কোন পুঁথি পত্রে পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার উপাধি বাচস্পতি। মহেশ্বর বিশারদের স্বর্গলাভের পর, বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান হইয়া, গঙ্গার পূর্ব্বপারে বিদ্যানগর গ্রামে, পৈত্রিক বাসভবনে বৃহৎ টোল খুলিলেন, এবং দেশ-দেশান্তরের ছাত্রকে শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বাসুদেবের টোল, বেদান্তশাস্ত্রের একটি প্রধান টোল বলিয়া, ভারতবর্ষের বহুস্থলে, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, সুপরিচিত হইল। বাসুদেব প্রাচীন ন্যায়েও প্রবিষ্ট ছিলেন বটে; কিন্তু তিনি বেদান্তশাস্ত্রেই

প্রকৃত অধীতী; বেদান্তের পণ্ডিত বলিয়াই তাঁহার পরিচয়, এবং তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকেও বেদান্ত বিষয়েই উপদেশ দিতেন।

বেদান্ত আর ন্যায় আলোক ও অন্ধকারের মত পরস্পর-বিরুদ্ধ। বেদান্ত অদ্বৈতবাদী, ন্যায়দর্শন দ্বৈতবাদী। ন্যায়ের মতে জীব আর ব্রহ্ম অনাদি কাল হইতে বিভিন্ন, বেদান্তের মতে জীব আর ব্রহ্ম এক ও সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। বেদান্তের সূত্রকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এবং ভাষ্যকার ভারত-বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য। রামানুজ প্রভৃতি আরও অনেক বড় লোকে বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন বটে; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকৃত "শারীরিক ভাষ্য" নামক মহাগ্রন্থই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি বলিয়া জগতে পরিচিত। ন্যায়-দর্শনের সূত্রকর্ত্তা গৌতম ঋষি, বৃত্তিকার মিথিলার মুকুট-মণি গঙ্গেশ উপাধ্যায়। গঙ্গেশের গ্রন্থের নাম "চিন্তামণি।" উহা চারিখণ্ডে বিভক্ত এবং উহাই ন্যায়দর্শনের প্রধান গ্রন্থ বলিয়া জগতে পরিচিত। বাসুদেব অবশ্যই মূল-চিন্তামণির সমস্ত কথা সম্যক্ জানিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত সেই চিন্তামণি-রূপ মূল-বৃক্ষ হইতে শাখা-প্রশাখার ন্যায় বিস্তারিত প্রকৃত ন্যায়শাস্ত্রের কোন প্রকার প্রেম-সম্পর্ক ছিল না। ইহা থাকিতে পারে না। কেন না তিনি বেদান্তবাদী। যাহাদিগের হৃদয় বেদান্তের তত্ত্বরসে ডুবিয়া রহে, তাহারা ন্যায়শাস্ত্র ভালবাসে না,—ন্যায়শাস্ত্রের সমীচীন ব্যাখ্যা কিংবা পক্ষসমর্থন করিতে সমর্থ হয় না। সেইরূপ আবার, যাহারা নৈয়ায়িক,—ন্যায়শাস্ত্রের নানা কথা লইয়া বিভোর বেদান্তের কোন কথাই তাহাদিগের কাছে ভাল লাগে না। যখন গৌরাঙ্গের সহিত নীলাচলে বেদান্তপণ্ডিত বাসুদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলিয়াছেন,—

"তুমি জগদ্‌গুরু, সর্ব্বলোক-হিত-কর্ত্তা,
বেদান্ত পড়াও, সন্ন্যাসী-উপকর্ত্তা।"

বাসুদেব সার্ব্বভৌম,বেদান্তশাস্ত্রের প্রসঙ্গে, নিজেও তখন বলিয়াছেন,—

"অধীতমধ্যাপিতমেতদুচ্চৈ
রনেকশস্তৎ পুনরপ্যমুষ্য।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই বেদান্তশাস্ত্র আমি বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং ছাত্রগণকেও অনেক বার ইহা অধ্যয়ন করাইয়াছি।

তবে কিরূপে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রচার হইল? সেই কথাই রঘুনাথের কথা। বাসুদেব যখন বিদ্যানগরের টোলে, শত শত ছাত্রকে একই সঙ্গে বেদান্ত বিষয়ে বিদ্যাদান ও অন্নদান করিতেছেন, এমন সময়ে, একদিন একটি মলিনবসনাবৃতা, ম্লান-মুখী, দুঃখিনী ব্রাহ্মণকন্যা, পাঁচ বৎসর বয়সের একটি অসামান্য-তেজস্বী অতিমাত্র-তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন নির্ভয় শিশুকে সঙ্গে লইয়া, সহসা তাঁহার কাছে যাইয়া, ভক্তির সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং কাতরকণ্ঠে এই বলিল,——

"বাবা, আমি পিতৃহীনা কাঙ্গালিনী। আমার নিবাস পদ্মার তটে। আমি আপনার নাম শুনিয়া এখানে আসিয়াছি। আমি

দেব-ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আপনাকে পিতৃ-সম্ভাষণ করিলাম। আজি হইতে আপনিই আমার পিতা। আমার এই বালকটিও এ অভাগিনীর কর্ম্মদোষে অকালে পিতৃহীন হইয়াছে। আমি উহাকে আপনার পদ-তলে ফেলিয়া দিলাম; এখন আপনার যাহা ইচ্ছা।"

দয়ার্দ্রচিত্ত বাসুদেব সেই দুঃখিনীকে কন্যাজ্ঞানে আপনার অন্তঃপুরে স্থান দিলেন, এবং বালকটির চটুল-নয়নে বুদ্ধির একটুকু বিশেষ চমক দেখিয়া উহাকে আদর করিয়া কাছে রাখিলেন। সেই পিতৃহীন বালকই এইক্ষণ শাস্ত্রার্থদর্শী শতসহস্র-বিদ্যা-ব্যবসায়ীর পিতৃস্থানীয়, প্রথিতনামা রঘুনাথ শিরোমণি। রঘুনাথ, বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে মাতামহ জ্ঞানে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বাসুদেবও রঘুনাথকে ঠিক্ আপনার দৌহিত্রটি মনে করিয়া ভালবাসিতেন।

যে দিন, প্রতিভার ঐ প্রাচীন-তরুর সহিত এই নবোদ্গত অঙ্কুরের প্রথম মিলন, তাহার পর দিবস, প্রাতঃসময়ে, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, বাটীর বহিরঙ্গণে বসিয়া মুখ প্রক্ষালনের কালে, ছাত্রদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,———

"এবার সব গাছেই প্রচুর আম হইবে। সব গাছেই প্রচুর মুকুল হইয়াছে।"

তখন ফাল্গুন মাসের প্রথম; বাসুদেব আমের মুকুল দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। রঘু-নাথ কাছে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—দাদা মহাশয়! এবার তাল গাছে আর তেঁতুল গাছেও আম হইবে না কি? বাসুদেব বলি-লেন,—"কেন রে ভাই"?" রঘুনাথ বলিলেন —"কেন আবার জিজ্ঞাসা কর কি, দাদা? তুমিই না বলিলে,'সব গাছে মুকুল হইয়াছে। তাল গাছ আর তেঁতুল গাছ কি 'সব' গাছের মধ্যে নয়?" বাসুদেব সার্ব্বভৌম বালকের প্রশ্ন ও পূর্ব্বপক্ষ শুনিয়া আগে একটুকু হাসিলেন; তার পর, আনন্দে ডগমগ হইয়া বালককে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন-দানে চরিতার্থ করিলেন। আর এক দিন বাসু-দেব, বালকটিকে আপনিই আদর করিয়া "ক, খ," পড়াইতে লাগিলেন। বালকেরা "ক—খ" শিক্ষার সময় কিরূপ কষ্ট অনু-ভব করে, তাহা সকলেরই জানা কথা। কিন্তু রঘুনাথের "ক-খ" শিক্ষা, শিক্ষকেরই অধিকতর কষ্টকর হইল। বালক রঘুনাথ বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"দাদা! আগে কেন "ক," তার পর কেন "খ"? "ঘ" কেন "গ" এর আগে বসে না? বাসুদেব ঘোরতর দার্শনিক। তিনি বালকের প্রত্যেক প্রশ্নেই কূট-জিজ্ঞাসার কৌশল-পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন।

ইহার কয়েক মাস পর এক দিন, বাসু-দেবের একটুকু আগুনের প্রয়োজন হইল। তামাক খাইতেছিলেন; আগুন নাই। আগু-নের জন্য রঘুনাথকে অন্তঃপুরে পাঠাইলেন। রঘুনাথ সেই সময়ে বাড়ীর সকলের কা-ছেই প্রশ্নকর্ত্তা ও পূর্ব্বপক্ষবাগীশ বলিয়া খ্যাতি পাইয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক প্রশ্নই অপূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষ। তিনি যাহাকে যে কোন

কার্য্য করিতে দেখিতেন, তাহাকেই সেই কার্য্যোপলক্ষে দুই একটি নূতন প্রশ্ন করিতেন। তাঁহার মাতামহী অর্থাৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের গৃহিণীকেও প্রশ্ন করিয়া অস্থির রাখিতেন। বাসুদেবের গৃহিণী পাক করিতেছিলেন; রঘুনাথ সেখানে যাইয়া আগুন চাহিলেন। বাসুদেবের গৃহিণী, রঘুনাথকে জব্দ করিবার জন্য, খানিকটা আগুন হাতায় তুলিয়া, "এই নে বানর" বলিয়া, তাহা তাঁহাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। রঘুনাথের হাতে কোন পাত্র ছিল না; কিন্তু মস্তিষ্কে অনন্যলক্ষিত বুদ্ধি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কতকটি মুড়িভাজা বালু হাতে তুলিয়া, দুই হাতে অঞ্জলি পাতিয়া, সেই বালুর উপর আগুন লইলেন।

এই বিস্ময়াবহ কথা ক্ষণকালের মধ্যেই বাসুদেবের কর্ণে পহুঁচিল। তিনি বুঝিলেন যে, এ সদানন্দ বালক সামান্য মনুষ্য নহে। ইহার দ্বারা কালে বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল হইবে। তিনি, সেই হইতে রঘুনাথকে ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রে আপনিই বিশেষ মনোযোগের সহিত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন; এবং আগুন যেমন অনিল-সংবর্দ্ধনায় অতি দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, রঘুনাথও সেইরূপ দেখিতে দেখিতেই 'বড়' হইয়া উঠিলেন। বালক হইলেও বড়; কেননা বুদ্ধি ও প্রতিভা অলোক-সামান্য। রঘুনাথ যখন দ্বাদশ-বৎসরের বালক, তখন তিনি নবদ্বীপ-প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রে সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত। রঘুনাথের এই অভাবনীয় উন্নতি দেখিয়া বাসুদেব আনন্দে আত্মহারা। এখন কি করিতে হইবে? বাসুদেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, রঘুনাথকে তখনকার দুর্ল্লভ, দুরূহ ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার জন্য, মিথিলায় পাঠাইয়া দিলেন। বাসুদেবের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, রঘুনাথ ন্যায় পড়িলে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের আর অভাব থাকিবে না।

তখন ন্যায়ের গুরু পক্ষধর মিশ্র, মিথিলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সমাজে, প্রধান-পদবীরূঢ়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলেন যে, এক পক্ষধরেরই পোনরটি টোল ছিল। যে সকল 'বিদেশী' * ছাত্র তাঁহার কাছে অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইত, তাঁহারা তাঁহার প্রথম টোলে যাইয়া কোন একটি প্রশ্ন করিত। যদি সেই টোলেই সেই প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইত, প্রশ্নকর্ত্তা তাহা হইলে আর দ্বিতীয় টোলে যাইতে অধিকার পাইত না। কথাটা অতিশয় অদ্ভুত হইলেও শুনিতে বড় মিষ্ট। এ দেশে, সে সময়ে, শাস্ত্রালোচনার কিরূপ আশ্চর্য্য ঘটা ও আড়ম্বর ছিল, ইহা দ্বারা তাহার একটুকু আভাস পাওয়া যায়। রঘুনাথ উল্লিখিত

* সংস্কৃতের অনুকরণে,—অনুসরণে নহে,—অনুকরণে,—বাঙ্গালায় "তস্য ইদম্" অর্থাৎ "ইহা তাহার" এই অর্থে, দেশ, বিদেশ, স্বদেশ কৃত্তিবাস, ও কাশীদাস প্রভৃতি কতিপয় শব্দের উত্তর ইন্ প্রত্যয় হয়। যথা, দেশী লোক, কৃত্তিবাসি রামায়ণ। "কে এল এই বিদেশিনী," ইত্যাদি। এইরূপ অনুকরণ কোন অংশেও দুষ্য নহে, অথচ দুষ্পরিহর।

পক্ষধর মিশ্রের টোলে যাইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। প্রথম টোলের ছাত্রেরা, বঙ্গদেশের এই দুগ্ধগন্ধি বালকটিকে দেখিয়া, আগে সকলেই উপহাস করিলেন। কিন্তু, তাঁহাদের এই উপহাস ও রসিকতা অনেকক্ষণ রহিল না। কারণ, এবারকার প্রশ্নকর্ত্তার নাম রঘুনাথ। রঘুনাথ যখন তাঁহার প্রশ্ন করিলেন, তখন প্রথম টোলের সমস্ত ছাত্রই, আপনাদের অসারতা অনুভব করিয়া, লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন।

রঘুনাথ ইহার পরে পক্ষধরের দ্বিতীয় টোলে অতিথি, এবং সেখানে তাঁহার দ্বিতীয় এক প্রশ্ন। দ্বিতীয় টোলের ছাত্রেরা খানিক কাল বিচার করিল; তার পর রঘুনাথের বুদ্ধির নিকট পরাভূত হইয়া নিরুত্তর হইল। মনস্বী রঘুনাথ, এইরূপে প্রায় এক মাসের পরিশ্রমে, পক্ষধর মিশ্রের চৌদ্দটি টোল অতিক্রম করিয়া, পঞ্চদশ টোলে উপস্থিত হইলেন। সেই টোলের অধ্যাপক ও উত্তরকর্ত্তা তদানীন্তন শাস্ত্রীয়-জগতের সর্ব্বেশ্বর-বিধাতা স্বয়ং পক্ষধর মিশ্র। তাঁহার কাছে আগেই রঘুনাথের সংবাদ পঁহুছিয়াছিল। বঙ্গদেশের এক দ্বাদশ-বর্ষীণ বালক পৃথ্বীজয়ী পক্ষধরের সমস্ত টোল একে একে পরাজয় করিয়াছে, এই কথা লইয়া তাঁহার কাছে বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু পক্ষধর তাঁহার ছাত্রদিগের মত ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না। তিনি উদার, উচ্চপ্রকৃতি ও মহাশয় পুরুষ,—স্বভাবতঃ স্নেহশীল ও গুণানুরক্ত। তিনি রঘুনাথ-হেন ছাত্র পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন; রঘুনাথের সকল কথারই সদুত্তর বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু রঘুনাথের অলোক-সামান্য প্রতিভার কথা চিন্তা করিয়া, মিথিলার ভাবি-গৌরব-রক্ষা বিষয়ে, মনে ভীত হইলেন।

রঘুনাথ এক্ষণ হইতে পক্ষধরের ছাত্র। পক্ষধর তাঁহাকে ন্যায়শাস্ত্রের তৎকাল-প্রচলিত গ্রন্থপত্রে উপদেশ করিতে লাগিলেন; এবং রঘুনাথও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ন্যায়ের মূল গ্রন্থ অর্থাৎ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চিন্তামণি ও সমস্ত টীকা টীপ্পনী কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পক্ষধরের নিয়ম বড় কঠিন। সে নিয়ম রঘুনাথের জন্য আরও বেশী কঠিনতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রঘুনাথ যখন বাড়ী আসিতেন, তখন পক্ষধর মিশ্র তাঁহাকে কোন পুস্তকই সঙ্গে আনিতে দিতেন না। রঘুনাথের ইহা প্রাণে সহিল না। বঙ্গভূমি, ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে, চিরকালই মিথিলার পায়ে মাথা লুটাইবে, বঙ্গমাতার ক্ষণজন্মা পুত্র রঘুনাথের কাছে ইহা ভাল লাগিল না। তিনি মনে মনে এক নূতন সঙ্কল্প করিলেন, এবং কিছু দিন নবদ্বীপে থাকিয়া চিন্তামণি-দীধীতি নামে ন্যায়শাস্ত্রের এক নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া ফেলিলেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের মূল গ্রন্থ অর্থাৎ "চিন্তামণি" আয়তনে বড় ক্ষুদ্র। উহা রঘুনাথের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার নূতন গ্রন্থে "চিন্তামণির" সমস্ত কথাই যথাযথ উদ্ধৃত রহিল। কিন্তু, মিথিলাবাসীরা চিন্তামণির যে সকল টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিতেন, সে গুলি,

সর্ব্বাবয়বে পরিবর্ত্তিত ও নূতন মূর্ত্তিতে বিরচিত হইয়া, "চিন্তামণি-দীধীতি" নামে জগতে একটি নূতন জ্যোতির মত প্রকাশিত হইল।

রঘুনাথ, গুরুদত্ত উপাধির গৌরবে, ইহার পর হইতে "শিরোমণি" বলিয়া পরিচিত হইলেন। যাঁহারা পৃথিবীতে এক্ষণ ন্যায়দর্শন পড়েন, শিরোমণিই তাঁহাদিগের সার-সর্ব্বস্ব। কেননা, নৈয়ায়িকদিগের নিকট দীধীতিরই এক্ষণকার প্রচলিত নাম "শিরোমণি।" যখন রঘুনাথ-শিরোমণির এই "নব্যন্যায়" অথবা নূতন গ্রন্থের একখানি প্রতিলিপি পক্ষধরের হস্তে পহুঁচিল, তখন তিনি উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মনের অতি গভীর বিষাদে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মিথিলার সমস্ত পুঁথি পত্র সরযূর জলে ডুবাইয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার কথা অনুরূপে ফলিল। মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র ও মিথিলার ন্যায়ের গৌরব. সেই হইতেই বিলয় পাইল, এবং সেই হইতে নবদ্বীপেই ন্যায়ের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কাশী যেমন বেদবেদান্ত-শিক্ষার প্রধান স্থান, নবদ্বীপও সেইরূপ ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া সমগ্র ভারতে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল; এবং মহামতি রঘুনাথ, গৌতম ও গঙ্গেশের ন্যায়শাস্ত্রকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, নূতন সাঁচে ঢালিয়া, যেরূপ গড়িয়া তুলিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ তাহাই ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইল।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপ-রুদ্র-গজপতির বিশেষ অনুরোধে, নবদ্বীপ ছাড়িয়া, উড়িষ্যার রাজধানী "পুরী" নগরে চলিয়া গেলেন; এবং রাজার দ্বারপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া, সেখানে আবার বেদান্তের টোল বসাইলেন। এ দিকে রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপের অন্তর্গত "বিদ্যানগরে" নূতন টোল সংস্থাপন করিয়া, কাশী, কাঞ্চী, মথুরা ও পুরাতন-গুরুস্থান মিথিলা প্রভৃতি নানাদেশীয় ছাত্রবৃন্দকে নব্য ন্যায়ের নূতন গ্রন্থ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রঘুনাথ যখন বৃদ্ধ, তখন নবদ্বীপবাসীরা তাঁহাকে "কাণভট্ট" বলিত। বোধ হয়, তিনি তাঁহার চিরজীবনব্যাপি গ্রন্থশ্রমে একটি চক্ষের দৃষ্টি শক্তিতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, রঘুনাথ ও কাণভট্ট এই উভয় নামই এক্ষণ লোপ পাইয়াছে। জগতে তাঁহার এক্ষণকার প্রচলিত নাম শিরোমণিই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জগতে চন্দ্র সূর্য্য থাকা পর্য্যন্ত এ নাম বিলুপ্ত হইবে না।

বঙ্গদেশে ইদানীং কত অক্ষর-জ্ঞান-শূন্য বিকট-মূর্খ 'ভট্টাচার্য্য,' শিরোমণি-উপাধির বিশেষ আদরে সমাদৃত হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু স্বদেশের প্রকৃত শিরোমণি রঘুনাথ যখন 'শিরোমণি' উপাধি লাভে অলঙ্কৃত হইলেন, তখন মিথিলা ও বঙ্গে অনেকেরই তাহা সহ্য হইল না। কেহ কেহ এই শিরোমণি উপাধির প্রতি শ্লেষের বিষবর্ষণ করিয়া শ্লোক রচনা করিলেন। সেই শ্লোকের একটি চরণ অদ্যাপি অনেকে পরিহাস-রসিকতার সহিত আবৃত্তি করিয়া থাকেন। যথা,-

"অভাগ্য-গৌর-দেশে তু
কাণভট্টঃ শিরোমণিঃ"

অর্থাৎ,—

গৌর দেশ এমনই অভাগা যে, কাণভট্টই এখন সে দেশে শিরোমণি নামে সকলের মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত।

কাণভট্ট রঘুনাথ দীর্ঘজীবী হইয়া ছিলেন। তিনি যখন চরম-বার্দ্ধক্যের সন্নিহিত, তখন শাস্ত্রীয় কথা কহিবার সময়ে তাঁহার একটু একটু শিরঃকম্প হইত। অপিচ, রঘুনাথ, পণ্ডিতসমাজের শিরোমণি হইয়াও, পৃথিবীর সুখ-সম্পদে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি চিরদিনই শাস্ত্রচিন্তার উন্মত্ততায় অর্থবিত্ত-উপার্জ্জনে উদাসীন রহিয়াছিলেন; সুতরাং সময়ে সময়ে সাংসারিক অভাবে কষ্ট পাইতেন। নবদ্বীপের নগণ্য পণ্ডিতেরাও, ধনিদিগের স্তুতি-বন্দনায় কবিতা রচনা করিয়া, কবি বলিয়া কীর্ত্তিত হইত, এবং ঐ রূপ নিকৃষ্ট কবিত্বের পুরস্কারে প্রচুর পারিতোষিক পাইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। অথচ, নবদ্বীপের শিরোমণি স্বনাম-ধন্য রঘুনাথ, স্বগৃহে রাশীকৃত গ্রন্থপত্র সম্মুখে লইয়া সাংসারিক দুঃখকষ্টে হৃদয়ে অবসন্ন রহিতেন, এবং কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, মাথাটি কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া উত্তর দিতেন। তাঁহার শরীর ও সংসারের এই দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া, এক নীচাশয় কবি কবিতা রচনা করিলেন। শুধু কবিতা-রচনা করিলেন, তাহাই নহে। কবিতা-রচনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অভিমান-সহকারে কহিলেন যে, রঘুনাথের যদি তাঁহার মত কবিত্ব শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি কোনরূপ দুঃখ পাইতেন না। সে কবিতাটি এই,——

যস্য সাংসারিকী চিন্তা,
চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ;
তস্যৈব হি শিরঃকম্পঃ
ক শিরোমণিধারণম্।

অর্থাৎ,—যাহার চিত্ত সাংসারিক চিন্তায় ক্লেশিত, সে কিরূপে চিন্তামণির চিন্তা করিবে? ঐ সাংসারিক চিন্তায়ই যখন শিরঃ-কম্প ঘটিয়াছে, তখন কিরূপেই বা সে তাদৃশ কম্পিত শিরে শিরোমণিরূপ রত্ন অথবা উপাধি ধারণ করিবে?

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, 'শিরোমণি' শব্দটি যেমন এই কবিতায় দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 'চিন্তামণি' শব্দটিও সেইরূপ দুইটি বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রঘুনাথ-পক্ষে চিন্তামণির অর্থ ন্যায়শাস্ত্রের মূল-গ্রন্থ 'চিন্তামণি'। কবিতা যখন কথাচ্ছলে রঘুনাথের কানে পশিল, তখন তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের দিকে চাহিয়া, এক হাসিয়া হাসিয়া, তন্মুহূর্ত্তরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। সে কবিতাটি আজও বঙ্গীয় নৈয়ায়িকেরা ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিয়া থাকেন। আমরাও এখানে প্রগাঢ় ভক্তির সহিতই উহা পত্রস্থ করিব। কারণ, রঘুনাথের কোন কথাই ইতিহাসের পরিত্যাজ্য নহে। রঘুনাথ কহিলেন,—

কবিত্বং কিয়দৌন্নত্যং
চিন্তামণি-মনীষিণঃ।

নিপীত-কালকূটস্য
হরস্যোবাহিখেলনম্।

ইহার এই তাৎপর্য্য,—যাঁহার মন, চিন্তামণির সৌন্দর্য্যসাগরে প্রবেশ করিয়া, সেখানেই ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহার পক্ষে কবিত্বে আর কি বিশেষ উন্নতির কথা। মহাদেব কাল-কূট-সমুদ্র পান করিয়া, নীলকণ্ঠ-মূর্ত্তিতে নীরবে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, ঠাকুর! তুমি সাপুড়িয়ার মত সাপটি লইয়া খেলা করিতে পার কি, তাহা হইলে মহাদেব কি উত্তর করিবেন?

এই কবিতায় অবশ্যই একটু অভিমানের গন্ধ আছে। কিন্তু সে অভিমান স্বচ্ছ-সলিল-প্রতিবিম্বিত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় প্রশান্ত ও প্রীতিসুখকর, এবং সর্ব্বথাই নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা অথবা সৃষ্টিকর্ত্তা মহামনীষী রঘুনাথের মহিমার যোগ্য। *

* প্রবন্ধ-লেখক, তদীয় প্রথম বয়সে, বিক্রমপুরের প্রধান পণ্ডিত ও তদানীন্তন পণ্ডিত-সমাজের গুরুস্থানীয়, স্বর্গগত গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম-মহাশয়ের নিকট, এবং তৎপরে, বিক্রমপুরের অন্যতম মহাপণ্ডিত, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, স্বর্গগত চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার ও নবদ্বীপাভরণ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি বহু ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ীর কাছে, বঙ্গে নব্য-ন্যায়-প্রতিষ্ঠার যে সকল কথা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাই এই প্রবন্ধে রঘুনাথের জীবনবৃত্তরূপে যত্নের সহিত গ্রথিত হইল।

এক্ষণ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, রঘুনাথই যে বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ইহার প্রমাণ কি? প্রমাণ—স্বয়ং, রঘুনাথ, প্রমাণ তাঁহার অক্ষয় ও অবিনশ্বর 'দীধীতি'। রঘুনাথের সেই দীধীতি এইক্ষণ শতগ্রন্থে পল্লবিত হইয়া সংসারে এক অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। রঘুনাথ যখন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ, তখন নবদ্বীপের জগদীশ তর্কালঙ্কার দীধীতির এক টীকা রচনা করেন। সে টীকা জাগদীশী বলিয়া জগতে বিখ্যাত। নবদ্বীপের অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ গদাধর ভট্টাচার্য্য রঘুনাথের লেখনী-বিন্যস্ত প্রত্যেক অক্ষরের অতি বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া আর এক টীকা লিখিয়াছেন। তা ছাড়া, বিক্রমপুর-সমাজের চন্দ্রমণি, কালীশঙ্কর ও অভয়ানন্দ "চমৎকার" প্রভৃতি উদ্দীপ্ত-কীর্ত্তি পণ্ডিতবর্গও রঘুনাথের গ্রন্থাবলম্বনে সম্মানার্হ পত্রী রচিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রন্থ ও পত্রীই ইদানীং বঙ্গে এবং কাশ্মীর ও কাশী প্রভৃতি স্থানে ন্যায়ের গ্রন্থ বলিয়া পঠিত ও পাঠিত হইয়া থাকে। ন্যায়শাস্ত্রের উল্লিখিতরূপ কোন গ্রন্থে বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভৃতি অন্য কাহারও কোন নাম নাই। থাকিবার কথাও নহে। কিন্তু রঘুনাথের নাম পত্রে পত্রে ও পংক্তিতে পংক্তিতে।

পরিচিত গ্রন্থপত্রে রঘুনাথের পিতৃপরিচয় নাই, রঘুনন্দনের পিতৃপরিচয় আছে। রঘুনন্দনের পিতার নাম হরিহর ভট্টাচার্য্য,—পূর্ব্বনিবাস বর্দ্ধমান প্রদেশ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথের ন্যায় প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

নহেন। জগতে তাঁহার স্তুতি নিন্দা নাই। তাঁহার জীবনের ইতিকথা, জনশ্রুতি কিংবা অন্য কোন সূত্রে, জগতের ইতিহাসে স্থান পায় নাই। লোকে কোন কালেও তাঁহার শৈশব কিংবা যৌবনের কোন কথা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহে নাই। কিন্তু, তিনি বড় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি। কিবা রঘুনাথ, কিবা গঙ্গেশ, কিবা গৌতম, কিবা জ্ঞানগুরু শঙ্কর, ইঁহারা কেহই রঘুনন্দনের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের কাছে সুপরিচিত নহেন। রঘুনাথ গভীর-চিন্তাশীল গুণগ্রাহী পণ্ডিতবর্গের মস্তিষ্কের মধ্যে; রঘুনন্দন হাটে ঘাটে, নিত্যকৃত্যবিধানে, নিত্যস্নানে, আহারে, বিহারে, শ্রাদ্ধে এবং জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে। যাহারা নিতান্ত নিরক্ষর, তাহারাও রঘুনন্দনের নাম লইয়া, কোন্ তিথিতে কি খাইতে নাই, সে কথার ব্যবস্থা দিয়া থাকে। ফলতঃ রঘুনন্দনই বঙ্গদেশের বিধাতা, ব্যবস্থাতা। বঙ্গদেশের ছোট বড় সকলেই তাঁহাকে জানে, এবং পাঁচ কাহন কড়ির প্রায়শ্চিত্তের কথা অবধি পঞ্চাগ্নি নামক ক্রিয়া পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই বঙ্গের সকলে তাঁহার দোহাই মানে।

রঘুনাথ যেমন পুরাতন ন্যায়শাস্ত্র ভাঙ্গিয়া দীধীতি নামক গ্রন্থ রচনা করেন, রঘুনন্দনও সেইরূপ স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের সারার্থ সংগ্রহ করিয়া অষ্টাবিংশতিতত্ব নামে এক নূতন গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। যথা গ্রন্থারম্ভে,—

প্রণম্য সচ্চিদানন্দং পরমাত্মনমীশ্বরং,
মুনীন্দ্রানাং স্মৃতেস্তত্বং বক্তি শ্রীরঘুনন্দনঃ।

এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের কোন স্থলেও রঘুনন্দনের নিজের কোন কথা নাই; অথচ তিনি যে ভাবে যে কথাকে গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছেন, সেই কথা ঠিক্ সেই ভাবেই বঙ্গদেশে গৃহীত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গের আধিপত্য প্রদান করিয়াছে, এবং রঘুনন্দনের নাম:মনু ও অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকার দিগের স্মরণীয় নামকেও বঙ্গদেশে নীচে ফেলিয়াছে। ইহার উপর রঘুনাথের আর অধিক পরিচয়ের আবশ্যকতা কি? কিন্তু এ কথা বড়ই বিস্ময়জনক যে, বঙ্গদেশের ইতিহাসে যে স্থানে ও যে সময়ে রঘুনাথ ও রঘুনন্দন, ঠিক্ সেই স্থানে ও সেই সময়ে ভক্তির বিগ্রহ গৌরহরি। এই তিনে, জল ও স্থলের পার্থক্য সত্বেও, কেমন একটুকু বিচিত্র সমভাবতা আছে, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে।

রঘুনাথ বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রে প্রচলন করিলেন। এ কথার সহিত গৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের বিশেষ সম্পর্ক কি? রঘুনাথকৃত-দীধীতির সারোদ্ধার এই যে, জীব আর ব্রহ্ম পরস্পর পৃথক্, এবং সেই নিত্যসত্য পর-ব্রহ্মের শ্রীপাদপদ্ম-লাভই জীবের পরম সম্পদ। এই কথা বেদান্তশাস্ত্রের মূলদেশে ও শঙ্করাচার্য্যের সমস্ত কথার উপর কুঠারের আঘাত স্বরূপ, এবং এই কথাই গৌরাঙ্গের প্রাণের কথা। রঘুনাথ যাহা জ্ঞান-যোগে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, গৌরাঙ্গ তাহা ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন,— ভক্তির অমৃতময় সাধনায় অসংখ্য জীব-

হৃদয়ে প্রত্যক্ষ ফলাইয়াছেন। তার পর রঘুনন্দন। রঘুনন্দন পরম বৈষ্ণব। তিনি তাঁহার অষ্টবিংশতি তত্ত্বে ক্রিয়া-যোগে ভক্তি শিখাইয়াছেন। গৌরাঙ্গ সেই শুষ্ক ভক্তির মধ্যে প্রাণের সঞ্জীবতা ঢালিয়া দিয়াছেন।

এই জন্যই বলিয়াছি যে, বঙ্গের ইতিহাসে, রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও রস-বিহ্বল শ্রীগৌরাঙ্গের একই কালে আবির্ভাব বড়ই বিস্ময়-জনক। এইরূপ ঘটনায় আপাততঃ অলৌকিকতার কোন আভাস দেখা যায় না। কিন্তু, ভাবিলে বোধ হয় যে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই লোকাতীত সূক্ষ্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম সূত্রে জড়িত ও বিরচিত। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই তিন জনই শঙ্করাচার্য্যের সমান বিরোধী ছিলেন। গৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিলেও কানে হাত দিতেন, এবং "হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ" বলিয়া কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতেন। একদিন অকস্মাৎ, শ্রীগৌরাঙ্গ একটি পণ্ডিতের নিকট শঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের বিবিধ কথা শুনিয়া, তিনি কেন ঐরূপ পাপ-কথা কান পাতিয়া শুনিলেন এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত জন্য গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। রঘুনাথ ও রঘুনন্দন শঙ্করাচার্য্যের নাম শুনিলে কানে হাত দিতেন না ; কিন্তু প্রাণে চমকিয়া উঠিতেন, এবং গঙ্গাস্নান না করিয়া গয়া-গঙ্গা-গদাধর প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিতেন। এই তিনের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতির আর এক সম্পর্ক ছিল বৌদ্ধ-বিদ্বেষ। গৌরাঙ্গ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছেন। রঘুনাথ ও রঘুনন্দনও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিকূলতা-আচরণে সতত যার-পর-নাই উৎসাহী রহিয়াছেন।

বঙ্গদেশের অনেকের মনে অদ্যাপি এইরূপ দৃঢ় সংস্কার আছে যে, রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও শ্রীগৌরাঙ্গ এই তিন জন এক টোলে পড়িয়াছেন, এবং তিনই বাসুদেবের ছাত্র। আমরা যত দূর অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় এ সংস্কার নিতান্ত ভ্রমমূলক। গৌরাঙ্গ-চরিতের প্রধান লেখক ঠাকুর বৃন্দাবন দাস। তিনি তাঁহার চৈতন্যভাগবতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, গৌরাঙ্গ তাঁহার অধ্যয়নব্রতের আরম্ভ হইতে, অধ্যাপনার কাল পর্য্যন্ত, গঙ্গাদাসের টোলেই অবস্থান করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস এই নিমিত্ত গঙ্গাদাসকে গৌরলীলার সান্দিপনি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

"নবদ্বীপে আছে অধ্যাপক শিরোমণি,
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে হেন সান্দীপনি। (ভা)

এই কথা অধ্যয়নের আরম্ভ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবতে এই হইতে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার শেষ পর্য্যন্ত, এক গঙ্গাদাস পণ্ডিত ভিন্ন গৌরাঙ্গের সহিত নবদ্বীপবাসী আর কোন পণ্ডিতের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকা দৃষ্ট হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতেও গঙ্গাদাস পণ্ডিত ভিন্ন আর কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই। যথা,—

"গঙ্গাদাস পণ্ডিত কাছে, পড়ে ব্যাকরণ,
শ্রবণ মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ।

অল্পকালে হৈলা পাঁজি টীকাতে প্রবীণ,
চির-কালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।"

লোচনানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে তিনটি অধ্যাপকের নাম দৃষ্ট হয়;—বিষ্ণু, সুদর্শন ও গঙ্গাদাস।

"হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর,
পড়িবারে গেলা বিষ্ণু পণ্ডিতের ঘর।"

কবি-কর্ণপুরের চরিতামৃত—কাব্যেও শুধু এই তিনটি নামই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে যথা,—

"পপাঠ সংপণ্ডিত-বিষ্ণু-নাম্নঃ
সুদর্শনাদপ্যতিহর্ষভাজঃ।
ততশ্চ বৈয়াকরণাৎ স গঙ্গা-
দাসাদভূৎ প্রত্যনুভূতবিদ্যঃ।"

অর্থাৎ—তিনি সুপণ্ডিত বিষ্ণু ও সহর্ষ সুদর্শন পণ্ডিতের নিকট পাঠ গ্রহণ করিলেন। তারপর, বৈয়াকরণ গঙ্গাদাসের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতবিদ্য হইলেন।

কিন্তু কবি কর্ণপুর তদীয় গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকা নামক গ্রন্থে বিষ্ণুপণ্ডিতের আর নাম লন নাই। তিনি সেই পুস্তকে গঙ্গাদাস ও সুদর্শনকেই শ্রীগৌরাঙ্গের অধ্যাপক বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে বিষ্ণু ও সুদর্শনের নাম নাই। যথা,—

"বুঝিয়া পুত্রের চেষ্টা মিশ্রপুরন্দর,
লৈয়া গেলা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, স্মরণীয়-নামা গঙ্গাদাস পণ্ডিতই গৌরাঙ্গের মুখ্য অধ্যাপক, বিষ্ণু ও সুদর্শন তাঁহার আনুষঙ্গিক উপদেষ্টা মাত্র। অদ্বৈতপ্রকাশ নামক একখানি অভিনব-প্রকাশিত অপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থে শান্তিপুরের অদ্বৈত-আচার্য্যের নামও শ্রীগৌরাঙ্গের অধ্যাপক শ্রেণীতে উল্লিখিত হইয়াছে; তাহাতে ইহাও লিখিত আছে যে, শচীর দুলাল গৌরহরি বাসুদেবের টোলেও কিছুকাল পড়িয়া বেদাচার্য্য অদ্বৈতের টোলে বেদ-বেদান্ত ও ভাগবত পাঠ সমাপন করেন, এবং বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করিয়া দেশে বিদেশে বিখ্যাত হন। আমরা এই বিদ্যাসাগর উপাধির কথা গ্রন্থান্তরে স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই গৌরচন্দ্রের শিক্ষাপ্রসঙ্গে বাসুদেবের নাম দৃষ্ট হয় না বলিয়া বাসুদেবকে তাঁহার অধ্যাপক এবং রঘুনাথকে তাঁহার সহাধ্যায়ীরূপে অবধারণ করিতে সাহস পাই নাই।

পরন্তু, যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত "পুরী" ধামে গৌরাঙ্গের পরিচয় হয়, তখন বাসুদেবের আলাপে ইহাই প্রকাশ পাইল যে, তিনি গৌরাঙ্গকে আর কখনও চক্ষে দেখেন নাই,—কর্ণেও কখনও তাঁহার নাম শুনেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের মত রূপ-গুণ-নিধান লোকাতীত পদার্থকে একবার যে চক্ষে দেখিয়াছে, সে কি আর কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিয়াছে? তবে লোকে তাঁহাকে রঘুনাথ ও রঘুনন্দনের সহাধ্যায়ী এবং বাসুদেবের ছাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করে কেন? ইহার উত্তর আমরা প্রকারতঃ পূর্ব্বেই করিয়াছি। ইতিহাসে যে ক্ষেত্রে রঘুনাথ ও রঘুনন্দন, সেই ক্ষেত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গ। কিন্তু আজি

রঘুনাথ ও রঘুনন্দন মনুষ্যহৃদয়ের বাহিরে,—বহু দূরে,—লিখিত পুঁথিপত্রের অন্ধকারময় গহ্বরে; আর হৃদয়হারী শ্রীগৌরাঙ্গ কোটি-হৃদয়ের অভ্যন্তরে। ইহা ধীরে ধীরে কেমন করিয়া ঘটিল, তাহাই এই ইতিহাসের আলোচ্য কথা।

তবে ইহা স্বীকার করি যে, রঘুনাথ, রঘুনন্দন ও শ্রীগৌরাঙ্গ ছাত্রজীবনের সম-সাময়িকতা সম্পর্কে একে অন্যের নিকট বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন; এবং তেজঃপুঞ্জ রঘুনাথ, প্রথম বয়সেই, গৌরচরিত্রে অলৌকিক উদারতার একটুকু আভাস পাইয়াছিলেন। এই দুইয়ের সম্পর্কে একটি অতি মনোহর ইতিকথা সর্ব্বত্র কথিত হইয়া থাকে। কথাটি এই,—একদিন গৌরাঙ্গ আর রঘুনাথ একসঙ্গে গঙ্গাপার হইতেছিলেন, এমন সময়ে রঘুনাথ গৌরাঙ্গের হাতে একখানি হস্তলিখিত পুঁথি দেখিতে পাইয়া, তাহা পড়িতে চাহিলেন। উদারহৃদয় গৌরাঙ্গ তৎক্ষণাৎ সে পুঁথি রঘুনাথের হাতে দিলেন। রঘুনাথ যখন পুঁথিখানির আগা গোড়া পড়িলেন, তখন তাঁহার মুখছবি পরিম্লান হইল, তাঁহার চক্ষে দুই এক ফোটা জল ঝরিল। গৌরাঙ্গ নিতান্ত ব্যস্তব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাই, এ কি? আমার এ ক্ষুদ্রপুস্তক পাঠে তোমার মুখখানি এমন বিবর্ণ হইল কেন?" রঘুনাথ বলিলেন,—"ভাই তোমার এ পুস্তক অপূর্ব্ব বস্তু। ইহা প্রকাশিত হইলে, পৃথিবীতে আমার পুস্তকের আর আদর থাকিবে না।"

গৌরাঙ্গ বলিলেন,—"বটে! এই সামান্য বিষয়ের জন্য তোমার মত সুহৃজ্জনের এত দুঃখ? তবে দেখ।" গৌরাঙ্গ ইহা বলিয়া তাঁহার বহুশ্রম-লিখিত পুস্তক খানি তৎক্ষণাৎ নখে ছিঁড়িয়া শতখণ্ড করিলেন; এবং সেই ছিন্ন পত্রগুলিকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া, খল খল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রঘুনাথ আগে বিস্মিত হইয়াছিলেন, গৌরাঙ্গের গ্রন্থ-নৈপুণ্য দেখিয়া; এখন ততোধিক—তাহা হইতে সহস্র গুণ অধিক—বিস্মিত হইলেন, তাঁহার এই অমানুষী উদারতা দেখিয়া। তিনি গৌরাঙ্গকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। এইরূপ অদ্ভুত কাহিনী বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কেননা, গৌরাঙ্গ কোন দিনও মিথিলায় যান নাই, এবং সুতরাং তাঁহার মৈথিলী ন্যায়-টীকা অমূলক কল্পনা মাত্র। কিন্তু তিনি চিরদিনই যেরূপ উদার, আনন্দময়, অমায়িক-স্বভাব, সুহৃদ্বৎসল ও সর্ব্বত্যাগী ছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রে এইরূপ ত্যাগ-স্বীকার কোন অংশেও অসম্ভব নহে।

পাঠক দয়া করিয়া জয়দেব প্রণীত নিম্ন লিখিত কবিতাটিকে ২৬৮ পৃষ্ঠায় উমাপতিধর ও শরণ প্রভৃতি নামের পরিচায়ক নোটরূপে পাঠ করিবেন।

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ, সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব এব, শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে। শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন-স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ীকবিক্ষ্মাপতিঃ।

# প্রাচীন ভারতে পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থান

বৈদিক কালে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অসভ্য আদিম অনার্য্য অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। অনার্য্যদিগের বাহু-বল ও ধর্ম্ম-বলে অসভ্য আর্য্যগণ বন হইতে বনান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল। তাঁহারা, ক্রমে পশ্চিমে সুলেমান গিরিপুঞ্জ হইতে পূর্ব্বে গঙ্গা যমুনার পুণ্য-সঙ্গম, উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সিন্ধু সঙ্গম পর্য্যন্ত, সাম-সঙ্গীতে মুখরিত করিয়া তুলিলেন। আর্য্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইল। ইহার বহির্ভূত অন্য কোন স্থানের বিবরণ প্রাচীন আর্য্যগণ অবগত ছিলেন না, অন্ততঃ বেদে তাহার উল্লেখ নাই। *

বঙ্গদেশ উপর্য্যুক্ত ভূমিখণ্ড হইতে পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। বেদে ইহার উল্লেখ না থাকায় বোধ হইতেছে, সেই সুদূর প্রাচীন কালে, ইহা বহু অরণ্যানী সঙ্কুল অনার্য্যগণের আবাসস্থল ছিল। অথবা বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল। কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে কোন বিষয়ের উল্লেখ দৃষ্ট না হইলেই, সেই বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে যাওয়া ধৃষ্টতার বিষয়। সুতরাং, বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ না দেখিয়া আমরা ইহার অস্তিত্ব একবারে অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সম্পূর্ণ বঙ্গদেশ যে তাহার বহু পরবর্ত্তী সময়েও বিদ্যমান ছিল না, ইহা বোধ হয় নিশ্চিত। বৈদিক প্রভাবের পর সংহিতার প্রাদুর্ভাব। মনুসংহিতায় বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; এই সময় বঙ্গদেশ অনার্য্যগণের আবাসভূমি ছিল। আর্য্যাবর্ত্তেরও সীমা পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বর্দ্ধিত হইয়া যথাক্রমে বঙ্গ ও বিন্ধ্য পর্ব্বত অবধারিত হয়। এই সীমা অতিক্রম করিলে, আর্য্যদিগের সমাজচ্যুতির ভয় ছিল। কিন্তু সংহিতাতেও বঙ্গদেশের সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। অতঃপর রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ।

রামায়ণ ও মহাভারত এই উভয় গ্রন্থে বঙ্গের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামায়ণের সময়ে বঙ্গদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন "অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কাশীও কোশল

* "It shows the widest geographical horizon of the vedic poets confined by the snowy Mountains in the north The Indus, and the ranges of the Sulaiman Mountains in the West, the Indus or the sea in the South & the valley of the Jamuna & Ganges in the east. Beyond that the world, though open was unknown to the Vedic poets. "R. C. Dutt's History of civilization of ancient India page 65.

প্রভৃতি দেশের রাজারা আমার শাসনাধীন।" *

রামায়ণে অঙ্গ, বঙ্গের নাম বারংবার কীর্ত্তিত থাকিলেও তৎকালে তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনা তদ্‌গ্রন্থে বিশেষ ভাবে প্রদত্ত হয় নাই। মহাভারত পাঠে এই ভৌগোলিক অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করা যায়।

মহাভারতের লিখিত বর্ণনায় অবগত হওয়া যায় যে, যযাতি রাজার চতুর্থ পুত্র অনুর অধস্তন দ্বাদশ বংশধর বলির পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে আদিত্য তুল্য তেজস্বী পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুত্রগণের নাম যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম। এই পঞ্চ কুমার পাঁচটি বিভিন্ন দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া স্ব স্ব নামে রাজ্যের নামকরণ করিলেন। § সুতরাং বঙ্গদেশ মহারাজ বঙ্গ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল ইহা অবগত হওয়া গেল। অতঃপর বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ সভাপর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প, মহাবীর ভীমসেন সুবিশাল বলচক্রে পূর্ব্বদিক জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছ নিবাসী রাজা মহৌজা প্রথর পরাক্রান্ত ও বলসম্পন্ন এই দুই বীরকে সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গ রাজ্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। এবং মহীপতি সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কিকটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি ও পর্ব্বতবাসী নরপতিগণকে জয় করিয়া সমুদায় ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। অতঃপর লৌহিত্য দেশে উপস্থিত হইলেন এবং সাগরতীর প্রভৃতি সলিল-সন্নিহিত দেশনিবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছ নরপতিদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। ¶

মহাভারতের উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে আমরা এইরূপ অবগত হইতে পারি। ১ম ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে বঙ্গদেশ নামে একটি দেশ ছিল। ২য় সেই সময় সমুদ্র সেন, চন্দ্র সেন প্রভৃতি মহীপতিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বঙ্গ দেশ বিভক্ত ছিল। ৩য় তাম্রলিপ্ত বা বর্ত্তমান তমলুক সেই সময়েও বিদ্যমান থাকিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজার রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। এবং ৪র্থ বঙ্গ অতিক্রম করিয়া তৎপূর্ব্বদিকে লৌহিত্য প্রদেশ বা লৌহিত্য সমুদ্রের পশ্চিমতট বর্ত্তমান ছিল।

বঙ্গ রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান একরূপ অবগত হওয়া গেল। এখন উত্তর ও দক্ষিণ সীমা অবগত হইতে পারিলে, নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইত, মহাভারতীয় যুগে ইহার আকার ও অবস্থান কিরূপ ছিল। আমরা "অশ্বমেধ পর্ব্বের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব; এই পর্ব্ব পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহাবল অর্জ্জুন যজ্ঞ-তুরগের অনু-

* অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম অধ্যায়।

§ মহাভারত আদিপর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়।

¶ সভাপর্ব্ব ত্রিংশত অধ্যায়।

গমন করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রাগ্জ্যোতিষ দেশে * আগমন করেন এবং তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া বঙ্গ রাজ্য অতিক্রম করিয়া সমুদ্র তীরস্থ মণিপুরে উপনীত হন। ¶ এই বর্ণনা অনুসারে প্রাক্জ্যোতিষ রাজ্যকে বঙ্গ রাজ্যের উত্তর সীমা বলা অসঙ্গত নহে। মণিপুর ওড্রের (বর্ত্তমান উড়িষ্যার) দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

মহাভারতের আলোচনায় বঙ্গরাজ্যের সীমা সন্ধান অবগত হওয়া গেল; কিন্তু ভারতবর্ষের গৌরবস্থল বঙ্গরাজ্যের বক্ষপ্রবাহী নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্রের অস্তিত্ব বর্ত্তমান স্থানে উপলব্ধি হইল না। সভাপর্ব্বে লৌহিত্য নদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা ভারতবর্ষীয় নদ নদীর তালিকার ভিতর একটি নাম মাত্র। এই অপ্রচুর বিবরণের এক মাত্র কারণ, ব্রহ্মপুত্র তখন প্রাগ্জ্যোতিষরাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছিল। সাগর-সঙ্গমে ভাগীরথী যেমন গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, ব্রহ্মপুত্রও তৎকালে সেইরূপ সঙ্গম-স্থলে লৌহিত্য সাগর বলিয়া পরিচিত হইতেছিলেন। বঙ্গদেশের অর্দ্ধাংশ (বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্রের তটদেশ) তখন বঙ্গোপসাগরের স্ফীত বক্ষে কল্লোলিত হইতেছিল। উত্তর বঙ্গের পূর্ব্বাংশ তখন লৌহিত্য প্রদেশ বলিয়া সুপরিচিত ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন পূর্ব্ব প্রদেশে আগমন করিয়া এই লৌহিত্য দেশে উপনীত হইয়াছিলেন। পরশুরাম-প্রতিষ্ঠিত তীর্থশ্রেষ্ঠ লৌহিত্য সম্বন্ধে বনপর্ব্বে তীর্থযাত্রা প্রকরণে লিখিত হইয়াছে "পুরাকালে পরশুরাম স্বকীয় প্রভাব দ্বারা যে লৌহিত্য তীর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, মনুষ্য তাহাতে গমন করিলে, বহু বহু সুবর্ণ দানের ফল লাভ করিতে পারে।" ইহাতে উক্ত তীর্থ মনুষ্যাগমের অতীত স্থানে স্থিত বলিয়াই অনুমিত হয়। বাস্তবিক তখন নদশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র সাগর বিস্তৃতির প্রাদুর্ভাবে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে উদ্ভূত হইয়া হিমালয়ের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত ছুটিয়াছিলেন মাত্র। ‖ তাঁহার সঙ্গমস্থল অর্দ্ধাধিক বঙ্গরাজ্য লইয়া তাঁহারই বিশাল

* বর্ত্তমান আসামের উত্তরাংশ তৎকালে প্রাগ্জ্যোতিষ নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে এই প্রাগ্জ্যোতিষের অধিপতি নরকাসুরের ও মহাভারতে তৎপুত্র ভগদত্তের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

¶ অনেকে বর্ত্তমান মণিপুরকে বভ্রুবাহনের মণিপুর বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মহাভারতোক্ত মণিপুর লৌহিত্য সাগরের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, ইহা মহাভারতের আলোচনায় কোন রকমেই স্থিরীকৃত হইবে না; বর্ত্তমান উড়িষ্যার দক্ষিণ সমুদ্র তটে এই মণিপুর রাজ্য বিদ্যমান ছিল। বিশ্বকোষে মণিপুর শব্দ বাহির হইয়াছে কি না অবগত নহি,—সুযোগ্য সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু জন্মভূমিতে মণিপুর সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্তধারণা অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‖ ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে "ব্রহ্মপুত্র" প্রবন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইবে।

মোহনা তাঁহারই নামে পরিচিত হইতে ছিল। আমরা আর একটি মহাভারতীয় উক্তি দ্বারা আমাদের বক্তব্য বিষয় আরও একটুকু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তৎকালীন ভারতের পূর্ব্ব সীমা অতি পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে মনস্থ করিয়া প্রথম পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করতঃ অনেক জনপদ, সাগর ও সরিৎ অতিক্রম করিয়া অবশেষে উদয়াচলের * প্রান্তস্থিত লৌহিত্য সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধনু জল মধ্যে বিসর্জ্জন করিয়া লবণ সমুদ্রের উত্তর তীর লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে গমন করিলেন। সুতরাং এই লৌহিত্য সাগর যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমা ছিল এবং তাহার পর সাগর-চুম্বিত গগন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহা বোধ হয়, মহাভারতের এই স্থূল আলোচনায় অবগত হওয়া গেল।

যদি মহাভরেতের নির্দ্দেশ মত এইরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যায়, তবে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের কোন্ কোন্ স্থান লৌহিত্য প্রদেশ বা লৌহিত্য সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া পরিচিত ছিল? এবং বর্ত্তমান এই ঢাকা বিভাগের কোন অংশের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইত কি না এই দুইটি বিষয়ে বিচার আবশ্যক।

মহাভারত বিরাট গ্রন্থ। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাতে নাই এমন কোন বিষয় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দুইটি বিষয় নির্দ্ধারণও সুকঠিন হইবে না।

মহাভারতের বন-পর্ব্বে তীর্থ-যাত্রা প্রকরণে করতোয়া ও বৈতরণীর নাম-উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং করতোয়া, বৈতণীর অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত ( বর্তমান গোয়াল পাড়া ) হইতে তমলুকের ( তাম্রলিপ্ত ) পাদস্পর্শ করিয়া রেখা কল্পনা দ্বারা লৌহিত্য সাগরের অবস্থান অনুমান করা যাইতে পারে; এবং তাহা

* কেহ কেহ উদয়াচলকে আসামের শৈলমালা নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কতকটা অস্তিত্ব রক্ষা করিতে প্রয়াস পান। এতৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন আপত্তির কারণ নাই; মহাভারতেও লৌহিত্য সাগর বক্ষে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পুঞ্জের আভাস পাওয়া যায়। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় কালিদাস এইরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আবশ্যক। পাণ্ডবগণ যে লৌহিত্য সাগরের পূর্ব্ব পারের কোন স্থলভাগের বিষয় অবগত ছিলেন না, এতদ্দেশের "পাণ্ডব বর্জ্জিত" অপবাদই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। "পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ" অর্থে বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থানকেই বুঝায় না। পরন্ত মহাভারতীয় যুগের পরবর্ত্তী সময়ে লৌহিত্য সাগরোত্থিত প্রদেশ সমূহকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের বর্ণনার সহিতও মিলিয়া যায়। তাহা হইলে, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙ্গালার কতক অংশ লইয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ঢাকা বিভাগ সহ লৌহিত্য সাগরের অসীম জলরাশি মধ্যে নিমগ্ন অবস্থায় ছিল, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বাস্তবিক পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গের অস্তিত্ব একেবারেই ছিল না। পৌরাণিক বা বৌদ্ধ যুগে ইহার অস্তিত্ব পুরাণাদির আলোচনা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। অতঃপর আমরা পৌরাণিক বা বৌদ্ধ যুগের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

মহাকবি-মাঘকৃত

# শিশুপাল বধ। *

## দ্বিতীয় সর্গ।

### মন্ত্রণা।

শিশুপাল সহ করিবারে রণ
যাইতে উন্মুখ যাদব-ঈশ্বরে
নিমন্ত্রিলা যজ্ঞে কুন্তীর নন্দন;
চিন্তিত মুরারি উভ কার্য্যতরে †। ১

বলদেব আর উদ্ধবের সনে
বসিলা কেশব মন্ত্রণা সভায়
যেন বৃহস্পতি-শুক্রের মিলনে
বিরাজিলা শশী অপূর্ব্ব শোভায়। ২

জগতের শান্তি-বিধান কারণ
নিজ তেজে আজি মিলি তিন জন
দীপ্যমান সেই সুচারু সভায়,
যেন অগ্নিত্রয় যজ্ঞবেদিকায় ‡। ৩

একাকী তাঁহারা নিভৃত সভায়;
পড়িয়া তাঁদের প্রতিবিম্বচয়
রত্নস্তম্ভে শোভে বহু জন প্রায়
চারিদিক তাই যেন লোকময়। ৪

উচ্চ হেমময় আসন উপরে
বসিলা উদ্ধব বলদেব হরি;
শোভা পে'ল যেন ত্রিকূট শিখরে
সমাসীন তিন বিশাল কেশরী! ৫

সর্ব্ব কার্য্যে হরি সদা বিচক্ষণ
জিজ্ঞাসিলা তবে গুরু দুই জনে
"করিব কি আগে যাগ দরশন
অথবা যুঝিব শিশুপাল সনে? ৬

* রঘু বংশের অনুবাদক শ্রীনবীনচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত। বান্ধবের ২য় খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠায়, পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

† নিমন্ত্রণ রক্ষা ও শিশুপাল বধ।

‡ দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নি।

কুন্দফুলসম দশন-প্রভায়
আলোকিত হাসি-জালে সভাস্থলী,
ধৌত হ'য়ে যেন সে হাসি ছটায়
বিশুদ্ধ কৃষ্ণের বচন আবলি। ৭

"আপনারা যাহে বক্তব্য আপন
পান অবসর করিতে বর্ণন
এ জিজ্ঞাসা মম—মঙ্গলাচরণ
হয় নাটকের আরম্ভে যেমন। ৮

"দিগন্ত বিজয়ী ভ্রাতৃগণ বলে
জিনিলা ধরারে ধর্ম্মের নন্দন;
রাজ-সূয় যাগ সাধিবে কুশলে
যদিও আমরা না করি গমন। ৯

"তবু নিজ হিত চাহে যেই জন
প্রবল শত্রুরে তুচ্ছ নাহি ক'রে;
বর্দ্ধমান রোগ আর অরিগণ
সম বলি কহে নীতিজ্ঞ নিকরে। ১০

"দুঃখ নাহি ভাবি সাত্বতী-নন্দন *
যদিও করেছে মম অপকার
কিন্তু সে লোকেরে করিছে পীড়ন
তাই মনস্তাপ হয়েছে আমার। ১১

"ইচ্ছা মম, তারে করিব দমন;
করুন প্রকাশ নিজ-অভিপ্রায়;
জানিলেও একা কর্ত্তব্য আপন
সন্দেহ আসিয়া দ্বিধা জনমায়"। ১২

নিজ মনোভাব প্রকাশি মাধব
কহিলা সংক্ষেপে এরূপ বচন,
উত্তর শুনিতে রহিলা নীরব—
মিতভাষী স্বতঃ মহৎ যে জন। ১৩

উত্তরিলা ধীরে রাম মহাবল
স্মরি অরিকৃত পূর্ব্ব অপকার
কাঁপিল ঈষৎ অধরোষ্ঠ তাঁর
বামা-বিম্বাধর-চুম্বন-কুশল। ১৪

ব্যগ্রতা তাঁহার দেখিয়া উদ্ধব
যে বাক্য বলিতে উদ্যত আপনি
না কহিয়া তাহা রহিলা নীরব,—
শেষ সিদ্ধিতরে রহিল সে বাণী †। ১৫

মধুপান মদে আরক্ত বরণ
ঘুরিল রামের যুগল নয়ন—
রেবতীর মুখ-চুম্বন পরশে
পবিত্রিত যাহা তাম্বূলের রসে। ১৬

সদন্ত মুখের মারুতে মলিন
চারু বনমালা দুলিতে গলায়,
আলিঙ্গন লোভী প্রিয়ার কঠিন—
স্তন-নিপীড়নে লাঞ্ছিত দেখায়! ১৭

অরি প্রতি রোষে আরক্ত শরীরে
দেখাদিল তাঁর স্বেদ বিন্দুচয়,
যেমতি সন্ধ্যার আরক্ত অম্বরে
ফুটিছে বিরল তারকানিচয় ‡। ১৮

ঝুলিছে কুণ্ডলে পদ্মরাগ দল,
সে লোহিত আভা বসনে শ্যামল,

* শিশুপাল।

† উদ্ধবের বাক্যে শেষ নিষ্পত্তি হইবে বলিয়াই যেন তাহা এখন চাপা রহিল।

‡ বলরামের শরীর ক্রোধে আরক্ত। তাহাতে অনধিক শ্বেত ঘর্ম্ম-বিন্দু দৃষ্ট হইল।

পড়ি প্রকাশিল ধূমল বরণ,
আম্রের নবীন পল্লব যেমন *। ১৯

রেবতীর মুখ বাসে সুবাসিত
মধুপানে তাঁর বদনে অম্লান
উঠেছে সৌরভ, করি বিনিন্দিত
মুখপদ্ম বাসে মদিরার ঘ্রাণ। ২০

সে মুখ-পদ্মের আঘ্রাণে বিহ্বল
উড়িছে সমীপে নীল অলিগণ
দশন-আভায় তাদের ধবল
করি, বলদেব কহিলা বচন। ২১

মাধব এখন বীর-জনোচিত
যে বাক্য কহিলা দোষ-বিরহিত,
সেই মত কার্য্য করাই সত্বর
সে বাক্যের পক্ষে প্রকৃত উত্তর। ২২

"যদিও সংক্ষিপ্ত কৃষ্ণের বচন
বহু বাক্যে তাহা কে খণ্ডিতে পারে ?
বহু কষ্টে দহি ব্যাপ্ত হুতাশন
পরাজে কি তেজে সুতনু ভাস্করে † ।২৩

"গুরু অর্থযুত যে অল্প বচন
কহিলা কেশব সমক্ষে সবার,
তারি ভাষ্যরূপে করহ শ্রবণ
এবে সবিস্তর বচন আমার। ২৪

"চতুর জনের বাক্যে নিরুত্তর
করে বিপক্ষের সুবক্তা নিকর;
অনুকূল বাদী হ'লেও নিগুণ
হয় তা শ্রবণে বচন-নিপুণ *। ২৫

"স্বল্প-মতি জন গ্রন্থ অধ্যয়নে †
বুঝাইতে পারে কুশল বচনে
ষড়বিধ গুণ, ‖ আর শক্তিত্রয়, ‡
তিন সিদ্ধি ¶ আর তিনটি উদয়। §

"কার্য্য জ্ঞান হীন যদি বাগ্মিবর
বাক্য জালে তাঁর নাহি কোন ফল;
বৃথা সে ধন্বীর বাক্য আড়ম্বর
না বিঁধে যাহার বাণে লক্ষ্যস্থল (১)।২৭

"আছে কি বৌদ্ধের (২) কার্য্যের শরীরে

* আম্র পল্লব কৃষ্ণ লোহিত বর্ণ।

† প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সূর্য্যমণ্ডল ক্ষুদ্র অর্থাৎ অল্পস্থানব্যাপী।

* স্বপক্ষের অজ্ঞান ব্যক্তিরাও সুচতুর বক্তার বক্তৃতা শ্রবণে বাক্-সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং বিপক্ষের সুবক্তারা নির্বাক হয়।

† শুক্রনীতি প্রভৃতি।

‖ সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় এই ষট্ গুণ।

‡ প্রভু, মন্ত্র ও উৎসাহমূলক শক্তি।

¶ উক্ত তিন শক্তি জাতসিদ্ধি।

§ বৃদ্ধি, ক্ষয়, ও অবস্থান (Rise fall and stationary)

(১) লক্ষ্য স্থানে শরনিক্ষেপ করিতে না পারিলে, ধনুর্ধারীর সর্ব্বযত্নই বৃথা।

(২) বৌদ্ধেরা সৌগত বলিয়া পরিচিত। এ স্থলে বৌদ্ধের অবতারণা সময়ানুক্রমিক নাই (anachronism) কবিবর মাঘ বৌদ্ধ সময়ের পরবর্ত্তী হওয়ায় এই ভ্রমে পড়িয়াছেন।

আত্মা কোন আর পঞ্চস্কন্ধ বিনা,
তেমতি রাজার কার্য্য সিদ্ধি তরে
পঞ্চ অঙ্গ বিনা * আছে কি মন্ত্রণা ২৮

বৌদ্ধ মতে সর্ব্ব কার্য্যরূপ শরীরে পঞ্চ স্কন্ধবিশিষ্ট জ্ঞান সন্তানকে আত্মা বলা যায়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন আত্মা নাই। পঞ্চস্কন্ধ যথা—

"রূপং সংজ্ঞা চ সংস্কারো বেদনানুভবস্তথা।
ইতি বৌদ্ধাঃ শরীরেষু মন্যন্তে স্কন্ধ পঞ্চকং।"

১। রূপ—বিষয় প্রপঞ্চ ( Perceptions )
"রূপং রসস্ততো গন্ধঃ স্পর্শঃ শব্দশ্চ পঞ্চমঃ
এতেভ্যো যৎ পরংভাতি ন তৎ সত্যং বিচারতঃ।"

২। সংজ্ঞা—নাম প্রপঞ্চ (Understanding names ) সবিকল্প বিজ্ঞান।

৩। সংস্কার—বাসনা প্রপঞ্চ will and desire ) সমনন্তর প্রতীতি।

৪। বেদনা—বিষয় জ্ঞানপ্রপঞ্চ, সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম ( Sensations )

৫। অনুভব—( Remembrance of past sensations ) আ-লয়-বিজ্ঞান-সন্তান, অর্থাৎ লয় পর্য্যন্ত স্থায়ী অহঙ্করাস্পদ বিজ্ঞান —তৎ-সন্তান অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মৃতির অনুভব।

* পঞ্চ অঙ্গ—"সহায়াঃ সাধনোপায়া
বিভাগো দেশ কালযোঃ
বিপত্তেশ্চ প্রতীকারঃ সিদ্ধিঃ পঞ্চাঙ্গমিষ্যতে
কামন্দক।

কর্ম্মের আরম্ভোপায়, পুরুষ দ্রব্যসম্পৎ দেশ কাল বিভাগ, বিপত্তি-প্রতীকার, কার্য্য-সিদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ।

"অতি সঙ্গোপিত হ'লেও মন্ত্রণা
প্রকাশের ভয়ে বিলম্ব না সয়
ভেদ-ভয়ে ভীরু বর্ম্মাবৃত সেনা
কতক্ষণ রণে স্থিরভাবে রয় *। ২৯

"আপন উন্নতি শত্রুর বিনাশ
এই দুই নীতি শাস্ত্রে পরকাশ
যে নীতি আশ্রয়ে নীতিবিদ্ গণ
প্রকাশেন কত বাগ্মিতা আপন। ৩০

"প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভেতে কখন
মহত জনের তৃপ্তি নাহি হয়—
যদিও জলধি পূর্ণ অণুক্ষণ
বাঞ্ছেন তথাপি চন্দ্রের উদয় §। ৩১

"অল্প সম্পদেই তৃপ্ত যার মন
সে সম্পদ তার বর্দ্ধিত না হয়
অল্পে তার হ'ল কাজের সাধন
ভাবেন বিধাতা, হেন মনে লয় ‡। ৩২

"সমূলে শত্রুরে না করি সংহার
অভ্যুদয় লাভ করে মানিগণ ?
বিনাশিয়া আগে ঘোর অন্ধকার
উদয় শিখরে উঠেন তপন। ৩৩

* ভেদ-ভয়ে—সৈনিকের পক্ষে বিদারণ, গুপ্ত মন্ত্রণার পক্ষে প্রকাশ। অর্থাৎ মন্ত্রণা অধিক কাল গোপনে রাখা সুকঠিন।

§ চন্দ্রের উদয়ে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া বৃদ্ধি লাভ করে।

‡ উন্নতির ইচ্ছার অভাবে।

"না করি বিপক্ষে সদা পদানত
লভে কি প্রতিষ্ঠা বিজয়-প্রয়াসী?
না করি ধূলিরে পঙ্কে পরিণত
রহে কি সুস্থির স্বচ্ছ জল রাশি *? ৩৪

"এক শত্রু যদি থাকে হে প্রবল
কোথা শান্তি তার জগত মাঝারে?
একা রাহু গ্রাসে চন্দ্রের মণ্ডল,
দেবগণ তাহে কি করিতে পারে? ৩৫

# ব্রহ্মদেশের কাহিনী।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

( ২ )

পরিচ্ছদাদি—মানব-শরীরের শোভা-জনক পদার্থের মধ্যে কেশ একটি দর্শনীয় বস্তু। সমস্ত সভ্যজগৎ ইহার যেরূপ আদর করেন, ইতর জাতিরাও সেইরূপ করে। সভ্য অসভ্য সকলেই মস্তকের কেশের উৎকর্ষ সাধনে সমান যত্নবান্। এই দেশে চুলের গৌরব আরও একটু বেসী। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মস্তকে দীর্ঘ কুন্তল। স্ত্রীদিগের অলকদাম যেমন চরণ চুম্বন করিবে, পুরুষদিগের কেশরাশিও জানুদেশ অতিক্রম করিয়া যাইবে; কিন্তু প্রক্ষালন সময় ভিন্ন উভয়েরই মস্তকে চুল সর্ব্বক্ষণ কবরীবদ্ধ থাকে। স্ত্রীগণ মস্তকের পশ্চাৎভাগে চারুদর্শন খোঁপা বান্ধিয়া চুল রাখে, পুরুষেরা রাখে মস্তকের মধ্যদেশে গোলাকৃতি ঝুঁটি বন্ধন করিয়া। কেশের বিরলতা বশতঃ যদি কাহার খোঁপা বা ঝুঁটি ছোট হয়, ইহার কলেবর বৃদ্ধির নিমিত্ত তখন পরচুলা ব্যবহার করা যায়। এই স্থানের সকলেই "সখ" করিয়া মাথায় ফুল-চিরুণী ব্যবহার করে, এবং চুলগুলি একটু এলোমেলো বোধ হইলে, নদী কি তরাগ-সলিলে মুখের প্রতিবিম্ব রাখিয়া অতি সন্তর্পণে চিরুণীর সাহায্যে তাহা যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া লয়, ইহাদের স্নান করিবার রীতিটি বড়ই বিশ্রী। স্ত্রী পুরুষ সকলেই নদী ও বাপীজলে উলঙ্গ হইয়া স্নান করে। সেই সময় বহু লোক উপস্থিত থাকিলেও, তাহারা কোনরূপ সংকোচ বা লজ্জা বোধ করে না।

বসন ভূষণে কাহারও কোনরূপ বৈচিত্র্য নাই। বড় ছোট সকলেরই একরূপ বেশভূষা। ধনীলোকের পরিচয়, ২॥ ইঞ্চি পরিসর রেশমের কাপড় একখানা, উত্তরীয় আকারে, বাম স্কন্ধ হইতে বক্ষদেশে সর্ব্বক্ষণ বান্ধা থাকিবে। স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অঙ্গে "অঙ্গরাখা"। একটি নহে দুইটি। যেইটি দেহ সংলগ্ন, সেইটি শুভ্র কার্পাসবস্ত্র নির্ম্মিত,

* ধূলি পঙ্করূপে নীচে বসিলে জল পরিষ্কাররূপ ধারণ করে।

উপরেরটি কোন রঙ্গিন কি কাল কাপড়ের হইবে, রেশমী রুমাল একখানা সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজন। রমণীরা দ্বি-বসনা অর্থাৎ তাহারা দুইটি বস্ত্র পরিধান করে। দুইটিই দীর্ঘে ৪॥ ফিট ও পরিসরে ৫ ফিট এবং সমচতুষ্কোণবিশিষ্ট। যেইটি বক্ষের নিম্ন হইতে নিম্নভাগের আচ্ছাদন, তাহার নাম "থামি"। আর একটি উন্নত বক্ষস্থলকে ঢাকিয়া রাখে; এই বস্ত্রখণ্ডের দুই অঞ্চলকে একত্র করিয়া এরূপ ভাবে গ্রন্থি দেওয়া হয় যে, তাহা কখন স্খলিত হইয়া লজ্জাশীলতা বিনষ্ট করে না। অঙ্গনাগণ ঢিলে অঙ্গরাখা ও বক্ষস্থলের আবরণ "বনিত্রঞ্জি" ব্যাহার করে; পুরুষেরা যেরূপ মস্তকে উষ্ণীষ বান্ধে, কামিনীকণ্ঠের শোভাবর্দ্ধনের নিমিত্ত উজ্জল পীতবর্ণের রেশমী রুমাল একখানা ব্যবহৃত হয়, কবরী-বেষ্টিত কুসুমকলি ইহাদের অনাবৃত মস্তকের বিমল-শোভা সংবর্দ্ধন করে। ইহাদের পায়ে সবুজ রঙ্গের জুতা; হাতে মুখে পাউডার মাখা, কানে ফুলের দোল, কণ্ঠে ফুলের হার, দেখিবার বস্তু নহে কি?

ভবন—দেবালয় ও বৌদ্ধ-মন্দিরগুলি যেরূপ সুন্দররূপে সজ্জিত, বাস-ভবনগুলি সেইরূপ নহে, তাহা অতি সাধারণ। কিন্তু সাধারণ হইলেও ইহাতে নির্ম্মাণকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে, সমস্ত গৃহে ৬টি মাত্র খুঁটি। এই খুঁটিগুলি এরূপ ভাবে বসান যে, কখন বাতাসে হেলিয়া পড়ে না। এই দেশে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহের বিধান নাই, সুতরাং, ধনী নির্ধন সকলেরই একরূপ বংশ-নির্ম্মিত গৃহ। রাজ-প্রাসাদ ভিন্ন কাহারও দ্বিতল গৃহ নাই। না থাকিবার বিশেষ কারণ, এরূপ গৃহে বাস করিতে হইলে নিম্নতলবাসীর মস্তকোপরি এই দ্বিতলবাসীর পদদ্বয় রাখিতে হয়; এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া কোন অধিবাসী দ্বিতল গৃহ প্রস্তুত করে না, কিন্তু গৃহগুলি সাধারণতঃ একতল হইলেও সমভূমি হইতে ৭। ৮ ফিট উচ্চ। এইহেতু বর্ষার প্লাবনে ভিত্তিমূল শিক্ত হইলেও গৃহগুলি অস্বাস্থ্যকর হয় না। গৃহের খুঁটিগুলিতে রঙ দেওয়া, কিন্তু ইহা বিলাসিতার চিহ্ন বলিয়া রাজাদেশ ভিন্ন হইতে পারে না। গৃহগুলি সাধারণতঃ এক প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট; প্রয়োজনানুসারে কখন কখন দুই তিন প্রকোষ্ঠও করা হয়; কিন্তু এইরূপ বহুপ্রকোষ্ঠ করা নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্য। সকল বাস-ভবনের সম্মুখে এক একটি অনতিবৃহৎ বারাণ্ডা। কার্য্যের সুবিধা ও গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত মূল গৃহ হইতে তাহা ২। ৩ ফিট নীচু করিয়া প্রস্তুত করা হয়। গৃহের খুঁটিগুলিরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ও জাতিভাগ আছে। যেগুলি পুরুষজাতীয় সেইগুলির সর্ব্বাঙ্গ সমান। স্ত্রীজাতীয় খুঁটিগুলির অধোভাগ স্থূল, মধ্যভাগ সরু; আর যেগুলি নপুংসক জাতীয়, তাহার দুইদিক সরু এবং মধ্যদেশ মোটা। গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ দেখিয়া জ্যোতির্ব্বেত্তা, গৃহস্থের ভাবীজীবনের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। গৃহারম্ভের সময়ও স্থান নির্ব্বাচন করিতে বসিয়া, কখন কখন তিনি গৃহস্বামীর ভাগ্যফল বলিয়া-

দেন, তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া অদৃষ্টবাদী ব্রহ্মারা নূতন স্থান ও নূতন গৃহও অকুণ্ঠিতভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। দরিদ্রদিগের পর্ণকুটীরে বাঁশের বেড়া, বাঁশের খুঁটি; চালাতে "উমপত্রের" * ছানি। এই দহ্যমান-পদার্থকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক গৃহদ্বারের সম্মুখে জলপূর্ণ কুম্ভ থাকে। এরূপ অধিবাসীদিগের মেজেতেও বাঁশের চাটাই। কিন্তু ধনী দিগের ব্যবস্থা অন্যরূপ। তাঁহাদের ঘরের খুঁটিগুলি সেগুণ কাঠের; উপরে কাঠের ছাদ, মেজেতেও কাষ্ঠফলক। আজ কাল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া অনেক ধনীগৃহে বিলাতি আস্‌বাব্‌ দেখা দিয়াছে; কিন্তু এই দেশের জনসাধারণের গৃহে, সেই সমস্ত বৈদেশিক দ্রব্যের নিতান্ত অভাব। তাহাদের গৃহের সম্বল একটি মাত্র পেটক; তাহাতে বস্ত্রাদি রাখা হয়। শয্যা উপকরণের মধ্যে মাতুর কএকটি, আর কএকটি বংশখণ্ড, তাহা বালিশরূপে ব্যবহৃত এবং ইহাই তাহাদের গৃহের সাজ সজ্জা। উচ্চাসনে বসিতে জানে না বলিয়া টুল চেয়ারের ব্যবহার নাই। ফরসা দিনে রন্ধন-কার্য্য হয় গৃহের বাহিরে, প্রাঙ্গণে। চুল্লীটি দুই তিন ফিটের বেড়, একটি বৃহৎ বাক্স। তাহার তলাতে মাটীদেওয়া, জ্বালানি কাষ্ঠগুলি ইহার উপর সজ্জিত থাকে, বাসনগুলি সমস্ত মৃণ্ময়। জলের কলশী হাতের কাছে। নারিকেলের খুলির দ্বারা ঘটীর কাজ সারা হয়, ঢেঁকির পরিবর্ত্তে "ডলনী" ব্যবহার হয়।

প্রসূতি ও শিশু—সকল দেশেই এক একটি কুপ্রথা আছে। ইহার দোষে অনেক সময় অনেকপ্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে। এই দেশে প্রসূতি পরিচর্য্যার কোন সুবন্দোবস্ত নাই। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রসূতির সর্ব্বাঙ্গে হরিদ্রা লেপন করা হয়। পরে সর্ব্বশরীরে রাশীকৃত বস্ত্র জড়াইয়া তাঁহাকে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসাইয়া রাখে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে জলন্ত ইষ্টকের স্তূপ করিয়া তাঁহাকে আধপোড়া করা হয়, ধাত্রী সবুজ ঔষধ ( Green medicine ) প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন প্রত্যূষে প্রসূতিকে খাইতে দেয়, এই অবস্থায় তাহাকে অহোরাত্র ৬ দিন কাটাইতে হয়, সপ্তম দিবসে প্রথমতঃ উষ্ণজলে স্নান করিয়া পরে তাঁহাকে শীতল জলে স্নান করিতে হয়। ইহার

* উম পত্র—উম গাছের অপর নাম তাড়িগাছ। এই গাছগুলি আব্‌কারি মহালের সম্পত্তি। ইহার মস্তকের "ডগা" কাটিলে খেজুরের রসের ন্যায় একপ্রকার রস নিসৃত হয়, তাহা অতি সুপেয়। কিন্তু বাসী হইলে তাহাতে মাদকতা গুণ জন্মে, মল্যরা ও ব্রহ্মবাসীরা অতি আগ্রহের সহিত তাহা পান করে। গাছগুলি নারিকেল জাতীয়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট, এক এক স্থানে বাঁশের ঝোপের ন্যায় অনেকগুলি গাছ হয়, গাছগুলি সাধারণতঃ সমুদ্রের লবণ-জল-শিক্ত চড়া ভূমিতেই অধিক জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বে তিনি অপবিত্রা থাকেন বলিয়া, স্বামী সহবাসে যাইবার অধিকার থাকে না। অষ্টম দিবস হইতে যদৃচ্ছাক্রমে চলা ফেরা করিতে পারেন। শরীরে অতিরিক্ত উত্তাপ প্রবেশ করিয়া সূতিকাগারে অনেক প্রসূতির জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ব্রহ্ম যুবতীরা ফুটনোন্মুখ মুকুল অবস্থায় যেরূপ সুন্দর থাকিলেও যৌবনফুল ফুটিবামাত্রই হেলিয়া পড়ে, এই নিমিত্ত কথায় বলে "বিশ বছরে ছুঁরী, এক বিয়ানে বুড়ী"।

শিশুশয্যা দোলায়—দোলার সাজসজ্জা একটি বিশ্রী বাঁশের ঝুড়িতে কতকগুলি ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, জননী দোলার পাছে বসিয়া দোলাইতে দোলাইতে নানাছন্দে গান ধরেন। পাঠক! গানের নমুনা একটুকু দেখিবেন কি?

শান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার গান;—

জনকের প্রতিকৃতি, মোর যাদুমণি,
আসিবেন পিতা তব, দোলাইতে দোলা,
ছুলিবে আপনি দোলা তাঁহার দয়াতে,
ঘুমাও অবোধ শিশু, ঘুমাও সুখেতে।

অশান্ত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার কর্কশ মাতার কর্কশ গান;—

( ১ )

লজ্জায় মরিয়া যাই, চিন না জনক,
আসিলে হইতে শান্ত ভয়েতে তাঁহার;
ধূমপানে পল্লীমধ্যে আমোদে রয়েছে,
আসিবে কি ফিরে গৃহে, সব ভুলে গেছে?

( ২ )

আর একটির নমুনা দেখুন,—

দুরন্ত বালক তুমি, না হইলে শান্ত
এখনি ডাকিব এক বৃহৎ মার্জ্জার,
ভীষণ দশন তার আকৃতি ভীষণ,
নখাঘাতে বিদারিয়ে করিবে ভক্ষণ।

নামকরণ—সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দিনপ্রাহ পরে নামকরণ হয়। জ্যোতির্ব্বিদ শুভদিন স্থির করিয়া দিলে পিতা, অভাবে মাতা, সাধ্যমত এক মহাভোজের আয়োজন করেন, এই ভোজে আত্মীয় স্বজন সকলেই যোগ দিয়া থাকেন। এই দিন শিশুর প্রথম মস্তক প্রক্ষালিত হয়। এই দেশে বর্ণমালার আদি অক্ষর লইয়া দিবসের নামকরণ হইয়াছে, এবং শিশুদিগেরও নামকরণ হয় জন্মবাসরের আদ্যক্ষর লইয়া। বর্ণগুলি এরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে; ক, খ, গ, ঘ ও ঙ এই পঞ্চ বর্ণের যে কোন একটি বর্ণ যদি বারের পূর্ব্বে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে সোমবার। সেইরূপ চ, ছ, জ, ঝ ও ঞ এই বর্ণসংযুক্ত বারের নাম মঙ্গলবার। ইত্যাদি যে বালক সোমবারে ভূমিষ্ঠ হয় তাহার নামের আদিবর্ণ হইবে প্রথম চরণের কোন একটি অক্ষর। মঙ্গলবার জন্ম হইলে ঐরূপ দ্বিতীয় চরণের একটি বর্ণ শিশুর নামের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবে।

লোক বিশ্বাস—জন্মবাসরের ফলানুসারে শিশুর চরিত্র সংঘটিত হয়। যে বালকের সোমবার জন্ম, সে কার্য্যক্ষম ও উৎসাহশীল হয়। মঙ্গলবার ভূমিষ্ঠ হইলে সৎস্বভাবাপন্ন হয়। বুধে চপলমতি, গুরুবারে বিনয়ী, শুক্রবারে বাচাল, শনিবারে কলহপ্রিয় এবং রবিবারে অতি লোভী হয়। দিবসগুলিও

পশুর আকারে আকারিত। সোম ব্যাঘ্ররূপী, মঙ্গলের সিংহরূপ, বুধ সদন্ত গজাকৃতি, গুরু মুষিকরূপী, শুক্রের বরাহরূপ, শনি পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপ জাতীয় এবং রবির কল্পিতরূপ অর্দ্ধ পশু ও অর্দ্ধ পক্ষী। যে শিশুর যে দিবস জন্ম হয়, পূজক রক্ত কি পীত বর্ণের মোম বা গালা দ্বারা বারের পরিচায়ক জীব জন্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করিয়া ধর্ম্ম মন্দিরে উৎসর্গ করিয়া দেন। ছেলেদের জন্ম পত্রিকাও এ স্থানে রক্ষিত হয়। ইউরোপবাসী কি অন্য কোন পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় তাহাদিগের ডাক নাম নাই। তাহারা বংশ নামের অনুকরণ করে না। সকলে স্ব স্ব নামে পরিচিত। সুতরাং পিতা পুত্রের কখন একরূপ নাম হয় না, সকল সভ্যজাতির যেরূপ লালা, বাবু, মিষ্টার প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধি আছে, তাহাদেরও আছে। তাহারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে "মৌদ্দ" বলে। পিতা মাতা ছেলেদিগকে আদর করিয়া ডাকিয়া থাকেন, ছোট মানুষ, কএক বৎসর অতীত হইলে তাহাদের পূর্ব্ব নাম ঘুচিয়া যায়, তখন তাহাদের নাম হয় বড় ছোট লোক ( Big littleman ) তাহার পর তাহারা বালক "মৌদ্দ" অর্থাৎ বালক বাবু বলিয়াই অভিহিত হয়। ব্রহ্মদেশে সকৃ করিয়া অনেকে নাম পরিবর্ত্তন করে। পিতা মাতার রক্ষিত নাম যদি বয়ঃপ্রাপ্ত যুবাদিগের রুচিকর বোধ না হয়, তাহারা পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন ইচ্ছা মতে এক একটি নূতন নাম গ্রহণ করে। এই নাম প্রচার করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে অনেকগুলি চাগর্ড কাগজের মোড়ক প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার মধ্যে নূতন নামটি ও আরও লিখা থাকে—আমি আর পূর্ব্বনামে পরিচিত নহি। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রদত্ত চা পান করুন। মোড়কগুলি এক জন বন্ধুর দ্বারা সকল আত্মীয় স্বজনের কাছে প্রেরিত হয়। তাহারাও বন্ধুর নূতন নামটি সকলের কাছে প্রচার করে। ক্রমশঃ

শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

# অভিশাপ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### বিবাহের কথা।

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে, যুবকদিগের সাধারণতঃ একটু অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। বিশেষতঃ সত্যেনের ন্যায় বয়সে, তাহার ন্যায় ধনীর সন্তান প্রায়শঃ অবিবাহিত থাকে না। সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ না হইবার কারণ, তাঁহার নিজের অনিচ্ছা। তিনি, একদিবস

পিতার সমক্ষেই বলিয়াছিলেন যে, একটু অধিক বয়স না হইলে বিবাহ করিবেন না। সেই পর্য্যন্ত রমাকান্ত বাবুও আর তাড়াতাড়ি বিবাহের কোন চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার ঈশ্বর প্রাপ্তির অল্প কাল পূর্ব্বে সত্যেনের সহিত যে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, রায় মহাশয়ের মৃত্যু হওয়াতে,—তৎপুত্রের এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া, পাত্রীর অভিভাবক অন্যত্র একটি সৎ পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। মাণিক-নগর ও তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামসমূহের অর্থবান্ ও মধ্যবিত অবস্থার কন্যা-ভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণ-গণের অনেকেই এ সংবাদ রাখিতেন। সত্যে-নকে জামাতা করিবার ইচ্ছা কাহার না হয়? কালাশৌচ থাকিতে পুত্রের বিবাহ হইতে পারে না, এই কারণেই এ কয়েক মাস ছোট বাবুর নিকট কেহ বিবাহের কথা উত্থাপন করেন নাই।

শচীকান্ত বাবু চিরদিনই একটু সৌখিন প্রকৃতির লোক। দাদা বিষয়কার্য্য দেখি-তেন, আর তিনি, যৌবন সময়ে, আমোদ প্রমোদেই সময় অতিবাহিত করিতেন। রমা-কান্ত বাবু তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসি-তেন। শচীকান্ত বয়স্থ হইয়াও বিষয়কার্য্য দেখেন না, সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে রত থাকেন, ইহা দেখিয়াও জ্যেষ্ঠ রমাকান্ত অনুজের প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট হন নাই; বরং শচীকান্তের জন্য একটি সুগঠিত মনোরম বৈঠকখানা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এখনও কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর নিজ বয়স্যগণ লইয়া সেখানে একটু গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি মাণিক নগরের মধ্যে একজন নামজাদা গায়ক। বেহালায় তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা। আজি স্থানান্তর হইতে এক জন ওস্তাদ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছেন। বৈকালে তাঁহার সহিত বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপ-কথন করিতেছেন, এমন সময়, খানসামা নোবে আসিয়া বলিল,—"একটি ব্রাহ্মণ আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চান।"

শচীকান্ত বলিলেন—"তাহার কি দর-কার জিজ্ঞাসা করে আয়।" নোবে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিল,—"কি দরকার বল্-লেন না, বল্লেন বাবুর সঙ্গে একবার দেখা না কর্‌লে হবে না।"

"যা দীনকে বল, তাঁর কোন বিশেষ আব-শ্যকীয় কথা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করে আসুক।"

দীননাথ মাধব ঘোষের পুত্র, সেও আজ কয়েক বৎসর হইতে, রায়দের সংসারে চাকুরী করিতেছে। বাবুর আজ্ঞায় দীননাথ ব্রাহ্ম-ণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া ছোট বাবুর নিকট নিবেদন করিল যে, ব্রাহ্মণ সত্যেন, বাবুর বিবাহের একটি সম্বন্ধ আনিয়াছেন। তখন শচীকান্ত বাবু তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ সম্মুখে আসিলে রায় মহাশয় বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"মহা-শয় নমস্কার।"

শচীকান্ত বাবু প্রতি নমস্কার করিয়া

বলিলেন ;—"মহাশয়ের নাম ?"

"শ্রীকেশবচন্দ্র বটব্যাল।"

"নিবাস কোথা ?"

"নিবাস ন-পাড়ায়, বড় বাবু আমায় জান্‌তেন। আমি মহাশয়ের কাছে একটু বিশেষ প্রয়োজনেই এসেছি।"

"কি প্রয়োজন বলুন ?"

"আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের যে মেয়েটির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল, সেটির ত বিয়ে হ'য়ে গেছে। শুনেছি আর কোথাও এখনও কোন কথা হয় নাই। কুসুমহাটিতে একটি পরমা সুন্দরী, মেয়ে আছে রূপে যেন সাক্ষাৎ ভগবতী। তবে মেয়ের বাপের অবস্থা আপনাদের উপযুক্ত নয়, কিন্তু বংশ অতি ভাল।"

"আমার ভাই পোর এখন বিবাহ হবে না।"

"আজ্ঞা হাঁ অগ্রহায়ণ মাস না হলে আর বিয়ে হচ্চে না,—তা একবার মেয়েটিকে দেখলে ভাল হয় না ? অমন মেয়ে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না।"

"কন্যাটির বয়স কত ?"

"দেখ্‌তে একটু হেয়াল গোছের, বয়স এখন দশ কি এগার পড়েছে।"

"মেয়েটির বাপের নাম কি ?"

"শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।"

"৺ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কি কেহ হন ?"

"রামহরি চাটুর্য্যের জেঠতুত ভাইয়ের মেয়ে। তা হলে ত আপনার সব জানা শোনার মধ্যে, ঘরের পরিচয় আর নূতন ক'রে কি দেবো ?"

অমন পণ্ডিত কি আর জন্মায়, আমাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। না, তাঁদের আর আমার কাছে পরিচয় দিতে হবে না। আচ্ছা চাটুর্য্যে মহাশয়ের ছেলে গোবিন্দ এখন কি কর্‌চে ?"

"সে তেমন ত শিখ্‌লে না বাপের শিষ্য যজমানদের নিয়েই একরকম চালাচ্চে।"

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, একটু শিখ্‌লেই ভাল হ'ত, তা শিষ্য যজমান অনেকগুলি আছে একরকমে চলে যাবে।"

এইরূপ অনেকক্ষণ উভয়ের কথা বার্ত্তার পর রায় মহাশয় বলিলেন,—"তা, বটব্যাল মহাশয় আজ যে বিবাহের বিষয় কোন কথা হ'তে পারে না। আজ দিনটা ভাল নয়, একে ত্র্যহস্পর্শ তাতে আবার অশ্লেষা।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তা বেস আজ দিনটা ভাল নয়, শুভ বিষয়ের কোন কথার প্রয়োজন নাই। তা আমি আবার কবে আস্‌ব একটা অনুমতি করুন। মেয়েটিকে কিন্তু একবার অনুগ্রহ করে দেখ্‌তে হবে।"

"হাঁ আমি স্বয়ংই কন্যাটিকে একবার দেখ্‌ব আপনার নিবাস বল্লেন ত নপাড়া। আমি একটি ভালদিন দেখিয়ে আপনাকে সংবাদ দিলে আপনি স্বয়ং আসবেন; তার পর আপনার সঙ্গে গিয়ে মেয়েটিকে একবার দেখে আস্‌ব।

"যে আজ্ঞা, আমার একটু সংবাদ পাঠালেই আমি আস্‌ব। তবে এখন আমি আসি"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন।

অন্য কোন বৈষয়িক ব্যাপার হইলে, শচীকান্ত বাবু আজি তাঁহার গৃহে আগত ভদ্র লোকের সহিত কথা বন্ধ রাখিয়া, তাঁহার সহিত দেখা করিতেন না, অন্য সময় আসিতে বলিতেন। একে তিনি, বৈকালে বিশ্রামের সময়, কোন বৈষয়িক কার্য্যের আলোচনা করেন না, তাহাতে আবার একটি অপরিচিত গুণী লোক আলাপ করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু, সত্যেনের বিবাহের সম্বন্ধ বলিয়াই, তিনি এতক্ষণ আগন্তুকের সহিত অতিবাহিত করিলেন।

অগ্রজের পরলোক গমনের পর শচীকান্ত যখন সত্যেন্দ্রনাথের মানসিক অসুস্থতা প্রথম লক্ষ্য করেন, তখন হইতেই তিনি মনে ভাবিলেন যে, সত্যেনের এইবার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, সম্ভবতঃ তাহা হইলে, তাহার মনের অসুখ সারিয়া যাইতে পারে। তিনি ভিতরে ভিতরে একটি সুশ্রী ও সুলক্ষণা কন্যার জন্যও চেষ্টা করিতেছিলেন। আজি ঘটকের নিকট এই কন্যাটির বিষয় শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন এবং শীঘ্র দেখিয়া আসিবেন মনস্থ করিলেন।

আমরা যে কেশব বটব্যালের কথা বলিলাম, উনি ঠিক ঘটক নন। পল্লিগ্রামে সহরের ন্যায় ঘটকের তত প্রাদুর্ভাব নাই। তবে কখনও কোন উৎকৃষ্ট পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান পাইলে, কেহ কেহ পুরস্কারের আশায় কোন বিবাহোপযুক্ত পুত্র বা কন্যাবান্ ধনী ব্যক্তির গোচরে উহার সংবাদ আনিয়া দেয়। বটব্যালও এই শ্রেণীর লোক।

ব্রাহ্মণ বিদায় হইতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শচীকান্ত বাবু ওস্তাদটির সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া, কোন ভৃত্যকে তাঁহার শয়নোপযোগি শয্যাদি রচনা করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন; এবং তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, আহার ও শয়নের জন্য, অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। ছোট বাবু আহার অন্তে বিছানায় শয়ন করিয়া, ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহে কি কি করিতে হইবে, মনে মনে তাহারই জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তিনি নিজেই চোখে চশমাদিয়া পাঁজি দেখিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের ১৭ই তারিখে পাত্রীটিকে দেখিতে যাইবার জন্য একটি ভাল দিন স্থির করিয়া রাখিলেন। আজ জ্যৈষ্ঠের আট তারিখ।

চারি পাঁচ দিন গত হইলে, শচীকান্ত বাবু কেশব বট ব্যালকে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ আসিতে সংবাদ দিলেন।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### পাত্রী দর্শন।

কুসুমহাটী বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে আজি মহাধুম। ঘর দ্বার পরিষ্কার করা হইয়াছে। পিত্তলের একটি করিয়া ডাল বিশিষ্ট দেওয়ালগিরী ও লণ্ঠন তিনটির গেলাসগুলি মুক্ত করা হইয়াছে। পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরাণ হইয়াছে। বর্দ্ধমান হইতে খাজা, সিতাভোগ, মিহিদানা ইত্যাদি মিষ্টান্ন আনিতে

লোক পাঠান হইয়াছে, দত্তদের বাটী হইতে আগমনী, রামরাজা, সাবিত্রী সত্যবান্ ইত্যাদি কলিকাতা আর্টষ্টুডিওর যে ছয়খানি চিত্র ছিল,—তাহা আনিয়া বাহিরের ঘরের দেওয়ালে লাগান হইয়াছে ও মেজেতে ফরাস তাকিয়া দেওয়া হইয়াছে।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহে এ সকল আয়োজন হইতে পারে; কারণ পুত্র বা কন্যাকে দেখিতে আসিলেই ত লোকে সাধ্যমত গৃহাদি পরিচ্ছন্ন করে এবং নানাবিধ খাদ্যাদির আয়োজন করে; আর আজ মানিক নগরের জমিদার শ্রীযুক্ত শচীকান্ত রায় স্বয়ং চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিবেন। রায় মহাশয়কে আহ্বানাদি করিবার জন্য দুই এক জন প্রতিবেশী ভদ্রলোকও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন।

যথাসময়ে রায় মহাশয় ঘটকের সহিত খানসামাকে লইয়া শিবিকা আরোহণ পূর্ব্বক বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও সমাগত ব্যক্তিবৃন্দ "আসুন আসুতে আজ্ঞা হয়" ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া তিনি উপবেশন করিলে, তাম্রকুট্ চলিতে লাগিল; এবং তৎসঙ্গে তাঁহার জমিদারীর কথা ৺রমাকান্ত রায়ের কথা, ধান চাউলের কথা, অজন্মার কথা, ইত্যাদি নানাপ্রকারের কথোপকথন চলিতে লাগিল। এ স্থলে আমরা সে সকল সবিস্তৃত রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণের বিরক্তি উৎপাদন করিতে ইচ্ছা করি না।

এইরূপে যখন কুসুমহাটী গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক, রায় মহাশয়ের সহিত কথোপকথনে আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছেন, তখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া যোড় করে বিনীতভাবে বলিলেন,—

"মহাশয়! অনুগ্রহ ক'রে একবার পায়ে হাতে একটু জল দিতে হবে।"

রায় মহাশয় মুহূর্ত্তের জন্য হস্ত যোড় করিয়া বলিলেন,—"বিলক্ষণ মহাশয়, সে কি কথা! আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন? অগ্রে আপনার কন্যাটিকে দেখি, তার পর হবে এখন।"

ঘটক ও উপস্থিত সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"বেস্ত, আগে মেয়েটিকে দেখাই হউক। তবে আপনি কন্যাটিকে একবার নিয়ে আসুন না?"

কুসুমহাটী গ্রামে এখনও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর আলোক পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয় নাই। এখনও যুবতীদের বড় বড় ফুলদার ঢাকাই, শান্তিপুর, না হয় গরদ বা চেলি আর সিঁতি, চিক, বাউটি এবং যুবকদের বেল দেওয়া কামিজ শান্তিপুরের ধুতি, উড়ানি আর চীনা বাড়ির বার্নিস জুতায়ই উহা সীমাবদ্ধ আছে। পার্শি শাটী, 'রেণ বো' রংয়ের জ্যাকেট, নেকলেস, ইয়ারিং "দেলখোস্" বা কলগেট্ কোম্পানীর ভিক্টোরিয়া বোকের নাম এখনও এখানে অজ্ঞাত আছে। বিবাহের সম্বন্ধার্থ কন্যা দেখাইতে হইলে, এখানে

কলিকাতার ন্যায় পাউডার বা পেণ্ট করার প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা, ভগিনীকে একখানি গরদের কাপড় পরাইয়া এবং তাঁহার নিজের ও পরের নিকট চাহিয়া, কয়েকখানি অলঙ্কার আনিয়া সাজাইয়া দিলেন। তৎপরে মাতা, কন্যাকে কিরূপে প্রণাম করিতে হইবে, কিরূপে বসিতে হইবে, নাম জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপে উত্তর দিতে হইবে, ইত্যাদি সমস্ত কথা শিখাইয়া দিলেন। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে, বীরেশ্বরের এক খুড়া নাতিনীর হস্ত ধারণ করিয়া, গৃহ দেবতাকে প্রণাম করাইয়া, বহির্ব্বাটীতে রায় মহাশয়ের কাছে লইয়া গেলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাকে শচীকান্ত বাবু ও অপর সকলকে প্রণাম করিতে আজ্ঞা করিলেন। বালিকা প্রণাম করিলে পর, কেহ কেহ বলিলেন, "আর থাক্ মা তুমি বসো।"

একজন বালিকাকে রায় মহাশয়ের দিকে সম্মুখ করিয়া বসাইয়া দিয়া, তাহার অবনত ক্ষুদ্র মস্তকটি ঈষদ্ উত্তোলিত করিয়া দিল। শচীকান্ত বাবু ভাল করিয়া বালিকাটির নাসিকা, মুখ, চোখ ইত্যাদি নিরীক্ষণ করিলেন; তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তোমার নাম কি?"

বালিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া দুই তিন জন বলিয়া উঠিলেন,—"বল মা তোমার কি নাম বল!"

বালিকা ধীরে ধীরে বলিল,—

"শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী।"

পল্লিগ্রামে পাত্র পাত্রী দেখাতে জিজ্ঞাসা করার বড় অধিক প্রয়োজন হয় না। পাত্র হইলে বড় জোর 'বাবাজি বা বাবু কি করা হয়' এই পর্য্যন্ত; পাত্রীকে 'তোমার নাম কি মা, ভিন্ন আর দ্বিতীয় কথা জিজ্ঞাসা করিবার নাই।

শচীকান্ত বাবু যখন অনিমেষলোচনে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, তখন কেশব বটব্যাল বলিলেন,—

"কেমন মহাশয়, যা বলেছিলুম ঠিক নয়, কোন খুঁত পেলেন কি?"

শচীকান্ত বাবু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিজের ট্যাঁক হইতে একটি গিনী বাহির করিয়া "নাও ত মা," বলিয়া বালিকার হস্তে প্রদান করিলেন। বালিকা আপনা হইতেই মস্তক অবনত করিয়া প্রণত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে, রায় মহাশয়ের অনুমতিতে বালিকারে এক ব্যক্তি হস্তধারণ পূর্ব্বক লইয়া গেলেন।

মানব-মনের দৃঢ়তা কত অল্প! কত সামান্য কারণেই বাসনা-পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অথবা সৌন্দর্য্যের কি মোহকরী ক্ষমতা! শচীকান্ত যখনই সত্যেনের বিবাহের কথা মনে করিয়াছেন, তখনই কল্পনা করিয়াছেন যে, কোন ধনশালী ব্যক্তির কন্যার সহিত সত্যেনের বিবাহ দিয়া, আমোদের পূর্ণতা সাধন করিবেন। ঘটক মহাশয়ের নিকট কন্যাটির অত্যধিক প্রশংসা শ্রবণ করিয়াও মনে করিয়াছিলেন, নিজে দেখিয়া কোন খুঁৎ

বা কোন লক্ষণাদি মন্দ দেখিলে, বিবাহের সম্বন্ধ করিবেন না। আজি তাঁহার বাসনা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। বালিকা হিরণ্ময়ীর সরলতাপূর্ণ স্নেহাকর্ষি মুখ দর্শনে আর তাঁহার ধনশালীর কন্যাকে বধূ করিবার সাধ রহিল না। এরূপ সুন্দরী বালিকা তিনি কখনও দেখেন নাই।

কন্যা দেখার পর, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে শচীকান্ত বাবু আহার করিলেন। বীরেশ্বর তাঁহার যথাযোগ্য আহারাদির আয়োজনে ত্রুটি করেন নাই। রায় মহাশয়ও তাঁহার যত্নে ও অপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইলেন। ভোজন সমাপ্তির পর, বহির্ব্বাটীতে বসিয়া রায় মহাশয় যখন তামাকু সেবন করিতেছেন, তখন বীরেশ্বরের কোন প্রবীণ আত্মীয় শচীকান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়ের কন্যাটি বেস পছন্দ হইয়াছে কি?"

শচীকান্ত উত্তরে বলিলেন,—"মেয়েটি পরিষ্কার বটে, আমার অন্য মত কিছু নাই তবে কোষ্ঠীখানি একবার দেখাতে ইচ্ছা করি।"

বীরেশ্বর বলিলেন,—"যে আজ্ঞা, সেটা প্রধান কর্ত্তব্য।"

শচীকান্ত বলিলেন,—"ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি কোষ্ঠীতে মিল হয়, তা হ'লে বিয়ে সেই অগ্রহায়ণ মাস না হ'লে আর হবে না।

চট্টোপাধ্যায়ের খুড়ামহাশয় বলিলেন,—শ্রাবণের শেষেও ত দিন আছে।"

শচীকান্ত বাবু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গৃহের মধ্য হইতে দুই তিন ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন,—না না, এই বর্ষা বাদলের সময় দরকার নাই, অগ্রহায়ণ মাসেই ভাল।"

এইরূপে ভাবী বিবাহের সম্বন্ধে কিয়ৎকাল কথাবার্ত্তার পর, শচীকান্ত রায় সকলের সহিত বিদায়সূচক সাদর সম্ভাষণ শেষ করিয়া, পুনরায় শিবিকারোহণ পূর্ব্বক কুসুমহাটী হইতে মাণিকনগরে আসিয়া পহুঁছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহর শেঠ।

# কবিসূক্ত

"প্রিয়ং ব্রূয়াদকৃপণঃ শূরঃ স্যাদবিকত্থনঃ।
দাতা সৎপাত্রবর্ষী স্যাৎ প্রগল্‌ভঃ স্যাদনিষ্ঠুর।"

প্রিয় কথা কবে সদা অকৃপণ-প্রাণে।
শূর হবে—মূক রবে—নিজ-গুণ-গানে।
সুপাত্রে করিবে দান,
হবে বীর বলীয়ান্,
কিন্তু ভীত রবে তবু পর-পীড়া দানে।

"জলান্তশ্চন্দ্রচপলং জীবিতং খলু দেহিনাং
তথাবিধমিতি জ্ঞাত্বা শশ্বৎ কল্যাণমাচরেৎ।"

তরল তরঙ্গ জলে চন্দ্রমা যেমন,
তেমনি চঞ্চল হায়! মানব-জীবন;
একথা নিশ্চয় জানি,
যে যে থানে আছ জ্ঞানী
জগৎ-কল্যাণ-ব্রত কর আচরণ।

# সাহিত্যপ্রসঙ্গ

১

## বঙ্গানুদিত সংস্কৃত-নাটকাবলী। *

বাঙ্গালায় উৎকৃষ্ট নাটক আছে কি না, সে এক "ঘটত্ব-পটত্ব-ঘাত-প্রতিঘাত ঘটকীভূত" ঘোরতর নৈয়ায়িক তর্কের কথা। দীনবন্ধু, উপেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল অনেক নাটক লিখিয়াছেন,—নাটক লিখিয়া দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; এবং বঙ্গের বিবিধ রঙ্গভূমিতে সেই সকল নাটকের প্রদর্শন-দ্বারা শতসহস্র লোককে হাসাইয়াছেন,—শতসহস্র লোককে নয়নজলে ভাসাইয়াছেন, অথবা কিছুকালের জন্য স্বপ্নসুলভ স্বর্গসুখের আভা দেখাইয়া, আনন্দে অধীর করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ঐ প্রশ্ন রহিয়া যাইতেছে, তাঁহারা যে সকল গ্রন্থকে গুণ-দোষ-বিচার-নিপুণ জন-সমাজের নিকট নাটক নামে উপস্থাপন করিয়াছেন, সে গুলি প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক,—না কথোপকথনচ্ছলে রচিত অভিনয়যোগ্য উপন্যাস মাত্র।

যাহা রঙ্গমঞ্চে নাটিত অর্থাৎ অভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহাই যদি নাটক নামের যোগ্য হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের উয়িচার্লি ও আয়র্লণ্ডের ফার্কার প্রভৃতি বিট-বিকট নট-কবিরা যে সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এবং যে সকল বস্তুর প্রদর্শন সম্পর্কে কিছুকাল প্রশংসা ও বাহবার পরাকাষ্ঠা পাইয়াছেন, সে গুলিও নাটক শ্রেণীতে নিবেশিত হইতে পারে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা সে গুলিকে কোন অংশেও নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। পক্ষান্তরে, জগতের অদ্বিতীয় নট-কবি নিত্যস্মরণীয় শেক্ষপীয়ের যে সকল নাটক অভিনয়ের অযোগ্য, অথবা অভিনয়-সম্পর্কে কৃচ্ছ্রসাধ্য, সেগুলিকেও তাঁহারা সাহিত্যজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া পূজা করেন। এই সকল কারণে, নাটকের নাটকত্ব-নিরূপণ অথবা সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ বিষয়ে আধুনিক সুপণ্ডিতদিগের মধ্যেও ঘোরতর মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কিন্তু যিনিই নাটকের যেরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করুন, মানবজাতির মহোজ্জ্বল-কীর্ত্তিরূপিণী সংস্কৃতভাষা যে কতএকখানি সরস-মধুর ও সর্ব্বজন-পূজ্য উপাদেয় নাটকের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছেন, সে বিষয়ে অণুমাত্রও সংশয়ের বিষয় নাই। কালিদাসের অভিজ্ঞান-

---

* ১ অভিজ্ঞান-শকুন্তল। ২ বিক্রমোর্ব্বশী। ৩ মালবিকাগ্নিমিত্র। ৪ মুদ্রা-রাক্ষস। ৫ মৃচ্ছকটিক। ৬ মালতী-মাধব। ৭ মহাবীর-চরিত। ৮ উত্তর-চরিত। ৯ বেণী-সংহার। ১০ প্রবোধ-চন্দ্রোদয়। ১১ চণ্ডকৌশিক। ১২ নাগানন্দ। ১৩ রত্নাবলী।

শকুন্তল যখন, উইলিয়াম যোন্‌সের যত্নে, ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া, ইউরোপীয় সাহিত্যসমাজে প্রথম আলোচিত হয়, তখন গ্যেটে প্রভৃতি সাহিত্য-স্রষ্টা ও সাহিত্য-গুরু মহাপুরুষেরাও, সে অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া, বলিয়াছিলেন যে, ইহা একখানি অলোক-সাধারণ নাটক বটে।

আজি সাত আট বৎসর হইল লণ্ডনের একটি প্রসিদ্ধ থিয়েটারে অভিজ্ঞানশকুন্তলের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনেত্রিদিগের মধ্যে যাঁহারা একটুকু বেশী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা, তাঁহারাই শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রভৃতি পাত্রী সাজিয়া, ইংলণ্ডের শিক্ষিত সাম্প্রদায়িকদিগকে পুরাতন ভারতের প্রেমের চিত্র দেখাইয়াছিলেন ; এবং যাঁহারা দুষ্যন্ত, মাতলি ও মারীচ প্রভৃতির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নাটকীয় চিত্রের পুরুষোচিত দৃশ্যনিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও মুহূর্ত্তের তরে সকলের মনেই একটা মোহময় আনন্দ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উজ্জয়িনীর অভিজ্ঞান-শকুন্তল, বহু শতাব্দীর পর, ইংলণ্ডে যাইয়া অভিনীত হইল,—ইংলণ্ডীয় বিবীরা বল্কলানুকারি দুকূল পড়িয়া, কক্ষে কলসী লইয়া, শকুন্তলা ও অনসূয়ার অনুকরণে, আলবালে জল-সেচন করিলেন, ইহা যেমন আনন্দের কথা, তেমনই আশ্চর্য্য গুণ-গ্রাহিতার কথা। ইহা দ্বারা কবির সে প্রসিদ্ধ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ;—

"ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"

অর্থাৎ——

রত্ন কারু করে না সন্ধান,
জহুরী যেখানে থাকে, আপনি যাচিয়া তাকে,
আদরে তুষিয়া করে গুণের সম্মান।

ভবভূতি প্রণীত উত্তর-রাম-চরিত ইয়ুরোপীয় সাহিত্য-সমাজে অদ্য পর্য্যন্ত এই প্রকার প্রণয়ের আদরে আদৃত হয় নাই। কিন্তু উহা যে কোন কোন অংশে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং শেক্ষপীরের রোমিও-জুলিয়েত প্রভৃতি প্রেম-রসাত্মক নাটক অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর * ও উচ্চস্থানীয়, ইহা এইক্ষণ সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এ সকল

* প্রশস্য ও বৃদ্ধ শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয়ে শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ এই দুইটি প্রচলিত শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রশস্য স্থানে শ্র এবং বৃদ্ধ শব্দ স্থানে জ্যা আদেশ করিয়া শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ। বরিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দও এই রূপে ব্যুৎপন্ন। এইক্ষণ প্রশ্ন এই, শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ প্রভৃতি ইষ্ঠ-প্রত্যয়ান্ত শব্দে পুনরায় তর তম প্রত্যয় করা যায় কিনা। ব্যাসের রচনায় নিদর্শন আছে,—করা যায়। যথা,— "যুধিষ্ঠিরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ কুরূণাং।" সুতরাং, সকলেই বাঙ্গালায়, নিঃশঙ্কচিত্তে, শ্রেষ্ঠতর শ্রেষ্ঠতম—জ্যেষ্ঠতর ও জ্যেষ্ঠতম প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করিয়া, ভাষার শক্তি বাড়াইতে পারেন। শাব্দিক-শিরোমণি অমরসিংহও শ্রেষ্ঠ শব্দকে একটি সিদ্ধ শব্দ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্কলঃ স্যাদিতি।

নাটক এত দিন সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালির নিকট গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থের ন্যায় অবোধ্য বস্তু ছিল। ইহারা ইদানীং, বিদ্বজ্জন-বরেণ্য, যশস্বিগণের অগ্রগণ্য, বিজ্ঞকবি জ্যোতিরীন্দ্রনাথের নৈপুণ্যে ও প্রযত্নে, বাঙ্গালা গদ্যপদ্যে যথাযথ অনূদিত হইয়া, বঙ্গীয় সাহিত্যের কিরূপ শোভা ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা আমরা সহজে বুঝাইতে পারি না।

বহুকাল হয় - বোধ হয় ১২৬২ সালে—মহাত্মা বিদ্যাসাগর যখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন, তখন সমগ্র বঙ্গে একটা আনন্দের কল-কল ধ্বনি উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা, এখন অবশ্যই, পাঠকের নিকট তেমন ভাললাগিতে পারে না। কারণ, বঙ্গীয় সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা সকলেই এখন মূল গ্রন্থ পড়িতেছেন; এবং কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পাইয়া, তদীয় লোকোত্তর কবিত্বের স্বাদগ্রহে সমর্থ হইতেছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে আছে, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমরা, মধুসূদনের তিলোত্তমা-সম্ভবের ন্যায়, পুনঃ পুনঃই উহা পাঠ করিয়াছি; এবং হৃদয়ের আনন্দ সংবরণ করিতে না পারিয়া, বন্ধুদিগকেও উহা পড়িয়া শুনাইয়াছি।

শকুন্তলা প্রকাশের বহুদিন পরে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় সীতার বনবাস প্রকাশ করেন। শকুন্তলার সহিত অভিজ্ঞান-শকুন্তলের যে সম্বন্ধ, সীতার বনবাসের সহিত উত্তর-চরিতের তেমন সম্বন্ধ নহে। কেন না, উহাতে উত্তর-চরিতের উৎকৃষ্ট সারাংশ সঙ্কলিত হইয়া থাকিলেও, আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ নাই। তথাপি, সীতার বনবাস পড়িয়াও, এদেশের অসংখ্য নরনারী, তদানীন্তন আনন্দের উচ্ছ্বাসে, কত কথা কহিয়াছেন,—কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সকলে জানেন।

আনুপূর্ব্বিক অথবা আক্ষরিক-অনুবাদগণনায় গোবিন্দচন্দ্রের বঙ্গানুবাদিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" সর্ব্বাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চন্দ্রসূর্য্যের সহিত খদ্যোতের তুলনা করিতে নাই। কেননা, তাদৃশ তুলনা অনেকের চক্ষে (Blasphemy) দেব-দূষণবৎ অতি বড় গর্হিত বোধ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ তুলনা করিতে অধিকার পাইলে, আমরা অসংকুচিত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলের অনুবাদ সম্পর্কে, কিবা উইলিয়ম যোন্স, কিবা মণিয়র উইলিয়মস্, কেহই গোবিন্দচন্দ্রের মত সুদুর্লভ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান মাণিকগঞ্জের নিকটবর্ত্তী নবগ্রাম নামক ভদ্রপল্লী। তিনি কিছুকাল, ঢাকায় থাকিয়া, গরীব ও শক্তিনামক সাহিত্যগন্ধি সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছেন; তার পর শেক্ষপীরের রোমিওজুলিয়েত নামক নাটককে উপন্যাসের মূর্ত্তিতে এবং কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলকে নাটকের আকৃতিতে অনুবাদ করিয়া, অকালে কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্র, লোক-লোচনের অগোচরে, অরণ্যে ফুটিয়া, আরণ্যকুসুমের মত, অলক্ষিত শোভায়, প্রতিভার হাসি হাসিয়া চলিয়া গিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞান-শকুন্তল বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে চিরকাল তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিবে।

তবে, গোবিন্দের অভিজ্ঞানশকুন্তলে দুই একটি গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছে। তিনি নাম দিয়াছেন অনুবাদ, অথচ বাঙ্গালির রুচি, মতি ও প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, দুই এক স্থানে, মূল-গ্রন্থের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন। কবিবর জ্যোতিরীন্দ্রনাথ প্রায়শঃ তাহা করেন নাই; অথচ তাঁহার অনুবাদ প্রায় সকল স্থলেই সরল, এবং অনেকস্থলে সুন্দর হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র একমাত্র অভিজ্ঞানশকুন্তলের অনুবাদ করিয়াছেন। জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, একাকী, এক উদ্যমে, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল লইয়া, এখন পর্য্যন্ত, ১২। ১৩ খানি নাটক অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার পুষ্পিত লেখনীর উপর বঙ্গ-ভারতীর পুষ্পবৃষ্টি হউক। তিনি একাকী, আপনাতে আপনি, বহুপ্রসারি মাধবী লতার মনোমোহন-বিতানের মত, এক অপূর্ব্ব সাহিত্যকুঞ্জ। তাঁহার এই সম্পদ্‌বহুল সুরম্য সাহিত্যকুঞ্জের সুখময় সৌরভ বঙ্গের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ুক,—সাহিত্যপ্রিয় ও সাহিত্যের উৎকর্ষপ্রয়াসী অলস বাঙ্গালির নিরাশ-হৃদয়ে আশা ও আনন্দের শক্তি সঞ্চারণ করুক।

বাবু জ্যোতিরীন্দ্রনাথের এই নাটকাবলী সম্পর্কে আমাদিগের কেবল একটি মাত্র কথা বক্তব্য। যিনি এতগুলি নাটক টীকা ও টিপ্পনীর সহিত পড়িয়াছেন,—পড়িয়া উত্তমরূপে বুঝিয়াছেন, এবং বুঝিয়া অতি উপাদেয় গদ্য-পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই সংস্কৃতভাষায় প্রগাঢ়-প্রবিষ্ট। কিন্তু তাঁহার রচনায় স্থানে স্থানে ইচ্ছাকৃত অসাবধানতা এবং ব্যাকরণের উপর একটুকু অনুচিত অত্যাচার পরিলক্ষিত হয়। যথা,—

"যাবৎ না সুনয়নী অতি উৎকণ্ঠিত,
উৎকণ্ঠিত সখী সঙ্গে না হন মিলিত
—যেমতি বসন্ত-লক্ষ্মী লতার সহিত।"

পুনশ্চ,——

"অপাঙ্গনয়নী তাই অর্দ্ধেক বদন,
ফিরাইয়া মোরে আজি করিল দর্শন।"

এই কবিতা দুইটির মধ্যে 'সুনয়নী' ও 'অপাঙ্গনয়নী' এই দুইটি পদ কোন ক্রমেই জ্যোতিরীন্দ্রনাথের মত সুযোগ্য লেখকের উপযুক্ত নহে। কারণ, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ অবয়ব-বাচক শব্দ লইয়া বহুব্রীহি সমাস হইলে, সে সকল শব্দে যদি "দুইয়ের অধিক স্বরবর্ণ থাকে," তাহা হইলে তাহাদের উত্তর স্ত্রী বুঝাইতে ঈ-প্রত্যয় হয় না; সর্ব্বদাই আ-প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা,—মৃগনয়না, চন্দ্রবদনা, চারুদশনা ইত্যাদি।*

---

* "ন ক্রোড়াদিবহ্বচঃ। ৪।১।৫৬। ক্রোড়াদের্বহ্বচশ্চ স্বাঙ্গান্ন ঙীষ্। পৃথুজঘনা, মহাললাটা।" ইতি পাণিনীয়ম্—পুরাতনম্। অনাসিকোদরাদ্ বহ্বচঃ—৩।৮৫। ইতি ক্রমদীশ্বরীয়ং—নব্যম্।

এইরূপ স্থানে অনেকে ইদানীং এই প্রকার একটা কথা উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত নিয়ম মানিতে যাইব কেন? আমরাও সাধারণতঃ এইরূপ কথাই বলিয়া থাকি। কিন্তু বাঙ্গালার যে অংশটুকু খাটি সংস্কৃত-মূলক, শুধু সেই অংশটুকুকে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে রক্ষা করা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করি। আমাদিগের বিবেচনায়, ইহা না করিলে, বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা পায় না। এ কথার প্রমাণ—মুখরা, মনোহরা, মধুকরী ও হৃদয়সহচরী প্রভৃতি সর্ব্বত্রপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ। বাঙ্গালায় রমণীর বিশেষণে কতকগুলি আকারান্ত ও কতকগুলি ঈকারান্ত শব্দ চিরনির্দ্দিষ্ট প্রথা অনুসারে প্রচলিত আছে। কিন্তু আজি কেহই যখন, সে আকার ও ঈকারের অবৈধ-ব্যত্যয় ঘটাইয়া, আপনার ইচ্ছানুসারে, রমণীকে মুখরী ও মনোহরী এবং ভ্রমরীকে মধুকরা বলিতে সাহস পাইতেছেন না, তখন অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে যে, উচ্ছৃঙ্খল বাঙ্গালা ভাষায়ও এমন একটু দৃঢ়-শৃঙ্খল-বদ্ধ স্থান আছে, যেখানে স্বেচ্ছাচারের পদক্রম অসম্ভব।

ইহা ছাড়া আর এক কথা আছে। যেখানে কোন একটি নূতন তত্ত্ব অথবা নূতন ভাব প্রকাশের জন্য কোন একটি নূতন শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা ঘটে, সেখানে ভাষার শক্তি ও সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য একটুকু অতিরিক্ত স্বাধীনতার আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে তাদৃশ কোন প্রয়োজন নাই, সেখানে অকারণ স্বজাতীয় সুচারু-বিকশিত ভাষার চিরপ্রতিষ্ঠিত গৌরবের উপর আক্রমণ করা আমাদিগের মতে কিঞ্চিদংশেও উপযুক্ত বোধ হয় না। আমরা এই হেতু 'নিরপরাধিনী,' ও 'বীরনাথিনী' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া 'নিরপরাধা' ও 'বীরনাথা' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করাই সঙ্গত মনে করিয়া থাকি; এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অন্যতম স্রষ্টা ও অসাধারণ পোষ্টা বলিয়া গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত সম্মান করিয়াও, তাঁহার ঐ 'সুনয়নী' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ সর্ব্বাংশে দূষ্য মনে করি। 'সুনয়নী' এই শব্দ অশুদ্ধ হইলেও সহজবোধ্য। কিন্তু 'অপাঙ্গনয়নী' শব্দ যেমন অশুদ্ধ, তেমনই অত্যন্ত কষ্টবোধ্য।* আমরা এ স্থানে দুইটি মাত্র শব্দ লইয়া সামান্যতঃ একটু আলোচনা করিলাম। কিন্তু প্রচলিত ব্যাকরণের প্রতি এইরূপ ইচ্ছাকৃত উপে-

* কালিদাসের মূল কবিতায় অপাঙ্গনেত্রা শব্দ আছে। অপাঙ্গনয়নী নাই। 'অপাঙ্গনয়না' থাকিতে পারে না। যথা,—

"যদিয়ং পুনরপ্যপাঙ্গনেত্রা
পরিবৃত্তার্দ্ধমুখী ময়া হি দৃষ্টা"

কিন্তু এই অপাঙ্গনেত্রা শব্দ সমাসের সূক্ষ্ম-কারুকার্য্য-সজ্জিতা সংস্কৃত ভাষায়ই ভাল সাজে, বাঙ্গালায় শোভা পায় না। সংস্কৃতেও, যখন উহার অর্থ করিতে যাইয়া, টীকাকার মল্লিনাথ প্রভৃতি ব্যক্তিরা কষ্ট পাইয়াছেন, তখন বাঙ্গালায় অপাঙ্গদর্শনা বলিলেই বোধ হয় সকল দিকে সুবিধা হয়।

ক্ষার ভাব, আরও কোন কোন স্থানে, অল্প পরিমাণে, পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহা না হইলে বড়ই ভাল হইত।

এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আমাদিগের দুইটি বৃহৎ অনুরোধ আছে। (১) তাঁহার এই নাটক-নিচয়,অনুদিত-সংস্কৃত-নাটকাবলী নামে একত্র গ্রথিত হইয়া, এক গ্রন্থে প্রকাশিত হইলে, তাঁহার যশস্য যত্ন ও অক্লান্ত শ্রমের ফল বহু লোকের উপকারজনক হইবে;—বহু সহস্র লোক, এই সূত্রে, সংস্কৃত নাটকরূপ দুষ্প্রবেশ সাহিত্যরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পাইয়া, ভারতীয় কাব্যযুগের শিক্ষা, সভ্যতা এবং রীতি নীতি বিষয়ে একই স্থানে একটি সুন্দর ও সুচিত্রিত পট দেখিতে পাইবে। (২) দ্বিতীয় অনুরোধ দুঃসাধ্য না হইলেও ব্যয়সাধ্য। প্রস্তাবিত নাটকাবলী অবশ্যই বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইবে। কিন্তু যদি গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেবনাগর অক্ষরে উহার পৃথক্ একটি সংস্করণ মুদ্রিত করেন, তাহাতে প্রকৃতই সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য-জগতে একটা নূতন আনন্দের তরঙ্গ বহিবে। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বম্বে ও মাদ্রাজ প্রদেশীয় লোকেরাও, বাঙ্গালা-সাহিত্যের রসাস্বাদে উৎসুক হইবেন; এবং যাঁহারা কোন দিন এক অক্ষর বাঙ্গালা পড়েন নাই, তাঁহারাও তদীয় নাটকাবলী পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিবেন; এবং নিজ নিজ ভাষায়, তাঁহারই অনুকরণে, মূল-গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ করিতে যত্ন করিয়া, সাহিত্যে একটা সমতানতার সৃষ্টি করিবেন। গ্রন্থকার লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সমান অনুগৃহীত। তাই আমরা, তাঁহার কাছে, এই দুইটি অনুরোধ করিতে সাহসী হইলাম। তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, বঙ্গদেশে কেহ কোন দিন তাহা করে নাই; করিবে বলিয়া কল্পনায়ও সাহস পায় নাই। তাঁহার নাম বঙ্গীয় সাহিত্য-মন্দিরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হউক।

( ২ )

## নববিধান অথবা সমন্বয়বাদ।*

যাঁহারা স্বাধীন চিন্তার অনুরোধে, ব্রাহ্ম-সমাজের সর্ব্বপ্রকার মত ও অনুষ্ঠানে হৃদয়ের সহানুভূতি দানে অসমর্থ, তাঁহারাও ধীরে ধীরে বুঝিতে পাইতেছেন যে, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ভারতভূমির অনন্যসাধারণ আভরণ, এবং বঙ্গের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কেশবচন্দ্র বঙ্গে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা উল্লেখ করিয়া বাঙ্গালি কোন দিন দেশ-দেশান্তরবাসী বিদ্বজ্জনসমাজে আদর পাইবে; এবং কেশবের প্রাতঃস্মরণীয় নামটিকে ভালবাসিতে শিক্ষা করিবে। বস্তুতঃ, কেশবচন্দ্রের মত অসামান্য প্রতিভান্বিত পুরুষেরা পৃথিবীতে সর্ব্বদা জন্ম-গ্রহণ করে না; জন্ম গ্রহণ করিলে, তাহারা শুধুই খাইয়া শুইয়া, আমোদ আনন্দ করিয়া,

* The New Dispensation or The Religion of Harmony. Compiled from Keshab Chander Sen's writings. Calcutta. Printed at the Bidhan Press. Price ~~Rs~~ 2.

দিন কটায় না; এবং তাঁহারা যে সকল কথা কহিয়া যায়, মানবজাতি শীঘ্র তাহা ভুলিতে পারে না। কেশবচন্দ্রের প্রাণের কথা বিবিধ পুস্তকে গ্রন্থবদ্ধ রহিয়াছে; কিন্তু তিনি, তাঁহার চরম সময়ে, যে সকল স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত, সুগভীর চিন্তাপ্রসূত, সূক্ষ্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত সার কথা The New Dispensation—অর্থাৎ নববিধান নামক সাপ্তাহিক পত্রে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাই সম্প্রতি তদীয় সাধুহৃদয় ভক্তশিষ্যদিগের সাধু প্রযত্নে সঙ্কলিত ও বিধানযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া, একখানি সুন্দর গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরই সুখপাঠ্য; এবং আমরা ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ইহা সকলেরই উপযোগী ও উপকারজনক।

গ্রন্থখানি তিন শত আট পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়প্রসঙ্গে প্রবন্ধ চিন্তা অথবা প্রবন্ধ রচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের জন্য ইহাতে অন্ততঃ তিন সহস্র কথা তত্ত্বসূত্রবৎ নিহিত রহিয়াছে। আমরা দুই একটি কথার উদাহরণ নিয়ে প্রদর্শন করিব।

সকলেই জানেন কেশবচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গকে ভক্তির অবতার বলিয়া পূজা করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রেমারাধ্য গৌরাঙ্গকে একই আধারে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন বলিয়া চিন্তা করিতেন, ইহা বোধ হয় সকলে অবগত নহেন। কেশবচন্দ্র এ সম্পর্কে কিরূপ উদার-হৃদয়ে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই তত্ত্বদর্শী পাঠকের—বিশেষতঃ বৈষ্ণবের—শ্রোতব্য কথা।

কেশব নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতেছেন,—"Verily, verily Chaitanya was Krishna and Radha in one."—অর্থাৎ ইহা সত্য—ইহা প্রকৃতই সত্য, চৈতন্য একই তনুতে কৃষ্ণ ও রাধার মিলিত মূর্ত্তি। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, কেশবচন্দ্র, বৈজ্ঞানিক না হইলেও, ঘোরতর বিজ্ঞান-ভক্ত। তিনি কি অর্থে এইরূপ আশ্চর্য্য কথা বলিলেন? তাঁহার সম্যক্ অর্থ বুঝিতে হইলে, তিনি চৈতন্যের "Double character" দ্বিষ্ঠ অথবা দ্বিসংশ্রিত চরিত্র সম্বন্ধে যাহা কতিপয় পংক্তিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আগাগোড়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমরা সে ভাবগভীর কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত না করিয়া, পাঠককে মূল গ্রন্থ হইতে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠকের পরিশ্রম অথবা সামান্য অর্থ ও সময়-ব্যয় বিফল হইবে না।

এ পুস্তকে শ্রীগৌরাঙ্গ-সম্পর্কিত বিবিধ গূঢ় কথা পাঠকের মনে যেমন বিস্ময় জন্মাইবে, গীতার তত্ত্বপ্রবক্তা এবং ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম্মাত্মক পূর্ণাঙ্গ-যোগ-ধর্ম্মের প্রথম-প্রতিষ্ঠাতা ভারতারাধ্য কৃষ্ণের বিশ্বরূপ-প্রকাশ, বুদ্ধদেবের বিবিধ কথা এবং বেদ-বেদান্তের নানারূপ নূতন ব্যাখ্যাও বুদ্ধিমান্ পাঠকের হৃদয়কে তেমনই আকর্ষণ করিবে।

পুস্তকের শেষভাগে (The Apostles Examined) অর্থাৎ "প্রেরিতদিগের পরীক্ষা" নামে দুইটি প্রবন্ধ আছে। যাহারা আপনা-

দিগকে বিশেষ কোন মঙ্গল্য কার্য্যের অনু-ষ্ঠানার্থ সংসারে প্রেরিত মনে করেন, তাঁহা-রাই 'প্রেরিত।' কেশবচন্দ্রের প্রধান শিষ্যেরা, এই অর্থে, আপনাদিগকে প্রেরিত মনে করিয়া থাকেন। কেশবচন্দ্রও এই অর্থেই তাঁহাদিগকে প্রেরিত মনে করিতেন। তিনি প্রেরিতদিগের পরীক্ষানামক প্রথম প্রবন্ধে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, আমরা তাহার উত্তরদানের যোগ্য নহি। কেন না সে সকল প্রশ্ন যোগি-জন-পরিজ্ঞেয় গভীর পরমার্থ-তত্ত্বের সহিত ওতপ্রোত জড়িত। দ্বিতীয় প্রবন্ধে পারলৌকিক অস্তিত্বের কথা। আমরা ছায়াদর্শন নামক প্রবন্ধনিচয়ে যে সকল কথা বঙ্গীয় পাঠককে বুঝাইবার জন্য নিরন্তর যত্ন পাইতেছি, দ্বিতীয় প্রবন্ধে সেই সকল কথাই, প্রকারান্তরে ও প্রশ্নের আ-কারে, উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা এখানে দুই একটি প্রশ্ন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের প্রত্যুত্তর যথাযথ লিপিবদ্ধ করিব।

১ম, প্রশ্ন—(ক) "তোমার কি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, দেহধ্বংসের পরেও তুমি জীবিত থাকিবে?"

উত্তর। হাঁ, এ বিশ্বাস আমাদিগের অতি দৃঢ় বটে। আমরা ইহা যার পর নাই দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি, এবং বিশ্বাস করি বলিয়াই পরের মনেও এই পীযূষময় পবিত্র সত্যে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নানাপ্রকার প্রয়াস পাইয়া থাকি। পুরাতন হিন্দুধর্ম্ম-প্রতি-ষ্ঠিত শ্রাদ্ধতত্ত্বেরও ইহাই প্রকৃত অর্থ যে, এ দেহ যখন বিনষ্ট অর্থাৎ দৃষ্টির বহির্ভূত হইবে, আমরা তখন অতি সূক্ষ্মতর আকাশিক অর্থাৎ অধ্যাত্মদেহে আবৃত হইয়া জীবিত মনুষ্যের ন্যায় পরলোকে অবস্থান করিব। আমাদিগের এখন যেমন হস্ত, পদ, চক্ষু প্র-ভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে, তখনও আমাদিগের সেইরূপ হস্ত, পদ ও চক্ষু প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় থাকিবে; এবং আমরা সর্ব্বাংশে জীবিত মনু-ষ্যের ন্যায় জীবন যাপন করিব। ফলতঃ আকাশের ঐ চন্দ্র সূর্য্য যেমন নিঃসংশয় সত্য, পারলৌকিক জগতের অস্তিত্বও সেই-রূপ নিঃসংশয় সত্য। তবে এই প্রভেদ, চন্দ্র সূর্য্য জড় পদার্থ; কালে উহাদিগের বিলয় হইবে। পারলৌকিক জগৎ ও উহার অধি-বাসীরা অজড়, অধ্যাত্ম ও অক্ষয়; কোন কালেও তাহাদিগের বিলয় নাই।

(খ) "তুমি কি প্রমাণ অথবা কি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস কর? পরলোক কি ইহলোকেরই আর এক অধ্যায়, না নূতন সৃষ্টি? সে বিশাল পরকাল সম্বন্ধে তোমার মনে কি কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই?"

উত্তর। পারলৌকিক অস্তিত্বের প্রমাণ অসংখ্য। এখানে তিনপ্রকার প্রমাণের প্র-কার মাত্র প্রদর্শন করিব। প্রথম, বৈজ্ঞা-নিক প্রমাণ অথবা জড়বিজ্ঞানের সাক্ষ্য। ইহা জড়বিজ্ঞানের দ্বারা অভ্রান্ত সত্য রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এ জগতে কোন বস্তুরই বিনাশ নাই। বিজ্ঞানের চক্ষে, রাসা-য়নিক-প্রক্রিয়ার নিয়মে, সমস্ত বস্তুরই রূপা-ন্তর-প্রাপ্তি ঘটে; কোন বস্তুরই, প্রকৃত

প্রস্তাবে, বিনাশ—অর্থাৎ anihilation হয় না।

বিনাশ শব্দের এই বৈজ্ঞানিক অর্থ বহুকাল হয় ভারতীয় ঋষিদিগের আত্মায় জ্ঞান-যোগে প্রতিভাত হইয়াছিল। যাহা নব্য বৈজ্ঞানিকেরা এইক্ষণ বহু পরীক্ষার দ্বারা বিজ্ঞান-সিদ্ধ সত্যরূপে স্বীকার করিয়া লইতেছেন, প্রাচীন ঋষিরা প্রজ্ঞামূলক অন্তর্দ্দৃষ্টিতেই তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ও শাকটায়ন প্রভৃতি ঋষিদিগের শব্দবিজ্ঞান-তত্ত্ব। কত সহস্র বৎসর হয়, পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! তিনি সেই অষ্টাধ্যায়ী রচনার সময়ে তদীয় ধাতুপাঠ নামক পুস্তকে 'নশ্' ধাতুর অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

নশোঽদর্শনে—অর্থাৎ দৃষ্টির বাহিরে যাওয়ার অর্থই নাশ।

এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্যের পাদ-লগ্ন ধূলিকণাও যদি বিজ্ঞানের নিকট অবিনাশি, তাহা হইলে কি বিনাশী বলিয়া মনে করিতে হইবে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সনক ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জগন্মঙ্গল মহাত্মাদিগকে?

দ্বিতীয় প্রমাণ পারমার্থিক। আমরা এই শ্রেণীর প্রমাণ-সম্পর্কে অধিক বলিতে চাই না। কারণ, আমরা পারমার্থিক পবিত্রতার সন্নিহিত নহি। তবে, ইহা বুদ্ধি যোগে বুঝি যে, যাঁহাদিগের আত্মা পূর্ণানন্দ পরমপুরুষের প্রেমময় স্পর্শে শীতল হইয়াছে, অথবা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে প্রেমময়—God is Love—বলিয়া জানিয়াছে, পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অন্য প্রমাণের প্রয়োজন থাকে না। যে ব্যক্তি জিহ্বাতে শর্করার স্বাদ অনুভব করে, সে শর্করার স্বাদ-মাধুর্য্যসম্পর্কে অন্যবিধ প্রমাণের জন্য আকুল হইবে কেন?

পারলৌকিক অস্তিত্বের তৃতীয় প্রমাণ আধুনিক—Science of Spiritualism—অর্থাৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞান। এই প্রমাণ আমাদিগের মত পৃথিবীর অনন্তকোটি অপারমার্থিক মনুষ্যের জন্য সর্ব্বাংশে "প্রচুর ও পর্য্যাপ্ত"। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার প্রধান বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীতে যে সকল অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছেন, এবং যাহা চক্ষে দেখিয়া, কানে শুনিয়া এবং হস্তে স্পর্শ করিয়া, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, সরলচিত্ত ব্যক্তির মনে, মনুষ্যের পারলৌকিক অস্তিত্ব বিষয়ে, মুহূর্ত্তের তরেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক (Doctor Wallace) ডক্টর ওয়ালেস্ আপনার ফটোগ্রাফ তুলিতে যাইয়া সেই ফটোগ্রাফের পার্শ্বে স্বর্গগত মাতার প্রতিকৃতি লাভে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। সার্ উইলিয়ম ক্রুকস্ একটি স্বর্গগত রমণীকে, প্রতিবিম্বিত মূর্ত্তিতে, বহু দিন এবং পুনঃ পুনঃ, প্রত্যক্ষ করিয়া, বহু বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিস্থলে, স্বহস্তে তাঁহার তেতাল্লিশ খানি ফটোগ্রাফ তুলিয়াছেন। ইহার উপর আর প্রমাণ কি হইতে পারে? ওয়ালেস্ ও ক্রুকস্ যাহা চক্ষে দেখিয়াছেন,

বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে আরও অনেকে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাদিগের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়াছি যে, পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে এখন আর অভ্রান্ত প্রমাণের অভাব নাই।—অপিচ, পরলোক ইহলোকেরই অনুবৃত্তি অথবা আর এক অধ্যায়। যে জীবন এখানে অঙ্কুরিত অথবা আরব্ধ হইয়াছে, তাহাই সেখানে যাইয়া ক্রমোন্নতির মঙ্গলময় নিয়মে, উৎকৃষ্ট-তর বিকাশ অথবা উন্নতি লাভ করিতেছে।

২য় প্রশ্ন। "স্বর্গ কি বিশেষ কোন স্থান, না ঈশ্বরের অনুভূতিমূলক উচ্চতর জীবন? স্বর্গবাসীরা কি পুনরায় তাঁহাদের এ পার্থিব রক্তমাংসময় দেহ লাভ করেন? যদি সে পার্থিব দেহের আর পুনঃপ্রাপ্তি না ঘটে, তাহা হইলে এক জনে আর এক জনকে চিনিতে পান কিরূপে?"

উত্তর। স্বর্গ বিশেষ স্থানও বটে, জীবনের বিশেষ অবস্থাও বটে। প্রাচীন ঋষিরা স্বর্গধামকে বিশেষ স্থান ও বিশেষ অবস্থা এই দুই ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন। খৃষ্টদেবের উপদেশও ঋষি বাক্যেরই সমর্থক। কেন না, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—"In my Father's house there are many mansions"—অর্থাৎ আমার পিতৃগৃহে অনেক প্রকোষ্ঠ অথবা প্রাসাদ আছে। মানুষ কখনও সে স্বর্গে অথবা পরলোকে পৃথিবীর রক্তমাংসময় দেহ লইয়া প্রবেশ করে না। পৃথিবীর দেহ পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর দেহের মধ্যে যে আর একটি সূক্ষ্মতর-পদার্থ-রচিত অপার্থিব আকাশিক দেহ আছে, মনুষ্য সেই দেহ লইয়া লোকান্তরে প্রবেশ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবীর দেহে যেমন চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত-পদাদি-নিরূপিত আকৃতি আছে, সেই সূক্ষ্মতর আকাশিক (Ethereal) দেহেও, সেইরূপ অথবা ততোধিক সুন্দর, আকৃতি আছে। সুতরাং, যেখানে আকৃতি থাকে, সেখানে পরস্পর-পরিচয়ের আর বিঘ্ন থাকে কি? তবে, সে আকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল। মনুষ্যের আকৃতি, এই পৃথিবীতে যেমন, বয়সের প্রভাবে এবং রোগ, শোক ও সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নানা কারণে, ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়; পরলোকবাসী সূক্ষ্মশরীরিদিগের আকৃতিও সেইরূপ পাপ-পুণ্য ও সুখ-দুঃখের শক্তিতে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পুণ্যের পথে উন্নতি লাভ করেন, তাঁহারা ক্রমশই দেবতার মত সুন্দর হন; এবং যাঁহারা কর্ম্মদোষে দীর্ঘ কাল তাদৃশ উন্নতিতে বঞ্চিত রহেন, তাঁহারা অতি কুৎসিত আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ঐ সময় ক্লেশে জীবন যাপন করেন।

৩য় প্রশ্ন। তুমি কি যিশু, পল, সক্রেতিস, মোজেস এবং চৈতন্য প্রভৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিবে বলিয়া আশা কর? তোমার কি এমন ভরসা আছে যে, তুমি সেখানে তোমার পিতা মাতা, ভাই বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের দর্শন লাভ করিয়া হৃদয়ে সুখী হইবে?

উত্তর। পরলোকে যাইয়া শীঘ্রই পুণ্যময় বিশু ও প্রেমময় চৈতন্যের দর্শন লাভ ঘটিবে, এমন আশা করি না। এক দিন না এক দিন অবশ্যই ঘটিবে, তাহা মানি। কিন্তু সে এক দিন বহু দূরের কথা। তবে, ইহা নিশ্চয় জানি যে, পৃথিবীতে যাঁহাদিগকে ভালবাসিয়াছি, যাঁহাদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাপন করিয়াছি, সেই স্নেহ-শীতল পিতা মাতা ও সমান-হৃদয় বন্ধু-বান্ধবদিগকে পরলোকে যাইয়া চক্ষে দেখিব; এবং তাঁহাদিগের করুণা ও স্নেহে উপকৃত হইব। যাঁহারা পৃথিবী হইতে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে পৃথিবীর আত্মীয়-স্বজনের নিকট ছায়ামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, পিতামাতার দর্শন লাভের কথা জানাইয়াছেন। তাঁহাদিগের সে সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। *

পরলোকে আত্মীয় স্বজনের দর্শন লাভ বিষয়ে, মহাভারতীয় ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির সংবাদে, একটি অমৃত মধুর কথা আছে। সে কথাটি এখানে উদ্ধৃত করিব। ধর্ম্মদেব যুধিষ্ঠিরকে ব্রহ্মলোকে স্থান দানের প্রস্তাব করিলেন। যুধিষ্ঠির, সে ব্রহ্মলোকের কথা শুনিয়া, বিস্ময় ও ক্ষোভে ক্লিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"ঠাকুর, আমি ব্রহ্মলোকস্বরূপ উচ্চ স্বর্গ কামনা করি না। আমার আত্মীয়েরা যেখানে বাস করেন, সেই স্বর্গই আমার স্বর্গ। সে স্থান পবিত্র হউক, অথবা অপবিত্র হউক, সেই স্থানই অদ্য আমার স্থান। আমি অন্য কোন স্থান পাইতে ইচ্ছা করি না। আপনি ব্রহ্মলোকের কথা কহিতেছেন। কিন্তু আমি আমার আত্মীয় স্বজনের সাহচর্য্যে বঞ্চিত হইয়া শাশ্বত ব্রহ্মলোকে যাইয়াও শান্তি পাইব না। সুতরাং আমার সুহৃৎ স্বজনেরা যেখানে আছেন, সেই স্থানই আমার প্রার্থনীয়,—তাহাই আমার প্রার্থিত স্বর্গধাম। যথা,—

"পুণ্যং বা যদি বা পাপং মিত্রাণাং স্থানমদ্য মে।
তদেব প্রাপ্তুমিচ্ছামি লোকানন্যান্ ন কাময়ে॥
তৈর্বিনা নোৎসহে বস্তুং ব্রহ্মলোকেঽপি শাশ্বতে,
গন্তুমিচ্ছামি তত্রাহং যত্র মে সুহৃদো গতাঃ॥
কিং মে মিত্রবিহীনস্য স্বর্গেণ গুরুসত্তম।
যত্র তে মম স স্বর্গো নায়ং স্বর্গো মতো মম।"

ধর্ম্মদেব, যুধিষ্ঠিরের এই মহৎ উদারতা ও স্বজনবৎসলতা দর্শনে প্রীত ও পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন,—"তুমি মনুষ্য হইলেও দেব-প্রকৃতি, কেন না তোমার প্রাণ পরের জন্য পোড়ে। অতএব যেখানে সর্ব্ববিধ আনন্দ, আমোদ ও অমর-ভোগ্য সম্পদ্ নিত্য বিদ্যমান, সেই বৈরাজ ধামই তোমার উপযুক্ত ধাম। তুমি তোমার সুহৃৎ-স্বজন সকলকে সঙ্গে লইয়া, সেই বৈরাজ স্বর্গে যাইয়া চিরকাল বিরাজিত রহ।" যথা,—

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ যত্র নিত্যাশ্চসম্পদঃ।
বৈরাজ নাম তে লোকাঃ সন্তু তে স্বজনৈঃ সহ।

* পাঠক ফ্রেডারিক মিয়ার্স প্রণীত Human Personality নামক বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিলে, এ বিষয়ে বহু প্রমাণ পাইবেন।

যুধিষ্ঠিরের এই কথাই আমাদিগের হৃদয়ের কথা। কারণ, আমরা বৈরাজ-স্বর্গের আশা করিতে সমর্থ না হইলেও, স্নেহবদ্ধ বন্ধুবান্ধবের দর্শন পাইব বলিয়া বিশ্বাস করি। পরলোক-গত নর-নারীর মধ্যে অনেকেই, উল্লিখিত অধ্যাত্মজগতে, পিতা মাতা ও প্রিয় সুহৃদ্বর্গের দর্শন লাভ করিয়া, সে কথা পৃথ্বীবাসী আত্মীয়বর্গকে নানা উপায়ে জানাইয়াছেন। তাঁহাদিগের অদৃষ্টে যে আনন্দ ঘটিয়াছে, করুণাময় জগদীশ্বরের রাজ্যে, অন্যের তাঁহা না ঘটিবে কেন?

যুধিষ্ঠিরের উক্তিকে নব্য-শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে পৌরাণিক ঋষি-প্রাণের অমূলক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু আধুনিক আমেরিকার অন্যতম ধর্ম্ম-গুরু দয়াধর্ম্মপূর্ণ থিয়োডর পার্কার্ও তাঁহার একখানি গ্রন্থে ঠিক্ এমনই কথা বলিয়াছেন। পার্কার্ হৃদয়ের প্রেমাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিয়াছেন,—জগদীশ্বর যদি বহু মনুষ্যকে নরকে প্রেরণ করিয়া আমাকে স্বর্গবাসের অধিকার দান করেন, আমি করযোড়ে কহিব—"প্রভো, আমি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর স্বার্থপরের মত একাকী স্বর্গসুখেরও অভিলাষী নহি। আমার ভাই বন্ধুরা যে অন্ধকার স্থানে অবস্থিত হইয়া দুঃখে কষ্টে দিনপাত করিতেছে, আমিও সেই অন্ধকারে যাইয়া তাহাদিগের দুঃখ কষ্টের ভাগী হইব।" এরূপ কথা পার্কারেরই যোগ্য বটে। আমরা যুধিষ্ঠির ও পার্কারকে লক্ষ্য করিয়া বারংবার নমস্কার করি।

মনুষ্য অকস্মাৎ সজ্জন-সঙ্গ লাভ করিলে পথের দীর্ঘতা অনুভব করে না। আমরাও এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের আলোচনায় পাঁচ কথা লিখিতে যাইয়া প্রবন্ধের দীর্ঘতা অনুভব করি নাই। যদিও এ পুস্তক সম্বন্ধে আরও বহু কথা বলিবার আছে, আমরা তথাপি এখানেই আজি বিরত হইব। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, জ্ঞানপিপাসু ভক্তিমান্ ব্যক্তি মাত্রই এ অভিনব পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন।

## সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

"হিন্দু ধর্ম্মের প্রমাণ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত।" হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দুর আরাধ্য নারায়ণের ন্যায়, সুচিরকাল নিদ্রায় অভিভূত থাকিলেও, উহার উত্থান-একাদশী আছে। বঙ্গে ইদানীং উত্থান-একাদশীর কাল। হিন্দু-ধর্ম্মের এই পুনরুত্থান-উৎসবে যাঁহারা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য পুরুষ। পূর্ণ বাবুর এ গ্রন্থ হিন্দু মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। তাঁহার এই গ্রন্থে শিখিবার কথা অসংখ্য। সম্প্রতি (Neil Alexander) নীল আলেকজন্দর নামক একজন নব্য পণ্ডিত "গীতা ও গস্পেল" নামে একখানি নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি গীতা ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্গীয় বহু লোকের গ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু বোধ হইল পূর্ণ বাবুর কোন গ্রন্থ পড়েন নাই। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের অন্তগূঢ় মর্ম্মগ্রহ করিয়া উহার বিবিধ কথা লইয়া বিচার বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ণবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড ] অগ্রহায়ণ, ১৩১০। [ ৮ সংখ্যা।

# বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও স[illegible]চন।

( পুনঃপ্রচারিত )

বৈশাখ হইতে চৈত্র বর্ষ-গণনা।

৮

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।



ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিন্টার্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য ... আনা।

## বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয়
## নিয়মাবলী।

### অগ্রিম।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩৲ ......... | ।৵০ ... | ৩।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২৲ ......... | ৶০ .. | |

### পশ্চাদ্দেয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৪৲ ......... | ।৵০ | ৪।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২৷০ ......... | ৶০ | ৩৷৶০ |

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারী সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইলে কার্য্য সম্পর্কে আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হইবে না কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা হয়, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৶০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲. এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

ঢাকা,
বান্ধব-কুটীর।
১৩১০ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীহরকুমার বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

### বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড বান্ধবের ৮ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এখনও যাঁহারা উহার মূল্য দেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া, একটু সত্বর, নিজ নিজ দেয় মূল্য পাঠাইয়া বাধিত ও অনুগৃহীত করিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।
সহকারী সম্পাদক,—বান্ধব।

# মা উমা।

## কালিদাস ও কবিগুণাকরের চিত্রতুলনা।

কালিদাস ভারতবর্ষের ভুবন-বিখ্যাত আভরণ। তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, আজি ভারতভূমি স্বদেশে ও বিদেশে ধন্য হইতেছে; এবং সুদূর ইয়ুরোপ এবং দূরতর আমেরিকাও ভারতীয় সাহিত্যিক-সভ্যতার অশেষ উচ্চসম্পদের কথা আলোচনা করিয়া, গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ, কালিদাস, বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার ও শেক্ষপীরের ন্যায়, জগদ্‌গুরু কবি না হইলেও, জগদুজ্জল ও জগন্মান্য কবি। তাঁহার অমিয়-মধুরা, সরস-সুধাক্ষরা রচনা দ্বারা সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কৃত ও উদ্ভাসিত হইয়াছে; এবং তাঁহার শকুন্তলা, মেঘদূত ও কুমারসম্ভব, উৎকর্ষের অলোকসাধারণ বৈভবে, কাব্যজগতে অতি উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া, পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যিকের হৃদয়ে বিস্ময়, ভক্তি ও প্রীতির হর্ষ জন্মাইয়াছে।

কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র, কালিদাসের ন্যায়, অত্যুজ্জল-প্রতিভান্বিত অসামান্য কবি নহেন, কিন্তু সুকবি; এবং অনতিবিকশিত বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জল আভরণ। তিনি, উৎকৃষ্টতম নাটক অথবা উৎকৃষ্টতম মহাকাব্য রচনা করিয়া, বঙ্গভারতীর আনন্দময় আরতি দ্বারা, অনন্যসাধারণ ক্ষমতার চমক দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু, তিনি যে সকল কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার অনেক স্থলেই প্রকৃত-কবিত্বের পরিচয় আছে; এবং কালিদাসের সুকীর্ত্তিত রচনা যেমন সংস্কৃত ভাষার শোভা ও সম্পদ বাড়াইয়াছে; ভারতচন্দ্রের "কোমল-কান্ত-পদাবলী" ও সেইরূপ উন্মেষোন্মুখী বাঙ্গালা ভাষার সৌন্দর্য্য ও শক্তির বিকাশে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

ফলতঃ, বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে কেহই আজি পর্য্যন্ত ললিত-মধুর শব্দ-সম্পদে ভারতের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই;—কাহারও লেখা, ভাষার স্বাভাবিক শোভা ও সরস-সরলতায়, ভারতচন্দ্রের সমান পদবীতে পঁহুচিতে সমর্থ হয় নাই। যাঁহারা কাব্য-রস-পিপাসার পরিতৃপ্তির জন্য মিল্টন, বায়রণ ও শেলি প্রভৃতির কবিতা লইয়াই সময় যাপন করেন, তাঁহারাও, শুধু বাঙ্গালা শিখিবার জন্য, সময়ে সময়ে, ভারতের উপাসনা করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ভারতের সেই—"আধ জটাজুট গঙ্গা-সরসী,—আধই চারু কবরী রে" প্রভৃতি পদ-লহরী বসন্ত-সমীর-সঞ্চারিত বিলোল যমুনার মৃদুলহরীর মত। সে সকল পদ-মালা অথবা সে হৃদয়-হারিণী ভাষা সহজে যাঁহার কণ্ঠে স্ফুরিত হয়

না, তিনি বাঙ্গালা পড়িয়াছেন, বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা ভাষার রস-মাধুর্য্যের স্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারি না।

কিন্তু স্বজাতীয় ভাষার শব্দ-সম্পদের উপর অসাধারণ আধিপত্য ভিন্ন, উজ্জয়িনীর মুকুট-কবি কালিদাসের সহিত কৃষ্ণনগর-নিবাসী কবিগুণাকরের আর কোন অংশেও তুলনা হইতে পারে কি ?

উভয়েই জীবনের বিকাশ ও জীবিকার প্রয়োজনে রাজার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, এই সাংসারিক কথা এক পৃথক্ কথা। এখন যেমন ইয়ুরোপীয় রাজ্যেশ্বরেরা, দেশের প্রসিদ্ধ কবি এবং প্রধান লেখক ও বৈজ্ঞানিকদিগকে গৃহপ্রতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায়, নিত্যনিয়মিত পদ্ধতিতে পূজা করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন; ভারতীয় রাজ্যেশ্বরেরাও, ভারতভূমির সুখ-সৌভাগ্যের দিনে, স্বদেশের কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগকে, সেই ভাবে কিংবা ততোধিক গৌরবে, পূজা করিয়া, নিজ নিজ সম্পদের সার্থকতা করিতেন। যদিও এ অংশে যশস্বিগণের অগ্রগণ্য স্বনাম-ধন্য বিক্রমাদিত্য, কালিদাস প্রভৃতি মহামতি পুরুষদিগকে আশ্রয়দানের দ্বারা, নব-রত্ন-সভা * প্রতিষ্ঠা করিয়া, পৃথিবীর ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছেন; ইহা তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার এই কীর্ত্তি অনন্যসাধারণ নহে।

ভারত-বিখ্যাত পৃথ্বীরাও চাঁদকবি প্রভৃতির পূজা করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। সে দিনকার সুখ-সুপ্ত বঙ্গাধিপতি,—বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণ ও লাক্ষ্মণেয়ও স্বগৃহে ক্ষুদ্র একটি নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; এবং "উন্মদ-মদন-মনোরথ" জয়দেব ও উজ্জ্বলোত্তর-রচন-চতুর গোবর্দ্ধন আচার্য্য প্রভৃতি বিশ্রুতনামা কবিদিগের অর্চ্চনার দ্বারা বঙ্গের গৌরব বাড়াইয়াছেন। *

কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের অদ্বিতীয় আশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্র, উল্লিখিত রাজাধিরাজগণের সহিত রাজবৈভবে তুলনার যোগ্য হওয়া দূরে থাকুক, এক সঙ্গে নামোল্লেখেরও যোগ্য হইতে পারেন না। কিন্তু তিনিও, হৃদয়ের মহত্ব ও আকাঙ্ক্ষার উদারতায়, ঐ পথেরই পথিক। বিক্রমাদিত্য ভারত-সাম্রাজ্যের সম্রাট্, আর কৃষ্ণচন্দ্র এই দারিদ্র্য দগ্ধ বঙ্গের এক দীন-হীন ভূস্বামী। কিন্তু, বিক্রমাদিত্য যেমন ভক্তি-বিহ্বল উপাসকের ন্যায়, চিরকাল কালিদাসের পূজা ও পরিপোষণ করিয়াছিলেন, ইহা বঙ্গবাসীর বিশেষ শ্লাঘার

---

* "ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহ শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটখর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥"

* "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ, সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং—জানীতে জয়দেব এব, শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে। শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈ—রাচার্য্যগোবর্দ্ধন—স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ।"

জয়দেব।

বিষয় যে, বঙ্গীয় কৃষ্ণচন্দ্রও, আপনার ক্ষুদ্র বৈভবের, ক্ষুদ্র পরিমাণে, ভারতচন্দ্রের পূজা ও পালনবিধানের দ্বারা দেশের নাম রাখিয়াছেন।

কিন্তু আমাদিগের মুখ্য প্রশ্ন রহিয়া যাইতেছে। কালিদাস ও কবিগুণাকর উভয়েই রাজার আশ্রিতরূপে জীবন যাপন করিয়া মাতৃভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন, এই এক নগণ্য কথা ভিন্ন এই দুইয়ের মধ্যে কবিত্বের উচ্চ গ্রামে কোনরূপ তুলনা হইতে পারে কি? তুলনার স্থল না থাকিলেও, একসঙ্গে আলোচনার স্থল আছে। সেই স্থল মা উমার যোগি-জন-বন্দ্য চরণ কমল। কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভবে উমার জন্ম, জীবন-তত্ত্ব, যোগ-চর্য্যা ও বিবাহের কথা প্রসঙ্গে পৃথ্বী-দুর্ল্লভ মহাকাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন; কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রও, তদীয় অন্নদামঙ্গল নামক কাব্যে, উমার জন্ম ও বিবাহ প্রসঙ্গে অতি মনোহর কাব্য সৃষ্টি করিয়া, কালিদাসের পদানুসরণ করিতে প্রয়াসপর হইয়াছেন। সুতরাং, উমা-চরিত্রের অলৌকিক চিত্র সম্পর্কে, আমরা এই দুইয়ের কবিত্ব ও কৃতিত্ব লইয়া এক সঙ্গে একটুকু আলোচনা করিলে, তাহা অবশ্যই রস-পিপাসু সাহিত্যিকদিগের হৃদ্য হইবে।

উমা এই অমৃত-শীতল নাম ভারতীয় হিন্দুর প্রাণারাধ্য বস্তু। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কালিদাস ও কবিগুণাকর উভয়েই সুন্দর কবিতা রচনা করিয়াছেন। সে সকল কবিতার কথা, এই প্রবন্ধেই, উপযুক্ত স্থলে, পরে বলিব। এইক্ষণ ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, ভারতবর্ষীয় হিন্দুর স্বভাব-কোমল পরমার্থনিষ্ঠ হৃদয়, এই প্রত্যক্ষ জগতের অপ্রত্যক্ষ কারণরূপিণী যে শক্তিকে—যে অচিন্ত্য, অজ্ঞাত,—মনোবুদ্ধির অগম্য ও অতীত, মহামায়া অথবা মহাতত্ত্বকে, ভক্তির উদ্বেল-উচ্ছ্বাসে, বহুসহস্র বৎসর হইতে, মা বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে, এবং সুখে ও দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, মুক্তকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিয়া, প্রাণের অননুভূতপূর্ব্ব পরিতৃপ্তিতে, নয়নজলে ভাসিতেছে, তিনিই কালিদাস ও কবিগুণাকরের কাব্যারাধ্যা উমা।

এই অনন্ত-বৈচিত্র্যময় বিশ্বসংসার যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,—উৎপন্ন হইয়া যাঁহার শক্তিতে সতত বিধৃত রহিয়াছে, এবং চরমে অথবা সংসারের শেষ পরিণামে পুনরায় যাঁহাতে যাইয়া ঠাঁই লইবে, তিনি কিরূপ পদার্থ? তাঁহাকে বুঝিবার জন্য পৃথিবীর অযুত-বিধ দর্শন-বিজ্ঞান অযুত-প্রকারে যত্ন পাইয়াছে। ভারতীয় হিন্দুর শিশুসমুচিত সরল প্রাণ, তর্কবিতর্কের ত্রিসীমায়ও না যাইয়া, তাঁহাকে পিতা ও মাতা জ্ঞানে পূজা করিয়াছে।* তিনি একে দুই, দুইয়ে এক; এবং একই আধারে শিব-শক্তি অথবা প্রকৃতি-পুরুষাত্মক নিত্য সত্য। তিনি যে মূর্ত্তিতে

* ঈশ্বরে পিতৃত্ব চিন্তা ভারতীয় আর্য্যের পুরাতন সম্পদ্। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মনুষ্য যে সময় বন্য পশুর মত জীবন যাপন করিয়াছে, ভারতবর্ষের হিন্দু, ভগবান্ অনন্ত-

সাধকের নিকট পিতৃভাবে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তির * নাম শিব-শঙ্কর, হর-বিশ্বেশ্বর; আর যে মূর্ত্তিতে, মাতৃভাবে আবির্ভূত হইয়া, মনুষ্যকে মাতৃস্নেহের চরম-সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে চরিতার্থ করিয়াছেন, সেই মূর্ত্তির নাম উমা।

উমা প্রথমতঃ প্রজাপতি দক্ষের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হইয়াছিল সতী। রমণী, পতিপ্রাণা সতী হইলে, সংসারে কি প্রকারে জীবন যাপন করিবে, তিনি তাঁহার সতী মূর্ত্তিতে তাহাই জীবিত চিত্রে আঁকিয়া দেখান; এবং দক্ষ-যজ্ঞে, কানে পতিনিন্দা শুনিয়া, প্রাণে তাহা সহিল না বলিয়া, জলন্ত অনলে জীবন-বিসর্জ্জনের দ্বারা, জগতে আদর্শ সতী নামে জীবের আরাধ্য হন। * সেই সতীই পুনরায়, হিমালয় পর্ব্বতে, হিমাদ্রির অধিপতি গিরিরাজ-গৃহে, মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া উমা নামে অভিহিত হন; এবং জগৎপিতা বিশ্বেশ্বরকে, লোকলীলার প্রকট পদ্ধতিতে, পতিরূপে বরণ করিয়া, দেবতা ও মনুষ্যকে প্রেমের আরাধনা বিষয়ে শিক্ষা দেন।

উমা, কালিদাস ও কবিগুণাকর উভয়েরই, ইষ্টদেবতা। কালিদাস তদগত শৈব ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। ভারতচন্দ্রও শিব-শক্তির সুপরিচিত উপাসক। কালিদাস, তাঁহার রঘুবংশের আরম্ভে, ইষ্টদেবতার স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে,
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।

অর্থাৎ,—

“নমি আমি জগতের জনক-জননী,
ভবেশ-শঙ্কর আর পর্ব্বত-নন্দিনী।

দেবকে সেই সময়েই পিতা ও মাতা জ্ঞানে পূজা করিয়া, জীবনে কৃতার্থ হইয়াছে। ইহার প্রমাণ বৈদিক-সাহিত্য। যথা,—

“পিতা নোঽসি পিতা নোবোধি”

এই “পিতা নোঽসি” অর্থাৎ “পিতা নস্” মন্ত্রই লাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ক্যাথলিকদিগের—Pater Noster—“পেতর নস্তর” নামক সুবিখ্যাত জপ-মন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ভট্ট মোক্ষমুলোরের মতে, খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রার্থনামন্ত্র—“Our Father in Heaven”—বৈদিক Dyaus Pitar—“দ্যায়ুস্ পিতর,” গ্রীক Zeu Pater এবং লাটিন Jupiter নামের রূপান্তরিত অবস্থা। Vide Max Muller's Lectures on the Science of Religion. ভারতীয় আর্য্যের প্রাতঃস্মরণীয় গায়ত্রীমন্ত্রেরও মৌলিক অর্থ—সবিতা—পিতা—“ত[illegible]বরেণ্যং।

* “রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যং।”

অপিচ——

“নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায়চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

* অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা,
দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্ব-পত্নী।
সতী সতী যোগ-বিসৃষ্টদেহা,
তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥
(কুমার সম্ভব)

নিরন্তর যুক্ত যাঁরা বাক্য-অর্থ প্রায়,
বাক্য-অর্থ-জ্ঞান লভি যাঁদের কৃপায়।"*

ভারতচন্দ্রও, উমামূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া, গদ্গদ কণ্ঠে বলিয়াছেন—

"উমা দয়া কর গো। বিষম শমন ভয় হর গো।
পাপেতে জড়িত মতি, কাতর হয়েছি অতি,
পতিতপাবনী নাম ধর গো।
মা বলিয়া ডাকি ঘন, শুনিয়া না দেহ মন,
গুহ-গজাননে বুঝি ডর গো।
তুমি গো তারিণী তারা, অসার সংসার-সারা,
নানারূপে চরাচরে চর গো।

কালিদাস সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর মত, তাঁহার কাব্যের সূচনায়, সর্ব্ব-প্রথমে, উমার জন্ম-স্থান-স্বরূপ গিরিপ্রদেশের চিত্রপট দেখাইয়াছেন। কবিগুণাকর তাহা দেখান নাই। কিন্তু উমা, বিশ্বেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়া, হিমাদ্রির যে প্রদেশে, শেষে, প্রতিষ্ঠিত-দেবতার ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন, কবিগুণাকর সেই কৈলাশ-শিখরের বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কৈলাশ-বর্ণন হইতে এ স্থলে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিব। পাঠক ইহার সহিত কালিদাসের হিমাদ্রি-বর্ণন মিলাইয়া পড়িতে পারিবেন। মিলাইয়া পড়িলে, কাহার কল্পনা কোন্ পথে বিচরণ করিতে স্ফূর্ত্তি বোধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

"কৈলাশ-ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস
* * *
তরু নানা জাতি, লতা নানা ভাতি,
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ,
নানা-পশু-সুশোভিত॥
অতি উচ্চ-তরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল কুহরে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল,
কেশরী হস্তি-রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে, *
ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কেহ না হিংসয়ে কারে।

---

* পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস মহাশয়ের বঙ্গানুদিত রঘুবংশ হইতে গৃহীত।

রঘুবংশের বিশ্রুতনামা টীকাকার কালিদাস-কাব্য-ভক্ত মহামহোপাধ্যায় মল্লিনাথও ভগবান্‌কে, কালিদাসেরই ভাবানুসরণে, একই তনুতে মাতা ও পিতা জ্ঞানে, উপাসনা করিতেন। যথা,—

"মাতাপিতৃভ্যাং জগতো নমো বামার্দ্ধজানয়ে,
সদ্যোদক্ষিণদৃক্‌পাত-সংকুচদ্বামদৃষ্টয়ে।"

* কবিগুণাকরের এই পংক্তিনিচয় পাঠ করিবার সময়ে সকলেরই কালিদাসের লেখা মনে পড়িবে। যথা,—

"অবাঙ্মুখো জিহ্মগতিঃ শ্বসন্মুহুঃ
ফণী ময়ূরস্য তলে নিষীদতি।"
"ন হস্ত্যাদূরেপি গজান্ মৃগেশ্বরো
বিলোল-জিহ্বশ্চলিতাগ্রকেশরঃ।"
ইত্যাদি।

যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার সংসারে ॥

কবিগুণাকরের এ বর্ণনায় উদাত্ত সৌন্দর্য্য ও উচ্চতার কোন লক্ষণ না থাকিলেও, ইহা সরল, সুন্দর ও মধুর। তখনকার অর্দ্ধস্ফুট অথবা ফোটো ফোটো বাঙ্গালায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রচনা সম্ভবে না। ইহার আর এক গুণ ভাব ও শব্দের সুরোচক-সুশ্লীলতা। কবি মা উমাকে যেমন মাতৃভাবে চিন্তা করিয়াছেন, মায়ের লীলা-বিলাস-স্থানকেও সেইরূপ প্রশান্ত-রস-ব্যঞ্জক পবিত্র শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে, তিনি কখনও পর্ব্বতের দিগন্ত-বিসারি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ও প্রীতিভয়াবহ বিচিত্র শোভা চক্ষে দেখিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

কালিদাসের রচনায় রুচির সুশ্লীলতা স্থানে স্থানে একটুকু বিঘ্নিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র যে দোষ, হিমাদ্রি-বর্ণনায়ও সে দোষের প্রক্ষেপ আছে। শেক্ষপীরের রচনায়ও এরূপ দোষের অভাব নাই। ইহা কালের ধর্ম্ম এবং তদানীন্তন কাব্যের অঙ্গীভূত! কিন্তু চন্দ্রের নয়ন-শীতল জ্যোৎস্নারাশির মধ্যে চিরসঙ্গি কলঙ্করেখাটুকু যেমন একবারে ডুবিয়া যায়, কাব্যময় গুণ-রাশির মধ্যে উল্লিখিত প্রকার সামান্য একটুকু দোষও যে সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে লুক্কায়িত রহে, কালিদাস আপনিই তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি হিমাদ্রির রত্ন-সম্পদ-বর্ণনায় কবি অকবি, সাধু অসাধু, এবং সর্ব্বশ্রেণিস্থ মনুষ্যের সদাশয় বন্ধুরূপে, বন্ধুজনোচিত স্নেহের ভাষায়, ভঙ্গি-ক্রমে কহিয়াছেন,—

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥

অর্থাৎ—

"অনন্ত রত্নের খনি খ্যাত হিমালয়,
হিমে কি করিবে হানি সৌভাগ্যের তার?
বহু গুণে এক দোষ, লীন হ'য়ে রয়,
জ্যোৎস্নাতে কলঙ্করেখা যথা চন্দ্রমার।"

আমরাও এই কথাই বলিয়া থাকি। কালিদাসের রচনা, ভাবের উচ্চতা ও গৌরবে, হিমাদ্রি তুল্য; এবং শব্দসৌন্দর্য্য, উপমা ও অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অন্যবিধ উজ্জ্বল রত্নসম্পদেও অনন্ত-রত্ন-প্রভব হিমাদ্রির সমান। উহাতে প্রাচীন-প্রথানুমোদিত লালসা-বিলসিত প্রেম-রসের একটুকু বেশী প্রক্ষেপ থাকিলেও, সে দোষ মানুষের চক্ষে পড়ে না। এই এক দোষের কথা পরিত্যাগ করিলে, কালিদাসের হিমাদ্রিবর্ণনা, কালিদাসের লেখনীরই উপযুক্ত।—"রাম-রাবণয়োর্যুদ্ধং রাম-রাবণয়োরিব।"

কালিদাসের ভাষার কথা কহিব না। যে সংস্কৃতভাষা, জটাজুটমণ্ডিত বৈদিক সাহিত্যের দুর্লঙ্ঘ্য শৈল-শৃঙ্গ সকল অতিক্রম করিয়া, বাল্মীকির বিশাল-হৃদয়-রূপ ব্রহ্মনির্ঝর হইতে স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় তর-তর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং ব্যাসের সময়ে কৃষ্ণলীলার প্রেমময় যমুনায় সম্মিলিত হইয়া,

অপূর্ব্ব শোভা ও সামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছে; সেই সংস্কৃতভাষা সৌভাগ্যবান্ কালিদাসের সময়ে, শত-মুখ-প্রসারিণী, বিচিত্র-তরঙ্গ-বিলাসিনী, বিপুলা স্রোতস্বিনী। তখন সংস্কৃতে যাহা কিছু লিখিত হয়, তাহাই কবিতার সৌন্দর্য্যে লোক-হৃদয় মোহন করে; এবং সে কবিতা যখন কালিদাসের মত কবির কণ্ঠে স্ফুরিত হয়, তখন সন্তাপ-দগ্ধ বৃদ্ধও, হৃদয়ে কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া, ক্ষণকাল আত্মবিস্মৃত রহে। সুতরাং, কালিদাসের কবিতা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অথবা উদার-মাধুর্য্য বর্ণনায় কিরূপ অলৌকিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, পাঠক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। কালিদাস হিমাদ্রির বর্ণনায় প্রথমেই বলিতেছেন,—

> অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
> হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
> পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
> স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

অর্থাৎ—

> বিরাজে উত্তর দিকে দেবাত্মা ভূধর—
> নগ কুল-অধিরাজ,—নাম হিমালয়,
> অবগাহি পূর্ব্ব আর পশ্চিম সাগর,
> পৃথিবীর মান-দণ্ড-সম শোভাময়।*

কালিদাস তাঁহার এই একটি কবিতায় পাঠকের হৃদয়ে হিমাদ্রির বিরাট্ মূর্ত্তি ও বিস্ময়াবহ সৌন্দর্য্যের যেরূপ একটা আশ্চর্য্য ভাব দৃঢ় মুদ্রিত করিয়াছেন, অন্য কোন কবি এক শত কবিতায় তাহা পারেন কি না, সন্দেহ। কেন না, এই একটি স্ফুট ভাবের মধ্যে অসংখ্য অস্ফুট ভাব, অঙ্কুরের মধ্যে অতি বৃহৎ তরুর ন্যায়, নিহিত রহিয়াছে। হিমাদ্রি, পূর্ব্ব আর পশ্চিম এই দুই দিকের দুই সাগরকে আপনার পাদ-প্রান্তে স্পর্শ করিয়া, পৃথিবীর মান দণ্ডের ন্যায় বিরাজিত রহিয়াছেন, এই একটি মাত্র কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে, মনুষ্যের মন মুহূর্ত্তকাল পৃথিবীর সকল কথা ভুলিয়া যায়; এবং পক্ষিণীর ন্যায়, কল্পনার নভোমণ্ডলে উড়িয়া উড়িয়া, আপনার অজ্ঞাতসারে, সৌন্দর্য্যের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করে। উমা যদি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, তবে এহেন হিমাদ্রিই তাঁহার উপযুক্ত জন্মস্থান।

হিমাদ্রি বলিলে এখনকার পাঠকের মনে দারজিলিং, দেরাদুন, মশুরী, শিমলা ও তিব্বত প্রভৃতি শৈল-প্রদেশের নানা কথা মনে পড়ে। আর মনে পড়ে ডোঙ্গা, ডাণ্ডী, এক্কা, ও একশা প্রভৃতি বিবিধ পার্ব্বত্য যান, এবং ভুটিয়া ও লাপ্‌চা প্রভৃতি হৃষ্ট-পুষ্ট পার্ব্বতীয় জাতিসমূহের বিবিধ শ্রেণিস্থ নর-নারী। কালিদাসের হিমাদ্রি, সাধারণতঃ, মনুষ্যের অগম্য দেব-ভূমি। অপ্সর, কিন্নর, বিদ্যাধর

---

* এই প্রবন্ধে কুমারসম্ভবের যে সকল বঙ্গানুদিত কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সমস্তই বান্ধবের সহকারিসম্পাদক শ্রীমান্ উমেশচন্দ্র বসুর রচনা। কালিদাসি কবিতার বাঙ্গালা অনুবাদ অতি কঠিন কার্য্য। উমেশচন্দ্রের অনুবাদ কোন অংশেও উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এমন কথা আমি বলিতে পারি না। তবে, যতদূর সম্ভব, অর্থানুগামি হইয়াছে।

ও সিদ্ধতাপসেরা সে স্থানে অবস্থান করেন। দেব-রমণীরা সেখানে, ধবল-মেঘ-বক্ষে, সিন্দূর-গৈরিক প্রভৃতি ধাতুনিচয়ের আলোহিত প্রতিবিম্ব দর্শনে, অকাল-সন্ধ্যা-ভ্রমে, সান্ধ্য-বিলাস-সমুচিত আভরণের জন্য অধীর হন। সিদ্ধ-তাপসেরা সেখানে, হিমাদ্রির নিম্নতর সানুতে মেঘের ধারাবর্ষণে ক্লিষ্ট হইয়া, ভানুদীপ্ত উচ্চতর শৃঙ্গে আশ্রয় লন। বন্য গজেরা সেখানে, মনের উল্লাসে, ঘুরিয়া বেড়ায়;—বন-ভূমির ভয়াস্পদ সিংহেরা সুযোগ পাইলেই গজ-শিরো-বিদারণের দ্বারা আপনাদিগের ক্ষুৎ-পিপাসার চরিতার্থতা করে; এবং বনেচর কিরাতেরা ঘনীভূত তুষার রাশির মধ্যে সিংহের পদাঙ্করেখা খুঁজিয়া লইতে অসমর্থ হইলেও, উহাদিগের নখ-রন্ধ্র-মুক্ত গজমুক্তা দর্শনেই, অনুসন্ধানের উপযুক্ত পথ পায়। গিরিদরীসমুত্থিত সমীর সেখানে, কীচক-বংশ-নিচয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, সুগম্ভীর শোঁ শোঁ শব্দে কেমন এক আনন্দ জন্মায়; এবং দেব-গায়ক কিন্নরেরা যখন গান্ধার গ্রামে কণ্ঠ তুলিয়া দেব-গীতি গান করে, তখন মনে লয়, ঐ সমীর-শব্দিত বংশ-নিঃস্বনেই তাহাদিগের তান-প্রদ বাঁশীর কাজ হইয়া যায়। কবি-কুল-ভূষণ কালিদাস এইরূপে অল্প কএকটি কবিতায় কত কথাই কহিয়াছেন, পাঠক নিম্নোদ্ধৃত অনুবাদে তাহার কতকটা পরিচয় পাইবেন। যথা—

( ৪ )

সিন্দুর-গৈরিক-ধাতু ধরে সে চূড়ায়,
অকাল-সন্ধ্যার মত—খণ্ড মেঘদলে
বিম্বিত সে ধাতু-রাগ;—সন্ধ্যা ভ্রমে তায়,
বিভ্রম-ভূষণ * পরে অপ্সরা সকলে।

( ৫ )

মেখলা-সমীপে তার মেঘ মালা শোভে,
নিম্ন শৃঙ্গে-ছয়াসুখ লভে সিদ্ধগণ,
বৃষ্টিজলে ক্লিষ্ট যবে, করে তারা সবে
ভানুদীপ্ত উচ্চ শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ।

( ৬ )

তুষার-স্রবণে ধৌত,—না হেরি নয়নে,
শোণিতাক্ত পদ-চিহ্ন, কিরাত নিচয়
করে হেথা, নখ-মুক্ত § মুক্তা দরশনে,
গজঘাতী কেশরীর পথ পরিচয়।

( ৭ )

প্রণয়-লিপির হেথা সাধে প্রয়োজন,
দ্রব-ধাতু-রসে লেখা বর্ণ মনোরম—

* মল্লিনাথ প্রভৃতির মতে 'বিভ্রম-ভূষণ' এই শব্দটি কালিদাস কর্তৃক দুইটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অনুমিত হয়। এক অর্থ—বিলাস-ভূষণ, অর্থাৎ বিলাস-লীলার উপযোগি বিবিধ রমণীয় আভরণ। দ্বিতীয় অর্থ—গলায় চন্দ্রহার পরার মত ত্বরাজনিত-ভ্রমবশতঃ অসঙ্গত ভূষণ।

§ কেশরীর নখ-রন্ধ্র-মুক্ত গজমুক্তা, কল্পিত বস্তু হইলেও, কবিকল্পনায় চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার নাম কবি-প্রসিদ্ধি। ইয়ুরোপের বৈজ্ঞানিক কবিরাও আবহমান কবি-প্রসিদ্ধির আনুগত্য হইতে একবারে মুক্তি পান নাই। যথা—প্রেম-লালসার পোষণ অথবা শোষণে পুষ্প-বিশেষের বিশেষ গুণ, ইন্দ্রধনু দর্শনে আশার সাফল্য

ভূর্জ্জপত্রে,—লিখে যাহে বিদ্যাধরীগণ;—
রক্ত-বিন্দুময় উহা গজ-বিন্দু * সম।

( ৮ )

গুহা-মুখ হ'তে তার উত্থিত সমীরে
পূরিছে সতত § বেণু-বংশ-রন্ধ্র-স্থান,—
গান্ধার-গ্রামের গীতে কিন্নর-নিকরে
চাহে যেন গিরিবর যোগাইতে তান।

( ৯ )

গজ-যূথ, ঘুচাইতে গণ্ড-কণ্ডূয়ন,
ঘরষে কপোল যবে শাল-তরু-দেহে,
নির্য্যাস-ক্ষরণে জন্মে সৌরভ এমন,
সানুচয় শৈলেশের সুরভিত রহে।

( ১০ )

চামরীরা চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—
প্রীত চন্দ্র-কর-শুভ্র-পুচ্ছ-আন্দোলনে;—
হিমাদ্রির গিরিরাজ এই নাম তায়,
সর্ব্বথা সার্থক হয় সে চারু-ব্যজনে!

* গজ-দেহে, বয়োবিশেষে, একপ্রকার লাল বিন্দু ফোটে। তাহাকে পুরাতন কবিরা গজ-বিন্দু, কুঞ্জর-বিন্দু, পদ্মক ও বিন্দু-জালক প্রভৃতি নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ভোজ পাতার উপর লাল আখর পড়িলে, উহা গজ-বিন্দুর মতই দেখায় বটে।

§ পর্ব্বতে একপ্রকার বাঁশ আছে, তাহার নাম বেণু অথবা কীচক। পর্ব্বতের বায়ু, কীচক অর্থাৎ বেণুর অঙ্গগত রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া, অতি উদাত্তমধুর, গম্ভীর বংশি-ধ্বনির মত ধ্বনিত হইয়া থাকে। যথা অম-রাভিধানে—"কীচকা বেণবস্তেস্যু র্যে স্বনন্ত্য-নিলোদ্ধতাঃ।"

( ১১ )

কাঁপাইয়ে দেবদারু, হেথা সমীরণ
বহে গঙ্গানির্ঝরের কণা মাখি গায়,—
ব্যাধ-কটি-শিখি-পুচ্ছ করে সঞ্চালন;
মৃগ চৌরি ক্লান্ত ব্যাধ শ্রান্তি হরে তায়।

( ১২ )

শীর্ষ-সরোবরে তার জন্মে যে নলিনী,
স্বহস্তে তুলিয়া তাহা নেয় সপ্তঋষি;
অবশেষ যাহা, অধশ্চর দিনমণি
উন্মেষে, ঊরধ-মুখ ময়ূখ বিকাশি।

নব্য পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে এখানে বঙ্গের নূতন কবি, পাশ্চাত্য-ভাবাবিষ্ট—পাশ্চাত্য-শিক্ষাপুষ্ট মহিমময় মধুসূদনের ধবল-গিরি-বর্ণনা স্মরণ করিতে চাহিবেন। মধুসূদন, ধবল-গিরির বর্ণনায়, মিল্টনের ছন্দে গাইয়াছেন,—

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে,—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ-দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
যেন উর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্র-বেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয় যোগী! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচল-ভালে শোভে যে সকল,
( যেন মরকতময় কনক কিরীট )
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথ্বীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয়! * * *

কিন্তু সহৃদয় পাঠকের এখানে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, মধুসূদন ও কালিদাসের প্রয়োজন

বিভিন্ন প্রকারের। মধুসূদনের প্রয়োজন সুখ-সৌরভ-সম্পর্ক-শূন্য বিষাদভূমিতে স্বর্গভ্রষ্ট সুরপতির অবতারণ; আর কালিদাসের প্রয়োজন আনন্দ-লীলাময় দেবধামে দেব-নর-সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বাদির আরাধ্যা জগন্মাতা উমার জন্ম ও জীবনের অপরূপ আলোকময় পট-প্রদর্শন। মধুসূদনের ধবল-গিরি, নিকুঞ্জ, কানন এবং তরুরাজি ও লতাবলীর মুকুল-কুসুম-সম্পর্কশূন্য শ্মশানভূমির মত। কালিদাসের হিমাদ্রি, ভ্রমর-গুঞ্জিত মুগ্ধ-নিকুঞ্জে, এবং তরুলতা-শোভিত ও কোকিলাদি-মধুর-কণ্ঠ বিহগ-কিন্নর-কুংরিত রম্যকাননে, নানা স্থানে পরিপূর্ণ। মধুসূদনের ধবল-গিরিতে, ইন্দ্র ধ্যানস্তিমিতবৎ, নিশ্চেষ্ট অবস্থায়, একাকী বসিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবেন। কালিদাসের হিমাদ্রিতে, কুঞ্জকুসুম-বিলাসী জগদুন্মাদন মদন স্বয়ং, তাঁহার সখা মাধব, সঙ্গিনী রতি, ও ললিত-ললনা-ভ্রূলতা-স্পর্দ্ধি কুসুম-ধনু সঙ্গে লইয়া, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের জন্য, উপযুক্ত সময়ে আবির্ভূত হইবেন। সুতরাং, প্রয়োজনের অতি গুরুতর পার্থক্যবশতঃই বর্ণনার পার্থক্য। কালিদাস যদি তাঁহার হিমাদ্রিধামকে, ঘুণাক্ষরেও, বিরস-বিষাদের বর্ণে চিত্র করিতেন, তাহা হইলে জগতের সাহিত্য, আজি সম্ভবতঃ, আর এক সামগ্রীতে সম্পুষ্ট রহিত; কখনও কুমারসম্ভব অথবা উমাপরিণয়রূপ জগদ্দুর্লভ মহাকাব্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইত না।

কালিদাসের হিমাদ্রি, পর্ব্বত হইলেও, পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—শরীরবদ্ধ দেব-পুরুষ। তাঁহার রমণীয় প্রাসাদ আছে। প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দেব-ভোগ্য বৈভবের সর্ব্বপ্রকার সম্ভার আছে। প্রাসাদের অদূরে উপবন ও তপোবন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে 'মুনিদিগেরও মাননীয়া' মহিষী মেনকা ও অসংখ্য সুখ-বিলাসিনী দেব-রমণী। পুনরপি বলিতেছি, কালিদাস মধুসূদনের পথ লইলে, নিশ্চয়ই আর এক পদার্থের সৃষ্টি হইত; কুমারসম্ভব হইত না।

কালিদাসের উমা, কালের পরিপূর্ণতায়, মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। কবি-গুণাকর উমার জন্মপ্রসঙ্গে কিছুই লেখেন নাই। তাঁহার অন্নদামঙ্গলে এইমাত্র আছে,——

"উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা ল'য়ে যতেক অমর॥
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেব-দেব শিব।
শিব হৈলা শক্তিহীন কেবা কি করিব॥
নানা মত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব॥
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা।
মহামায়া হিমালয়-আলয়ে জন্মিলা॥"

কালিদাস আকাশ-বাণীর আশ্রয় লন নাই, লৌকিক পদ্ধতির আশ্রয় লইয়াছেন; —লৌকিকের সহিত অলৌকিকের অত্যল্প অংশ অতি সুচারু কৌশলে মিশাইয়া উচ্চ অঙ্গের কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং, সমৃদ্ধ ও সৌভাগ্যসম্পন্ন রাজাধিরাজের ঘরে অলোকসামান্য-রূপশালিনী জগন্মোহিনী কন্যা জন্মিলে, যেপ্রকার আনন্দের উচ্ছ্বাস হইয়া

থাকে, গিরিরাজগৃহে উমার জন্মগ্রহণেও সেই প্রকার লৌকিক আনন্দ, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটুকু লোকত্তর-লীলাময় দিব্যানন্দ। যথা—

নিরমল দিক্ দশ, শঙ্খস্বনান্তরে
মুহুঃ পুষ্প বরিষণ,—বায়ু রজোহীন,
স্থাবর-জঙ্গমময় সর্ব্ব-জীব তরে
অপার আনন্দহেতু উমা-জন্মদিন।

বিদূর-পর্ব্বত-ভূমি, * নব-ঘন-স্বনে,
শোভে, নব-রত্নাঙ্কুর ফুটিলে যেমতি,
স্ফুরন্ত-প্রভার প্রায় তনয়া-রতনে,
জননী মেনাও আজি শোভিলা তেমতি।

পিতা আদি বন্ধুজনে বন্ধুবৎসলারে,
ডাকিলা পার্ব্বতী এই কৌলিক-আখ্যানে;
লভিলা সুমুখী উমা এই নাম পরে,
"উ—মা,"এ নিষেধে মার,তপ-আচরণে। ‡

* পৌরাণিকেরা কহিয়া থাকেন যে, বিদুর নামে এক পর্ব্বত আছে। উহার প্রান্তভূমিকে বিদূরভূমি কহে। সে স্থলে নূতন মেঘের গর্জ্জনে নানাপ্রকার রত্ন ও মণি আপনা হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উদ্গত হয়। কবিবর মাবও, কালিদাসের অনুকরণে, এই পৌরাণিকী কথার অনুসরণে, উপাদেয় কবিতা লিখিয়াছেন।

‡ উ—মা শব্দের প্রকৃত অর্থ "না গো না।" কথিত আছে, মা উমা যখন, মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য, হিমাদ্রির বিজন-প্রদেশে বন-ভূমিতে যাইয়া, তপস্বিনীর ন্যায় কঠোর তপশ্চরণে কৃতসংকল্প হন, তখন মেনকা মা উমাকে মাতৃস্নেহে বুকে সাপটিয়া লইয়া, আদর করিয়া বলিয়াছিলেন,—"উ—মা", "না গো না"—তা কি হয়? তোমার এ কোমল শরীরে কি তপস্যার কঠোর শ্রম সম্ভবে? পার্ব্বতী সেই হইতেই উমা নামে প্রকীর্ত্তিতা। এ কথা কালিকাপুরাণেও আছে। কালিকাপুরাণ আর কুমারসম্ভব, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত পুরাতন, তাহা নির্ণয় করা আমাদিগের পক্ষে অসাধ্য।

কালিদাস, জগন্মাতা উমার জন্ম, জাতকর্ম্ম ও নামকরণের বর্ণনায়, তিন চারিটি শ্লোকে ভক্তি, * বিস্ময় ও বাৎসল্য-রসের কিরূপ মধুর-মৃদুল ও হৃদয়হারি মিশ্রণ ফলাইয়াছেন, পাঠক, তাহা দেখিতে পাইতেছেন। বঙ্গের কবিগুণাকর সে পথে যান নাই;—সে পথে যাইতে কল্পনারও আশ্রয় পান নাই। তিনি অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

"উ' শব্দে বুঝহ শিব, 'মা' শব্দে শ্রী তাঁর।
বুঝিয়া মেনকা 'উমা' নাম কৈলা সার॥"

কবিগুণাকরের নাম-ব্যাখ্যা পুরাণ-প্রচলিত শব্দশাস্ত্রানুসারে অধিকতর সঙ্গত বটে। কেন না, পৌরাণিকেরা ওঁ কারের

* পুরাতন আলঙ্কারিকদিগের মধ্যে অনেকেই ভক্তিকে নবরসের মধ্যে একটি মুখ্য রস বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ইহা সাহিত্যজগতের অসীম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আধুনিকেরা ভক্তিকে কাব্যের সর্ব্বপ্রধান রস বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

ব্যাখায় 'উ' শব্দকে শিব-বাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং 'মা' শব্দকে স্থানান্তরে শ্রী, কান্তি ও শক্তি প্রভৃতি অর্থদ্যোতক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা,—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারস্তু স্মৃতো ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়ার্থকঃ।"

কিন্তু, তথাপি সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, 'উমা' নামের উচ্চারণে, কালিদাসের ব্যাখ্যা হৃদয়কে যেরূপ স্নেহমাখা ভক্তির উচ্ছ্বাসে আকুল করিয়া তুলে, কবিগুণাকরের ব্যাখ্যায় তাহা সম্ভবে না। 'উমা' নাম-প্রসঙ্গে, বঙ্গে বহু সহস্র অশ্রু-লিখিত আগমনী গীতি, যার-পর-নাই মধুর ভাষায় বিরচিত হইয়া, মনুষ্যের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত রহিয়াছে; এবং এ দেশের শারদীয় উৎসবেও, সেই মাতৃভাব ও দুহিতৃভাবেরই সুখাবহ-মিশ্রণে, জয়-জয়-কোলাহল-সহকারে, ভক্তি-স্নেহের অশ্রুসিক্ত পুষ্পোপচারে, সর্ব্বত্র উমার পূজা হইতেছে। সে মিশ্রভাবের আরাধ্য দেবতা, একই মূর্ত্তিতে, মা ও মেয়ে। কালিদাসের উমাও মা ও মেয়ে;—ভক্তির দিকে জগদাদিভূতা—জগন্নারী—জগন্মাতা;—স্নেহের দিকে সমস্ত সুকুমার-ভাব-সমন্বিতা—সুশীলা,—সুকোমলা—প্রাণ-প্রতিম-স্নেহাস্পদা,—প্রাণাধিকা দুহিতা। ইতি প্রথমঃ প্রবন্ধঃ।

মহাকবি-মাঘকৃত

# শিশুপাল বধ।

## দ্বিতীয় সর্গ।

"কার্য্য ও কারণে কৃত মিত্র, অরি
হয় চিরতরে সে হিতাহিতকারী; *
অরি কি বান্ধব সহজ প্রাকৃত
প্রয়োজন মতে করে হিতাহিত। ‡ ৩৬

উপকারী অরি সন্ধির ভাজন,
সন্ধিযোগ্য নহে মিত্র অপকারী,
উপকারে হয় মিত্রতা-কারণ
অপকার সদা মিত্র-ভাব হারী। ৩৭

"রুক্মিণীকে তুমি হরিয়া, মুরারি,
করিয়াছ শিশুপাল-অপকার,—
বৈর-তরুমূল এ জগতে নারী;
তাই সে বিষম অরাতি তোমার। ৩৮

"নরকে জিনিতে গিয়াছিলে যবে *
রোধিল সে আসি পুরী দ্বারকার,

* এবম্প্রকার কৃত বা কৃত্রিম মিত্র ও শত্রু পরিবর্ত্তনশীল নহে। ৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

‡ সহজ কিংবা প্রাকৃত মিত্র ও শত্রু বদ্ধমূল ও চিরস্থায়ী নহে।

* নরক—ভূমি হইতে প্রসূত দৈত্য বিশেষ, অপর নাম ভৌম।

নৈশ তমোরাশি, রবির অভাবে
গ্রাসে যথা আসি সুমেরু-গুহায়। ৩৯

"হরিল সে বলে বভ্রুর রমণী *
সে কথা আলাপে নাহি প্রয়োজন
কে না জানে মুখে পাপের কাহিনী
আনিলেও হয় অশুভ কারণ? ৪০

"করিয়াছ তুমি অনিষ্ট তাহার,
সেও আমাদের কৈল অপকার;
সহজ বান্ধব পিতৃশ্বসা-সুত
কৃত্রিম শত্রুতে তাই পরিণত। † ৪১

"প্রথমে শত্রুতা করিয়া বিধান
উদাসীন ভাবে রহে যেই জন।
শুষ্ক তৃণে অগ্নি করিয়া প্রদান
বায়ু অভিমুখে করে সে শয়ন। ৪২

"ক্ষুদ্র অপরাধ হ'লে বার বার,
কিম্বা একবার গুরু অপকার
সহে ক্ষমাশীল; কিন্তু বারে বারে
গুরু অপরাধ কে সহিতে পারে? ৪৩

"সময়ে নারীর লজ্জার মতন
ক্ষমা পুরুষের পরম ভূষণ;
শত্রু আক্রমিলে দেখাবে বিক্রম
বিহারে নারীর শোভে কি সরম? ৪৪ §

"সহি শত্রু হ'তে অবজ্ঞা পীড়ন
বহে যে অভাগা ঘৃণিত জীবন
মাতৃ-ক্লেশকর জনম তাহার,
বহিলা জননী বৃথা তার ভার! ৪৫

"পদাঘাতে উঠি যে ধূলি উপরে
করে আরোহণ প্রহারক-শিরে,
তা হ'তে অধম সে জন নিশ্চয়
শত্রুপদাঘাতে স্থির যেই রয়। ৪৬

"জাতি ক্রিয়া গুণে অক্ষম যে জন,
সাধিতে সুকৃতি আদি প্রয়োজন;
নিরর্থক উচ্চারিত শব্দ প্রায়
নাম সার তার জনম ধরায়। ৪৭

"গিরি উচ্চ বটে, নহে ত গভীর,
সিন্ধু সুগভীর, উচ্চতা কোথায়?
উচ্চও গভীর মনস্বী সুধীর
কে আছে এমন লঙ্ঘিবে তাঁহায়?" ৪৮

সম অপরাধী যদিও উভয়, *
প্রচণ্ড বলিয়া বিলম্বে ভাস্করে
গ্রাস করে রাহু সিংহিকা তনয়,
মৃদু বলি আশু গ্রাসে হিমাংশুরে। † ৪৯

"সামান্য শত্রুরে করি দরশন
প্রণমে সভয়ে কাপুরুষগণ,

* বভ্রু—যদুবংশীয় ব্যক্তি বিশেষ।

† শিশুপাল—চেদী রাজ দমঘোষের পুত্র। তাঁহার মাতা কৃষ্ণের পিতৃশ্বসা ছিলেন।

§ বিহারে নৃত্যগীতাদি সময়ে।

* সমুদ্র মন্থন কালে অমৃত বণ্টন বিষয়ে রাহুর কাছে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই সম দোষী।

† চন্দ্র গ্রহণ অতি শীঘ্র হয়। সূর্য্য গ্রহণ বিলম্বে হইয়া থাকে।

দুর্ব্বলতা রূপী তৃণের সংহতি
সামান্য পবনে প্রণত যেমতি। ৫০

রহিলেও দূরে তেজস্বী প্রবর,
তেজীগণ মাঝে তাঁহার গণন,
পঞ্চমাগ্নি বলি খ্যাত দিবাকর
পঞ্চ অগ্নি মাঝে তপস্যা কারণ। * ৫১

"বীরের বাঞ্ছিতা সুকীর্ত্তি কেমনে
উঠিবে আকাশে আশ্রয় বিহীন
নিজপদ যদি রাখিতে না পারে
হেলায় শত্রুর সমুন্নত শিরে § ? ৫২

"অতি দয়াবশে মৃগ কোলে করি
কলঙ্কী মৃগাঙ্ক জানে সর্ব্বজন,
বধি মৃগযূথে নিষ্ঠুর কেশরী
মৃগেন্দ্র বলিয়া যশের ভাজন ? ৫৩

যে রিপুর প্রতি দণ্ড সমুচিত,
ক্ষমার প্রয়োগে হয় অপকার;
ঘর্ম্মের উদ্যম যে জরে বিহিত
জল-সেকে তাহে জনমে বিকার। ৫৪

"রোষ কলুষিত বদ্ধ-বৈর অরি
প্রিয় বাক্যে হয় অধিক কুপিত,
সহসা উত্তপ্ত ঘৃতের উপরি
জলবিন্দু পাতে হয় প্রজ্বলিত। ৫৫

* পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যায় সূর্য্য পঞ্চম অগ্নি বলিয়া গণ্য।

§ শত্রু দমন না করিলে বীরের আকাশ-ব্যাপি যশঃ হয় না।

"সন্ধিবুদ্ধ আদি যে সচিবগণ
অযথা প্রয়োগে কার্য্য হানি করে
শত্রুরূপী তারা দোষের কারণ
তাদেরে নৃপতি ত্যজিবে অচিরে। ৫৬

"আছে সেনা মাঝে অপ্রমেয় বল,
অথচ সে রিপু এবে বন্ধুহীন *
এ উভ কারণে সচিবের দল
আহ্বানিছে রণে; কেন উদাসীন? ৫৭

"এ যাদব সেনা পয়োনিধি প্রায়
অলঙ্ঘ্য, ত্রিলোক লঙ্ঘিবারে পারে!
একা তব ক্ষমা রোধিয়াছে তায়
যথা তীরভূমি রোধে পারাবারে †। ৫৮

"হবে জয়ী, নিজ সেনার বিজয়ে
সাক্ষীরূপে তুমি করি অধিষ্ঠান
সাংখ্যের পুরুষ উদাসীন হ'য়ে
প্রকৃতির ভোগে হয় ভোগবান্ * ৫৯

"ভীম হস্তে হত জরাসন্ধ বীর
এত দিন পরে বান্ধব-বিহীন
হ'য়ে শিশুপাল শোকেতে অস্থির;
পরাজয় তরে নহে সুকঠিন। ৬০

"আক্রমিবে অরি বিপন্ন যখন
এ নীতি বীরের লজ্জার কারণ;

* শত্রুকে সহায়হীন অবস্থায় আক্রমণ করা নীতি সঙ্গত। ৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† সমুদ্র তীর অতিক্রম করিতে পারে না।

* সাংখ্য মতে, যুদ্ধকারী সেনার সহিত কার্য্যকারিণী প্রকৃতির উপমা।

সবল শত্রুতে পূরে তার আশ
পূর্ণ-শশীগ্রাসে রাহুর উল্লাস! ৬১

"প্রকৃত যে বল, না মানে শৃঙ্খল;
তা হ'তে পৃথক্ কূটনীতি বল;
একাধারে দোহে রহে না কখন,
আলো অন্ধকারে হয় কি মিলন? ৬২

"ইন্দ্রপ্রস্থে তবে কি কাজ গমনে,
আমাদের এই মাতঙ্গ নিকর
করুক ভূতলশায়ী তরুগণে
প্রবেশিয়া চেদী দেশে মনোহর। ৬৩

"অরিগণ সহ মাহিষ্মতী পুরী *
যাদব নিকরে রোধিবে সঘন;
ধান্য মিত্রাদির-প্রবেশ নিবারি
যথা রোধে গাভী ব্রজে গোপগণ †। ৬৪

"যুধিষ্ঠির যাগ করুন; তপন
প্রকাশুন কর; রাখুন অপরা
দেবরাজ; রিপু বধিব আমরা;
সকলেই সাধে নিজ প্রয়োজন। ৬৫

"শত্রুশির হ'তে নিঃসৃত শোণিত
শাণিত অসিতে লাগিয়া সহসা
রবির কিরণে হ'য়ে উদ্ভাসিত,"
ঝলিবে প্রকাশি বিজলী ঝলসা! ৬৬

এ বাক্য রামের সরোষ ভীষণ
চিত্রপট স্থিত দেবতা সকলে
ভয়ে যেন পুন কৈলা উচ্চারণ
সভা মণ্ডপের প্রতিধ্বনি ছলে ‡। ৬৭

ক্রমশঃ
শ্রীনবীনচন্দ্র দাস।

# মোগলের অধঃপতন।

অতঃপর বাদশাহ, জুলফিকর খাঁকে দাক্ষিণাপথের সুবেদারের পদ প্রদান করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। জুলফিকর মহারাষ্ট্রদিগকে মোগলের অনুকূল করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে কামবক্সের সঙ্গে যুদ্ধকালে রাজপক্ষাবলম্বী মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মিনহাজ সিন্ধিয়াকে বহু রাজসম্মানে ভূষিত করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিদের মধ্যে কোন কারণে মতদ্বৈধ

* মাহিষ্মতী—চেদীরাজ শিশুপালের রাজধানী।

† আহার্য্য সামগ্রী; বন্ধুকৃত সাহায্যাদি প্রবেশ নিবারণে শত্রু পরাজয় সহজ সাধ্য হয়। কৃষ্ণাদি গোপগণ ক্ষীর ভার ইত্যাদি আনয়ন বন্ধ করিয়া গোকুলে গরু অবরোধ করিয়াছিলেন।

‡ সভায় প্রতিধ্বনি হওয়াতে বোধ হইল যেন মণ্ডপের চিত্র হইতে দেবগণ তদ্বাক্যের পোষকতা করিলেন।

উপস্থিত হইল; জুলফিকর খাঁ এক পক্ষ এবং মুনিম খাঁ অপর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু বাদশাহ চক্ষুলজ্জাবশতঃ কাহারও প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। এই দ্বন্দ্ব উপলক্ষে সামন্তবর্গ সমস্ত দক্ষিণাপথ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য দিকে রাজপুতগণের মোগল বিদ্বেষ ক্রমশঃ নানাভাবে প্রকাশিত হইয়া শাসনকার্য্যে বিবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে লাগিল এবং নব প্রতিষ্ঠিত শিক জাতির অস্ত্রসঞ্চালনে মোগল শক্তির ভিত্তিভূমি পঞ্চনদ প্রদেশ আন্দোলিত হইয়া উঠিল।

বাদশাহ রাজপুত ও শিক উভয় শক্তির সঙ্গে এককালে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এজন্য যে কোনরূপে রাজপুত জাতির সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে শিককে পর্য্যুদস্ত করিতেই বদ্ধপরিকর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অম্বর ও যোধপুরের অধিপতিদিগকে দরবারে আনয়ন করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা মোগল দরবারে উপনীত হইলে, বাদশাহ তাঁহাদের সমস্ত অসন্তোষের কারণ নিবারণ করিয়া রাজপুত জাতির সঙ্গে সখ্য সংস্থাপন করিলেন। কিন্তু অধিপতিযুগল স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে উদয়পুরে গমন করিয়া রাণার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। মহাত্মা টড নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই ত্রিসম্মিলনের ফলে বাবরের সিংহাসন ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল। তার পর মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলের গৃহ-কলহোপলক্ষে পক্ষভুক্ত হইয়া বিবাদের মূলীভূত সাম্রাজ্যের অধিকাংশ গ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

যাহাহউক, রাজপুতগণের সঙ্গে শান্তি সংস্থাপন করিয়া বাদশাহ উদীয়মান শিক জাতিকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন। প্রধান মন্ত্রী মুনিম খাঁ শিকদিগকে মন্থন করিতে বিপুলবাহিনীসহ গমন করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর শিক সৈন্য সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল ও তাহাদের অধিনেতা পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। মুনিম খাঁ বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া সগৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই মুনিম খাঁ * পরলোক গমন করিলেন; তাঁহার মৃত্যুর

---

* মুনিম খাঁ সুফি মতাবলম্বী এবং দরিদ্র-বন্ধু ছিলেন। তিনি সমস্ত জীবনে কখনও কাহাকেও মনঃক্ষুণ্ণ করেন নাই। তিনি আপনার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য প্রত্যেক সহরে একটি করিয়া মস্‌জিদ ও সরাই নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করেন। এজন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের কার্য্য দোষে ভূমি গ্রহণোপলক্ষে অনেক স্থানে নানা প্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। সৎকার্য্য উপলক্ষেও যে লোকে উৎপীড়িত হয়, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ সাফি খাঁ এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

পর মন্ত্রী-নিয়োগ সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইল। শাহজাদা আজিম ওস্যান পর লোকগত উজীরের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দক্ষিণাপথের সুবাদার জুলফিকর খাঁকে মন্ত্রীপদ প্রদান করিয়া উ রের পুত্রদ্বয় মধ্যে একজনকে সৈন্যের অধিনায়কত্ব এবং অপর জনকে দক্ষিণাপথের শাসন-কর্ত্তৃত্ব দিবার প্রস্তাব করিলেন। জুলফিকর প্রায় স্বাধীনভাবে দক্ষিণাপথের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এজন্য তিনি শাসন-কর্ত্তৃপদ পরিত্যাগ করিয়া উজীরের পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। আজিম ওস্যান অন্য কাহাকেও উজীর নিযুক্ত না করিয়া স্বয়ং সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বহুদর্শী ও কার্য্যপটু ছিলেন না। এজন্য রাজকার্য্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল। আমরা এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। মুনিম খাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বাদশাহ গোতবার আলীর নামের শেষে "ওয়াশী" শব্দ সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন। "ওয়াশী" শব্দের অর্থ উত্তরাধিকারী। বাদশাহ সিয়া সম্প্রদায়ের সন্তোষবিধান জন্যই "ওয়াশী" শব্দ সংযোগ করিতে আদেশ করেন। ইহাতে ইহাই স্বীকৃত হয় যে, মহাত্মা আলী প্রেরিত মহাপুরুষ মোহাম্মদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। এই রাজাদেশে সমগ্র সুন্নি সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং নানা স্থানে উৎপাতের সূত্রপাত করে। আমেদাবাদের গোতবা পাউক নৃশংসভাবে নিহত হন। শাহজাদা আজিম ওস্যান গোপনে গোপনে বিরুদ্ধ-চারীদের সঙ্গে মিলিত ছিলেন। লাহোরেই সুন্নি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করে। এজন্য বাহাদুর শাহ লাহোরবাসী হাজি ইয়ার মোহাম্মদ প্রভৃতি কতিপয় প্রধান সুন্নিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে তাঁহারা উপস্থিত হইলে, বিচার-বিতর্ক আরম্ভ হইল। হাজি ইয়ার মোহাম্মদ রাজ-সভার আদব কায়দা উল্লঙ্ঘন করিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ ভাবে কথা কহিতে ভীত হইতেছ না?" তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমি সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট চারিটি বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। (১) জ্ঞানার্জ্জন, (২) ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন, (৩) তীর্থ পর্য্যটন, (৪) ধর্ম্ম-রক্ষার্থ জীবন বিসর্জ্জন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁহার কৃপায় আমার তিনটি প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। ন্যায়পরায়ণ রাজার অনুগ্রহে শেষটিও পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করিতেছি।" বহু বিচার বিতর্কেও কোন ফল হইল না। সুন্নি সম্প্রদায় ক্রমশঃ বল-সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। আজিম ওস্যান প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করায়, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ঈর্ষ্যানলে জ্বলিতেছিলেন। মহারাষ্ট্র, রাজপুত, শিক সকলেই দিল্লীর রাজ-শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত ছিলেন। বাহাদুরশাহ চারিদিকেই এইরূপ নানা ভাবে বিব্রত হইয়া

সুন্নি সম্প্রদায়কে শান্ত করিবার জন্য স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই বাদশাহ পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন এবং রাজকুমারগণ দুর্গন্ধলুব্ধ শকুনিপালের ন্যায় তাঁহাকে চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। তাঁহারা সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপুরুষগণ স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষকের পক্ষাশ্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ও অনিয়ম পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ সঙ্কটকালে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মৃদুস্বভাব আড়ম্বর-প্রিয় বাহাদুরশাহ পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজস্ব হ্রাস প্রাপ্ত এবং অর্থাগমের অন্যান্য পথও বহুল পরিমাণে রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাদশাহের দানশীলতার বিরাম ছিল না; একারণ, রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। বাদশাহ চক্ষুলজ্জাবশতঃ কাহারও প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান অথবা কাহারও ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিতেন না; এজন্য রাজ-গৌরবও প্রভাহীন হয়। *

## জাহান্দরশাহ।

বাহাদুরশাহের পরলোক গমনের পর অরাজকতার রাজত্ব আরম্ভ হইল। চারিদিকে বিভীষিকার ছায়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অনেকে ভয়ে সপরিবারে সহর পরিত্যাগ করিল। রাজ-পথে জন-প্রবাহনিবন্ধন গমনাগমন দুঃসাধ্য হইল। সৈন্যগণ বাকী বেতনের জন্য চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। সকলেই আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কেহই কাহাকেও সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। দুর্ব্বৃত্তদের "পবার" উপস্থিত হইল। তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল। এই সর্ব্বব্যাপী অরাজকতার মধ্যে রাজকুমার জাহান্দরশাহ দক্ষিণাপথের প্রবল সুবাদার জুলফিকর খাঁর সাহায্যে পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। জুলফিকর খাঁর প্রবল প্রতাপে অচিরে সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইল। নবাভিষিক্ত সম্রাটের ভ্রাতৃগণ ঘাতক-হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া, তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াদিলেন। তিনি রাজ-পদে আসীন হইয়া জুলফিকর খাঁকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মন্ত্রীপদ প্রদান করিলেন। তিনি দাযুদ খাঁকে

* খাফি খাঁ তাঁহার চরিত্র বর্ণনা কালে লিখিয়াছেন,—For generosity, munificence, boundless good nature, extenuation of fault, and forgiveness of offences, very few monarch have been found equal to Bahadur Shah in the history of past times and specially in the race of Timur. But though he had no vice in his character. Such complacency and such negligence were exhibited in the protection of the state and in the Government and the management of the country that witty sarcastic found the date of his accession in the words Shah-i-hekhber, "Heedless King."

দক্ষিণাপথে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং রাজধানীতে অবস্থানপূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। জুলফিকরের পিতা আসফ খাঁ জীবিত ছিলেন; তিনি উকীল-ই-মুৎলক (সম্রাটের প্রতিনিধি) উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রাজ-প্রসাদ লাভ করিলেন।

জাহান্দরশাহের সিংহাসনারোহণের অল্প পরেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার ন্যায় বিলাসপটু, কর্ম্মবিমুখ ও আত্মপরায়ণ শাসনকর্ত্তা আর কখনও বাবরের সিংহাসন কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি একজন নীচ-স্বভাবা কুলটার আয়ত্ত ছিলেন। এই রমণী তাঁহার উপপত্নী ছিলেন। তাঁহার নাম লাল-কুয়র। রাজ্য লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি লালকুয়র ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনের হস্ত-ক্রীড়নক হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রিয়তমা উপপত্নীর মনস্তুষ্টিবিধান জন্য অর্থ ও স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বার্ষিক দুই কোটি মুদ্রা তাঁহার বৃত্তি বরাদ্দ হইল। ইহা ছাড়া তাহার প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও মণি মুক্তা সরবরাহ করিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইল। বাদশাহ লালকুয়রের ভ্রাতাকে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু উজীর নিয়োগপত্র প্রদান করিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এজন্য লালকুয়র তাঁহার বিরুদ্ধে বাদশাহের নিকট বলিয়া দিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা, রাজপুরুষগণ উৎকোচগ্রাহী, উৎকোচ ব্যতীত তাঁহারা কোন কাজ করেন না।" বাদশাহ ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আমার উপপত্নীর নিকট তুমি কি উৎকোচ প্রত্যাশা কর?" জুলফিকর উত্তর করিলেন, "এক সহস্র সেতারি ও ওস্তাদ-ই নক্কাশি (Drawing Masters) আমার উৎকোচের পরিমাণ।" বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন?" জুলফিকর খাঁ তদুত্তরে বলিলেন, "আমাদের ন্যায় রাজপুরুষগণের প্রাপ্য সমস্ত পদ তাঁহাদিগকে দিতেছেন, সুতরাং আমাদের পক্ষে তাঁহাদের ব্যবসায় শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে।" বাদশাহ এই উত্তরে ঈষদ্ হাস্য করিয়া আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তিনি নিজে বিলাস-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তদীয় মন্ত্রিবর্গ তাঁহার দুর্ব্ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া স্বকার্য্যে উদাসীন হইয়াছিলেন। জাহান্দরশাহের অল্প পরিসর রাজত্বকালে অত্যাচার ও ব্যভিচারের পূর্ণ প্রভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল। * জুলফিকর খাঁর দেওয়ান ও কর্ম্মনায়ক শভূচাঁদ এরূপ অকথ্য অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে অভ্যস্ত ছিলেন যে, তাঁহার নিশ্বাস-স্পর্শে নীতি-

* খাফি খাঁ তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"It was a fine time for minstrels and singers and all the tribes of dancers and actors. There seems to be a likelihood that kazis would turn tosspots, and Muftis become tipplers.

পরায়ণ ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে কলুষিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

ঈদৃশ অরাজকতার রাজত্ব শীঘ্রই শেষ দশায় উপনীত হইল। জাহান্দরশাহের সিংহাসনারোহণ কালে আজিম ওস্যানের পুত্র ফরকশিয়র বঙ্গদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। একারণ তাঁহাকে তৈমুর বংশীয় অন্যান্য রাজকুমারের ন্যায় ঘাতক-হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল না। জাহান্দর শাহের রাজত্বের তৃতীয় মাসে তিনি রাজ-সিংহাসন অধিকারকল্পে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় আজিম ওস্যানের প্রিয়-পাত্র সৈয়দকুলোদ্ভব রাঢ়নিবাসী হোসেন আলী খাঁ বিহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ আব্দুল্লা খাঁ এলাহাবাদের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতে ছিলেন। ফরকশিয়র বিহারে পৌছিয়া দীনভাবে হোসেন আলী খাঁর সহায়তা প্রার্থী হইলেন। তিনি স্বীয় প্রভুপুত্রের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। ইহার পর আবদুল্লা খাঁও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সমরানল জলিয়া উঠিল। এলাহাবাদের পার্শ্বদেশে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জুলফিকর খাঁ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ আমীর ওমরাহ জাহান্দরশাহের দুশ্চরিত্র, কুসংসর্গলিপ্সা ও দুর্ব্ব্যবহারের জন্য তাঁহার ধ্বংসকামী হইয়াছিলেন। একারণ, তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রসন্নচিত্তে অস্ত্রধারণ করিলেন না। এদিকে লালকুঙ্কর ও গাথকদের হস্তীগুলি অশ্রান্ত বাণবর্ষণে অশান্ত হইয়া উঠিল। এই সময় দুর্ভাগ্যক্রমে জাহান্দরশাহের হস্তীও ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন তিনি ভয়ব্যাকুলচিত্তে লালকুয়রকে সঙ্গে লইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গোপনে পলায়ন করিলেন। ইহার পর রাজপক্ষাবলম্বী সেনানায়কগণ একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। এজন্য জুলফিকর খাঁ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধ ভঙ্গ করিয়া দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জাহান্দরশাহ শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া ছদ্মবেশে দিল্লীতে উপনীত হইলেন; কিন্তু অত্যধিক ভয়নিবন্ধন দুর্গে প্রবেশ না করিয়া আসদ খাঁর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জাহান্দর শাহের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, বৃদ্ধ মন্ত্রী ভাবী সম্রাটের শুভ দৃষ্টি লাভ করিবার কল্পনায় তাঁহাকে বন্দী করিলেন। ক্রমশঃ

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

# ব্রহ্মদেশের কাহিনী।

"মা ও মি"—অধুনাতন সভ্যসমাজের সংঘর্ষণে অনেক দেশের অনেক প্রাচীনত্বের বিলোপন হইতেছে। বাহ্য সৌন্দর্য্যের বিমোহনে অনেক দেখিবার বস্তু বিনষ্ট হইতেছে। অনেক দেবভাব পশুভাবে পরিণত হইতেছে। অনেক ভাল জিনিস হারাইয়া যাইতেছে। এখন আর কাহারও পুরাতনে আস্থা নাই, সকলে নূতন নূতন করিয়া পাগল হইতেছে। নূতন প্রাচীনের স্থান অধিকার করিতেছে; এবং প্রাচীনের অন্তর্দৃষ্টি নূতনের বহির্দৃষ্টিতে ঢাকিয়া যাইতেছে। নূতনের দৃষ্টি সম্মুখে, প্রাচীনের দৃষ্টি ছিল অতীত হইতেও অতীতের প্রতি। নূতন চাহেন ঐহিক সুখে দেহ ভাসাইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া যাইতে; প্রাচীন চাহিতেন সমস্ত পার্থিব সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া, অপার্থিব ধনকে আয়ত্ত করিতে। নূতন চাহেন নবীন সাজে নবীন পরিচ্ছদে, বাহার দিতে; প্রাচীন চাহেন পুরাতনটি বজায় রাখিতে। সমাজের এ দুর্গতি আজ কাল সভ্য অসভ্য সকল শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সমাজের এ কলঙ্ক, ভগবান্ জানেন, কবে বিদূরিত হইবে। এ দেশে পূর্ব্বে কখন পরদার ছিল না। সুন্দরী দর্শনে কাহারও মন বিচলিত হইত না। এখন নবীন, নবীনা দেখিলে কটাক্ষ করেন; নবীনা, নবীন দেখিলে হাসির তরঙ্গ ছুটান। কিন্তু এখনও প্রবীণ, নবীনা ও প্রবীণা সকলকেই সমভাবে ভক্তি করেন। অধুনা সমাজে এই দোষ কেন প্রবেশ করিল? এ দেশের অনেক স্থান আজ কাল ব্যভিচার-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে; অনেক গৃহ অপবিত্র হইয়াছে; অনেকে প্রাচীন রীতি নীতি ভুলিয়া সভ্যতা প্রদর্শনের ভাণ করিতেছে; সমাজে ব্যভিচারদোষ পরিহারের নিমিত্ত, বোধ হয়, এই দেশের রমণীকুলের "মা" নাম হইয়াছিল। কুমারী হইতে যুবতী পর্য্যন্ত ব্রহ্মকামিনীর সাধারণ নাম "মা"। কেবল অতি প্রৌঢ়াদিগকে "মি" বলে।

বিদ্যালয়—অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। যাঁহারা ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে "পুঙ্গী" বলে। পুঙ্গী শব্দে অতি মহিমান্বিত ব্যক্তিকে বুঝায়। তাঁহাদের আশ্রমের নাম কেয়াঙ্গ। Monastry অর্থে আমরা যেরূপ বুঝি, কেয়াঙ্গও প্রায় তদ্রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাতে উদাসীন ভাব সম্যক্‌রূপে পরিলক্ষিত হয় না। পুঙ্গীরা নিতান্ত বৈষয়িক না হইলে সংসার ও বৈরাগ্য এই দু'য়ের সংমিশ্রণে তাঁহাদের চরিত্র সংগঠিত হয়। এই নিমিত্ত বৌদ্ধ মন্দিরগুলি গৃহী ও সন্ন্যাসী সকল সম্প্রদায়ের উপদেশ-স্থান হইয়াছে। পুঙ্গীরা শুধু ধর্ম্মযাজক নহেন; তাঁহারা বালকদিগের শিক্ষা দীক্ষা-

দাতা গুরু। অষ্টম বর্ষ বয়ক্রম হইলে, বালকেরা কেয়াঙ্গ-গৃহে প্রেরিত হয়। এই স্থানেই তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা। এ দেশবাসীরা স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী, এই নিমিত্ত কোন বালিকা পুঙ্গীগৃহে বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরিত হয় না।

শিক্ষাপ্রণালী—বালকগণ কেয়াঙ্গ-গৃহে প্রবেশ করিবার পর তাহাদিগকে এক এক খানা কাঠের শ্লেট দেওয়া হয়; তাহাতে বর্ণাবলী লিখা থাকে। বর্ণশিক্ষা শেষ হইলে বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে সেইগুলি পাঠ করে। যদি কোন বালকের স্বর ক্ষীণ হইয়া যায়, শিক্ষক মনে করেন, সে ঘুমাইয়া পড়িতেছে; তখন তাহার কর্ণ মর্দ্দন করিয়া সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়। অল্পমেধাবী বালককে বর্ণশিক্ষা দিতে প্রায় এক বৎসর লাগে। অলস বালকের দণ্ড একটি শ্রমশীল বালককে পৃষ্ঠে করিয়া বহু বার বিদ্যালয়ের উপরে ও নীচে উঠিবে ও নামিবে; বেত্রাঘাতের ব্যবস্থাও আছে।

দেশভাষা—এ দেশের প্রচলিত ভাষা মাগধি বা পালী। পালীসংস্কৃতের অপভ্রংশ মাত্র, কিন্তু বর্ণাবলী স্বতন্ত্র। বর্ণগুলি প্রায় গোল ও অর্দ্ধ গোলাকৃতি। ইংরেজী ও বাঙ্গালার ন্যায় বামদিক হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সমস্ত বর্ণে ১০টি স্বর ও ৩২টি ব্যঞ্জন বর্ণ। লিঙ্গ বিভাগ নাই। শব্দগুলি বহু অর্থবোধক। উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ বোধ করিতে হয়। বর্ণগুলির এক একটি বিশেষণ আছে;—যথা বক্র ক, কুব্জ ব ইত্যাদি। এ দেশে কাগজের ব্যবহার অল্প; তাহাও আবার বাঁশের কোমল অংশদ্বারা প্রস্তুত। পবিত্রতার অনুরোধে গ্রন্থ সমস্ত তালপত্রে লিখিত হয়। পাঠ্য পুস্তকগুলি পালীভাষায় লিখিত। অধিকাংশই ধর্ম্মপুস্তক। জটিল বিষয়গুলি কখন অপোগণ্ড শিশুদিগের বোধগম্য হয় না; এই নিমিত্ত পুস্তকগুলি তাহাদের সম্মুখে থাকে মাত্র, কিন্তু শিক্ষা হয় মুখে মুখে। সারি দিয়া হাঁটু গাড়িয়া শিষ্যগণ গুরু-সম্মুখে উপবিষ্ট হয়; এবং তাঁহার মুখ-নিসৃত শব্দগুলির পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তি করিয়া পাঠ শেষ করে। তখন ক্ষুদ্র বালকের ক্ষুদ্র মস্তক এক একবার ভূমি স্পর্শ করে, আর এক একবার উত্থিত হয়, দেখিলে বোধ হয় যেন, ভক্তিভরে শিষ্যবৃন্দ গুরুপদে বার বার প্রণতি করিতেছে। সায়াহ্নকালে ভজন-শিক্ষা দেওয়া হয়। বৈরাগ্য বসন,—পীতাম্বর পরিধান করিয়া, পুঙ্গী, পদের উপর পদ রাখিয়া এক উচ্চাসনে উপবিষ্ট হন। সম্মুখে ২০।৩০টি ছাত্র যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকে। পুঙ্গী ভক্তিভাবে স্তুতি গান আরম্ভ করেন, বালকগণ সমস্বরে সেইগুলির পুনরাবৃত্তি করে। বাল-কণ্ঠের শ্রুতি-সুখকর মধুরধ্বনি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া আকাশে উঠে। তখন সকলের দৃষ্টি, একবার মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেব-প্রতিমার প্রতি, আর একবার সায়াহ্ন গগনের শোভা সন্দর্শনে নিবিষ্ট থাকে। এই দৃশ্যটি বাস্তবিকই সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না। বালকগণ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে জ্ঞান-মার্গে অগ্রসর হইবার চেষ্টা

করে। শিক্ষাদাতা ধর্ম্মযাজক; গ্রন্থনিচয় ধর্ম্মপুস্তক; পাঠাগার ধর্ম্মমন্দির; সুতরাং ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মশিক্ষা ভিন্ন কেয়াঙ্গ-গৃহে অন্য কোন বিষয়ের বা পুস্তকের অধ্যয়ন হয় না। বালকবৃন্দ যতদিন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকে, শিক্ষাদাতা গুরু সর্ব্বক্ষণ তাহাদের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাদের বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি আছে কি না, নানা কৌশলে তাহা জানিয়া লইবার চেষ্টা করেন। ইংরেজদিগের ব্রহ্মাধিকারের পর হইতে এই দেশে ইংরেজি ভাষা প্রচলিত হইয়াছে। এই অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনেক নগরীতে এখন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; এবং বৎসর বৎসর, এই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে অনেক ছাত্র কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া আফিসাদিতে প্রবিষ্ট হইতেছে। অনেকে সিভিলিয়ান বা "বারিষ্টার" হইয়া ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন।

উল্কিধারণ—ব্রহ্মদেশে স্ত্রী পুরুষ সকলেই উল্কি পরে। পরে না কেবল সান ও তৈলিঙ্গ রমণীরা। এই উল্কি বঙ্গমহিলার ললাট-ফলকের সিন্দূর-বিন্দু নহে। ইহা সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হিঙ্গুলের ছাপ। এই ছাপে পশু, পক্ষী, লতা, পাতা, ঘটী, বাটী, ভূত, প্রেত ও মন্দির প্রভৃতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকে। যে যন্ত্রদ্বারা উল্কি দেওয়া যায়, তাহার মস্তক পিত্তলের, অধোভাগ লৌহ-নির্ম্মিত। নিম্নভাগের কাঁটাটি নিরেট গোলাকার। উপরিভাগটি চেরা; এই চেরা অংশে রঙ থাকে। উল্কি দিবার সময় কাঁটার দ্বারা শরীর যেমন বিদ্ধ হয়, ঐ কাঁটার মুখে রঙ নামিয়া গায়ে ছাপ লাগিয়া যায়। উল্কি দিবার পর সমস্ত শরীর ফুলিয়া বেদনা উপস্থিত হয়। চাম্‌ড়া ফাটিয়া জল পড়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে বিশ্রী ক্ষত হয়, তীব্রজ্বরে, প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে। "চুলকানী" এত হয় যে, উল্কিধারী সমস্ত শরীর নখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে। কষ্ট অননুভবনীয় করিবার নিমিত্ত অনেক-সময় অহিফেণ সেবনে অজ্ঞান করিয়া উল্‌কি দিতে হয়। কিন্তু অতিরিক্ত মাদক-দ্রব্য সেবনে অনেক শিশু একবারে চৈতন্য হারায়। এ কারণ, আজ কাল পিতা মাতা এইরূপ অজ্ঞান করিয়া উল্‌কি দেওয়ার ভয়ানক বিরোধী। পুরুষেরা সর্ব্বাঙ্গে যেরূপ উল্‌কি পরে, স্ত্রীলোকে তেমন পরে না। তাহারা এরূপভাবে স্বভাবকে বিকৃত করিতে চাহে না। উল্‌কি দিবার পূর্ব্বে বালকগণ নাবালক বলিয়া পরিচিত। বয়সের প্রশ্ন উঠিলে জিজ্ঞাসা করা যায়, উল্‌কি দেওয়া হইয়াছে কি না। মগ জাতির বিশ্বাস শরীরে উল্‌কি ধারণ করিলে, কোন অপদেবতার ভয় থাকে না; ঘাতকের হাতে প্রাণ যায় না; জল ও সর্পভয় থাকে না; এবং বন্দুকের গুলি শরীরে প্রবিষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসভ্যতার পরিচায়ক। স্বাভাবিক অবস্থায় তাহাদিগকে যেরূপ সুন্দর দেখায়, উল্‌কি দিবার পর, তাহাদের আর সেই শ্রী থাকে না।

বালিকার কর্ণভেদ—ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা। যৌবনের প্রথম মুকুল দেখা দিয়াছে। বিলাসীদিগের সখের পুষ্পোদ্যান সজ্জিত করিবার উপযুক্ত সময়। এহেন বয়সে জ্যোতির্ব্বিদ শুভ দিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিয়া দিলে, পিতা এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন। বন্ধু বান্ধব সকলেই এই প্রীতি-ভোজে যোগ দিতে আসেন। আমোদ আহ্লাদের ধূম লাগিয়া যায়। শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইবামাত্র এক সুতীক্ষ্ণ হেম-কণ্টক দ্বারা বালিকার কর্ণভেদ কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। অঙ্গনে বাদকগণ ভীমনাদে ঢক্কা বাদ্য আরম্ভ করে। বালিকার ক্লেশজনিত ক্রন্দনের রোল এই বাদ্য মধ্যে ডুবিয়া যায়। কর্ণ-রন্ধ্র অগ্রে ছোট ক্রমে বড় করা হয়। যেন একটি চুঙ্গি অনায়াসে ঐ রন্ধ্র-পথে প্রবিষ্ট হইতে পারে। দরিদ্র রমণীরা কাচের চুঙ্গিতেও সন্তুষ্ট থাকে; এবং কথন কথন ছিদ্র মধ্যে কাগজ কি কাপড় পুরিয়া দেয়; কিন্তু রাজমহিলা ও সমৃদ্ধিশালিনী অঙ্গনারা প্রস্তর-শোভিত স্বর্ণ চুঙ্গিই ব্যবহার করেন। ধূম্র-পানের পিপাসা নিবারণার্থ পরিভ্রমণ কালেও অনেক রমণী কর্ণরন্ধ্রে চুরুট একটি লইয়া যায়। বালিকাজীবনের প্রধান ঘটনা কর্ণ-ভেদ। এই সংস্কারের পূর্ব্বে কোন বালিকার নাবালিকা অবস্থা ঘুচে না। কর্ণ-ভেদের পূর্ব্বে যে বালিকা যদৃচ্ছাক্রমে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছে, কর্ণভেদের পর তাহার সেই শৈশব-প্রকৃতি এক মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া যায়; এবং এই দৈহিক সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নাবালিকা বালিকা যুবতী মধ্যে পরিগণিতা হয়। তখন সে চপল ভাব পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাব ধারণ করে। বহির্ভ্রমণে যাইতে হইলে, মাতা কি অন্য কোন স্ত্রীলোক দোসর না হইলে যাইতে পারে না। বালিকা জীবনের সেই পুতুলের খেলাতে এখন আর তাহার মন যায় না। স্বভাব ছাড়িয়া কৃত্রিমতার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। যেন কাহারও চিত্ত আকর্ষণের প্রয়োজন হইয়াছে। এখন তাহার ভ্রমণের বাহার, পরিচ্ছদের বাহার, কবরী বন্ধনের বাহার, কবরীতে ফুল গুঁজিয়া দিবার বাহার, যেন সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্যরাশি ছড়াইয়া দিয়া, দর্শকবৃন্দের চক্ষে ধাঁন্ধা লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। প্রমোদ-উদ্যান হইতে এখন এই ফুটনোন্মুখ কুসুমটিকে চয়ন করিয়া কক্ষ-বাতায়নে রাখিয়া দাও, ঘরপুর সৌরভ বিস্তার করিবে। কিন্তু স্পর্শ করিও না, পুড়িয়া মরিবে। দেশ-প্রথানুসারে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীতারকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

# সান্ত্বনা।

## প্রথম স্তবক

বৃদ্ধ পিতা বৈষ্ণবের মধুর-কণ্ঠ-নিঃসৃত এবং মধুস্রাবিণী সারঙ্গীর স্বর-মিশ্রিত নিমাই সঙ্গীত শুনিতেছেন, আর নয়ন-জলে ভাসিতেছেন। মাঝে মাঝে, আপনার একটি শোকাকুলা কন্যাকে, আকুল প্রাণে সম্মুখে আবরিয়া লইয়া, সান্ত্বনা দান করিতেছেন। বলিতেছেন,——

"মা, তুমি আর কাঁদিও না। অনেক কাঁদিয়াছ, আর কাঁদিও না। তোমার বুকে যেমন শ্মশানের আগুন দিবারাত্রি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, এই সংসারে আরও শত-সহস্র সুকুমারমতি অবলার হৃদয়, ঐ রূপ আগুনে, পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্ম হইতেছে। তুমি কেবল আপনার দুঃখ ভাবিবে কেন?

"মানুষ যদি অহোরাত্র কেবল আপনার দুঃখ ও আপনার কষ্টই চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার আত্মার নিশ্চয়ই অতি শোচনীয় অধোগতি হয়। কারণ, তাদৃশ অবস্থায়, তাহার আত্মা, প্রীতি, স্নেহ, সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণে একবারে বঞ্চিত হইয়া, শুধুই স্বার্থপরতার একটা নীরস-নিঠুর বিড়ম্বিত পিণ্ডের মূর্ত্তি ধারণ করে; এবং মানবজাতির সুখ ও দুঃখ—উন্নতি ও অবনতির সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য হইয়া, কেমন এক প্রকার অসার, আত্মসর্ব্বস্ব, অর্দ্ধীভূত ভাবে, আপনাতে আপনি লুক্কায়িত রহে।"

এইরূপ উপদেশ-সময়ে, গৌরগুণানুরক্ত ভক্ত গায়কেরা, শোক-সন্তপ্ত পিতা ও দুহিতার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পাইয়া, আপনা হইতে অপসৃত হইল। পিতা বলিতে লাগিলেন,—

"মা, তুমি মনুষ্যের মধ্যে কাহাকে বড় বল, আর কাহাকেই বা ছোট বল? মানুষ, শুধু অর্থবিত্তে বড় হয় না, আর অর্থবিত্তের অভাবেও ছোট হয় না; প্রকৃত-প্রস্তাবে বড় হয় মহত্ত্বে ও মনুষ্যত্বে, আর ছোট হয় মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের অভাবে। যার প্রাণটা সতত পরের জন্য পোড়ে,—পরের ভাবনাই বেশী ভাবে, এবং পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য, অথবা পরের প্রাণ শীতল করিবার অভিলাষে বেশী ব্যাপৃত রহে, সে-ই মানবজগতে বরণীয় ও বড়। তুমি শুধুই আপনার দুঃখ-চিন্তায় এই সংসারের সকলের দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছ, ইহা আমার নিকট ভাল লাগে না। পাছে ইহাতে তোমার বিশেষ অনিষ্ট হয়, এই ভাবনায় আমি সর্ব্বদা অন্তরে দুঃখিত থাকি।"

পিতা যাহাকে সম্ভাষণ করিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, সেই পুত্রশোকাতুরা অভাগিনী তখনও একপ্রকার বালিকা। বঙ্গদেশের অনেক বালিকাও,—'হা আমার রামরে!—হা আমার সোনার পুতুল বিশ্বরূপ!—হা আমার নিমাইবিশ্বম্ভর!—তুই কোথায় গেলিরে আমার প্রাণধন—!' এইরূপ বলিয়া বলিয়া, হৃদয়বিদারি আর্ত্তনাদসহকারে, দুঃখদগ্ধা কৌশল্যা ও চিরদুঃখিনী শচীর মত অনেক সময় বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া থাকে। বালিকা, তাহার অশ্রুধারাসমাকুল আরক্ত নয়নে, পিতার দিকে চাহিয়া, অতি গদ-গদ কাতর কণ্ঠে বলিল,—"বাবা, এই সংসারে আমার মত দুঃখিনী আরও কি আছে?"

তখন বৃদ্ধ পিতা, বালিকার দর-দরিত অশ্রু মুছাইয়া, দুঃখে যেন একবারে অবসন্ন ও অভিভূত হইয়া, কহিলেন,—

"বাছা, তুমি দয়ার্দ্রহৃদয়া ও ধর্ম্মানুরাগিণী। আমি তাই তোমাকে পুনরপি সাবধান হইতে বলিতেছি; তুমি শুধুই আপনার সুখ-দুঃখ-চিন্তাস্বরূপ স্বার্থপরতার কূপে ডুবিয়া পাতকগ্রস্ত হইও না। এ বিশ্বজগতের অধিপতি, ভগবান্ অনন্তদেব, স্নেহ ও করুণার অপার ও অতল সমুদ্র। তিনি স্বভাবতই পূর্ণমঙ্গল। তিনি যে এই সংসারে শোক ও দুঃখের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাও জীবের মঙ্গলার্থ। সোনা যেমন আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া অতি পবিত্র উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে, মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়াই পবিত্র হয়। এই জন্যই জগতে দুঃখের সৃষ্টি। এ সংসারে যে আসিয়াছে, সে-ই কোন না কোন সময়ে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছে; এবং কিছু না কিছু দুঃখ ভোগ করিয়া, জীবনের পরিণামবিষয়ে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। সুতরাং, তোমার মত দুঃখিনী আর নাই, এ কথা অতি অমূলক কথা,—অতি পাপ-কথা। তুমি এমন কথা আর কখনও মুখে আনিও না।

"তুমি তোমার প্রাণে পরের দুঃখ বুঝিতে চাও কি?—পরের দুঃখ চিন্তা করিয়া আপনার সুখ-দুঃখের পরিমাণ করিতে, অথবা আপনার আত্মাকে দয়া-ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের দিকে একটু টানিয়া তুলিতে ইচ্ছা কর কি? তাহা হইলে, তোমার উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। চাহিয়া দেখ কত সুন্দরী যুবতী,—কত সুশীলা, সুকুমার-ভাব-কোমলা, দেব-কন্যাসদৃশী কুলবতী, আপনার প্রাণারাধ্য পতিকে শ্মশানের জ্বলন্ত অনলে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করিয়া, বাণ-বিদ্ধ বিহগীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে; এবং ঘরে পিতা মাতা, পুত্র কন্যা ও ভাই ভগিনী প্রভৃতি কেহই না থাকা হেতু, আপনার অসহ্য দুঃখ অন্তরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, পরের আশ্রয়ে, অতি কষ্টে সৃষ্টে, জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে। চাহিয়া দেখ, কত স্নেহবিহ্বলা মাতা, আপনার স্নেহের পুতুল পুত্রনিচয়কে, একে একে, কালের দুর্নিবার করাল স্রোতে নির্ম্মাল্য কুসুমের মত ভাসাইয়া

দিয়া, আপনার শূন্য গৃহে, শূন্যান্তরে, একাকিনী পড়িয়া আছে; এবং এক ফোঁটা জল দিয়া উপকার করে, পৃথিবীতে এমনও কোন আপনার জন নাই বলিয়া, আপনিই দিনান্তে, আপনার শাকান্ন সংগ্রহের জন্য, ধীরে ধীরে যত্নপর হইতেছে। সংসারের এ সকল দৃশ্য চক্ষে দেখিলে, অথবা ক্ষণকাল চিত্তে চিন্তা করিলে, মনুষ্য কখনও কি কেবল আপনার দুঃখটুকু ভাবিবার জন্য আত্মায় সাহসী হইতে পারে?

"বস্তুতঃ, যাঁহারা পরের দুঃখ পাঠ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শুধু আপনার দুঃখ লইয়াই ব্যাপৃত রহিতে সমর্থ হন না। পুরাতন পণ্ডিতেরা এই পৃথিবীকে বসুন্ধরা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেন না, পৃথিবী সকল দেশেই রত্নপ্রসবিনী। কিন্তু জ্ঞানীর চিত্তে এই পৃথিবীর আর এক নাম আছে। সে নাম সর্ব্বগ্রাসিনী শ্মশান-ভূমি। পৃথিবীর সকল স্থলই শ্মশান-সদৃশ। যেখানে যাও সেখানেই শ্মশান,—আকাঙ্ক্ষার শ্মশান, আশার শ্মশান, সাংসারিক সম্পদ ও সম্মান এবং উৎসাহ ও অভিমানের শ্মশান। অযোধ্যার সে রাম নাই, সে সীতা নাই,—সে ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ নাই, সে ভাব-গম্ভীর ভরত ও শত্রুঘ্ন নাই। কিন্তু অযোধ্যার সে মহাশ্মশান, সরযূর তটে সুবিস্তৃত রহিয়া, হা রাম! হা সীতা! বলিয়া প্রান্তর-বাহি সমীরণের গভীর স্বননে বিলাপ করিতেছে; এবং মনুষ্যমাত্রকেই সাংসারিক সুখ-দুঃখের অনিত্যতা সম্পর্কে অশেষ-প্রকারে উপদেশ দিতেছে। শ্যাম-সলিলা, সুশীতলা যমুনার তটে এখন আর শ্যামের সে বাঁশরী বাজে না,—যে জগন্মোহন বাঁশরীর অলৌকিক নিঃস্বনে যমুনার জল না কি উজান বহিত, এখন আর তাহার উদাস-ধ্বনি মনুষ্যের কর্ণে পরিশ্রুত হয় না। কিন্তু যমুনার তটে তটে, তট-ভূমি-ব্যাপিনী অসংখ্য শ্মশান-ভূমি যেমন ছিল, তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে; এবং মনে হয়, যেন উহারা প্রত্যেকে, হা কৃষ্ণ! হা করুণানিধান! হা মাধব! হা যাদব! বলিয়া, করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে, ঐহিক-জীবনের অসারতা বিষয়ে সহস্র কথা বলিতেছে।"

বৃদ্ধ ইহার পর আবার বলিলেন,—"বাছা তুমি ত মহাভারত পড়িয়াছ। মহাভারতে পতিপরায়ণা সতী, পবিত্রমতি গান্ধারীর কাহিনী পাঠ করিয়াছ। যদি গান্ধারীর জীবন-বৃত্ত আলোচনা করিয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যই ইহা বুঝিয়াছ যে, গান্ধারী কোন কোন অংশে সাবিত্রীর সমান অথবা সাবিত্রী হইতেও উচ্চতর-স্থানীয়া রমণী। গান্ধারী যখন জানিতে পাইলেন যে, তাঁহার পতি জন্মান্ধ, তিনি তখন, মুহূর্ত্তের আর অপেক্ষা না করিয়া, আপনার চক্ষু দুটিকে শত-পটল-বস্ত্রে বান্ধিয়া রাখিলেন; এবং প্রফুল্ল-প্রসন্ন নয়নের সৌন্দর্য্যে গৌরবিণী হইয়াও, চিরকাল অন্ধের মত জীবন যাপন করিলেন। ইতিহাসে এ অংশে গান্ধারীর তুলনা কোথায়? কিন্তু গান্ধারী এইরূপ পুণ্যবতী হইয়াও, পুত্রশোকে কিরূপ কষ্ট পাইয়াছেন,

তাহা জান কি? গান্ধারী তাঁহার শেষ জীবনে, শত পুত্রের শোকের শ্মশান বুকে পুষিয়াও, কিরূপ প্রশান্ত ভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

"গান্ধারীর সে পুত্রনিচয়ের মধ্যে কেহই ত দুধের শিশু ছিল না। তাহারা সকলেই ঘোরতর যোদ্ধা—বীরের মধ্যে বীর—বহু সৈন্যের নায়ক, বহু লোকের পালক, এবং সর্ব্বত্র সম্মানিত। যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি এক সময়ে সমগ্র ভারতের রাজরাজেশ্বর হইয়াছিলেন; এবং অভিমানী দুর্য্যোধন বলিয়া আজও কাব্যে ও ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। দুর্য্যোধন, ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের তুলনায় ধার্ম্মিক না হইলেও, ইয়ুরোপীয় রাজাধিরাজদিগের শিরোভূষণ; এবং স্বজনপালকতা ও স্ববিক্রম-নির্ভরতা প্রভৃতি বিবিধ অসাধারণ রাজসম্পদে মানবজাতির আভরণ। হতভাগিনী গান্ধারী, এহেন দুর্য্যোধনের মত শত পুত্রকে সমরের গ্রাসে ডালি দিয়াও, কি লইয়া এই পৃথিবীতে দিনপাত করিয়াছেন, তাহা বাছা চিন্তা করিতে পার কি?

"গান্ধারী হইতেও অধিকতর সম্মানিতা, রাজসূয়-যজ্ঞপূজিতা, সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী দ্রৌপদীর দিকেও একবার দৃষ্টিপাত কর। দ্রৌপদী, জীবনের আনন্দময় উল্লাসের দিনে, শত্রুকৃত লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার পরাকাষ্ঠা ভোগ করিয়া,—যেরূপ নিঘৃ'ণ বিড়ম্বনার কথা স্মরণ করিতেও শরীর ও মন শিহরিয়া উঠে, তাহার সমস্তই সর্ব্বংসহা পৃথিবীর মত সহিয়া লইয়া, কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের পর, পুনরায় আপনার বিশাল রাজ্যে অধিকার পাইলেন। রাজ্য ও রাজ-বৈভব হারাইয়া বনবাসিনী হইয়াছিলেন; আবার রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু এ রাজ্য লাভের দক্ষিণা হইল কি? দক্ষিণা—তাঁহার বৃদ্ধ পিতা, পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়কারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, —অসংখ্য আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এবং আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব পাঁচটি পুত্রের আশান্বিত উৎফুল্ল প্রাণ। এই অসহ্য শোকের আগুনে, অস্থিপঞ্জরে জর্জ্জরিত রহিয়াও, ধর্ম্মপরায়ণা দ্রৌপদী দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন; এবং জীবনের নিত্য কর্ম্মে, গৃহবাসিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় ধর্ম্ম আচরণ করিয়া, পরকালের জন্য পাথেয়-সম্বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের সহিত প্রফুল্ল মুখে কথা কহিতেন; —আপনার প্রাণের আগুন প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, পরের দুঃখ মোচনের জন্য নানা প্রকার প্রয়াস পাইতেন; এবং কিরূপে পাঁচ জনের উপকার করিয়া জীবনের সার্থকতা করিবেন, সর্ব্বদা ইহারই উপায় দেখিতেন। পুণ্যশীলা দ্রৌপদীর পুণ্যময় জীবনচর্য্যা প্রত্যক্ষ করিয়া কে তাঁহাকে শোকদগ্ধ বলিয়া মনে করিত?"

বৃদ্ধ পুনরপি বলিলেন,—"মা তোমার নিকট দুইটি পৌরাণিক শোকাতুরার কথা কহিলাম। পুরাণের কথা অতি পুরাতন কাহিনী। গন্ধারী ও দ্রৌপদী কতকাল হইল পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের শোক দুঃখে এখন আর মানুষের স্বার্থকঠিন, পাষাণ প্রাণ আর্দ্র হইতে চাহে না।

আমি এই হেতু, তোমার নিকট দুইটি ঐতিহাসিক মহিলার কথা কহিব। যাঁহারা তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখিয়াছেন,—চক্ষে দেখিয়া তাঁহাদিগের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত আছেন। সুতরাং উল্লিখিত মহিলাদ্বয়ের অশ্রুতপূর্ব্ব দুঃখের কাহিনী অবশ্যই তোমার প্রাণে লাগিবে।

"তুমি বাঙ্গালা পুঁথিপত্র-সম্পর্কে লিটিসিয়া রামোলিনী নাম্নী একটি লোক-প্রসিদ্ধ রমণীর নাম শুনিয়াছ কি? যদি এই ধরণীধামে কোন কালে কোন রমণী রত্নগর্ভা বলিয়া মনুষ্যের পূজা পাইবার যোগ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রামোলিনীর নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রামোলিনী অতি দীন হীন কাঙ্গালের মেয়ে। তিনি ভদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ভদ্রলোকের সহিতই তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি, অর্থ বিত্ত ও সাংসারিক সম্পদের প্রতি দৃষ্টি করিলে, তাঁহাকে কাঙ্গালিনী বলিয়া বর্ণনা করিতে কোন শঙ্কা নাই। তিনি চারিটি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী পুত্র এবং তিনটি সুন্দরী কন্যা প্রসব করেন; এবং অদৃষ্টক্রমে, এতগুলি শিশুর বোঝা লইয়া, প্রথম বয়সেই বিধবা হন।

"রামোলিনীর বৈধব্যসময়ে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লবের তুফান বহিল। সেই তুফানে, তাঁহার বাড়ী ঘর ও বিত্ত সম্পত্তি, সামান্যতঃ যাহা কিছু ছিল, সমস্তই রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল। রামোলিনী পূর্ব্বে পতিশোকে কিছুকাল পাগলিনীর মত ছিলেন। যখন তাঁহার সাংসারিক জীবনের সমস্ত সম্বল বিনষ্ট হইল, তখন তাঁহার শরীর ও মনের অবস্থায় এমনই শোচনীয় পরিবর্ত্ত ঘটিল যে, যে তাহাকে দেখিতে পাইল, সে-ই তাঁহাকে প্রকৃত পাগল বলিয়া মনে করিল। তিনি, চক্ষে আর পথ না দেখিয়া, তাঁহার ঐ সাতটি শিশুকে সঙ্গে করিয়া লইলেন; এবং মার্শেল নগরে, অতি সাধারণ একটি কুটীরে, ভিখারিণীর মত আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, কোন প্রকারে সময় যাপন করিতে লাগিলেন।

"কিন্তু, বিশ্ববিধাতা ভগবান্ অনন্তদেব কাহার ললাটে কি লিখিয়াছেন, এবং কাহার জন্য কি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অন্ধ মনুষ্য কোথায় কবে আগে অনুমান করিতে পারিয়াছে? যে তুফানের প্রথম ফুৎকারে রামোলিনীর গৃহবাস চূর্ণ চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল, সেই তুফান, ক্রমে ক্রমে, গর্জ্জিয়া উঠিয়া, লোক-ভয়ঙ্কর তুর্ণড-ঝটিকার মত, ফরাশি দেশের সমস্ত পুরাতন কীর্ত্তি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল; এবং রামোলিনীর দ্বিতীয় পুত্র ভুবন-বিখ্যাত বোনাপার্টি, সেই তুফানের উপর, অলৌকিক পুরুষের শক্তিতে সওয়ার হইয়া, ফরাশি সাম্রাজ্যের সম্রাট্ ও তদানীন্তন ইয়ুরোপের অধীশ্বর হইলেন।

"বোনাপার্টির কথা বিশেষ করিয়া বলিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। যাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ইতিহাস, শত্রু মিত্র, নিন্দক ও স্তাবক কর্ত্তৃক, এক সহস্র গ্রন্থে লিখিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আলোচিত হইয়াছে,

আমি কিরূপে এক মুহূর্ত্তে তোমার কাছে তাঁহার কথা কহিয়া শেষ করিব? তবে এইমাত্র বলিতে পারি, তাঁহার নিশ্বাসে নিত্য নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইত, এবং প্রশ্বাসে সেই সকল রাজ্য প্রলয়ের গ্রাসে গড়াইয়া পড়িত। ফলতঃ, মনুষ্য যাঁহাদিগকে অবতীর্ণ-পুরুষ বলিয়া পূজা করে, তাঁহাদিগের কথা পরিত্যাগ করিলে, মানবজগতে এমন মহা-মহিম ব্যক্তি,—এমন সুন্দর-সুকোমল-তনু শান্তমূর্ত্তি সুপুরুষ,—এমন ধীর-স্থির সুগম্ভীর পণ্ডিত,—এমন উন্মদ-ভাবোদ্দীপক ওজস্বল বাগ্মী,—এমন জন-মানব-ভয়ঙ্কর কঠোর-কর্ম্মা দুর্জ্জয় বীর দ্বিতীয় আর একটি জন্মিয়াছে কি না, সন্দেহের কথা। ইহার উপর বোনা-পার্টির মাতৃভক্তি। সেকেন্দর সাহ ও জুলিয়স সিজর প্রভৃতি পৃথিবীর দিক্‌পাল পুরুষেরা সকলেই মাতৃভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বোনাপার্টি যে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পু-রুষ,—নামতঃ ফরাশি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও, প্রকারতঃ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর, তিনি সেই সময়েও, তাঁহার মা রামোলিনীর কাছে, দুধের শিশুর মত, মুখ-প্রেক্ষী থাকিতে ভালবাসিতেন।

"বোনাপার্টির প্রভাবে রামোলিনীর আর তিন পুত্র তিনটি রাজ্যের রাজা, এবং তিন কন্যা তিন পৃথক্ দেশের রাজেশ্বরী হইল; এবং পৃথিবীর শত কোটি লোকের প্রাণ, কাঙ্গালিনী রামোলিনীকে, পৃথ্বীপতির প্রসূতি ও ইন্দ্রের মাতা অদিতির ন্যায়, অলোক-সামান্যা ভাগ্যবতী জ্ঞানে, পূজা করিতে লাগিল। রামোলিনীর নাম স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বত্র সমান প্রচারিত হইল; এবং যে সকল বালক মায়ের কোল ছাড়িয়া সা-মান্য কথাবার্ত্তা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি-য়াছে, তাহাদিগের কানেও রামোলিনীর নাম কথাপ্রসঙ্গে প্রবেশ পথ পাইল।

"রামোলিনী তাঁহার এই ক্ষণজন্মা পু-ত্রকে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহাও কি, মা, তোমায় বুঝাইয়া বলিতে হইবে? পুত্র, বৎ-সরের অধিকাংশ সময়ই, রাজ্যরক্ষা অথবা সাম্রাজ্য-বিস্তারের প্রয়োজনে, বহু লক্ষ যোদ্ধ্‌বীর সঙ্গে লইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাপৃত রহিতেন; রামোলিনী, পুত্রের মঙ্গলকামনায়, প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্তম্ভিত রহিয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টে, সর্ব্বদা অন্তরে তাঁহার মঙ্গলকামনা করি-তেন। এহেন পুত্রের অমঙ্গল হইলে মায়ের প্রাণ কি তাহা সহিয়া লইতে পারে? কিন্তু যিনি, মঙ্গল ও অমঙ্গলের অদৃষ্টসূত্র আকর্ষণ করিয়া, মনুষ্যকে আপনার কাছে টানিয়া লন, তাঁহার ইচ্ছায়, সে আশঙ্কিত অমঙ্গল, একসঙ্গে, অযুত-বজ্রের মত, রামোলিনীর বুকে আসিয়া আপতিত হইল; এবং রামো-লিনীর সেই জগজ্জয়ী পুত্র,—সে বীর-মুকুট-মণি বোনাপার্টি, সপ্তরথি-বেষ্টিত অভিমন্যুর ন্যায়, বহুলক্ষ বিষাক্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রবদ্ধ আক্র-মণে, আগে রাজ্য, রাজপদ ও রাজ-বৈভব হারাইয়া,—পরিশেষে—বিদেশে বিপাকে, প্রাণে নষ্ট হইলেন। বৃদ্ধা রামোলিনী তাঁহার বোনাপার্টি পুত্র হারাইয়াও পনর ষোল বৎসরকাল পৃথিবীতে ছিলেন; এবং আপনার

দুঃখ সংবরণ করিয়া লইয়া, পরের দুঃখ মোচন ও অশ্রু মার্জ্জন করার জন্য, সময়ে সময়ে যত্ন পাইয়াছিলেন।

"রামোলিনীর এক পৌত্রবধূ অদ্যাপি জীবিত আছেন। সে পৌত্রের নাম ছিল লুই নেপোলিয়ন, আর পৌত্রবধূর নাম সম্রাজ্ঞী ইয়ুজিনী। লোকে তাঁহাকে এখনও সম্রাজ্ঞী * বলিয়া সম্মান করে; আমিও তাই তাঁহাকে তোমার কাছে সম্রাজ্ঞী বলিয়া উল্লেখ করিলাম। কিন্তু তাঁহার সম্রাট্ স্বামী,—সাম্রাজ্যের ভাবি-উত্তরাধিকারী—সুরেন্দ্রপ্রতিম দুরন্ত পুত্র, এবং শত-সুখ-সম্পন্ন বিশাল সাম্রাজ্য, সমস্তই তাঁহার বুকের মধ্যে—স্মৃতির শ্মশানে। ইয়ুজিনী, ইয়ুরোপীয় রূপসী হইলেও, চরিত্রের পবিত্রতায় সীতা ও সাবিত্রীর চরণস্পর্শের যোগ্যা। ইংলণ্ডের পুণ্যবতী ভিক্টোরিয়া তাঁহার প্রাণ-সখী ছিলেন। আজি তেত্রিশ কি চৌত্রিশ বৎসর হইল, তাঁহার স্বামী যখন জর্ম্মণীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া বিশাল রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হন, তখন এক-পুত্রা ইয়ুজিনী, তাঁহার সেই সিংহশাবক-সম একমাত্র পুত্রটিকে সঙ্গে লইয়া, ইংলণ্ডে পালাইয়া যান; এবং প্রাণসখী ভিক্টোরিয়ার স্নেহের আশ্রয়ে, লণ্ডনের উপকণ্ঠে, একটি ক্ষুদ্র গ্রামে, অপরিচিত ভদ্রমহিলার মত অবস্থিত রহেন।

"এইরূপ অবস্থিতির কিছু দিন পরেই, রাজ-বৈভব বিলাসিনী স্বর্ণপ্রতিমা ইয়ুজিনীর বৈধব্য ঘটিল। ইয়ুজিনী তখন, আপনার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রটিকে পক্ষিণীর মত প্রগাঢ়-স্নেহের পক্ষপুটে ঢাকিয়া জীবনের উচ্চ আশা পোষণ করিতে লাগিলেন; এবং এই পুত্র, প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে, পুনরায় পিতার সমৃদ্ধ-সাম্রাজ্য ও সোনার সিংহাসন কাড়িয়া লইবে, এই প্রত্যাশায়, পুত্রের শিক্ষা ও সংরক্ষণ কার্য্যকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করিলেন। পুত্র ক্রমে বাড়িতে লাগিলেন। বয়সে বাড়িলেন,—বিদ্যা, বুদ্ধি ও মানসিক-ক্ষমতায়ও মায়ের আশার মত বর্দ্ধিত হইলেন। তাঁহার চাল-চলনের নির্ভীক ভঙ্গি এবং প্রতিভার চমক দেখিয়া, আত্মীয়বন্ধু-

* সম্রাজ্ঞী এই শব্দটি, বাঙ্গালায় অপ্রচলিত হইলেও, প্রয়োগার্হ এবং রীতি-সঙ্গত। কর্ত্তৃ-বোধক কৃৎপ্রত্যয়ে, রাজ্‌ধাতুর দুইপ্রকার রূপ হয়। ক্বিপ্ প্রত্যয়ে রাট্,—কনিন্ প্রত্যয়ে রাজন্; এবং সুতরাং, উপসর্গযোগে, সুরাট্ ও সম্রাট্, এবং সুরাজন্ ও সম্রাজন্। এইরূপ অবস্থায়, অধিরাজন্ শব্দ যেমন, "রাজাহসখিভ্যষ্টচ্" এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে, টচ্-প্রত্যয়ান্ত হইয়া, পুংলিঙ্গে অধিরাজ এবং স্ত্রীলিঙ্গে অধিরাজী হয়; সম্রাজন্ শব্দও সেইপ্রকার, কর্ম্মধারয়-ব্যবস্থায়, টচ্ প্রত্যয়-যোগে, পুংলিঙ্গে অদন্ত মূর্ত্তিতে সম্রাজ, এবং স্ত্রীলিঙ্গে, টিত্ত্ববিহিত ঙীপ্-প্রত্যয়যোগে, সম্রাজী হইতে পারে। বাঙ্গালায়, স্ত্রীলোকের বিশেষণে, সম্রাট্ শব্দ বড়ই শ্রুতিকটু। সুতরাং, সম্রাজ্ঞী বলিলে, আমাদিগের বিবেচনায়, ভাষার (Idiom) গঠনী রীতি যেমন রক্ষা পায়, ব্যাকরণের সম্মানও মূলে সেইরূপ অক্ষুণ্ণ রহে।—বান্ধব-সম্পাদক।

দিগের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। পৃথিবীতে যাঁহারা রাজ্যেশ্বর বলিয়া পরিচিত, এই নবীনযুবার প্রতি তাঁহাদিগের চক্ষু পড়িল। যৌবনের প্রথম উন্মেষ-সময়েই, সে যুব-বীর, বিধবা মায়ের বাধা না মানিয়া যুদ্ধশিক্ষা ও যুদ্ধব্রতে জীবনের প্রথম দীক্ষা-অভিলাষে, আবিসিনিয়ার সমরে, ইংরেজ-সেনাপতিদিগের সঙ্গী হইয়া গেলেন; এবং অদৃষ্টরেখার অনুল্লঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া,—বিনা প্রয়োজনে—বৃটিশ-সৈনিকদিগের স্বার্থসাধনে, প্রাণে মারা পড়িলেন।

"শত-শোক-সন্তপ্তা সম্রাজ্ঞী ইয়ুজিনী, তাঁহার সাংসারিক আশার ঐ এক আশ্রয়-স্বরূপ অদ্বিতীয় পুত্র হারাইয়া, আজিও জীবিত আছেন; এবং জীবজগতের দুঃখ মোচন ও মঙ্গল সাধনই আপনার অবশিষ্ট জীবনের ব্রত জ্ঞান করিয়া, ব্রতচারিণী তপস্বিনীর মত কালপাত করিতেছেন। ইয়ুজিনী আরও কতকাল বাঁচিবেন বলিতে পারি না। কিন্তু, আমার এই মনে লয়, তিনি যতকাল জীবিত থাকিবেন, তত কালই যেন আপনার অপরূপ জীবনের অভাবনীয় ইতিহাসে মনুষ্যকে এই এক কথা নিঃশব্দে উপদেশ করিবেন,——

"পৃথিবীর মনুষ্য, তুমি শোক করিও না। পৃথিবীর নর-নারী, তোমরা কেহই শোক-দুঃখে অভিভূত হইয়া জীবনের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না। সংসারের সুখ ও দুঃখ, জ্যোৎস্না ও অন্ধকার, সমস্তই স্বপ্নের মত। তোমরা, অসার স্বপ্নকে সার মনে করিয়া, আপনার গম্য স্থান ভুলিয়া রহিও না। তোমাদিগের হৃদয় যখন শোকে আকুল অথবা দুঃখে অভিভূত হয়, তখন তোমরা আমার দিকে চাহিও; এবং আমার সুখ-সংবর্দ্ধিত ও দুঃখ-দগ্ধ জীবনের নানা কথা আলোচনা করিয়া, নিজ নিজ শোক-দুঃখ বিস্মৃত হইও। সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না,—থাকে সুখ দুঃখের স্মৃতি;—আশাও থাকে না, নৈরাশ্যও থাকে না,—থাকে জীবনের কর্ম্ম-সূত্র-নিয়মিত নিত্য-প্রবাহিত-গতি।"

## দ্বিতীয় স্তবক।

শোকাকুলা কন্যা পিতার এই সকল উপদেশ বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া, কিছু কাল নিস্তব্ধবৎ রহিল; তার পর, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলাইয়া, যেন ভয়ে ভয়ে ও ধীরে ধীরে বলিল,——

"বাবা, আপনি যাহা বলিলেন, সবই সত্য; কিন্তু প্রাণে ত প্রবোধ মানে না। যার যায় তারই যায়, ইহা যেন বুঝিলাম; এবং বুকে পাষাণ বান্ধিয়া, পরের মঙ্গল সাধন ও পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে, ইহাও যেন মানিয়া লইলাম। কিন্তু, যে যায় তার কি গতি হয়? কে তাহার সংবাদ লয়? কে তাহার আদর করে? তাহার সহিত আবার কি কখনও সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে? যাহাকে এত ভাল বাসিতাম, এবং পাখীর মত প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া এত যত্নে লালন ও পালন করিতাম, তাহাকে আবার কি কখনও চক্ষে দেখিব; এবং

বুকে সাপটিয়া লইয়া এ দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতে পারিব? আমি কত চেষ্টা করি; কিন্তু কিছুতেই ত, বাবা, আমার সেই প্রাণাধিক ধনকে ভুলিতে পারি না। যাহাকে দণ্ডে দশবার না দেখিলে আকুল হইতাম,—আপনি না খাইয়া ভাল বস্তুটুকু যত্নে খাওয়াইতাম,—শয্যার আর্দ্র অংশে আপনি অতি ক্লেশে রহিয়া, স্বাস্থ্যকর শুষ্ক বস্ত্রে অতি যত্নে আবরিয়া রাখিতাম, তাহাকে সম্মুখবর্ত্তি অনন্ত কালে আর কখনও চক্ষে দেখিব না, এ কথা মনে করিলেই ত আমি চারি দিক্ অন্ধকার দেখি, এবং প্রাণের মধ্যে কেমন এক প্রকার ফাঁপরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকি। তে আরও অনেকে আমার মত আর্ত্তনাদ করিতেছে, এ কথায় তাহাদিগের জন্য অবশ্যই আমার দুঃখের উপর দুঃখ হয়,—দুঃখে প্রাণ অত্যন্তই ছট্ ফট্ করে; কিন্তু আমার আত্মদুঃখের ত নিবৃত্তি হয় না!"

বৃদ্ধ পিতা, এবার অতি গভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"শোন বাছা, আমার কথা শোন,—আমার সমস্ত কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়া হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ। আকাশের ঐ চন্দ্র সূর্য্য তুমি চক্ষে দেখিতেছ। ঐ চন্দ্র সূর্য্য যেমন সত্য বস্তু, মনুষ্যের আত্মা সেইরূপ অথবা ততোধিক সত্য বস্তু। চন্দ্র সূর্য্য, কালের পরিপূর্ণতায়, নিবিয়া যাইতে পারে। চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদিগের এই পৃথিবী, এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহনিচয়ও, কক্ষভ্রষ্ট হইয়া, কালের গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের আত্মার কখনও বিনাশ হইতে পারে না। মনুষ্য জন্মের রাজরাজেশ্বর অথবা রাজপথের ভিখারী, ইহার যে ভাবে,—যে অবস্থায়,—যে প্রকারে কেন এ সংসারে পরিচিত না হউক, মনুষ্যের নাম মনুষ্য;—মনুষ্য মাত্রই দেব-শিশু, ঈশ্বরের অংশ,—অনন্তকাল স্থায়ী—অবিনশ্বর জীব।

"আমি তোমায় সত্যই বলিতেছি, মনুষ্যের ধ্বংস নাই। যাঁহাকে, ভারতবর্ষের বহু কোটি হিন্দু, বহু সহস্র বৎসর হইতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই কর্ম্মযোগ-গুরু কৃষ্ণ এই কথা উপদেশ করিয়াছেন। আজি যাঁহার উপদেশ [illegible], এসিয়া ও ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও প্রদেশে, এত আন্দোলন হইতেছে, সেই তপঃসাগর-মগ্ন বুদ্ধদেব মনুষ্যকে এই সত্য শিখাইয়াছেন; এবং এই সত্যের উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়াই, আপনার রাজ্য, রাজপদ ও রাজলক্ষ্মীসদৃশী রূপ-লাবণ্যবতী ভার্য্যাকে অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যের দ্বারে দ্বারে, ভিক্ষুর আকারে, দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইয়ুরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সকল দেশের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা যাঁহাকে পুত্ররূপী প্রত্যক্ষ ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, সেই নিত্যযোগ-মগ্ন নির্ম্মল-স্বভাব খৃষ্টদেবও, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া, বাহু তুলিয়া, মানবজাতিকে নানা প্রকারে এই মহাসত্য বুঝাইয়াছেন; এবং ভক্তির পুতুল শ্রীগৌরাঙ্গও, এই সত্যই প্রাণে অনুভব করিয়া, হা কৃষ্ণ! বলিয়া অহোরাত্র নয়নজলে ভাসিয়া-

ছেন। পৃথিবীর সকল দেশের ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা দেবপুরুষেরা,—দিব্যদর্শী জ্ঞানীরা, যে কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য, আপনাদিগের বুকের রক্ত ঢালিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই;—এবং ভারতবর্ষের পূতচিত্ত পুরাতন ঋষিরা, যে কথাকে সারাৎসার সত্যরূপে হৃদয়ে অনুভব করিয়া, মুহূর্ত্তের তরেও সংসারের সুখে আসক্ত হইতে পারেন নাই, তুমি কোন্ সাহসে সে কথায় উপেক্ষা করিবে?

"তবে, আমি ইহা বুঝিতেছি যে, আমার উপদেশে তোমার আত্মা সম্যক্ শান্তি পাইতেছে না;—তোমার মুখ্য প্রশ্নের উত্তর হইতেছে না। তোমার তিনটি প্রশ্ন। (১) যাহাকে হারাইয়াছ, সে কি সেই অজ্ঞাত লোকান্তরে, অথবা দেশান্তরে, যাইয়া সুখে আছে? (২) তাহার পিতা মাতা ও ভাই বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনেরা, পৃথিবীতে থাকিয়া, সর্ব্বদা যে তাহার জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে, সে কি তাহা জানিতে পাইতেছে? (৩) তাহার সহিত, সম্মুখের অনন্তকালে, তাহার আপনার-জন-দিগের আবার কি কখনও সাক্ষাৎকার ও সম্মিলনের আশা আছে? আমি তোমাকে অতি সংক্ষেপে এই তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর দিব। যাহা নিঃসংশয় সত্য বলিয়া জানিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। আমি দয়াময় দীনবন্ধুর শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা করি, তাঁহার কৃপায়, তোমার তাপিত প্রাণ প্রকৃত সত্যে শান্তি-লাভ করুক।

"তোমরা সকলেই শিশুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছ যে, মানুষ, মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই, এই পৃথিবীর কোথাও যাইয়া, পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। যে, এই পৃথিবীতে, সোনার অট্টালিকায় বাস করিয়া, এবং সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণাভরণ পরিয়া, সহস্র লোকের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করিয়াছে, সে হয় ত মরিয়া, তাহার কর্ম্মদোষে কাক কিংবা কুকুর রূপে পুনরায় জন্মলাভ করিতেছে, এবং কাক ও কুকুর, কর্ম্মগুণে, অথবা কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে, মৃত্যুর পর, রাজ্য-সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া, স্বপ্নাতীত সুখ-সম্ভোগে কৃতার্থ হইতেছে। এ সকল কথা তোমরা যেমন শুনিয়াছ, আমরাও তেমন শুনিয়াছি; এবং এখনও, পুনর্জ্জন্ম প্রসঙ্গে, এই প্রকারেরই পাঁচ কথা, পণ্ডিত ও মূর্খ, অথবা বৃদ্ধ ও যুবার মুখে, পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু, আমি তোমায় সত্য বলিতেছি, জ্ঞানোজ্জ্বল জগদ্গুরু পুরুষেরা, এবং পুরাতন ভারতের জ্ঞান-বৃদ্ধ বৈদিক ঋষিরা, পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্বের যে প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে এ সকল কথা কোন প্রকারেও সুসঙ্গত হয় না।

"মানুষ যদি মরিয়া কুকুর কিংবা বিড়াল হয়, তাহা হইলে মনুষ্য শ্রাদ্ধ করে কার?—অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া তর্পণ করে কাহার উদ্দেশ্যে? আর অশ্রুবর্ষণেরই বা সার্থকতা থাকে কি? যদি কেহ মৃত্যুর পর পশুদেহে প্রবেশ করে, তবে তাহার আর অস্তিত্ব থাকে কোথায়? মনে কর, তোমার নাম মনু, আর ঐ যে তোমার পার্শ্বে আর একটি শোকানল-জর্জ্জরিতা দুঃখিনী বালিকা বসিয়া

আছে, উহার নাম সুরু। তুমি মনু, আর সে সুরু, এ কথার অর্থ কি? এ কথার সার অর্থ এই যে, তুমি, শিশুকাল হইতে, ক্রমে ক্রমে সংবর্দ্ধিত হইয়া, আপনাকে আপনি মনু নামে এক জন,—এক অপরিবর্ত্তনীয় ব্যক্তি বলিয়া জানিয়া আসিতেছ; আর সেও, আপনাকে সুরু নামে আর এক জন,—আর এক অপরিবর্ত্তনীয় ব্যক্তি বলিয়া জানিয়া আসিতেছে। তুমি যদি মরিয়া, দেশান্তরে যাইয়া, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী অথবা বনবাসিনী রূপে, জন্ম লাভ কর; আর সুরুও যদি মরিয়া, কোথাও যাইয়া, কোন এক তপস্বিনী অথবা শত পুত্রের জননীরূপে জন্ম লাভ করে, তাহা হইলে তুমিই বা 'তুমি' রহিলে কোথায়, এবং সে-ই বা আর 'সে' রহিল কি প্রকারে? তুমি যদি 'তুমি' রহিতে, তাহা হইলে তোমার স্মৃতি থাকিত; এবং সে-ও যদি 'সে' রহিত, তাহা হইলে তাহারও, এ জীবনের সমস্ত কথা সে জীবনে মনে রহিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কাহারও‌ই যখন আপনার উল্লিখিতরূপ মনঃকল্পিত পূর্ব্বজীবনের কোন কথা মনে থাকে না, তখন অবশ্যই মানিয়া লইতে হইবে যে, পূর্ব্বজন্মের প্রকৃত অর্থ অন্য প্রকার।

"সে অর্থ কি? যাহারা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া,—সকল তত্ত্বের দুই দিক্ মিলাইয়া, জীবনের প্রকৃত রহস্য পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা উপদেশ করেন যে, জীব, সর্ব্বপ্রথম, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, চক্ষুর অলক্ষ্য, কীটাণুরূপে জীবন লাভ করে; এবং ক্রমে ক্রমে, জীবনের ক্রম-বিকাশ-ধর্ম্মে, অনন্ত কোটি জন্ম লাভের পর, অবশেষে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া, আত্মচৈতন্য-সম্পন্ন, অহং-জ্ঞান-পূর্ণ জীব-দেব-রূপে জগতে দণ্ডায়মান হয়। এই অসংখ্য জীব-সঙ্কুল বিচিত্র জগতে মনুষ্যই আপনাকে আপনি 'অহং' অর্থাৎ আমি বলিয়া জানে;—অন্য কোন জীব তাহা জানে না; এবং জীবের মধ্যে যে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, আপনাকে আপনি অহং বলিয়া জানিল, তাহার আর, এই পৃথিবীতে, পশুপক্ষীরূপে অথবা অন্য কোন মূর্ত্তিতে, পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"তবে, মনুষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয় কোথায়? পুনর্জ্জন্ম হয় লোকান্তরে, অথবা পরলোকে। সে পরলোক, ধ্রুবনক্ষত্র প্রভৃতির ন্যায় চিন্তার অগম্য দূরবর্ত্তি স্থান নহে। উহা আমাদিগের এই পৃথিবীর সহিতই ওতপ্রোত জড়িত,—সততই আমাদিগের ঊর্দ্ধস্থিত ও সন্নিহিত; এবং সূক্ষ্মতর পরমাণুতে রচিত বলিয়া চর্ম্মচক্ষুর অলক্ষিত। হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে স্বর্গ ও নরক বলে, তাহা ঐ পরলোকে; এবং যাহাকে পিতৃলোক, দেবলোক, বৈরাজধাম, বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সে সমুদয়ও ঐ পরলোকে। উহা অনন্ত স্থান লইয়া ব্যাপ্ত, এবং স্তরে স্তরে বিভক্ত হইয়া, একটি আর একটির উপরে অবস্থিত। উপরিস্থিত স্তরগুলিকে সাধারণতঃ স্বর্গ বলে, এবং অধঃস্থিত স্তর অথবা ধামগুলিকে নরককল্প অথবা নরক বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। মনুষ্য,

মৃত্যুর পর, সূক্ষ্মতর দেহে জন্ম লাভ করিয়া, কর্ম্মফলের তারতম্য অনুসারে, ঊর্দ্ধতন লোকনিচয়ের কোন না কোন লোকে যাইয়া স্বপ্নের অতীত সুখ শান্তি ভোগ করে; এবং যদি সে তাহার পার্থিব-জীবনে নিরন্তর পরপীড়ন ও পর-চিত্ত-দাহনের দ্বারা দুষ্কৃতি সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে, দীর্ঘকাল, অধস্তন, আনন্দশূন্য নরক-প্রতিম স্থানে অবস্থিত রহিয়া, পরিশেষে, ক্রমোন্নতির নিয়মে, উৎকৃষ্টতর লোকে গতি লাভ করে।

বালিকা, এখানে, কোনক্রমেই আর সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে না পারিয়া, আকুল প্রাণে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, পাপ-পুণ্য-জ্ঞানশূন্য শিশুদিগের কি গতি হয়? যাহারা মুহূর্ত্তও মায়ের কোল ছাড়া থাকিতে চাহে না, থাকিতে পারে না; ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্লেশ সহিতে সমর্থ হয় না,—খেলার সাথী না পাইলে ক্ষণকালও প্রফুল্ল কিংবা প্রশান্ত রহে না; তাহারা কোথায় যাইয়া কাহার আশ্রয়ে শান্তি পায়? অস্ফুটন্ত কচি ফুলটিরে গাছের বোঁটা হইতে বল করিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গেলে, সে ফুল কি আর ফোটে?—ফুটিয়া জগতের কোন কাজে লাগে?"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"মা, আমি গুরুর উপদেশে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি পাঠে, এবং প্রত্যক্ষ দর্শনে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া, দৃঢ়তার সহিত তোমায় বলিতেছি,—শিশুরা মৃত্যুর পরক্ষণেই ঊর্দ্ধতন সুখ-স্বর্গে চলিয়া যায়, এবং সেখানে, মায়ের কোলের মত, মনঃ-প্রাণ-শীতল সুখের স্থান,—মাতৃস্নেহের মত মধুর স্নেহসম্পদ লাভ করিয়া, পৃথিবীর সকল দুঃখ, সকল কষ্ট বিস্মৃত হয়।

"মা, তোমরা পরলোককে কি মনে কর? পরলোক আর আত্মা এই উভয় সম্পর্কেই তোমাদের বড় বৃহৎ ভ্রম আছে; এবং সেই ভ্রম হেতুই তোমরা স্বজন-বিয়োগে এত দুঃখ অনুভব করিয়া থাক। পরলোক আকাশ-ব্যাপি বিস্তৃত স্থান হইলেও, আকাশকে এখন যেমন আমরা শূন্য মনে করি, উহা সেইরূপ শূন্য নহে। পরলোকে জল আছে, স্থল আছে,—নদ, হ্রদ, পর্ব্বত, পার্ব্বত্য উপত্যকা, নানা প্রকারের বন, উপবন, আনন্দ-রম্য উদ্যান এবং অসংখ্য তরু-লতা আছে। সে সকল তরু ও লতা পৃথিবীর তরুলতার মত নহে, অথচ তাহারা সর্ব্বাংশে তরুলতা নামের যোগ্য; এবং পৃথিবীর তরুলতা হইতে অধিকতর সুন্দর ও মনোহর। এখানে যেমন তরুলতায় ফুল ফোটে, ফল পাকিয়া জীবের ভোগে লাগে, সেখানেও তরুতে তরুতে, এবং লতায় লতায়, নানা প্রকারের ফুল, আপনা হইতে ফুটিয়া, স্বর্গভূমির শোভা বাড়ায়; এবং নানা প্রকারের স্বাদুমধুর ফল স্বর্গবাসিদিগের সেবা ও ভোগে ব্যবহৃত হয়।

"মনুষ্য এখানে একা থাকে না, সেখানেও একা থাকে না। কেন না, জগদীশ্বর মনুষ্যকে, 'আপনাকে লইয়া আপনি', একা থাকিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। সেখানে সুরনেরা কখনও একা থাকেন না। যাহারা পৃথিবীতে

অশেষ পাপ-অনুষ্ঠান-হেতু, প্রাণের মধ্যে অনুতাপের আগুন লইয়া, পরলোকে যায়, তাহারা কিছুকাল—অতি অল্প কিছু কাল—পারলৌকিক-দণ্ডব্যবস্থার মঙ্গলজনক নিয়ম অনুসারে, একা থাকিতে বাধ্য হয় বটে। কিন্তু যাঁহারা সরল, শান্তিপ্রিয়, সর্ব্বজনের উপকারী, তাঁহারা আপনাদিগের চিত্ত ও চরিত্রের অনুরূপ সাধুহৃদয় সহচর ও অনুচর লাভ করিয়া, দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, আশার অতীত সুখ-শান্তি-সম্ভানে, অবস্থান করেন।

"বস্তুতঃ, মনুষ্য পৃথিবী ও পরলোক উভয় স্থলেই সামাজিক জীব। সমাজেই তাহার জন্ম, সমাজেই তাহার কর্ম্ম, এবং সমাজেই তাহার শিক্ষা, পরীক্ষা ও ক্রমোন্নতি। তবে এই প্রভেদ, এখানে অতি দুর্ব্বৃত্ত দুরাচার, নীচাশয়, নিকৃষ্টমতি মূর্খও, অর্থ বিত্ত, পদ ও প্রভুত্ব, এবং বাড়ী ঘর ও গাড়ি ঘোড়ার মহিমায়, মনুষ্য-সমাজে বড় মানুষ বলিয়া সম্মানের আসন পাইতে পারে। সেখানে কোন ক্রমেই তাহা সম্ভবে না। সেখানকার দেবস্বভাব ও দেব-শক্তিসম্পন্ন অধিবাসীরা ঈশ্বরানুরাগী ও পরার্থপরায়ণ প্রেমিক জ্ঞানি-দিগকেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পূজা করেন; এবং যাহারা প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞানের পথে উন্নত নহে, তাহারা পৃথিবীতে কোটী-শ্বরের পদে অধিষ্ঠিত রহিয়া থাকিলেও, তাহাদিগকে কিছুকাল নিগ্রহযোগ্য নিঃসম্বলের অবস্থায় রাখিয়া মনুষ্যত্বের উচ্চতত্ত্বে উপযুক্ত শিক্ষা দেন।

"পরলোকবাসী নরনারীরা কি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-শূন্য নিরাকার পদার্থ? তাহা নহে। মানুষ, পৃথিবীর স্থূল-তনু-ত্যাগে, মনুষ্যচক্ষুর অদৃশ্য হয়; নিরাকার হয় না। এখানে যেমন তাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সেখানেও তাহার সেইরূপ চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে; এবং এক জনে আর এক জনকে, আকৃতি দর্শনেই, আপনার জন বলিয়া চিনিতে পারিয়া, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করে। কিন্তু সেই আকৃতিতেও একটু বিচিত্র পার্থক্য ঘটে।

"এখানে পাষাণ-কঠোর পাপাত্মাও দর্শনীয় পুরুষ নামে, অনেক স্থলে, শুধু রূপের ছটায়, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; এবং যাহারা, হৃদয়ের অভ্যন্তরে, রক্তশোষিণী রাক্ষসী, অথবা পরকীয় প্রাণ-শোষিণী পিশাচী, তাহারাও বাহিরের রূপে রূপসী সাজিয়া, রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রূপের গৌরবে রাজমহিষীর মত পূজা পাইয়া থাকে। কিন্তু পরলোকে, আকৃতির পরিবর্ত্ত না ঘটিলেও, প্রকৃতির উচ্চতা ও নীচতা, পবিত্রতা ও অপবিত্রতার তার-তম্য-অনুসারে, রূপে বড় বৃহৎ পার্থক্য ঘটে। কারণ, সেখানে সকলেই অন্তরে বাহিরে এক। যিনি অন্তরে উদার, আনন্দময়, ঈশ্বর-প্রেমে অভিমানশূন্য, এবং সর্ব্ব জীব-সম্পর্কে অকৃত্রিম-প্রীতিস্নেহ-পূর্ণ সজ্জন, তিনি দেব-যোগ্য, দেব-ভোগ্য জ্যোৎস্নাশীতল মূর্ত্তি লাভ করিয়া দেবতা-দিগের মধ্যে উপবিষ্ট হন। পক্ষান্তরে, যাহারা এই পৃথিবীতে, ধন-মানের মত্ততায়

আত্মবিস্মৃত, এবং অন্তরে ক্রোধ, কুৎসিত লালসা, হিংসা, অসূয়া, অভিমান ও আত্ম-ম্ভরিতার অতৃপ্ত আগুনে অহোরাত্র জর্জ্জরিত, তাঁহারা সেখানে যাইয়া, আকৃতির পরিচয় সত্ত্বেও, কিয়ৎকালের জন্য অতি কদর্য্য মূর্ত্তি লাভ করেন; এবং আপনার মূর্ত্তি দর্শনে আপনিই দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া, ঘৃণা ও লজ্জায় দশ জন হইতে দূরে সরিয়া পড়েন।

"আর এক কথা আছে। অনেকেরই এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, যাহারা দেহপিঞ্জর হইতে মুক্ত হইয়া দেব-ধামে অথবা লোকান্তরে চলিয়া যায়, তাহাদিগের আর কোন কর্ম্ম থাকে না। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের কর্ম্মত্যাগ ঘটে; এবং তাহারা কর্ম্মজীবন হইতে একবারে অব্যাহতি পাইয়া, অনন্ত কালের তরে, সুখ-স্বপ্নময় নিদ্রার ক্রোড়ে, শয়ানী রহে। এ ধারণাও নিতান্ত অমূলক। পৃথিবী যেমন মনুষ্যের জন্ত কর্ম্মক্ষেত্র, পরলোকও সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্র; এবং সেখানে বড় ও ছোট উন্নত ও অবনত সকলেই কর্ম্মরত। তবে, এখানকার কর্ম্মে আর সেখানকার কর্ম্মে ঘোরতর প্রভেদ। এখানকার এক প্রধান কর্ম্ম দেহরক্ষা; এবং দেহপরিরক্ষণের জন্য অন্ন বস্ত্র, ঔষধ পথ্য, গৃহবাস ও বাস্তভূমি প্রভৃতি সংগ্রহে শিক্ষা ও শক্তিপরীক্ষা। এই প্রকার কর্ম্ম সেখানে নাই। কেন না, সেখানে মনুষ্য, ক্ষুৎপিপাসার তাড়না হইতে প্রথমতঃ একবারে মুক্তি লাভ না করিলেও, অধ্যাত্ম-জগতের অযত্নসুলভ ফল-মূলের দ্বারাই, সে সামান্য ক্ষুৎপিপাসার সন্তর্পণ করিতে পারে। সুতরাং, কেহই সেখানে ক্ষুৎপিপাসার প্রণোদনায়, পরের অধীন হয় না, অথবা পরের দিকে চাহিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় না। অপিচ, শারীরিক সুখের লালসা ও সাংসারিক প্রভুত্বের পিপাসায়ও সেখানে কাহারও কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। তবে, সেখানে কর্ম্ম করিতে হয় কি লইয়া? এই কথাটা একটুকু বুঝাইয়া বলিব।

"মানুষ এই পৃথিবীতে দেহরক্ষণের কার্য্য ছাড়া আর যত প্রকার কর্ম্ম লইয়া ব্যাপৃত রহে, তাহার মূল-সূত্র অথবা মূল-মন্ত্র দুই। (১) শরীরের সুখ, (২) সাংসারিক প্রভুত্ব। এই দুই সূত্র অথবা দুই মন্ত্রেই পৃথিবীর সমস্ত কর্ম্ম-চক্র, রথ-চক্রের ন্যায়, আবর্ত্তিত ও বিবর্ত্তিত হইতেছে;—মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের বিবাদ ও যুদ্ধ বাধিতেছে, অথবা বিবাদ ও যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইতেছে;—পৃথিবীর সহস্র প্রকার ব্যবসায়, বহমানা নদীর ন্যায়, তর-তর বেগে চলিতেছে;—মনুষ্য, মাংসগৃধ্নু শকুনি ও গৃধিনীর মত, শোঁ শোঁ শব্দে, বহু দূর হইতে আপতিত হইয়া, পরের বুকে ছোঁ মারিতেছে,—অথবা কদন্নপুষ্ট কাকের মত নিরন্তর কোলাহল করিয়া প্রতিবেশীর উপদ্রব জন্মাইতেছে; কখনও বা ব্যাঘ্রভল্লুকের ন্যায় বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া,—কখনও বা শৃগাল ও সর্পের ন্যায় নিঃশব্দ-গতিতে অগ্রসর হইয়া, পরের সুখ-শান্তিটুকু কাড়িয়া লইতেছে,—পরের সুখে বিষ ঢালিতেছে।

"উল্লিখিতরূপ অকর্ম্ম অথবা অপকর্ম্ম পৃথি-

বীতে অনুষ্ঠিত হয়, এবং পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে ; মনুষ্য দুষ্কৃতির বোঝার মত উহার স্মৃতি মাত্র বুকে লইয়া লোকান্তরে প্রবেশ করে। ইহা আবারও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এমন অবস্থায়, সেখানে কর্ম্ম থাকে কি ? কর্ম্ম থাকে যাহা মানব-জীবনের প্রকৃত কর্ম্ম,—জ্ঞান-উপার্জ্জন আর জ্ঞান-বিতরণ;—প্রেম, ভক্তি ও পুণ্য উপার্জ্জন, এবং প্রেম, ভক্তি ও পুণ্য বিতরণের দ্বারা পরের প্রাণ-তর্পণ—পরের মঙ্গলসাধন।

"যাহারা এই শেষোক্ত প্রকারের কর্ম্মকে কর্ম্ম বলিয়া বোঝে না,—প্রকৃত কর্ম্ম বলিয়া অনুভব করে না,—অথবা বুঝিয়া ও অনুভব করিয়াও, এইরূপ কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে, প্রাণে স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ পায় না, তাহারা কতকটা সময় বড়ই কষ্ট পায়। কারণ, তাহাদিগের কোনই কর্ম্ম থাকে না। জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার, অনন্ত সমুদ্রের মত, সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে ; জ্ঞানের অনুশীলনে তাহাদিগের মন যায় না। প্রেমময়ের অনন্ত প্রেম-জগৎও সেইরূপ পুরোভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে ; প্রেমেও তাহাদিগের পিপাসা জন্মে না। তাহারা কর্ম্ম করিবে কি লইয়া ? সুতরাং তাহারা নিরন্তর শুধুই তাহাদিগের পার্থিব জীবনের অকর্ম্ম ও অপকর্ম্মনিচয় স্মরণ করে; এবং অন্তরে অনুতাপের তুষানলে তাপিত হইয়া অহোরাত্র অশ্রু জলে ভাসে।

"পক্ষান্তরে, যাঁহারা উন্নতির পথ লইতে ইচ্ছুক,—জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়া, মনুষ্যত্বের উচ্চতর গ্রামে এবং পারলৌকিক জগতের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিবার জন্য লালায়িত, তাঁহাদিগের কর্ম্মের আর অবধি নাই। তাঁহারা যদি পৃথিবীতে নানা প্রকারে বহু লোকের অপকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রথম কর্ম্ম, নানা সূত্রে ও নানা প্রকারে, পরলোক প্রবিষ্ট সেইলোকের উপকার সাধনের দ্বারা জীবনের প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন। যাঁহারা সে বিষয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চিত্তে নিশ্চিন্ত ও হৃদয়ে নির্ম্মল হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখ্য কর্ম্ম অশেষপ্রকার জ্ঞান-উপার্জ্জন, এবং আপনা হইতে অধঃস্থিত অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানদিগের মধ্যে সেই জ্ঞানামৃত বিতরণ।

"এই যে পৃথিবী হইতে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অসংখ্য অশিক্ষিত মূর্খ, এবং সুখ-সম্মান-সংবর্দ্ধিত অভিমান-দগ্ধ শিক্ষিত মূর্খেরা, পিপীলিকার সারির মত, প্রতিদিন পালে পালে পরলোকে প্রবেশ করিতেছে, ইহারা কি সেখানে যাইয়া এক মুহূর্ত্তেই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান লাভ করে ? ইহা অসম্ভব ও অপ্রাকৃত। এখানেও যেমন মনুষ্য, ভগবানের নিয়মিত ব্যবস্থায়, ক্রমে ক্রমে, শিক্ষার শ্রমে, উন্নতি লাভ করে ; সেখানেও, সকলেই সেইরূপ, ক্রমে ক্রমে, শিক্ষার শ্রমে, উন্নতির পর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। অতএব, অশিক্ষিত নরনারীর শিক্ষাদান এবং পাপ-তাপ-জর্জ্জরিত দুর্ম্মতিদিগের তাপনিবারণ ও পরিত্রাণ-বিধান যাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য, সেখানে কত প্রকার কর্ম্মে তাঁহাদিগের সতত

ব্যাপৃত রহিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

"পারলৌকিক জীবনের এইরূপ অনন্ত কর্ম্মের মধ্যে এক প্রধান কর্ম্ম শিশুপালন, শিশুসংরক্ষণ, এবং শিশুর শিক্ষা, শান্তি, উন্নতি ও মঙ্গল সম্পাদন। পৃথিবীর যে সকল রমণী, পরলোকে যাইয়া, পুণ্যবলে উন্নত দেবতা হইয়াছেন, এবং প্রীতিস্নেহের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় জ্যোৎস্নাময় তনু লাভ করিয়াছেন, এই কার্য্য তাঁহাদিগেরই কার্য্য। তাঁহারা, উচ্চশ্রেণীস্থ দেবপুরুষদিগের উপদেশ ক্রমে, সর্ব্বদা পৃথিবীতে আসিয়া, দুঃখক্লিষ্টের সংবাদ লইতেছেন;—প্রাসাদে কিংবা পর্ণকুটীরে যাতায়াত করিয়া, বিপন্ন শিশুদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; এবং যে সকল শিশু, বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত, মায়ের বক্ষঃস্থল হইতে অকালে খসিয়া পড়িতেছে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বড়ই আদরে বুকে তুলিয়া, লালনপালনের অভিলাষে, ঊর্দ্ধতন স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন। দেবাত্মারা সে স্বর্গস্থলীর যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, মনুষ্য কোন দিন চক্ষে যাহা দেখে নাই, কর্ণে যাহা শুনে নাই, এবং কল্পনারও যাহা চিন্তা করিতে পারে নাই, সেইরূপ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল আনন্দ, নির্ঝর জলের ন্যায়, সেখানে সতত উছলিয়া পড়িতেছে; এবং শিশুরা সেই দেবধামে স্থান লাভ করিয়া, নানারূপ শিক্ষা ও শক্তি লাভে, দেব-শক্তিতে বর্দ্ধিত হইতেছে।"

বৃদ্ধ পিতা, এই সুদীর্ঘ কথায় পরিসমাপ্তি করিয়া, তদীয় শোকাতুরা দুহিতাকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন,—"মা, আমার এই সকল কথায় অবিশ্বাস করিও না। আমি যাহা কিছু বলিলাম, সমস্তই সত্য, এবং ইহাই পারলৌকিক জগতের প্রকৃত বৃত্ত। এ সকল কথা কাহারও মনগড়া কথা নহে,—অনুমানের বিবৃতি নহে। যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা, অধ্যাত্মসাধনার বিশেষ প্রণালীতে, পরলোক-গত নরনারীর দর্শন লাভ করিয়াছেন, অথবা অন্য প্রকারে দেবাত্মার উপদেশ পাইয়াছেন, তাঁহারাই মানবজাতির মঙ্গলার্থ এই সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি পুনরপি বলিয়াছি, তাঁহারা যাহা জানিয়াছেন, তাহা সত্য,—অভ্রান্ত সত্য—অমূল্য ও অমৃতময় সত্য। * তুমি যাঁহাকে হারাইয়াছ, সত্যই তুমি আবার তাহাকে দেখিতে পাইবে; এবং তোমার বুকের ধন বুকে পাইয়া ভগবান্ করুণানিধানের

* যে সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি এইপ্রসঙ্গে রীতিমত প্রমাণপর্য্যালোচনা করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে পঁহুছিতে চাহেন, তাঁহারা গণিতবিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক De. Morgan কর্ত্তৃক প্রকাশিত "From Matter to Spirit" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, Hon'ble J. M. Peebles প্রণীত "Immortality and Our Employments hereafter," Loren Albert Sherman প্রণীত "Science of the Soul," দেব-চরিত্র William Stainton Moses প্রকাশিত "Spirit Teachings" এবং Eppes Sargent প্রভৃতি সুবিখ্যাতনামা তাত্ত্বিকদিগের গ্রন্থপত্র মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

পদারবিন্দে, গভীর কৃতজ্ঞতায়, হাসিমুখে,—হর্ষাশ্রুসিক্ত প্রফুল্লচক্ষে, মাথা নোয়াইবে। সে, কালের অন্ধকার-সমুদ্রে ডুবিয়া না যাইয়া, শিশুসমুচিত সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তিতে জীবিত আছে; এবং বৃক্ষ যেমন জলসেকে ধীরে ধীরে বাড়ে, সেও সেই প্রকার ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। সে তাহার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পরলোকগত আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পাইতেছে;—তাহার পালয়িত্রীদিগের স্নেহ ও বাৎসল্যে, সময়ে সময়ে, পৃথিবীতে আনীত হইয়া, তোমাকেও দেখিয়া যাইতেছে; এবং তোমাদিগের ঘরের যে সকল শিশু তাহার আগে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে, নানারূপ ক্রীড়ার আনন্দে বর্দ্ধিত হইতেছে। সে এখানে পাঁচ বৎসর কিংবা দশ বৎসর যেমন তোমার পুত্র ছিল, লোকান্তরে ও চিরকাল—অনন্তকাল—পুরোবর্ত্তি কোটি-যুগ-ব্যাপি সীমাশূন্য কাল ব্যাপিয়া তোমারই প্রাণাধিক পুত্র রহিবে। এই বিশ্ব সৃষ্টি বিপর্য্যস্ত হইলেও, সৃষ্টিকর্ত্তার এই সুখময় ব্যবস্থার ব্যত্যয় হইবে না।

"তোমরা পৃথিবীতে থাকিয়া, শোকের আবেগে, কুররীর মত সর্ব্বদা যে আর্ত্তনাদ কর, তাহাতে লোকান্তরিত শিশুর প্রাণ সন্তাপিত হয় ও ক্লেশ পায়। অতএব ইহা আর করিও না। যে শিশু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে দূরগত সন্তানের ন্যায়, সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে; এবং যদি তাহাকে অচিরেই আবার নয়ন ভরিয়া দেখিতে চাও, তাহা হইলে ক্রোধ, ঈর্ষা, অভিমান ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিনিচয়কে বিছুটির ন্যায় হৃদয়কানন হইতে উন্মূলন করিয়া, হৃদয়ে ও মনে সর্ব্বপ্রকার দেবভাব পোষণ করিবে। যদি জীবনের অনুষ্ঠানে,—প্রীতি ও পবিত্রতার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল্য-বিধানে, দেবতার মত হইতে না পার, তাহা হইলে, মৃত্যুর পরক্ষণেই দেবলোকগত নিষ্পাপ শিশুর দর্শন লাভ করিবে কি প্রকারে? যাঁহারা চিত্ত ও চরিত্রগত উদারতায় পৃথিবীতে থাকিয়াই দেব-প্রকৃতি লাভ করেন, তাঁহারা পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, চক্ষু বুজিবার সময়েই পরলোক-গত পুত্র-কন্যা প্রভৃতির প্রেমানন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন; এবং জয়-জগদীশ্বর-করুণাময় প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, সুখ-শান্তিতে, স্বর্গে চলিয়া যান। আমি হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, তোমারও এইরূপ সদ্গতি হউক; এবং তুমি যাহাদিগকে হারাইয়াছ, তাহারা আবার তোমার জীবনের সাথী হইয়া, কৃতার্থতা লাভ করুক। তোমার মুখচ্ছবি দেখিয়া বুঝিতেছি যে, আমার এ সকল কথা সম্পূর্ণরূপে সত্য কি না, সে বিষয়ে তোমার মন এখনও যেন একটুকু সংশয়ে দোলায়িত হইতেছে। আমি এ প্রসঙ্গে, তোমার কাছে, কল্য হইতে কএকটি আশ্চর্য্য অথচ ইতিবৃত্তমূলক প্রকৃত তত্ত্বকাহিনী কহিব। সে কাহিনীগুলি মনোযোগপূর্ব্বক শুনিলে, তুমি আপনিই বুঝিতে পাইবে যে, ঈশ্বর সত্য, পরলোক সত্য,—এবং ঈশ্বরের অনন্ত করুণাময় অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে, পারলৌকিক-জীবনে, পরস্পরের পুনর্ম্মিলন ও সুখ-শান্তি-সমুন্নতির যে বিধান রহিয়াছে, তাহাও সর্ব্বতোভাবে সত্য।

# প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের মনোজ্ঞ পাত্রী।

মন যারে চায়।—অথবা যে মনকে আপনার অস্তিত্ব জানাইয়া * সতত আনন্দে নাচায়, এবং সুতরাং—মন যার পাছে পাছে, মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, উড়িয়া বেড়ায়, মানুষের ভাষা তাদৃশ জনকেই মনোজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করে। কিন্তু মন, মনোভব-প্রনোদিত প্রীতিস্ফুরিত পিপাসায়, কাহার তরে আকুল হইয়া, আপনার পুরাতন-প্রবৃত্তি-রূপি তরুকোটরের বাসা ছাড়িয়া, ঐরূপ প্রধাবিত হয়, তাহা খুব সহজেই অবধারণ করা যায় কি?

যুব-জনদিগের মন, সাধারণতঃ, নয়নের অনুবর্ত্তি বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকে। কারণ, নয়ন যেখানে লইয়া যায়, উহা সেখানেই যাইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ উপবিষ্ট রহে। কবিকুল-শিরোমণি শেক্ষপীরও, এই নিমিত্ত, প্রণয়োন্মাদিত যুবজনের নয়নকে প্রকারতঃ পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন,——

"The Lover, all as frantic, sees Helen's beauty in a brow of Egypt."

অর্থাৎ—

প্রেমিক পাগলপারা—মৈশরীর চোখে,
নিরখে রূপের ডালি হেলেনার রূপ।

পাঠককে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক যে, এখানে মৈশরী শব্দে মিশরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মনোমোহিনী ক্লিওপেট্রাকে বুঝায় না; বুঝায় আফ্রিকার স্থূলাধরা, স্থূলতরোদরা, বিকট-নয়ন-কোটরা, বীভৎসরূপ-কঠোরা কাফ্রী রমণী, অথবা জিপ্‌শী যাদুকরী। কিন্তু প্রেমিক-যুব-জনের 'নয়নে' সেও হৃদয়-মনোহারিণী।

নয়নের সহিত মনোনয়নের কিরূপ নিকট সম্পর্ক, তাহা বুঝাইবার জন্য, কবি তাঁহার নিদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন নামক অমোদময় নাটকের আরম্ভস্থলে কথাটা আরও খুলিয়া বলিয়াছেন। নাটকের অন্যতম নায়িকা হার্‌মিয়া লাইসেন্দর নামক যুব-জনে অনুরাগিণী। পিতার অনুরাগ ডেমিট্রিয়স নামক পাত্রান্তরে। তিনি তাহাকেই, সুপাত্র বিবেচনায়, কন্যা দানের জন্য কৃতসংকল্প; এবং কন্যা প্রেমোন্মাদে কতকটা আত্মহারা বলিয়া, তাহার শাসনের জন্য, রোষ-কষায়িত হৃদয়ে,

* মনকে যে জানে এইরূপ অর্থ করিলে, ফুল ফল, লতা পাতা প্রভৃতি অজ্ঞান—অচেতন বস্তুকে মনোজ্ঞ বলা যায় না। কারণ, তাহারা ত কিছুই জানে না,—কিছুই জানিতে পারে না। বৈয়াকরণেরা, এই হেতু, এই স্থলে, অন্তর্ভূত-ণিজর্থতার আশ্রয় লইয়া, "জ্ঞাপয়তি—বোধনায় প্রবণীকরোতি" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এ অর্থে চেতন ও অচেতন সকলেই মনোজ্ঞ হইতে পারে,—সকলেই না জানিয়া জানাইতে,—না নাচিয়া নাচাইতে পারে।

রাজদ্বারে সমাগত। রাজা, পিতার পক্ষপাতী হইয়া, হার্‌মিয়াকে স্নেহের মধুর ভাষায় প্রবোধ দিয়া, ধীরে ধীরে অনেক কথা বলিলেন। যাহা বলিলেন, তাহার সারার্থ এই যে, ডেমিট্রিয়স্‌ই অপেক্ষাকৃত সুন্দর এবং সর্ব্বাংশে মনোজ্ঞ-মনোহর। বালিকা হার্‌মিয়া, তখন মুহূর্ত্তেরও আর অপেক্ষা না করিয়া, মাথা নোয়াইয়া, মৃদু মৃদু স্বরে বলিল,——

"I would, my father look'd but with my eyes."

পূর্ব্বতন বঙ্গের প্রেমিককবি নিধুর ভাষায় এই বিখ্যাত পংক্তিটির অনুবাদ করিলে বলা যাইতে পারে,—

আমারি নয়ন দিয়ে বারেক নিরখি তারে,
দেখুন বিচারি পিতা, বিচারে সে কিসে হারে।

হিন্দু বালিকারা হয় ত বেচারা হারমিয়াকে এখানে যার-পর নাই বেহায়া বলিয়া ছি-ছি থুৎকার দিতে চাহিবেন; কেহ হয় ত, তাম্বুলাক্ত অধরে শ্লেষের হাসি হাসিয়া, উহাকে পাপীয়সী বলিয়াও গালি দিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মনে রাখা উচিত যে, হার্‌মিয়া যে দেশে জন্মিয়াছে,—যেরূপ সমাজে ফুটিয়াছে—এবং যেরূপ শিক্ষা, সংসর্গ ও সুখ-দুঃখ-চিন্তার ভাবমণ্ডলে ক্রমে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে উহার মুখে এইরূপ কথাই স্বাভাবিক ও সম্ভব। যাহা হউক, হার্‌মিয়ার কোন কথাতেই মুখ্য কথার মীমাংসা হইতেছে না। মনোজ্ঞ-নির্ব্বাচনে নয়ন আর মন কাহাকে গুরু বলিয়া মানিব? নয়নকে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক বলিয়া উপেক্ষা করিলে, এ সংসার-উদ্যানে, কিরূপে শুধু মনের সাহায্যে, মনোজ্ঞ জন বাছিয়া লইতে সমর্থ হইব?

জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ, নয়নকে নিতান্ত অবিশ্বস্ত জ্ঞানে অনাদর করিয়া, প্রণয়-পূজার্হ পাত্রী-নির্ব্বাচনেও, একমাত্র মনকেই উপদেষ্টার আসন দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদিগের মতে মনেরনাম "সূক্ষ্মার্থপরিণাম-দর্শিনী মনঃশক্তি,—অর্থাৎ ফলাফল-তত্ত্বানুসারিণী, বিচার-বর্ত্মবিহারিণী, শান্তিসুখাভিলাষিণী বুদ্ধিবৃত্তি।" তাঁহারা, এইহেতু, গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, রূপমুগ্ধ যুবজনের ন্যায় নয়নের প্রতারণায় বিশ্বাস করিতে নাই। বিশ্বাস করিবে শুধুই বুদ্ধিকে। কেন না, বুদ্ধি অলভ্য সুখের অমূলক আশায় রূপ দেখিয়া ভোলে না; এবং বুদ্ধির কাটা—কখনও চটুল চক্ষের চোরা কটাক্ষ অথবা ঐরূপ আর কোন চিত্তহারি চাতুরীতে সম্যক্‌ হেলে না। কিন্তু বুদ্ধিভ্রান্ত, বিচার-বিমূঢ় প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরাও, 'মনোজ্ঞ' পাত্রীর অন্বেষণে, পরিশেষে নয়নেরই আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া, সংসারে কিরূপ উপহসিত হইয়াছেন, ইতিহাসে ইহার অনেক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত আছে। এক বিশেষ ও বিখ্যাত দৃষ্টান্তস্থল দিগন্ত-বিশ্রুত কেপ্‌লার। বৃদ্ধ কেপ্‌লারের বিবাহের কাহিনী বঙ্গীয় যুবক-যুবতীদিগের নিকট নিশ্চয়ই নিতান্ত বিচিত্র বোধ হইবে।

কেপ্‌লার পণ্ডিতের মধ্যে পণ্ডিত,—

পণ্ডিত-কুল-চূড়ামণি, প্রতিভার জলন্ত * বিগ্রহ। যাঁহারা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রবিষ্ট, তাঁহাদিগের কাছে কেপ্‌লারের নাম আর জগদানন্দ নিউটনের নাম নিত্য-স্মরণীয় বলিয়া সমান। নিউটন জন্মিয়াছিলেন ইংলণ্ডে; তাই তিনি আমাদিগের নিকট একটু বেসী নিকটবর্ত্তী। কেপ্‌লারের জন্মস্থান জর্ম্মণী; এইহেতুই তিনি আমাদিগের কাছে অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদের নিকট কেপ্‌লার দূরবর্ত্তী নহেন। কারণ,তাঁহার গ্রন্থ পত্র পাঠ না করিলে,—তাঁহার যে সকল বিখ্যাত সিদ্ধান্ত 'Kepler's Laws' অর্থাৎ কেপ্‌লারের আবিষ্কৃত বিধি নামে পণ্ডিত-সমাজে পরিচিত, তাহার অর্থগ্রহ না করিতে পারিলে, কেহই. জ্যোতিষশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন না। এ হেন কেপ্‌লার, বৃদ্ধকালে, আবার বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া,—আকাশের অনন্ত কোটি নক্ষত্রের তত্ত্বপরীক্ষায় জীবনযাপনের পর, জীবনের শেষ ভাগে, আবার এক নূতন জীবন-সঙ্গিনীর অনুসন্ধানে বাহির হইয়া, কত রঙ্গ করিলেন—কত ঘাটে কত প্রকার জল খাইয়া কিরূপ বিড়ম্বিত হইলেন, তাহা আলোচনা করিলে, পাঠকের নিশ্চয়ই একটুকু আমোদ হইবে; এবং আমোদের সঙ্গে সঙ্গে, বোধ হয়,—একটু,—অন্ততঃ অল্প একটু—উপকারও হইবে।

কেপ্‌লারের পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-গুরুর নাম ( Tycho Brahe ) টিকোব্রাহি। টিকোব্রাহি যে সময়ে জর্ম্মণীর সাম্রাজিক-জ্যোতির্ব্বিদ্, ( Imperial Astronomer ) নামে জগতে পরিচিত, সেই সময়ে কেপ্‌লার নবীন যুবা। তিনি তখনই আপনার নবোদ্গত প্রতিভার ছটায় সকলের বিস্ময় জন্মাইলেন; এবং উদারহৃদয় টিকোব্রাহির আশ্রয় পাইয়া, সমীর-সন্ধুক্ষিত বহ্নিশিখার মত, অতি দ্রুত বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন। টিকোব্রাহি, কিছুকাল পরে, বার্দ্ধক্য হেতু, সরিয়া পড়িলেন; কেপ্‌লার তাঁহার উচ্চ আসনে সমাসীন হইয়া, এবং জর্ম্মণ সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া, জ্যোতিষশাস্ত্রের নূতন সম্রাট্ রূপে ইয়ুরোপে সম্মানিত হইলেন।

এইরূপ সুখ-সৌভাগ্য ও সমুন্নতির দিনে অকস্মাৎ কেপ্‌লারের গ্রহবৈগুণ্য ঘটিল। তাঁহার বর্ষীয়সী স্ত্রী স্বর্গগত হইলেন। তাঁহার এক বয়স্থ পুত্র ছিল। সে পুত্রও পিতার ন্যায় পণ্ডিত হইবে, অনেকের মনে এমন আশা ছিল। সে ফুটিতে না ফুটিতেই মায়ের সঙ্গে লোকান্তরিত হইল। কেপ্‌লার কিছুকাল শোকে জর্জ্জরিত রহিলেন, এবং শোকের অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু সংসারের সকল স্থলে, শুধু অশ্রুজলে, শোকের অনল নির্ব্বাণ হয় না। কেপ্‌লারেরও হইল না। তিনি কিছুকাল

* জলন্ত, জীবন্ত, ফুটন্ত, অফুটন্ত এবং সিঞ্চন প্রভৃতি কয়েকটি অব্যুৎপন্ন অথচ শ্রুতিমধুর শব্দ বাঙ্গালায় কি রূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আর এক স্থলে বলিব।

পরেই বুঝিতে পাইলেন যে, তাঁহার উন্নত জীবন, উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনীর অভাবে, এ ভাবে, নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা ভাল নহে। কিন্তু সে জীবন-সঙ্গিনী কি রূপে মিলিবে? তিনি কি মূর্খ যুবজনদিগের ন্যায় রমণীর মুখচ্ছবি দেখিয়া ভুলিবেন? তাঁহার মত প্রাজ্ঞ পণ্ডিত কি 'মনোজ্ঞ'-জন-নির্ব্বাচনে শুধুই নয়নের প্ররোচনায় প্রতারিত হইয়া, পরিণামে পাণ্ডিত্যের নাম হাসাইবেন? শাস্ত্রে এমন লেখে না। ইহা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

কেপ্‌লার এ সকল কথা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া, তাঁহার অনুগত বন্ধু বান্ধবদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন; এবং কি রূপে বুদ্ধি, বিবেচনা এবং বিজ্ঞান-সম্মত-বিচার-প্রণালীতে একটি মনোজ্ঞ পাত্রী নির্ব্বাচন করা যায়, তাহার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা, ইঙ্গিত বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইলেন; এবং ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার পাত্রীর পরিচয় লইয়া, নিজ নিজ মন্তব্য সহকারে, রিপোর্ট দাখিল করিলেন। অত বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কেপ্‌লার, আজি বৃদ্ধ বয়সে, পুনরায় যখন বিবাহের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, তখন এ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করা, অনেকেই নিতান্ত সুসঙ্গত বলিয়া মনে বুঝিলেন। কেহ কেহ, কেপ্‌লার-সদৃশ ব্যক্তির জন্য কামিনী নির্ব্বাচনের ভার পাইয়া, আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞানে, আনন্দে অধীর হইলেন।

কেপ্‌লার কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর সহায়তায় সে রিপোর্টগুলির অদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের পরীক্ষা-প্রণালীতে তাহার এক বৈজ্ঞানিক তালিকা প্রস্তুত করিলেন;—এবং সেই তালিকায় পাত্রীদিগের নাম ১নং, ২নং, ৩নং ও ৪নং এইরূপ নম্বর-ওয়ারি পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করিয়া, ক্রমান্বয়ে কএকটি মাস তাহাদিগের দোষ-গুণ-চিন্তায় নিবিষ্ট রহিলেন। তিনি নয়নের সাক্ষ্যে নির্ভর করিবেন না, সুতরাংই এইরূপ পরীক্ষা অপরিহার্য্য। জ্ঞান-যোগে পরীক্ষা না করিলে, কোন্ পাত্রী কি গুণে তাঁহার মনোজ্ঞ হইবে, তাহা নিরূপণ করিবেন কিরূপে?

উল্লিখিত তালিকায় যিনি এক নম্বর পাত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিলেন, তিনি বিধবা,—বর্ষীয়সী না হইলেও অবৈজ্ঞানিকদিগের নয়নে বিবাহের অযোগ্যা। তবে, তিনি কেপ্‌লারের পূর্ব্বতন জীবনসঙ্গিনীর প্রিয়সখী। ইহা তাঁহার গুণসম্পদের মধ্যে এক বিশেষ গুণ। কেপ্‌লার এই আকর্ষণে কিছুকাল তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে রহিলেন। এ যাতায়াত তাঁহার নয়ন কিংবা প্রণয়নের উপর কোন প্রকার প্রভুত্ব করিতে পারিয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না। যাহাই হউক, এখানে একটা ভয়ানক প্রতিবন্ধক ঘটিল। প্রণয় যখন ফোটে ফোটে, তখনই উহার পথে একটা অচিন্তিত অন্তরায় যুটিল।

এই বার্দ্ধক্যসন্নিহিতা বিধবার দুইটি বিবাহযোগ্যা যুবতী কন্যা ছিল। কেপ্‌লারের

মন—নয়ন নহে—মন—একবার যাইত সেই বিধবার দিকে, আবার যাইত তাঁহার যুবতী দুহিতা দুইটির দিকে। বিধবা যখন ইহা বুঝিতে পাইলেন, তখন তিনি অন্তরে যার-পর-নাই ব্যথিত হইয়া পাত্রীপরীক্ষার ব্যাপার হইতে সরিয়া পড়িলেন; এবং কেপ্‌লারের তালিকা হইতে তাঁহার নাম চির জীবনের তরে খারিজ হউক, এই প্রার্থনা জানাইলেন। কেপ্‌লার, হতাশ-হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া, তালিকার পার্শ্বে নোট লিখিলেন। নোটে অনেক কথা ছিল। তাহার প্রধান কথা এই যে, আকাশের নক্ষত্রনিচয় এ বিবাহের অনুকূল নহে।—"Have the stars exercised any influence here &c."

কেপ্‌লারের এইরূপ নোটগুলি চরিতাখ্যায়কেরা যত্নের সহিত সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন; অনেকে সেই নোটের উপর আবার নোট অর্থাৎ টীকাটিপ্পনী লিপিবদ্ধ করিয়া আপনার সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস, উচ্ছ্রিত, উন্নত, অসাধারণ পুরুষদিগের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কথা লইয়াও, আলোচনা করিতে ভালবাসে। সুতরাং কেপ্‌লারের এ সকল নোট যে ঐতিহাসিক আখ্যায়িকায় আদরের সহিত ঠাঁই পাইয়াছে, ইহা কোন অংশেও বিস্ময়াবহ নহে। নোটগুলির উপর আমিও কিছু কিছু নোট লিখিব বলিয়া অনেক দিন হইতে মনে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। কারণ, পরের লেখার উপর নোট লেখা বড়ই আমোদ-জনক। কিন্তু আমার সে সুদীর্ঘ নোট বান্ধবের আয়তনে কুলাইবে না, এবং পাঠকবর্গেরও হয় ত ভাল লাগিবে না, এই নিমিত্ত আমার সে আকাঙ্ক্ষা এখানেই অগত্যা পরিত্যক্ত হইল।

নোট লিখিব না, একটা কথা কহিব। কেপ্‌লার, তাঁহার তালিকার দশ নম্বর পাত্রীর নামের পার্শ্বে, তদীয় বংশমর্য্যাদা, ভাগ্যবৈভব এবং আরও বহু গুণের আলোচনা করিয়া লিখিয়া রাখিলেন,—"আমি অতি কৃশ, কঙ্কাল-সদৃশ, শুষ্ক-মাংস; ইনি খর্ব্বাকৃতি ও স্থূলদেহী। এ দুয়ে প্রণয় হইতে পারে কি?" না পারিবে কেন? প্রণয় নয়নে না মনে? প্রণয়ের সহিত যাহারই যেমন সম্পর্ক থাকুক, এই নোটটুকু পড়িবার সময়ে পাঠক অবশ্য বুঝিতে পাইবেন যে, কেপ্‌লার, ভাগ্য ও বৈভব এবং বংশগৌরব প্রভৃতি বিজ্ঞজন-স্পৃহণীয় গুণ-নিচয়ের আলোচনায় নয়নের উপর আগে যতই অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকুন, নয়নকে তিনি একেবারে অবসর দিতে পারেন নাই।

অবসর দিতে পারিলে, পাত্রীর আকৃতিগত খর্ব্বতা এবং পুষ্পিত-পেশল কোমল-কলেবরের আপেক্ষিক স্থূলতা তাঁহার মনের উপর কার্য্য করিত পারিত কি? প্রণয় হইবে মনের সহিত মনের। তাহাতে একজন দীর্ঘাবয়ব, আর একজন খর্ব্ব; একজনের শরীর কৃশ, আর একজনের শরীর স্থূলপর্ব্ব, এই বহিরঙ্গ-পার্থক্যে অন্তরঙ্গ-প্রীতিশ্রদ্ধার আসে যায় কি? কেপ্‌লার তথাপি কিছুকাল, সত্য সত্যই, তাঁহার নয়নের সহিত বীরের মত যুদ্ধ করিলেন;—বুদ্ধি, বিবেচনা, চয়ন

শান্তির ভাবনা এবং ফলাফল-চিন্তাকে লঙ্ঘন করিয়া, নয়নের চটুলতায় টলিবেন না, এই সাধুসংকল্পে দৃঢ় রহিলেন।

কিন্তু তাদৃশ কেপ্‌লারও, পরিশেষে—হায়! পরিশেষে,—অশেষ-বিশেষে, সেই নয়নেরই আনুগত্য করিতে বাধ্য হইয়া, মনুষ্যকে প্রকারতঃ বুঝাইয়া গেলেন যে, মন অথবা মনস্বিতার আশ্রয়শূন্য নয়ন বিশ্বাসের অযোগ্য হইলেও, নয়নহীন মন, নিষ্প্রদীপ প্রাসাদের ন্যায়, যার-পর-নাই শোচনীয় বস্তু। ইহার প্রমাণ,—পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনার শেষ অধ্যায়ে, সামান্য এক নয়নমোহিনীর নিকট কেপ্‌লারের মনঃপ্রাণ-দান। যিনি কেপ্‌লারের তালিকায় পাঁচ নম্বরের পাত্রী নামে নিবেশিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সকলই ছিল দোষ; গুণের মধ্যে গুণ ছিল একটুকু নয়নমোহন মুখলাবণ্য। কেপ্‌লার ভাবিয়া চিন্তিয়া, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিবিধ প্রণালীতে বিচার-বিতর্ক করিয়া,—বিচার-যুদ্ধে কোন কোন বন্ধুকে কর্ণকটু কথা শুনাইয়া,—ঐ পাঁচ নম্বরের পাত্রীকেই জীবন-সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিলেন; এবং পাছে কেহ তাঁহাকে নয়ন-প্রতারিত মূর্খ বলিয়া অনুমান করে, এই নিমিত্ত, মনের অলক্ষিত গতির দোহাই দিয়া, মনোজ্ঞ শব্দের অভিনব 'মুগ্ধবোধ' ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধন্য রে মন, ধন্য রে নয়ন,—ধন্য রে নয়ন-মনের আকুঞ্চন ও সম্প্রসরণ!

# ছায়া-দর্শন।

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

### উপক্রম।

আমাদিগের এ দেশে, অর্থশালী ব্যক্তিরাই, সাধারণতঃ, সম্মানসূচক উপাধি লাভে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠার আসন লাভ করেন। ইংলণ্ডে, অনেক সময়েই, এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। কেন না, যাঁহারা, জীবন-ব্রতের উচ্চতর প্রয়োজনে, অর্থবিত্তের উপাসনায়, আত্মসমর্পণ করিবার অবসর পান না, অথবা ইচ্ছুক হন না, তাদৃশ মহামনস্বী পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সেখানে, শুধু পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা ও বিবিধগুণের গৌরবে, উচ্চ উপাধি লাভে অলঙ্কৃত হইয়া থাকেন। এইরূপ উপাধি-ভূষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে (Sir Charles Isham) সার্ চার্লস ইসাম একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন উচ্চপদবীরূঢ় পণ্ডিত, তেমনই ছিলেন সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতা প্রভৃতি গুণের জন্য সমাজের শীর্ষস্থানীয়। অল্প কএক বৎসর হইল, তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইয়াছে; এবং তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির সময়, বহু সহস্র ব্যক্তি, তাঁহার জন্য অকৃত্রিম শোকাবেগে হাহাকার করিয়াছে। আমরা পাঠকবর্গের

নিকট আজি যে কাহিনীটি লইয়া উপস্থিত হইতেছি, তাহার সত্যতা সম্পর্কে উল্লিখিত সার্ চার্লস ইসাম, এবং তদীয় প্রিয়সুহৃৎ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ( Henry Spicer ) হেন্‌রি স্পাইসার মনুষ্যসমাজের নিকট দায়ী। তাঁহারা উভয়েই, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, স্বয়ং অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎ প্রমাণ সংকলন করিয়াছেন; এবং ঐরূপ অনুসন্ধান ও প্রমাণে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, তাহা মনুষ্যকে জানাইয়াছেন। ঘটনা, বহু সাক্ষীর চক্ষু কর্ণের সাক্ষ্যে এবং আরও বহুবিধ আশ্চর্য্য প্রমাণে প্রমাণিত;—ঘটনা প্রকৃতই অতি বিচিত্র। যাঁহারা এইরূপ ঘটনার প্রমাণ-পর্য্যালোচনায় অনুরাগী, তাঁহারা ইহার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে, বিস্ময়ে অভিভূত হইবেন; এবং মানবজীবনের কোন কর্ম্মই যে এখানে পরিসমাপ্ত হয় না, ইহা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া, জীবনের চিত্রপটকে আর এক চক্ষে দর্শন করিবেন।

## আত্মিক কাহিনী।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত ওয়ারউইক শায়রে বার্‌বি নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামটি ক্ষুদ্র, কিন্তু বড়ই সুন্দর ও পরিষ্কৃত। উহা কিল্‌স্‌বি হইতে এক মাইল ও ওয়ারউইক শায়রের প্রসিদ্ধ রেলওয়ে ষ্টেশন রাগ্‌বি হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। বার্‌বিতে যে কএকখানি গৃহ আছে, সমস্তই কুটীর-শ্রেণীভুক্ত। এখানে শৌণ্ডিকালয় নাই; এমন কি, মাদকতাশূন্য-পাচনবৎ বিয়ার নামক মদ্যেরও একখানি দোকান এই গ্রামে দৃষ্টিগোচর হয় না। সম্ভবতঃ, এই কারণেই, বার্‌বি গ্রামের গৃহস্থেরা ধীর, স্থির ও বুদ্ধিমান্। তাহারা আচার-ব্যবহারে বড়ই শিষ্ট, সুশীল ও সুবিনীত। সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোকেরাও তাহাদিগকে প্রথমদর্শনে ভদ্রলোক বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হন।

বার্‌বির এক কুটীরে মিসেস্ ওয়েব ( Mrs. Webb ) নাম্নী একটি বর্ষীয়সী রমণী বাস করেন। তাঁহার বয়স সাতষট্টি বৎসর। তিনি বার্‌বিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বার্‌বিতেই বার্দ্ধক্য-দশায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘাকৃতি পুরস্ত্রী ঐ পল্লীতে আর একটিও ছিল না। তাঁহার দৈহিক উচ্চতা পাঁচ ফিটেরও একটু উপরে ছিল। তিনি, শেষ বয়সে, ঐ গ্রামের ওয়েব নামক একজন সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় এই প্রকার বার্দ্ধক্য পরিণয় প্রায়শঃই সংঘটিত হইয়া থাকে। এক বৎসর হইল, বৃদ্ধা ওয়েবের সে পরিণয়-সূত্রের পার্থিববন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মিষ্টার ওয়েব স্বর্গগত হইয়াছেন। তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি জন্মে নাই। সুতরাং, তাঁহার ঐ পরিণত বয়সের পরিণত-বয়স্কা পত্নীই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন।

মিসেস্ ওয়েব. পতিবিয়োগের পর যে কুটীরে অবস্থিত রহিলেন, সে কুটীরটিও পতিপরিত্যক্ত সম্পত্তিরই অঙ্গীভূত। তাঁহার অবস্থা এইক্ষণ সর্ব্বতোভাবে সচ্ছল। কিন্তু, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ব্যয়কুণ্ঠতা হেতু, আপনার আয়ের একটি কপর্দ্দকও ব্যয়

কিংবা হস্তান্তর করিতে চাহিতেন না। যে সূত্রে যাহা আয় হইত, তাহার সমস্তই তিনি, অতি যত্নে,—অতি গোপনে, সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। ইহাতে গ্রাসাচ্ছাদনেরও কষ্ট হইত। তিনি তাহাতেও কখনও দৃক্‌পাৎ করিতেন না। দীন-দুঃখিনী ভিখারিণীর মত লোকের নিকট আত্মদৈন্য-প্রকাশে তাঁহার বিন্দুমাত্রও লজ্জা বা অপমান বোধ হইত না। বার্‌বিনিবাসিনী এই দীনজীবনা বর্ষীয়সী বিধবার যদি কোন পাপ, যদি কোন কলঙ্ক থাকিয়া থাকে, তবে তাহা এই ব্যয়কুণ্ঠা ও কার্পণ্য।

কিছু দিন পরে, প্রকৃতির নিয়মভঙ্গরূপ অমার্জ্জনীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-সময় উপস্থিত হইল। মিসেস ওয়েব অনুচিত অর্থলোভ ও অসঙ্গত সঞ্চয়-তৃষ্ণার বশবর্ত্তিনী হইয়া, অবশ্যপ্রয়োজনীয় আহারাদি সম্পর্কেও, আপনাকে আপনি বঞ্চিত রাখিতেন। পরিণত বয়সের জীর্ণ শরীর বহুদিন ইহা সহিয়া লইতে পারিল না। অচিরেই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিল। মিসেস্ ওয়েব উৎকট পীড়ায় শয্যাশায়িনী হইলেন।

মিসেস্ ওয়েবের ভ্রাতুষ্পুত্র মিষ্টার হার্ট (Mr. Hart) বার্‌বিতে বাস করিতেন। হার্টই ঐ পল্লীর একজন বড় জোতদার। হার্ট এই সময়ে তাঁহার অদ্বিতীয় আশ্রয় ও অবলম্ব হইয়া উঠিলেন। হার্ট পিসীমার স্বভাব জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, পিসীমা বিনা চিকিৎসায়;—বিনা শুশ্রূষায় প্রাণত্যাগ করিবেন; তথাপি তাঁহার সঞ্চিত ধন এক ক্রান্তি ব্যয় করিবেন না। সুতরাং, যখন যাহার প্রয়োজন হইত, হার্ট নিজের ব্যয়ে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন। প্রতিবেশিনী মিসেস্ হোল্ডিং (Mrs. Holding) এবং মিসেস্ গ্রিফিণ (Mrs. Griffin) অহোরাত্র বৃদ্ধার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা রহিয়া তাঁহার যথারীতি শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বৃদ্ধার বিয়োগ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। স্বভাব এমনই বস্তু অর্থমোহান্ধ বৃদ্ধা অন্তিম দশায়ও অর্থের মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট তনু ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে,—নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এইরূপ অবস্থায় একদিন একটুকু ব্রাণ্ডীর প্রয়োজন হইল। হাতে একটি পয়সাও নাই বলিয়া মুমূর্ষু বৃদ্ধা কাঁদিয়া পড়িলেন; এবং কোন প্রতিবেশীর নিকট হইতে চারিটি পেনী (চারি আনার পয়সা) ধার করিয়া আনিবার নিমিত্ত মিসেস্ হোল্ডিংকে কাকুতি মিনতি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

মিসেস্ ওয়েব, এই ভাবে ক্রমান্বয়ে, দেড় মাসকাল, রোগ-যন্ত্রণায় অসহ্য ক্লেশ পাইলেন। রোগ সাংঘাতিক হইলেও, হায় প্রাণটি যেন, ধনাসক্তির অস্বাভাবিক বন্ধন ছিঁড়িতে না পারিয়াই, ঐ ভগ্ন পিঞ্জরে, এত দীর্ঘকাল, অবরুদ্ধ রহিল। কিন্তু বিধিনির্দ্দিষ্ট বিধানের অন্যথা নাই। ছয় সপ্তাহ পরে রুগ্না বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, তিনি আর ইহলোকে থাকিতেছেন না। রাত্রি এগারটা বাজিয়া

গিয়াছে। বৃদ্ধার এখন পার্শ্ব পরিবর্ত্তনেরও শক্তি নাই। তাঁহার ইচ্ছাক্রমে, শুশ্রূষানিরতা পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণী, অতি সাবধানে ধরিয়া, ধীরে ধীরে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করাইয়া দিতেছিলেন,—এই সময়ে, মিসেস্ ওয়েব একান্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন,—"না—আর না;—আমি ফিরিয়া আর প্রভাতের মুখ দেখিব না। আমার মনে লয়,—রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই আমি স্বর্গধামে মঙ্গলময় যীশুর চরণপ্রান্তে ঠাঁই পাইব।" বৃদ্ধা অতি ভয়ঙ্কর অর্থপিশাচী হইলেও, শরীরে, অন্য প্রকারে নিষ্পাপ এবং যিশুভক্ত। তাঁহার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি চক্ষু বুজিবার পরমুহূর্ত্তেই পুণ্যময় যিশুর সন্নিধানে চলিয়া যাইবেন।

বৃদ্ধার রাত্রি প্রভাত হইল না। তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার শরীরে কোনরূপ যন্ত্রণা কিংবা অস্থিরতার কোন চিহ্নও পরিস্ফুট হইল না। তাঁহার শেষ উক্তির তিন ঘণ্টা পরে, রাত্রি দুটার সময়ে, তিনি পার্থিব জীবনে চিরকালের তরে চক্ষু বুজিলেন।

মিসেস্ ওয়েব, ইতিপূর্ব্বেই উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র হার্টকে দান করিয়াছিলেন। হার্ট নয়নজলে পিসীমার অন্তিম তর্পণ করিলেন। তাঁহারই যত্নে ও উদ্যোগে, যথাসময়ে, মিসেস্ ওয়েবের সমাধি যথারীতি সুসম্পন্ন হইল।

মিসেস্ হোল্ডিং ওয়েবের অতিসন্নিহিত প্রতিবেশিনী। একই প্রাচীরের একপার্শ্বে মিসেস্ হোল্ডিং এবং অন্য পার্শ্বে ওয়েবের ঘর। এইরূপ লাগালাগি বাড়ী বলিয়াই, হোল্ডিং প্রতিনিয়ত ওয়েবের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হোল্ডিংয়ের এক বৃদ্ধ খুল্লতাত ছিলেন। তিনিও হোল্ডিংয়ের সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতেন।

হার্ট, উইলসূত্রে, ওয়েবের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকিলেও, ওয়েবের গৃহে অবস্থান করিতেন না; একটু দূরে, আপনার বাটীতে থাকিতেন। ওয়েবের গৃহে থাকিবার কোন লোক ছিল না; সুতরাং উহা কিছুকাল রুদ্ধ অবস্থায় খালি পড়িয়া রহিল। মিশেস্ হোল্ডিং ও তাঁহার খুল্লতাত গৃহস্থিত দ্রব্যসামগ্রীনিচয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

একমাস হইল, মিসেস্ ওয়েবের সমাধি হইয়াছে। তাঁহার জন্য কাঁদিবার জন কেহ নাই। প্রতিবেশিদিগের মধ্যে যাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহার খবর লইতেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। একদা, গভীর রাত্রিতে মিসেস্ হোল্ডিং তাঁহার আপন শয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়, হঠাৎ ওয়েবের গৃহে হুড়্ হুড়্ শব্দে কি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। হোল্ডিং শয্যাতলে চমকিয়া উঠিলেন। উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলেন, ওয়েবের বাটীর দিকে, প্রাচীরের গায়ে এবং প্লেট ইত্যাদি রাখিবার তাকের উপরে কে যেন চপেটাঘাত করিতেছে। তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইল।

তিনি দ্রুতগতি শয্যা হইতে নামিলেন পুনরপি শুনিতে পাইলেন, কে যেন সবলে ধাক্কা দিয়া ওয়েবের দরোজা বন্ধ করিয়া দিল; এবং ঘরের সমস্ত দ্রব্যজাত বেগে টানিয়া নিয়া আছাড়িয়া ফেলিল।

এত রাত্রিতে ওয়েবের ঘরে এ কি,—একবার দেখা আবশ্যক; মিসেস্ হোল্ডি এইরূপ চিন্তা করিয়া, আলো লইয়া, ধীরে ধীরে ওয়েবের ঘরের দ্বার খুলিলেন; এবং সাহসে ভর করিয়া, গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, জন-প্রাণীর সম্পর্ক নাই, সমস্ত দিকের দ্বার সমান বন্ধ; গৃহ নীরব ও নিস্পন্দ; কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীগুলি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তিনি বুঝিলেন না, এ শব্দ কোথা হইতে, কিরূপে হইল। তিনি পুনরায় কপাট বন্ধ করিয়া, আলো নিবাইয়া শয়ন করিলেন। অবশিষ্ট রাত্রি তাঁহার আর ঘুম হইল না, সেরূপ শব্দও আর শুনিতে পাইলেন না।

পর দিন, দিনের বেলায়, আবার নানারূপ অনুসন্ধান করা হইল। কেহই সে নৈশ-নিস্তব্ধতায় শ্রুত ভয়াবহ শব্দের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। কিন্তু রাত্রিতে, আবার ঐরূপ উপদ্রবে, অনেকের নিদ্রাভঙ্গ ঘটিল। এই হইতে প্রতিদিনই রাত্রি দুটায়, অর্থাৎ যে সময়ে মিসেস্ ওয়েবের তনুত্যাগ হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে, অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে;—কিংবা পরে ওয়েবের ঘরে একটা বিষম হুলস্থূল শব্দ হইতে লাগিল। চির-শান্তি-নিকেতন বার্‌বির ঐ পল্লীটিতে অকস্মাৎ একটা ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি হইল। কিন্তু কেহই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে পারিল না;—যে শুনিল, সেই বিস্মিত হইল। অনেকে এতদূর ভীত হইয়া পড়িল যে, মনে মনে পল্লী ত্যাগের কল্পনা করিতে লাগিল। পল্লীর সকলেই, ওয়েবের ঘরে, পূর্ব্বকথিত সময়ে, একবার ঐ গোলমালটা না হইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, বিনিদ্র অবস্থায় বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য বোধ করিল।

মিসেস্ হোল্ডিং স্বভাবতই একটু নিভীকা ছিলেন। পার্শ্বের ঘরে প্রতি রাত্রিতে ঐরূপ গোলমাল হইত, তথাপি তিনি উহাতে খুব বেশী বিচলিত কিংবা ভীত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার এ সাহসও অবশেষে অটুট রহিল না। একদিন গোলমাল ও শব্দ এমন দীর্ঘ-কাল-ব্যাপি ও ত্রাসজনক হইয়া উঠিল যে, মিসেস্ হোল্ডিং আর সাহস করিয়া ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাঁহার খুল্লতাত স্থানান্তরে ছিলেন। হোল্ডিং, বাড়ী ছাড়িয়া, কম্পিত-কলেবরে, খুড়ার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ খুল্লতাত, কাহিনী শুনিয়া, এইমাত্র বলিলেন,—"আমাদের মিসেস্ ওয়েব আবার ফিরিয়া আসিলেন না ত? আমার যেন মনে লয়, এ উপদ্রব তাঁরই আত্মার অশান্তিজনিত।"

কিছু দিন পরে, মিষ্টার একলিটন (Mr. Accleton) নামে জনৈক শিল্পব্যবসায়ী ভদ্রলোক বার্‌বিতে আগমন করিলেন। মিসেস্ ওয়েবের ছাড়া বাড়ীই তাঁহার থাকিবার স্থান হইল। একলিটন, আপনার সাহস

পরথ করিবার নিমিত্ত, সখ করিয়া, ঐ আত্মিকাবিষ্ট বাটীতে বাসা লইলেন, এমন নহে। তিনি, ভাড়া করার যোগ্য অন্য বাড়ী না পাওয়া হেতু, দায়ে ঠেকিয়া, মিসেস্ ওয়েবের ঘরেই আপনার বাসস্থান লইতে বাধ্য হইলেন।

তাঁহার সঙ্গে লোকজন বেসী ছিল না। পত্নী আর দশ বৎসর বয়সের একটি শিশু কন্যা, ইহা লইয়াই একলিটনের গার্হস্থ্য জীবন। পত্নী বর্ষীয়সী ও বুদ্ধিমতী গৃহিণী। কন্যা কুসুম-কলিকার ন্যায় কমনীয়া ;—সুন্দরী অথচ বুদ্ধিমতী। তাহার চোখ দুটি নীলাভ ; দৃষ্টি সরল ও সুখ-স্নেহময়ী। মেয়েটির সেই নীল-উৎপলের মত ঢল ঢল চোখ দুটিই তাহার অকপট ও নির্ম্মল প্রাণের পরিচয় প্রদান করিত ; এবং যে তাহাকে দেখিত সে-ই তাহার অমায়িক ও আনন্দ প্রফুল্ল ব্যবহারে মোহিত হইত।

মিষ্টার একলিটন, আপনার বিবিধ করণীয় কার্য্যের অনুরোধে, প্রায়শঃই বাহিরে থাকিতেন। তাঁহার পত্নী অধিকাংশ সময়ই, ঐ বালিকাটিকে লইয়া খালি বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। যে ঘরে বৃদ্ধার মৃত্যু হইয়াছিল, ঐ বাড়ীর মধ্যে সেই ঘর খানিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও প্রসর, এবং বাসের পক্ষে সুবিধাজনক। একলিটনপত্নী ঐ ঘরেই আপনার শয়ন-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইলেন। ঐ ঘরের একপার্শ্বে ছাদের সহিত লগ্ন একটি ক্ষুদ্র চোরকুঠি ছিল। চোরকুঠিটি প্রথমাবধিই বন্ধ ছিল। চোরকুঠি যে দিকে ছিল, জননী সেদিককার একখানি ছোট খাট্‌লিতে কন্যার শয়নস্থান করিলেন ; এবং তাহা হইতে দুই এক হাত দূরে আপনাদিগের খাট্‌লি পাতিয়া হইলেন।

ইহার অল্প কএক দিন পরেই, এক রাত্রিতে, সেই দুটার সময়, মিসেস্ একলিটনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন,—নীচের কোঠার সমস্ত টেবল ও চ্যায়ারগুলিরে কে যেন একত্র করিয়া, প্রচণ্ডবেগে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে ; আর কতই কি উপদ্রব করিয়া কেমন একটা অশান্তি জন্মাইতেছে। স্বামী গৃহে ছিলেন না। তিনি ( Hillmorton ) হিল্‌মর্‌টন নামক গ্রামে এক ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। পত্নী প্রথম মনে করিলেন, —স্বামীই বুঝি বা ভোজ হইতে মত্ত-অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া, টেবল চ্যায়ারগুলি এইরূপ ঠেলিয়া ফেলিতেছেন। এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি একটু বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন, —"এতক্ষণে বুঝি তুমি এই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছ ?"

রমণী ইহা খুব বড় গলায় কহিলেন। কিন্তু, তাঁহার কথায় কোন ফল হইল না। আবারও সেই ভয়াবহ শব্দ হইল। রমণী মেয়েটিকে বুকে আবরিয়া লইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। চারিটা পর্য্যন্ত ঐরূপ বিবিধ বিকট শব্দ শ্রুত হইল। তিনি, জাগিয়া রহিয়া, সমস্তই শুনিলেন। সাতটার সময় মিষ্টার একলিটন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এইরূপ হুর্ হুর্ হুর্ হুর্ এবং টেবল চ্যা-

য়ার ইত্যাদির বিক্ষেপ-বিঘট্টন-শব্দ অল্প বা অধিক মাত্রায় প্রতি রাত্রিতেই চলিতে লাগিল। সকলেই কানে শব্দ শুনিত, কিন্তু কেহই চক্ষে কিছু দেখিতে পাইত না। নৈশ-উপদ্রবের কোন চিহ্নও দিবসে দৃষ্টিগোচর হইত না।

কিছুদিন এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, একদা রাত্রি দুটার সময়, বালিকাটি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। মেঃ এক্লিটন সে দিন বাড়ীতে ছিলেন। বালিকার চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, বালিকা ভীতিবিহ্বল স্বরে কহিতেছে, "মা, ও মা, উঠ উঠ,—ঐ দেখ, একটা স্ত্রীলোক—বৃদ্ধা একটা বিশ্রী আমার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এবং আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাথা নাড়িতেছে। ও মা, মা, আমি কোথা যাব! তুমি এসে দেখ।"

এক্লিটন ও তাহার পত্নী উভয়েই কন্যার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বালিকা বারংবার জেদ করিতে লাগিল। এক্লিটন, বালিকার বিছানার সকল দিকেই বিশেষ পরীক্ষা করিলেন। তথাপি কোন স্ত্রীলোক তাঁহার নয়নগোচর হইল না। তিনি ভীত বালিকাকে প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলিলেন, —"কৈ বাছা, কিছুই ত না, বোকা মেয়ে ঘুমের ঘোরে কি দেখিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিয়াছে।—এ যে তোমারই মা'র গাউন আর টুপিটা, এখানে বিছানার কাছে ঝুলান রহিয়াছে। কিছুই না, কোন ভয় নাই। তুমি বাছা, নির্ভয়ে চোখ বুজিয়া, চুপ করিয়া শুইয়া থাক।"

বালিকা বলিল,—"না, বাবা আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি—একটা স্ত্রীলোক বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া, একদৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইয়া ছিল। তাহার মাথায় শাদা রঙের টুপি, পরিধানে নানা রঙের বুটাদার গাউন। স্ত্রীলোকটি, বাবা, প্রায় তোমারই মত উঁচু।" পিতা কহিলেন,—"ও কিছু নয়, তুমি ঘুমের ঘোরে ধাঁধাঁ দেখেছ। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুম যাও।"

ধাঁধাঁ কিংবা দৃষ্টিভ্রম যাহাই হউক, বালিকা পিতা মাতার কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া, প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল; এবং কিছুক্ষণ পরে, ঘুমাইয়া পড়িল। ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। পিতা মাতাও একটু নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহারই মধ্যে, বালিকা আবার ভীত ও চমকিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ও মা, ও মা, ঐ ত,—ঐ ত,—আবার সেই স্ত্রীলোকটা আসিয়া আমার বিছানার নিকট উঁকি দিয়া কি দেখিতেছে।"

বালিকা ইহা কহিয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিল। পিতা মাতা উভয়ে মিলিয়া অনেক কথা বলিলেন,—অশেষ বিশেষে বুঝাইলেন, বালিকা আর বুঝ মানিল না। অবশেষে তাঁহারা বালিকাটিকে তাঁহা-

দের শয্যায় লইয়া গেলেন। বালিকা সেখানে একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল,—"মা, এবার ঐ স্ত্রীলোকটা আসিয়া, বিছানার চাদরের কোণাটা উল্‌টাইয়া আমার মুখের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহাতেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিঁয়াছিল। সে যে প্রকার কট মট চোখে আমার দিকে চাহিয়াছিল, তাহা মনে হইলে আমার বুকটা এখনও ধর ফড় করিয়া কাঁপিয়া উঠে। মা, আমি কিন্তু আর কখনও ওখানে শুইব না।"

সে দিন আর কোনরূপ উপদ্রব হইল না। ইহার পরে, ক্রমে কএক রাত্রিতে, বালিকা, এক দুই করিয়া, সাত বার, ঐ স্ত্রীলোকের ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইল। পুনঃ পুনঃ দেখার দরুণ, মনের আতঙ্ক অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিল; কিন্তু তথাপি শিশুর মনের সেই চমক শীঘ্র দূর হইল না। বালিকা অসুস্থ হইয়া পড়িল। দিন কএক ক্লেশভোগের পর, ভগবানের কৃপা ও প্রথম বয়সের স্বাভাবিক শক্তিতে বালিকার স্নায়বিক অসুখ ও অশান্তি ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল।

বালিকা সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া বলিল,—"ঐ স্ত্রীলোকটিকে যখন যখন দেখিতে পাইয়াছি, তখনই তাহাকে কেমন একপ্রকার বিষাদমাখা হাসির সঙ্গে সঙ্গে গানের মত গুণ্ গুণ্ শব্দ করিতে শুনিয়াছি। আমার মনে লয়, সে যেন কি কহিতে চাহিতেছে, কহিতে পারিতেছে না। তাহার চারি পাশে পিঙ্গল বর্ণের একটা আলোক তাহার সমস্ত শরীর আবরিয়া রাখে। সে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়; এবং হাত দু'খানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, নির্ভয়-তীব্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।"

বালিকার এই সকল উক্তিতে, বাড়ীর আশে পাশে, সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। কিন্তু আজন্ম-সত্য ভাষিণী সরলমতি বালিকার কথায় মাতার মনে বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস রহিল না। বিশেষতঃ, তিনি ঐরূপ দর্শন সময়ে, বালিকাকে ভয়ে যেরূপ আড়ষ্ট দেখিতেন, তাহাতে অমন শিশুর পক্ষে, এরূপ ব্যাপারে, কোনরূপ ভাণ বা ছলনাচাতুরীর সম্পর্ক থাকা তিনি কোন প্রকারেই সম্ভবপর মনে করিলেন না।

ইহার দিন কএক পরে, মাতা স্বয়ংই সেই ছায়ামূর্ত্তির দর্শন পাইলেন। স্বামী মাঝে মাঝেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। বাড়ীতে নিত্য নৈশ-উপদ্রব। অতএব, তিনি স্বামীর অনুপস্থিতি কালে, তাঁহার মাতাকে আনিয়া আপনার ঘরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলেন। একদা, তিনি তাঁহার মাতার সহিত শয়ান আছেন, এই অবস্থায় সহসা রাত্রি দুটার সময়, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। দেখিলেন, ঘর কিরূপ একটা পীতাভ নীল আলোতে আলোকময়। তাঁহার মনে তৎক্ষণাৎ ছায়ামূর্ত্তির কথা জাগরূক হইল। তিনি প্রথমতঃ, ইহা দেখিব না, এই সঙ্কল্প করিয়া, নয়ন মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁহার সাহসের সঞ্চার হইল।

তিনি মনে মনে কহিলেন—"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমি কখনও ইহার কোনরূপ অনিষ্ট করি নাই। এ আমার অনিষ্ট করিবে কেন? আমি ইহাকে দেখিব।"

গৃহিণী এই ভাবে সাহসে ভর করিয়া বালিস হইতে মাথা উঠাইলেন; এবং দেখিলেন,—পিঙ্গলবর্ণ-আলোক-বেষ্টিত স্ত্রীমূর্ত্তি অদূরে দণ্ডায়মানা। উহা, জীবিত মূর্ত্তির ন্যায়, অঙ্গভঙ্গি ও সগৌরব-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে। তিনি পূরা পাঁচ মিনিট তাহাকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মাতারও তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া ছিল। তিনি মাতাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "মা চাহিয়া দেখ, এই ত মিসেস ওয়েব সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।" মাতাও স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া কহিলেন,—"ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন, উহাকে দেখিয়া কাজ নাই।" এই বলিয়া বৃদ্ধা মস্তকে কাপড় টানিয়া দিয়া শুইয়া রহিলেন।

মিসেস্ এক্‌লিটনের সঙ্কল্প ছিল, যদি কোন দিন তিনি ঐ ছায়ামূর্ত্তির দেখা পান, উহার সহিত আলাপ করিবেন। কিন্তু আজ তিনি সে সঙ্কল্প রক্ষা করিতে পারিলেন না। সাহসে কুলাইয়া উঠিল না। তিনি দেখিলেন, ছায়ামূর্ত্তি ধীরে ধীরে, মৃদু-মন্দ-পাদসঞ্চারে, তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল; এমন কি, তাঁহার বালিসটা পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল। উহার মুখচ্ছবিতে বড়ই কাতরতা ও কাকুতির ভাব স্পষ্ট পরিস্ফুট ছিল। ছায়ামূর্ত্তির মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, সে যেন কতই আন্তরিক আগ্রহের সহিত তাঁহাকে দুটি কথা কহিতে অনুরোধ করিতেছে। কিন্তু তিনি কথা কহিতে পারিলেন না।

মিসেস্ রেড্‌বারণ (Mrs. Radburn) ঐ পল্লীরই একজন প্রাচীনা নারী। রেড্‌বারণের বয়স ষাট বৎসর। কিন্তু তিনি দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট ও কর্ম্মঠ। তিনি কএক দিন মিসেস্ এক্‌লিটনের সহিত তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিলেন। একদা তিনি মিসেস্ এক্‌লিটনের ঘরে নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে, কে আসিয়া, তাহার কুনুইতে ধরিয়া, নাড়া দিয়া, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, ঘর আলোকময়। আলো দেখিয়া তাহার প্রথম ধারণা হইল যে, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। তিনি উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু অমনই ঘড়িতে দুটা বাজিল। তিনি তখন বুঝিলেন, প্রভাত নহে, ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব। বৃদ্ধা যেমন নির্ভয়স্বভাবা, তেমনই দৃঢ়সঙ্কল্পা। তিনি ভাল করিয়া ছায়ামূর্ত্তিকে দেখিয়া লইলেন। ছায়ারূপিণী, জানালা ও তাঁহার বিছানার মধ্য স্থানে দণ্ডায়মানা। সমস্ত ঘর দিনের ন্যায় আলোকিত, কিন্তু আলোটা নীল-পীত-মিশ্র। তিনি মশারির ভিতর হইতে সেই আলোকে জানালার রেলিং স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কোঠার মধ্যে, নানা দিকে, নক্ষত্র অপেক্ষা বৃহত্তর আলোক খণ্ড ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মিসেস্ রেডবারণ, একবারে চক্ষু বুজিয়া, তার পর আবার চাহি-

লেন। এই নিমেষ মধ্যেই দেখিলেন, সে ছায়ামূর্ত্তি নাই, সে আলোক নাই; সমস্ত কোঠা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বারবি গ্রামে মিসেস্ গ্রিফিণ নামে আর একটি বুদ্ধিমতী এবং সর্ব্বতোভাবে সুনীতি-পরায়ণা,সৎস্বভাবা ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি মিসেস্ ওয়েবের পুরাতন প্রতিবেসিনী। তিনিও আসন্ন সময়ে মিসেস্ ওয়েবের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। ওয়েবের সমাধি-সময়েও তিনি উপস্থিত থাকিয়া তৎকালোচিত অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছিলেন।

মিসেস্ ওয়েবের ছায়ামূর্ত্তি একবার এই গ্রিফিণেরও নয়নপথবর্ত্তিনী হইয়াছিল। গ্রিফিণ, একদিন, রাত্রিযোগে, মিসেস্ এক্‌লিটনের সহিত তাঁহার ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই শয়নাবস্থায়, তিনিও অন্যান্যের ন্যায়, এক রাত্রিতে, ঠিক দুটার সময়ে, সহসা জাগরিত হইয়া, সম্মুখে ওয়েবের ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। গ্রিফিণ তাঁহার প্রতিবেশিনীদিগের অপেক্ষা অন্তরে অধিকতর দৃঢ় ও শক্তসমর্থ ছিলেন। তিনি, ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাবে, উপেক্ষা প্রদর্শনে সঙ্কল্প করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—"রও বৃদ্ধা, আজ আমি তোমাকে কি রূপ নিরাশ করি, তাহা দেখ। তোমার যত ইচ্ছা তত উৎপাত কর, আমি তোমার পানে ফিরিয়াও চাহিব না।"

গ্রিফিণের এই সঙ্কল্প পরিণামে রক্ষা পাইল না। গ্রিফিণ টের পাইলেন না। অথচ কেমন যেন একটা অজ্ঞাত শক্তি তাঁহাকে নয়ন-উন্মীলনে বাধ্য করিল। তিনি অনাত্মবশা আবিষ্টার ন্যায়, অনিচ্ছাসত্বেও চাহিয়া দেখিতে বাধ্য হইলেন। দেখিলেন—ছায়ামূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভ্রূভঙ্গিশূন্য, সগর্ব্ব দৃষ্টিতে, তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে; এবং কি যেন বলিতে চাহিতেছে। তিনি, মিসেস্ হোল্ডিংকে জাগাইয়া, দুইয়ে মিলিয়া, স্পষ্ট দেখিলেন,—তাঁহারা মিসেস্ ওয়েবের মৃতদেহ যেরূপ শাদা ক্যাপে ও নানা রঙের বুটাদার গাউনে সাজাইয়া, শবাধারে (Coffin) স্থাপন করিয়াছিলেন, ছায়ামূর্ত্তি সেই প্রকার গাউন ও ক্যাপ পরিধান করিয়া আসিয়াছে। আরও দেখিলেন, একটা পিঙ্গল-বর্ণ বিচিত্র আলো ছায়ামূর্ত্তিটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এবং ঐ আলো হইতে, পৃথক্ পৃথক্ আলোক-রেখা নির্গত হইয়া, চোর-কোঠার দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। আলো এত তীব্র যে গ্রিফিণ অনেকক্ষণ উহার পানে তাকাইতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল, তাঁহার চক্ষু দুটি যেন জ্বলন্ত অনলে ঝলসিয়া যাইতেছে। তিনি চক্ষু বুজিলেন। ছায়ামূর্ত্তিও অদৃশ্য হইল।

মিসেস্ ওয়েবের ছায়ামূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, ঐ ছায়ামূর্ত্তির ম্লান মুখে নিয়তই ক্লেশব্যঞ্জক মৃদু মৃদু গুণ্ গুণ্ শব্দ শুনা যাইত; এবং মূর্ত্তি যখন অদৃশ্য হইত, তখনও, ঐ গৃহে, নিশাবসানে, বহু ঘণ্টা ব্যাপিয়া ঐপ্রকার কাতর শব্দ চলিতে থাকিত। বৃদ্ধা মৃত্যুর দুই এক দিন পূর্ব্বে,

রোগের অকথ্য-যন্ত্রণায়, অবিশ্রান্ত যেরূপ শব্দ করিতেন, এ শব্দেও ঠিক্ সেইরূপ করুণ-কাতর অস্ফুট শব্দ সকলের মনে পড়িত।

ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব ও তিরোধান সর্ব্বদাই চোর-কুঠির সান্নিধ্যে হইত। ছায়ামূর্ত্তির শরীর-বেষ্টনী পিঙ্গল-প্রভাও, রেখাকারে ছুটিয়া ছুটিয়া, ঐ চোর-কুঠির নিকটে যাইয়া সঙ্ঘীভূত, এবং ঐ খানেই বিলীন হইত। মিসেস্ ওয়েবের অস্বাভাবিক কার্পণ্য ও অর্থাসক্তির কথা ঐ পল্লীতে কাহারও অবিদিত ছিল না। মিসেস্ এক্লিটন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, "সম্ভবতঃ ঐ চোর-কুঠিতে কিছু ধন লুক্কাইত আছে। বৃদ্ধা পরলোকেও সেই সঞ্চিত সম্পত্তির মায়া কাটাইতে না পারিয়া যার-পর-নাই ক্লিষ্ট আছেন। তিনি নিশ্চয়ই ধনের মমতায় এই স্থানে আইসেন, এবং এই কারণেই ঐ বাটীতে নিত্য এইরূপ নৈশ উপদ্রব ঘটাইয়া সকলকে অস্থির রাখেন।"

মিসেস্ এক্লিটন তাঁহার এই সন্দেহ ও সিদ্ধান্ত মিষ্টার হার্টকে জানাইলেন। কথাটা হার্টেরও মনে লাগিল। তিনি অচিরেই চোর-কুঠি খুলিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করিলেন। একটা কাঠের সিঁড়ি আনীত হইল। মিসেস্ এক্লিটন সিঁড়িটা ধরিয়া রাখিলেন। হার্ট আলো লইয়া ঐ সিঁড়ি দিয়া বহুকষ্টে চোর কুঠিতে প্রবেশ করিলেন। আলোটি তিন বার নিবিয়া গেল। কুঠির ভিতরে ঘোরতর অন্ধকার। চতুর্থ বারে আলো নিবিল না। হার্ট প্রথমতঃ একটা পুলিন্দা পাইয়া উহা নীচে নিক্ষেপ করিলেন। উহার ভিতরে কতকগুলি পুরাতন দলিল ও লিখিত কাগজ ছিল। তিনি, ইহার পর, বড় একটা ব্যাগ পাইয়া, উহা লইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন। ব্যাগের উপরিভাগ লূতাতন্তু ও অন্যবিধ আবর্জ্জনায় আবৃত।

পাঠকের মনে আছে, হার্ট পরলোকগতা বৃদ্ধার ভ্রাতৃপুত্র ও একমাত্র উত্তরাধিকারী। হার্ট ব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন উহা মোহর ও নোটে পরিপূর্ণ। তিনি ব্যাগে কি পরিমাণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন, অন্যে অবশ্যই তাহা জানিল না। কিন্তু সকলেই, তাঁহার মুখচ্ছবি উত্তেজিত ও উৎফুল্ল দেখিয়া, খাটি বুঝিল যে, তিনি ঐ ব্যাগে বিশেষ কিছু পাইয়াছেন। হার্ট ব্যাগ হইতে কএকটি মোহর বাহির করিয়া তাঁহার সহকারী পরীক্ষকদিগকে দিলেন; এবং যাঁহারা নৈশ-উপদ্রবে নিরন্তর উপদ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও কিছু দান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, —"আপদ্ গেল,—আজ হইতে এই পল্লীর সকল অশান্তি দূর হইল।"

কিন্তু হার্টের এই উক্তি সফল হইল না। ক্রমান্বয়ে তিন দিন, পল্লীবাসীরা সকলে, রাত্রিকালে, নিরুপদ্রবে নিদ্রাসুখ অনুভব করিল বটে; চতুর্থ দিনে আর সে কথা রহিল না। চতুর্থ দিনের রাত্রি, কাতর-করুণ বিলাপধ্বনি, আর্ত্তরব, দ্বার ও দেয়ালে মুহুর্মুহু চপেটাঘাত প্রভৃতি নানা প্রকার শব্দে, চতুর্গুণ ভয়াবহ হইয়া উঠিল। পরদিন হার্ট এই সংবাদ পাইলেন। এই সংবাদ পাইয়া, তিনি চোরকুঠির

কাগজের পুলিন্দা খুলিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া দেখিলেন। দেখিলেন বৃদ্ধার কিছু ঋণ আছে।—কাগজপত্রের মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণ রহিয়াছে। হার্ট, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, সমস্ত ঋণ কড়ায় ক্রান্তিতে পরিশোধ করিয়া ফেলিলেন। ঋণ-শোধের পর বাড়ির এই প্রসিদ্ধ নৈশ-উপদ্রব এবং ছায়ামূর্ত্তির নিত্য আবির্ভাব সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইল। কিন্তু, পূর্ব্ব-কথিত সেই সরলমতি বালিকাটি অবধি বর্ষী-য়সী গ্রিফিণ পর্য্যন্ত, যে ছয় সাত ব্যক্তি, পৃথক্ পৃথক্‌রূপে, এবং একই সময়ে,—এক সঙ্গে—দুই তিন জনে, ওয়েবের ছায়ামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকলেরই হৃদয়ে ইহা চিরজীবনের তরে দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া রহিল যে, মনুষ্যের কর্ম্মফল পরলোকেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়; এবং মনুষ্য, ঈশ্বরের কৃপায়, সেখানে যাইয়া, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান অথবা অন্য প্রকারে জীবনের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের দ্বারা, পরিশেষে শান্তি পায়।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "বেদসংহিতা। শ্রীমধুসূদন সর-কার কর্ত্তৃক পদ্যে অনূদিতা, মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহ প্রকাশিতা।"—গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বেদসংহিতা হিন্দুর মহাগ্রন্থ, হিন্দুর পক্ষে এতদপেক্ষা নমস্য গ্রন্থ আর নাই।" এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। হিন্দু-ধর্ম্মকে যিনি যে ভাবে নিরীক্ষণ করুন, বেদ-শাস্ত্র অবশ্যই তাঁহার আলোচ্য বস্তু। কিন্তু সে বেদশাস্ত্র, বিকট-তুঙ্গ হিমাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায়, সাধারণের দুরধিগম্য। বেদের ভাষা পৃথক্, ব্যাকরণ পৃথক্ এবং শব্দ ও বাক্যের অর্থ-পরিগ্রহের প্রণালীও প্রচলিত প্রণালী হইতে নিতান্ত পৃথক্। কলির কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-কল্প রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অক্লান্ত শ্রমে, সে বেদ-শাস্ত্র, সরল, সুখ-বোধ্য বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া, বাঙ্গালির অতি বিচিত্র জ্ঞান-ভোগ্য হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার, রমেশ চন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া, কতি-পয় প্রসিদ্ধ সূক্তের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই পদ্যানূদিত বেদসংহিতাও বহু লোকের উপকারে আসিবে। অনুবাদ অ-নেক স্থলে প্রাঞ্জল ও প্রীতিকর; কুত্রচিৎ কঠিন হইলেও, টীকার সাহায্যে সুগম। যদি এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোন কালে, বাঙ্গালার পঠন ও পাঠনা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে, এই বেদসংহিতা বিদ্যার্থিদিগের এক-খানি সুপাঠ্য পুস্তক হইবে।

২। "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড; শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এল প্রণীত।" ইহা বঙ্গদেশের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্য যে, শি-ক্ষিত বাঙ্গালিরা, এত দিনের পর, স্বাধীন চিন্তার পথ অবলম্বন করিয়া, বাঙ্গালায় বঙ্গের

ইতিবৃত্ত-সংক্রান্ত বিবিধ পরিচ্ছেদের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহারা এইক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র মৈত্র, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। নয়নানন্দমূর্ত্তি, নিখিল-পুরাতন-বৃত্তবিৎ শ্রীমান্ নিখিলনাথ রায়ও তাঁহাদিগের মধ্যেরই এক জন। নিখিল বাবু ইতঃপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদকাহিনী নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার এই মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সেই পথে বৃহত্তর দ্বিতীয় গ্রন্থ। তিনি এই উভয় পুস্তকেই বহুশ্রম-লভ্য পাণ্ডিত্য, বৃত্তান্ত-পরীক্ষণ-পটুতা ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পরিশ্রমে স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার এই গ্রন্থের রীতিমত ঐতিহাসিক সমালোচনা করিতে হইলে, অন্ততঃ এক শত পৃষ্ঠার একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ লেখা আবশ্যক। কিন্তু আমাদিগের দ্বারা সম্প্রতি তাহা অসম্ভব। তবে, ইহা সরল হৃদয়ে স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহার এই পুস্তক পড়িয়া, আমরা সাধারণতঃ উপকৃত এবং সময়ে সময়ে আনন্দে আপ্লুত হইয়াছি। পুস্তকের কোন কোন স্থলে দুই একটি মুদ্রাকর-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ সুপণ্ডিত জনের গ্রন্থে ঈদৃক্ সামান্য দোষও স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

৩। "কুসুম-চরিত। হাজারিবাগ জিলাস্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক বিরচিত।" এই পুস্তকে কুসুম নাম্নী একটি কুসুম-কোমলা পুণ্যশীলা কুলবালার জীবন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গীয় কুল-কামিনীরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। আমরা বৃদ্ধ হইলেও বালিকার উদার হৃদয়ের অনেক কথা পড়িয়া আত্মায় স্পৃষ্ট হইয়াছি।

৪। "বালিকা-বিকাশ। (বালিকাপাঠোপযোগী কবিতাপুস্তক)। জনৈক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীজগবন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগের অপরিচিতা। কিন্তু তিনি, তাঁহার এই কবিতা-পুস্তকখানি, অতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাষায়, বান্ধব-সম্পাদকের নামে উৎসর্গ করিয়া, আমাদিগকে স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা, এই হেতু, তাঁহার রচনার সমালোচনায় স্ফূর্ত্তি বোধ করিতেছি না। তথাপি আমরা ন্যায়পরতার অনুরোধে, ইহা কহিতে প্রস্তুত আছি যে, তিনি সুকবী; এবং সুমধুর-সুখ-শ্রুত শব্দসম্পদে প্রকৃতই সমৃদ্ধিশালিনী। বাঙ্গালা ভাষায়, কামিনীফুলের কোমল দলের মত, অসংখ্য সুকোমল, সুললিত, কাব্যাঙ্গ-সমুচিত, খাটি-বাঙ্গালা, অথচ ভদ্রসমাজ-প্রচলিত ছোট ছোট প্রাকৃত শব্দ আছে। বালিকাবিকাশের সকল স্থলেই, সে সকল শব্দ, রচয়িত্রীর লেখনীমুখে, অবিরত ঝুর্ ঝুর্ করিয়া পড়িয়াছে; এবং পুস্তক খানি, এই এক বিশেষ গুণে, বালিকা-বিদ্যালয়ে ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ, ইহার প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত, সকল কবি-

তাই, ভাবের শিশুতোষিণী সরলতা ও ভাষার সচ্ছল মাধুর্য্যে, যার-পর-নাই স্বাদুস্নিগ্ধ; কোন কোন কবিতা বালিকাদিগের কণ্ঠস্থ হইবার উপযুক্ত। শেষ কবিতাটি একটুকু উচ্চ অঙ্গের। গ্রন্থকর্ত্রী, ভগবানের দিকে তদ্গত হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া, বলিতেছেন,—

"নেবো না, দেবো না বেশী—সে শকতি নাই,
এতটুকু—এতটুকু দিতে - নিতে চাই।
অনন্ত শকতি তব, অনন্ত আকার—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড গায় মহিমা তোমার!
সিন্ধু-সম তব কৃপা, বিন্দু মাত্র নেবো,
আমার বালুকা কণা প্রাণ পায়ে দেবো।
এ হ'তে অধিক কভু মন নাহি চায়—
দিনান্তে ডাকিতে যেন পারি হে তোমায়!"

গ্রন্থকর্ত্রী নব্যশিক্ষিতা বঙ্গবিদুষী, না সেকে'লে কাব্যকর্ত্রী বর্ষীয়সী, তাহা আমরা জানি না। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, তিনি উচ্চশিক্ষার আনন্দময় সোপানে দিন দিন উন্নতি লাভ করুন; এবং বাঙ্গালা কবিতার উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া, আপনার কবিত্বশক্তির সার্থকতা সাধনে যত্নবতী হউন।

৫। "রাধিকা। শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।" ইহাও একখানি কবিতা পুস্তক এবং কবিতাগুলি, অনেক স্থলে, সুন্দর। গ্রন্থকার, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতি প্রেম-ভাবক কবিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার এই প্রয়াস সাহসিকতার পরিচায়ক। যে পথে, জয়দেব ও বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া, বঙ্গের শত শত সুকবি, কুকবি ও অকবি শত সহস্র প্রকারে প্রেমের গীতি গাইয়াছেন, সেই পথে, নূতন সুরে, গীতি-রাগের আলাপ করা,—নূতন গীতিকবিতা রচনার দ্বারা পাঠকের হৃদয়কে টানিয়া লওয়া সহজ কথা নহে। কিন্তু তথাপি দু'একটি কবিতায় একটুকু নূতন ভাবের পরিচয় আছে। যথা, মূর্চ্ছাভঙ্গে রাধার প্রলাপ,—

"হারাণ রতন পেয়ে
দূর হলো অভিমান,
দূর হলো নিদারুণ
সে শ্যাম-হারাণ মান।
কোটি হস্তে, কোটি বক্ষে
কোটি পদে বেড়িলাম;
কোটি নেত্রে, অনিমেষে,
মুখপানে চাহিলাম;
কোটি নাসিকায় তাঁর
অঙ্গ-গন্ধ লইলাম।"

এখানে এই কোটি হস্তে—কোটি বক্ষে স্পর্শন, কোটি নেত্রে অনিমেষ দর্শন, এবং কোটি নাসিকায় অঙ্গগন্ধের সৌরভ গ্রহণ আমাদিগের নিকট বড়ই সুন্দর লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায়ই পুরুষের কণ্ঠস্বর একটুকু বেশী পরিশ্রূয়মান,—কোন কোন কবিতায় বিরক্তিজনক। যথা রাধিকার সখীসম্ভাষনে,—

"অফুট ফুটন্ত কলি
সব আজ নিব তুলি,
ভোমরারে গলা টিপে
পাঠাইব যমদ্বীপে।"

এই গলাটিপির কথা আর যমদ্বীপে প্রেরণের কথা নিশ্চয়ই "ললিত-লবঙ্গ-লতা পরিশীলিত" প্রেম-মধুর ব্রজনিকুঞ্জের কথা নহে। ইহার Environment এবং Thought-atmosphere,—অর্থাৎ প্রাবরণ-পরিধি ও ভাবমণ্ডল আর এক প্রকার।

দ্বিতীয় খণ্ড ]  পৌষ, ১৩১০।  [ ৯ম সংখ্যা।

# বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

( পুনঃপ্রচারিত। )

বৈশাখ হইতে চৈত্রে বর্ষ-গণনা।

৯

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।



ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য আট আনা।

## বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয়
## নিয়মাবলী।

অগ্রিম।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩৲ | ।৵০ | ৩।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২৲ | ৶০ | ২৶০ |

পশ্চাদ্দেয়।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৪৲ | ।৵০ | ৪।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২॥০ | ৶০ | ৩॥৶০ |

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারী সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইলে কার্য্যাদি সম্পর্কে আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হইবে না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা হয়, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৶০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া,চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই,বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

ঢাকা,
বান্ধব-কুটীর।
১৩১০ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীহরকুমার বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড বান্ধবের ৯ম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। এখনও যাঁহারা উহার মূল্য দেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া, একটু সত্বর, নিজ নিজ দেয় মূল্য পাঠাইয়া বাধিত ও অনুগৃহীত করিবেন। মাঘ ও ফাল্গুনের সংখ্যা একত্র বাহির হইবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু।
সহকারী সম্পাদক,—বান্ধব।

---

# কিশোর গৌরাঙ্গ।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

---

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"একাবি পীযূষমিব ক্ষরন্তী
নেত্রাতিথিঃ কাচন হেমবল্লী।"
(চরিতামৃত-মহাকাব্যং।)

কবিকর্ণপূর তাঁহার চরিতামৃত নামক মহাকাব্যে লিখিয়াছেন যে, গৌরাঙ্গ এক দিন, অধ্যাপনার কার্য্য পরিসমাপন করিয়া, নবদ্বীপের নগরপথে বাড়ী যাইতেছেন, এমন সময়ে একটি চলন্ত সোনার লতা,—একটি ললিত কুসুমা লতা-সদৃশী সুন্দরী—সহসা তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হইল। লতায় হাসে ফুল; সুন্দরীর নয়নে হাসে ফুলের সুষমা। লতার মৃদুল-দোলনে যেমন রূপের লহরী, সুন্দরীর চলন-দোলনেও সেইরূপ লাবণ্যের লহরী। সুন্দরী, স্নানীয় গন্ধদ্রব্যে সুরভিত হইয়া, পুরস্ত্রীদিগের সহিত গঙ্গার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; যাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহাদিগের মনে লইতেছে যে, যেন সত্য সত্যই একটি সোনার লতা তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে; আর সে লতা হইতে সৌন্দর্য্যের অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে। এই সোনার লতা কে, তাহা পাঠকের মনে হইতেছে কি? ইনিই নবদ্বীপনিবাসী বল্লভাচার্য্যের বিশ্রুত-নাম্নী কন্যা। ইহাঁর নাম লক্ষ্মী। কোন কোন পুস্তকে লক্ষ্মীপ্রিয়া নামও দৃষ্ট হয়।

যথা কর্ণপূর-চরিতামৃতে,—

"সা বল্লভাচার্য্যসুতা চলন্তী
স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াং।
লক্ষ্মীরনেনৈব সহাবতীর্ণা
প্রভোর্ম্মনো লোচন-বর্ম্ম তত্র।"

অপিচ, শ্রীমন্মুরারিপ্রণীত গ্রন্থান্তরে,—

"বল্লভাচার্য্যদুহিতা সখীজন-সমাবৃতা,
স্নানার্থং জাহ্নবীতোয়ে গচ্ছন্তী রুচিরাননা।"

পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, গৌরাঙ্গ যখন, তাঁহার বাল্যকালের উদ্দাম-চাঞ্চল্যে, নবদ্বীপের বালিকাদিগের সহিত গঙ্গার ঘাটে খেলা করিতেন, এবং কখনও কখনও তাহাদিগের ফুলের সাজি কাড়িয়া লইয়া, অথবা ফুল, ফল, ফুলের মালা ও খেলার নৈবেদ্য ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলিয়া, চঞ্চলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন, তখন আর আর বালিকারা শচীর কাছে আসিয়া কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে নালিস করিত; লক্ষ্মী কথ-

নও নালিশ করিতে যাইতেন না। লক্ষ্মী রূপে ও গুণে, সকল অংশেই শিশুকাল হইতে লক্ষ্মী মেয়ে। যেমন সুন্দর, তেমনই শান্ত, সুশীল, এবং সুখ-প্রফুল্ল কুসুমের ন্যায় কোমল-স্বভাবা। গৌরাঙ্গের আদর ও আবদার বালিকাদিগের মধ্যে অনেকের একটু ক্লেশকর হইত ; কিন্তু সে আদরের অত্যাচারও লক্ষ্মীর কাছে কেন যেন একটুকু ভাল লাগিত।

বনের বিহঙ্গ রূপ দেখিয়া ব্যাকুল হয়; মনুষ্যের নয়ন ও মন, জীবনের সকল অবস্থায়ই, রূপে কিরূপ অনুরক্ত, তাহাও আবার বুঝাইয়া বলিতে হয় কি? গৌরাঙ্গ সেই বাল্য কালেই বুঝিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মী বড় রূপবতী। লক্ষ্মীও, গৌরাঙ্গের অপ্রতিম-রূপ-মাধুরীতে সেই সময়ের অস্ফুটন্ত হৃদয়েই একটুকু আকৃষ্ট হইয়া, বুঝিয়াছিলেন যে, গৌরাঙ্গ বড় সুন্দর। বোধ হয়, সে কথা দুইয়েরই হৃদয়ে লেখা ছিল। বোধ হয়, শৈশবের সেই সুখ-লালসা-শূন্য সুখময়ী প্রীতি, সে মধুর চাহনি, মধুমাখা আবদার, প্রবৰ্দ্ধিত স্মৃতির পটলে পটলে মুদ্রিত হইয়া, প্রগাঢ় অনুরাগে পরিণত হইয়াছিল।

লক্ষ্মী এইক্ষণ সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ-বর্ষীণা বালিকা। বঙ্গীয় ভদ্রসমাজে তখনকার দিনেও অনেক বালিকা বার কিংবা তের বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা রহিত ; কেহ কেহ ঐ বয়সেই নবযৌবনের নয়নানন্দ কান্তি লাভ করিয়া, অকাল-ফুল্ল স্থল-কমলবৎ মনুষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। মা লক্ষ্মীও বোধ হয় অল্পবয়সেই বাল্যের পরবর্ত্তি বয়ঃসীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। কেন না, কর্ণপুর লিখিয়াছেন,—

"সা শৈশবাদেকপদেন বালা
সমাগতা যৌবন-সীম্নি কিঞ্চিৎ।

নবোদ্গত-বয়োলাবণ্যা লক্ষ্মীর সহিত নির্ম্মল-স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরসুন্দরের, অনেক দিনের পরে, এই আবার নূতন দেখা। গৌরাঙ্গ যখন লক্ষ্মীর দিকে চাহিলেন, তখন তাঁহার স্বভাব-বিহ্বল উদ্বেল-হৃদয় সহসা আজি এক অনির্ব্বচনীয় ও অভিনব আনন্দ অনুভব করিল। তাঁহার শরীর ও মন হৃদয়ের সঙ্গে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার প্রাণটা লক্ষ্মীর অমৃতময় সৌন্দর্য্যে যেন একবারে ভরিয়া গেল। লক্ষ্মী গৌরাঙ্গকে কখনও লজ্জা করিতেন না। যখন ছোট বেলায় দু'জনে, গঙ্গার তটে, লতা পাতা দিয়া পুতুল সাজাইয়া, মনের আনন্দে খেলা করিতেন, তখন লজ্জা কাহাকে বলে তাহা লক্ষ্মী কখনও অনুভব করিতে পাইতেন না। আজি লক্ষ্মীও লজ্জায় একবারে জড় সড় হইয়া গেলেন। তাঁহার এইরূপ ভাবান্তর ঘটিল কেন? তাঁহার শৈশব-সহচর গৌরাঙ্গের সন্দর্শনে কেন তাঁহার এইরূপ লজ্জা বোধ হইতেছে, এই কথাই তাঁহাকে অধিকতর লজ্জিত করিল। তিনি আপনাতে আপনি লুক্কায়িত হইয়া, অবনত মস্তকে, গঙ্গার দিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কএকটি সমান-বয়স্কা বালিকা ছিল। তাহারা তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস করিল। কিন্তু, মা আমা-

দিগের, বোকা মেয়েটির মত, এমনই মুখ ভার করিয়া রহিলেন যে, সেই পরিহাসও যেন তিনি বুঝিতে পাইলেন না।

"বিলোক্য সা প্রাক্তন-বল্লভং তং
সুধাম্বুধৌ মজ্জনমাততান।
নৈসর্গিকং প্রেম যথাবকাশং
প্রসহ্য নামোদয়তীহ কং বা ॥"

বঙ্গদেশে বর ও কন্যার এইরূপ পূর্ব্বরাগ, এবং পরিণয়ের পূর্ব্বে প্রণয়ের বিকাশ প্রায়শঃ অতি দুর্ল্লভ। গৌরাঙ্গের অলোক-সাধারণ অপ্রতিম-জীবনে ইহাও সুলভ হইল তিনি আপনিই বিবাহের ঘটকতার ভার লইলেন। পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন গৌরাঙ্গ তাঁহার মনের কথা কাহাকে জানাইবেন? তখন বাড়ীর বৃদ্ধ পরিচারক ও তাঁহার চির-পরিরক্ষক ঈশানদাসই তদীয় সুখ-দুঃখের একমাত্র সঙ্গী। তিনি শুধু ঈশানকেই ইঙ্গিতে একটুকু বুঝিতে দিলেন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ-জাতির কুল-বিধাতা ক্ষত্রবীর-বল্লালের প্রসাদাৎ, বল্লালের শেষরাজধানী নবদ্বীপে তখন অনেকেই ঘটকতা করিয়া দিনপাত করিত। ঘটকতা এখন যেমন অসংখ্য বিদ্যাশূন্য বাচস্পতির জীবিকার একটা উপায়, উহা তখনও অনেকের পক্ষে জীবিকার অতি সুলভ উপায় স্বরূপ হইত; এবং কেহ কেহ, শুধু ঘটকতা করিয়াই, সমাজে প্রাধান্য পাইত। ঘটকদিগের আর এক নাম কুলাচার্য্য। নবদ্বীপস্থ কুলাচার্য্যদিগের মধ্যে বনমালী ঘটক নামে একটি বিজ্ঞ লোক বসতি করিতেন। বনমালীর সহিত লক্ষ্মীর পিতা বল্লভাচার্য্যের বহুকাল হইতে বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। পাঠককে আজি মুহূর্ত্তের তরে বনমালীর সুরম্য বাস-গৃহ দর্শন করিতে অনুরোধ করি। গৌরাঙ্গের চরণ-ছায়া লাভ করিয়া চণ্ডালও কৃতার্থ হইয়াছে;—যাহারা সমাজে অতি অধস্তন ছিল, তাহারা সমাজের শীর্ষণ্য হইয়া সহস্র লোকের উপর গুরুতা করিয়াছে। এমন অবস্থায়, ব্রাহ্মণবর্য্য বনমালী যে এই ইতিহাসে একটু আদরের স্থান পাইবেন, ইহা কোন অংশেও বিচিত্র নহে। *

লক্ষ্মীর সহিত ঐরূপ চারি চক্ষে চিত্ত-বিনিময়ের দুই-এক-দিন পর, গৌরাঙ্গ একদা বনমালীর বাড়ী বেড়াইতে গেলেন। কিশোর-কান্ত ও শাস্ত্রোদ্দান্ত গৌরসুন্দর কি ভাবিয়া, অথবা কার কি প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, বনমালীর মত বিনয়ী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যাইয়া দেখা দিলেন, তাহা পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে কি? পাঠককে বলিয়া দিতে হইলেও বনমালীকে বলিয়া দিতে হইবে না। কারণ, বনমালী বুদ্ধিমান্ ও ব্যবসায়-নিপুণ ঘটক। ঘটকের শ্রুতি-স্মৃতি, ন্যায়-বেদান্ত, এবং পুরাণ ও তন্ত্র, সমস্তই বিবাহের কথা। বিবাহের কথা ভিন্ন আর কোন কথাই প্রকৃত ঘটকের কানে অথবা প্রাণে স্থান পাইতে পারে না। গৌরাঙ্গ যখন বনমালী ঘটকের বাড়ীতে যাইয়া উপ-

* কবিকর্ণপূর-প্রমুখ গ্রন্থকারেরা বনমালীর নাম-উল্লেখ-স্থলে 'মহানুভব' ও 'মহাত্মা' প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

স্থিত, তখন বনমালী অমনই মনে মনে শত কথার আন্দোলন করিয়া সিদ্ধান্তে পহুঁচিলেন যে,—'যেহেতু' বল্লভাচার্য্যের কন্যা রূপলাবণ্যময়ী লক্ষ্মী এইক্ষণ বিবাহযোগ্যা, এবং 'যেহেতু' সেই বল্লভাচার্য্যের সহিত তাঁহার সোহার্দ্দ ও সদ্ভাব থাকা সকলেরই পরিজ্ঞাত কথা, অতএব গৌরাঙ্গের এই আকস্মিক আগমন অবশ্যই পরিণয়-কামনার পরিস্ফুট পূর্ব্বলক্ষণ।

ঘটকেরা পাখীটি উড়িয়া যাইতে দেখিলে, তাহা হইতেও পাঁচ বাড়ীর পাঁচটা কথা যুটাইয়া ও ঘটাইয়া লন বটে; কিন্তু বনমালী ঘটক, গৌরাঙ্গকে দেখিয়া এবার মনে মনে যাহা ঠাওরাইয়া লইলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনঃকল্পিত নহে। কেননা, গৌরাঙ্গ তখন নবোদ্গত-প্রেমের অচিন্তনীয় স্ফূর্ত্তিতে চিত্তে একটুকু বিকল। গৌরাঙ্গের প্রাণ প্রথম বয়স হইতেই একটা তরঙ্গবিহ্বল টল-টল সমুদ্রের মত। তাঁহার প্রেম, ভক্তি, দয়া,—সমান-হৃদয় ও সমবয়স্কে ভালবাসা, এবং জ্ঞানে পিপাসা, সমস্তই চিরকাল অতি দুর্দ্দম। যেটি যখন উথলে, সেইটিই তখন তাঁহাকে আকুল ও আত্মহারা করিয়া তুলে। বনমালী, সে ভুবনমোহন মুখচ্ছবির সেদিনকার ভাব দেখিয়া, তৎক্ষণাৎই বুঝিলেন যে, গৌরাঙ্গের চিত্তে বিশেষ কোন কথা লুকায়িত রহিয়াছে। সে কথা লজ্জায় মুখে ফুটিতেছে না, অথচ সলজ্জ চক্ষু এবং লজ্জালাঞ্ছিত মুখচ্ছবিতে যেন স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। বনমালী গৌরাঙ্গের প্রীতিতে একটুকু স্পৃষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে সমস্ত ভার গছিয়া লইলেন।

যে দিন বনমালীর সহিত গৌরাঙ্গের এইরূপ সাক্ষাৎকার, তাহার পর দিনই, পূর্ব্বাহ্নে বনমালী শচীর দ্বারে স্বয়মাগত অতিথি। বনমালী আর কোন সময়ে দুঃখিনী শচীরে তাদৃশ তদ্গত-ভাবে প্রণাম করিতেন কি না, তাহা জানি না। আজি বড় প্রগাঢ় ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন।

"নমশ্চকার প্রণতো মহাত্মা
শচীং শুচিঃ সংকথয়ন্ বিধিজ্ঞঃ।"

বনমালী ঐরূপ প্রণামের পর ঘটা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

আপনি বল্লভাচার্য্যের অবিবাহিতা কন্যা লক্ষ্মীরে দেখিয়াছেন কি? না দেখিয়াছেন, এমনও সম্ভব নহে। কারণ, এই নবদ্বীপে তেমন সুন্দর, তেমন সুশীল, তেমন সদ্গুণশালিনী, সর্ব্বজন-মনোহারিণী সুকুমারী বালিকা দ্বিতীয় আর একটি নাই। বিশেষতঃ, আপনার পুত্র যেমন ভরদ্বাজ-গোত্রীয় বড় কুলীনের ছেলে, লক্ষ্মীও তেমনই বড় কুলীনের মেয়ে। লক্ষ্মীর পিতা বল্লভাচার্য্য, কুলে, শীলে ও সদাচারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—

"বল্লভ আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে,
নির্দ্দোষ বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে।
তাঁর কন্যা লক্ষ্মী-প্রায়, রূপে, শীলে, মানে,
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে।"

বনমালী ঘটক কন্যাপক্ষের কথা কহিতেছিলেন, সুতরাং তিনি কন্যার রূপ ও গুণের কথাই একটুকু বাড়াইয়া বলিলেন। ইহাই

ঘটকদিগের চিরপ্রচলিত প্রথা, অথচ লক্ষ্মীও প্রকৃতই পরমা সুন্দরী। কিন্তু, কনক-গৌর গৌরাঙ্গের কাছে লক্ষ্মীর সেই অনুপম সৌন্দর্য্যও বুঝি একটু হীন-প্রভ হয়। অপিচ, গৌরাঙ্গের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা প্রভৃতি গুণের কথা তখন নবদ্বীপের সর্ব্বত্র হৈ চৈ শব্দে আলোচিত হইতেছে। নবদ্বীপের বড় ও ছোট, পণ্ডিত ও মূর্খ, সকলেই গৌরাঙ্গ সম্পর্কে সতত নানা কথা কহিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ স্থলে, বনমালী ভুলিয়াও একবার গৌরাঙ্গ-হেন বরের রূপ ও গুণের প্রসঙ্গ করিলেন না;—গৌরচন্দ্রকে জামাতৃরূপে লাভ করিলে, লক্ষ্মীর পিতা বল্লভাচার্য্য কিরূপ চরিতার্থ হইবেন, তিনি সামান্য শিষ্টাচারের অনুরোধেও সে কথাটি একবার মুখে আনিলেন না; ইহা শচীর কাছে ভাল লাগিল না। পুত্র-গুণ-গৌরবিনী মাতার কাছে কোন স্থানেই ইহা ভাল লাগে না। ভাল লাগিতে পারে না। শচী সর্ব্বদাই প্রিয় কথায় সকলের পরিতোষ জন্মাইতেন। কিন্তু, আজি বনমালীর কাছে অতিমাত্র বিরস বদনে বিরস উত্তর করিলেন। তাঁহার উত্তরটি নিতান্তই আধুনিক বঙ্গীয় ছেলের মা'র উত্তরের মত হইল। শচী বলিলেন,—

আমার বালক পিতৃহীন; আগে বাঁচিয়া রহুক, এবং কিঞ্চিৎ বিদ্যা শিক্ষা করুক, তার পর উহার বিবাহের কথা। এখন বিবাহের কথা দিয়া আমি করিব কি? যথা চৈতন্যভাগবতে,—

"আই বলে পিতৃহীন বালক আমার,
জীউক,—পড়ুক আগে, তবে কার্য্য আর

বনমালী, শচীর কথা শুনিয়া, যার-পর-নাই অপ্রতিভ হইলেন, এবং অপ্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী চলিলেন। তিনি যে পথে যাইতেছিলেন, গৌরাঙ্গও তাঁহার টোলের কার্য্য সমাপন করিয়া সেই পথেই বাড়ী আসিতেছিলেন। পথে দুই জনের সাক্ষাৎকার ঘটিল। সাক্ষাৎকার হওয়া মাত্রই গৌরাঙ্গ একান্ত হৃষ্ট মনে, বনমালীর চরণে প্রণত হইলেন; এবং তাঁহার প্রেমময় হৃদয়ের স্বাভাবিক স্ফুরণে, তাঁহাকে একটি প্রগাঢ় আলিঙ্গন দানে, পরিতর্পণ করিলেন। যথা, কর্ণপূর—

"অসৌ নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র
শ্চন্দ্রাননশ্চন্দ্রসহস্রকান্তঃ।
আচার্য্যমালোক্য ননাম হৃষ্টো
দৃঢ়ং পরিষজ্য চ ধীরমূচে।"

প্রণাম ও প্রতিনমস্কারের পর দুই জনে সামান্য কিছু আলাপও হইল। আলাপে আজি গৌরাঙ্গই একটুকু বেসী উন্মুখ। হৃদয় যখন হৃদয়ারাধ্য অভিলষিত জনের জন্য লালায়িত হয়, তখন নয়ন, মন, মুখচ্ছবি ও রসনা, সকলই আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া দুটি কথা কহিতে ভালবাসে।

"প্রভু বলে কহ গিয়াছিলা কোন ভিতে,
দ্বিজ বলে তোমার জননী সম্ভাষিতে।
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাম তারে,
না জানি, শুনিয়া শ্রদ্ধা না করিলা কেনে।

অথবা যথা, কবিকর্ণপূর—

"আসীঃ ক গন্তা ক্বময়ে মহাত্মন্

কথং নু বা ত্বং বিমনাঃ প্রয়াসি।
স আহ মাতুশ্চরণৌ ত্বৈব
দ্রষ্টুং গতঃ সম্প্রতি যামি দুঃখী।”

গৌরাঙ্গ, কান পাতিয়া সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া আপনিও অত্যন্ত বিমনা হইলেন। মা শচী গৌর-জীবনেই জীবিত। তিনি গৌরাঙ্গের আশার পথে অন্তরায় হইবেন, এবং এমন নিঠুর উত্তর দিবেন, ইহাও কি সম্ভব? গৌরাঙ্গ বনমালীকে আর একটি কথাও না কহিয়া, বড়ই শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত চিত্তে বাড়ী আসিলেন; এবং আজি বাড়ীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করিলেন। শচী জানিতেন গৌরাঙ্গ অনেক সময়েই তাঁহার পুস্তক লইয়া একাকী বসিয়া থাকেন। সুতরাং শচী কোন খবর লইলেন না। ইহার কিছুক্ষণ পরে, গৌরাঙ্গ, আপনিই ধীরে ধীরে, যত-দূর-সম্ভব ধীর-পদ-সঞ্চারে, মায়ের কাছে যাইয়া, মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন,—

মা, আজি বনমালী আচার্য্য আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে কি তুমি আদর-সম্ভাষণ কর নাই? শচী স্বভাবতঃ একটুকু সাদাসিদে গোছের লোক হইলেও, গৌরাঙ্গের সকল কথাই তিনি ইঙ্গিত-মাত্রে বুঝিতেন। আজি শচী, গৌরাঙ্গের ঐ রূপ অর্দ্ধস্ফুট এবং লজ্জারুদ্ধকণ্ঠের কথা শুনিয়া আশাতীত সুখে সুখী হইলেন;—বাল্যযোগী বিশ্বরূপের সন্ন্যাস অবধি স্বপ্নেও যে সুখের সম্ভাবনা করেন নাই, তাহা সম্মুখস্থ দেখিয়া, আপনাকে আপনি সৌভাগ্যবতী মনে করিলেন,—অথচ মনে মনে একটুকু হাসিলেন। তার পর, গৌরাঙ্গের বিকচ-নলিন-সদৃশ চক্ষু দুটির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

বনমালী আমার কাছে আবার আসিবে। তাহাকে আমি শীঘ্রই ডাকাইয়া আনিব। সে আমার কথা ভাল করিয়া বুঝে নাই। গৌরাঙ্গ, মায়ের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন,—মায়ের মুখচ্ছবি দেখিয়া প্রাণে আনন্দ অনুভব করিলেন; এবং সেখান হইতে, নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া, ঈশানের কানে কানে কহিলেন,—তোমার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে। যথা ভক্তিরত্নাকরে, ঈশানের উক্তি,—

“এইখানে বসিয়া শ্রীশচীর কুমার,
মোরে কহে হইবেক মনে যা তোমার।”

আমরা এই জন্যই বলিয়াছি যে, প্রীতি-পিপাসু গৌরাঙ্গ আপনিই এ বিবাহের প্রধান ঘটক।

পাঠক যদি বনমালী ঘটকের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বল্লভাচার্য্যের বাড়ী যাইতে হইবে। বনমালী দিনেক দু’দিন পরেই শচীর ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বুঝিতে পাইলেন; এবং তার পর, বল্লভাচার্য্যের বাড়ী যাইয়া, রীতিমত অধ্যক্ষ হইয়া বসিলেন। তিনি শচীর কাছে মিনতি করিয়া কথা কহিয়াও প্রথমে মুখ পান নাই, কিন্তু বল্লভাচার্য্যের বাড়ীতে তাঁহার অন্যরূপ ভাব। সেখানে তাঁহার আদরের আর সীমা নাই। কেন না, বল্লভাচার্য্য কন্যার পিতা, এবং সে কন্যা একটুকু

বয়ঃস্থা। বনমালী ঘটক, শচীর কাছে গৌরাঙ্গের সামান্য কোন গুণেরও প্রশংসা না করিয়া, লক্ষ্মীরেই রূপে গুণে লক্ষ্মীসদৃশী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; এক্ষণে বল্লভাচার্য্যের বাড়ী আসিয়া সুর বদলাইলেন; এখানে তিনি শুধু গৌরাঙ্গেরই প্রশংসা করিলেন।—

"আচার্য্য বলেন শুন আমার বচন,
কন্যাবিবাহের এবে কর সুলগন।
মিশ্রপুরন্দর-পুত্র নাম বিশ্বম্ভর,
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের সাগর।
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়,
কহিলাম কর যদি চিত্তে হেন লয়।"

বল্লভাচার্য্য নিতান্ত সাধু, সরল ও নম্রস্বভাব লোক ছিলেন। তিনি, বনমালীর প্রস্তাব শুনিয়া, তৎক্ষণাৎই প্রীতির সহিত সম্মতি দিলেন; এবং গৌরাঙ্গের মত সুরূপ ও সুপণ্ডিত জামাতৃলাভের সম্ভাবনা জানিয়া, একবারে আনন্দে ডগ-মগ হইলেন। বল্লভাচার্য্যের আর সন্তান নাই। ঐ লক্ষ্মীই তাঁহার সংসার-সর্ব্বস্ব অথবা জীবন-সর্ব্বস্ব। তিনি লক্ষ্মীর বিবাহের জন্য পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী এবং তৎকাল-ব্যবহৃত আভরণাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথাপি, আপনার দৈন্য ও সৌজন্য জানাইয়া, ঘটকের কাছে বিনয় করিয়া বলিলেন,—

"সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই,
আমি ত নির্ধন, কিছু দিতে শক্তি নাই।
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া,
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া।"

এ দেশে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, সামাজিকতার কি রূপ সুন্দর ব্যবস্থা ছিল,—বরপক্ষে ও কন্যাপক্ষে পরস্পর কি রূপ প্রীতিবান্ধবতার কথা চলিত, এবং ঘটকেরাই বা কিরূপে কার্য্য ঘটাইতেন, পাঠক এই চিত্রে তাহার পরিচয় পাইতেছেন।

লক্ষ্মী যদি এখনকার মেয়ে হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার আপাদ-সীমন্ত রূপের পরীক্ষায়ই, সম্ভবতঃ সংবৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইত;—বরের সমানবয়স্ক সুহৃৎ-স্বজন হইতে আরম্ভ করিয়া, বাড়ীর হাড়ী ঝী ও পাড়ার পাঁচী গোয়ালিনী পর্য্যন্ত, সকলেই এক এক বার বালিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-নিচয়কে ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তুর মত পরখ করিয়া দেখিত,—এবং দানসামগ্রীর তালিকা লইয়াও বৈঠকের পর বৈঠক ও বাদার্থশাস্ত্রের বিচার চলিত। কিন্তু শচী, অর্থবিত্তে কাঙ্গালিনী হইলেও, হৃদয়ের গুণ-গৌরবে রাজরাণী অথবা রাজ-পূজ্য দেব-রমণী। তিনি পঞ্চ হরিতকীতেই প্রীত ও পরিতৃপ্ত। তিনি পুত্রবধূর মুখারবিন্দ দেখিবেন, ইহাই তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা; বধূমাতা সঙ্গে কি লইয়া আসিবেন, ইহা ক্ষণকালও তাঁহার আলোচনার বিষয় নহে। এইরূপ বণিগ্‌বুদ্ধিশূন্য বিশুদ্ধ সামাজিকতা, তদানীন্তন বঙ্গের কি রূপ গৌরব-খ্যাপক, পাঠক তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন না কি?

আমরা গৌরাঙ্গকে শচীর আঙ্গিনায় নাচিতে দেখিয়াছি; গঙ্গার ধারে খেলা করিতে দেখিয়াছি; গঙ্গার এ পারে ও পারে, সহা-

ধ্যায়ি-বালকদিগের সহিত বিচারযুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি ; গঙ্গাদাসের টোলে, ললাটে চন্দনের রেখা এবং বক্ষে যোগ-পট্টের ন্যায় উত্তরীয়, এই বেশে, মনের উল্লাসে, শাস্ত্র-চিন্তায় মগ্ন দেখিয়াছি। সেই চারুচঞ্চল, অথচ চিরগভীর,—কৌতুকপ্রিয়, অথচ অধ্যয়নের কঠোর-শ্রম-রত,—ক্ষণক্রোধী, অথচ স্নেহমমতার খনি, প্রভুত্বপ্রিয় অথচ প্রণয়-তৃষাকুল গৌরাঙ্গকে এক্ষণ বিবাহের সজ্জায় সজ্জিত দেখিতেছি। গৌরাঙ্গের বয়স এক্ষণ ষোল যাইয়া সতর। কিন্তু এই বয়সেই তিনি পঁচিশ বৎসরের যুবার ন্যায় পূর্ণ-বিকশিত।—

"নবীন কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরণ,
সুমেরু-পর্ব্বত জিনি অঙ্গের গঠন।
সহজ রূপের নাহি ভুবনে তুলনা,
যজ্ঞসূত্রে অতিশয় তাহাতে শোভনা।

* * *

দীঘল সুন্দর আঁখি পুণ্ডরীক জিনি,
অপরূপ তাহে চারু সুন্দর চাহনি।"

পাড়ার এয়োরা আসিয়া যখন গৌরাঙ্গকে বর-বেশে সাজাইতে লাগিল, তখন তাঁহার সেই চিরপরিচিত মনোহর রূপ, তাহাদিগের নিকট, যেন কেমন এক নূতন-মাধুরীতে মধুর, এবং নূতন-আভায় উজ্জ্বল বোধ হইল। শচীর সেই ক্ষুদ্রায়তন বাস-ভবনের অন্তঃপুরে ও বহিঃপ্রকোষ্ঠে অসংখ্য লোকের ভিড়। কেহ আসিতেছে, কেহ যাইতেছে। কেহ পুরোবর্ত্তিনী মেয়েদিগের দিকে চাহিয়া মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতেছে, আর আমোদে ঢলিয়া নানারূপ কৌতুকের কথা কহিতেছে। এমন সময়, এই আনন্দের উচ্ছ্বাস, শোকের সকরুণ ক্রন্দন-শব্দে সহসা যেন থামিয়া গেল। আকাশে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্না উছলিয়া পড়িতেছিল ; একখানি বিষাদের মেঘ আসিয়া সহসা সেই জ্যোৎস্নাকে ঢাকিয়া ফেলিল।

শচী, সকল সময়েই, তাঁহার প্রাণের পুতুল বিশ্বরূপ এবং প্রাণারাধ্য জগন্নাথকে মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেন। তিনি, শুধু গৌরাঙ্গের সুখশান্তির দিকে চাহিয়া, তাঁহাদিগের নাম মুখে আনিতেন না। আজি এ উৎসবের সময়েও, বিশ্বরূপের কথা বুকে চাপা দিয়া রাখিলেন। পাছে সে অমঙ্গলের কথা উল্লেখ করিলে, গৌরাঙ্গের কোন দিক্ দিয়া কোনরূপ অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে বুকের সে আগুন বুকেই ঢাকিয়া রাখিলেন। কিন্তু জগন্নাথের শোক, এই সময়ে, তাঁহার পতি-গত-প্রাণে সহসা দুঃসহ হইল। "আমি তোমার সোনার চাঁদকে বিবাহের সাজে সাজাইয়া দিতেছি, হায়! তাহা তুমি দেখিলে না, তুমি কোথায় হে আমার চির-জীবন-গুরু!" এই বলিয়া সতী অশ্রুজলে আপ্লুত হইলেন ; এবং তাঁহার মত অনাথা কিরূপে এই উৎসবের উপযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা মনের সাধ মিটাইবে, ইহা মনে করিয়াও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপ, ঐ সময়ে, বঙ্গীয় ভদ্রসমাজের শীর্ষ স্থান;—সামাজিকতার সকল বিষয়েই সমগ্র বঙ্গের আদর্শ। তখন কিবা কাঙ্গাল, কিবা

ধনী, সকলের গৃহেই, উৎসবের সময়, সকলের সমাগম হয়। শচীর গৃহেও সে দিন নবদ্বীপের সমস্ত পুরমহিলারা সমাগত হইয়াছেন। কিন্তু পতিহীনা শচীর তখন এমন সংস্থান নাই যে, তিনি পুরমহিলাদিগের উপযুক্ত আদর করিতে পারেন। শোক, জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থায়ই, শোক। উহা, সাধারণতঃ, সাংসারিকতার কর্ম্মশাসনে, হৃদয়ের মধ্যে কোথাও লুকাইয়া থাকে; উৎসবাদির আনন্দসময়ে, অভিনব বহ্নিশিখাবৎ, জ্বলিয়া উঠে অথবা ফুটিয়া পড়ে। যদি তখন, অবস্থার বৈগুণ্যও আবার, হৃদয়কে আর এক দিক্ দিয়া, নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে শোক, অন্ততঃ ক্ষণকালের তরে, অতিমাত্র রোগ-যন্ত্রণার ন্যায়, জ্বালাময় এবং প্রকৃতিনিহিত সহিষ্ণুতারও অনধিগম্য হয়। অভাগিনী শচীরও আজি তাহাই হইল। তিনি, প্রতিবেশিনী এয়োস্ত্রী'য়োদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বাষ্পরুদ্ধ গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"পতিহীনা মুই ছার, পুত্র পিতৃহীন,
তো সবার পূজা কি করিব মুই দীন।
এ বোল বলিতে শচী গদ-গদ ভাষ,
তিতয়ে আঁখির নীরে হৃদয়ের বাস।"

গৌর-হৃদয় সকল সময়েই ভাবের সমুদ্র। গৌরাঙ্গ এতক্ষণ কেমন একপ্রকার অনন্যগম্য গভীর-ভাবে আবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু যখন শচীর চক্ষে জল দেখিলেন,—শচীর করুণ-বিলাপ শুনিতে পাইলেন, তখন আপনিও চক্ষের উচ্ছলিত জল-ধারায় আর্দ্র হইলেন, এবং পিতার কথা চিন্তা করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

"চিন্তিতে লাগিলা, মোর পিতা গেলা কোথা,
পড়িতে লাগিল হিয়া পাইলা বড় ব্যথা।
মুকুতা-গাঁথনি যেন চক্ষে পড়ে পানি,
দেখিয়া ত ব্যস্ত হৈলা শচী ঠাকুরাণী।"

গৌরাঙ্গ, পিতার শাসনে, কখনও কখনও, বিশেষরূপে শাসিত হইয়া থাকিলেও, শিশুকাল হইতেই, তিনি একান্ত পিতৃবৎসল ও মাতৃভক্ত বলিয়া পরিচিত। তাঁহার হৃদয়ে এই বাৎসল্য ও ভক্তি চিরদিনই সমান ছিল। তিনি যখন বর-বেশে বিভূষিত হইয়া,—বরযাত্রার সুখাসনে বসিয়া, মাতার শোকাশ্রু দর্শনে, ও স্বর্গগত পিতার কথা স্মরণে, ঐ রূপ নয়ন-জলে ভাসিতে লাগিলেন, এবং কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তখন পল্লীর মেয়েরা কেহই সেখানে চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না। সকলেই উৎসবের কথা ক্ষণকাল ভুলিয়া গেলেন; এবং শচীও গৌরাঙ্গের দিকে চাহিয়া, শোকবিহ্বল সুহৃজ্জনের মত বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। কথাটা লইয়া তখন একটু আলোচনা হইয়াছিল। তাই কবিকর্ণপুর প্রভৃতি গৌর-চরিত-লেখক সংস্কৃত-কবিরাও এ ঘটনার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা চরিতামৃত-মহাকাব্যে,——

"স মাতুরিত্থং করুণোদিতং প্রভু
র্নিশম্য তাত-স্মৃতি-দুঃখ-বিহ্বলঃ।
মুক্তাফলস্থূল-বিলোচনাম্বুসাং
বিন্দূন্ববাহ প্রবরোরুবক্ষসি।"

আনন্দ-উৎসবের সময় অশ্রুজল-বর্ষণ প্রাচীনাদিগের চক্ষে একান্তই অমঙ্গলের চিহ্ন। শচীর ভাঙ্গা কপালে পুত্রোৎসবের এই প্রথম সুখও কি ভাঙ্গিয়া পড়িবে? উৎসবের অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত ভবিষ্যতে যাহাই লিখিত থাকুক, নবদ্বীপবাসী সকলেই তখন বুঝিলেন যে, শচী যেমন শৈশব হইতে স্নেহের প্রতিকৃতি, শচীর দুলাল গৌরাঙ্গও তেমনই উচ্ছল ও উদ্বেল-স্নেহের চিত্রিত মূর্ত্তি। নহিলে, এমন সময়ে, পিতৃস্মৃতি তাঁহারে ঐরূপ বিকল করিবে কেন? উভয়ের প্রতিই লোকের পূর্ব্বসঞ্চিত প্রগাঢ় ভক্তি অধিকতর প্রগাঢ় হইল; যাঁহারা, নিজ নিজ বুদ্ধির সংকীর্ণতায়, গৌরাঙ্গকে ক্রীড়াচঞ্চল বালকটি বলিয়া জানিতেন, তাঁহাদিগের মনে বিস্ময় জন্মিল।

পতিহীনা শচী, সুপ্তোত্থিত শোক-দুঃখের প্রথম আবেগে যার-পর-নাই ক্লিষ্ট হইয়া থাকিলেও, পরিশেষে, প্রাণধন গৌরনিমাইর আবেগ-বিহ্বল অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার সকল দুঃখ সংবরিয়া লইলেন; এবং বৈবাহিক বল্লভ-আচার্য্যের ব্যবহারে চিত্তে কতকটা শান্তি পাইলেন। বল্লভ-আচার্য্য এ বিবাহে বড়ই ঘটা করিয়াছিলেন। ইহাতে শচীর মনে প্রীতি জন্মিল; শচী পুত্রোৎসবে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া ব্যয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার সে দুঃখও দূর হইল। যখন গৌরাঙ্গ, বিবাহের তৃতীয় দিবসে, স্বর্ণপ্রতিমা লক্ষ্মীর সহিত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া, দুইজনে একত্র দাঁড়াইয়া, শচীর চরণে প্রণত হইলেন, দুঃখিনী তখন পূর্ব্বের সকল কথা বিস্মৃত হইয়া, পুত্র ও পুত্রবধূ কোলে লইয়া, নানাপ্রকার আনন্দ করিতে আরম্ভ লাগিলেন।

"পুত্রবধূ কোলেতে করিয়া শচীদেবী,
দূর্ব্বা ধান্য দিয়া বলে হও চিরজীবী।
পুত্রমুখে চুম্ব দেয় বধূমুখ চাইয়া,
বধূমুখে চুম্ব দেয় পুত্র নিরখিয়া।" (ম)

মা লক্ষ্মীও পিতৃবাস পরিত্যাগের সময় একান্ত আকুল হইয়াছিলেন। সেই ত নবদ্বীপ,—সেই নবদ্বীপের সেই ত পল্লী;—এক ঘর হইতে আর এক ঘর,—তথাপি তাঁহার এইরূপ বোধ হইয়াছিল, যেন তিনি তাঁহার পিতামাতাকে জন্মের মত ছাড়িয়া, দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছেন। পিতা ও মাতার কথা ত পৃথক্, পিতৃগৃহের পশুপক্ষী এবং তরুলতাগুলিরেও তখন তাঁহার আপনার জন বলিয়া বোধ হইয়াছিল; এবং তাহাদিগের দিকে চাহিয়াও তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু, শচীর মধুমাখা কথায়,—মধুমাখা ভালবাসায়, তাঁহার মনে সহসা একটা ভাবান্তর জন্মিল; এবং শাশুড়ীও, সর্ব্বাংশে, মায়ের মত আর এক মা হইতে পারে, এই বিশ্বাস তাঁহাকে একটা অভিনব আনন্দে আপ্লুত করিল।

গৌরাঙ্গের জীবন, এখন হইতে, এক দিকে মাতা শচী, আর এক দিকে পিতৃতুল্য পূজ্যাস্পদ অধ্যাপক গঙ্গাদাস, এবং সাধারণতঃ সমস্ত নবদ্বীপবাসীরই নিতান্ত প্রীতিকর হইয়া উঠিল। শচীও, তাঁহার নিমাইচাঁদের ভাবিজীবন বিষয়ে, চিত্তে একবারে নিশ্চিন্ত হইয়া, নববধূর মধুর ব্যবহারে, বৃদ্ধাবস্থায়ও

মাতৃস্নেহের সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন বধূ লক্ষ্মী, বালিকা হইয়াও, স্নান-আহারের যত্নবিধানে, এবং আরও শত প্রকার স্নেহের অনুষ্ঠানে, শচীর যেন মা। তাঁহার রূপে ও গুণে, বিশেষতঃ তদীয় নম্র ব্যবহারে, শচীর শোক-দগ্ধ শুষ্ক প্রাণটা প্রকৃতই যেন আর্দ্র হইল।

"অতি সুকোমল তনুখানি
হাসিমাখা বদন পূর্ণিমার চাঁদ জিনি।
পরিধেয় বিচিত্র বসন—
ঝল মল করে নানা রত্ন আভরণ।"

শচী বিরলে বসিয়া পুত্রবধূর রূপ দেখিতেন; এবং পুত্রবধূর স্নেহময় সুশীলতায় ও সানন্দ-পরিচর্য্যায় পুত্রকেও ভুলিয়া থাকিতে চাহিতেন। রূপে কুসুমের কান্তি আছে—কুসুমের কোমলতা আছে। ইহা প্রসিদ্ধ কথা, অথবা কবিপ্রসিদ্ধি বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু কুসুমের হৃদয়হারি সৌরভও রূপে কখনও সম্ভব হয় কি? শচী মনে করিতেন, তাঁহার পুত্রবধূ যে স্থান দিয়া চলিয়া যান, সেই স্থানই পদ্মের গন্ধে আমোদিত হয়। যথা চৈতন্যভাগবতে,

"কমল পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়,
পরম বিস্মিত আই চিন্তয়ে সদায়।
আই চিন্তে, বুঝিলাম কারণ ইহার,
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার।"

স্নেহের এইরূপ ভাবান্ধতা জগতে বড় মধুর বস্তু। স্নেহান্ধতার এইরূপ বর্ণনাও যার-পর-নাই মধুর। কিন্তু এ মধুরা প্রীতি,—এই হৃদয়-মনোমোহিনী সুরভি-মাধুরী, গৌরাঙ্গের মহোচ্ছ্রিত হৃদয়কে মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করিয়াও, সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিতে পারিল না। সে হৃদয়ের এক পার্শ্বে উহা প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যে শোভা পাইল; হৃদয়ের অন্য সমস্ত অংশ জ্ঞানের প্রবল পিপাসা এবং ততোধিক উচ্চতর আশার বিলাসক্ষেত্র হইয়া রহিল।

ইতি কিশোর-গৌরাঙ্গ-সন্দর্ভে বিদ্যাবিলাস-নামকঃ
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ পরিসমাপ্তঃ।

# হিন্দু জ্যোতিষের প্রাথমিক সময়

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দু জ্যোতিষের প্রাগৈতিহাসিক সময়ে উহার তুলনাস্থল অরুণোদয়কাল বা অতি প্রত্যুষ,—যখন সমুদয় বস্তুই তমসাচ্ছন্ন কেবল অরুণালোকে উহাদিগের অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ; কিন্তু প্রকৃত আকার চতুষ্পার্শ্বের অন্ধকার হইতে বিচ্ছিন্ন করা দুষ্কর বলিয়া সম্পূর্ণ অপরিস্ফুট। আদিম অবস্থা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অবগত হওয়া যায় যে, যখন এক একটি নভশ্চর এক একটি দেবতারূপে পরিগণিত, তখন আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক উৎ-

সর্পিনী আশাতেই জ্যোতিষশাস্ত্রের অবস্থান। সেই পরমপুরুষ নভশ্চরদিগের প্রতি যে যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের শাসন সংরক্ষণ করেন। সুতরাং গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি এবং সময় ও ঋতুর পর্য্যায় অবলোকন ও অনুশীলন করিয়া ঐশী ইচ্ছার জ্ঞান লাভ হয় ইহাই আর্য্য ঋষিদিগের জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নের মূল সূত্র।

কাল ও ঋতুর সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দু ধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ধর্ম্মানুষ্ঠানের কাল নির্ব্বাচন করার জন্য পঞ্জিকার সৃষ্টি। এই পঞ্জিকা প্রারম্ভে স্বভাবতঃ অসম্পূর্ণ ছিল। কালে সাংসারিক ব্যাপার ছাড়িয়া ধর্ম্মোদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রণালীতে উহার উন্নতিসাধন করা হয়।

সকল জাতির মধ্যেই কালের মৌলিক বিভাগ দিন, মাস ও বর্ষ ঠিক একরূপ। প্রধান পার্থক্যের বিষয় মাস ও বর্ষে দিনের সমাবেশ; দিনের ক্ষুদ্রতর ভাগ; মধ্য রাত্রি, মধ্য দিন কি সূর্য্যোদয় দিনের আরম্ভ; ভিন্ন সংখ্যক দিন বিশিষ্ট মাসে বর্ষের বিভাগ; বিভিন্নরূপ মাসে বর্ষ গণনা ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্তরূপে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কোন্ সময়ে বর্ষারম্ভ করিলে তদন্তর্গত মাস ও ঋতুর পুনরাবৃত্তি ঠিক নিয়মিতরূপে হয়, এই বিষয়ের পর্য্যালোচনাতে সকল জাতিই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। এতৎ সম্পর্কে কোন স্থির নিয়ম নির্দ্ধারণোদ্দেশ্যে সকল জাতির লোকই নভশ্চরগণের গতি মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যয়ন অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। কারণ বেদে নভশ্চরগণকে দেবতারূপে পূজা করার বিধান রহিয়াছে। এই ভাবে হিন্দুগণ নভোমণ্ডলকে বিশেষ যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং পর্ব্বদিন বিশুদ্ধরূপে নির্দ্ধারণ করার জন্য পঞ্জিকা সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। বীজগণিত ও পাটীগণিত সম্বন্ধে তাঁহাদিগের স্বকীয় স্বতন্ত্র প্রণালী দেখিয়া অনুমান করা যায় যে জ্যোতির্গণনার প্রয়োজনেই এই দুই শাখার সৃষ্টি। বীজগণিত সম্বন্ধে ইহা অসম্ভব বোধ হয় না যে, আর্য্য ঋষিগণই এই শাস্ত্রের প্রণেতা। তাঁহারা যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের গতির সমাবেশ দ্বারা সৌর চন্দ্র বর্ষের গণনা স্থির করিয়াছিলেন, তখন গণিত শাস্ত্রে যে তাঁহারা সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদেশ এই যে, কেহ কোন ব্যবসায়ে বিশেষরূপে শিক্ষিত না হইয়া তাহা অনুসরণ করিবে না। ইহাতেই প্রত্যেক ব্যবসায় এক এক চিহ্নিত পরিবারের অবলম্বিত এবং উহার গূঢ় তত্ত্ব সকল এক এক সম্প্রদায় দ্বারা সংরক্ষিত। এই ভাবে হিন্দু জ্যোতিষের জ্ঞান কোন এক সম্প্রদায় দ্বারা অতি পবিত্রভাবে সংরক্ষিত এবং উহার তত্ত্বগুলি এত গূঢ় ছিল যে, দেবতারাও তাহা জানিতেন না। উহা সাধা-

রণ্যে প্রকাশের অযোগ্য, অনুপ্রাণিত ঋষিদিগের ধন কেবল অনুপ্রাণিত শিষ্যগণই পাইতে পারিতেন। হিন্দু জ্যোতিষের প্রাথমিক ইতিহাস যে এত দুরূহ তাহার প্রধান কারণই উক্ত রূপ গোপনীয়তা। উহার যে অংশ অতি প্রাচীন তাহা মুখে মুখে সমাগত। কেবল পুরুষ-পরম্পরাগত বাক্য রূপেই মূল শাস্ত্রের অস্তিত্ব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতবাসী কতিপয় ইংরেজ হিন্দুদিগের দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া সবিশেষ আগ্রহ ও যত্ন প্রদর্শন এবং আংশিক কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ যে যে বিষয় আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে হিন্দুসভ্যতার প্রাচীনতাই প্রধান। ইহাতে সকলেরই মত জন্মে যে, প্রাচীনতম সভ্যজাতির মধ্যে হিন্দু জাতি একতর। এই মতের সমর্থনে যে যে কারণ আছে, তাহা তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিতে যত্নপর হন। হিন্দু ইতিবৃত্তের প্রামাণিক কাল নির্ণয় করাই তাঁহাদের প্রথম চেষ্টা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হিন্দুগণ বহুকাল হইতে তাঁহাদিগের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে অসম্ভব উপাখ্যানে আসক্ত। তাঁহাদিগের চক্ষে বর্ত্তমান কলিযুগ সর্ব্বপ্রকার অধোগতি ও দুঃখের আকর, সুতরাং পরম্পরাগত আখ্যায়িকা হইতে তাঁহারা অতীত সকল বিষয়ই বর্দ্ধিত আকারে দেখেন। তাঁহারা সত্য ও ত্রেতা যুগের ঘটনাবলীর বিশেষরূপে উল্লেখ করেন। তখন লোক সকল স্বাধীন, পবিত্র এবং নীরোগ ছিল। দ্বাপর যুগে যে যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্রের সমুজ্জ্বল অথচ কল্পিত কার্য্যকলাপ ভারতীয় দুই প্রধান মহাকাব্যে বর্ণিত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের রাজত্বের কথাও তাঁহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন।

হিন্দুগণ নিজেরা বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের জাতীয় আস্তত্ব কোটি কোটি বর্ষব্যাপী, কিন্তু উহা অসম্ভব মনে করিয়া সার্ উইলিয়ম জোন্স্ এবং কাপ্তান্ উইল্‌ফোর্ড্ স্বতন্ত্র-ভাবে হিন্দুদিগের প্রাচীন লিপি এই আশায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, অতীত কালে যে সকল লোক বাস্তবিক জীবিত ছিলেন এবং যে সকল ঘটনা নিঃসন্দেহরূপে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রামাণিক অথবা অন্ততঃ সম্ভবপর কাল নির্ণয় করা যায় কি না। উভয়েই নিরাশ ভাবে উহা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু উভয়েই সম্ভবপর সময়ের এক এক তালিকা প্রচার করিয়াছিলেন। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স্ উপসংহারে প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিষয়টি এরূপ তমসাচ্ছন্ন এবং ব্রাহ্মণ দিগের কল্পনা জালে এতাধিক ঘনাবৃত যে, সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ দ্বারা অয়নান্ত বৃত্তের অবস্থান স্থিরীকরণ পূর্ব্বক ঐতিহাসিক কাল ঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা ব্যতীত নিরাপত্তিতে কোন সময়ের তালিকা প্রস্তুত হইতে পারে না। তাহাও জ্যোতির্ব্বিদ্ কীরণের পরিদর্শনের ন্যায় কাল্পনিক পরম্পরাগত কোন কথার উপর নির্ভর করিয়া হইবে না; যেহেতু, কীরণ নামক কোন প্রকৃত জ্যোতির্ব্বিদ্

জীবিত থাকাই সম্ভবপর নহে। এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী কোন স্থানে অয়নান্তবৃত্তের অবস্থান দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে জ্যোতিষসম্পর্কীয় কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় ঘটনার কাল অবধারণ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

সময় সম্পর্কে হিন্দু লেখক দিগের মিথ্যা ভাবে অত্যুক্তির জন্য শত্রুপক্ষ দোষারোপ করেন। কিন্তু এই দোষারোপ সকল প্রাচীন জাতির প্রতিই হইয়া থাকে। মিসরীয়, চীন ও পারশীয় প্রত্যেকেই গর্ব্বে স্ফীত হইয়া স্ব স্ব জাতির প্রাচীনতা বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া নিন্দিত। চীনগণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম জাতি রূপে পরিগণিত হইতে চাহেন। গ্রীকদিগের নিকট মিসরীয়গণ সাহঙ্কারে বলিতেন যে ৫৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ তাঁহাদের প্রাচীন লিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। বেবিলীয়গণ বলিতেন যে, বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে সংঘটিত জ্যোতিষিক ঘটনাবলীর প্রকৃত পরিদর্শনের বিবরণ তাঁহাদের ছিল। গ্রীষ্টীয় শকের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে কালিস্থেনিস্ তাঁহার পিতৃব্য আরিস্ততলের নিকট ১৯ শত বর্ষ পূর্ব্বে কৃত পরিদর্শনের নকল বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ এ সকল জাতির বিবরণ যে সময় হইতে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তখন উহার সকল জাতিই বহু-লোকপূর্ণ। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক সময়ে দীর্ঘকাল অবস্থান না করিলে, লোক-সংখ্যার এত বৃদ্ধি হইতে পারে না। এ সকল জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে পরম্পরাগত আখ্যানের সহিত বাস্তবিক ঘটনার মিশ্রণে উহাদিগের বর্ণনায় এত অত্যুক্তি থাকা আংশিক রূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

অতিপ্রাচীন ঘটনাবলীর কালনির্ণয়সম্বন্ধে আপাত-প্রতীয়মান অত্যুক্তির একতর কারণ বর্ষ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ভালরূপে অবধারণ করিতে না পারা। আধুনিক ইউরোপীয় জাতির মধ্যে বর্ষ শব্দের একই অর্থ। পোপ্ গ্রেগরির সময়ে উহার বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হেতু যে অসুবিধা অনুভূত হয়, তাহা দূরীকরণ মানসে তিনি উহার বর্ত্তমান অর্থ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে, দেখা যায় বর্ষ শব্দের অর্থ উহা ( অর্থাৎ পৃথিবীর সায়ন রাশিচক্র পরিভ্রমণ করার কাল ) হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অতীত কালের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখা যায় বর্ষ শব্দের অর্থ ক্রমশঃ অস্পষ্ট ভাব ধারণ করাতে অবশেষে উহাতে বর্ত্তমান অর্থ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সময়ের নানা ভাগকে, ঐতিহাসিকগণ, বর্ত্তমান কালে বর্ষ শব্দ যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, সেইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কতিপয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রত্যেক গ্রহের রাশিচক্র ভ্রমণের কালকে বর্ষ বলিয়াছেন। যথা মঙ্গল, শুক্র ও শনি প্রত্যেকের ভগণ-পরিমিত কাল উহাদিগের এক এক বর্ষ। চন্দ্রের ভগণ ৩০ দিনে, আমরা পাঠ করিয়া থাকি যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে চন্দ্রের ভগণ ধরিয়া দুই, তিন কি চারি মাসে সময়ের গণনা করা

হইত। যখন বিশুদ্ধতা তত আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না, তখন সৌর-মান অপেক্ষা চান্দ্র-মানে সময়ের গণনা করাই সহজ। অমাবস্যাতে চন্দ্রের কিছুই দেখা যায় না, এবং পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্র দেখা যায়; সুতরাং, অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, যেরূপ সহজে বর্ষের আরম্ভ করা যায়, সৌর বর্ষের আরম্ভ তত সহজ নহে।

যে দেশে লোকের ব্যবসায় প্রধানতঃ ভূমিকর্ষণ কি পশুচারণ, সেই দেশে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, রোপণ করা, বপন করা, শস্য সংগ্রহ করা, কি গৃহ পালিত পশুর সন্তান উৎপাদন করার সময়সম্পর্কে পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশই সহজে পরিগ্রহ হয়। এ সকল কাজে বৎসরের তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ এবং কখন কখন ষষ্ঠাংশেরই প্রয়োজন।

বর্ষ শব্দের প্রাচীন অর্থ সন্দেহাত্মক। কষ্টার্ড সাহেব জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমুত্থান (Rise of Astronomy) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে বৎসর শব্দ সূর্য্য, চন্দ্র অথবা যে কোন গ্রহের পরিভ্রমণ কালের জন্য ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে উহা সূর্য্যের পরিভ্রমণ-কাল-জ্ঞাপক; কিন্তু পূর্ব্বে উহা ভিন্ন ভিন্ন কালের পরিমাণ বুঝাইত। নিউমার জীবন চরিতে প্লুটার্ক এবং প্লিনির ৪৮ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, মীসরীয় বৎসর বাস্তবিক এক এক মাস, আবার কোন স্থানে বৎসরের পরিমাণ চারি মাস। বৎসরে তিন ঋতুর ব্যবহারই বোধ হয় এই শেষোক্ত পরিমাণের নিদান, যেহেতু মীসরীয়, গ্রীক ও হিন্দুদিগের মধ্যে তিন ঋতুর ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দুগণ গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত এই তিন ঋতু ব্যবহার করিতেন এবং তৎ সঙ্গে ছয় ঋতুর ব্যবহারও ছিল। ইহা বলা যাইতে পারে যে, মীসরীয়দিগের ন্যায় হিন্দুগণ ছয় কি চারি মাসে বৎসর গণনা করিতেন বলিয়াই কাল সম্বন্ধে এত অত্যুক্তি দেখা যায়।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ইস্রাইলের সন্তানগণ বহুকাল মীসর দেশে রুদ্ধ ছিলেন এবং বৎসর গণনাতে মীসরীয়দিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এব্রাহাম প্রভৃতি পিতৃগণের অসম্ভাবিত দীর্ঘ জীবন এই প্রণালীতে গণনা করিলে বর্ত্তমান কালের জীবনের সহিত মিলিয়া যায়। মীসরীয়গণ যে বলেন ৪৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও চান্দ্রমানে গণনা করিলে বর্ত্তমান কালের ৪ হাজার বৎসর হয়।

যে সময়ে বৎসরের পরিমাণ অন্ততঃ বর্ত্তমান মানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল, সেই সময়ের ঘটনাবলীর কাল কথঞ্চিৎ পরিমাণে গণনা দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে; কিন্তু বৎসরের অর্থ না বুঝিয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার কাল সম্বন্ধে কিছু অনুমান করাও অসম্ভব।

ফরাশি দৌত্য বিভাগের এম্লি নুবেরি শ্যামদেশ হইতে কতিপয় জ্যোতিষিক সারণী নিয়া যান এবং খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্যাসিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া যাথার্থ্যের সহিত

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে Memoirs of the Academy of Sciences নামক পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। এই সারণী দ্বারাই কেবল হিন্দু জাতি নহে, হিন্দু জ্যোতিষও যে অতি প্রাচীন, এ বিষয়ে ইয়োরোপীয় অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি ও মন প্রথম আকৃষ্ট হয়। এই সারণী "শ্যামের সারণী" নামে খ্যাত। তদানীন্তন ভারতবাসী ফরাশি মিসনারিদিগের নিকট কৃষ্ণনগর ও নর্ষাপুরের সারণী নামক আরও দুই খণ্ড সারণী পাওয়া যায়। কিন্তু ফরাশি জ্যোতির্বিদ্ লিজেলটিল্ রবির সহিত শুক্রযুতি ( transit of venus ) পরিদর্শন করিতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি ফিরিয়া না গেলে উক্ত সারণী দ্বয়ের কোন সন্ধান লওয়া হয় না। তিনি ভারতবর্ষে থাকা সময়ে তীর্ব্বালুরের ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের নিকট গ্রহণ গণনা সম্বন্ধে এ দেশীয় প্রণালী শিক্ষা করেন। এই উপলক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণ জ্যোতির্ব্বিদ্গণ যে সারণী ও নিয়মাবলী প্রদান করেন, তাহা তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে Memoirs of the Academy of Sciences নামক পত্রিকাতে "তীর্ব্বালুরের সারণী" নামে প্রকাশিত করেন।

ফরাশি জ্যোতির্ব্বিদ্ এমবেইলি তাঁহার ( Trait de l' Astronomie Indienne ) ভারতীয় জ্যোতিষ নামক গ্রন্থের সম্পূর্ণ একখণ্ডে উক্ত চারি খানি সারণীর প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রফেসর প্লেফেয়ার সেই গ্রন্থের সম্পূর্ণ সমালোচনা করিয়া এডিনবরার রয়েল সোসাইটিতে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তাহা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হয়।

প্রফেসার প্লেফেয়ার ভূমিকাতে বলিয়াছেন,—"যদিও গ্রন্থকারের বিদ্যা ও ক্ষমতার প্রতি আমার সম্পূর্ণ ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, তথাপি বিষয়টি নূতন বলিয়া অনাস্তিকের ন্যায় আমি উহার সিদ্ধান্তগুলি বিশুদ্ধরূপে তোল করণোদ্দেশ্যে স্বয়ং গণনা করিয়া যুক্তি সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইহার ফলস্বরূপ গণনার বিশুদ্ধতা এবং যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিয়াছে"।

তীর্ব্বালুরের সারণীর সময় বি সি ৩১০২ সনের ১৭ই এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারি মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধ রাত্রি। সেই সময়ে সূর্য্য চলত্রাশি চক্রে প্রবিষ্ট এবং উহার স্ফুট ১০ রাশি ৬ অংশ। তদানীন্তন উৎকৃষ্ট সারণী ( ল্যাকাইল ও মেয়ারকৃত ) দ্বারা চন্দ্র ও সূর্য্যের বিশুদ্ধ স্ফুট স্থির করিয়া পশ্চাৎ গণনা দ্বারা দেখা গেল, তীর্ব্বালুরের সারণীর প্রদত্ত স্ফুটের সহিত ঠিক্ মিলে। এই তুলনা দ্বারা নিম্নোক্ত চারিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

১। ভারতীয় জ্যোতিষের ভিত্তিরূপ পরিদর্শন খৃষ্ট জন্মিবার ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বের কৃতকার্য্য এবং বিশিষ্টরূপে চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুট প্রকৃত পরিদর্শন দ্বারা নির্ণীত।

২। যদিও ব্রাহ্মণদিগের জ্যোতিষ মূলতঃ অতীব প্রাচীন, কিন্তু উহার অনেক নিয়ম এবং সারণী শেষের প্রস্তুত।

৩। যে চারি প্রকারের সারণী পরীক্ষ করা হইয়াছে, তাহার মূল স্পষ্টতঃ এক।

৪। এই সারণী প্রস্তুত করিতে জ্যামিতি, পাটীগণিত ও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষে সবিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

৩১০২ বি সিতে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের সম্মিলন যে, হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রকৃত পরিদর্শন দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনেকে আপত্তি উত্থাপন করেন। সেই সময়ে খেচরগণ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের ঠিক মিলন হইয়াছিল না। সুতরাং বেইলি সাহেবের যুক্তির বিরুদ্ধে এই বলা হয় যে, হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অপেক্ষাকৃত শেষে কেবল গণনা দ্বারা উক্ত ৩১০২ বি সিকে বিশিষ্ট সময়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই তর্ক সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থের ১ম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণ বুরমের সারণী পর্য্যালোচনা করিতে বেইলি সাহেব বলিয়াছেন যে, গ্রহ মধ্য হইতে স্ফুট নির্ণয় জন্য প্রদত্ত সংস্কার কম সূক্ষ্ম নহে এবং কক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদত্ত পরিবর্ত্তন সত্যের অতীব নিকটবর্ত্তী। তবে হিন্দুদিগের সংস্কার গণনার প্রণালী কি?

ক্যাসিনি পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত সমীকরণ—যাহা অধুনা কেন্দ্র সমীকরণ নামে খ্যাত—মধ্য মন্দ কেন্দ্র জ্যার সমানুপাতিক। কিন্তু শ্যামের সারণীতে উহা কেবল কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বিন্দুর জন্য গণিত, সুতরাং উক্ত নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অনুসৃত হইয়াছে কি না বলা যায় না। বেইলি সাহেব পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ বুরমের সারণীতে এই নিয়ম সর্ব্বত্রই প্রায় অনুসৃত। এই "প্রায়" হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ কেবল কেন্দ্র জ্যার নিয়মে সংস্কার গণনা করিতেন না।

উক্ত অসামঞ্জস্যের মিল করণোদ্দেশ্যে প্লেফেয়ার সাহেব এক নূতন সূত্রের উদ্ভাবন করেন। তিনি কক্ষার দ্বিগুণিত উৎক্ষেপ (doublo excentrivity) গ্রহণ করিয়া গণনা করেন এবং দেখেন যে, সারণী প্রদত্ত সংস্কারের সহিত বেস মিলে।

এই গ্রন্থের পর ভাগে দেখান যাইবে যে, প্লেফেয়ার সাহেবের উক্ত অনুমান ঠিক্ নহে। হিন্দুদিগের পরিবৃত্ত টলমীয় পরিবৃত্তের অনুরূপ। প্রথম পরিবৃত্তের পরিধি বিষম পাদের আরম্ভে ( in Apogee and Perigee ) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া সম পাদের প্রারম্ভে (at quadrants) সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। বুধ, শুক্র ও মঙ্গলের জন্য পরিধি পরিবর্ত্তনের এই নিয়ম, কিন্তু শনি ও বৃহস্পতির জন্য উহার বিপরীত, অর্থাৎ সমপাদের প্রারম্ভে পরিধি বৃহত্তম।

যে সকল সারণী সম্পর্কে এত ঔৎসুক্য পূর্ণ আলোচনা, তাহাদিগের মূল যাহাই হউক, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যে, খৃষ্টীয় শকের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে নভশ্চরদিগের

গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং সূক্ষ্মরূপে সময় গণনা করিতে সেই জ্ঞান ব্যবহার করিতে পারিতেন ও বাস্তবিক্ করিতেন, তাহা নিশ্চয়। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের পর্য্যবেক্ষণ এবং পুরুষপরম্পরাগত কাহিনীর উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ক্রান্তিপাতের গতি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহারা গণনা দ্বারা বার্ষিক অয়নাংশের পরিমাণ যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ।

যে সময়ে নভশ্চরগণ একত্র সমবেত ছিল, সে সময়ে সকলের গতি একস্থানে আরম্ভ হইয়াছে মনে করা যায় বলিয়া আমাদের ন্যায় হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণও ওরূপ কোন সময় অবলম্বন করিতে বাধ্য। ল্যাপ্ল্যাস যে বলেন কলিযুগের ( ৩১০২ বি সি ) অবতারণা কেবল রাশিচক্রে গ্রহ গতির একস্থানে আরম্ভের জন্য তাহা সত্য। সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহগণের যে যে সময়ে একত্র মিলন হইয়াছিল, হিন্দুমতে কলিযুগের আরম্ভ তাহার একতম।

হিন্দুগণ সৃষ্টি আরম্ভের এক সময় নির্দ্দেশ করেন, তখন একস্থানে গ্রহগণ মিলিত হয় এবং সেই স্থানেই সকলের গতির আরম্ভ। তাঁহারা সৃষ্টির পূর্ব্বেরও চিন্তা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার দিনকে কল্প বলিয়াছেন। এই কল্পও ব্রহ্মার জীবিতকালের এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। এক কল্পের পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ। ইহার সহস্র ভাগের এক ভাগ এক এক মহাযুগ। এক এক মহাযুগ আবার চারি ভাগে বিভক্ত যথা কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও কৃত বা সত্য যুগ।

কলিযুগ ( মহা যুগের দশমাংশ) ৪৩২০০০ বর্ষ
দ্বাপর যুগ ( কলির দ্বিগুণ)... ৮৬৪০০০ বর্ষ
ত্রেতা যুগ ( কলির ত্রিগুণ )...১২৯৬০০০ বর্ষ
কৃত যুগ ( কলির চতুর্গুণ )...১৭২৮০০০ বর্ষ
মহাযুগ ( উহার সমষ্টি )...৪৩২০০০০ বর্ষ।

হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতে ইহার প্রত্যেকের আরম্ভ সময়ে গ্রহগণ একস্থানে মিলিত থাকে। সুতরাং ইহার যে কোন সময় হইতে গ্রহ মধ্য গণনা করা যায়। এই উদ্দেশ্যে কলির ন্যায় অন্যান্য যুগেরও ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু কলির মান সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম বলিয়া সাধারণতঃ উহারই ব্যবহার। কলির আরম্ভ ৩১০২ বি সির ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারির মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধ রাত্রি। সুতরাং এই কলির আরম্ভ জ্যোতিষিক গণনা এবং সাবন সময় নির্দ্ধারণ জন্য সবিশেষ প্রয়োজনীয়। কল্প ও তদন্তর্গত যুগের পরিমাণ এত বৃহৎ যে, আপাততঃ উহা উপহাসাস্পদ বলিয়া বোধ হয়। এই প্রবন্ধের পরবর্ত্তি অংশে প্রদর্শিত হইবে যে, জ্যোতিষিক অনেক প্রশ্নের ভ্রম ক্ষুদ্রতম এবং বিশুদ্ধতা অত্যাধিক করণোদ্দেশ্যে উহা বাস্তবিক প্রয়োজনীয়। আমরা যে উদ্দেশ্যে ৮১৯ স্থানের দশমিকে গ্রহগণের উপকরণ সকল প্রকাশ করিয়া থাকি, দশমিক প্রবর্ত্ত-

নার পূর্ব্বে হিন্দুগণ ঠিক্ সেই উদ্দেশ্যে উক্ত বৃহদায়তনের কল্লাদির ব্যবহার করিতেন।

ব্রহ্মার উৎপত্তি হইতে কি নিকটতম কল্পের আরম্ভ হইতে গণনা করা উচিত, তৎ সম্বন্ধে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌দিগের মতভেদ। এ বিষয়ে সূর্য্য সিদ্ধান্ত বলেন, কৃত যুগের অন্ত হইতে ভূমি সাবন দিন ( Terrestrial Civil days. ) গণনা করিয়া গ্রহ মধ্য স্থির করাই সুবিধাকর। কারণ, পাত ও মন্দোচ্চ ভিন্ন গ্রহ মধ্য সকলই কৃত যুগের অন্তে মেষের প্রারম্ভে ছিল। সেই সময়ে চন্দ্রোচ্চ ৯ রাশি, চন্দ্রের উর্দ্ধপাত বা রাহু ৬ রাশি এবং অন্যান্য স্বল্পগতি মন্দোচ্চ ও পাত নিরংশ ছিল না, অর্থাৎ মেষের প্রারম্ভ হইতে কতিপয় অংশ দূরে ছিল।

অন্যান্য সিদ্ধান্তকারদিগের মতে সূত্রানুসারে গণিত যে কোন কালে যদি দৃক্ তুল্যতা লাভ হয়, তবে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদ্ ডাভিস্ বলেন যে, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌গণ কোন নির্দ্দিষ্ট শকাব্দার উপরে যান না। তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গ্রহ মধ্য স্থির করিয়া খণ্ডার সাহায্যে যে কোন সময়ের মধ্য গণনা করিয়া থাকেন।　　শ্রীরাজকুমার সেন এম এ।

# সাহিত্যপ্রসঙ্গ।

## বাঙ্গালা সাহিত্যে শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাস।

উপন্যাস এই শব্দ বাঙ্গলায় নূতন, উপন্যাস-সাহিত্যও নূতন। উপন্যাস শব্দকে এইহেতু নূতন বলিতেছি যে, উহা পুরাতন সংস্কৃতগ্রন্থপত্রে যে অর্থে ব্যবহৃত হইত, এইক্ষণ প্রায়শঃ সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। উহার পুরাতন অর্থ বাক্যের উপক্রম,—কথার আরম্ভ,—বিচার অথবা বিচারে সর্ব্বজনশান্তিজনক ব্যবস্থা,—বিশ্বাসের সহিত অন্যের নিকট আপনার কোন বস্তুর ন্যাস অথবা সংরক্ষণ, ইত্যাদি।

এতগুলি অর্থের মধ্যে প্রথম অর্থটিকে, ইংরেজীতে, কথার Preface—Introduction অথবা Suggestion বলা যাইতে পারে; আর শেষ অর্থ Pledge, Pawn অথবা Hostage প্রভৃতি শব্দে অনুবাদযোগ্য। হোরেস উইলসন ( H. H. Willson ) যখন তাঁহার বিখ্যাত অভিধান সঙ্কলন করেন, তখন পর্য্যন্ত এই সকল অর্থই প্রচলিত ছিল। কেন না, সংস্কৃত সাহিত্যে এই সকল অর্থ ছাড়া, উপন্যাসশব্দের আর কোন অর্থ বিদ্যমান থাকা দৃষ্ট হয় না। যথা অমরকোষে,——

"বিবাদোব্যবহারঃ স্যাদুপন্যাসস্তু বাঙ্‌মুখম্‌।"

বাঙ্‌মুখ শব্দের অর্থবিবৃতি উপলক্ষে, রঘুনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন, —"উপনিপূর্ব্বাদস্যতে র্ঘঞ্‌—বাঙ্মুখং বচনোপক্রমঃ" ।

অথবা, যথা শঙ্করাচার্য্যের রচনায়,—

"তস্মাদ্‌ব্রহ্মাজিজ্ঞাসোপন্যাসমুখেন"

অপিচ মনুসংহিতায়—

'বিশ্বজন্যামিমং পুণ্যমুপন্যাসং নিবোধত।"

মনুর টীকাকার উল্লিখিত উপন্যাস শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

বক্ষ্যমানং সর্ব্বজনহিতং বিচারং শৃণুত।"

সাহিত্যদর্পণের টীকাকার এবং আরও অনেকে উপন্যাস শব্দকে এই প্রকার অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু, উপন্যাস বলিলে বঙ্গদেশে এইক্ষণ বুঝায় কি? বুঝায় বিবিধ-রসের উদ্ভাবক,—বিচিত্র ঘটনাব্যঞ্জক, কল্পনা-মূলক, কথাত্মক কাব্য। তাই বলিতেছি যে, উপন্যাস শব্দ বাঙ্গালায় নূতন। উপন্যাসের সঙ্গে রমন্যাস ও নবন্যাস নামে আরও দুইটি শব্দ বাঙ্গালায় কতকটা প্রচলিত হইয়াছে; তাহারাও নূতন। ভাষা যখন, নবপ্রবাহিতা নদীর মত, তর-তর বেগে, ঢেউ খেলাইয়া, বহিয়া যায়, তখন উহাতে এই প্রকার নূতন শব্দের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

নূতন শব্দ যদি পুরাতন প্রসিদ্ধ অর্থের বিরুদ্ধ কিংবা বিঘাতক হয়, তাহা হইলে, তাহার প্রচলন সর্ব্বথা দূষ্য। যথা—'প্রত্যাদেশ' শব্দের পুরাতন অর্থ প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ, দূরীকরণ অথবা প্রার্থনার প্রতিকূল ভাবধারণ। * এই শব্দটিকে, কেহ কেহ, নব্যবাঙ্গালায়, দেব-বাণী অথবা দিব্যাদেশ অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা একান্তই অসঙ্গত, এবং শব্দবিজ্ঞানের রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু, যেখানে পুরাতন অর্থে কোন প্রকার বাধে না, তাদৃশ স্থলে, পুরাতন শব্দের নূতন একটি অতিরিক্ত অর্থে প্রচলন, অথবা প্রকৃতিপ্রত্যয়ের মৌলিক অর্থ-রক্ষা-সহকারে নূতন শব্দ সংকলন, সাহিত্যে অপরিহার্য্য। কেন না, এরূপ নূতন শব্দের সৃষ্টি বিনা ইংরেজী, ফরাশী ও ইতালিয়ান প্রভৃতি আধুনিক কোন ভাষাই এক পদ অগ্রসর হইতে পারে নাই; এবং বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত নূতন শব্দের আশ্রয় না লইলে, আমাদিগের এই শব্দ-সম্পদ-দুর্বিধা বাঙ্গালা ভাষাও অগ্রসর হইতে পারিবে না।

যাহা হউক, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, বাঙ্গালায় প্রতিনিয়তই দুই চারিটি করিয়া বিশেষ অর্থবোধক, অথচ অভাবপূরক, নূতন

* যথা কালিদাসের রচনায়,—

"প্রত্যাদেশং ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি।"

এখানে প্রত্যাদেশ শব্দের অর্থ প্রত্যাখ্যান। বাঙ্গালায়, প্রত্যাদেশ না বলিয়া, পরাদেশ বলিলে, কোন গোলযোগ ঘটে না। কেন না, পরা একটি অব্যয় শব্দ; এবং উহা প্রাধান্য, আভিমুখ্য ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—"পরা বাগনপায়িনী"—"পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" পর শব্দেরও এক অর্থ পরব্রহ্ম।

শব্দের উৎপত্তি হইতেছে; এবং সে সকল শব্দ, শব্দার্থ-বিচার-ক্ষম সাহিত্যিকদিগের মধ্যে, যার-পর-নাই আদরের সহিত চলিয়া যাইতেছে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় অন্যূন এক সহস্র শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। উপন্যাস, রমন্যাস ও নবন্যাসও সেই প্রকারের শব্দ; এবং উহাদিগের প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ অর্থের সম্পর্ক আছে বলিয়া, উহারা আদরযোগ্য

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরাণী ও আনন্দমঠকে কি বলিব? ইংরেজীতে ওয়াল্‌টার স্কটের আইভান্‌হো এবং ডুমার মণ্টিক্রুষ্ট প্রভৃতি যে সকল কথাত্মক কাব্যকে Romance বলে, উল্লিখিত গ্রন্থত্রয় নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে সম্মানের স্থান পাইবার যোগ্য। সুতরাং উহারা, উপন্যাস নামে অভিহিত না হইয়া, রমন্যাস নামে গৃহীত হইলেই ভাল হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল আখ্যায়িকায় চরিত্রের তত্ত্ববিশ্লেষ এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিবিধ চিত্র নাই, সেগুলি, রমন্যাস অথবা উপন্যাস নামে পরিচিত না হইয়া, নবন্যাস নামে পরিচিত হইলেই সঙ্গত হয়।

বাবু শ্রীশচন্দ্রমজুমদারের সমস্ত উপাখ্যানই উপন্যাস নামের যোগ্য; এবং উপন্যাস-কাব্যের মধ্যে উচ্চসম্মানার্হ। এইরূপ উপন্যাস সংস্কৃত-সাহিত্যে একখানিও নাই। না থাকা তেমন বিস্ময় অথবা লজ্জার কথাও নহে। কারণ, ঔপন্যাসিক-কাব্য সাহিত্য-সংসারে নূতন সৃষ্টি। শেক্ষপীর একখানি ভাল উপন্যাস পড়িবার সুযোগ পান নাই। গ্রীক ও লাটীন সাহিত্যেও আধুনিক ছাঁচের উপন্যাস নাই। সংস্কৃতে ত থাকিবার কথাই নহে। সুতরাং, সংস্কৃতসাহিত্য অন্যপ্রকারে সমুদ্রের মত বিশাল পদার্থ হইলেও, উহা ঔপন্যাসিক সাহিত্যে দরিদ্র। উহার "দশকুমার-চরিত" প্রভৃতি কথাকাব্য এইক্ষণ আর লোকের প্রীতি জন্মাইতে পারে না। ঐ শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে একমাত্র 'কাদম্বরী,' আপনার অতুল, অক্ষয় ও অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে, দূর-লক্ষ্য নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে, —চিরকালই এইরূপ শোভা পাইবে; এবং সৌন্দর্য্যের বাসন্তী কান্তি বিকিরণ করিয়া সাহিত্যিকের হৃদয়কে উন্মাদিত রাখিবে। কিন্তু 'কাদম্বরী' উপন্যাস নহে, উহা রমন্যাস। আর, পৃথিবীর আধুনিক সাহিত্য, যে শ্রেণীর কথাকে, সমাজচিত্রের বৈচিত্র্য ও গার্হস্থ্যচিত্রের প্রশান্ত-মাধুর্য্য প্রভৃতি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উপন্যাস-সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছে, শ্রীশচন্দ্রের সমস্ত কাব্যই তদনুসারে উপাদেয় উপন্যাস।

আমরা শ্রীশচন্দ্রের 'কৃতজ্ঞতা' 'বিশ্বনাথ' 'শক্তিকানন' ও 'ফুলজানি' এই চারিখানি গ্রন্থ পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়াছি; এবং পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, তিনি শব্দসম্পদে যেমন সমৃদ্ধ,—ভাব-সম্পদে যেমন বৈভবশালী, চরিত্রের বিশ্লেষ, বিকাশ এবং ঘটনার বৈচিত্র্য-চিত্রণেও, সেইরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন কবি। বস্তুতঃ, তাঁহার এই চারিখানি উপন্যাস বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিক্ আনন্দময় করিয়া

রাখিয়াছে; এবং সে নিরাবিল আনন্দ ভোগে সকলশ্রেণীস্থ পাঠকেরই বিশেষ উপকার হইতেছে।

শ্রীশ বাবুর 'কৃতজ্ঞতা,' বর্ণনার পরিণাম-রমণীয়তায়, তুলসীচন্দনের মত পবিত্র। উহার প্রথমাংশে পিশাচ ও পিশাচীর কথা থাকিলেও, সে কথা প্রবৃত্তিকে মন্দ দিকে আকর্ষণ করে না;—মন্দকে ভাল জ্ঞানে ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মায় না। কিন্তু, উহার উপসংহারে পঁহুছিলে হৃদয় আপনা হইতেই উৎকর্ষের একটুকু উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করে;—যে অতি মন্দ, সেও মুহূর্ত্তের তরে, ভাল'র নিকট মাথা নোয়াইতে ভালবাসে। সমৃদ্ধ-হিন্দু পরিবারের সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, স্বাধীনা, যুবতী, সুখসম্পদের সর্ব্বপ্রকার বিলাস-দোলায় দোলায়িত রহিয়াও, কিরূপে হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং সাংসারিক জীবনের বহিশ্চত্বরে, ঋষিতাপসের আরাধ্য নির্ম্মলতাকে তদ্গত প্রাণে পূজা করিতে পারে, শ্রীশচন্দ্র তাহা স্ফুটচিত্রে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন; এবং অঙ্কনৈপুণ্যে কবিত্ব ফলাইয়াছেন।

'বিশ্বনাথ' কিঞ্চিদংশে রমন্যাস-লক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু বিশ্বনাথ-চরিত্রের ঐতিহাসিকতা স্মরণ করিলে সে কথা মনে থাকে না। ইহার একধারে জাতী-যূথী-কুন্দ-কলিকা-পরিশোভিত গার্হস্থ্য উদ্যান, আর একধারে সর্প-শ্বাপদ-সঙ্কুল কণ্টক-বৃক্ষময় গহন-কানন। কিন্তু দুইয়ে বড় সুন্দর মিশিয়াছে।

'শক্তিকানন' অপেক্ষাকৃত নীরস ও নিষ্প্রভ। উহার ঘটনা-বিবৃতি, বর্ণনার অতিরিক্ত ভারে, একটুকু বেশী অলস-মন্থরা; কোন কোন স্থলে, সহিষ্ণুতা সম্পর্কেও দুর্ভরা। কিন্তু আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি যে, শ্রীশ বাবু যদি তাঁহার 'ফুলজানি' ভিন্ন আর একখানি উপন্যাসও রচনা না করিতেন, তথাপি তিনি ঔপন্যাসিক-সাহিত্যে অতি উচ্চ আসন অধিকার করিতেন।

শ্রীশচন্দ্রের 'ফুলজানি' বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব পদার্থ। ইহাকে অতি উৎকৃষ্ট দার্শনিককাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, সে কথা কোন অংশেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার আগা গোড়া সর্ব্বত্রই প্রগাঢ় চিন্তাশক্তি ও রস-ভাবকতার বিচিত্রমিশ্রণ পাঠকের হৃদয় ও মনকে আকর্ষণ করে; এবং নিত্যপরিলক্ষিত গার্হস্থ্যজীবনেও, কত প্রকার সামাজিক শক্তি, মানবজীবনের উপযুক্ত বিকাশ অথবা আশানুরূপ পূর্ণতা লাভের পথে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে কার্য্য করিয়া, এ সংসারে সুখ-দুঃখাবহ বিচিত্র ঘটনায় পরিণত হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়া বিস্ময় জন্মায়।

'ফুলজানির' আর একটুকু বিশেষ মহিমা আছে। চরিত্রের বিশ্লেষ এক কথা, চারিত্র-সৌন্দর্য্যের ক্রম-বিকাশ-চিত্র-প্রদর্শন আর এক কথা। একটি সিরাজি গোলাপ অথবা সান্ধ্য যূথিকা, যখন আপনার রূপের সোহাগে মৃদু মৃদু হাসিয়া, চন্দ্রের বাসন্তী জ্যোৎস্নায় স্নাতবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন সকলেই সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হয়; কেহ

কেহ সে স্থির-সৌন্দর্য্য বর্ণতুলিতে আঁকিয়া তুলিতেও সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মধুর-হসিত গোলাপ, মৃদু-স্নিগ্ধ যূথিকা, কি প্রকারে, কণ্টক-সঙ্কুল গ্রামীণ-উদ্যানে, প্রখর রৌদ্র, প্রবল বায়ু, পশুপক্ষীর অত্যাচার, এবং আরও পাঁচ প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, ধীরে ধীরে, অতি ধীরে,—লোকলোচনের অগোচরে, আপনার বৃন্তলগ্ন বিন্দুপ্রতিম তনুখানিতে প্রথম হইতে প্রবর্দ্ধিত হইয়া—ধীরে ধীরে পাপ্‌ড়ি মেলিয়া, পরিশেষে পূর্ণাঙ্গ-সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হয়, তাহার ক্রম-পরিবর্ত্ত-পট-চিত্রণ বড়ই কঠিন কার্য্য;—কবি, দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক সকলের পক্ষেই কঠিন। সৌভাগ্যবান্ শ্রীশচন্দ্র, জ্ঞাতসারে, অথবা আপনার স্বভাব-সিদ্ধ সূক্ষ্মদৃষ্টির অজ্ঞাতসারে, 'ফুলজানি'র কাব্যবিকাশে, তাদৃশ দুষ্কর-চিত্রণ ও চিত্র-প্রদর্শনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; এবং আমরা হৃদয়ের সহিত বলিতে পারি, তিনি এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্যেও বহুপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহা অসামান্য প্রশংসা, এবং ইহার প্রমাণ ফুলকুমারী ও পুরন্দরের চরিত্রবিকাশ।

ফুলকুমারী যখন পাঠকের চক্ষে প্রথম আতিথ্য লাভ করে, তখন উহাকে একটুকু বেশী লজ্জাশীলা, অথচ একটুকু অসামান্য দয়াস্নেহময় গ্রাম্যবালিকা ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু সেই ফুল যখন, রমণীচরিত্রের পরিপূর্ণসৌন্দর্য্যে প্রস্ফুট হইয়া, বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানীতে, বিলাস-লালসা-মত্ত বঙ্গাধিরাজের বিলাস-নিকেতনে, সংসারের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করে, তখন হৃদয় আপনা হইতেই বলিয়া উঠে,—"মা তুমি সতী-লক্ষ্মীর আদর্শ প্রতিমা,—সাবিত্রীর তেজস্বিতা-বিহীন হইলেও তাহারই আর এক প্রকার প্রতিকৃতি,—ভূতলে দেবতা। তুমি পরকাল ও পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া তোমার ইহকালের সকল সুখ বিসর্জ্জন করিলে,—বীর-ললনা না হইয়াও বীর-পত্নির উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বিস্ময় জন্মাইলে, তোমায় পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।"

গ্রন্থের নায়িকা ফুলকুমারী, নায়ক পুরন্দর বসু। গ্রন্থকার নায়িকার সলজ্জমধুর, লজ্জাজড়সড় চরিত্রটুকু যেপ্রকার তুলিপাতের শিল্পনৈপুণ্যে ধীরে ধীরে ফুটাইয়াছেন, গ্রামের দুর্দ্দান্ত বালক পুরন্দরকেও, সেইরূপ ধীরে ধীরে, দেব-চরিত্র অথবা দেব-বীরত্বের উচ্চতর গ্রামে পঁহুচাইয়াছেন। হরিশপুর গ্রামের দুরন্ত ও দুর্দ্দান্ত বালক পুরন্দর, কএকটি বৎসরের মধ্যে, কেমন করিয়া একটা দেব-বীরের মত দণ্ডায়মান হইয়া, রাজ্যাধিপতির নিকটও আপনার তেজঃসমুজ্জ্বল, মহামহিমময় গম্ভীর চরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে, গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। ফুলকুমারীর প্রাণ-সখী কালীর চরিত্রে এবং আরও অনেকের চরিত্রে গ্রন্থকার এইরূপ তুলিনৈপুণের ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই বর্ণতুলি অথবা লেখনীকে আমরা পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ দেই।

গ্রন্থের ভাষা নিদাঘ-সান্ধ্য সুশীতল সমীরের ন্যায় সুখ-শীতল। পড়িতে আরম্ভ করিলে, আরও পড়িতে ইচ্ছা করে, এবং গ্রন্থকারের বর্ণনানৈপুণ্যেও হৃদয় স্থানে স্থানে প্রীতিতে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা বড়ই দুঃখের কথা যে, ভাষা, এইরূপ সুন্দর ও সুললিত হইয়াও, রচনার দ্রুতচারিতা অথবা" মুদ্রাকরের অসাবধানতা হেতু, সকল স্থলে আশার অনুরূপ শুদ্ধ নহে। আমরা নিম্নে ইহার কএকটি নিদর্শন দিব।

(১) পরিষ্কৃত ও পরিমার্জ্জিত অর্থে "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।" যথা, "বেশের মধ্যে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন তাঁর সুমার্জ্জিত পৈতা গাছটি।" পৈতার বিশেষণে পরিচ্ছন্ন শব্দের এইরূপ প্রয়োগ উপযুক্ত হয় কি? ইদানীং অনেকেই "ঘরটি বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন," এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিষ্কাররূপে বস্ত্রে আচ্ছাদিত, অর্থাৎ Neatly clothed. এমন অবস্থায়, আমাদিগের বিবেচনায়, শুধু মানুষই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। বাড়ী ঘর, পৈতা, জুতা প্রভৃতি পদার্থ কখনও "পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন" এই বিশেষণের বিষয়ীভূত হইতে পারে কি না, তাহা শ্রীশবাবু বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনেকের উপকার হইবে।

(২) পুরুষের বিশেষণে সমবয়সী প্রভৃতি স্ত্রীত্ববোধক পদের প্রয়োগ, যথা,—"রামা, শঙ্করা, ভুজো কুমুদের সমবয়সীর দল।" প্রথম কথা, স্ত্রীলোকের বিশেষণেও 'সমবয়সী' শব্দের ব্যবহার হইতে পারে না। সেখানেও সমবয়স্কা শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক। যদি বাঙ্গালায় একান্তই 'সমবয়সী' নামে একটি শব্দ সৃষ্টি করিয়া লওয়া অপরিহার্য্য হয়, তাহা হইলেও, সে শব্দ পুরুষের বিশেষণে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

(৩) সশঙ্ক অর্থে 'সশঙ্কিত'। যথা,— 'সর্দ্দার পোড়োরা পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।"

(৪) অনাথা অর্থে 'অনাথিনী', নিরপরাধা অর্থে 'নিরপরাধিনী,' নির্দ্দোষ অর্থে 'নির্দ্দোষী', নির্ধন অর্থে 'নির্ধনী'। যথা,— "চাষ মাত্র অনাথিনী বিধবার জীবনোপায়।"

(৫) শক্তি অর্থে 'সাধ্য'। যথা,—"মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।" এ স্থলে, "মনুষ্যের সাধ্য নহে, এইরূপ বলিলেই" মনোগত অর্থ প্রকাশিত হয়। এমন অবস্থায়, সাধ্য শব্দের সঙ্গে আবার আয়ত্ত শব্দের যোগ করিয়া অকারণ অর্থপ্রতীতির ব্যাঘাত ঘটাই কেন? সাধ্য শব্দ কোন স্থলেও শক্তি কিংবা সামর্থ্য বুঝায় না; সকল স্থলেই 'সাধন-যোগ্য' বুঝায়। যথা, "সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু।" মহাজন-কবিরাও সাধ্য শব্দকে এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—"সাধ্য ও সাধনে মোরে শিক্ষা দেও প্রভু।"

(৬) বাঙ্গালা পিয়াসী অর্থে সংস্কৃত 'প্রয়াসী', যথা,—"তালরাজি শিরস্থ ছায়া-প্রয়াসী পক্ষিগণের বিষম ভীতির কারণ হইতেছিল।" সংস্কৃত 'পিপাসু' শব্দ, বাঙ্গালায় 'পিয়াসু' ও 'পিয়াসী' এই দুইটি মুখ-শ্রুত

শব্দে পরিণত হইয়াছে। যাঁর ইচ্ছা হয়, তিনি 'পিপাসু' শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন; যাঁর ইচ্ছা না হয়, তিনি 'পিয়াসু' কিংবা 'পিয়াসী' শব্দের প্রয়োগ করিয়া ভাষার শ্রুতিমাধুর্য্য বাড়াইতে পারেন। কিন্তু, পিপাসু অর্থে 'প্রয়াসী' শব্দের ব্যবহার হইবে কি প্রকারে?

(৭) যদি অর্থে 'যদিস্যাৎ,' অথবা 'যদ্যপিস্যাৎ। যথা,—"তাঁর যদিস্যাৎ অমত না হয়।" 'যদি স্যাৎ' একটি সংস্কৃত বাক্যাবয়ব। উহার অর্থ 'যদি হয়'। যথা,—"পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যাৎ।" সুতরাং বাঙ্গালায় যদি অর্থে 'যদিস্যাৎ' সর্ব্বতোভাবে দূষ্য ও পরিত্যাজ্য।

(৮) কিঞ্চিৎ অর্থে 'কথঞ্চিৎ'। যথা,—"দুষ্ট মেয়েটিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সভ্য ভব্য হইতে হইয়াছে।" 'কিঞ্চিৎ' ও 'কথঞ্চিৎ' এই উভয় শব্দই সংস্কৃত। কিঞ্চিৎ অর্থ কিছু,—কথঞ্চিৎ অর্থ 'কোন প্রকারে'। কথঞ্চিৎ শব্দের উল্লিখিতরূপ অনুচিত প্রয়োগ কোন অংশেও বাঞ্ছনীয় নহে।

(৯) ব্যবস্থাতা অর্থে 'নির্ম্মাতা'। যথা,—"যিনি অনন্ত করুণাময় বিশ্ববিধাতা, তিনি স্রষ্টামাত্র—এ পক্ষপাতের নির্ম্মাতা নহেন।" নির্ম্মাতা শব্দে ব্যাকরণে কোন দোষ নাই! কিন্তু ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, এ স্থলে, উহার প্রয়োগ হয় কি না, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

(১০) প্রভুত্ব প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বর্ণনায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার। যথা,—"তাহাদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।" এখানে সর্ব্বতোমুখ বলিলে আর কোন কথা থাকে না। অত্যাচারের বিশেষণে 'নারকী' শব্দের প্রয়োগও উল্লিখিতরূপ ভুল। যথা,—"তাঁহার ভেট, সওগাদ সংগ্রহের জন্য তাহারা যে হীন উপায় সকলের আশ্রয় লইত,—যে নারকী অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিত, আজিও তাহার বিভীষিকা মানস পটে ফুটিয়া উঠে।" এখানে 'নারকী' শব্দে কি বুঝিব? নারকী শব্দের এক অর্থ নরকনিবাসী পুরুষ। সে অর্থ এখানে খাটে না। "তত্র ভব" এই অর্থে অণ্ প্রত্যয় করিয়া আর একটা নারকী শব্দ ব্যুৎপাদিত হয়। সে নারকী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তাহার অর্থ নরকসম্বন্ধীয়া,—Hellish,—relating to Hell; সুতরাং সে নারকী পুংলিঙ্গ অত্যাচার শব্দের বিশেষণ হইতে পারে না। আমাদিগের বিবেচনায়, এখানে, নারকীয় বলিলেই আর কোন আপত্তি থাকে না।

(১১) তুচ্ছার্থে 'তাচ্ছিল্য'। যথা,—"অনেকেরই মধুর অধরে ঈর্ষ্যায় তাচ্ছিল্যের কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল।" বাঙ্গালায় "তুচ্ছ তাচ্ছীল্য" এইরূপ মিলিত পদের প্রয়োগ আছে। সে প্রয়োগও সম্যক্ সঙ্গত নহে। কিন্তু তুচ্ছ শব্দের সঙ্গশূন্য অবস্থায় শুধু তাচ্ছীল্য বলিলে অবজ্ঞার্থ প্রতিপাদিত হয় কি না, ইহা চিন্তনীয়।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার কথা লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে, কেহ হয় ত, এইরূপ বলিয়া উঠিবেন যে, বাঙ্গালা

রচনায়, বাঙ্গালার প্রতিই দৃষ্টি রাখিব, বাঙ্গালা (Idiom) বাগ্‌ নিয়ম মানিয়া চলিব; সংস্কৃতের আবার সংবাদ লইতে যাইব কেন? এ কথা কিয়দংশে আমাদিগেরও কথা বটে। আমরা বাঙ্গালায় খাটি বাঙ্গালার একান্ত পক্ষপাতী। যথা, শ্রীশ বাবুর রচনায়,—

"সে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।" "ঝড় থামিয়া যায়, আগুন নিবিয়া যায়; তা গুরু মহাশয়ের রাগ কত ক্ষণ।" "দুজনে বাঁধা ঘাটের দিকে চলিল,—কালী আগে, ফুল পাছে।" "ফুল জীব কাটিয়া বলিল, ছি সই, ন্যাংট হইয়া সাঁতার দিবি, কেউ যদি দেখে।" "কালী নির্ব্বিকার ভাবে বলিল, হাঁ কেউ দেখ্‌তে পেলে ত? এখনি এলুম কাপড় ছেড়ে, আবার তোর কথা শুনে কাপড় ভিজুই আর কি? কে আস্‌বে এখানে? সব তাতেই তোর ভয়!"

উল্লিখিত বাক্যগুলি, খাটি বাঙ্গালার ছোট ছোট শ্রুতিমধুর শব্দের গাঁথনিতে, কিরূপ সুন্দর হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠককে বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। অধর যেমন সংস্কৃতে মধুর, ঠোঁটও তেমনই বাঙ্গালায় মধুর। বাঙ্গালি বালিকার মুখে বিবস্ত্রা কিংবা বিবসনা প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে ন্যাংট শব্দই সুন্দর সাজে। "বাতাসে কেহ নাচিয়া উঠে, কেহ মুদিয়া যায়।" এইরূপ বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠে, শিশির-স্নাত যুই ফুলের মালার মত, কিরূপ বিচিত্র সৌন্দর্য্য ফলায়, তাহা শব্দ-সুধা-প্রিয় সুরসিক সাহিত্যিককে বলিয়া দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। শ্রীশ বাবুর রচনায় এইরূপ হৃদয়হারি শব্দের গাঁথনি সর্ব্বত্রই পাঠকের চক্ষে পড়িবে, এবং তাঁহার ভাব ও ভাষা উভয়েরই প্রতি পাঠক মাত্রের অনুরাগ জন্মিবে। কিন্তু ঐ যে উপরে আছে "কালী নির্ব্বিকার ভাবে বলিল," এখানে ঐ নির্ব্বিকার শব্দটি আমাদের কাছে ভাল লাগিতেছে না। নির্ব্বিকার শব্দটি খাটি বাঙ্গালা নহে, উহা অবিকল সংস্কৃত। সংস্কৃতে "নির্ব্বিকার ভাবে" শব্দ দুটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এখানে নির্ব্বিকার না বলিয়া, নির্ভয়ে কিংবা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিলেই সুন্দর হয়। কেন না, পুরাতন ও প্রসিদ্ধ কবিরা বিকার শব্দকে যে অর্থে চিরকাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, সে অর্থ সহজে মনুষ্যের চিত্ত হইতে দূর হইতে পারে না। যথা কালিদাসের রচনায়,—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।"

নির্ব্বিকার শব্দের উপরিদর্শিত প্রয়োগে আমাদিগের এখানে যে প্রকারের আপত্তি, 'নির্দ্দোষী,' 'সমানবয়সী,' 'নিরপরাধিনী' ও 'কথঞ্চিৎ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে, তাহা হইতেও গুরুতর কারণে, গুরুতর আপত্তি।

কিন্তু রচনার অসাবধানতাজনিত অথবা উপেক্ষাসম্ভূত এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল এক দিকে, আর বর্ণনার মাধুরী ও চিত্রনৈপুণ্যের কবিসমুচিত চারুমহিমা আর এক দিকে। আমরা ফুলজানির পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ও পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, কত স্থলেই যে প্রীতি, শ্রদ্ধা

ও প্রশংসাদিসূচক শব্দ চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বস্তুতঃ, আমরা বাঙ্গালা উপন্যাসসাহিত্যে এমন পুস্তক শীঘ্র পড়ি নাই; এবং যে ভাষা এইরূপ উপন্যাসকাব্যে অলঙ্কৃত হয়, তাহা যে কালে বিদেশীয় সাহিত্যিকদিগেরও হৃদয় আকর্ষণ করিবে, সে বিষয় আমাদিগের সংশয় নাই।

তবে, এই এক বিশেষ কথা, যাঁহারা শ্রীশ বাবুর মত স্বাভাবিক-শক্তিসম্পন্ন সুদক্ষ লেখক, তাঁহাদিগের পক্ষে, প্রকৃত (Patriotic feeling) পৈত্রাভিমান অথবা পৈত্রবৎসলতার সহিত এ ভাষার তদ্গত উপাসনাই ধর্ম্মসঙ্গত। ইংরেজ লেখকেরা ইংরেজী ভাষাকে যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তির সহিত উপাসনা করেন, এবং ইংরেজী ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষাকে জাতীয়সম্মানরক্ষার মত কার্য্যজ্ঞানে, যে ভাবে উহার অনুশীলন করিয়া থাকেন, নব্যবঙ্গের শ্রীশপ্রমুখ উচ্চশিক্ষিত উচ্চক্ষমতান্বিত সাহিত্যসেবীরা বাঙ্গালা ভাষার সেইরূপ উপাসনা করিলে, বাঙ্গালার শুদ্ধিরক্ষা ও সম্পদ্-বিস্তারকে সেইরূপ জাতীয় গৌরবাত্মক কার্য্য মনে করিয়া, শব্দগ্রন্থন ও মুদ্রণাদি সমস্ত বিষয়ে সাবধান হইলে, এ দেশের সাহিত্যিকসম্মান শত হস্ত উপরে উঠিবে; এবং বিদেশী পণ্ডিতেরাও বাঙ্গালা ভাষাকে একটা বস্তু জ্ঞানে সম্মান করিতে শিখিবে।

শ্রীশ বাবুর উপন্যাসনিচয় সম্বন্ধে উপসংহার-স্থলে আমাদিগের আর একটি কথা বলিবার আছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত বঙ্গমহিলার সাধারণতঃ কোন সম্পর্ক ছিল না। ইদানীং, বঙ্গমহিলাই বাঙ্গালা গ্রন্থপত্রের উৎসুক পাঠক, এবং উপন্যাস-সাহিত্যই তাঁহাদিগের মনোমোদক। কিন্তু বঙ্গীয় পুর-সুন্দরীরা যে জাতীয় উপন্যাস লইয়া সময় যাপন করেন, তাহার অধিকাংশই অতি কদর্য্য,—কোন কোন পুস্তক ভদ্রমহিলার অস্পৃশ্য। যে সকল উপন্যাস, রচনার চমৎকারিত্ব অথবা অন্যান্য গুণে আদরযোগ্য, তাহারও প্রধান এক ভাগ কুল-যুবতীর অপাঠ্য। এ অংশে, শ্রীশ বাবুর উপন্যাসনিচয়, রমণীমোহন-রমণীয়তায় অতিমাত্র সুন্দর হইয়াও, সুরুচির পথ-প্রদর্শক; এবং আদ্যোপান্ত সকল স্থলে রসপূর্ণতায় মধুর হইয়াও, সুপেয় স্বাদুদুগ্ধের ন্যায় উপকারক। তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

> "গো-রস্ গলি গলি ফিরি,
> সুরা বৈঠ্ বিকায়।"

অর্থাৎ, সুখ-সেব্য গব্য দুগ্ধ লইয়া ফিরিওয়ালারা গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চীৎকার করিয়া বেড়ায়; সুরা, আপনার ঘরে বসিয়াই, পিপাসুকে আকর্ষণ করে। শ্রীশ বাবুর লেখা সত্যই এই উভয়-লক্ষণাক্রান্ত। উহা সুরা অথবা মদিরার ন্যায় চিত্তরোচক, অথচ গোরসের ন্যায় পবিত্র, প্রীতিকর ও পুষ্টিবর্দ্ধক। উপন্যাস-রচনায় ইহার উপর আর অধিক কি সৌভাগ্য হইতে পারে? বঙ্গীয় কুলকামিনীরা এই উপন্যাস গুলির সমস্ত কথা কণ্ঠস্থ করিতে পারিলে, তাঁহাদিগের অশেষ সুশিক্ষা হইবে; দেশেরও বিশেষ উপকার দর্শিবে।

# ( মা উমার রূপের বিকাশ ।)

## কালিদাস ও কবিগুণাকরের চিত্রতুলনা

দশ দিক্ নির্ম্মল, সুনির্ম্মল নীল-আকাশে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি হইতেছে,—শঙ্খনিঃস্বনের সঙ্গে সঙ্গে, আকাশ হইতে পুষ্পরাশি যেন আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে,—পার্ব্বত্য সমীর, সে পুষ্পসৌরভে সুরভিত ও সুশীতল হইয়া, ধীরে বহিতেছে, এবং কিবা বনের তরুলতা ও বন-বিহঙ্গনিচয়, কিবা বনভূমির সন্নিহিত বিবিধ রম্য-নিকেতনে যক্ষ-গন্ধর্ব্ব মানব, সকলেই শরীরে ও মনে কেমন এক অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছে, এইরূপ সুসময়ে,—সর্ব্বসুখাবহ শুভক্ষণে, মা উমা গিরিরাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন; এবং আপনার অচিন্তনীয় ও অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যের ছটায় মাতা পিতা ও সুহৃৎ স্বজন—সকলকেই চমৎকৃত করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিলেন।

যে, এ জগতে, জীবরূপে জন্ম গ্রহণ করে, সেই, প্রকৃতির অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে, দিনে দিনে ও ধীরে ধীরে, পরিবর্দ্ধিত হয়। মা উমা, স্বয়ং সে প্রকৃতির প্রাণরূপিণী জগন্ময়ী শক্তি হইয়াও, আজি জগজ্জনের মঙ্গলার্থ জীব-ধর্ম্মাবলম্বিনী; সুতরাং তিনিও সংসারের প্রতিষ্ঠিত প্রথা-অনুসারে, দিনে দিনে ও ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন; ফুলের মত ধীরে ধীরে ফুটিলেন। কালিদাস মা উমার এইরূপ দিন-দিন ক্রমবৃদ্ধি ও রূপরাশির ক্রমবিকাশ চারিটি পংক্তিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পংক্তি-চতুষ্টয়ময়ী মধুরাক্ষরা কবিতাটি অনুপ্রাণনায় কিরূপ মহামুহূর্ত্তে তাঁহার কণ্ঠে স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। ঈদৃক্ কবিতা শ্রুতিমাত্র যাহার হৃদয়-ফলকে লিখিত হইয়া না রহে, কাব্যরসের সহিত তাহার স্বাভাবিক কোন সম্পর্ক আছে, এমন অনুমান করিবার কারণ নাই। বাল্মীকি অথবা শেক্ষপীরও, রূপের ক্রমবিকাশ-বর্ণনায়, একটি মাত্র কবিতায়, এইরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, এমন আমাদিগের স্মরণে আইসে না। কবিতাটি এই,—

"দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা<br>
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।<br>
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্<br>
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি।"

অর্থাৎ,—

নবোদিত চন্দ্রমার রেখাটি যেমতি,<br>
জ্যোৎস্নাময় অঙ্গচয়ে, দিনে দিনে বাড়ে।<br>
বাড়িলা লাবণ্যময়ী বালিকা তেমতি,<br>
আপনার অঙ্গপুষ্ট-লাবণ্যসঞ্চারে!

বাঙ্গালা পদ্যে কালিদাসের অনুবাদ হইতে পারে না। অন্ততঃ আমাদিগের দ্বারা তাহার কিছুই সম্ভবে না। তাই কবিতাটির অর্থ একটুকু পরিস্ফুট করিয়া বুঝাইতে

ইচ্ছা হইতেছে। কবি কহিতেছেন,—আকাশের এক প্রান্তে শুক্লপক্ষের চন্দ্র প্রথমতঃ একটি সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় দেখা দেয়। কিন্তু ঐ যে সূক্ষ্ম রেখা, উহার মধ্যে ষোল কলা চন্দ্রের সম্পূর্ণ জ্যোৎস্নারাশি ঢাকা থাকে। এক একটি দিন যায়, আর এক একটি কলা আবর্ত্তিত হয়; এবং সে জ্যোৎস্নাময়ী সূক্ষ্মরেখা, জ্যোৎস্না-ঢাকা অঙ্গনিচয়ের বিকাশে, একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পায়। মা উমার বাল্যতনুতেও রূপের তেমনই ক্রমবিকাশ হইল। তাঁহার সে সুকুমার তনু, প্রতি অঙ্গে—প্রত্যেক প্রত্যঙ্গে, লাবণ্যে আচ্ছাদিত। উহার বাহিরে লাবণ্য,—অন্তরে লাবণ্য,—উহা সর্ব্বতোভাবে লাবণ্যময়। একটি একটি করিয়া দিন যাইতে লাগিল, আর সে লাবণ্যময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গনিচয়ের একটি করিয়া কলা বাড়িল—যেন একটি করিয়া পাপড়ি মেলিল। মা ক্রমে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরিপূর্ণ লাবণ্যজ্যোৎস্নায় প্রস্ফুটিত হইতে লাগিলেন। বর্ণনা কি সুন্দর! কি হৃদয়হারি! যিনি বাল্য-সৌন্দর্য্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেন না তাঁহাকে কবিকুল-শিরোমণি বলিয়া সর্ব্বদা হৃদয়ে পূজা করিবে? কেনই বা ভারতবাসী তাঁহার নামোচ্চারণের সময় অভিমানে না স্ফীত হইবে?

বঙ্গের কবিগুণাকর, মায়ের বাল্যরূপ এবং বাল্যের পরবর্ত্তি বয়স ও চিত্তবিকাশের বর্ণনা করিতে, অগ্রসর হন নাই। তাঁহার উমা, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের সমৃদ্ধ-হিন্দু-পরিবারের সেকেলে কচি মেয়েটি। সাত আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, মা সমানবয়স্কা বালিকাদিগকে লইয়া, বাড়ীর বহিরঙ্গণে, পুতুলের বিবাহ প্রভৃতি ক্রীড়ারঙ্গে,—ধূলিখেলার আমোদ-প্রসঙ্গে, দিনপাত করিয়াছেন; এবং ঐ বয়সেই, অতিবৃদ্ধ অথবা বার্দ্ধক্যের চরম-দশাপ্রাপ্ত কুলীন বরের নিকট, শ্রোত্রীয়-কন্যার মত, গৌরীদানে সম্প্রদত্তা হইয়া, বরের গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। মা সেখানে যাইয়া, একই দিনে বাল্যভাব পরিত্যাগ করিয়া,—হর-গৌরী-মূর্ত্তি-বিলাসের অভিলাষে, অলৌকিক মায়াপ্রকাশে, মুহূর্ত্তের মধ্যে মোহিনী সাজিয়া মহাদেবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইয়াছেন, সে এক পৃথক্ কথা। কিন্তু তিনি হিমাদ্রিভবনে, বিবাহ পর্য্যন্ত, একটি সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত অশিক্ষিত বালিকা ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

কালিদাসের উমা সর্ব্বাংশেই আর এক পদার্থ। তিনি দময়ন্তী, ইন্দুমতী ও সাবিত্রী প্রভৃতি পৌরাণিক-কাব্যবর্ণিত রাজকন্যাদিগের মত, পিতৃগৃহে ধীরে ধীরে বাড়িয়াছেন,—পিতৃনির্দ্দিষ্ট শিক্ষকের নিকট নিয়মিত প্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, রূপ ও গুণের বিবিধ সম্পদে, ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়াছেন; এবং পূর্ণযৌবনের প্রফুল্লবয়সে, আপনার চিত্তবৃত্তির অপ্রতিম-বিকাশে, দেব-মানবের বিস্ময় ও ভক্তি জন্মাইয়া,—দেব-জগৎ ও মানব-জগৎ উভয়কেই প্রেম-তপস্যার চরমচিত্র ও পরমসৌন্দর্য্য প্রদর্শনের

দ্বারা, বিস্ময় ও ভক্তিতে একবারে অভিভূত করিয়া, আপনার প্রার্থিত-দুর্ল্লভ পরাৎপর-পুরুষের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন।

উল্লিখিত দ্বিবিধ চিত্রের মধ্যে কোন্‌টি পুরাণশাস্ত্র-সম্মত, তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না, এবং এখানে সে কথার বিচারও হইতেছে না। তবে, ইহা নিঃসংশয় বলা যাইতে পারে যে, কালিদাসের উমাই মহাকাব্যের উপযুক্ত উপাদান। কবিগুণাকরের উমাচিত্রে দেখিবারও কিছু নাই, শিখিবারও কিছু নাই! কালিদাস তাঁহার উমাচিত্রে রমণী-জন-স্পৃহণীয় রূপ-বৈভবের, এবং উচ্চাভিলাষ ও অধ্যবসায়-ধীরতা প্রভৃতি ভাব-সম্পদের যে সকল অলৌকিক পট প্রদর্শন করিয়াছেন, মানবজাতি তাহা বহুশতাব্দীকাল নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে,—দেখিয়া ধন্য ধন্য করিয়াছে; এবং যাহারা নিবিষ্টচিত্তে দেখিয়াছে, তাহারা ঐহিক ও পারমার্থিক প্রেমের চরমোৎকর্ষ দর্শনে, প্রীতিতে কণ্টকিত হইয়া, হৃদয়ারাধ্য আদর্শচরিত্রের উচ্চতর গ্রামে উঠিয়াছে।

এখানে আপাততঃ কালিদাস-বর্ণিত উমারই কথা কহিব। মা, বাল্যকালে, কিছু দিন, হিমাদ্রিপ্রস্থ-প্রবাহিণী, কুলু-কুলু-নাদিনী মন্দাকিনীর সৈকতময় তটে, স্মিতমুখী সহচরীবর্গে পরিবেষ্টিত রহিয়া, কবিগুণাকরবর্ণিত উমার মত, ক্রীড়ারসের স্বাদ-সুখে ডুবিয়া রহিলেন; এবং বালুকার বেদী নির্ম্মাণ ও কৃত্রিম পুত্রকন্যার কৌতুক-বিধানের দ্বারা নানারূপ লীলা খেলায় দিন কাটাইলেন। তদীয় বাল্যক্রীড়াপ্রসঙ্গে কালিদাস কন্দুক-ক্রীড়ারও উল্লেখ করিয়াছেন।

কন্দুক অর্থাৎ মৃণ্ময় কিংবা অন্য কোনরূপ বস্তুবিরচিত 'ব্বল' লইয়া খেলা পুরাতন ভারতের একটা প্রসিদ্ধ আমোদ ছিল। এ আমোদ যেমন চিত্তপ্রীণক, তেমনই শরীর-পোষক ও শক্তিবর্দ্ধক। এই হেতু, বালকেরা যেমন 'ব্বল' লইয়া খেলিত, বালিকারাও হাতের ব্বল ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া, এবং এক জনের নিক্ষিপ্ত 'ব্বল' আর এক জনে হাতে ধরিয়া, আনন্দ করিত। দণ্ডি-প্রণীত দশকুমারচরিতে এইরূপ কন্দুক-ক্রীড়ার বিশেষ বর্ণনা আছে। দশকুমার-কাব্য-বর্ণিত একটি বালিকা এক সঙ্গে বহু কন্দুক লইয়া খেলা করিতে পারিত বলিয়া কন্দুকাবতী নামে অভিহিত হইয়াছিল। কবিগুণাকরের সময় বঙ্গীয় বালিকারা কন্দুক-ক্রীড়ার নামও কানে শুনে নাই। কালিদাসের সমসাময়িক বালিকারা বীরবালা। তাহারা সাধারণতঃ কন্দুকাদি-ক্রীড়ায় *

* তখনকার দিনে, কুল-কুমারী এবং অল্প বয়সের কুল-বধূদিগের মধ্যেও কত প্রকারের আমোদজনক খেলা প্রচলিত ছিল, মল্লিনাথ তাহার এক দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। যথা মল্লিনাথ-ধৃত-শব্দার্ণব-কারিকায়,—

রত্নাদিভির্ব্বালুকাদৌ গুপ্তৈর্দ্রষ্টব্যকর্ম্মভিঃ,
কুমারীভিঃ কৃতা ক্রীড়া নাম্না গুপ্তমণিঃ স্মৃতা।
রাস-ক্রীড়া গূঢ়মণির্গুপ্তকেলিস্তলায়নম্—
পিণ্ডকন্দুক-দণ্ডাদ্যৈঃ স্মৃতা দৈশিক-কেলয়ঃ।

দণ্ডপিণ্ডের দ্বারা ক্রীড়াকে এখন কি বলে, তাহা সমস্ত পাঠকই জ্ঞাত আছেন।

কখনও লজ্জা অনুভব করে নাই। যাহা-হউক, মা কিছুকাল, এই ভাবে কন্দুক ও কৃত্রিম পুত্র-কন্যা প্রভৃতি বস্তু লইয়া ক্রীড়া-সুখে ডুবিয়া রহিলেন; এবং শরীরে এক-টুকু সংবর্দ্ধিত হইয়া, রীতিমত বিদ্যাশিক্ষায় নিবিষ্ট হইলেন।

যিনি জগজ্জীবের জীবন-রূপিণী,—সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও বিদ্যার আদিম-খনী, তাঁহার আবার বিদ্যা-শিক্ষা কি? এইরূপ প্রশ্ন করিলে, কাব্যসৃষ্টির স্থল থাকে না; এবং হিন্দুশাস্ত্রে অবতার-তত্ত্বের যে প্রকার ব্যাখ্যা রহিয়াছে, তদনুসারে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। কেন না, অবতার-তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য, মনুষ্যের মত কর্ম্মাচরণের দ্বারা, আদর্শচরিত্র বিষয়ে শিক্ষাদান ও সঙ্গে সঙ্গে জীবের মঙ্গলবিধান; এবং সুতরাং যাঁহারা অবতীর্ণ দেবতা, তাঁহাদিগের সকল কার্য্যেই পৃথিবীর প্রচলিত-রীতির অনুষ্ঠান। মা উমা, অনাদ্যা হইলেও, সম্প্রতি গিরিরাজ-ভবনে অবতীর্ণা। অতএব, দেবী অথবা মানবীর ন্যায় তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন আছে। তিনি, জ্ঞান-লিপ্সু অজ্ঞানের ন্যায়, ঔৎসুক্যের সহিত বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইলেন; এবং অচিরেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। যাহারা দেখিল, তাহাদিগের মনে লইল যে,—

"শরতে গঙ্গায় যথা শোভে হংস শ্রেণী,—
স্বাভাবিক রশ্মি রাত্রে ওষধি-লতায়; *
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা আশ্রিল তেমনি,
শিক্ষাকালে মেধাবিনী গিরীন্দ্রবালায়।

বিদ্যাশিক্ষা, বাল্যে আরব্ধ হইয়া, বাল্যেই পরিসমাপ্ত হইল; এবং মায়ের বাল্য-পরবর্ত্তি-বয়ঃকালের রূপের প্রভা হিমাদ্রির পার্ব্বত্য প্রদেশকে উজ্জ্বল করিল। মায়ের রূপ-বর্ণনা সাধারণতঃ শিষ্টসম্মত নহে। কিন্তু কালিদাসের প্রয়োজন অন্যবিধ। সুতরাং তিনি মাতৃরূপ-বর্ণনাতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি যে জন্য তুষার-শীতল হিমাদ্রিপ্রস্থে ভ্রমর-ঝঙ্কার-মাধুরীযুক্ত, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ-কানন-সম্পদ্ প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই; সেই জন্যই, মাতৃরূপ বর্ণনায়ও, মুহূর্ত্তের তরে, চিত্তে ভীতি কিংবা সংকোচ অনুভব করেন নাই। মাতৃরূপ-বর্ণনা খুবই দূষ্য কি?

মনুষ্য যদি রাফায়েলের তুলিকা লইয়া চিত্রপটে, এবং মৃত্তিকর অথবা ভাস্করের শিল্প-সম্পদ লইয়া মৃণ্ময়ী কিংবা পাষাণময়ী ভূমিতে, মা ও মেয়ের সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিকৃতি ফলাইতে অধিকারী হয়; তাহা হইলে, শব্দশিল্পী, শব্দের পটে, কিংবা শব্দময় ভূমিতে, তাদৃশ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিতে যাইয়া নিন্দিত হইবে কেন?

"ওষধ্যঃ ফল-পাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ।" এইরূপ নৈশ-প্রভাময়ী লতা হিমাদ্রির কোন কোন প্রস্থে আছে বলিয়া, সে সকল প্রস্থ পুরাণে ও কাব্যে ওষধিপ্রস্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "তৎ প্রযাত্যৌষধিপ্রস্থং স্থিতয়ে হিমবৎপুরং"। ওষধিলতা মণির ন্যায় রাত্রে জ্বলে, ফল পাকিলে, মরিয়া যায়।

* "জ্যোতির্লতা,—যে সকল লতা রাত্রি কালে জ্বলে।"—"The glowing plant."

ইয়ুরোপীয় শিল্পীরা, যিশুর মাতা মেরীকে জগত্রাতার জননীরূপে পূজা করিয়াও, প্রতিমায় তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রচনা করেন। ভারতীয় শিল্পীরা, মা উমাকে ততোধিক ভক্তি করিয়া, প্রতি বৎসরই তাঁহার আপাদ-মস্তক মূর্ত্তিরচনায় নৈপুণ্য দেখাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের তাদৃশ অনুষ্ঠান যদি কোন অংশেও দূষ্য না হয়, তবে কবিকৃত চিত্র দূষ্য হইবে কোন্ কথায়? দূষ্য হউক, আর অদূষ্য হউক, কালিদাস শিল্পীর চক্ষু লইয়া মায়ের রূপ দেখিয়াছেন; এবং সে রূপের বর্ণনায় কবিত্ব ও শব্দ শিল্পের চমৎকারিত্ব ফলাইয়াছেন।

কালিদাসকৃত উমারূপ-বর্ণনা আধুনিক সভ্যতাদীক্ষিত, ইয়ুরোপীয়-সাহিত্য-শিক্ষিত সমালোচকদিগের মধ্যে অনেকের কাছে ভাল লাগে না। আমরা, এই হেতু, এস্থলে, রূপ-বর্ণনা প্রসঙ্গে, দুই একটি দূর-প্রসঙ্গের কথা কহিব। আমাদিগের ভরসা আছে, সহৃদয় পাঠকের তাহাতে কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। যাঁহারা সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের স্বাদগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা জানেন যে, রূপ-বর্ণনার প্রণালী ও পদ্ধতি নানা প্রকার। গ্রীক, লাটিন, ইংরেজী ও ফরাশি কবিরা এক পদ্ধতিতে রূপের বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন; এবং ভারতীয় কবিরা, কাব্যসৃষ্টির প্রথম সময় হইতে, আর এক পদ্ধতিতে রূপ-বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং, উভয় দেশের কবিরাই দেশ ও কালের ভাব-মণ্ডলের দ্বারা অনুশাসিত। অনুশাসনের সাম্যসত্ত্বেও, প্রকৃতি, জীবনের গতি, এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার পৃথক্ পৃথক্ পরিণতি অনুসারে, একই দেশের কবিদিগের মধ্যেও আবার পরস্পর বিশেষ পার্থক্য আছে। যথা, ইয়ুরোপীয় কাব্যের আদিপ্রস্রবণ-স্বরূপ হোমারের এক পদ্ধতি; সুখালস, রূপ-লালস নব্যকবি বায়রণের আর এক পদ্ধতি। শেক্ষপিরের এক পদ্ধতি, টেনিসনের আর এক পদ্ধতি। কিন্তু বোধ হয়, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ভবভূতি* ও টেনিসনের পদ্ধতি তুলনার বাহিরে রাখিলে, ভারতের কালিদাস, রমণীর রূপ-চিত্রণে আর সকল পদ্ধতিতেই সমান কৃতী; এবং ভারতীয় পুরাতন পদ্ধতির দ্বারা হাতে পায়ে শৃঙ্খলিত রহিয়াও, এ অংশে, পৃথিবীর আদর্শ কবি।

কালিদাসের সকল কাব্যেই রূপের উপাসনা ও রূপের বর্ণনা। 'মেঘ-দূতের' হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই রূপ ঝলকে ঝলকে, উছলিয়া পড়িতেছে; এবং রমণীর রূপের তরঙ্গ, জড় প্রকৃতির উচ্ছলিত রূপ-লহরীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া, খেলিতে খেলিতে বহিয়া যাইতেছে। তাঁহার মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলেও,

* ভবভূতিকৃত রূপ-বর্ণনার একটু বিচিত্র উদাত্ত-পবিত্রতা আছে। কালিদাস কোথাও সেখানে পহুঁচেন নাই। টেনিসনের বর্ণনায়, উদাত্ততা ও পবিত্রতার (Sublimity এবং Purity র তাদৃশ মিশ্রণ থাকিলেও, উহা ভবভূতির বর্ণনার মত মধুর নহে।

নানা সূত্রে, নানা কথায়, শুধুই রমণীর রূপ। রঘুবংশেও যেখানে সুযোগ ঘটিয়াছে, সেখানেই রূপবর্ণনার দুই একটি ললিত-স্নিগ্ধ-ধারা তাঁহার লেখনীমুখে আপনা হইতেই উছলিয়া পড়িয়াছে। সেই কালিদাস মদন-দাহের নিদানভূতা, মনোমদ-সৌন্দর্য্যের চলন্ত-চিত্র-রূপা মহামায়ার রূপ-বর্ণনায়, আপনার হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু তিনি এখানে যে পদ্ধতির আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে কি না, ইহাই বিচার্য্য।

এইমাত্র কহিলাম কালিদাস রূপবর্ণনার প্রায় সকল পদ্ধতিতেই সিদ্ধহস্ত। ইহার দুই একটি নিদর্শন দিব, এবং কথাটা পাঠককে তুলনায় সমালোচনার দ্বারা বুঝাইব। পাশ্চাত্য প্রবীণ-কবি, মহামতি হোমার, প্রায়শঃ কোথাও, রূপসীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চিত্র প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার ইলিয়দ্ নামক মহাকাব্যের মুখ্য নায়িকা হেলেনা। হেলেনা তদানীন্তন পৃথিবীর প্রধানতমা রূপসী। হেলেনার রূপের কথা লইয়াই কাব্যের সৃষ্টি; এবং গ্রীক ও ট্রোজান্‌দিগের মধ্যে দীর্ঘকাল-ব্যাপি মহাযুদ্ধের রক্তবৃষ্টি। ঐ উভয় দেশে, এবং আসে পাশে ইয়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশে, হেলেনার রূপের প্রসঙ্গে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, কত প্রকার প্রমোদ-কবিতা ও গীতিকবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অবধি নাই। কিন্তু যে হোমার হেলেনাকে, কাব্য-জগতের রমণীয় কুঞ্জে, রূপসম্পদে রমণীর শিরোমণিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, সেই হোমার, ইলিয়দের কোন স্থলেও, শিল্পীর তুলি লইয়া তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অঙ্কনে প্রয়াসপর হন নাই। তবে, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কিরূপে? উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রণালীটুকু হোমারেরই যোগ্য।

গ্রীক ও ট্রোজান যুদ্ধের সময় এক দিন হেলেনার পূর্ব্বতন * গ্রীকপতি মেনিলেয়স্ এবং অধুনাতন প্রেমের পতি পারিস, এই দুই বীরের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব হইল; এবং সে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিবার জন্য, দুই দেশেরই যোদ্ধৃবর্গ সমরাঙ্গণে সারি বান্ধিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যুদ্ধের স্থান ট্রয়নগরস্থ রাজ-প্রাসাদের পুরোবর্ত্তি প্রাঙ্গণ। পারিসের পিতা বৃদ্ধ-ভূপতি প্রিয়ামও, বহু বৃদ্ধসদস্য সঙ্গে লইয়া, প্রাসাদের বহির্দ্বারে উপবিষ্ট হইলেন; এবং গ্রীকবীরদিগের পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে, পুত্রপ্রেয়সী রূপসী হেলেনাকে সেখানে সসম্মানে ডাকাইয়া আনিলেন।

প্রাচীন প্রিয়াম হেলেনাকে স্বকীয় প্রাসাদে সহস্র বার দেখিয়াছেন। তাঁহার প্রাচীন সদস্যেরাও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই হেলেনার রূপে অনুরাগী নহেন। সকলেই বৃদ্ধ। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নয়ন কিংবা মন এখন আর সহজে রমণীর রূপে আকৃষ্ট কিংবা অনুরক্ত হয় না। কিন্তু তথাপি, হেলেনা যখন

* "পূর্ব্বতন গ্রীকপতি" এই বিশেষণ শ্লেষদ্যোতক নহে। হোমর স্বয়ংই, হেলেনার সম্ভাষণে, প্রিয়ামের মুখে, ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন।

রণক্ষেত্রের উপকণ্ঠে তাঁহাদিগের কাছে আসিয়া বসিলেন, তখন তাঁহারা সে অপ্রতিম-রূপরাশি-দর্শনে, সহর্ষ-বিষাদ-বিস্ময়ের অনির্ব্বচনীয় অনুভূতিতে, শিহরিয়া উঠিলেন; এবং একে অন্যের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন,—

বিস্ময়ের কথা নহে, ইহার লাগিয়া—
এমন রমণীজন লভিবার তরে,
দুঃখদগ্ধ গ্রীক আর ট্রোজান-বীরেরা
এত দুঃখ-বিড়ম্বনা করিবে স্বীকার!
ইহার মুখের কান্তি অমর-যুবতী-
মুখ-মাধুরীর মত,—অপ্রতিম!—

এই প্রকার রূপ-বর্ণনাকে ফল-নিদর্শনা বা ভাবানুমেয়া নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইয়ুরোপীয় সমালোচকদিগের মধ্যে অনেকে ইহার বড় পক্ষপাতী। কেহ কেহ, এই প্রকার বর্ণনার বাহুল্য প্রদর্শন করিয়া, ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের বিশেষ গৌরব-খ্যাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু কালিদাসের রচনায় ঠিক এমনটি না হইলেও, এমনই প্রকারের বর্ণনা কত আছে, তাহার অবধি নাই। কালিদাস, কোথাও কবির উক্তিতে, কোথাও দ্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টৃবৃন্দের ভাব-ব্যক্তিতে,—কোন স্থলে সমানহৃদয় সুহৃজ্জনের সহিত দ্রষ্টার বিশ্রব্ধ আলাপে, কোন কোন স্থানে রূপমুগ্ধ দ্রষ্টার বিষাদ-বিলাপে, সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ কবিতার মুক্তা বৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা, ভারতীয় কবিতার সর্ব্বতোমুখিতা দেখাইবার জন্য, সে অজস্রনিঃসৃত কবিতারাশি হইতে দুই একটি মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করিব।

কালিদাস-বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত সমস্ত সাহিত্যসেবীরই সুপরিজ্ঞাত কাহিনী। বিদর্ভদুহিতা ইন্দুমতী, ধাত্রী সুনন্দার ইঙ্গিত-ক্রমে, স্বয়ংবর-সভায় এক একটি রাজপুত্রের সন্নিহিত হইতেছেন, আর অমনি তদীয় মুখখানি রূপের চমকে এবং আশা ও বিস্ময়ের মিশ্রণ-কৌতুকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। আর, সেই তিনি, সঞ্চারিণী দীপ-শিখার ন্যায়, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, আর একটি যুবার দিকে চলিয়া যাইতেছেন, তাহার সেই মুখই কেমন এক প্রকার বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইতেছে। কবি ইহার বর্ণনায় কহিতেছেন,—

নিশীথে চলন্ত-দীপ-শিখার আভায়,
ক্ষণ হাসি', রাজ-পথে, প্রাসাদ-নিচয়,
ডোবে অন্ধকারে;
ত্যজি গেলা, রাজ-বালা, যাদেরে সভায়,
ডুবিল তেমতি সেই যুবরাজচয়
বিষাদ-আঁধারে।

অথবা যথা বন-শোভিনী শকুন্তলার রূপ-দর্শনে বিস্মিত দুষ্মন্তের উক্তিতে—

মানুষীর গর্ভে কভু, এমন রূপের প্রভা
হয় কি সম্ভব?
সম্ভবে কি ধরাতলে, প্রভা-তরলিত-মূর্ত্তি
বিজলী-উদ্ভব?

কালিদাসের কথা দূরে থাকুক, ফল-নিদর্শনা রূপ-বর্ণনা বাঙ্গালা সাহিত্যেও বিরল নহে। যথা, নৈমিষারণ্য হইতে বলাপ-

হৃতা,—দৈত্য-পামর-নিকন্ধর কর্তৃক দৈত্য-রাজ-সভায় আনীতা, নিস্তব্ধ-শচীমূর্ত্তি-দর্শনে বৃত্রাসুরের অচিন্তিত ও আকস্মিক ভক্তি-বিস্ময়,—

"নিকন্ধর শচীদেহ সেখানে রাখিল;
শচী মূর্ত্তি দৈত্যপতি,
নেহারি অনন্য গতি,
চমকি সম্ভ্রমে শীঘ্র উঠি দাঁড়াইল।"

পাঠককে ইহা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক যে, কালিদাসের উমা-রূপ-বর্ণনা ফল-নিদর্শনা, অথবা হর্ষবিস্ময়াদি-ভাব-ব্যঞ্জনা নহে। উহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত চিত্ররচনা, অথবা বাঙ্ময়ী প্রতিমানির্ম্মিতি। কালিদাস, সে চিত্র অথবা সে প্রতিমায়, ভক্তিপ্রণোদিত আলঙ্কারিক-ব্যবস্থানুসারে, মায়ের পদ-নখ হইতে আরম্ভ করিয়া, মাথার কেশরাশি পর্য্যন্ত, সমস্তই শব্দবিন্যাসের চরমোৎকর্ষে বর্ণনা করিয়াছেন; এবং যাঁহারা কবির হৃদয়ে, অথবা ভক্তের প্রাণে, উমামূর্ত্তি চিন্তা করিতে ইচ্ছা করেন, উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা তাঁহাদিগের গুরুস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার বর্ণনা সার্থক হইয়াছে,—মা উমাকে কিরূপে ধ্যান কিংবা কল্পনা করিতে হইবে, সে বর্ণনায় তাহার আদর্শ পাওয়া যাইতেছে।—মায়ের মূর্ত্তি মনোবুদ্ধির অগম্য হইলেও, কালিদাসের বর্ণনাপাঠে প্রত্যক্ষ প্রতিমা দর্শনের মত কার্য্য হইতেছে।

মায়ের পা দুখানি লাল টুক্ টুক্। পায়ের অঙ্গুষ্ঠ-নখে এমনই উজ্জ্বল আরক্ত প্রভা যে, মা যখন ধরাতলে পদন্যাস করিতেন, তখন যাহারা চাহিয়া দেখিত, তাহাদিগের চক্ষু আর ফিরিত না। তাহাদিগের মনে লইত যে, বুঝি সে পাদ-যুগল হইতে অল্প অল্প অলক্তক-রস ঝরিয়া পড়িতেছে; এবং উমা যে স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, সেই স্থানেই স্থলারবিন্দের চলন্ত শোভা ফুটিয়া উঠিতেছে। এরূপ পদারবিন্দকান্তির কতকটা আভা পৃথিবীতেও সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মায়ের ধীর-পদ-বিক্ষেপ-লক্ষিত লীলাঞ্চিত-গতিতে একটুকু অপরূপ বৈচিত্র্য ফলিত; এবং পায়ের নূপুরে রুণু ঝুণু নিক্কণ শ্রুতিগোচর হইত। দেখিলে মনে লইত, বুঝি বা রাজহংসেরাই, নূপুর-শিঞ্জিত-শিক্ষার জন্য, কিছু কাল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে; এবং তাহারাই, সেই সুযোগে, তাঁহাকে ঐরূপ হৃদয়হারি চলন-লীলায় শিক্ষা দিয়াছে। ভারতীয় ললনারা, তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, প্রৌঢ়-বয়সেও যে পায়ে নূপুর পরিতেন, কাব্যসাহিত্যে তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমরাও এই দেশে মাতৃপ্রতিম সুন্দরীর চরণ-নূপুরের মধুর নিক্কণ কানে শুনিয়াছি, এবং মৃদুল-দো[illegible] মহিমময় চলন দেখিয়া আনন্দ অনু-[illegible]য়াছি।

[illegible]য়ের মুখখানি রূপে অতুল। মুখের [illegible] উপমাস্থল চন্দ্র। কিন্তু চন্দ্র জ্যোৎস্নাময় হইলেও, উহাতে পদ্মের কোমলতা, কান্ত-মধুর-স্নিগ্ধতা ও সৌরভ নাই। মুখের আর

এক উপমাস্থল পদ্ম। কিন্তু পদ্মে চান্দ্রমসী জ্যোৎস্নার তরল, উচ্ছল, টল-টল সৌন্দর্য্য নাই। উমার মুখখানি এই উভয়বিধ সম্পদেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হইত। দেখিলে বোধ হইত যে, কবিরা যাঁহাকে রূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া চিন্তা করেন, সে স্বভাব-লোলা, রূপ-তরলা লক্ষ্মী, চন্দ্রে প্রস্ফুট পদ্মের গুণসম্পৎ ভোগ করিতে সমর্থ না হইয়া, এবং পদ্মে পূর্ণচন্দ্রের প্রফুল্ল জ্যোৎস্না দেখিতে না পাইয়া, উল্লিখিত উভয়বিধ গুণের সঙ্গসুখ-লালসায় উমামুখে আশ্রয় লইয়াছেন; এবং সেখানে, রূপে সৌরভ, এবং সৌরভে রূপের সুষমা, প্রত্যক্ষ করিয়া, চিরকালের তরে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ, চন্দ্রমাখা পদ্ম অথবা পদ্মমাখা চন্দ্রে, অনুপ-মনোহর রূপ-মাধুরীর কল্পনা দেব-কল্পনার যোগ্য নয় কি?

মায়ের তাম্রবর্ণ ওষ্ঠপল্লবে যখন মৃদু মৃদু মধুমাখা হাসির রেখা ফুটিত, তখন সকলেই অনিমিক্ নয়নে তাকাইয়া দেখিত। দেখিবার সময়ে সকলেরই এইরূপ প্রতীতি হইত যে, তরুলতার তাম্রবর্ণ কচি কচি পাতার উপরে একটি শ্বেত-কান্তিময় ফুল, অথবা পরিস্ফুট প্রবালের উপরে একটি শুভ্রবর্ণ মুক্তা রাখিয়া দিলে, তাহাতে যে শোভা ফলে, এ হাসি তাহারই অনুকৃতি।

মা উমার চক্ষু দুটি সমীর-সঞ্চার-চঞ্চল নীলোৎপলের মত। সে চক্ষের দৃষ্টি, ঢল-ঢল কান্তিতে, প্রায় সকল সময়েই মৃদুচঞ্চল। মাই মৃগাঙ্গনাদিগের নিকট এ দৃষ্টিবিভ্রম শিক্ষা করিয়াছেন, না মৃগাঙ্গনারা তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সংসারে ধন্য হইয়াছে? মৃগাঙ্গনার তরল-চঞ্চল চক্ষুর সহিত সুন্দরীর চক্ষু ও চাহনির এই প্রকার উপমা যাঁহাদিগের কাছে একটুকু বিসদৃশ বোধ হয়, তাঁহারা অবশ্যই ইহা মনে করিয়া সুখিত হইবেন যে, ইয়ুরোপীয় কবিরাও, এ অংশে, সংস্কৃতকবিদিগের অনুকরণে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। যথা বায়রণের ইয়ান্থী-রূপ-বর্ণনা। কালিদাসের উমা যে বয়সে পহুঁছিয়াছেন, বায়রণ ঐ বয়সের একটি বাল-যুবতীকে—একটি ঈষদুন্মিষিত উচ্চবংশসম্ভূত রূপবতীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন,—

ওই আঁখিটিতে একবার—
বন-হরিণীর ওই বিলোল-ঈক্ষণে,
কভু তেজে সমুজ্জ্বল,—কভু সঙ্কুচিত
সলজ্জ শোভায় যেন;—সঞ্চরে যেখানে,
কেড়ে লয় মন;—নিজ-দীপ্তি-প্রভাসিত
করি সেই স্থান, যথা করয়ে বিহার;—
ওই আঁখিটিতে একবার—
এ লেখা বারেক দেখ, প্রার্থনা আমার। *

* চাইল্ড হারোল্ডের তীর্থযাত্রা (Childe Harold's Pilgrimage) নামক সুপরিশ্রুত কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে, ইয়ান্থী নাম্নী একাদশবর্ষীয়া একটি সুন্দরীর সম্ভাষণে—

"Oh! let that eye, which,
wild as the Gazelle's,
Now brightly bold
or beautifully shy,

তবে, এখানে এই পার্থক্য, বায়রণ যাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি তাঁহার প্রীতিপরিচিতা, প্রণয়াকাঙ্ক্ষালক্ষ্যীকৃতা একটি জীবিত ললনা;—কালিদাস যাঁহাকে আঁকিয়া তুলিতেছেন, তিনি জীব-নয়নের অগম্যা, অথচ পুরাণাদিশাস্ত্রের সাহায্যে কল্পনার অধিগম্যা, জগদারাধ্যা দেবাঙ্গনা। বায়রণের অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়ের উদ্বেল-লালসা; কালিদাসের অক্ষরে অক্ষরে বাৎসল্য-ভক্তির স্নিগ্ধ ভাষা। কালিদাস এইরূপে, সে অপ্রতিম রূপরাশির সর্ব্বাবয়বি বর্ণনা করিয়া শেষ স্থলে বলিতেছেন,—

বিন্যাসিয়া যথা যোগ্য যতন-বিধানে,
উপমার উপযোগি সামগ্রী-সম্ভারে,
জগতের রূপরাশি যেন একস্থানে
দেখিবার লাগি বিধি সৃজিলা উমারে।

কালিদাসীয় পদ্ধতির এইরূপ সর্ব্বাবয়বনিষ্ঠা রূপ-বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরল। ঋষিপ্রণীত কাব্যনিচয়ে, কোন কোন স্থলে, ঈদৃক্ বর্ণনার চেষ্টা আছে; কিন্তু বর্ণনা সফল হয় নাই। পড়িবার সময়, সে বর্ণতুলীকে হরিতকীর কষায়-রস-সিক্ত বলিয়া অনুমান হয়। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে, একমাত্র নৈষধকার শ্রীহর্ষ, রূপবর্ণনায়, কালিদাসের অনুকরণে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস ও চেষ্টা হাস্যাস্পদ হইয়াছে।*

Wins as it wanders,
dazzles where it dwells,
Glance o'er this page,"

* পুরাতন বঙ্গের পূজাস্পদ কবি প্রসিদ্ধনামা শ্রীহর্ষ, তদীয় নৈষধকাব্যের বহু স্থলেই শ্রীহর্ষের মত শব্দসম্পৎশালী সুকৃতী কবিও, কালিদাসের অনুকৃতিচেষ্টা করিয়া, যে পথে কিঞ্চিন্মাত্র সার্থকতা লাভ করেন নাই, বঙ্গের কবিগুণাকর যে সেই পথে সেই কৃচ্ছ্রসাধ্য শিল্পপদ্ধতিতে, উমার রূপবর্ণনায়

দময়ন্তীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইটি বর্ণনা সুদীর্ঘ ও সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। প্রথম বর্ণনা নৈষধের দ্বিতীয় সর্গে দ্রষ্টব্য। উহার বক্তা মৃগয়াব্যাসক্ত নিষধনাথ নলের কর-মুক্ত হংস। শ্রোতা নিষধনাথ। দ্বিতীয় বর্ণনা কাব্যের সপ্তম সর্গে দ্রষ্টব্য। উহার বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই নল। নল দময়ন্তীর রূপ দেখিতেছেন, আর সে রূপ বর্ণনা করিয়া মনে মনে কবিতা আবৃত্তি করিতেছেন। আমরা পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির নিমিত্ত, এ স্থলে শ্রীহর্ষের দুইটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিব।

হৃতসারমিবেন্দুমণ্ডলং
দময়ন্তীবদনায় বেধসা
কৃতমধ্যবিলং বিলোক্যতে
ধৃতগম্ভীর-খনীখনীলিম।

অর্থাৎ—বিধাতা দময়ন্তীর বদননির্ম্মাণের জন্য চন্দ্রের সমস্ত সার-সৌন্দর্য্য খুদিয়া আনিলেন। খুদিতে খুদিতে চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থলে একটা গভীর গর্ত্ত অথবা বিল হইল। চন্দ্রের দিকে চাহিলে, উহার মধ্যভাগে এখন যে একটা নীলবর্ণ বিলের মত বস্তু নয়নগোচর হয়, তাহা সেই বিধিখাত বিল। বিলের অন্তস্তলে আকাশের নীলিমা।

অগ্রসর হন নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে বুদ্ধিমত্তার কার্য্য হইয়াছে।

কালিদাসের উমা, একদিন, গিরীন্দ্র-প্রাসাদের বহিঃপ্রকোষ্ঠে, পিতার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে ভক্তি-গদ্গদ নারদ, বেড়াইতে বেড়াইতে, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং মায়ের

স্বদৃশোর্জনয়ন্তি সান্ত্বনাং
খুরকণ্ডুয়ন-কৈতবানমৃগাঃ।
জিতয়োরুদয়ং-প্রমীলয়োস্তদ-
খর্ব্বেক্ষণ-শোভয়া ভয়াৎ।

অর্থাৎ—মৃগদিগের চক্ষু দময়ন্তীর দীর্ঘল চক্ষুর শোভায় পরাজিত হইয়া ভয়ে বুজিয়া রহিয়াছে। মৃগেরা চেষ্টা করিতেছে, তথাপি সে নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত হইতে চাহিতেছে না। মৃগেরা, এই হেতু, খুর-কণ্ডূয়ন-ব্যপদেশে, মাটী খুড়িতেছে, এবং তদ্দ্বারা পরাভূত চক্ষু দুটির সান্ত্বনা জন্মাইতেছে।

আমরা কবিতা দুইটির টীকার্থ অনুবাদ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থগ্রহ করিতে পারিলাম না। চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে যে নীলিমা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বিলের ও-পিঠের, না এ পিঠের? আর, মৃগের চক্ষু, নিদ্রা ভিন্ন আর কোন্ সময়ে, নিমীলিত থাকে, এবং খুর-কণ্ডুয়ন-জাত ধূলি-বালু দ্বারাই বা কেন তাদৃশ নিমীলিত চক্ষের সান্ত্বনা জন্মে, ইহা মনোবুদ্ধির অগম্য। পাঠক এই কবিতা দুইটির সহিত কালিদাসীয় মুখ-নেত্রবর্ণনা মিলাইয়া পড়িলে অবশ্যই তদীয় কবিত্ব-শক্তির মহিমা পরিগ্রহ করিতে পারিবেন।

দিকে চাহিয়া গিরিরাজকে বলিলেন—"মহাভাগ, আপনি আপনার এই মেয়েটিকে চিনিতে পাইয়াছেন কি? ইনি দেবাদিদেবের ভাবিপত্নী,—প্রেমের অপ্রতিম-শক্তিতে তদীয় অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী।" নারদ যাহা কহিলেন, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় শ্রুত হইল।

নারদের এইরূপ আকস্মিক সমাগম কবিগুণাকরের অন্নদামঙ্গলেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সে নারদও আর একজন, বর্ণনাও আর এক প্রকার। সংস্কৃত সাহিত্যের নারদ, আনন্দ-বিহ্বল পুরুষ হইলেও, ঋষিদিগের মধ্যে দেবতা, দেব-সমাজে ঋষি;—জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ, জগজ্জন-তাপহারী, ইচ্ছাবিহারী ভক্তসন্ন্যাসী। ফলতঃ, সংস্কৃত সাহিত্যের যে যে স্থানে নারদের উল্লেখ আছে, সেই সেই স্থানেই নারদ-সমাগম, অতি দুর্ল্লভ দেব-সমাগমের ন্যায়, তদ্গত ভক্তির ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিগুরু বাল্মীকি নারদ কর্ত্তৃকই রামায়ণ-রচনায় প্রথম উপদিষ্ট হন; এবং নারদকে গুরুবৎ পূজা করেন। কবিবরেণ্য মাঘ যে ভাষায় নারদের দ্বারকা-সমাগম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও দেব-জন-যোগ্য ভক্তির ভাষা। * কালিদাস নারদের কোন বর্ণনা করেন নাই। কিন্তু যতটুকু পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সংস্কৃতসাহিত্যের সুপরিচিত নারদ বলিয়াই চিনা যায়। কবিগুণাকরের নারদকে কোন প্রকারেই সে নারদ বলিয়া

"পতত্যধো ধাম বিসারি সর্ব্বতঃ
কিমেতদিত্যাকুলমীক্ষিতং জনৈঃ।"

চিনা যায় না। তিনি মেনকার যত্নে, পাদ-বন্দনা ও সিংহাসনদানে, পূজিত হইয়া থাকিলেও, তাঁহাকে নিশ্চয়ই আর এক লোক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার সহিত হিমাদ্রিভবনের বাহিরের কোন স্থানে ধূলি-খেলাব্যাপৃতা বালিকা উমার সাক্ষাৎকার ঘটিল। তখন তিনি, সে বালিকার পদ-যুগলে প্রণাম করিয়া, বিবাহের কথা কহি-লেন। বালিকা, বিবাহের কথায় লজ্জায় জড়সড় হইয়া, মায়ের কাছে দৌড়িয়া গে-লেন; এবং কৌশলে নারদের পরিচয় দিলেন। যথা অন্নদামঙ্গলে,—

বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পেয়ে,
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে।
আল্যাকরি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে,
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে।
সখি মেলি খেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া,
ধুলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া।
কোথা হ'তে বুড়া এক ডোকরা বামন,
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ।
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে,
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে।
ছুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ এক খান,
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান।
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কুন্দলিয়া,
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া।

পাঠকের মনে আছে কবিগুণাকরের উমা কচি বালিকা; কালিদাসের উমা লোকাতীত-সৌন্দর্য্যসম্পন্না, ঢল-ঢল-লাবণ্যা, পূর্ণবিকশিতা যুবতী। নারদ যখন উমার প্রসঙ্গে ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্দেশ করিলেন, তখন গিরিরাজ হৃদয়ের হর্ষাতিশয্যে স্তম্ভিত-বৎ হইলেন। তিনি এতটুকু জানিতেন যে, তাঁহার নয়নের পুতুলি উমা দেব-দুর্ল্লভ ধন,—যজ্ঞীয় হবির ন্যায় দীপ্তবহ্নি-সমুচিত, মন্ত্রপূত বস্তু। তবে এই উমা মহাদেবের মহিষী হইবেন, একথা আজি প্রথম তাঁহার কল্পনায় প্রবেশ করিল। কিন্তু উমা তাঁহার কন্যা। তিনি কন্যার পিতা হইয়া কিরূপে আপনা হইতে প্রার্থী হইবেন?—দেবাদি-দেব স্বয়ং যাচমান হইয়া উমার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা না করিলে, তিনি কিরূপে তাঁহাকে কন্যাদান করিবেন?

কালিদাসের কাব্য এই স্থান হইতে আর এক পথ লইল। তাঁহার যে কল্পনা এতক্ষণ পর্ব্বতের বর্ণনা এবং উমার রূপ-চিত্র-রচনায় ব্যাপৃত ছিল, তাহা এই স্থান হইতে, নভস্তল-বিহারিণী পক্ষিণীর ন্যায়, ঊর্দ্ধগামিনী হইয়া, আর এক দেশে উঠিল। সে পথ অথবা সে দেশ, কবিগুণাকরের কেন, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কবিরই অনধিগম্য। কালি-দাস, সেই পথে বিচরণ ও সেই দুর্গম গ্রামে আরোহণ করিয়া, কাব্যের যে উৎকর্ষ ফলাই-য়াছেন, তাহা পৃথিবীতে আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে কি না, বলিতে পারি না।

গিরিরাজ যে সময়ে উমা-হেন কন্যার ভাবিজীবনের কথা লইয়া চিন্তান্বিত, সেই সময় তাঁহার কাছে সংবাদ পঁহুছিল যে, যিনি চরাচর-বিশ্বের আদিপুরুষ,—বিশ্বেশ্বর নামে সর্ব্বত্র পূজ্য;—ঊর্দ্ধরেতা তাপসেরা, বহুকাল

কঠোর-তপোব্রত আচরণ করিয়াও, যাঁহার দর্শন পায় না, অথচ যিনি লীলাধর্ম্মের আনন্দময় অনুষ্ঠানে, সামান্য লোকেরও গোচনাস্পদ হইয়া থাকেন ;—যিনি বৃদ্ধ হইয়াও কামচারিত্ব হেতু চিরযুবা,—বিরাট্‌মূর্ত্তি হইয়াও চিরমনোহর, সেই জগৎপিতা মহাদেব, তপস্যায় চিত্তনিবেশ করিয়া, হিমাদ্রির কোন এক মন্দাকিনী-লহরীসিক্ত, দেবদারু-ছায়াযুক্ত, মৃগনাভি-গন্ধসুরভিত, কিন্নরগীতি-কণিত, মনোরম প্রস্থে যোগাসনে আসীন হইয়াছেন। মহাদেব দক্ষযজ্ঞের পর হইতেই আসক্তিশূন্য উদাসীন। যে অবধি তাঁহার প্রাণের সতী,—প্রকৃতির জীবন্ত-প্রতিকৃতি দাক্ষায়ণী, পতিনিন্দা শুনিয়া, অনলাগ্নির প্রসারিত জিহ্বায় তনুত্যাগ করিয়াছেন, সেই অবধি মহাদেব, সংসারের সমস্ত বিষয়ে যেন একবারে নির্লিপ্ত হইয়া, আপনাতে আপনি শূন্যহৃদয়ে অবস্থিত আছেন। সম্প্রতি তিনি হিমাদ্রিপ্রস্থে তপস্যার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাদেবই সকলের সর্ব্ববিধ তপস্যার ফল-বিধাতা। তিনি আবার তপস্যা করিতেছেন কাহার? তপস্যাই বা করিতেছেন কি জন্য? কিন্তু তথাপি গিরিরাজ জানিতে পাইলেন যে, মহাদেব, স্পর্শশীতল-ভূর্জ্জত্বাচ-পরিহিত, পুন্নাগ-কুসুম-ভূষিত, মনঃশিলা-লাঞ্ছিত প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, এবং যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা আপনারই অন্যতম প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিস্বরূপ অগ্নি জালিয়া, কি এক নিগূঢ় কামনায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ তপস্যা, দক্ষদুহিতার পুনরাবির্ভূত-মূর্ত্তি উমাধন-লাভের জন্য, প্রেমের তপস্যা নয় ত? কবি-বিরচিত,—"কেনাপি কামেন তপশ্চচার" এই গূঢ়ার্থপংক্তির অর্থাভাসে তাহাই যেন একটুকু সংসূচিত হয়!

ঈদৃশ প্রার্থিতদুর্ল্লভ অতিথি হিমাদ্রি-প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছেন; গিরিরাজ, কিরূপে, কি দিয়া, তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবেন? তিনি, অর্ঘ্যদানে, স্বয়ং মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া, সখীসমবেতা দুহিতাকে—তাঁহার সেই প্রাণের পুতুল মা উমাকেই, মহাদেবের প্রাত্যহিক পূজা ও পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন; এবং যদিও সুন্দরী যুবতী সাধারণতঃ তপঃসমাধির অন্তরায়রূপিণী, তথাপি মহাদেব উমার পরিচর্য্যাগ্রহণে সম্মত হইলেন।

মা উমা রাজেন্দ্রনন্দিনী হইয়াও, আজি হইতে দেবসেবায় নিযুক্ত। প্রাচীন ভারতে, আরও অনেক রাজকন্যা, এইভাবে, দেবসেবা অথবা ঋষিতাপসের অর্চ্চনা করিয়াছেন। মা প্রতিদিন, দুই বেলা, স্বহস্তে মহাদেবের যজ্ঞবেদী সম্মার্জ্জন করেন; যজ্ঞীয়-পুষ্প তুলিয়া আনেন; যজ্ঞার্থ নিয়ম-বিধির জল ও কুশ আনিয়া দেন; এবং প্রায় সর্ব্বদাই ছায়ার ন্যায় মহাদেবের কাছে কাছে রহেন। মায়ের সে সুখ-লালিত সুকুমার তনুতে এত পরিশ্রম সহ্য হয় কি? মা যখন অতিরিক্ত শ্রমে একটুকু বেশী ক্লান্ত হন, তখন সে গভীর-ধ্যানমগ্ন মনোহর-মহামূর্ত্তির অদূরে উপবিষ্ট হইয়া, তদীয় ললাটশোভি

চন্দ্রলেখার সুশীতল জ্যোৎস্নায় একটুকু শান্তি লাভ করিতে উৎসুক হন।

যজ্ঞীয় বিধির ফুল　যতনে তুলিয়া বালা,
যজ্ঞবেদী করেন মার্জ্জন;
নিয়মিত-কুশ-জল　আনি দেন, নিতি নিতি,
মহেশের সেবার কারণ।
সেবার সে শ্রম-ভরে,　সুকেশীর কান্তদেহে
অবসাদ ঘটয়ে যখন;
হর-শির-চন্দ্রলেখা　সতত-শীতল-কান্তি
করে সেই ক্লান্তি-প্রশমন।

কল্পনার কি অপরূপ দৃশ্য! কাব্যের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! হিমাদ্রির উর্দ্ধতন শিখরে,—সাধারণের অনধিগম্য, স্বর্গগঙ্গার তরঙ্গ-রম্য, শীতল-সমীর-সেবিত নমেরুকাননের অভ্যন্তরে,—জগতের জীবন-স্বরূপ প্রকৃতি-পুরুষ পরস্পরের আরাধনায় নিরত; অথচ দ্রষ্টব্য, একে অন্যের নিকট, যেন আজি অপরিচিত;—অতি সন্নিহিত হইয়াও, নিজ নিজ আত্মার অগাধ গাম্ভীর্য্যে,অথবা অধ্যাত্ম-যোগানুরোধে, একান্ত অন্তর্হিত। এক জন গভীরধ্যানে আত্মবিস্মৃত, আর এক জন সে ধ্যানরত তাপসের নিত্যসেবায় ব্যাপৃত! রূপ ও যৌবন, বিকচ বন-কুসুমের মত, সেখানে সৌরভে আমোদিত হইয়া, ফুটিয়া রহিয়াছে; কিন্তু লালসাকুল-চিত্ত, লোলুপ-ভ্রমরের মত, সে সুরভি রূপ-কুসুমের সম্মুখীন হইতেছে না। প্রীতি আপনিও যেন, সে বিজন প্রা-ন্তপ্রদেশে,তপোবহ্নির পবিত্রশিখার সান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে সাহস পাইতেছে না। তবে, প্রীতির উদয় হইবে কি রূপে? কালিদাস, তাঁহার উমাচিত্রে, এই গভীর তত্ত্বপ্রশ্নেরই প্রত্যুত্তর দিতে প্রয়াসপর হইয়াছেন। সে লোকোত্তর-সৌন্দর্য্যময় প্রত্যুত্তর-পট-নিচয় পাঠকের নিকট ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে।

---
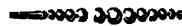
# সান্ত্বনা।

## দ্বিতীয় স্তবক।

পাঠকের স্মরণ আছে, সান্ত্বনার প্রথম স্তবকে,—শোকসন্তপ্ত পিতাপুত্রীর কথোপ-কথনের উপসংহার-স্থলে; বৃদ্ধ পিতা, তদীয় দুহিতাকে, পরলোক ও অধ্যাত্মজগতের অস্তিত্ব, এবং সেখানে স্বর্গগত আত্মীয়দিগের পরস্পর-পুনর্ম্মিলন বিষয়ে, কএকটি বৃত্তান্ত-মূলক কাহিনী কহিবেন বলিয়া বাক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা সেই যথাশ্রুত কাহিনী-গুলি এইক্ষণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। কাহিনী-গুলি আমাদিগেরও পরিজ্ঞাত বৃত্তান্ত। আ-মরা বহু সম্ভ্রান্ত ও সুপণ্ডিত ব্যক্তির গ্রন্থ-পত্রে এই কাহিনীনিচয় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, এবং বৃত্তান্তের সহিত বৃত্তান্তর্ম্মিলা-ইয়া,বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুতরাং,

ইহাদিগের সত্যতা জ্ঞাপন সম্বন্ধে, আমরাও সমাজের নিকট কতকটা দায়ী।

বৃদ্ধ, উপদেশের উপক্রমে, জিজ্ঞাসাচ্ছলে কহিলেন,—"মা, তুমি মিনট স্যাভেজ নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম শুনিয়াছ কি? সম্প্রতি আমেরিকায় ঐ নামে একটি মহামতি পুরুষ, একটি আনন্দস্নিগ্ধ আলোকস্তম্ভের ন্যায়, বিদ্যমান আছেন। তিনি যেমন ভগবৎপ্রেম-বিহ্বল ভক্তিমান্ ধার্ম্মিক, তেমনই পরীক্ষাপটু কঠোর বৈজ্ঞানিক। আমেরিকার অসংখ্য লোক তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে পূজা করে, এবং তাঁহার মুখ-নিঃসৃত প্রত্যেক বাক্যকে দেববাক্যের মত বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে।

তত্ত্ববিজ্ঞান-ভক্ত স্যাভেজ যখন, তাঁহার প্রথম বয়সে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তখন পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়েই, তাঁহার মনে ঘোরতর সংশয় জন্মে। তাঁহার চিত্তে এই প্রকার প্রশ্নের উদয় হয় যে, পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণির প্রাণীই যখন প্রাকৃতজগতের চিরপ্রথিত নিয়মে, কালের পূর্ণতায়, কাল-স্রোতে ভাসিয়া যায়, তখন মৃত্যুর পর, মনুষ্যের আর অবশিষ্ট থাকিতে পারে কি? মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ, হস্ত পদ, সমস্তই জড়পদার্থ; মনুষ্যের জীবনও সুতরাং জড়পদার্থ অথবা জড়শক্তিরই স্ফুরণ মাত্র। ঘটিকাযন্ত্র যেমন বিকল হইলেই অবস্ত মধ্যে পরিগণিত হয়, মনুষ্যের জীবন-যন্ত্রও সেইরূপ বিকল হইলেই বিনষ্ট হইয়া যায়। জীবনের সকল আশা, সকল ক্রিয়াই তখন একবারে নিবৃত্তি পায়। সুতরাং যাহারা, পরলোক ও পরকালের দিকে চাহিয়া, প্রত্যক্ষ জগতের সুখ-সম্পদে উপেক্ষা করে, তাহারা কিয়দংশ উদ্ভ্রান্ত ও আত্মপ্রতারিত।

মিনট স্যাভেজের উল্লিখিতরূপ সংশয় এখন আর নাই। উহা একবারে উন্মূলিত হইয়াছে; এবং যে হৃদয় এত দিন নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহা এইক্ষণ জ্ঞানোজ্জ্বলা বিশ্বাস-ভক্তির স্নিগ্ধজ্যোৎস্নায় অসংখ্য হৃদয়ে আলোক দান করিতেছে। বস্তুতঃ, এই উন্নতমনা উদারপুরুষ এইক্ষণ পারলৌকিক অস্তিত্বের সমস্ত কথা চাক্ষুষ-প্রতীত সত্যবৎ বিশ্বাস করেন; এবং মনুষ্য মাত্রই যেন, এই অমূল্য সত্য অন্তরে অনুভব করিয়া, শোক-দুঃখের নিদারুণ-দাহে, সান্ত্বনা পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে, দেশে দেশে ও নগরে নগরে, তত্ত্ব প্রচার করিয়া থাকেন। তিনি বিজ্ঞানের আলোকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পাইয়াছেন, তাহা কএকখানি বৃহৎগ্রন্থে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; এবং গ্রন্থগুলি তাঁহার নাম-মাহাত্ম্যে পৃথিবীর সমস্ত সুশিক্ষিত সমাজে আগ্রহের সহিত আলোচিত হইতেছে। গ্রন্থে অনেক আশ্চর্য্য কথা আছে। এখানে দুই একটি কহিব।

একদিন গ্রন্থকার স্যাভেজ একজন সুপরিচিত আবিষ্ট-পুরুষের * সন্নিধানে বসিয়া আ-

* পরলোকবাসী আত্মারা, পদার্থতত্ত্বের কেমন এক বিশেষ নিয়মে, পৃথিবীস্থ সক-

ছেন, এমন সময় একটি হারমোনিয়ম আপনা হইতে বাজিয়া উঠিল;—হারমোনিয়মটিকে সেই আবিষ্ট পুরুষ উল্টো দিকে, অর্থাৎ চাবির বিপরীত ভাগে, একটি অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শমাত্র করিতেছেন, ইহাতেই উহা হইতে নানা প্রকার মধুর ও মনোহারি গীত স্পষ্ট ও পরিস্ফুট স্বরে বাজিতে লাগিল। স্যাভেজ তখন হারমোনিয়মটি আপনার হাতে তুলিয়া লইলেন। উহা তখন আর বাজিল না। কিন্তু না বাজিয়াও, অচেতন হারমোনিয়ম, সর্ব্বতোভাবে সচেতনবৎ কার্য্য করিয়া, অদৃশ্য আত্মার উপস্থিতির সাক্ষ্য দিল। আবিষ্ট ব্যক্তি তাঁহা হইতে বহু দূরে। তাঁহার কাছে অন্য-মানবের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। তথাপি, কে যেন, উহাকে তাঁহার হাত হইতে লইয়া যাওয়ার জন্য, শক্তিশালী পুরুষের মত, সবলে টানাটানি করিতে লাগিল। যে হারমোনিয়ম ধরিয়া ঐরূপ টানিতেছে, তাহাকে তিনি চক্ষে দেখিতেছেন না; অথচ সে যে একটি সূক্ষ্মশরীরী সজীবব্যক্তি এই বিশ্বাস তাঁহার মনে দৃঢ়বদ্ধ হইল।

আর এক দিন, স্যাভেজ একটি গুরুভারযুক্ত বিবিধবস্ত্রাচ্ছাদিত বৃহৎ আরমচেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; এবং একটি আবিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আত্মিক ও আত্মিকাদিগের অশেষবিধ শক্তির বিষয় কথোপকথন করিতেছেন। সেখানে একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বারিষ্টার ছিলেন। তিনিও কান পাতিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্যাভেজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "পরলোকগত আত্মিকেরা তাঁহাকে শূন্যে তুলিতে পারেন কি?" আবিষ্ট ব্যক্তি বলিলেন "তাঁহারা এই প্রকার শক্তি অহরহঃই প্রদর্শন করিয়া থাকেন।" যেই কথা, সেই কার্য্য। আবিষ্ট ব্যক্তি, মিনট স্যাভেজের আসনাস্পদ বৃহৎ আরম চেয়ারখানিকে, একটি অঙ্গুলির দ্বারা, 'ছোয় না ছোয়' এমনই ভাবে, ঈষৎ-সংস্পর্শে, স্পর্শ মাত্র করিলেন। সে চেয়ার অমনই স্যাভেজের গুরুভার লইয়া আপনা হইতে শূন্যে উঠিল। অবিশ্বাসী বারিষ্টার বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মাথা নোয়াইলেন; এবং প্রকারান্তঃ ইহাই বলিলেন যে, এই প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণে উপেক্ষা করিলে, পৃথিবীতে প্রমাণের আর প্রয়োজন থাকে না।

মিনট স্যাভেজ এইরূপে কত পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহার অবধি নাই। কিন্তু সকল পরীক্ষার উপর অভ্রান্ত ও আশ্চর্য্য পরীক্ষা স্পর্শ। একদিন একটি আত্মিক মূর্ত্তি, অদৃশ্য রহিয়া [illegible] তাঁহাকে হস্তস্পর্শে আদর করিয়াছিলেন,—তাঁ[illegible]র হাতখানিরে একবার হাতে

লের দেহে প্রবেশ করিতে পারেন না। তাঁহারা, যাহাদিগের দেহে আবিষ্ট হইয়া, অথবা যে সকল ব্যক্তির দেহস্থিত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া, জড়জগতের উপর কার্য্য করিতে পারেন, ইংরেজীতে তাহাদিগকে মিডিয়ম ( medium ) বলে। মিডিয়ম নামে অভিহিত পুরুষেরাই বাঙ্গালায় আবিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইল।

লইয়া—যেন জোরের সহিত হাতে ধরিয়া,—আবার তাঁহার গায়ে মৃদু মৃদু হাত বুলাইয়া, তাঁহাকে স্নেহ ও প্রীতি জানাইয়াছিলেন; এবং তিনিও সেই অপ্রত্যক্ষ অথচ স্পর্শানুভূত হাত খানি পুনঃ পুনঃ আপনার হাতের উপর রাখিয়া,—উহার সুকোমল অঙ্গুলি গুলি এক দুই করিয়া হাতে গণিয়া, বিস্ময়ের চরম-গ্রামে পঁহুছিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, তাঁহার পিতা ও পরিচিত-সুহৃজ্জনদিগের আত্মা, অনেক দিন, তাঁহার সহিত, আবিষ্ট-ব্যক্তির লেখনীর সাহায্যে, আলাপ করিয়াছেন; এবং তাঁহার জীবনের যে সকল কথা তিনি আর পরলোকগত পিতা মাতা ভিন্ন এ সংসারে অন্য কোন ব্যক্তি জানে না, উপস্থিত আত্মিকেরা, সে সকল কথাও কথিতরূপ আলাপে ব্যক্ত করিয়া, নিজ নিজ পরিচয় দিয়াছেন।

সত্যপ্রিয় স্যাভেজ তাঁহার গ্রন্থনিচয়ে ইতিহাস ও বিজ্ঞানসংক্রান্ত যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বালক-বালিকার বোধগম্য হইবে না। কিন্তু তিনি কতকগুলি সুপরীক্ষিত ও সুদৃঢ়-প্রমাণ-সমন্বিত পারিবারিক বৃত্তান্তও তাঁহার গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছেন। আমি তাহারই একটি বিশেষ বৃত্তান্ত আজি তোমায় জানাইব। তোমায় ইহা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক যে, যে সকল সারতত্বসূচক অধ্যাত্মবৃত্তান্ত মিনট স্যাভেজের মত জগন্মান্য ব্যক্তির দ্বারা মানবজগতে প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে উপেক্ষা করা শুধুই মূর্খতার পরিচয় মাত্র।"

( ১ )

মিনট স্যাভেজের বসতি স্থল বোষ্টন নগর। বঙ্গে যেমন নবদ্বীপ, আমেরিকায়ও তেমন বোষ্টন। কেন না, এই বোষ্টনই চ্যানিঙ, পার্কার ও এমার্সন প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের জন্মস্থান অথবা কর্ম্মস্থান। বোষ্টনের অদূরে, একটি প্রতিবেশি-নগরে, জেনী আর এডিথ নামে দুইটি বালিকা, এক মায়ের সন্তান না হইয়াও, একে অন্যকে সহোদরার অধিক ভালবাসিত। উহারা স্কুলে একসঙ্গে পড়িত,—বাড়ীতে একত্র খেলা করিত, এবং দিবা-রাত্রির অষ্ট প্রহরের মধ্যে প্রায় সকল সময়েই একজন আর একজনের গলায় মালার মত গাঁথা রহিত। উভয়েই সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকা; সুতরাং অল্পবয়সেই সাধারণ-শ্রেণির বালিকা অপেক্ষা সুশিক্ষিত। উহাদিগের একটির বয়স আট বছর, আর একটির বয়স নয় বছর। কিন্তু শরীরের হৃষ্ট-পুষ্টতায় উভয়কেই একটুকু বেশী বয়সের বলিয়া বোধ হইত।

বিধাতার বিধি অথবা নিয়তির গতি এক এক সময় বড়ই বিচিত্র বলিয়া অনুমিত হয়। বিধিবৈচিত্র্যে, ১৮৮৯ সনের জুন মাসে, জেনী আর এডিথ, দুই জনেই, এক সময়ে, ডিপ্‌থিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া, শয্যাগত হইল। জেনী, রোগের এই আকস্মিক আক্রমণে, অল্প কালেই অবসন্ন হইয়া পড়িল; এবং ৫ই জুন, আপনার পিতা মাতাকে অশ্রুজলে ভাসাইয়া, কালের গ্রাসে

গড়াইয়া পড়িল। কিন্তু এডিথের পিতা মাতা উহাকে এই ঘটনার কিছুই জানিতে দিলেন না। পাছে রুগ্ন বালিকা এডিথ, জেনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, প্রাণে ভয় পায়, এই জন্য তাঁহারা এতৎসংক্রান্ত সমস্ত কথা, অতি কৌশলে,—অত্যন্ত বেশী সাবধানে, গোপন করিয়া রাখিলেন।

এই ভাবে, ক্রমে তিনটি দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু ৮ই জুন শনিবার এডিথের অবস্থান্তর ঘটিল। মাতা, পিতা ও চিকিৎসক প্রভৃতি আত্মীয়জনেরা মধ্যাহ্ন-বেলায় বুঝিতে পাইলেন যে, এডিথের সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। সুকুমারমতি এডিথ, বালিকা হইলেও, স্বকীয় শরীরের ভাল মন্দ সমস্ত অবস্থা সম্যক্ অনুভব করিল; এবং আর বড় বেশী সময় বাকি নাই, ইহা স্থির বুঝিয়া, জেনীকে দেওয়ার জন্য, আপনার দুই খানি প্রতিকৃতি একজন আত্মীয়ের হাতে তুলিয়া দিল।

হায়! জেনী তখন কোথায়? এডিথের বিশ্বাস যে, জেনী তাহার রোগ-শয্যায় শয়ানা রহিয়াছে, এবং একটু একটু করিয়া ভাল হইতেছে। প্রতিকৃতি (Photograph) প্রেরণের সময় এডিথ আত্মীয় ব্যক্তিকে ইহাও বলিয়া দিল যে, "এ দুখানি আমার আদরের উপহার বলিয়া জেনীর নিজ হাতে দিবে, এবং উহাকে আমার এ জীবনের শেষ বিদায়-সম্ভাষণ জানাইবে।" কিছুক্ষণ পরেই এডিথের মোহতন্দ্রা জন্মিল; এবং সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বালিকা তন্দ্রাভিভূতবৎ পড়িয়া রহিল।

সূর্য্য এইমাত্র অস্ত গিয়াছে, - সমস্ত সংসার সায়ন্তন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, ঠিক এমনই সময় এডিথ আবার চৈতন্য লাভ করিল এবং চক্ষু মেলিয়া, কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবে, এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিল। এডিথের আত্মীয়স্বজনদিগের মধ্যে যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন, এডিথ তাঁহাদিগের অনেককেই প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়া, পিতা মাতার নিকট একে একে তাঁহাদিগের কথা কহিতে লাগিল।

মুমূর্ষুর এই প্রকার আত্মিক-মূর্ত্তি-দর্শনকে মনুষ্যজগতে প্রায় সকলেই মোহের অবস্থা অথবা দৃষ্টির ভ্রান্তি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। এডিথের উল্লিখিতরূপ মূর্ত্তি-দর্শনকেও সেইরূপ দৃষ্টির ভ্রম বলা যাইতে পারে। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরই এডিথ, যাহার স্নেহময় মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিল, তাহাতে কাহারও চিত্তেই কোনরূপ সংশয়ের আর সম্ভাবনা রহিল না। এডিথ তাহার সে প্রাণপ্রিয় মূর্ত্তি দেখিয়া, হর্ষবিস্ময়ে আত্মহারার মত, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"এ কি! বাবা, এ কি! একি গো বাবা! তুমি না বলিয়াছিলে জেনী এখনও রুগ্ন অবস্থায় আছে, এবং ক্রমে ভাল হইতেছে, এ কেমন কথা বাবা? এই ত জেনী,—এখানে—আমার দিকে চাহিয়া, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; এবং যাঁহারা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন, জেনীও ত তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিয়াছে?

বালিকা ইহা বলিয়া, যেন একটি সম্মুখস্থিত সুহৃজ্জন-সম্ভাষণের ভঙ্গীতে কহিতে

লাগিল।—"জেনী, বোন, তুমিও আসিয়াছ! তবে আমার আর ভয় কিংবা দুঃখ নাই। আমি তোমার সহিত প্রফুল্লচিত্তে চলিয়া যাইতে পারিব।" এস, জেনী, এস, এস।"

কথা সমাপ্ত হইল না। কথা ফুরাইবার পূর্ব্বেই বালিকা এডিথের বিকাসোন্মুখ-জীবন-লীলার সমস্ত আশা পৃথিবীর দিকে ফুরাইল। বালিকা, জেনীকে আলিঙ্গন করিবার ভঙ্গীতে, বাহু প্রসারণ করিয়া, তখনই চক্ষু বুজিল।

যাঁহারা কাছে ছিলেন, তাঁহাদিগের সকলেরই সেই সময়ের সেই আকুল, উদ্বেল ও শোকবিহ্বল প্রাণ, এডিথের তথাবিধ হর্ষের ভাব দর্শনে ও হর্ষ-গদ্‌গদ কথা শ্রবণে, অচিন্তিত শান্তি লাভ করিল। তাঁহাদিগের নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মিল যে, এডিথ একা এক অন্ধকার-প্রদেশে যাইতেছে না। পরিজনদিগের মধ্যে যাঁহারা বহুকাল অবধি পরলোকবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা এডিথকে আদর করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন; এবং এডিথের জীবন-সঙ্গিনী জেনীও তাঁহাদিগের সঙ্গে আসিয়া স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিয়াছে। তাঁহাদিগের ইহাও দৃঢ় বিশ্বাসে হৃদয়ঙ্গম হইল যে, মনুষ্যের দেহান্তর-প্রাপ্তি রূপান্তর-প্রাপ্তি মাত্র;—মনুষ্য, পৃথিবীতে যেমন থাকে, পরলোকে যাইয়াও ঠিক তেমনই থাকে; এবং পৃথিবীর স্নেহমমতা ও সৌহার্দ্দ-ভালবাসার সকল সম্পর্কই পরলোকে সজীব রহে।

এখানে কেবল এই একটি মাত্র প্রশ্ন হইতে পারে যে, এডিথ যে চরম-সময় তাহার প্রিয়সহচরী জেনীকে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা দৃষ্টিভ্রম নয় ত? মিনট স্যাভেজ বিশেষ প্রমাণের সহিত বুঝাইয়াছেন যে, উহা কোন ক্রমেই দৃষ্টিভ্রম হইতে পারে না। কেন না, এডিথ জেনীকে মৃত বলিয়া চিন্তা করিবার জন্য মুহূর্ত্তের তরেও অবকাশ পায় নাই। এমন অবস্থায়, জেনীর ঐরূপ প্রত্যক্ষ-দর্শন-লাভকে মনঃকল্পিত বলিয়া চিন্তা করা কোন ক্রমেই বিচার-সঙ্গত নহে।

বৃদ্ধ ইহার পর বলিলেন,—"বাছা, এডিথ যেমন আপনার জনে পরিবেষ্টিত হইয়া আনন্দের সহিত চলিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত অকাল-ছিন্ন শিশুই সেইরূপ আনন্দের সহিত চলিয়া যাইতেছে। তোমরা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ; সুতরাং তোমরাও, যাইবার সময়, স্নেহবদ্ধ আত্মীয়স্বজনের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া, আনন্দের সহিত চলিয়া যাইবে। শিশুর জন্য সন্তাপের কারণ নাই, তোমাদিগের জন্যও সন্তাপ কিংবা শঙ্কার কোন কারণ নাই। শঙ্কা ও সন্তাপ তাহাদিগের জন্য, যাহারা পৃথিবীতে থাকিয়া নিরন্তর দুষ্কৃতিতে ডুবিয়া রহে; এবং করুণানিধান ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া, স্বার্থপরতার অন্ধমত্ততায়, পরের প্রাণে আঘাত করিতে পারিলেই হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি বোধ করে।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "The English Diary of an Indian student, 1861—62. Being the Scribbling-Journal of the late Rakhal Das Haldar, with an introduction by Hari Nath De, M. A."

অধুনাতন বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ, যাঁহাদিগের মনস্বিতা ও কর্ম্মজীবনের অপরিলক্ষিত শক্তিপ্রভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত ও ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কলিকাতার অদূরবর্ত্তি জগদ্দল-নিবাসী রাখালদাস হালদার মহাশয় একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। হালদার মহাশয় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; এবং আপনার পবিত্র, প্রীতিময় ও উন্নতিশীল জীবনে, সিংহল ও ইংলণ্ড প্রভৃতি নানা স্থান-দর্শন, এবং বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে প্রবন্ধরচনা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে, পরলোক-গত হন।

ইংরেজী কিংবা বাঙ্গালায় হালদার মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিত হয় নাই। কিন্তু তিনি, ইংলণ্ডে থাকা কালে, প্রতি দিন যে দৈনিক-বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তাহাই সম্প্রতি, তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদারের যত্নে, উপরিলিখিত নামে, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; এবং ঢাকা কলেজের উর্দ্ধতন প্রফেসর, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মহাশয়ের লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত চারিত্রাখ্যাপক (Biographical) প্রবন্ধ উহাতে উপক্রমণিকাস্বরূপ সংযোজিত হওয়ায়, গ্রন্থের গৌরব বাড়িয়াছে।

সাধুসজ্জনের জীবনবৃত্তান্ত সকলেরই সুখপাঠ্য ও সুখ-সমালোচ্য। কিন্তু সে বৃত্তান্ত যখন ইংলণ্ডীয় সমাজ ও সভ্যতার আলোচনামূলক বিবিধ জ্ঞানগর্ভ কথার দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, তখন উহা অন্যপ্রকারেও উপকারজনক হইয়া থাকে। আমাদিগের ভরসা আছে, স্বর্গগত রাখালদাস হালদার মহাশয়ের এই ইংলণ্ডীয়-দৈনিক-পাঠেও এ দেশে বহু লোকের উপকার হইবে। হালদার মহাশয় কলিকাতা হইতে সামুদ্রযানে যাত্রা করিয়া সমুদ্রে ও সমুদ্রতটবর্ত্তি বিবিধ স্থানে যে সকল মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন, তাহার বর্ণনা প্রীতিকর,—কোন কোন স্থলে হৃদয়ের উদ্দীপক। আমরা স্থানের অভাবে গ্রন্থখানির সুবিস্তৃত সমালোচনা করিতে না পারিয়া দুঃখিত রহিলাম।

২। শ্রীরামচরিত, ৺ রাখালদাস হালদার প্রণীত।" রামচরিত ছয়ত্রিশ পৃষ্ঠাত্মক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও, সাহিত্যিক বিচারে ইহার মূল্য আছে;—বাঙ্গালা ভাষা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও কিরূপ সুন্দর গদ্যে শোভান্বিত হইয়াছিল, ইহাতে তাহার

পরিচয় আছে। গ্রন্থখানি, এ কথা ছাড়া, অন্য অংশেও শিক্ষার্থীর উপযোগী। শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার হালদার এই উভয় গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা সাহিত্যসেবীর কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

৩। "দীল্লিমহোৎসব-কাব্যম্। বিজয়িনীকাব্য-রচয়িতৃ শ্রীশ্রীশ্বর-বিদ্যালঙ্কার-বিরচিতম্।" আমরা বহুদিন হয়, পূজনীয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বিজয়িনীকাব্য পড়িয়া, বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম; সম্প্রতি তাঁহার দিল্লীমহোৎসব-কাব্য পাঠ করিয়াও অতি গভীর আনন্দ অনুভব করিলাম। এই কাব্য-সন্দর্ভ, দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত, ১৬৬ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত, বহুশতশ্লোকাত্মক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। বৃদ্ধকবি বিদ্যালঙ্কার, ইহার রচনায় যেমন দেখাইয়াছেন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক-পাণ্ডিত্য, তেমনই প্রদর্শন করিয়াছেন সংস্কৃতভাষার উপর আপনার অসাধারণ আধিপত্য।

লোকে ইদানীং বাল্মীকিব্যাসের সেই পুরাতনী সংস্কৃত-ভাষাকে মৃতভাষা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের এই বিচিত্র কাব্য পাঠ [illegible]ন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই[illegible]ন যে, সংস্কৃতভাষা এখনও মরে নাই, এবং মরিয়া যাইবে এমন লক্ষণাক্রান্তও হয় নাই। তর-তর-বাহিনী সজীবা স্রোতস্বিনী যেমন, আপনার উদ্বেল-তরঙ্গহৃদয়ের উপর, তৃণ-কাষ্ঠ ও পশুপক্ষীর মৃতদেহের বোঝা লইয়া, দুর্দম বেগে বহিয়া যায়, এবং অমেধ্য বস্তুর স্পর্শদোষে লাঞ্ছিত হইয়াও, স্বকীয় বেগাতিশয্যে পবিত্র রহে; কবিবর-বিদ্যালঙ্কারের লেখনীমুখোচ্ছলিত শুদ্ধ-সুললিত সংস্কৃতশব্দ-ধারাও সেইরূপ, স্থানে স্থানে অসংখ্য অনার্য্য শব্দে জড়িত হইয়া, প্রবল বেগে বহিয়া গিয়াছে, অথচ সংস্কৃত অংশে সর্ব্বতোভাবে আপনার অনবদ্য পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছে। আমরা এ কথার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে কএকটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।—

"'হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে' ধ্বনিরিতি তদা-
নন্দতঃ প্রাদুরাসীদ্।"
"তোপধ্বনির্দ্রাক্ পুনরেব জাতঃ
পুনর্বভৌ সৈন্যগণোঽপি ভাতঃ।"

দীল্লিমহোৎসব-কাব্যে শুধুই যে শব্দ-সম্পদের বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নহে। ইহার অনেক স্থলে কবিত্বশক্তিরও বিশিষ্ট পরিচয় আছে। এই প্রবীণ পণ্ডিত-কবি অদ্যাপি যে রাজপুরুষদিগের প্রসন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। যদি ইংলণ্ড তাঁহার জন্মস্থান হইত, তাহা হইলে, তিনি নিশ্চয়ই, মোক্ষমূলর প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিতদিগের ন্যায়, রাজকীয় বৃত্তি ও রাজদত্ত উপাধি লাভে সম্মানিত হইতেন; এবং তাঁহার তাদৃশ সম্মানে সমস্ত পণ্ডিত-সমাজ সংবর্দ্ধিত হইত। কাকিনার বিদ্যোৎসাহি-ভূপতি রাজা মহিমারঞ্জন রায় কবিবর বিদ্যালঙ্কারের প্রতিপালক বলিয়া পরিচিত। বিদ্যালঙ্কারের কাব্যনিচয় বহুকাল কাকিনার কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে শোভা পাইবে।

# হিন্দু ভিষক্ বিজ্ঞানের মৌলিকতা।

ইতিপূর্ব্বে অনেক প্রাচ্য পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে, ভারতবর্ষ, গ্রীস ও আরব দেশের নিকট ঋণী। অধিকাংশ প্রাচ্য পণ্ডিত রোম ও গ্রীস দেশীয় শাস্ত্রে দীক্ষিত ও শিক্ষিত। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অধুনা অনেক ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থের নষ্টোদ্ধার হইয়াছে এবং বৈদেশীকগণের লিপিবদ্ধ বিবরণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। বিদ্যার্থিগণ তাহা পাঠ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতবাসী আর্য্যগণ যেরূপ পৃথিবীস্থ অন্য যাবতীয় জাতির অগ্রগামী, চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়েও তাঁহারাই তদ্রূপ সর্ব্বপ্রথম জগতের সমক্ষে আলোক বর্ত্তিকা ধারণ করিয়া গিয়াছেন।

পবিত্র পঞ্চনদ প্রদেশে বাসকরা কালে, ভারতীয় আর্য্যগণ পৃথিবীর অন্য যাবতীয় জাতিগণ অপেক্ষা সভ্যতার অনেক উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহারা অন্য জাতীয় লোকদিগকে অত্যন্ত কৃপার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। বস্তুতঃ, অন্য জাতীয় লোক সকল তৎকালে ভারতীয় আর্য্যগণ অপেক্ষা এত হীনতর অবস্থায় অবস্থিত ছিল যে, ভারতীয় আর্য্যগণ কোন বিষয়ে ঐ সকল জাতি হইতে কোন প্রকার শিক্ষা পাইতে পারেন, এরূপ ধারণা কখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। এই নিমিত্তই প্রাচীন হিন্দুগণ নির্জ্জনে ও অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বকীয় সভ্যতা বিস্তার করিয়াছেন এবং এই কারণেই পৃথিবীস্থ অপর জাতীয় সভ্যতার সহিত তাঁহাদের সভ্যতার কোন প্রকার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। উক্ত অবস্থানুসারে ভারতীয় আর্য্যগণ যে অন্য জাতি হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।

পঞ্চনদ প্রদেশে ভারতীয় আর্য্যগণের সভ্যতার প্রথম অঙ্ক অভিনীত হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহারা যুদ্ধকুশল, কৃষিজীবী, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সুসভ্য ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাস দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, সভ্য ও অসভ্য উভয় অবস্থায়ই মনুষ্যমাত্র রোগ শান্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। ইতর শ্রেণীস্থ জীবগণের মধ্যেও শারীরিক উপদ্রব প্রশমনের চেষ্টা স্বভাবসিদ্ধ। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ চেষ্টা রীতিমত বিজ্ঞানে পরিণত হইয়া থাকে।

সর্ব্ববাদিসম্মত মতে হিন্দুদিগের ঋগবেদ জগতের প্রাচীনতম ইতিহাস বলিয়া পরি-

গৃহীত হইয়াছে। খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহার জন্ম হওয়া সম্বন্ধে প্রাচ্য পণ্ডিতগণও একবাক্যে মত প্রকাশ করিতেছেন। বস্তুতঃ ইঁহাই হিন্দু সভ্যতার প্রথম অঙ্কের ইতিবৃত্ত। ঐ সময় হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন হয় নাই। সমগ্র ভারতীয় আর্য্য জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি হলচালনা করিয়া কৃষিকার্য্য করিয়াছে এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উপাসনা করিয়াছে, এবং আবশ্যক হইলে, প্রত্যেকেই অস্ত্রশস্ত্রসহ অসভ্যজাতীয় লোকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় পরিবারবর্গ, কৃষিক্ষেত্র, গোধন এবং সভ্যতার ফল রক্ষা করিয়াছে। ঋগবেদের এক ঋষি স্বভাবসুলভ বিষাদ-মিশ্রিত সরলতাসহকারে সোমলতার উপাসনায় বলিয়াছেন যে, "আমি স্তোত্র রচনা করি, আমার পিতা চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং জননী যাঁতায় শস্য পেষণ করিয়া থাকেন। গাভীগণ আহার অন্বেষণে গোচারণের মাঠে যেরূপ ইতস্ততঃ বিচরণ করে, আমরাও তদ্রূপ বিভিন্ন ব্যবসায় দ্বারা সোম দেবতার উপাসনা করিতেছি।" উক্ত গ্রন্থে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এই মর্ম্মে উপাসনা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি এবং খঞ্জকে গতিশক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সোমলতারস, ওষধি এবং অপাক বহু-রোগনিবারক বলিয়া বর্ণিত ও উপাসিত হইয়াছে।

ফলতঃ হিন্দুজাতীয় চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ মধ্যে চরক, সুশ্রুত, অষ্টাঙ্গহৃদয় এবং নিদানই রীতিমত বিজ্ঞান শ্রেণীতে আসন পাইবার যোগ্য। এই সমস্ত গ্রন্থ মধ্যে চরক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। কিন্তু চরকের পূর্ব্বে অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারিত, ক্ষরপাণি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ চিকিৎসা বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কৃত গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। চরক অগ্নিবেশ কৃত গ্রন্থকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। চীন দেশীয় ত্রিপিতক গ্রন্থে কণিষ্ক রাজার সভায় চরক নামক এক চিকিৎসক থাকার কথা উল্লেখিত আছে। ঐতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, তিনি খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু এ স্থলে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পাতঞ্জল নামক ঋষি চরক গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন এবং উক্ত ঋষি যে খৃষ্ট জন্মের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। চরক পাঠে দেখা যায় যে, উহাতে মাত্র বৈদিক দেবতা ও মন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতার নাম গন্ধও নাই। বেদে যেমন মনুষ্যের কঙ্কাল সমষ্টির পরিমাণ ত্রিংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রোক্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানেও তাহার ঐ পরিমাণই নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। বেদে চরক নামের উল্লেখ আছে বটে; কিন্তু তথায় উহা ব্যক্তি বিশেষের নাম অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বংশ বিশেষের নাম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণিনি ব্যাকরণ অনুসারে চরক শব্দের অর্থ চরকের শিষ্যবর্গ। খৃষ্ট জন্মের

আট শত বৎসর পূর্ব্বে ঐ ব্যাকরণ রচিত হয়। ইহা অধুনা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ দ্বারাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, চীন দেশীয় ত্রিপতক গ্রন্থের উল্লিখিত চরক নামধারী চিকিৎসক চরক নামক চিকিৎসাগ্রন্থের প্রণেতা নহেন; তিনি হয় ঐ বংশীয় কোন ব্যক্তি, অথবা তাঁহার প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালীর অনুবর্ত্তী ব্যক্তি হইবেন। এই গ্রন্থের ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল যে, তাহা পাঠ করিতে বসিলে, পাঠকের মনে স্বতঃই উদিত হইবে, তিনি যেন বেদের ব্রাহ্মণ পাঠ করিতেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়, হিমাচল প্রদেশস্থ চিত্রকর নামক বন-প্রদেশে প্রজ্ঞাজনদিগের এক সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় অত্রেয়, শাকুন্তেয়, মদগোল্য, কৌশিক, ভরদ্বাজ, বিদেহাধিপ নিমি, ব্যাস এবং বাহ্লিক প্রদেশীয় কাঙ্কায়ন উপস্থিত ছিলেন। তথায় তর্ক বিতর্ক দ্বারা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছিল, তাহাই চরক নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সুশ্রুত অস্ত্র-চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। কিন্তু ইহাই যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের ঐ জাতীয় প্রথম গ্রন্থ, তাহা নহে। ফলতঃ চরক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান তৎকালে কায়-চিকিৎসা এবং ধন্বন্তরী সম্প্রদায় এই দুই প্রধান শখায় বিভক্ত ছিল। কায় চিকিৎসা বলিতে শারীরিক চিকিৎসা এবং ধন্বন্তরী চিকিৎসা বলিতে অস্ত্র চিকিৎসা বুঝায়। বেদেও ঐরূপ দুই বিভাগ থাকা দেখা যায়। হিন্দুগণ বলেন যে, দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। মহাভারতে সুশ্রুতকে বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কাত্যায়ন নামক ঋষি খৃষ্টের অন্ততঃ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎকৃত বর্ত্তিকা গ্রন্থে সুশ্রুত নামের উল্লেখ আছে। সুশ্রুত পাঠে দেখা যায় যে, কাশিরাজ নামক মুনি উক্ত গ্রন্থের তত্ত্ব সুশ্রুতের নিকট প্রকাশ করেন। চক্রপাণি দত্ত ১০৬০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের যে টীকা প্রণয়ন করেন, তাহা ভানুমতী নামে বিখ্যাত। ডল্বনাচার্য্য নামক ব্যক্তি সাহানসাহ নামক নৃপতির রাজত্ব কালে জীবিত ছিলেন। তিনিও নিবন্ধ সংগ্রহ নামক সুশ্রুতের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। ডল্বনাচার্য্যের পূর্ব্বে গয়দাস ভাস্কর ও মাধব প্রভৃতি মনস্বিগণ ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে টীকা প্রণয়ন করেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয় বাগভট্ট কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। উহা চরক ও সুশ্রুত অবলম্বনে রচিত। হারিত ও ভেল নামক ব্যক্তিগণের গ্রন্থ হইতেও কতক তত্ত্ব উহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, যদি কোন-গ্রন্থ প্রাচীন ঋষিগণের কৃত বলিয়া প্রামাণ্য রূপে গণ্য হয়, তবে ভেল প্রভৃতির গ্রন্থ অধীত না হইয়া কেবলমাত্র চরক ও সুশ্রুতের কৃত গ্রন্থ অধীত হওয়ার কোনই কারণ নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বাগভট্টের সময় চরক ও সুশ্রুত অত্যন্ত প্রাচীন অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল,

এবং তজ্জন্য গ্রন্থকার নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। তিব্বত দেশীয় তাঞ্জুর নামক গ্রন্থে চরক সুশ্রুত এবং বাগভট্টের উল্লেখ আছে। জর্জ্জ লুথ নামক প্রাচ্য পণ্ডিত গবেষণাদ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে। চীন দেশীয় টি-সিঙ্ নামক ভ্রমণকারী আয়ুর্ব্বেদের অষ্ট বিভাগের প্রণেতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই অষ্টবিভাগ "অষ্টাঙ্গহৃদয়" ভিন্ন আর কিছুই নহে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বুদ্ধদেবের স্তোত্র লিখিত হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল পরাক্রমের সময় এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

মাধবকর নিদান নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাও চরক এবং সুশ্রুত অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। বৃন্দ নামক ব্যক্তি চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধিযোগ নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা নিদান নামক গ্রন্থের অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। চক্রপাণি দত্ত বৃন্দকৃত গ্রন্থের অনুকরণে স্বীয় নামধেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণিদত্ত কোন সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, হারুণ অল রশিদ নামক খলিফা খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদ নগরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে চরক, সুশ্রুত ও নিদান আরব দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। তাঁহার সভায় মঙ্ক ও সালে নামক দুই জন হিন্দু রাজচিকিৎসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। সিরাপিয়ন, রাহাজেচ ও অভিসেন্না নামক আরব দেশীয় প্রাচীন লেখকগণ তাঁহাদের কৃত গ্রন্থে চরককে ক্রমান্বয়ে জারক, স্কিরক এবং স্কারক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হাজি খলিফা নামক পণ্ডিত খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে অবির্ভূত হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "কিতাব অল ফেরেস্ত" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হারুণ অল রসিদ মঙ্ক নামক হিন্দু চিকিৎসক দ্বারা সুশ্রুল নামক গ্রন্থ আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করাইয়া ছিলেন। এই "সুশ্রুল" যে সুশ্রুত নামের অপভ্রংশ মাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ করার অণুমাত্রও কারণ নাই।

মাসিডনের সুপ্রসিদ্ধ রাজা আলেকজাণ্ডার হিন্দু চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে গ্রীস দেশীয় চিকিৎসক সম্প্রদায় যে সমস্ত রোগ অপনয়ন করিতে অসমর্থ হইত, হিন্দু চিকিৎসকগণ তাহা অনায়াসে আরোগ্য করিতেন। নিয়রকস যে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সর্পদংশন রোগে গ্রীস দেশীয় চিকিৎসকগণের অণুমাত্রও অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু হিন্দুগণ তাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হইত। আরিয়ান বলেন যে, গ্রীস দেশীয় লোকেরা পীড়িত হইলেই হিন্দু চিকিৎসকগণের শরণাগত হইত এবং তাঁহারা অদ্ভুত কৌশলে তাহাদের রোগ দূর করিয়া দিতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু চিকিৎসকগণই সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতবীয় ঔষধের আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন ও তাহাদের প্রণীত অস্ত্রচিকিৎসা শাস্ত্রে ১২৭ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ ও কঠিন কঠিন রোগ সম্বন্ধে অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। হিন্দু-চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বায়ু, পিত্ত, কফ এই ধাতু দ্বারা মানব দেহ নির্ম্মিত এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও উক্ত তিন ধাতুর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে প্রকাশ পায় যে, মনুষ্য শরীরস্থ ধাতু বিপর্য্যয় দ্বারা রোগের উৎপত্তি হয়। পানিণিকৃত ব্যাকরণে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রয়োগ থাকা দেখা যায়, এবং তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, গ্রন্থকর্ত্তার জীবিতকালে ভারতবর্ষে রীতিমত চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

গ্রীস দেশীয় চিকিৎসকগণ বলেন, পিত্ত কফ শোণিত এবং জল এই চারি পদার্থ দ্বারা মনুষ্য শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে। পিথেগোরাস নামক পণ্ডিত গ্রীস দেশীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে হিন্দুচিকিৎসকগণের যে সময় নিরূপণ করা গিয়াছে, গ্রীস দেশীয় প্রথম চিকিৎসক তাহার অনেক পরবর্ত্তী।

বস্তুতঃ, হিন্দু সভ্যতার প্রথম অবস্থায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের তাদৃশ প্রাধান্য লাভ করা পরিলক্ষিত হয় না। যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে এতদ্দেশীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান সংকলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অথর্ব্ববেদই সর্ব্বপ্রধান। উক্ত গ্রন্থে যাদুবিদ্যা, প্রেতবিদ্যা, বশীকরণ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বিষয়ের অবতারণা আছে; এবং প্রকৃত চিকিৎসাতত্ত্ব ঐ সকলের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। পবিত্রচেতা ভারতীয় আর্য্যগণ এ নিমিত্তই অথর্ব্ববেদকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। চরকের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই ঐ তাচ্ছিল্য ভাব বিদূরিত হইতেছিল; এবং তন্নিমিত্তই ঐ গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ এবং দেবতাগণের প্রকাশিত তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। সুশ্রুতের সময় চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ আদরণীয় হইয়াছিল যে, ঐ গ্রন্থের প্রণেতা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অনাদি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গস্বরূপ সৃষ্টি করা বলিয়া বর্ণনা করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতীয় আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে চিকিৎসা-বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া উহার অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। যে কারণেই হউক, জ্যামিতি জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের ন্যায় কালক্রমে উহার অধঃপতন হইতে আরম্ভ হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় দশম হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ঐ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। ইংরেজ জাতির আগমনের সময় ভারতবর্ষে এই শাস্ত্রের এত অবনতি সংঘটিত হইয়াছিল যে, মোগল সম্রাটগণ পীড়িত হইলে, হিন্দুচিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া, ইংরেজ ডাক্তারের শরণা-

পন্ন হইতেন। অস্ত্রচিকিৎসার এত অবনতি ঘটিয়াছিল যে, ঐ ব্যবসায় অশিক্ষিত ক্ষৌর-কারবর্গের এক চেটিয়া হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তৎকালে শবচ্ছেদ সম্বন্ধে হিন্দু ছাত্র মণ্ডলী ও তাহাদের অভিভাবকগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ সময় সৎসাহসী ৺ মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় সর্ব্বপ্রথম শবচ্ছেদন করিয়া এ দেশীয় ছাত্র-বর্গের কুসংস্কার দূর করিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎকালে এই কার্য্য এত অসাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল যে, মধুসূদনের সম্মানার্থ শবচ্ছেদন সময়ে তোপধ্বনি করা হইয়াছিল।

অধুনা ভারতবর্ষে নবজীবনের সঞ্চার হওয়া দেখা যাইতেছে। এ সময় আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ-প্রদত্ত এই অমূল্য বিজ্ঞান আলোচনা করা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী চিকিৎসকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এতদ্দ্বারা কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমস্ত জগতের উপকার সাধিত হইবে। অপিচ নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার দ্বারা অধ্যয়নার্থীর জ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইবে।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত বি, এল,।

# এ পারে ওপারে।

নয়নের অগোচর সে দেশ কেমন,
যে দেশে গিয়াছ তুমি?
সে দেশে কি আছে স্থাবর জঙ্গম,
এমনি কঠিন ভূমি?
সেথা তোমাদের, কেমন সে দেহ,
এমনি শোণিত বয়?
সেথা তোমাদের কেমন হৃদয়,
এমনি মমতা-ময়?
সেথাকার আঁখি খুলিয়া তোমরা
হেথায় পানে কি চাও?
হেথা [illegible]তের বিলাপ করুণ
সেথা কি শুনিতে পাও?

স্বপ্নাবেশে খুকী ফুলাইয়া ঠোঁট্
কেঁদে কেঁদে ডাকে "মাগো ওঠ্ ওঠ্"
স্নেহময়ি, তুমি শুন না?
প্রতি ডাকে তার ফাটে বক্ষ মম,
কি যাতনা সহে তব প্রিয়তম,
প্রেমময়ি, তুমি বুঝ না?

ওপারের লোক এপারের কথা
কিছুকি শুনিতে পায় না?
নর-জগতের মরমের ব্যথা
কিছুই কি সেথা যায় না?

২

পেতেছিলে হেথা সুখের সংসার

ভেঙ্গেচুরে দিয়ে খেলা আপনার
কোথায় চলিয়া গেলে।
চলেছিনু পথে করে গলাগলি,
মাঝখানে তুমি কোথাগেলে চলি,
আমারে একাকী ফেলে ?
এই দীর্ঘপথ দুজনায় যুটী,
চলেছিনু কত সুখে ছুটাছুটী,
পদচিহ্ন আছে দুজনার ;
এক পা সম্মুখে সুধু আমি একা
কোথাগেলে তুমি নাহি পাই দেখা,
কোথায় খুঁজিলে পাব আর ?
একটি মধুর ত্রিতন্ত্রীর তান,
একটি নির্ম্মম বাঁশরীর গান,
হৃদয় কাড়িয়া গিয়াছে চ'লে,
ওপারে গিয়াছে জীবনের সুখ,
এপারে র'য়েছে সুধু ম্লান-মুখ,
চির-সিক্ত হবে নয়ন জলে।

শ্রীমনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা।

# ব্রহ্মদেশের কাহিনী।

৩

বিবাহ—জীবজগতের উন্নতির নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি। ইতর প্রাণীদিগের ন্যায় যথেচ্ছাচারী না হইয়া মানব মানবী যে পবিত্র সম্মিলনে সম্মিলিত হয়, তাহার নাম বিবাহ। বৈধ সম্মিলনে দেব ভাবের প্রকাশ পায়, অবৈধ সম্মিলন পাশববৃত্তির পরিচয় দেয়।

এই দেশে বিবাহ পদ্ধতি একটুকু স্বতন্ত্র। ইহার কএকটি কার্য্য পাশ্চাত্য প্রথানুসারে, আর কোন কোন প্রক্রিয়া ভারতীয় রিত্যানুসারে সম্পাদিত হয়। স্ত্রী নির্ব্বাচনের ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বে যে বালকের বিবাহ হয়, কন্যানির্ব্বাচনের ভার পড়ে পিতা মাতার হস্তে ; কিন্তু যুবকদিগের পরিণয় সময়ে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। সেই অবস্থায় পতি পত্নীর পূর্ব্বসাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় নিতান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বে যুবকদিগের বিবাহের বয়স ছিল ২৪ বৎসর ; এখন ২০ ( বিশের ) নীচে নামিয়াছে। কিন্তু সংসার পত্তনের উচিৎ বয়স না হইলে নাবালিকা অবস্থায় বালিকাদিগের কখনও বিবাহ হয় না। এই নিমিত্ত এই দেশে সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বয়স বেসী দৃষ্ট হয়। বালিকাগণ যুবতী হইয়া পতির সংসারের ভার বহন করিবার পূর্ণ ক্ষমতা জন্মিলে তখন তাহারা পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হয়। এ দেশে স্ত্রীজাতি "পর্দ্দানসীন" নহে। সুতরাং পুরুষের ন্যায় স্ত্রীরাও যথায় তথায় স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে। জীবনের চিরসঙ্গী স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় বলিয়া বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা আরও স্বাধীন ভাবে ক্রীড়াস্থলে, বন্ধুগৃহে, ভোজে ও উৎসবাদিতে যুবক বৃন্দের সহিত মিলা মিশা করে। কিন্তু এ হেন অব-

হারও তাহারা প্রায় ব্যভিচারিণী হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে যদি কোন যুবক তাহাদিগকে আবিল-নেত্রে দর্শন করে তখনই তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, এবং আজীবন এহেন পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত দর্শন করিতে চাহে না।

প্রণয়িনী যেরূপ সর্ব্বক্ষণ প্রণয় পাত্র খুঁজিয়া বেড়ায়, প্রণয়ীও সেইরূপ অনুক্ষণ পরস্পরের সাক্ষাৎ সম্মিলন কামনা করে। এই পার্থিব রাজ্যে ঈশ্বর কখনও কাহার বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। হাটে মাঠে যথায় তথায় এবং নানা কার্য্যের উপদেশে যুগল রূপের সম্মিলন হয়। সম্মিলন স্থান প্রণয়-পাত্রকেই ঠিক করিয়া লইতে হয়। যুবতীরা সেই স্থানে যাইয়া যুবকের সঙ্গে একত্র হয়। যুবতীরা হাটে বাজারে চুরট ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় করে, যুবকগণ সেই স্থানে যাইয়াও তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া আসে। যুবক যুবতীর সম্মিলন স্থানে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের যাইবার অধিকার নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও তাঁহাদের তাহা অপরিজ্ঞাত থাকে না।

রমণী যুবককে পতিভাবে গ্রহণ করিবার সম্মতি দিলে অটল ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ যুবক যুবতীকে ও যুবতী যুবককে প্রীতি উপহার প্রেরণ করে। উপহার দ্রব্য অতি সামান্য; কিন্তু সামান্য হইলেও আদরের বস্তু অতি যত্নের সহিত গৃহিত হয়। ইহার পর আদান প্রদানে, নির্জ্জন ভ্রমণে, প্রণয় কাহিনী শ্রবণে কিছুকাল কাটিয়া যায়। যখন পরস্পরে বুঝিতে পারিল যে, সংসার পত্তনের সময় হইয়াছে; এবং পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে শিখিয়াছে, তখন পুত্র পিতার নিকট ও কন্যা মাতার নিকট বিবাহের সম্মতি প্রার্থনা করে। এই স্থানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে, প্রায়শঃই এই সম্মতি প্রদত্ত হয়। দৈবপ্রতিকুলতাবশতঃ যদি এরূপ বিবাহে পিতা মাতা সম্মতি না দেন, যুবক যুবতীরা স্থানান্তরে পলাইয়া যাইয়া বিবাহ করে; এইরূপ বিবাহকে পলাতক বিবাহ ( Runaway-marriage ) বলে। এইরূপ স্থলে পুত্র কন্যার অবাধ্যতা দর্শনে পিতা মাতার রাগ জন্মে ঘটে, কিন্তু কিছুকাল অতীত হইলে তাহাদের ক্রোধানল ক্রমে মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন পুত্র কন্যার অনুনয় বিনয়ে পুনঃ মাতৃ পিতৃ হৃদয়ে অপত্য স্নেহ জাগিয়া উঠে। তখন তাহারা বিনা আপত্তিতে গৃহে নীত হয়। বলিয়াছি ব্রহ্ম রমণীদিগের স্বভাব বড়ই উদ্ধত, তাহাদের ঈপ্সিত কার্য্যের কোনরূপ বাধা পড়িলে একবারে আত্মহারা হইয়া যায়। নির্দ্ধারিত বিবাহে পিতা মাতা সম্মতি না দিলে অনেক সময় তাহারা আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিবার চেষ্টা করে। ভারতীয় প্রথানুসারে বিবাহে শুভদিন ও শুভ লগ্নের প্রয়োজন হয়। জন্ম বাসর গণনা করিয়া জ্যোতিষবেত্তা বিবাহের দিন নিরূপণ করেন। যে যুবকের জন্ম শনিবার সে কখনও শুক্রবারে জন্ম রমণীকে বিবাহ করিবে না, কারণ এইরূপ অবৈধ পরিণয়ে উত্তরোত্তর

প্রাণনাশ হয়। স্ত্রী পুরুষের জন্মবার একই হইলে, সম্মিলন-সুখ অবিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া, সকলের এইরূপ বিবাহেই যত্ন ও চেষ্টা বেশী।

কথায় বলে—

শনি গুরু বার দ্বয়,
সর্প ও মূষিক হয়;
নাহি এত মন্দ বার,
জীবন করে সংহার।

শনির অধিনায়ক সর্প এবং গুরু বারের অধিনায়ক মূষিক, পরস্পরের খাদ্য খাদক সম্বন্ধ থাকাতে, এই অকল্যাণকর বারদ্বয়-জাত স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন, নিতান্ত অশুভ-জনক বলিয়া তাহারা উহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করে।

বিবাহ হয় কন্যার পিতৃভবনে; কিন্তু ভোজের আয়োজন ও বিবাহের সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করিতে হয় বর কি বরের অভি-ভাবকদিগকে। উভয় দলের সমস্ত বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্ব নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ-সভায় সমাগত হয়। বহু লোকের একত্র সম্মিলনে বিবাহ-সভায় তিলমাত্র স্থান থাকে না। এই লোক-সমুদ্রের মধ্যে নবদম্পতি কর-তলের উপর করতল বিন্যস্ত করিয়া, একাসনে উপবিষ্ট হইয়া, বিবাহ-সভার শোভা বর্দ্ধন করে। তাহার পর তাহাদের একপাত্রে ভো-জন। একটি সুন্দর পরিষ্কৃত ভোজনপাত্রে নানাবিধ রসনাপ্রিয় খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে সজ্জিত থাকে। মধ্যে মধ্যে যুবতী আদর করিয়া এক এক গ্রাস স্বামীর মুখে তুলিয়া দেয়, এই আদরের প্রতিদানস্বরূপ, স্বামী আবার আর এক গ্রাস প্রণয়িনীর মুখবিবরে পুরিয়া দেয়। তখন উভয়ের মুখ দিয়া হাসির তরঙ্গ ছুটে। নিমন্ত্রিত দর্শকবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নানাবিধ কৌতুক কথার অবতারণা করে। পরে প্রাণ খুলিয়া সকলে খাইতে বসে। ইহাই বিবাহের শ্রেষ্ঠ আনুষ্ঠানিক কার্য্য; এবং উপস্থিত সভ্যদিগের ভোজন, আমোদ আ-হ্লাদ ও কথোপকথনই বিবাহ-প্রচারের প্রধান প্রক্রিয়া। এই স্থলে এই দেশবাসীর খাদ্য দ্রব্যের আর একটু পরিচয় দিব। সিদ্ধ চাউলের ব্যবহার এ দেশে নাই; সকলেই আতপ চাউলের অন্ন খাইয়া থাকে। চাউল গুলি বড়ই পরিষ্কার, জলও সেইরূপ নির্ম্মল। কিন্তু অপর খাদ্যদ্রব্যের নাম শুনিলে ন্যক্কার উঠে। জীবন হত্যা করিয়া মাছ মাংস ভক্ষণ করা এ দেশে একটি মহাপাপ। সুতরাং যত পচা জিনিসই বাজারে বিক্রীত হয়। পচা বরাহ মাংস ইহাদের একটি প্রিয় খাদ্য। কু-রগী, অজা, ঘোড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি যাহাই মরিবে, শকুনী, গৃধিনী, শৃগাল, কুকুর কাহারও ভাগ্যে উহার ভাগ পাইবার সুযোগ নাই, সকলই ইহাদের জঠরানলে আহুতি পড়ে। আম, জাম প্রভৃতি বৃক্ষের কচি পত্রও ইহারা খাইয়া থাকে। ইহাদের আর একটি উপা-দেয় খাদ্য সিদ্ধ তেঁতুল পত্র। বহু দূর হই-লেও অঙ্গনাগণ দলে দলে তেঁতুল পাতা পাড়িবার নিমিত্ত চলিয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা ইহাদের আর একটি প্রধান খাদ্য "নাপ্পি।" "নাপ্পি" প্রস্তুতের নিয়ম এইরূপ,—বৃহদাকা-

রের মাছগুলিকে লবণ মাখাইয়া হাঁড়ির মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। যখন হা পচিয়া চারিদিকে দুর্গন্ধ বিস্তার করিতে থাকে, এবং হাঁড়ি মুখে পোকা নির্গত হয়, তখন তাহা পেষিয়া রৌদ্রে অর্দ্ধ শুষ্ক করিয়া লইলেই "নাপ্পি" প্রস্তুত হইল। "নাপ্পি" ঘৃতের ন্যায় ভাতে মাখাইয়া খাইতে হয়। সচরাচর হাটে, বাজারেও "নাপ্পি"র ক্রয় বিক্রয় হয়।

বিবাহের পর পিতা মাতার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া যুবককে দুই তিন বৎসর সস্ত্রীক শ্বশুর ভবনে থাকিতে হয়। শ্বশুর বাড়ীর সুখের অবস্থান কালে জামাতা যাহা অর্জ্জন করে, তাহা শ্বশুরেরই প্রাপ্য এবং জামাতাও সেই পরিবারের লোক বলিয়া পরিচিত।

এই দেশে বহু বিবাহ অবৈধ কার্য্য না হইলেও, প্রায় লোকে আমরণ একস্ত্রীতেই অনুরক্ত থাকে। রাজাদিগের বহুমহিলা ছিল। তাঁহাদের অধঃপতনের একমাত্র কারণ ব্যভিচার দোষ। অতি সুন্দরী রমণী পাটেশ্বরী রাণী "সুফিয়েনী" বর্ত্তমান থাকিতেও ভূতপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়পরায়ণ রাজা থিবুর ৫৩ জন মহিষী ছিলেন। ইঁহাদের গর্ভজাত সন্তান সন্ততি ১১০ জন, তবুও রাজা উপপত্নী সম্ভোগলালসা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই এই দেশবাসীরা রাজাকে দেবতার ন্যায় মান্য ও ভক্তি করিত; এইনিমিত্ত তাঁহাদের সকল দোষ পরিহার্য্য ছিল। রাজাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সার্ব্বভৌমিক ক্ষমতাই তাঁহাদিগকে অধঃপতনের পথে টানিয়া নিত।

ব্যক্তিসাধারণের মধ্যে নিয়ম আছে, স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মনোমালিন্য জন্মিলে, স্ত্রী স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃষ্ট কারণ অভাবে ত্যাগ করিতে হইলে, ত্যাগকারীর ত্যাজ্যকে প্রচুর অর্থ দিতে হয়, এবং ত্যাগপত্রে গ্রামের প্রধান প্রধান বয়োবৃদ্ধ লোকের স্বাক্ষর আবশ্যক করে। এই দেশে স্ত্রী পুরুষের বিবাহসংস্কার একটি চুক্তি বিশেষ হইলেও, এবং ত্যাগ করিবার বিধি বিধান থাকিলেও, বহু দিনের সৌহার্দ্দ ভুলিয়া কেহ পবিত্র বন্ধন সহজে ছিন্ন করিতে চাহে না। ইহারা মনে করে, ইহা অপেক্ষা দুঃখাবহ ঘটনা মানবজীবনে আর কিছুই হইতে পারে না। বিবাহভঙ্গের পর সন্তানসন্ততির এইরূপ ভাগ হয়,—কন্যা থাকিলে, সে পড়ে মাতার অংশে, পুত্র থাকিলে পড়ে পিতার অংশে। পিতার সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার সমান অধিকার। কন্যার বিবাহ হইয়া গেলেও সে স্বত্বের কোনরূপ ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীর কোনরূপ অধিকার নাই।

গৃহস্থ পরিবার মধ্যে ব্যভিচারিণীর সংখ্যা অতি বিরল। কিন্তু সতীত্ব রক্ষার এতগুলি সুন্দর নিয়ম থাকা সত্বেও, এ দেশে বারাঙ্গনার সংখ্যা কম নহে। অনেকগুলি যুবতী আছে যাহারা আজীবন কুমারী অবস্থায় থাকিতে ভালবাসে। তাহারা মনে করে পতি গ্রহণ করা একটি বিড়ম্বনা মাত্র। এইরূপ অবিবাহিতা কুমারীদিগের নাম "আ-

পিয়া"। যে "আপিয়া" গোপনে প্রেম বিলাইতে আরম্ভ করে, আর একটু বেসী প্রকাশ হইলে, সে সেই গোপন ভাব পরিত্যাগ করিয়া একবারে বারাঙ্গনা শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়া পড়ে। তখন পবিত্র কুমারী "আপিয়া" নামের পরিবর্ত্তে তাহার আর একটি নাম হয় "নানি"। পরের মন ভুলাইতে হইলে কৃত্রিম সাজসজ্জার আবশ্যক হয়। "নানিগণ" সর্ব্বাঙ্গে পাউডার মাখিয়া, মাথায়, কর্ণে, কণ্ঠে, ফুলের ভূষণে ভূষিত হইয়া, রাস্তার ধারে দোকান সাজাইয়া বসে। দিন রাত্রি ভেদ নাই, পুরুষ দেখিলেই কটাক্ষ করে। লজ্জার কথা, কখন কখন হাত ধরিয়া আপন গৃহের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

অনেক "আপিয়া" আছে যাহারা কখন বারাঙ্গনা শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে চাহে না। তাহারা সখের গোলাপ—চুক্তি মত আজ তোমার, কল্য তাহার, পরশ্ব আর এক জনের গৃহিণী সাজিয়া ঘর কন্না করে, চুক্তি শেষ হইলে চলিয়া যায়। বিদেশী প্রবাসীদিগের পক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা একরূপ মন্দ নহে; বিপদ এই,—ব্রহ্মা রমণীকে গৃহিণী করিবার পূর্ব্বে তুমি মুসলমান হও, কিম্বা ইংরেজ কি হিন্দুই হও, মুখে যদি শ্মশ্রু থাকে, তাহা অগ্রে মুণ্ডন করিতে হইবে, কারণ ব্রহ্মাস্ত্রীলোকেরা পুরুষের দাঁড়িকে বড়ই ভয় করে। দেখিবা মাত্র মুখ ফিরাইয়া [illegible] যায়। আজকাল অনেক বিদেশী লোক চাকরি ও অন্যান্য কার্য্যানুরোধে ব্রহ্মা ও রেঙ্গুণে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের প্রবাসবাসের সুবিধার জন্য তাঁহারা "আপিয়া" চাকরাণী রাখিয়া থাকেন। এই "আপিয়া" চাকরাণী, কিছুদিন পরে, ঠাকুরাণী সাজিয়া, তাঁহার শয্যা-সঙ্গিনী হয়; এবং ক্রমে পুত্র কন্যার জননী হইয়া, গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রবেশ করে। আবার প্রবাসী প্রবাসবাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহাভিমুখী হইলে যে স্থানের জীব সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে। যুবতীর যদি যৌবন থাকে, তাহা হইলে আর একজনের অঙ্কশায়িনী হইয়া, আবার সংসার পত্তনের সূত্রপাত করে; নতুবা পুত্র কন্যা লইয়া মজুরী করিয়া পাপজীবন অতিবাহিত করে।

উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দ্রব্য—পূর্ব্বে আমরা এই স্থানের উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পদার্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠক সমীপে উপস্থিত করিয়াছি, এইস্থলে তাহা আর একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। যে দেশে বসুন্ধরা নিত্যপ্রসবিনী, সে দেশ নিরন্তর ঐশ্বর্য্যশালিনী। কৃষিপ্রধান ব্রহ্মদেশের সমতল ভূমিখণ্ড আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও তাহার ¾ অংশে ধান্য উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্রগুলি অনুর্ব্বর নহে। ইরাবতীর পর্য্যাপ্ত বারি ও পর্ব্বত-নির্ঝরিণী ক্ষেত্রগুলিকে সিক্ত ও উৎপাদিকা শক্তি প্রদান করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সামান্য উদ্যোগ ও চেষ্টা দ্বারা প্রচুররূপে ফসল উৎপন্ন হয়, জল সেচনের প্রয়োজন হয় কেবল উচ্চ ভূমিতে।

বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে এইস্থানে দক্ষি-

পানিল বহিতে থাকে, সেই সময় নদীতে জলের আধিক্য হেতু নিম্নতর ক্ষেত্রগুলি অন্তঃসলিলা হয়। মাটী সিক্ত হইয়া কোমল হইলে সামান্য কর্ষণ দ্বারা ভূমি শীঘ্র বপনোপযোগিনী হইয়া উঠে। বীজ উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইবার অনতিকালমধ্যেই অঙ্কুরিত হয়, উচ্চ পাদান স্থানে চারাগুলি বর্দ্ধিত হইলে, কামিনীরা কোমল হস্তে সেইগুলি উঠাইয়া রোপণ স্থলে লইয়া যায়। যে দেশের নারীজাতি, দৃশ্য শোভা পরিবর্দ্ধনের উপকরণ না হইয়া, পতির কার্য্যক্ষেত্রের সহায়কারিণী হয়, সে দেশ যে শীঘ্র সমুন্নত হইয়া ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বলা নিষ্প্রয়োজন, ব্রহ্মারমণীর ন্যায় শ্রমসহিষ্ণু ও কার্য্যক্ষম নারী জাতি অতি অল্প মাত্রই আছে। তাহারা সারাদিন ক্ষেত্রে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কার্য্য করে। প্রচলিত কথা, "স্ত্রীর ভাগ্যে ধন" এই বাক্যের সার্থকতা কেবল এই দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঝড়, বৃষ্টি মাথায় করিয়া কামিনীরা ক্ষেত্রের সর্ব্ব গাত্রে ৫।৬ ইঞ্চি অন্তর এক একটি গর্ত্ত করে। এইরূপে সমস্ত ভূমি প্রস্তুত হইলে, দুই দুইটি ধান্যের চারা ঐ সমস্ত গর্ত্তে রোপণ করে। বীজ দেওয়ার পর হইতে নিষ্কর্ম্ম পুরুষেরা সমস্ত কার্য্য-ভার স্ত্রীকন্যার মস্তকে চাপাইয়া দিয়া মাঠ হইতে অবসর গ্রহণ করে। ক্ষেত্রের সঙ্গে তাহাদের আর একবার সাক্ষাৎ হয়, ধান্যগুলি যখন পাকিয়া উঠে। কিন্তু দক্ষিণ ব্রহ্মার লোকেরা অপেক্ষাকৃত শ্রমশীল। তাহারা চাষের কার্য্যে অবলা ও বালক বালিকার সাহায্য পারত পক্ষে গ্রহণ করে না। এইদেশে ধান্যের মূলকাটার নিয়ম নাই, শীর্ষ মাত্র কাটিয়া লওয়া হয়; অবশিষ্টাংশ মাঠে পড়িয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসের তীব্র রৌদ্রে খড়গুলি শুষ্ক হইলে, অগ্নিদ্বারা সেই গুলি পোড়াইয়া সার করা হয়; এবং বর্ষার সময় লোকে তাহা মাঠে ছড়াইয়া দিয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে। কাটা ধান্যের পালা সজ্জিত করিয়া রাখা হয়।

ধান্য মাড়াইবার প্রক্রিয়া বঙ্গদেশের ন্যায়। একটি পরিষ্কৃত স্থানের মধ্যে একটি খুঁপ বা স্তম্ভ থাকে; তাহার চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ধান্যের উপর গরু দুই তিনটি ধীরে ধীরে পরিচালিত হয়। পরে কুল করিয়া এক উচ্চ স্থান হইতে বাতাসের অভিমুখে ধান্য ছাড়িয়া দিয়া খোসা উড়াইয়া ধান্য পৃথক করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

এই দেশের ক্ষেত্র সমস্ত একফসলী। লোকেরা ইহাতেই পরিতুষ্ট। ধান্যবীজ বপন করা যায় জ্যৈষ্ঠে, রোপণ কার্য্য শেষ করা হয় ভাদ্রে, কাটা হয় পৌষে, এইরূপ ভূমিতে প্রতি বিঘায় প্রায় ৮০ হইতে ১০০ মন পর্য্যন্ত ধান্য উৎপন্ন হয়। প্রতি মণ এক টাকা করিয়া বিক্রয় করিলেও কৃষকের যথেষ্ট লাভ দাঁড়ায়; সুতরাং দ্বিফসলের প্রয়োজন হয় না।

ধান চাউলের ব্যবসায় যেমন বিশেষ লাভজনক, তেমনি আবার কার্য্য-প্রণালীও অতি সহজ। এই দেশ, একমাত্র এই ব্যবসায় দ্বারা, উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরো-

হণ করিতে পারিত, যদি পুরুষগুলি মিতব্যয়ী হইত ও তাহাদের প্রকৃতিগত অলস ভাব পরিহার করিতে শিখিত। হাতে যে পর্য্যন্ত কপর্দ্দকমাত্র সঞ্চিত থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহারা জুয়াখেলার আড্ডা পরিত্যাগ করে না। তাহাদের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহাদিতেও অল্প ব্যয় হয় না।

প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গ প্রজাবর্গকে আদর্শ দেখাইবার নিমিত্ত স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেন। প্রাতঃস্মরণীয়া সীতাদেবী রাজর্ষি জনকের এই শ্রমলব্ধ সম্পত্তি। বর্ত্তমান্ নৃপতিদিগের মধ্যে এইরূপ চাষামিতে-প্রবৃত্তি আছে কি না জানি না, কিন্তু এখনও চীন ও ব্রহ্মদেশে রাজপরিবার মধ্যে এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। চীন সম্রাটের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজ হস্তে লাঙ্গল ধরিয়া প্রজাবৃন্দকে কৃষি কার্য্যে উৎসাহ দেন। ব্রহ্মরাজও কৃষি-বৎসরের প্রারম্ভে এক শুভ দিনে স্বীয় হস্তে ভূমিকর্ষণ করিতেন। সাধারণের বিশ্বাস ছিল, ভূপতি অগ্রে ভূমিতে লাঙ্গল দিলে, বসুন্ধরা শস্যপ্রসবিনী হন। এই দেশে এত ধান্য জন্মে যে, ৫০ খানা কলেও কাজ করিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। বৎসর বৎসর এই স্থান হইতে বহু লক্ষ টাকার চাউল ইউরোপ, আমেরিকা ও চীন প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হয়। আজকাল ঘন ঘন মন্বন্তর হওয়াতে ভারতবর্ষও ব্রহ্মদেশের কাছে ঋণী হইয়াছে।

কেরল ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের মধ্যে হলপ্রবাহের রীতি নাই। তাহারা পাহাড়ের বনজঙ্গল কাটিয়া পোড়াইয়া ভূমি আবাদ করে, পরে ফসলী বর্ষের আরম্ভে তাহাতে নানাবিধ শস্যের বীজ বপন করে। সাধারণতঃ পাঁচ মাসের মধ্যে শস্য সকল পক্ক হইয়া কর্ত্তন করিবার উপযোগী হয়। পর বৎসর আর এক নূতন স্থান ঐরূপ পরিষ্কার করিয়া আবাদ করে। কিন্তু ইহাতে বন-বিভাগের বড়ই অনিষ্ট হয় বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট এখন তাহাদের "জোম" করিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। এই সীমা অতিক্রম করিয়া এখন তাহারা যথায় তথায় বনজঙ্গল নষ্ট করিতে পারে না।

ব্রহ্মদেশে ধনাগমের আর একটি উপায় বনবিভাগ। এই স্থানে এত সেগুন বৃক্ষ জন্মে যে, তুলনার সমালোচনায় পৃথিবীর কোন অংশ ব্রহ্মার সমকক্ষ হইতে পারে না। বৎসর বৎসর বহু লক্ষ টাকার কাষ্ঠফলক এই স্থান হইতে নানা দেশে প্রেরিত হয়। এই নিমিত্ত ধান চাউলের ব্যবসা হইতেও লোকে ইহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকে।

লজ্জানিবারণের জন্য ব্রহ্মবাসীরা কখন পরমুখাপেক্ষী হয় না। তাহারা অন্যের বুনন করা বসন পরিধান করে না। গৃহে অন্য আসবাব কিছু না থাকিলেও, তাঁতের কল এক একটি সকল বাটীতেই থাকে। স্ত্রী পুরুষ সকলেই বস্ত্র বয়ন করিতে জানে। কিন্তু এই কার্য্যে রমণীকুলই অধিক দক্ষ। স্বীয় স্বীয় রুচি অনুসারে তাহারা নানা প্রকার রেসমী কাপড়ও প্রস্তুত করে। গুটী পোকা পোষণ একটি দেশময় ব্যবসা। তাহাতে লাভও

বিস্তর হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা নিষ্ঠুরতার কার্য্য বলিয়া অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি এই-কার্য্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অ-হিংসা যে ধর্ম্মের বীজ-মন্ত্র, অগণিত সংখ্যায় জীবকুল ধ্বংস করিয়া,ক্ষণভঙ্গুর দেহের শোভা বর্দ্ধন করা নিতান্ত অন্যায় বোধে, সেই ধর্ম্মা-বলম্বীরা গুটী পোকা পোষণকারীদিগকে ধীবর ও ব্যাধের সংঙ্গে তুলনা করিবেন, বিচিত্র কি? লোকে এরূপ করে বটে, কিন্তু কাহারও রেসমী বস্ত্র অন্ততঃ একখানা না হইলে হয় না। যা-হারা তন্তুকীট পোষণ করে, তাহাদের ন্যায় হেয় ও নিকৃষ্ট জাতি এ দেশে আর নাই। তাহাদের বসতি স্থানও লোকালয় হইতে বহু দূরে, পর্ব্বত প্রান্তে। কতকগুলি অসভ্য বর্ব্বর পাহাড়ী লোক ভিন্ন কোন গৃহস্থ পরিবার গুটী পোকার চাষ করে না। গৃহস্থ লোকেরা প্রস্তুত্তি রেসম, বাজার হইতে ক্রয় করিয়া বস্ত্র বয়ন করে। কাপড় বুনিবার পূর্ব্বে সূত্রগুলি ইচ্ছানুসারে রঙ করিয়া লইতে হয়, কিন্তু এ দেশজাত রেসমদ্বারা আট-পৌরে কাপড় ব্যতীত ভাল বসন প্রস্তুত হয় না। তন্নিমিত্ত চীনদেশ হইতে চিকণ সূতা আমদানী করিয়া লইতে হয়। কিন্তু চীন সূত্রের কাপড় ব্রহ্মা সুতার কাপড়ের ন্যায় এত টেকসহি হয় না। কাপড় বয়নের প্রায় সমস্ত কার্য্য বালিকা ও যুবতীরাই করিয়া থাকে। ইহাদের "শলা" চালাইবার কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, যেন সুন্দরীদিগের স্বর্ণাঙ্গুলিচয় সূত্রের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া ক্রীড়া করিতেছে।

কেরোসিন তৈলের জন্য এ দেশ আরও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মূল্যে সুলভ বলিয়া আজি কালি বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে ব্রহ্মাতৈল ব্যবহৃত হইতেছে। পূতসলিলা ইরাবতীর ক্রোড়দেশে,—ইয়ংসাঙ্গ নগরীর অনতি দূরে বহু সংখ্যক তৈলকূপ আছে। তাহা হইতে এত তৈল উদ্ভূত হয় যে, তদ্দর্শনে ডাক্তার নোয়েট্লিং (Noitling) বলেন,—That when the young gang oil fields are methodically worked, they will take their place side by side with America, Russia in supplying the world with oil.

নির্ব্বাসিত রাজা থিবুর এই তৈলের একচেটিয়া ব্যবসা দ্বারা বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা আয় হইত। অনেকে মনে করেন, এই ব্যবসায় দ্বারা একদিন ব্রহ্মবাসীরা, আমেরিকা, রুষিয়া, ও পোলেষিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে। মিষ্টার মারভিন্ (Marving) এই সম্পর্কে অনেক গবে-ষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। এই দেশে আবার পাথুরে কয়লার খনির সংখ্যাও অল্প নহে। একজন ইংরেজ পরিব্রাজক বলেন "There are extensive coal mines in Burma, which when worked may be expected to yield a fair profit." থিবুর পিতা বৃদ্ধ নরপতি মিনদ্‌মিন অলসপ্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া, ধনাগমের এতগুলি সুপন্থা থাকিতেও, তিনি সর্ব্বসমৃদ্ধিময় হইতে পারেন নাই। প্রকৃতির রত্নভাণ্ডা-

রের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলে এ স্থানে আরও, অনেক মূল্যবান্ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টার বল্ ( Ball ) তাহার Economic Geology of India নামক পুস্তকে এই দেশজাত নীলকান্ত মণি, পদ্মরাগ. স্ফটিক, রসাঞ্জন, ফটকিরি প্রভৃতি রত্নরাজীর বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলেন যে, এই সমস্ত রত্ন উদ্ধারের যন্ত্রাদি যদিও এখন পর্য্যন্ত সেই আদিম অবস্থা অতিক্রম করিয়া উঠে নাই, তবুও ব্রহ্ম ও সায়েম বাসীর অর্থাগমের পথ অনেক পরিমাণে পরিষ্কৃত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কাপ্তান উইণ্ড্হেম সাহেব ( Captain Wyndham) ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে তেনাসরিণ প্রদেশের শিবগঙ্গা ও সুটমা নদীর সঙ্গম স্থলে পর্য্যাপ্তরূপে স্বর্ণপ্রসূ বালুকারাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, এ স্থানের এক হস্ত পরিসর বর্গক্ষেত্রে ৯৫ রেণু স্বর্ণ আছে। পর্য্যটক Ralf Fitch দলীল রাখিয়া গিয়াছেন ; ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে ভারতে যে টীন ব্যবহৃত হইত, সমস্তই টেভয় নগরী হইতে প্রেরিত হইত। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত পার্ডি ( Mr. Pardy ) সাহেবও Indian nation নামক মাসিক পত্রিকায় এই দেশের খনি সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রীতারকচন্দ্র দাসগুপ্ত।

# মোগলের অধঃপতন।

## ফরোকশিয়র।

ফরোকশিয়র রণক্ষেত্রে বিজয়শ্রী লাভ করিয়া * রাজ-মুকুট ধারণ করিলেন। তাঁহার আদেশে জাহান্দর শাহ ও জুলফিকর খাঁ এবং তদীয় পিতা আসদ খাঁ নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। আওরঙ্গজেবের আত্মপরায়ণতা এবং পরধর্ম্ম-বিদ্বেষনিবন্ধন অতুল মোগল সাম্রাজ্য অধঃপতনোন্মুখ হয়। বাহাদুর শাহের দুর্ব্বলতা ও জাহান্দর শাহের ব্যভিচার সে অধঃপতনের পথ প্রসস্ত করে। তাহার পর ফরোকশিয়রের সিংহাসনারোহণের মুহূর্ত্ত হইতেই তৈমুর বংশের বিনাশের দিন দ্রুত বেগে ঘনাইয়া আসিয়াছিল।

ফরোকশিয়র রাজপদে আসীন হইয়া, হোসেন আলী খাঁকে মির বক্সীর পদে, এবং আবদুল্যা খাঁকে উজীরের পদে নিযুক্ত করি-

* এই বিজয়শ্রী লাভ করিতে ফরোকশিয়রের পক্ষীয় বহু লোক হতাহত হইয়াছিল। স্বয়ং হোসেন আলী খাঁ আহত হইয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পতিত হন। যুদ্ধাবসানে সকলে তাঁহাকে মৃত দেহরাশির মধ্যে খুঁজিতে আরম্ভ করে। বহু অনুসন্ধানের পর, তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। যুদ্ধে জয় লাভের শুভ সংবাদে তাঁহার অবসন্ন দেহে সঞ্জীবনী শক্তি আনয়ন করে, এবং তিনি অচিরে সুস্থ হন।

লেন। সৈয়দযুগল তাঁহার রাজ্য লাভের মূলাধার ছিলেন, এইহেতু তাঁহাকে নামে মাত্র সম্রাট্ রূপে সম্মান করিয়া আপনারাই শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে সংকল্প করিলেন।

নূতন সম্রাট্ অপরিণতবয়স্ক, অনভিজ্ঞ, ভীরুস্বভাব ও দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন। যিনি সর্ব্ব শেষে যুক্তি প্রদর্শন করিতেন, দুর্ব্বলচিত্ত বাদশাহ ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে অসমর্থ ছিলেন বলিয়া, তাঁহারই অনুবর্ত্তী হইতেন। তাঁহার এই দুর্ব্বল স্বভাব সৈয়দযুগলের অখণ্ড প্রভুত্বের অন্তরায় স্বরূপ ছিল। তাঁহারা প্রথমতঃ বাদশাহের তাদৃশ স্বভাবের বিষয় অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন না। এজন্য তাঁহারা মন্ত্রণাদাতা রাজপুরুষদিগকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে রাখিতে যত্ন করেন নাই। মুলতাননিবাসী মিরজুম্লা বঙ্গ দেশের কাজির পদে নিযুক্ত ছিলেন; ফরোকশিয়রের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই, এই ব্যক্তি তাঁহার একান্ত বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

নূতন রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে হোসেন আলী খাঁ যোধপুরাধিপতি অজিত সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মহাত্মা টড্ লিখিয়াছেন যে, অজিত সিংহের হস্তে মোগল সৈন্য পরাজিত হয় এবং সেনাপতি হোসেন আলী খাঁ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাস লেখক খাফি খাঁ অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিরজুম্লা প্রথম হইতেই সৈয়দ যুগলের ক্ষমতা ধ্বংসের অভিলাষী ছিলেন। সম্ভবতঃ এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য হোসেন আলী খাঁকে দরবার হইতে দূরে রাখিবার অভিপ্রায়ে যোধপুরাধিপতির বিরুদ্ধে তাঁহার অধীনে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। মোগল সৈন্যের আগমনে অজিত সিংহ ভীতিবিহ্বল হইয়া সন্ধিপ্রার্থী হন। বাদশাহ মিরজুম্লাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। তিনি প্রকাশ্য ভাবেই বলিতেন যে, মির জুম্লার বাক্য ও স্বাক্ষর তাঁহার নিজের বাক্য ও স্বাক্ষরের ন্যায় বলবৎ। মির জুম্লা একজন ন্যায়নিষ্ঠ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বাদশাহের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার হস্তেই নিয়োগভার ন্যস্ত ছিল। তাদৃশ বন্দোবস্ত উজীর আবদুল্যা খাঁর স্বার্থের বিরোধী ছিল বলিয়া, তিনি উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কিন্তু অধিকাংশ আমীর, ওমরাহ এবং বাদশাহও তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করেন। আবদুল্যা দরবারের মতিগতি দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, হোসেন আলী খাঁ অচিরে রাজধানীতে প্রত্যাগমন না করিলে, তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবি। তদনুসারে তিনি হোসেন আলী খাঁকে রাজধানীতে উপনীত হইবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। অজিত সিংহের সন্ধিপ্রার্থী হইবার সমসময়ে পূর্ব্বোক্ত পত্র তাঁহার হস্তগত হয়। এজন্য, তিনি সন্ধি সংস্থাপন জন্য উদগ্রীব হন। ইহার পর, উভয় পক্ষে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, এবং অজিত সিংহ স্বীয় কন্যাকে বাদশাহের

হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য মোগল সেনাপতির সঙ্গে রাজধানীতে প্রেরণ করেন।

হোসেন আলী খাঁ রাজপুতনা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ক্ষমতা-লাভ-প্রয়াসী উভয় দল মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল ; এবং বাদশাহ একান্ত বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইলেন। তিনি এই বিবাদের মূলোচ্ছেদ-উদ্দেশ্যে প্রথম দলের চালক হোসেন আলী খাঁ ও দ্বিতীয় দলের চালক মির জুম্লাকে দূরে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তদনুসারে মির জুম্লা বিহার প্রদেশের এবং হোসেন আলী খাঁ দক্ষিণাপথের শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। হোসেন আলী খাঁ দক্ষিণাপথে গমন করিবার সময় বাদশাহকে বলিলেন, "আমার অনুপস্থিতিতে মির জুম্লাকে দরবারে আহ্বান অথবা আমার ভ্রাতার সঙ্গে কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করিবেন না। ইহার অন্যথাচরণ হইলে, আমি তিন সপ্তাহ মধ্যে সসৈন্যে আসিয়া পৌছিব।"

জুলফিকর খাঁ বাদশাহের আদেশে নৃশংসভাবে নিহত হইলে, তদীয় প্রতিনিধি দায়ুদ খাঁই দক্ষিণাপথের শাসন ভার লাভ করিয়াছিলেন। হোসেন আলী খাঁ তথায় গমন করিলে, তিনি বাদশাহের ইঙ্গিতে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। তুমুল যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ নিহত হইলেন; এবং হোসেন আলী খাঁ শাসন-ভার লাভ করিলেন। এই সংবাদ রাজধানীতে পৌছিলে বাদশাহ বিমর্ষচিত্তে বলিলেন, এরূপ সুবিখ্যাত প্রশস্তমনা বীরের মৃত্যু দুঃখজনক। ইহাতে আবদুল্যা খাঁ উত্তর করিলেন, আফগানের হস্তে আমার ভ্রাতার প্রাণনাশ হইলে, জাঁহাপনা সুখী হইতেন। *

এই সময় শিখজাতি পুনর্ব্বার মস্তকো-

* বাস্তবিকই দায়ুদ খাঁ প্রশস্তমনা ছিলেন। একবার আমেদাবাদে কতিপয় মোসলমান একজন হিন্দু অধিবাসীর গৃহ পার্শ্বে গো হত্যা করায় হিন্দুরা উত্তেজিত হইয়া একজন মোসলমান বালককে হত্যা করে। ইহাতে উভয় পক্ষ দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হয়। দায়ুদ খাঁ এই ব্যাপারে হিন্দুর পক্ষ অবলম্বন করেন। আমরা এস্থানে দায়ুদ খাঁর সম্বন্ধে একটা রোমান্টিক গল্পের অবতারণা করিতেছি। ইহাতে তদীয় হৃদয়ের প্রণয়শীলতার আভাস পাওয়া যায়। একবার তিনি উপহার স্বরূপ একটি সুন্দরী হিন্দু বালিকা প্রাপ্ত হন। তিনি তাহাকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। হোসেন আলী খাঁর সঙ্গে যখন তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন এই রমণী সাত মাস অন্তর্বত্নী ছিলেন। তিনি পতির যুদ্ধযাত্রা কালে, তাঁহার কোমর হইতে সগর্ব্বে তরবারি গ্রহণ করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দেন। তারপর তিনি তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্বহস্তে গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া জীবিত অবস্থায় সন্তান বাহির করেন এবং পতির সঙ্গে স্বর্গারূঢ়া হন। খাফি খাঁ এই গল্পে আস্থা স্থাপন করেন নাই।

স্তলন করিয়া লাহোর হইতে আম্বলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র প্রদেশ অধিকার করিল। বাদশাহ শিখশক্তিকে সমূলে বিনাশ করিতে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। শিখগণ আত্মরক্ষার্থ প্রাণপণ করিল এবং লোকাতীত পরাক্রমে মোগল সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিল। কিন্তু তাহাদের শিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগলের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। ক্রূর প্রকৃতি মোগল সেনাপতি, নৃশংসাচরণের একশেষ প্রদর্শন করিয়া, দুই সহস্র শিখ সৈন্যের শিরশ্ছেদন করিয়া, ছিন্ন মস্তকগুলি বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। শিখগুরু ( অধিনেতা ) বান্দাকে সহস্রাধিক অনুচরসহ হস্ত পদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করা হইল। বন্দী শিখবীরগণ একে একে ঘাতক হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া বিধাতার অভিসম্পাত মোগল সাম্রাজ্যের উপর আনয়ন করিল। বান্দা আপনার শিশু পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিতে আদিষ্ট হইলেন; তিনি অবিচলিতচিত্তে এই আদেশ প্রতিপালন করিলেন। এই ঘোর নৃশংস কাণ্ডের পর তিনিও শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। *

এই ঘটনার পর বৎসর মিরজুম্লা পাটনার শাসন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজদরবার হইতে দূরে অবস্থান করায় তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিপত্তি আর ছিল না; হোসেন আলী খাঁ দক্ষিণাপথে গমন কালে যে ভয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও বাদশাহ বিস্মৃত হইয়া-

---

* His son was placed upon his knees,—a knife was put into his hands and he was required to take the life of his child. He did so, silent and unmoved. His own flesh was then torn with red-hot pincers, and amid those torments he expired, his dark soul, say the Mahomedans winging its way to the regions of the damned. Cunningham's History of the Sikhs. শিখগণ স্বদেশপ্রেমের মোহন-মন্ত্রে উন্মত্ত হইয়াছিল। এজন্য তাহারা জীবন বিসর্জ্জন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ছিল না। এক জন শিখরমণী বাদশাহের নিকট সুকৌশলে স্বীয় পুত্রের জীবন ভিক্ষা করেন। বাদশাহ, তাঁহার কৌশলপূর্ণ বাক্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। যে সময়, শিখজননী আদেশলিপিসহ পুত্রের নিকট উপনীত হন, তখন ঘাতক পুত্রের শিরশ্ছেদন জন্য তরবারি উত্তোলন করিয়াছিল। বীর পুত্র মুক্তিপত্র দেখিয়া সগর্ব্বে উত্তর করেন, "মা মিথ্যাবাদিনী, আমি গুরুসেবার জন্য মনঃপ্রাণে সমবিশ্বাসিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছি। আমাকে অবিলম্বে তাঁহাদের সহযাত্রী কর।"

ছিলেন না। এজন্য, তিনি সাদরে পরিগৃহীত হইলেন না। বাদশাহ তাঁহাকে দূরে রাখিবার জন্য লাহোরের শাসন-কার্য্যে প্রেরণ করিলেন।

সৈয়দগণের প্রভুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল এবং বাদশাহ বিলাস-স্রোতে মগ্ন হইয়া রমণীর বিলোলকটাক্ষ ও চিত্তোন্মাদকর মৃগয়াই জীবনের সার করিয়াছিলেন। তিনি শাসনকার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিতেন না; এমন কি প্রধান অমাত্যের পক্ষে তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ করাও দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। এ সময় ঘৃণ্য জিজিয়া কর পুনর্জ্জীবিত হয়। হিন্দুরাজপুরুদিগকে পদচ্যুত করা হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের হিসাব নিকাশ তলব করা হয়। দক্ষিণাপথে মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্রমশই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহাদের যুদ্ধপ্রণালীও দিন দিন নিয়মবদ্ধ হইতেছিল। বাদশাহ সৈয়দগণের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য স্থির-সংকল্প ছিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিতে পারিতেন না। তিনি হোসেন আলীর বিনাশ সাধন জন্য মহারাষ্ট্রাদিগকে গোপনে গোপনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই আত্মকলহের ফল কি হইয়াছিল?—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হিন্দুগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে; এবং মোগলের রাজশক্তি গৌরবভ্রষ্ট হয়।

হোসেন আলী খাঁ দীর্ঘকালব্যাপি যুদ্ধ সত্বেও মহারাষ্ট্রশক্তি দমন করিতে অসমর্থ হইয়া, মোগলের গৌরব-নাশক সন্ধি সংস্থাপন করিতে মনন করিলেন। * কিন্তু বাদশাহ সৈয়দযুগলের শত্রু পক্ষের পরামর্শে তাদৃশ অকীর্ত্তিকর প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না এবং যোধপুরাধিপতি রাজা অজিত সিংহ এবং কতিপয় আমীর ওমরাহের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাদের উচ্ছেদ-সাধনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাদশাহের অস্থিরমতিত্বে ও ভীরুতায় এই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। আবদুল্লা খাঁ আত্মরক্ষার্থ সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং হোসেন আলি খাঁকে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন।

তদনুসারে তিনি দশ সহস্র মহারাষ্ট্রা সৈন্য লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃযুগল সহজেই অরক্ষিত রাজপুরী অধিকার করিলেন। তাঁহাদের কতিপয় চেলা প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, বাদশাহকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু অনুসন্ধানের পর, ছাদের এককোণে তাঁহাকে লুকায়িত অবস্থায় পাওয়া গেল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে নানারূপে অপমানিত করিয়া টানিয়া বাহির করিল। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী

* এই সন্ধি অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবাজির অধিকৃত প্রদেশ সমূহে স্বাধীন অধিকার লাভ করে; এবং সমগ্র দক্ষিণাপথের চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা বার্ষিক দশ লক্ষ মুদ্রা ও একাদশ সহস্র সৈন্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়।

মাতা, মহিষী, ভগিনী প্রভৃতির করুণ ক্রন্দনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা চেলাদের পদধারণ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাদের তাদৃশ করুণ ক্রন্দনেও অবিচলিত রহিল। তাহারা ফরোকশিয়রকে পুরমহিলাদের পার্শ্ব হইতে বাহিরে আনয়ন করিল। তারপর তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নাশ করিয়া, তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। থাফি খাঁ এই কারাগারকে তাঁহার living tomb স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে ফরোকশিয়রের কষ্টের সীমা রহিল না। তিনি মুক্তিলাভের কল্পনায় প্রহরীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। এই ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, সৈয়দযুগল তাঁহার আহার্য্য বস্তুতে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহার ইহলীলার অবসান করিলেন। *

## রফিউদ-দরজাত।

সৈয়দযুগল ফরোক শিয়রকে বন্দী করিয়াই রফিউস-সানের (রফিউস সান বাহাদুর শাহের পুত্র) কনিষ্ঠ পুত্র রফিউদ-দরজাতকে ময়ূর তক্ত প্রদান করেন। রাজ্যলাভ কালে রফি কারাগারে বন্দী ছিলেন। সৈয়দযুগলের হস্তে ফরোকশিয়র বন্দী হইলে, জনসাধারণ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং রাজসিংহাসন শূন্য দেখিয়া নানারূপ অরাজকতার সূত্রপাত করে। এজন্য তাঁহারা, তাড়াতাড়ি রফিকে কারামুক্ত করিয়া, সিংহাসনে বসাইয়া দেন। তাড়াতাড়িতে তাঁহার কারাবস্ত্র পরিবর্ত্তনেরও অবসর ঘটিয়াছিল না। রফির রাজত্বের তৃতীয় মাসে ফরোকশিয়র শত্রুর বিষ-প্রয়োগে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। নামসর্ব্বস্ব নূতন সম্রাটের কোন ক্ষমতাই ছিল না। মন্ত্রিযুগল স্বাধীনভাবে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রফি-উদ-দরজাত ঈদৃশ অবস্থা স্পৃহণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; এজন্য তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফিদ্দৌলার নামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলনের প্রস্তাব করিয়া স্বয়ং এ প্রহসনের দায় হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

---

* ফরোক শিয়রকে হুমায়ুনের সমাধি ভবনের এক পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সহস্র দোষ ছিল। কিন্তু তিনি গরীবের মা বাপ ছিলেন। এজন্য তাঁহার শবাধারের সঙ্গে দুই তিন সহস্র গরীব দুঃখী ও সন্ন্যাসী ফকির গমন করিয়াছিল। তাহাদের চীৎকারে গালাগালিতে ধূলি নিক্ষেপে চতুর্দ্দিকে বিকট দৃশ্য উপস্থিত হয়। সৈয়দযুগলের বক্সী অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সঙ্গে লইয়া সমাধি স্থানে উপস্থিত হন। ক্ষুব্ধজনপ্রবাহ তাঁহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করে। পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্য চাল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ করিয়াছিল না। তৃতীয় দিবস, ইতর শ্রেণীর বহু লোক মিলিত হইয়া, অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, গরীব দুঃখীকে বিতরণ করে, এবং সমস্ত রাত্রি সেখানেই সম্মিলিত থাকে।

## রফিদ্দৌলা।

উজীর ও তদীয় ভ্রাতা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রফিদ্দৌলা নামে খোতবা ও শিক্কা প্রচলিত করিলেন। ইহার তিন দিন পরেই রফি-উদ-দরজাত রাজযক্ষ্মারোগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহার রাজত্ব সপ্তাহাধিক অর্দ্ধ বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফিদ্দৌলাও রাজতক্তে আরোহণ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। তিনি সিংহাসনারোহণের কিঞ্চিদধিক তিন মাস মধ্যেই উৎকট আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহাদের রাজত্বকালে হিন্দুর শক্তি বর্দ্ধিত এবং দিল্লীর প্রভুত্ব সঙ্কুচিত হইয়াছিল। জয়সিংহ এবং অজিত সিংহ রাজপুত অধিপতিগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন। জয়সিংহ সসৈন্যে আগ্রার দ্বারদেশে উপনীত হন; এবং অজিত সিংহ ফরোকশিয়রের বিধবা মহিষীকে (ইনি অজিত সিংহের কন্যা) বলপূর্ব্বক স্বদেশে লইয়া যান। সৈয়দযুগল ইহাদিগকে প্রশমিত করিবার জন্য জয়সিংহকে সুরাটের ও অজিত সিংহকে আজমীঢ় ও আমেদাবাদের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। ইহাতে তাঁহাদের আধিপত্য দিল্লীর পঞ্চাশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র দেশে সংস্থাপিত হয়। ভরতপুরবাসী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক চূড়ামণি আগ্রা দুর্গপ্রাচীরের অনতিদূরেই স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবজির অধিকৃত প্রদেশ সমূহে স্বাধীনভাবে রাজত্ব ও সমগ্র দক্ষিণাপথে চৌথ ও সরদশ মুখি আদায় করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

# অভিশাপ।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### নলিন ও সতীশ।

শচীকান্ত রায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার যে কন্যা মনোমত হইয়াছে, ইহাতে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আর আনন্দের সীমা নাই। কেবল বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনীনাথ আহ্লাদিত নন। তিনি কেন নন, তাহা পরে জানিতে পারিবেন।

চট্টোপাধ্যায়-গৃহিণী, যদিও তাঁহার রূপবতী কন্যা রায় মহাশয়ের মনোমত হই-

য়াছে—এ সংবাদ যথাসময়ে অবগত হইয়াছেন, তথাপি স্বামীর নিকট সবিশেষ শুনিবার আশায়, সকল গৃহকার্য্য সমাপ্তির পর শয়ন-গৃহে তাঁহার অপেক্ষায় জাগরিতা রহিয়াছেন। যথাকালে বীরেশ্বর গৃহে প্রবেশ করিলেন; এবং তৎপরে পতি পত্নীতে যেরূপ কথোপকথন হইল, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

বী।—তোমার মেয়েকে রাজরাণী কর্‌বার সাধ বুঝি ঈশ্বর পূর্ণ কর্‌লেন।

প।—দাঁড়াও,—এখনও কোথা কি, আগে কোষ্ঠী মিলুক তবে ত।

বী।—হিরের কোষ্ঠী খুব ভাল। নর-গণ, পতি ও সন্তানের স্থানে খুব ভাল। তাতে কোন ভাবনা নাই। কিন্তু ভাব্‌চি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, আমি কি পেরে উঠ্‌ব? তাঁরা মস্ত জমিদার।

প। তাঁরা হিরেকে দেখে কি বল্‌লেন?

বী।—বল্লেন ভালই তাঁর কোন অমত নাই, কেবল কোষ্ঠীখানা একবার দেখাবেন।

প।—যা হোক্ আমার কিন্তু একটা ভাবনা হয়;—সতীশ যে হিরেকে ভালবাসে। তার বাপ মাও অনেক দিন থেকে মনে ঠিক করে রেখেছেন যে, হিরেকে বৌ কর্‌বেন।

বী।—বিয়ের কথা কি কেহ বল্‌তে পারে? কত লোকের যে বিয়ে কর্‌তে বসে পাত্র উঠে যায়, আর এ আশীর্ব্বাদও এখনও হয় নাই।

প।—না আমি সে জন্য কিছু বল্‌চি না। মানুষকে নিরাশ কর্‌লে পাছে কারও কিছু অমঙ্গল হয়, এজন্যই এক একবার ভাবনা হয়।

বী।—মেয়েকে বড় মানুষের বাড়ি দেওয়ার কার না ইচ্ছা হয়? কেশব যে দিন এ কথা তুল্‌লে আমিও আগে তত মনে করি নি। তোমারইত এতে বেসী মত ছিল। আজ আবার আর এক কথা বটে!

প।—তুমি রাগ কর কেন, আমি কি বল্‌চি এ ভাল হয় নি। যদি হয়, এত আমাদের পরম ভাগ্য। কেবল সতীশকে কি করে মুখ দেখাব তাই ভাব্‌চি।

বী।—সতীশ কি তার বাপের সঙ্গে দেখা হলে আমারও লজ্জা করে না কি? তা কি কর্‌ব, দুদিন পরে সব মিটে যাবে। সতীশকে নলিন যে কি চখে দেখেচে তাও বল্‌তে পারি না। সে আজও আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কয় নি।

প।—সে বলে আমাদের গরীবের ছেলেই ভাল। আরও বলে সতীশের মত ভাল ছেলে এ গ্রামের মধ্যে নাই।

বী।—তারা এখনও ছেলে মানুষ, একটু একটু ইংরাজি শিখে তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আলাদা রকম হয়ে গেছে। আজ কাল যে সময় পড়েছে, শুধু দুটু পাশ কর্‌লে কি হবে, টাকা না থাক্‌লে আর কিছুই হবার যো নেই। আর রায় মহাশয়ের ভাইপোও শুনেচি পাশ করেচেন। যা হোক, এখন থেকে হিরেকে যাতে সতীশ আর দেখ্‌তে টেক্‌তে না পায়, তাই করো, তা হলেই সতীশও ক্রমে ওকে ভুলে যাবে।

প।—হিরে ছেলে মানুষ অত শত বোঝে না, কিন্তু ওর রকম সকম দেখে মনে হয়, যেন সতীশকে সেও ভালবাসে। আজ কাল আবার পাঁচজনকার সামনে সতীশের সঙ্গে বড় কথা কয় না। সতীশ যখন আমাদের সঙ্গে কথা টথা কয়, হিরে তখন কাছ থেকে চলে যায়।

স্বামী স্ত্রীতে এইরূপ তনয়ার বিবাহ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। নলিনীনাথ আজি এই আনন্দের দিনে বড়ই অসুখী। প্রকৃতই তিনি এই নূতন সম্বন্ধে বিশেষ দুঃখিত। তিনি প্রতিবেশী ও সহপাঠী সতীশকে বড় ভালবাসেন। নলিনীনাথ লেখা পড়া শিখিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি ও মনোভাব কিছু স্বতন্ত্র প্রকারের। তাহার আধুনিক মতের সহিত পিতার মতের অনেক সময়েই ঐক্য হয় না। নলিনী সতীশকে আদর্শ চরিত্রের যুবক বলিয়াই মনে করেন। অসমান সংযোগে দুর্ব্বল পক্ষকে সর্ব্বদা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়—এই ইংরাজি প্রবচনটিকে তিনি বড় বিশ্বাস করেন। এই কারণে, তিনি আজি ধনীর সন্তানের সহিত তাঁহার ভগিনীর পরিণয়ের কথায় অসুখী। দ্বিতীয়তঃ সতীশ হিরণ্ময়ীকে ও হিরণ সতীশকে যে ভালবাসে, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন। তাঁহার মনের দৃঢ় ধারণা, যদ্যপি উভয়ের মধ্যে বিবাহ না হয়, তাহা হইলে দুইজনের পরিণাম বিশেষতঃ সতীশের জীবন অনন্ত অশান্তির আবাস হইয়া উঠিবে; এবং তাহার ফলে তাঁহার উদ্যমশীল জীবনের সকল উন্নতির মূলে কণ্টক পড়িবে। নলিনীর মনের স্থির বিশ্বাস হিরণ্ময়ীর পক্ষে সতীশের ন্যায় উপযুক্ত পাত্র আর দ্বিতীয় নাই।

জমিদার শচীকান্ত রায় চলিয়া গেলে পর, নলিনীনাথ মনে স্থির করিয়াছেন যে, পিতাকে বুঝাইয়া, এ বিবাহ যাহাতে না হইয়া সতীশের সঙ্গে হয়, তাহার বিধিমত চেষ্টা করিবেন। যদি ইহাতে পিতাকে সম্মত করিতে না পারেন, এবং পরে কোষ্ঠী মিল হয়, তাহা হইলে কৌশলদ্বারা সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### সতীশচন্দ্র কে?

সতীশচন্দ্র কে, তাঁহার কোন পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব সতীশচন্দ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। নিবাস কুসুমহাটী। বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাসী এবং নলিনীনাথের বন্ধু ও সহপাঠী, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি বর্দ্ধমান হইতে এল, এ পাশ করিয়াছেন সেখানে আর উচ্চ শিক্ষার উপায় না থাকা বশতঃ এবং হুগলী বা কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ পড়িবার উপযুক্ত অর্থ সচ্ছলতা না থাকাতে বাধ্য হইয়া লেখা পড়া ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে সতীশচন্দ্র গ্রামের বামাচরণ বসুকে ধরিয়া একটি পল্লীগ্রামের পোষ্ট অফিসে ২০ টাকা বেতনে সব্ পোষ্টমাষ্টারের চাকুরি পাইয়াছেন। কর্ম্মস্থলে কোন ধনী ব্যক্তির

পুত্রকে বাটিতে পড়াইয়া আর পাঁচটি টাকা উপার্জ্জন করেন। উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী নিরক্ষর লোকদিগের মণিঅর্ডার ফরমে ঠিকানাদি লিখিয়া দিয়াও মাসে দুই তিনটি টাকা উপরী পাইয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্ম-স্থান বাটী হইতে প্রায় চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে।

সতীশচন্দ্রের পিতা কোন জমিদারের তরফে কর্ম্ম করেন। আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের যে সামান্য জমি জিরাত আছে, তাহাই দেখিয়া থাকেন। সংসারের সমস্ত বৎসরের খরচের উপযুক্ত ধান্য কলাই প্রভৃতি নিজ জমিতেই উৎপন্ন হয়। পিতা যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার-নির্ব্বাহ হইয়া বরং প্রতিমাসেই কিছু কিছু উদ্বর্ত্ত হইয়া থাকে। সর্ব্ব বিষয়ে একত্র করিয়া দেখিলে, সতীশের সংসারটি একটি সুখের সংসার বলিয়াই মনে হয়। তবে তাঁহার পিতা মাতার চক্ষে এখনও একটি বিষয় অপূর্ণ আছে বলিয়া মনে হয়,—সেটি সতীশের অবিবাহিত জীবন। এ যাবৎ তাহার বিবাহ না হইবার কোন কারণ ছিল না, কেবল সতীশচন্দ্র, উপায়ক্ষম হইলে বিবাহ করিব, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাঁহার পিতা, পুত্রের বাসনার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে প্রয়াস পান নাই। বিশেষ তিনি মনে জানেন, পাত্রী অন্বেষণ করিতে হইবে না, যে দিন ইচ্ছা, সেই দিনই বিবাহ দিতে পারিবেন।

সতীশচন্দ্রের সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহের কথা যে এক প্রকার স্থির হইয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। হিরণ্ময়ীর বয়ক্রম যখন সবে মাত্র তিন চারি বৎসর, তখন হইতেই তাহার পিতা সতীশের পিতাকে, তাঁহার কন্যাটিকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, বলিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আহ্লাদের সহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক সেই সময় হইতে, ঐ সুহাসিনী সুন্দরী বালিকাটিকে পুত্রবধূ করিবার আশা মনে মনে পোষণ করিতেছেন। পুত্র সতীশের চাকুরি হইয়াছে, এইবার তাঁহার বিবাহ দেবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন।

পোষ্ট অফিসের কার্য্যে ছুটি অতি অল্প; তবে পল্লীগ্রামের যে সকল ডাকঘরে দুই তিন জন কর্ম্ম করেন, তথায় কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃপক্ষকে লুকাইয়া আপনাদিগের মধ্যে বন্দোবস্ত করিয়া মধ্যে মধ্যে বাটী আসিয়া থাকেন। সতীশচন্দ্রও এইরূপ মাসের মধ্যে দুই একবার করিয়া বাটী আইসেন। হিরণ্ময়ীকে দেখিতে আসিবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে, সতীশচন্দ্র এক দিন বাটী আসিলেন। তখন তিনি মনোমধ্যে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই যে, এই নূতন সম্বন্ধে হিরণ্ময়ীর পিতা মাতার মত আছে। তিনি বাটীতে আসিয়াই মাতার নিকট হইতে উক্ত বিষয়ের কিছু কিছু শুনিলেন।

যে আশা পূর্ণ হইবার পক্ষে কোন সংশয় থাকে না, অকস্মাৎ তাহাতে কোন বাধা উপস্থিত হইলে, উহা মনুষ্যের হৃদয়ে ব্যথা আনয়ন করিয়া মনকে নিস্তেজ করিয়া

ছেন। সতীশচন্দ্র মাতাঠাকুরাণীর নিকট শুনিয়া যার-পর-নাই দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন। কি শৈশবে কি কৈশোরে সতীশের এমত অবসর কাল ছিল না, যে সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে না অতিবাহিত হইত। নলিনীর সহিত তাঁহার যে পরিমাণ বন্ধুতা, তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতেও তিনি তদনুরূপ স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া থাকেন। নলিনীদের বাটীতে এমন স্থান নাই, যাহা তাঁহার অগম্য, অন্তঃপুরে এমন কেহ রমণী নাই, যিনি তাঁহার সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করেন। সতীশচন্দ্র নলিনীর পিতা মাতাকে ভক্তি করেন; আর হিরণ্ময়ীকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। হিরণ্ময়ীর সহিত সতীশের এই ভালবাসা এক দিনে জন্মে নাই, ইহা ধীরে ধীরে অনেক দিনে জন্মিয়াছে। শৈশবে হিরণ্ময়ী সতীশের হৃদয় হইতে যে স্নেহটুকু আকর্ষণ করিত, তাহাই একণে যুবক সতীশচন্দ্রের ভালবাসায় পরিণত হইয়াছে। আবার বিবাহের কথা হওয়া অবধি, ঐ ভালবাসা ক্রমে পত্নী-প্রেমে পরিণত হইতে চলিয়াছে। বালিকা হিরণ্ময়ী সতীশকে ভালবাসে; কিন্তু সে ভালবাসার সহিত সতীশচন্দ্রের ভালবাসার কোন প্রভেদ আছে কি না, জানি না। আমরা এইটুকু নিশ্চিত বলিতে পারি যে, হিরণ্ময়ী সতীশকে দেখিতে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে, তাঁহার কাছে থাকিতে যত ভালবাসে, তাঁহাকে না দেখিলে মনে মনে যে ভাব অনুভব করে, এরূপ আর কাহারও সম্বন্ধে করে না। সতীশচন্দ্র ইহা বুঝিয়াছেন, ও বোধ হয়, এই জন্যই বালিকাকে হৃদয় মধ্যে এত অধিক স্থান দিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সতীশ তাঁহার অবসর কালের অধিকাংশই নলিনীদের বাটীতে কাটাইতেন। চাকুরি গ্রহণ করা অবধি যখন বাটীতে আসিতেন, তখনই নলিনীনাথের নিকট যাইতেন। অদ্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে, বাটী আসিয়া হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক, পূর্ব্বের ন্যায়, নলিনীর কাছে যাইবার জন্য বাহির হইলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, অন্যমনস্কতার সহিত ভাবিতে ভাবিতে অপর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ গ্রহণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, একটি নির্জ্জন সরোবরের ধারে উপবেশন করিয়া, নির্ম্মম সংসারের কঠোরতার কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—আমার যদি অর্থ থাকিত, তাহা হইলে, আজি কি হিরণের পিতা তাহার বিবাহে অন্য মত প্রকাশ করিতে পারিতেন? তাঁহারা কি নিষ্ঠুর, এত দিন কি দেখিয়া, হিরণকে আমাকে দিবার জন্য এত ইচ্ছুক ছিলেন, আর এখনই বা কি দোষ দেখিয়া, সে বাসনা লুপ্ত হইল। আজ যে ধনীর সন্তানকে জামাতা করিবার জন্য মন উল্লসিত, কালি যদি অধিকতর ধনীর পুত্রকে পান, তাহা হইলে হয়ত ইহা-

কেও হতাদর হইতে হয়। হায়! এ অধম বাঙ্গালী জাতির নিকট, ভালবাসার মূল্য কত অল্প! তাঁহাদের স্নেহের তনয়ার হৃদয়-মুকুরে কাহার প্রতিবিম্ব অঙ্কিত আছে, তাহা কি তাঁহারা জানেন না? অর্থ কি ধর্ম্ম অপেক্ষাও বড়? ভগবান্ নলিনীর মঙ্গল করুন, পিতা মাতার যে স্বার্থ, তাহারও ত সেই স্বার্থ, তবে সে এ শুভ সম্বন্ধে অসুখী কেন?—আমার জন্য, না অধর্ম্মের ভয়ে? যে কারণেই হউক, যদি কেহ আমার প্রকৃত বন্ধু থাকে তবে সে নলিনী।—

এইরূপ অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে একবার নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, সতীশচন্দ্রের মন অধীর হইতে লাগিল। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় চারিদিকের বৃক্ষ লতা আচ্ছন্ন হইয়াছে। তখন সতীশচন্দ্র তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। নলিনীর সহিত তাঁহার বাটীতে গিয়া সাক্ষাৎ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেও, অদ্য যেন তথায় যাইতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। একবার মনে করিলেন, নিজ বাটীতে গিয়া ছোট ভ্রাতার দ্বারা নলিনীকে একটু পত্র লিখিয়া ডাকাইয়া আনিবেন, আবার সে ইচ্ছা শীঘ্রই তিরোহিত হইল। ভাবিলেন, এক্ষণ হইতেই, তাঁহাদের বাটীতে যাওয়া ত্যাগ করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে; যত দিন না হিরণ্ময়ীর বিবাহের কথা পাকা হয়, তত দিন যাইতে কোন দোষ নাই। এই সকল মানসিক তর্কবিতর্কের পর, অবশেষে নলিনীদের বাটী যাওয়াই ঠিক করিলেন, এবং তখনই তথায় গমন করিলেন।

সতীশচন্দ্র, চট্টোপাধ্যায়-গৃহে প্রবেশ করিয়া, বহির্ব্বাটীতে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অন্য দিন হইলে, একবারে ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু অদ্য তাহা পারিলেন না, মনের মধ্যে যেন একটু সঙ্কোচ ভাব উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিয়া, যখন উঠিয়া আসিবার কথা মনে করিতেছিলেন, এমন সময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আসিলেন। তিনি সতীশকে দেখিয়াও যেন দেখেন নাই, এইরূপ ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক, তথা হইতে চলিয়া গেলেন। সতীশ তাহা লক্ষ করিলেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র অবিলম্বেই নলিনীনাথ সতীশচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কতক্ষণ এসে বসে আছ, আমায় যে ডাক নি?"

"প্রায় এক কোয়াটার, তুমি ছিলে কোথা?

"বাটীর ভিতরে ছিলাম, আজ যে বড় এখানে চুপ ক'রে ব'সে, বাড়ী এসেছ কখন?"

"বৈকালে এসেছি।"

"বৈকালে যে এখানে এলে না, রাত্রি হ'ল কেন?"

"বৈকালেই আসবার জন্য বেরিয়ে ছিলাম।"

"বেরিয়েছিলে ত এলে না কেন ?"

"ভাই নলিনী সে কথা আমায় আর জিজ্ঞাসা করো না, আমি আজ অনেক কষ্টে এখানে এসেছি; আজ যে ভাবে এসেচি এ ভাবে কখনও আসি নাই।"

"তোমার মুখ দেখে অবধি আমিও মনে করিয়াছিলাম যে, আজ তোমার কিছু হ'য়েছে, মন তত ভাল নাই। আজ কিসের জন্য তোমার মন এত খারাপ হয়েছে, তা আমায় বল্‌তে কি তোমার বিশেষ কষ্ট হবে?"

"নলিনী ভাই, তোমায় না বলে কি আমি থাক্‌তে পার্‌ব? বৈকালে তোমাদের কাছে আস্‌বার জন্যই বেরুলেম, কিন্তু ভাই তখন কিছুতেই আস্‌তে পারলেম্ না, কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌ল—'নলিনীদের বাড়ীতে কি আমার আর সে স্নেহ, সে যত্নটুকু আছে? অনেকক্ষণ একেলা পথের ধারের একটি নির্জ্জন স্থানে বসে বসে কতই ভাব্‌লেম, মন ক্রমেই অসুস্থ হ'তে লাগল, তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল,—তখন আর থাক্‌তে পার্‌লেম না।"

"সতীশ! তুমি একবারও এরূপ মনে করো না যে, তোমার প্রতি আমাদের ভালবাসা কিছুমাত্র কমেছে। বোধ হয়, কখনও কমিবে না। তুমি একেবারে মনকে ওরকম মিছামিছি কষ্ট দিও না। হিরণের বিয়ের সবে মাত্র একটু কথা হয়েছে, এখনও অনেক প্রতিবন্ধক হ'তে পারে; আর তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি এ সম্বন্ধে কখনও সহজে মত কর্‌তে দেব না।"

"তোমার মন আর আমার জান্‌তে বাকি নাই। কিন্তু এতে তোমার ক্ষমতা অতি অল্প। আর পিতা মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বিশেষ যে ইচ্ছা অন্যায় নয়, এরূপ স্থলে পুনঃ পুনঃ বাধা দেওয়াও পুত্রের কর্ত্তব্য বলে, মনে হয় না।"

"আমি মায়ের জন্য ভাবি না, বাবা মত কর্‌লে, তাঁহার মত করাতে সহজে পার্‌ব। আর তুমি যে ন্যায় ইচ্ছা বল্‌চ, সে কথা ভাই তোমার সাক্ষাতে কি বল্‌ব, যে যা বুঝে তাই ভাল।"

দুই বন্ধুতে এইরূপ কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। সতীশচন্দ্র বিশেষ অনিচ্ছা সত্বেও নলিনীর অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সহিত আজিও একত্র আহার করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন। আহার করিবার কালে নলিনীর মাতাঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি পূর্ব্বেরই মত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অদ্য আর হিরণ বা তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

সতীশচন্দ্র রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া আপনা আপনি মনে স্থির করিলেন যে, হিরণকে কোন মতেই নিজের সহধর্ম্মিণী করিতে পারিবেন না। কেবল মাত্র মনোমধ্যে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইল,—'হিরণের ইহাতে মত আছে ত?'

পর দিন প্রাতে সতীশচন্দ্র নিজ কর্ম্ম-স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### নূতন সংবাদ।

ভাদ্র মাস। এখনও প্রাবৃটের প্রকোপ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। অবিরাম বর্ষণে জনাকীর্ণ রাজধানীর অধিবাসিবৃন্দকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। আজি কয়দিনের পর বরুণ দেব কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিয়াছেন। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, অধিক উজ্জ্বল নয়, কিন্তু বড় মধুর;—মাঝে মাঝে মেঘমালার সঞ্চরণে এক একবার অন্ধকার হইতেছে, যেন অসীম জগৎ এক স্বপ্নময় আবরণে আবৃত। দোতলায় এক উন্মুক্ত ছাদ, দুই ধারে রেলিং দেওয়া, প্রত্যেক ছোট থামগুলির মাথায় ও রেলিংএর পার্শ্বে ফুলের টব, তাহাতে নানাবিধ ফুলের গাছ। দোপাটি, হংসরাজ ও কএকটা গোলাপ ফুটিয়া আছে। চন্দ্রের কিরণ সেই শাদা শাদা দোপাটি ও হংসরাজের উপর পতিত হইয়া তুষার ধবলবৎ দেখাইতেছে। আর একটা মৃণ্ময় বৃহৎ টবের জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব জলিতেছে। কুসুম-পরিমল-বাহি-মৃদুল-নৈশ-সমীরণ ধীরে ধীরে সেই হংসরাজের গুচ্ছগুলি হেলাইতেছে দোলাইতেছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা, কেবল এক একবার বহু দূর হইতে কোন দেবালয়ের মঙ্গল আরতির বাদ্যধ্বনি কুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তরের সহিত ভাসিয়া ভাসিয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে

রেলিংএর নিকট দুইটি মনুষ্য মূর্ত্তি। একটি যুবক, অপরটি যুবতী। দেখিতে উভয়েই সুশ্রী। যুবক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"আর কত দিন এই ভাবে কাটিবে!" যুবতী উত্তর দিলেন,—"তুমিই জান।"

যুবক। তোমার বৃদ্ধা জননীর কথা ভাবিয়াছ?

যুবতী। অনেকবার ভাবিয়াছি।

যুবক।—কি স্থির করিয়াছ?

যুবতী কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। নিজ অলসদেহ-ভার পূর্ব্ববৎ আলিসের উপরে স্থাপিত করিয়াই রহিলেন।

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। উভয়েই আত্মহারা, জগতের কিছুই তাহাদের হৃদয়ে এখন স্থান পাইতে পারে না,—যেন এক স্বপ্নরাজ্যে অধিষ্ঠিত। মানব এই নশ্বর জগতে এইরূপ স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিতে পাইলে আর কি চায়?

যুবক একবার নয়ন উন্মীলিত করিয়া যুবতীর মুখপানে চাহিলেন। চাঁদের আলোকে দেখিলেন, শারদ-শিশির-স্নাত গোলাপসম রমণীর নয়ন প্রান্তে মুক্তা সদৃশ একবিন্দু অশ্রুকণা।

"মালতী! চখে জল কেন?"

"মনে হয় তোমায় আমি না দেখিলেই ভাল ছিল। এ প্রণয়ে শত বিষ।"

যুবক।—"কেন মালতী আজি তোমার মুখে এমন কথা শুনি?"

যুবতীর মনে কি একটা উত্তর উদয় হইতেছিল, বলিতে পারিলেন না।

পাঠক! যবনিকার অন্তরাল হইতে যে দুইটি মানুষের কথোপকথন ও কার্য্যকলাপ নয়নগোচর করিতেছেন, উহাদের মধ্যে একজন আপনার পরিচিত। চিনিতে পারিয়াছেন কি? —ঐ যুবক সত্যেন্দ্রনাথ। আর যুবতী, যুবতীর আর পরিচয় কি দিব, সে সত্যেনের প্রণয়িনী।

মালতী সুন্দরী, তবে সত্যেন্দ্রনাথের চক্ষে তাহার সৌন্দর্য্য যত অধিক, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার রূপ তত নয়। সাধারণ রূপবতী গণের সহিত পার্থক্য এই যে, সে রূপে লাবণ্য আছে। আর একটু আকর্ষণী আছে। বয়ক্রম সপ্তদশ বৎসর, যুবতী ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা বালা। যখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর, তখন তিনি বিধবা হন। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, কলিকাতা হইতে দশ বার ক্রোশ দূরে কোন পল্লীগ্রামে। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে প্রায় কলিকাতায়ই থাকেন।

মালতী যে বাটীতে বাস করেন, তাহা সত্যেনদের বাসার ঠিক পার্শ্বে। উভয় বাটীর জানালা হইতে স্বচ্ছন্দে কথা বার্ত্তা চলিয়া থাকে। এমন কি বোধ হয় দুই ধার হইতে হস্ত প্রসারিত করিলে স্পর্শ হয়। অল্প চেষ্টা করিলে এ বাটী হইতে ও বাটীতে যাওয়া যায়। কলিকাতায় এই শ্রেণীর বাটীর অভাব নাই।

মালতীদের সংসারে অভিভাবক তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি হিন্দু স্কুলে প্রথম শিক্ষকের কার্য্য করেন; এবং সন্ধ্যার পর কোন ব্যবসাদারের দোকানে ইংরাজি চিঠি পত্র লিখিয়া থাকেন। সংসারে তিনি ভিন্ন তাঁহার এক বৃদ্ধা মাতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, স্ত্রী, একটি পুত্র ও একটি শিশু কন্যা আছে।

তিনি অতি অল্প সময়ই বাটীতে থাকিতে পান। তিনি বিধবা মালতীকে বড় স্নেহ করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, দুইটি বাটী অতি নিকটে থাকায়, উভয় বাটীর লোকই উভয় বাটীর অনেক কার্য্য কলাপ, অনেক ব্যবহার প্রভৃতি দেখিতে পান। সত্যেন দেখেন, একটি সুন্দরী যুবতী, একটি ছোট বালিকাকে লইয়া খেলা করে, পান সাজে, কাপড় কোঁচায়, বই পড়ে, অপর একটি যুবতীর সহিত গল্প করে, তাস খেলে, তাহার মাথা বাঁধিয়া দেয়, আপন মনে দর্পণ সম্মুখে রাখিয়া নিজের চুল বাঁধে, খুকিকে টিপ্ পরায়, এক বৃদ্ধার গাত্রে হাত বুলাইয়া দেয়, পক্ক কেশ তুলিয়া দেয়। আর মালতী দেখেন,—একটি কন্দর্প-সদৃশ নবীন যুবক মাথায় সামান্য টেরি, অধরে অল্প শ্মশ্রু, চেয়ারে বসিয়া কাগজ পড়ে, চিঠি লেখে, বেড়াইতে যায়, সন্ধ্যার পর এক প্রৌঢ়ার সহিত বসিয়া কথোপকথন করে, কলিকাতার কত নূতন সংবাদ বলে, কোন দিন খোলা বারন্দায় একাকী বসিয়া কি চিন্তা করে, বা ছাদে পায়চারি করে, আবার কোন দিন চাঁদের আলোতে বসিয়া বাঁশী বাজায়।

শুভ্রহৃদয়া সুন্দরী সকল গৃহকার্য্যের ফাঁকে

ফাঁকে এই সমস্ত কখনও জানালা হইতে, কখনও ছাদ হইতে দেখেন। মনে মনে ভাবেন, কি সুন্দর মুখ, কি সুশ্রী গঠন, কি কোমল আঁখি দুটি, কি অদ্ভুদ বংশীবাদন-ক্ষমতা। প্রথম প্রথম মনে কত কি কথা উঠিত, কত চিত্ত-চাঞ্চল্যকর নূতন ভাব হৃদয় মাঝে গুপ্তভাবে উঁকি ঝুঁকি মারিত, যুবতী মনের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সেগুলিকে সবলে দূর করিয়া দিতেন। সে আর কয়দিন হয়, অপক্কবুদ্ধি অরক্ষিতা অবলা আর কয়দিন মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? যুবতী সত্বরেই সপ্তরথী দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। স্থির, শান্ত হৃদয়-জলধিতে একবার তরঙ্গ উঠিলে আর শীঘ্র উহার নিবৃত্তি হয় না।

মালতী অনেক চেষ্টাতেও বাসনা কামনা আর নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। মালতী মনে মনে ভাবেন, এ পারিজাত আঘ্রাণের অধিকারী কে?

আর সত্যেন্দ্র,—সত্যেন্দ্র পুরুষ মানুষ, অশিক্ষিতও নহেন তাঁহার চিত্ত খুব দৃঢ়। কিন্তু হইলে কি হয়, সত্যেন্দ্র যুবক। যৌবন সময়ের প্রথম প্রণয়াঙ্কুর অতি কঠিন মৃত্তিকা ভেদেও সমর্থ হয়। একবার মাত্র বীজটি, যত্নে হউক আর অযত্নেই হউক, ক্ষেত্রে পতিত হইলেই হইল; আর একজনে রোপণ করিলে ত কথাই নাই। তারপর সলিল সিঞ্চন করিলে ভালই, না করিলেও ক্ষতি নাই। রোপণকারী আর না দেখিলেও, বৃক্ষ আপনা হইতেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহার ছায়া, সকল বৃক্ষের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। তাহা সময়ে সময়ে ক্ষেত্রস্থিত অন্যান্য মূল্যবান্ আবশ্যকীয় পাদপবৃন্দকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। প্রণয় অমৃত। কিন্তু প্রণয় ও রূপজমোহ এক কথা নহে। অসংযত হৃদয়ের পক্ষে, কখনও বিষময় বিপত্তি, কখনও নরকের ন্যক্কারজনক ক্লেদে উহার পরিণতি।

সত্যেন্দ্রনাথেরও, অনেক বার, সে প্রদীপ্ত লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বেই বলিয়াছি। একটা অননুভূত পূর্ব্বভাব, একটা অযাচিত লালসা, একটা অপ্রত্যাশিত আকর্ষণ, একটা অদম্য পিপাসা, নিশাবসানে উষার প্রথমালোকের ন্যায়, ক্রমে ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। তিনি ক্রমে সে ভাব সে লালসা, সে আকর্ষণ, সে পিপাসা যেন একটু একটু অনুভব করিতে লাগিলেন। সে জানালাটা বন্ধ করিলেন, তথাপি নড়িতে চড়িতে দেখা হইয়া যায়, কি করিবেন। সে প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিলেন, হায়! কি দুরদৃষ্ট, ছাদে উঠেন দেখা হয়, হয় ত বা একবারে চোখাচোখি হইয়া যায়। যুবতী উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠেন বলিয়াছি। কিন্তু সত্যেনেরও এক বিষম ব্যাধি উপস্থিত হইল,—তাঁহাকে ভুতে পাইল। জানালা বন্ধ করিলেন, কক্ষ পরিবর্ত্তন করিলেন, ছাদে উঠা বন্ধ করিলেন, এমন কি পথে বাহির হওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন, পাছে দেখিয়া ফেলেন। কিন্তু কি বিপদ তবু সে মূর্ত্তি চখের সম্মুখেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেখানে

যান, সেই স্থানেই সেই মূর্ত্তি; কার্য্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায় সকল সময়েই সেই মূর্ত্তি স্বপ্নবৎ যাতায়াত করিতে লাগিল। সত্যেনও এইবার উন্মত্ত প্রায় হইলেন। তাঁহার মনোভাব ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। তিনি ভাবিলেন,—"যখন সুন্দরীর ঐন্দ্রজালিক ছায়ামূর্ত্তির নিকট আর নিস্তার নাই। তখন আর কেন?" চেষ্টা বৃথা; সত্যেন সাগরে ঝাঁপ দিলেন।

জলে জল, তরলে তরল, লোহিতে লোহিত, উজ্জ্বলে উজ্জ্বল, মধুরে মধুর যত সহজে মিশ্রিত হয়, অন্য সামগ্রীর সহিত তত সহজে হয় না। এক উপাদানসম্ভূত সমগুণ সম্পন্ন পদার্থের মিলন সহজে সাধিত হয়, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যদি কোন বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ মালতী ও সত্যেনের হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন উভয়েতেই এক উপাদান বিরাজিত, তবে উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ ও প্রণয়সঞ্চার বিস্ময়ের বিষয় কিসে?

এইরূপে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মিতে লাগিল। যেখানে বাসনা আছে, সেখানেই উপায় আবিষ্কারের পথ সরল হইয়া থাকে। প্রথমে নয়নে নয়নে মিলিত হইলে উভয়েই চক্ষু নাবাইতেন; কিন্তু সেইখানেই দণ্ডায়মান থাকিতেন। তাহার পর তাহা দূর হইল; চখে চখে শব্দহীন অব্যক্ত কথোপকথনে কএকদিন কাটিল। তৎপর ক্রমে ক্রমে দেখা হইল। কথা হইল। উভয়েই উভয়ের হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

এক্ষণে সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে সুবিধা হইলেই, একবার না একবার, তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। ইহা নিত্য কার্য্যের মধ্যে হইয়া উঠিয়াছে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্কল্প।

প্রেম যখন হৃদয় মাঝে প্রথম ফুটিতে থাকে, তখন নায়ক-নায়িকা উভয়েই তাহা লক্ষ করিলেও, তাহার পরিণাম-চিন্তা করিবার অবসর পায় না। যখন একটু দৃঢ় ভাব ধারণ করে, যখন বন্ধন ক্রমশঃ কঠিনতর হইতে থাকে, তখন একবার পরিণামের কথা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের কথা, পাপ পুণ্যের কথা মনে আইসে এবং কএকদিন মনোমধ্যে একটা মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়; তাহার পর আবার সমস্ত ভাসিয়া যায়। সে অশান্ত দিবস-যামিনীব্যাপি মানসিক তর্ক-বিতর্ক, সে আশা-নিরাশার মর্ম্মভেদি অন্তঃকোলাহল, সব নিবৃত্তি পায়। সে আনন্দ, উচ্ছ্বাস, ভীতি, ভরসার সমষ্টীভূত অব্যক্ত হৃদয় ভাব তিরোহিত হয়। এ শক্তির নিকট সকলই পরাভব স্বীকার করিয়া থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয়-জলধি ভীষণ আলোড়নের পর আবার স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে তিনি মনে একটা স্থির করিয়াছেন,—স্থির করিয়াছেন, মালতীকে চিরদিনের জন্য আপনার করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে বিবাহ করিবেন; কিন্তু সে এখন নয়,—পরে। এখন তাঁহার মনোভাব, পৃথি-

ধাতে পরোপকার যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে বিধবাবালা মালতীকে ভালবাসিয়া তিনি পাপ করেন নাই। যদি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, জীবনে একটা কাজ করা হইল। মালতীর যৌবন আছে, রূপ আছে, স্বাস্থ্য আছে, তবে তাহার আশা, বাসনা, কামনা কুসুম-কোরকেই বিনষ্ট হইবে কেন? তাহার হৃদয় মরুভূমি আজীবন এমনই দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে কেন? বিজন বিপিনে শত শত বন্যপ্রসূন যেমন আপনি প্রস্ফুটিত হইয়া আপনিই ঝরিয়া পড়ে, এই প্রসূনটিও কি তেমনই আপনি ফুটিয়া আপনি ঝরিয়া পড়িবে? না না তাহা কখনই হইতে পারে না। যে কাপুরুষ, সেই সমাজের মুখ চাহিবে, যাহার ক্ষমতা আছে, তাহার এ বিষয়ে ভীত হওয়া তদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমি এ উষার অরুণকে, অকাল জলদমালার আবৃত হইতে দিব না। তাঁহার হৃদয় স্থিত সুধা-প্রস্রবণ আবার প্রবাহিত হউক, দেখি কে ইহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয়?

আর মালতী,—তাঁহার হৃদয়েও ঝটিকার নিবৃত্তি হইয়াছে। সে ঝটিকা তত প্রবল নহে। মালতী তত অধিক ভাবিতে পারেন না, বা চাহেন না। আঁধার ভবিষ্যতের তমোরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে তিনি ভালবাসেন না। বিশাল-বারিধি পার হইতে সম্মুখে সুবর্ণ হেতু দেখিয়া কয় জন তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে? যুবতী ভাবেন, তাঁহার আঁধার হৃদয়ে সুবর্ণ বর্ত্তিকা যে কয়দিন জ্বলে, সেই কয়দিনই ভাল।

সত্যেন্দ্রনাথ ও মালতী পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন, উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন। সত্যেনের সঙ্কল্প যতদিন খুড়া মহাশয় জীবিত থাকিবেন, তত দিন গুপ্তভাবেই কাটাইবেন, তৎপরে তাঁহার অবর্ত্তমানে স্বাধীন ভাবে নিজ আলয়ে লইয়া গিয়া সুখে বাস করিবেন। তাঁহার এ সঙ্কল্পের কারণ ভয় নহে, তাঁহার হৃদয়ে ভয় নাই। তিনি বিশেষ জানেন, যদিও তাঁহার বিবেচনায় এ বিবাহে পাপ নাই, তথাপি তাঁহার খুড়া মহাশয় বা সাধারণের চক্ষে ইহা দোষহীন নহে। তিনি পিতার সদৃশ বৃদ্ধ খুড়ার মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না।

সত্যেনের বাসনা, যদি সুবিধা হয়, তাহা হইলে মালতীকে মানিকনগরের নিকটবর্ত্তি কোন গ্রামের কোন একটি বাটীতে লইয়া যাইয়া রাখিবেন। আর তাহা না হইলে, কলিকাতাতেই একটি বাটী ভাড়া লইয়া তথায় তাঁহাকে গুপ্তভাবে রাখিবেন। খুড়া মহাশয়ের নিকট অনুমতি লইয়া কোন একটি ব্যবসায়ের বাসনা জানাইয়া, বা অন্য সূত্রে, কলিকাতায় বাস করিবেন।

পাঁচ মাস কলিকাতায় আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে একবারও বাটী যান নাই। শচীকান্ত বাবু তিন চারিবার বাটীতে যাইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছেন। সত্যেন প্রত্যেক বারই শীঘ্র যাইবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিত জীবন স্রো

সুখেই অতিবাহিত হইতেছে; কেবল চিন্তার মধ্যে তাঁহার খুড়া মহাশয় তাঁহার বিবাহের জন্য একটি পাত্রী স্থির করিয়াছেন। তিনি সুহৃদ্‌বর অমরনাথের পত্রে, বিবাহ সম্বন্ধীয় সকল কথা অবগত হইয়াছেন। শুনিয়াছেন আগত অগ্রহায়ণ মাসে পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইবে। এক্ষণে সত্যেনের এক মাত্র ভাবনা, কি প্রকারে এই বিবাহ হইতে পরিত্রাণ পান। তিনি সর্ব্বদাই ইহার উপায় চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

( ক্রমশঃ )।

শ্রীহরিহর শেঠ

---

# আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ

## ( ১ )

### সূচনা।

যে রুগ্ন, তাহারই চিকিৎসকের প্রয়োজন। যে বিকৃত, তাহারই সংস্কারকের প্রয়োজন। যে পথভ্রান্ত, তাহারই পরিচালকের প্রয়োজন।

মনুষ্যের মত মনুষ্যের জাতিবিশেষও রুগ্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের মত মনুষ্যের সমাজ বিশেষেও বিকৃত হইয়া উঠে। মনুষ্যের সঙ্গে জাতি বা সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ। কারণ, মনুষ্যের সমষ্টি লইয়াই জাতি; অথবা জাতির ব্যষ্টি লইয়াই মনুষ্য।

নানা কারণে হিন্দুজাতি এখন রুগ্ন। সুতরাং হিন্দুর চিকিৎসক চাই। বহু শতাব্দীর বন্ধনে হিন্দু সন্তান বিকৃত। সুতরাং হিন্দুর সংস্কারক চাই। নানা পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া হিন্দু এখন পথভ্রান্ত। সুতরাং হিন্দুর একজন পরিচালক চাই। তাই জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, হিন্দুর পরিচালক কে হইবেন? হিন্দুর সংস্কারের ভার কে লইবেন? ইহার উত্তরে বলিব স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

### দয়ানন্দ কে?

ভারতভূমির পশ্চিম উপকূলে কাটিবার প্রদেশ। কাটিবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত। সেই ক্ষুদ্র বৃহৎ হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে মর্ভি একটি রাজ্য। দয়ানন্দ নিজে বলিয়াছিলেন;—"আমি মর্ভি রাজার অধীন কোন নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।" তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া যেমন জন্মস্থানের নাম বলিতেন না, তেমনই পিতা মাতার নামও প্রকাশ করিতেন না। ১৮৮১ সম্বৎ। [ খৃঃ ১৮২৪ ] দয়ানন্দের জন্মাব্দ।

দয়ানন্দের পিতা উদীচ্য ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতা ধনশালী এবং সম্ভ্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। অধিকন্তু দয়ানন্দের পিতা একজন ঘোরতর শৈব বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

দয়ানন্দ বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি। এই হেতু চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি সমগ্র যজুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাল্যকাল হইতে তেমনই সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তিনি, ইচ্ছা করিলে, সংসারে থাকিয়া সকলপ্রকার সাংসারিক সুখই উপভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। যে হেতু, যে বৈরাগ্যের অনল তাঁহার অন্তরে অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল, তাহা ক্রমশঃ স্ফুলিঙ্গময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে সাংসারিকতার সীমা হইতে দিন দিনই পৃথক্ করিয়া ফেলিতে লাগিল। একটি সহোদরার মৃত্যু, এবং মৃত্যুকালীন অবর্ণনীয় যন্ত্রণাই দয়ানন্দের এই সংসার বিরক্তির কারণ। এই সম্পর্কে তিনি নিজে বলিয়াছেন,—"আমার চারিদিকে যখন আত্মীয় স্বজনগণ ভগিনীর নিমিত্ত বিলাপ ও রোদন করিতেছিলেন, আমি তখন পাষাণনির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, ইহ সংসারে সকল মনুষ্যকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। সুতরাং, আমিও এক দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইব। আমি ভাবিলাম, কোথায় গমন করিলে মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইব, এবং মুক্তির পথ দর্শন করিব। আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্কল্প করিলাম যে, যে কোন প্রকারেই হউক, আমি মুক্তির পথ আবিষ্কার পূর্ব্বক অবর্ণনীয় মৃত্যুক্লেশ হইতে আপনাকে রক্ষা করিব।" এই সুমহৎ সঙ্কল্পে দয়ানন্দ ক্রমশঃ সুদৃঢ় হইয়া উঠিলেন; এবং একদিন সন্ধ্যাকালে সংসারের স্নেহ মমতা চিরদিনের মত বিসর্জ্জন করিয়া, মুক্তির পন্থা অন্বেষণে বাহির হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় একুশ।

দয়ানন্দ শুনিয়াছিলেন যে, মানুষ যোগবলে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই হেতু তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়াই যোগীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কএক স্থানে কএক জন যোগীর নিকটে যোগবিষয়ে কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়া, প্রায় দুই বৎসর পরে, তিনি নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী চানোদকর্ণালিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এইস্থানে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, এবং গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী নামে প্রখ্যাত হইলেন। চানোদ-কর্ণালির অদূরেই ব্যাসাশ্রম। ব্যাসাশ্রমের যোগানন্দ যোগবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত। এই নিমিত্ত তিনি যোগানন্দের নিকটে যাইয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাহাতে দয়ানন্দের তৃপ্তি হইল না। তিনি যোগমার্গের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। তদনুসারে নর্ম্মদাতট পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি ভারতের অপরাপর স্থান ভ্রমণে বাহির হই-

লেন। ভ্রমণ করিতে করিতে, কিছুদিন পরে, তিনি উত্তরাখণ্ডের হিমভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই সময়ে দয়ানন্দের চিত্তে যোগ-জিজ্ঞাসা এতই প্রবলা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি যে স্থানে কোন যোগী পুরুষের সন্ধান পাইতেন, শত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। এই কারণ, কখন অখিমঠে,কখন যোশিমঠে, কখন তুঙ্গনাথের তুঙ্গশৃঙ্গে, কখন বা অলকনন্দার চির-তুষারাবৃত তটভূমিতে যাইয়া, তিনি যোগসিদ্ধ মহাত্মাদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি ইহার জন্য শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি এই উদ্দেশ্যে দুর্গম পথ, দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুরারোহ পর্ব্বত, তুষারময় শৈলশৃঙ্গ, শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমি সকল অতিক্রম করিতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। দয়ানন্দ এই একই উদ্দেশ্যে এক একটি করিয়া এগারটি বৎসর ক্ষেপণ করিলেন। তথাপি কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং দায়ানন্দ তখন অতৃপ্তচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে ঘটনাক্রমে মথুরাবাসী এক মহাত্মার সন্ধান পাইয়া, তিনি অবিলম্বে মথুরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মথুরাবাসী সেই মহাত্মার নাম বিরজানন্দ স্বামী। বিরজানন্দ, চক্ষুহীন বলিয়া প্রজ্ঞাচক্ষু নামে অভিহিত হইতেন। বস্তুতই তিনি প্রজ্ঞাচক্ষু ছিলেন। বিরজানন্দের পাণ্ডিত্য বিরজানন্দের প্রতিভা, বিরজানন্দের শাস্ত্রদর্শিতা, বিরজানন্দের বাক্‌পটুতা সমস্তই অদ্ভুত। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে দুই চক্ষুহীন হইয়া পড়িলেও,সমগ্র শাস্ত্র বিরজানন্দের তুণ্ডাগ্রে নৃত্য করিত। বিরজানন্দের সম্বন্ধে এইস্থলে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বিরজানন্দ সর্ব্বদাই বলিতেন যে, যাহা ঋষি প্রণীত গ্রন্থ, তাহা থাকুক, আর যাহা মনুষ্য প্রণীত, তাহা বিলুপ্ত হইয়া যাউক। এই হেতু তিনি বেদাদি আর্যগ্রন্থ এবং বেদোক্ত ধর্ম্মকেই স্বীয় হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন; এবং বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনারূপ মহা সঙ্কল্প অন্তরে লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেও,বৈদিক ধর্ম্মের জয়পতাকা স্কন্ধে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং কাহার স্কন্ধে সেই পতাকা অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন, এই চিন্তাতেই দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। এমত সময়ে দয়ানন্দ যাইয়া দণ্ডবৎ হইলেন।

দয়ানন্দ জ্ঞানশিক্ষার্থী। সুতরাং শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, বিরজানন্দ অপরকে যাহা বলিতেন, দয়ানন্দকেও তাহাই বলিলেন। তিনি বলিলেন,—"তুমি, একাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ, সব ভুলিয়া যাও। তোমার নিকট যদি কোন মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থ থাকে, তবে তাহা যমুনার জলপ্রবাহে ফেলিয়া আইস। যেহেতু মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থের আলোক তোমার হৃদয়ে যত দিন প্রতিভাত থাকিবে, আর্ষগ্রন্থের আ-

লোক তত দিন কিছুতেই প্রতিভাত হইবে না"। দয়ানন্দ তাহাই করিলেন, এবং বিরজানন্দের পাদমূলে উপবিষ্ট হইয়া নূতন ভাবে ও নূতন প্রণালীতে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি পাণিনি-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাষ্য এবং নিরুক্ত প্রভৃতি আর্ষ-গ্রন্থগুলি একে একে অধ্যয়ন করিলেন। আর্ষ গ্রন্থমালার আলোচনায় দয়ানন্দের চিত্তে একটি নূতন আলোকের সঞ্চার হইল। সে আলোক তিনি ইতঃপূর্ব্বে এত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও প্রাপ্ত হয়েন নাই, সে আলোক তখন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে তৃপ্তচিত্ত না করিলেও, তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন যে,সেই আলোকের সাহায্যেই তিনি তাঁহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু ক্রমে লাভ করিতে পারিবেন। শিক্ষাসমাপ্তির পর দয়ানন্দ বিদায়-প্রার্থী হইলেন। বিদায় কালে বিরজানন্দ প্রিয়তম শিষ্যকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং আশীর্ব্বাদের পর বলিলেন, —"তোমাকে আমার নিকটে একটি প্রতিশ্রুতি করিয়া যাইতে হইবে।" দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি প্রতিশ্রুতি, খুলিয়া বলুন?" বিরজানন্দ বলিলেন,—"তুমি যত দিন জীবিত থাকিবে, আর্য্যাবর্ত্তে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ততদিন বদ্ধপরিকর রহিবে।" দয়ানন্দ "তথাস্তু" বলিয়া বিদায় হইলেন।

অতঃপর তিনি মথুরা হইতে আগ্রায় আসিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করিলেন। আগ্রা হইতে গোয়ালিওর, জয়পুর ও আজমীর প্রভৃতি নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া নানা সম্প্রদায়ের সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল সম্প্রদায়ের নিকটই বেদোক্ত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। পরিশেষে ১৯২৪ সংবতের [ খৃঃ ১৮৬৭ ] সনের কুম্ভে আসিলেন, এবং হরিদ্বারের উচ্চতর ভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়াই বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন, সেই ডঙ্কা-নাদে অনেকেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া দণ্ডী, পরমহংস এবং পরিব্রাজকগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, —"এ আবার কি! এ আবার কে?" ফলতঃ সেইক্ষণ হইতেই দয়ানন্দ-দিবাকর প্রকট হইতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে, হরিদ্বারের উচ্চভূমি হইতে অবতরণ করিয়া, গঙ্গাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের প্রবাহকে প্রসারিত করিবার উদ্দেশে, তিনি অনুগাঙ্গ প্রদেশের নগর ও জনপদ সমূহ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি গড়মুক্তেশ্বর হইতে কাম্পিল, কাম্পিল হইতে ফরাক্কাবাদ, এবং ফরাক্কাবাদ হইতে কানপুর ও প্রয়াগ হইয়া বারাণসীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বারাণসীতে বৈদিক ধর্ম্মের বিজয়নিশান উড্ডীন হইল। দয়ানন্দ কাশীর বক্ষের উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চনাদে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে—"শক্তিশৈববাদি সাম্প্রদায়িক মত বেদবিরুদ্ধ, তিলক ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ বেদবিরুদ্ধ, এবং পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজনও বেদবিরুদ্ধ।" সেই ঘোষণা শুনিয়া কাশীর লোকে কোলা-

হল তুলিল। দয়ানন্দকে পরাভূত করিবার উদ্দেশে অচিরে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। মহাসভার মহাব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত আনন্দবাগের অভিমুখে জনস্রোত ছুটিতে লাগিল। কাশীরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বর-প্রসাদ নারায়ণ মহাসভার অধিনায়ক হইলেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও পণ্ডিত বালু-শাস্ত্রী প্রভৃতি মহারথগণ সমাগত পণ্ডিত-বৃন্দের প্রতিনিধি হইয়া দয়ানন্দের সঙ্গে শাস্ত্রসংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সংগ্রামে দয়ানন্দের পক্ষ অপরাজিত হইয়া রহিল। কাশীর আভরণ মহারথগণ একত্র হইয়াও ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেন না যে, পাষাণাদি মূর্ত্তিপূজন বেদানুমোদিত। পণ্ডিতগণ মিছামিছি একটা কোলাহল তুলিয়া বলিতে লাগিলেন—"দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছেন।" সে কোলাহলে কেবল কাশীর কলঙ্কই প্রকাশ পাইল। সেই শাস্ত্রসংগ্রামে কাশী কাঁপিয়া উঠিল, এবং সেই কম্পনস্রোত চতুর্দ্দিকে গড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র ভারতকে কাঁপাইয়া তুলিল। দয়ানন্দের নাম তখন ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ইহার পর দয়ানন্দ বিহারে গমন করিলেন, বঙ্গদেশে আসিলেন, এবং মান্দ্রাজ ভিন্ন ভারতের প্রায় সমস্ত বিভাগেই পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তিনি কি বোম্বাই কি রাজপুতানা, কি পঞ্জাব যে স্থানেই যাইলেন, সেই স্থানের পণ্ডিতদিগকে বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। মূর্ত্তিপূজা বেদপ্রতিপাদিত নহে,—সুতরাং উহা মিথ্যা, এই কথা একাকী একসহস্র হইয়া তিনি আর্য্যাবর্ত্তের চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। দীপ্যমান অগ্নিশিখা যেমন সহজে নির্ব্বাপিত হয় না, প্রচণ্ড নদীপ্রবাহকে যেমন সহজে রোধ করা যায় না, দয়ানন্দের প্রতাপও তেমনই নির্ব্বাপিত হইল না,—তাঁহার গতিও তেমনই রুদ্ধ হইয়া পড়িল না। এতদ্ভিন্ন তিনি স্থানে স্থানে বৈদিক পাঠশালা স্থাপিত করিলেন। আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারের পথ খুলিয়া দিলেন, গবাদি পশুর উন্নতির জন্য গোরক্ষিণী সভার সূচনা করিলেন, এবং এইরূপ আর্য্যাবর্ত্তের অশেষ হিতসাধক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের [ ১৯৪০ সম্বৎ ] ৩০শে অক্টোবর দীপাবলীর দিবসে ভারতের সমস্ত দীপমালাকে নির্ব্বাপিত করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। এই ত গেল দয়ানন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।*

* প্রবন্ধলেখক চিন্তাশীল পণ্ডিত ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত মত ও সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি থাকা সম্ভব নহে।

বান্ধব-সম্পাদক।

# ভারতীয় কবি ও চিত্রকর।

কবি ও চিত্রকর উভয়ই এক শ্রেণীভুক্ত। প্রথমোক্ত মহাত্মা তাঁহার মনোভাব সুললিত ও চিত্তাকর্ষক ভাষার সাহায্যে লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিয়া থাকেন; এবং অপরে (চিত্রকর) তাহা সুরঞ্জিত ও নয়নমোহকর বর্ণসহযোগে তুলিকাদ্বারা চিত্র ফলকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইয়া দেন। কেবল মাত্র ছন্দোময়ী ভাষাই যেমন উৎকৃষ্ট কাব্যের পরিচায়ক নহে, তদ্রূপ কেবল মাত্র বিচিত্র বর্ণবিন্যাসই উৎকৃষ্ট চিত্রের লক্ষণ নহে। বস্তুতঃ, ভাবমূলক ছন্দ অথবা গদ্যময়ী ভাষা, উভয়ত্রই প্রকৃত কবিত্ব সম্ভবপর; এবং তন্মূলক আলোক ও ছায়াযুক্ত (Light and shade) বর্ণবিন্যাসই সুনিপুণ চিত্র। কি কাব্যে, কি চিত্রে, ভাব-পরিস্ফুট না হইলে, কবি অথবা চিত্রকরের শ্রম নিরর্থক হয়। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্"—রসাত্মক বাক্যবিন্যাসই কাব্য,—কবি শৃঙ্গারাদি রসের অবতারণা করিতে যাইয়া, তাহা সুব্যক্ত করিতে না পারিলে, তাঁহার শ্রম কেবল পণ্ডশ্রম হয়। চিত্রকরের পক্ষেও এই উক্তি প্রযুজ্য।

সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে পীযূষোপম অগণ্য কাব্যমালা বিদ্যমান। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের নিকট ইহার কতকগুলি কেবল মাত্র ছন্দোবদ্ধ কবিতামাত্র, অতএব সেগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য নামে অভিহিত হইতে পারে না, কিন্তু আবার কতকগুলি জগতের সাহিত্যক্ষেত্রে অতুলনীয়। যে দেশে মহাকবি বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাসপ্রমুখ মহামনস্বী কবিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদের প্রচারিত কাব্য নাটক প্রভৃতিতে সুনিপুণ চিত্রাদির ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে দেশে উৎকৃষ্ট চিত্রাদির অভাব দেখিলে, বিস্মিত ও পরিতপ্ত হইতে হয়, এবং সত্যই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, "প্রাচীন ভারতে কি একজনও ভেণ্ডাইক্ অথবা রাফেলের ন্যায় চিত্রকর উদ্ভূত হয়েন নাই?" এ কথা বিশ্বাস করিতে যেন কিছুতেই প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের অনুমান হয়, এক সময়ে এই অধঃপতিত ভারতবর্ষে চিত্রবিদ্যার সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাকবি ভবভূতি প্রণীত সুবিখ্যাত উত্তরচরিত নাটকের চিত্রদর্শন নামক অঙ্কের উল্লেখ করা যায়, এবং মহাকবি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ কাব্য হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে যথা—

"আলেখ্য শেষং পিতরংদদর্শ।"

এতদ্ব্যতীত উক্ত মহাকবি প্রণীত কুমার-

সম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রভৃতি হইতে অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। রত্নাবলী নাটিকা, মালতীমাধব নাটক প্রভৃতিতেও চিত্রবিদ্যার অস্তিত্ব বিষয় ভূরি ভূরি প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য নহে, বাহুল্য ভয়ে সকলগুলি উদ্ধৃত হইল না, কুতূহলী পাঠকবর্গ মূল গ্রন্থগুলি পাঠ করিলেই এ বিষয় নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। এস্থলে কুমারসম্ভব হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে যথা—

"উন্মীলিতং তুলিকয়েব চিত্রং
সূর্য্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।"
"তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে।"

অভিজ্ঞান শকুন্তলে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতেও এ বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কালবশে এবং শত সহস্র বিপ্লবে ভারতের অনেক কীর্ত্তিকলাপই বিধ্বস্ত হইয়াগিয়াছে। ইহা জাতীয় অধঃপতনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সুসভ্য ও কলানিপুণ ইংরেজ জাতির সংস্রবে ভারতবর্ষে অধুনা চিত্র-বিদ্যার পুনরভ্যুদয় হইতেছে। আশা হয়, অচিরেই উক্ত বিদ্যা ফলবতী হইবে। বর্ত্তমান কালে স্বনামখ্যাত (রাজা রবিবর্ম্মাপ্রমুখ কতিপয় প্রতিভাশালী চিত্রকর স্বীয় স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়া আমাদের আশা তরুর মূলে বারিসিঞ্চন করিতেছেন। ভগবানের কৃপায়, তাহা মুকুলিত হইয়া ফলবতী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবিবর্ম্মার চিত্রগুলি ভাবময় এবং সুরুচিসম্পন্ন এবং এগুলির বর্ণবিন্যাস সুনিপুণ ও মনোহর। আশা হয়, ইহার ন্যায় আরও প্রতিভাশালী চিত্রকর আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। রবিবর্ম্মাকৃত চিত্রগুলি প্রায়ই এক ছাঁচে ঢালা, এবং রমণী মূর্ত্তিগুলি যেন প্রাদেশিক ভাবে চিত্রিত, অর্থাৎ প্রায়ই বোম্বেয়ে' রকমের; এবং চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তিগুলির বেশভূষা ঠিক সময়োচিত নহে, সেগুলি যেন একটু (Anachronism) দোষযুক্ত। তথাপি বলিতে হইবে যে, রবিবর্ম্মাকৃত চিত্রাবলি আমাদের স্পর্দ্ধার সামগ্রী। বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর ভারতবর্ষীয় উৎসন্নপ্রায় শিল্পবিদ্যার পুনরুদ্ধার-কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; এবং জাতীয় মহাসমিতি বার্ষিক অধিবেশনের সহিত শিল্পপ্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া, প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যের পথ প্রসর করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন দেশীয় কৃতবিদ্যমণ্ডলী এবং ধনীসম্প্রদায় পৃষ্ঠপোষক হইলে শিল্পী ও চিত্রকরগণ দ্বিগুণ উৎসাহে স্বীয় স্বীয় বিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিতে পারে। নতুবা সমস্ত চেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য হইবে। আমাদের ধনী সম্প্রদায় বৈদেশিক শিল্পের প্রতি যাদৃশ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার শতাংশের একাংশও দেশীয় শিল্প কার্য্যের প্রতি প্রদর্শিত হইলে, দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত এবং রবিবর্ম্মার ন্যায় আরও সুনিপুণ চিত্রকর প্রাদুর্ভূত হইতেন; কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমাদের সে আশা সুদূর-পরাহত।

ভারতবর্ষে এক সময়ে * চতুঃষষ্ঠী কলা বিদ্যা প্রচারিত হইয়াছিল। অধুনা তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত, ইহা আমাদের অবনতিরই পরিচায়ক। চেষ্টা করিলে, ইহার অনেকগুলির পুনরভ্যুদয় হইতে পারে, অতএব সময়োচিত প্রযত্ন বিধেয়।

আলোচ্য বিষয় হইতে আমরা একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; অতএব প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক—কবি, কল্পনার চক্ষে কত বিচিত্র বস্তুই দর্শন করেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার মানসিক গতিরই ত সীমা নাই। তিনি কখনও পৃথিবীতে কখনও, অনন্ত তারকাগ্রহখচিত নভোমণ্ডলে, কখনও স্বর্গে, কখনও নরকের গভীর অন্ধকারে, আবার কখনও তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বতশিখরে, কখনও বা অতল জলধি-গর্ভে কল্পনা বলে বিচরণ করেন। ফলতঃ মহাকবি সেক্সপীয়র যথার্থই বলিয়াছেন,—

—"The poet's Eye in fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to Earth, from earth to heaven;
And, as imagination bodes forth,
The forms of things unknown the poets pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

মহাকবি কালিদাস একখানা সামান্য মেঘ একজন বিরহী যক্ষ এবং তদীয় বিরহবিধুরা একবেণীধরা মলিনা ও কৃশা পত্নীকে আহ্বান করিয়া কল্পনার কতই না বিচিত্র লীলা খেলা দেখাইয়াছেন,—ক্রমেই লীলা তাঁহার অমৃতময়ী লেখনীমুখে গভীর জীমূত মন্দ্রে মন্দাক্রান্তা ছন্দে উচ্ছলিত হইয়া আমাদের কর্ণে আজও সুধাবর্ষণ করিতেছে এবং আরও কতকাল এই ভাবেই চলিয়া যাইবে তাহা কে বলিতে পারে? ধন্য কবি কালিদাস, এবং ভারতবর্ষ! যে দেশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। একজন সুনিপুণ চিত্রকর যদি এই মেঘদূতের বর্ণিত বিষয়টি চিত্রফলকে ভাল সমাবেশ সহকারে প্রতিফলিত করতঃ আমাদের নয়নগোচর করিতে পারেন, তবে কতই না আনন্দের বিষয় হয়। ফলতঃ আমাদের পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতিতে সুললিত চিত্রের অনেক আদর্শ

* চিত্রবিদ্যার ন্যায় নৃত্য, গীত, আলেখ্য রচনা, উদকবাদ্য ও পুষ্পাস্তরণ প্রভৃতি চৌষট্টিটি সুকুমার শিল্প চতুঃষষ্ঠী কলা বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। প্রবন্ধ লেখক মহারাজ বাহাদুর ফুট্‌নোটে সেই চৌষট্টিটি বিদ্যারই পৃথক্ পৃথক্ নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সে সকল কলাবিদ্যার মধ্যে অনেকটির নামও এখন অবোধ্য। আমরা, এইহেতু, স্থানাভাব বশতঃ, এখানে সে নামাবলীর সুদীর্ঘ তালিকা লিপিবদ্ধ করিলাম না। পাঠক প্রকৃতিবাদ অভিধানে কলা শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানিতে পাইবেন।

বান্ধব সম্পাদক।

বর্ত্তমান আছে, আমাদের বিবেচনায় সেই-গুলি অবলম্বনেই চিত্রাঙ্কিত করা সঙ্গত,—তাহাতে ভাববিকাশও সহজ হয় এবং আমাদেরও উহা অধিকতর মনঃপূত হয়। বৈদেশিক ভাব ধারণা করা দুরূহ; এবং তাহা চিত্রে প্রতিফলিত করাও আয়াস-সাধ্য। অতএব দেশীয় আদর্শ অবলম্বন করাই সমীচীন। রবিবর্ম্মা এই পন্থা অবলম্বন করিয়া দূরদর্শিতা এবং ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন, এইজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। শুনিতে পাই, কোনও উদীয়মান বঙ্গীয় চিত্রকরও এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহার চিত্রাবলী আমরা আজও দেখিবার অবসর পাই নাই। অতএব তৎসম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে বিরত রহিলাম।

আমাদের বিবেচনায় হিন্দুরমণীগণের পক্ষে চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা অবাঞ্ছনীয় নহে। প্রত্যুত রমণীর ভাবপ্রবণ কোমল হৃদয়ে সুললিত কলাবিদ্যার বীজ উপ্ত হইলে, তাহা সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া মহামহীরুহে পরিণত এবং কালে ফলবান্ হইবে, ইহা বোধ হয়, অসম্ভব নহে। কথা এই যে, এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে কে? রমণীগণের পুরুষ দ্বারা শিক্ষিত হওয়া, আমাদের বিবেচনায় সঙ্গত নহে, অথচ এ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীরও অভাব। এ সমস্যার মীমাংসা কি? সুধিগণের ইহা বিবেচ্য বটে। মধ্যম শ্রেণীর ভদ্র পরিবারের মহিলাগণ নানাবিধ গৃহকার্য্যে লিপ্ত রহিয়া, সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ধনীগৃহের রমণীগণ বিলাসের ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়া অথবা বাক্যালাপে পরনিন্দার আমোদ উপভোগ করিয়া—দর্পণে স্বীয় স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া—কুরুচিপূর্ণ নাটক নভেল পড়িয়া এবং সুবাসিত তাম্বুল-চর্ব্বণে অধর রঞ্জিয়া সময়ের অপব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশেষে রুগ্নদেহে, ভগ্নমনে, জলবুদ্বুদের ন্যায় কালসাগরে বিলীন হইয়া যান। এই অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে কলাবিদ্যার আলোচনা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন ভারতে রাজকুলবধূরা রাজকন্যাগণ এবং অন্যবিধ নাগরিক মহিলাগণ সুকুমার কলাবিদ্যা আলোচনায় সময়পাত করিতেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব আধুনিক হিন্দু রমণীগণের পক্ষে তাঁহাদের পদানুসরণ করা শ্রেয়ঃ।

বর্ত্তমান কালে, আমাদের দেশে অনেক মহাত্মা পাশ্চাত্য মতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার অনুশীলন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাতে ভগ্নোৎসাহ হওয়ার কারণ নাই; যেহেতু—'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ'। প্রকৃতপক্ষে আলোক ও ছায়াপাত চিত্রে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে, চিত্র কেবল পট মাত্র হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ চিত্রই এই শ্রেণীর। অতএব এ বিষয় শিক্ষা সাপেক্ষ।

* কোন কোন বঙ্গীয় যুবক ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষাকরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তাঁহাদের

লক্ষবিদ্যা প্রচারের রীতি মত চেষ্টা হওয়া আবশ্যক এবং দেশীয় আদর্শ অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্রাঙ্কনে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষে অচিরেই চিত্রবিদ্যা পুনরুজ্জীবিত হইবে; এবং প্রত্যেক বিপণিতে এবং ধনী ও অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলীর গৃহে আমরা সুরঞ্জিত বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ, সুঠাম চিত্রাবলী বিলম্বিত দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতে পারিব এবং দেশীয় সুধিবৃন্দ ও ধনী সম্প্রদায়ও এ বিষয়ে শিল্পিগণকে উৎসাহ দান করিবেন।

ভগবানের কৃপায় অচিরেই আমাদের এই অতৃপ্ত বাসনা ফলবতী হইবে; এবং স্বদেশের যশোভাতি দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইবে। এখন অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; অতএব সমায়োচিত তরণী বাহিয়া চলা উচিত। স্বদেশীয় কর্ণধারগণকে এ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই ভারতবর্ষ প্রকৃতির লীলাভূমি,—এবং ইহার কাব্য-কাননে সুন্দর প্রসূনরাজি বিরাজিত। ইচ্ছা করিলেই ইহা হইতে চিত্রের যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। অতএব কি Landscape (প্রাকৃতিক) painting কি protrait painting (মানবচিত্রে) অনেক আদর্শ এই ভারতবর্ষ হইতেই সংগ্রহ করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তবেই সেগুলি আমাদের জাতীয় সম্পপত্তি হইবে এবং বৈদেশিক চিত্র অপেক্ষা সমধিক নয়নানন্দকর ও হৃদয়গ্রাহি হইবে,—অলমতি বিস্তারেণ।

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, এ।
মহারাজা, সুসঙ্গ।

## কবিসূক্তি

(১)

উপকারিণি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ
যঃ সমাচরতি পাপম্;
তং জনমসত্যসন্ধং ভগবতি
বসুধে কথং বহসি।

বিশ্বাসে নির্ভর করে,—করে উপকার,
সতত সরল-মতি না জানে খলের গতি,
তার প্রতি হায় যার পাপ-ব্যবহার;
কেমনে মা বসুমতি, তোমার পবিত্র দেহে,
বহ সেই কৃতঘ্নের ভার।

(২)

দুর্জ্জনেন সমং বৈরং
প্রীতিঞ্চাপি ন কারয়েৎ।
উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ
শীতঃ কৃষ্ণয়তে করম্॥ ৯

শত্রুতা ক'রো না কভু দুষ্টের সহিত,
মিত্রতাও তার সনে নহে ক বিহিত।
উত্তপ্ত অঙ্গারে হয় অঙ্গের দহন,
শীতল অঙ্গারে কালো কলঙ্কলাঞ্ছন।

# জানকীর অগ্নিপরীক্ষা।

## কাব্য—ইতিহাস—বিজ্ঞান। ..

আজি লঙ্কার উত্তর দ্বারে, সমুদ্রের তীরে, —সুবেল নামক * অত্যুচ্চশৈল-শৃঙ্গের অদূরে, লোকে লোকারণ্য। অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ ও অতুল-প্রতাপ রাবণের নিধন-সময়ে, লঙ্কার বহির্দ্বারে, লোকের যেরূপ ঘটা হইয়াছিল, আজি তাহা হইতেও অধিকতর ভয়ঙ্কর লোক-সংঘট্ট। এক দিকে, রাবণের প্রাচীর-পরিখা-পরিবেষ্টিত কাব্যকীর্ত্তিত রম্যলঙ্কা; আর এক দিকে, দক্ষিণভারতের মেখলা-রূপিণী, তুঙ্গতরল-তরঙ্গশোভিনী সমুদ্ররেখা। মধ্যে ধূ-ধূ-বিস্তারিত বৃহৎ প্রান্তর। কিন্তু সে বিশাল প্রান্তরে আজি তিলার্দ্ধস্থান শূন্য নহে। সমস্তই লোকে পরিপূর্ণ।

তবে এই এক বৈচিত্র্য, আজিকার এই লঙ্কাসন্নিহিত লোকারণ্য নিবাত-নিশ্চল অটবী, অথবা অসংখ্য-চিত্রিত-মূর্ত্তির প্রদর্শনীর ন্যায়, নিস্পন্দ ও নীরব। যেখানে, বিশেষ কোন কারণে, বহুলোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত সমাগম হয়, সেখানে, মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত মধুর ও কর্কশ, অস্ফুট ও উচ্চৈঃস্বরিত কথোপকথনে, কেমন একটা অদ্ভুত হল-হলা-শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু আজিকার এই লোকারণ্য, প্রবল ঝটিকার প্রাক্কালীন নিস্তব্ধ-প্রকৃতির ন্যায়, এক বারে শব্দশূন্য। যে, যেখানে, যে ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, সে, সেখানে, ঠিক সেই ভাবেই, প্রস্তরনির্ম্মিত পুতুলের মত, আপনাতে আপনি স্থির রহিয়াছে;—মুখ ফুটিয়া কথাটি কহিতে অথবা মুখ তুলিয়া সম্মুখস্থ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সাহস পাইতেছে না। ইহার কারণ কি?

উল্লিখিত লোকারণ্যের মধ্যস্থলে, মৃণ্ময় বেদীর উপরে, জটাবন্ধন-বিলম্বিত জগজ্জয়ী রাম, হাতের ধনুর্ব্বাণ দূরে ফেলাইয়া, অপ্রফুল্লবদনে ও অগ্নিবর্ষিনয়নে, বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছেন; এবং মাঝে মাঝে, আপনার মনঃপ্রাণ-দাহি দীর্ঘশ্বাসে ক্ষোভিত, হইতে-

* বাল্মীকীয় ভূগোল অনুসারে লঙ্কার চারি দিকে চারিটি প্রান্তর ছিল। উত্তর-দিগর্ত্তি প্রান্তরের শেষ সীমায়, সমুদ্রের তটে, ক্ষুদ্র একটি পর্ব্বত ছিল, তাহার নাম সুবেল। যথা বাল্মীকীয় যুদ্ধকাণ্ডের ৩৭শ সর্গে,—
"সুবেলারোহণে বুদ্ধিং চকার মতিমান্ প্রভুঃ।
রমণীয়তরং দৃষ্ট্বা সুবেলস্য গিরেস্তটম্।"

ছেন। দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, রামের অস্থিপঞ্জরও যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; এবং তাঁহার হৃৎপিণ্ড কেমন একটা অন্তর্গূঢ় অভাবনীয় দুঃখে দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইতেছে। রামের দক্ষিণে ও বামে, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণ প্রভৃতি লঙ্কা-সমর-সহায় সুহৃদ্বর্গ;—পুরোভাগে,—একটুকু দূরে, ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ ও ভক্তকুল-চূড়ামণি বীরাগ্রণী হনুমান্;—সম্মুখে,—নয়ন-সান্নিধ্যে—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী,—রমণীজন-স্পৃহণীয় নবনীত-কোমলতা ও ঋষিতাপস-পূজ্য নির্ম্মল পবিত্রতার প্রতিকৃতিরূপিণী,—তপ্ত-কাঞ্চন-প্রতিমা জানকী।

জানকী কৃতাঞ্জলি দণ্ডায়মানা। যাঁহার কাছে, মিথিলার রাজভবনে ও অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে, অসংখ্য আশ্রিতবর্গ, দুঃখ-তাপ-হরা বরাভয়-করা দেবীপ্রতিমার নিকট ভক্তের ন্যায়, গদ্গদ-ভক্তিতে কৃতাঞ্জলি রহিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত, আজি সেই জানকী ক্লিষ্ট-কৃতাঞ্জলি মূর্ত্তিতে অবনত-বদনা। জানকী চিরজীবনই পতিপাগলিনী ও পতিসোহাগিনী,—পতিহৃদয়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী রাজরাণী; তথাপি, আজি অকস্মাৎ, পতিবিরাগে যার-পর-নাই বিপন্না। তিনি তাঁহার প্রেমানুবদ্ধ ও প্রাণপ্রতিম পতির নিকট ইহ জীবনে কখনও যে ভাবে দণ্ডায়মান হন নাই, আজি সেই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নীলোৎপল-সদৃশ চক্ষু দুটি হইতে দর-দরিত ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। তাঁহার সুকুমার অঙ্গ-যষ্টি, অতি দুঃখিনী শোকাতুরার শরীরের মত, ক্ষণে ক্ষণে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। তিনি এইরূপে, মাথা হেঁট করিয়া, অশ্রুজলে ভাসিতেছেন; এবং হায়! এ কি হইল, যেন এই এক কথাই চিন্তা করিতেছেন।

কিন্তু জানকীর অশ্রুবর্ষণ অথবা অঙ্গোচ্ছ্বাসে ভয়ের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে না। তাঁহার দৃষ্টি কাতর; অথচ দয়ার্দ্রহৃদয়া দেবতার ধবল-বহুলা স্নিগ্ধ দৃষ্টির ন্যায়, স্নেহ ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ;—সময়ে সময়ে ঘৃণা ও অভিমানেও যেন একটুকু সঙ্কুচিত। উহা শ্রীরামচন্দ্রের বিষাদমলিন মুখচ্ছবির দিকে এক এক বার কেমন এক ভাবে আকৃষ্ট হইতেছে; এবং যেন দয়ায় গলিয়া,—আপনাকে ভুলিয়া, দৃষ্টির সেই অনির্ব্বচনীয় অস্ফুট ভাষায়, ধীরে ধীরে কহিতেছে,—হা রাম! তুমি আমায় চিনিলে না! হা হৃদয়বল্লভ! হা আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! তুমি, এত বড় হৃদয়িক পুরুষ এবং এত হৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইয়াও, তোমার এ চিরসঙ্গিনীর হৃদয়টারে তৌলাইয়া বুঝিতে সমর্থ হইলে না।

শোক-ভয়ঙ্কর লঙ্কাযুদ্ধের অবসানসময়ে,—জয়-জয়-কোলাহলময় বিজয়মহোৎসবের শুভ-অভ্যুদয়ে, আজি সকলেই এইরূপ স্বপ্নাতীত অশুভ-বিষাদে বিষণ্ণ দৃষ্ট হইতেছেন কেন? দেব-নর-দুরাধর্ষ দুর্ব্বৃত্ত রাবণ,—দক্ষিণ-ভারতের শরীরবদ্ধ শল্য, অথবা সর্ব্বপ্রকার দুঃখদুর্গতির একমাত্র কারণ, "সবংশে নির্ব্বংশ" হইবে, এবং তাহার বীর-প্রাচীরা

বীর-হুঙ্কার-মুখরা পৃথ্বীবিজয়িনী লঙ্কা, রামচন্দ্রের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া, ভারত-ললনা ও ভারতীয় বনবাসী ঋষিদিগকে নিঃশঙ্ক করিবে, ইহা কেহই সহজে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। আজি সেই রাবণ, রাম-শরে নিহত হইয়া, হতভাগ্য পামরের ন্যায়, ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছে; এবং তাহার লঙ্কা-রাজ্য ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে,—লঙ্কার সর্ব্ববিধ সম্পদ, যেন সতী সাধ্বী জানকীর শাপানলে ভস্মীভূত হইয়া, সমস্ত সংসারের বিস্ময় জন্মাইয়াছে; অথচ কাহারও মুখে হাসি ফুটিতেছে না,—কেহই একবার রামচন্দ্রকে অভিনন্দন অথবা সে রামময়-জীবিতা জানকীরেও অভিবাদন করিতেছে না, ইহার কারণ কি?

কারণ—অশ্রোতব্য ও অনুচ্চার্য্য কথা; কারণ—জানকীর চারিত্র-তথ্যনির্ণয়,—অথবা যে জানকীর জন্মগ্রহণে এ জগৎ পবিত্র হইয়াছে,—যাঁহার চারিত্রশক্তির অলৌকিক প্রভাবে মনুষ্যের কাব্যে অমৃতসিন্ধু উছলিয়াছে,—মনুষ্যজগতের কোটি হৃদয় স্বর্গীয়-পবিত্রতার সুধাস্বাদে অধিকারী হইয়া শত হস্ত উপরে উঠিয়াছে,—যাঁহার নামমাত্র-উচ্চারণেও জীব-হৃদয়ের পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই অনলদগ্নিনিভা, জ্যোতিঃ-প্রতিভা, পুণ্যশ্লোকা জনকনন্দিনীর অগ্নিপরীক্ষা।

অগ্নিপরীক্ষা, এক অর্থে, উচ্চপদারূঢ় উন্নত জীবনের অপরিহার্য্য সঙ্গী। সোনা যেমন, আগুনে সন্তাপিত কিংবা সুচারুরূপে অগ্নিপরীক্ষিত না হইয়া, মনুষ্যের আভরণ হইতে পারে না; সেইরূপ, যাঁহারা মনুষ্য-জাতির সোনা,—চিত্তের উচ্চতা ও উদারতা, এবং চরিত্রের অলোকসাধারণ মহত্ত্ব অথবা পবিত্রতায় সুবর্ণজাতীয়, তাঁহারাও অশেষ-প্রকারে, অগ্নিপরীক্ষার অধীন না হইয়া জগতের আলোক অথবা জগতীয় নর-নারীর আদর্শস্থানীয় হইতে সমর্থ হন না। বস্তুতঃ, যাঁহারা মানবসমাজে কোন না কোন অংশে বড়,—জ্ঞানে গুণে, প্রতিভার জ্যোতিতে, প্রতিষ্ঠার গৌরবে, অথবা নিত্যজীবনের নির্ম্মল-প্রেমময় নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানে, সাধারণ মনুষ্য হইতে একটুকু বেশী সমুচ্ছ্রিত, তাঁহারা কেহই, সংসারে আসিয়া, সুখ-শয্যায় শয়ান রহিয়া, দিনপাত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সকলেই, কোথাও কালের অপূর্ণতায়, কোথাও নিয়ন্ত্ররহিত মানব-সমাজের ঈর্ষ্যা ও অহঙ্কারে,—কোথাও বা কেমন এক-প্রকার আচম্বিত বিপাক-বিড়ম্বনায়, অথবা অপরিজ্ঞেয় দৈবী ব্যবস্থায়, কোন না কোন-রূপ অগ্নিপরীক্ষার অধীন হইয়াছেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ, সে তুষানলবৎ নির্দ্দয়-পরীক্ষার নিদারুণ দাহে, অহোরাত্র দগ্ধ হইয়াও, মনুষ্যজাতিকে অভিসম্পাতের পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদ প্রদানের দ্বারা, মনুষ্যত্বের মহিমা বাড়াইয়াছেন।

ইহার সাক্ষী ইতিহাস। ইতিহাসের প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে প্রবর্ত্তমান অধ্যায় পর্য্যন্ত পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে, এই কথাই মুখ্য কথা। ইয়ুরোপীয় সাহিত্যসভ্যতায় আদি

প্রস্রবণ প্রতিভার বিগ্রহ হোমার; আর সূক্ষ্মার্থজ্ঞান-সম্পদের প্রথম-প্রতিষ্ঠাতা, সর্ব্বজন-হিতৈষী, সদানন্দ সক্রেতিস্। আজি ইয়ুরোপ অশেষবিধ-সারস্বত-বৈভবে অবনীর আদর্শস্থান হইয়া থাকিলেও, হোমার ও সক্রেতিসের নাম, সে বৈভব-রাশির উর্দ্ধতন স্থানে, উজ্জ্বলতম মণিমাণিক্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর কি বিচার! যে দুই মহাপুরুষের নাম-মাহাত্ম্যে ইয়ুরোপের এত অভিমান, এত আদর, তাঁহাদিগের এক জন,—অর্থাৎ কবিগুরু হোমার, স্বজাতির দ্বারে দ্বারে, কাঙ্গালের মত মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া, অকথ্য কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করিয়াছেন; এবং আর এক জন,—অর্থাৎ জ্ঞানগুরু সক্রেতিস্, কতকগুলি অকাল-বৃদ্ধ অবোধ মূর্খের ঈর্ষ্যামূলক অবিচারে, বিষপানে তনুত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ফরাশি জাতির রাজকীয় ইতিহাস, উহার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, আগাগোড়া অবিচার, অত্যাচার, প্রজার হাহাকার এবং পাশব-সুখলালসার প্রমত্তবিকারের সুদীর্ঘ ইতিহাস। যাঁহারা রাজশক্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া ফরাশি জাতির রাজসিংহাসনকে অলঙ্কৃত অথবা অবমানিত করিয়াছেন, তাঁহারা ভোগবিলাস-সম্পর্কে না করিয়াছেন, এমন দুষ্কার্য্য নাই; এবং লোক-নিপীড়ন-সম্পর্কে না অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এমন পাতক নাই। গ্রাম্যভূমির ছাগ-কুক্কুর এবং বন-ভূমির বিষ-সর্প ও ব্যাঘ্র-ভল্লুকও তাঁহাদিগের অনেকের তুলনায় প্রীতিকর পবিত্র বস্তু। ফ্রান্সের তাদৃশ সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীরা,—চার্ল্‌স * হেন্‌রি ও চতুর্দ্দশ লুইর মত সম্রাট্ এবং মার্‌গারিটা ও ক্যাথেরিনার মত সম্রাজ্ঞীরা, সোনার অট্টালিকায়, শতসুন্দরীবেষ্টিত সোহাগের শয্যায়, সুখ-সচ্ছন্দে বাস করিয়া, সম্পদের ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গিয়াছেন; অথচ যে রাজদম্পতি রাজ্যের মঙ্গলসাধনকেই আপনাদিগের পার্থিব জীবনের এক মাত্র ব্রত বলিয়া জানিতেন, এবং দীন-দুঃখীর দুঃখের কথা শুনিলে অশ্রুজলে আপ্লুত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধানের জন্য যত্নপর হইতেন, সেই সাধুস্বভাব ষোড়শ লুই ও সুকুমার-মূর্ত্তি মেরায়া এণ্টোনেটা, নিজ নিজ দেহপ্রাণের প্রত্যেক পরমাণুতে জলন্ত সূচিভেদের যন্ত্রণা ভুগিয়া, এবং জীবনব্যাপি অগ্নিপরীক্ষার চরম দশায় পঁহুচিয়া, অবশেষে, পুত্রপ্রতিম প্রজার বিচারে, পশুর ন্যায় কুঠারঘাতে নিহত হইয়াছেন।

তাই বলিয়াছি, যাঁহারা মানবজাতির আভরণ, অগ্নিপরীক্ষা তাঁহাদিগের অপরি-

* রত্নগর্ভা (!) ক্যাথারিনার দ্বিতীয় পুত্র নবম চার্লস। ক্যাথারিনা তাঁহার বিদ্বিষ্ট ব্যক্তিদিগকে অতি সূক্ষ্ম বিষপ্রয়োগে বিনষ্ট করিতেন; পুত্র চার্লস অপেক্ষাকৃত সরল, তিনি আহূত অতিথিদিগকে স্বহস্তে গুলি করিয়া মনের স্ফূর্ত্তিতে খল-খল হাসিতেন। কিন্তু এইরূপ হইয়াও ইহারা রোমের টাইবিরিয়স প্রভৃতি সম্রাটের তুলনায় উচ্চতর শ্রেণির জীব।

হার্য্য। অগ্নিপরীক্ষার সে অর্থে, মা জানকীর অমিয়-মধুর অনবদ্যজীবন, জীবনের প্রথম-উন্মেষ হইতেই, এক অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ পরীক্ষা। জানকী জন্মিয়া অবধি জননীর মুখ দেখেন নাই,—জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ন করিয়া শীতল হন নাই,—জননীর স্তন্য পান করিয়া প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করেন নাই। তথাপি, আপনার প্রকৃতিনিহিত চারুচরিত্রের স্বাভাবিক-বিকাশে, সর্ব্বপ্রকার সুস্নিগ্ধ, সুমধুর, সুকোমল গুণে সংবর্দ্ধিত হইয়া, এ সংসারে, রমণীজাতির শিরোমণি স্বরূপ শোভা পাইয়াছেন। তাঁহার মা নাই; তিনি সহিষ্ণুতার প্রতিমাসদৃশী পৃথিবীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করিয়া, আপনিই পৃথ্বীস্থ প্রাণিনিচয়ের মাতৃস্থানীয় হইয়াছেন। ইহা সামান্য পরীক্ষা নহে।

তার পর পরীক্ষা পিতার ধনুর্ভঙ্গ পণে। বালিকারা, নবযৌবনের প্রথম-স্ফূর্ত্তি-সময়ে, আশার অনুরূপ বর ও অভিলষিত বিবাহের কথা চিন্তা করিয়া, কতই আনন্দ ও আমোদ করিয়া থাকে। জানকী, তাদৃশ অবস্থায়, আনন্দ ও আমোদের পরিবর্ত্তে, অহোরাত্র দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছেন; এবং আপনার উচ্চচরিত্রের উপযোগি পতিলাভের প্রার্থনায় ঈশ্বরের দিকে উর্দ্ধনয়নে তাকাইয়া, দিনপাত করিয়াছেন। তাঁহার অলোক-সামান্য অতুল রূপের কথা শুনিয়া মিথিলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, সকল দেশের সমস্ত বীর-পুরুষেরাই, বরবেশে, তদীয় পিতৃনিবাসে, উপস্থিত হইয়াছে; এবং তিনি কর্ম্মবিপাকে কাহার হাতে গড়াইয়া পড়েন,—কিরূপ পিশাচ অথবা পাপিষ্ঠের পদসেবা করিতে বাধ্য হন, এই কথা লইয়া, সর্ব্বত্রই আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু কনকলতা জানকী, এই অনিচ্ছায়ত্ত অদৃষ্টপরীক্ষায়ও, যেন আপনার হৃদয়শক্তির অলক্ষিত আকর্ষণে, লোকাভিরাম রামচন্দ্রের জীবন-সঙ্গিনী হইয়া, পিতা ও পিতৃবন্ধুদিগের মনোরথ-সাফল্যের কারণ হইয়াছেন।

জানকীর তৃতীয় পরীক্ষা অভিষেকের উৎসব-সময়ে। রাজাধিরাজ দশরথ রামচন্দ্রকে যুবরাজের পদে অভিষেক করিবেন, এবং জানকী যুবরাজী হইয়া, তদানীন্তন ভারতের রাজসিংহাসনে রামের বামে বসিবেন। জানকীর কি ভাগ্য! জানকীর এই অসম্ভাবিত সৌভাগ্য প্রসঙ্গে, অযোধ্যার ঘরে ঘরে আমোদ ও আনন্দের উৎসব হইতেছে,—সমান-বয়স্কা সুন্দরী ও সখীদিগের মধ্যে সরস মধুর শ্লেষের কথা চলিতেছে; অথচ জানকীর জগন্মঙ্গল ও অগদালোচ্য অদৃষ্ট তাঁহাকে জটাবল্কলধারী রামচন্দ্রের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যের দুর্গমবর্ত্মে লইয়া যাইতেছে। ইহা কখনও সাধারণ পরীক্ষা নহে।

জানকী যদি ইচ্ছা করিতেন,—জানকী যদি সংসারের মেয়েদিগের মত সাংসারিক সুখের উপাসনা করিতে জানিতেন, তাহা হইলে, তিনি শ্বশ্রূবৃন্দ ও শুভাভিলাষি সুহৃদ্বর্গেরও মন রাখিতে পারিতেন; এবং অনায়াসে অযোধ্যায় থাকিয়া প্রাসাদবাসের সৌভাগ্যসুখে দিনপাত করিতে সমর্থ হই-

তেন। কিন্তু তাঁহার মত আদর্শরমণীর আদর্শ জীবনে ইহা সম্ভবপর নহে। তিনি পৃথিবীর অনন্তকোটি অবলাকে পতিপ্রাণা ও পতি-মাত্রপরায়ণা প্রেমময়ী সতীর পবিত্র-জীবন-সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার জীবনে প্রাসাদ-বাসের সুখ-সম্ভোগ সংঘটিত হইবে কেন? তিনি পতির সহিত বনবাসিনী হইলেন; এবং সুখ-সৌভাগ্য-লালিতা সুন্দরী যুবতী, কিরূপে, পতি-প্রেমের পূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়া, পুরুষ-সিংহ রামচন্দ্রেরও বিস্ময় জন্মাইলেন।

তখন এক দিকে ভারত-রাজধানী অযোধ্যার অপ্রতিম বৈভব ও ভোগবিলাসের অনন্ত সামগ্রীসম্ভার; আর এক দিকে জানকীর প্রেমময় প্রাণ। এক দিকে কুল-গুরু বশিষ্ঠ, কুলদেবতা অরুন্ধতী,—শ্বশুর-শাশুড়ী ও সখীজনদিগের অনুরোধ ও উপরোধ, আর এক দিকে জানকীর প্রেমময় প্রাণ। এক দিকে অসংখ্য দাস ও দাসীর আর্ত্তনাদ,—অসংখ্য অনুগত প্রজার হাহাকার ও অনুনয়-প্রার্থনা; আর এক দিকে জানকীর প্রেমময় প্রাণ। এক দিকে সর্প-শ্বাপদ-সঙ্কুল কণ্টক-কঙ্করাকীর্ণ দুর্গম-বনের বিভীষিকা, এবং বৃক্ষ-তলে তৃণ-পত্র-শয্যা ও বনবাস-জীবনের ত্রাস-জনক রুক্ষচিত্র; আর এক দিকে জানকীর প্রেমময় প্রাণ। কিন্তু সেই পৃথ্বীবিশ্রুত ভয়ঙ্কর-চিত্তপরীক্ষার পৃথিবীর সমস্ত সম্পদই ধিকৃত, উপেক্ষিত ও অধঃপতিত হইল; এবং পতিপ্রাণা জানকীর প্রেমময় প্রাণ, শতচন্দ্রসমুজ্জ্বল সুশীতল-কান্তিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া, অবনীর অসংখ্য নর-নারীকে প্রেমের অপ্রতিম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিল।

যখন মাতা কৌশল্যা প্রভৃতি মাননীয় গুরু-জনেরা সকলেই, জানকীরে বনবাস সংকল্পে নিবৃত্ত করিবার জন্য, একে একে প্রয়াসপর হইয়া, পরাভব পাইলেন, তখন রামচন্দ্র স্বয়ংও, তাঁহার কচি-কিসলয়-তুল্য হাত দুখানি হাতে তুলিয়া লইয়া, অশেষ-বিশেষে উপদেশ দিলেন। ভয় দেখাইলেন,—ভাবি সুখ-সম্পদের চিত্র প্রদর্শন করিলেন, এবং ভালবাসার কথা কহিয়াও অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। কিন্তু যে জানকী, লজ্জাবতী লতার ন্যায়, লজ্জায় সতত জড়সড় রহিতেন,—রামচন্দ্রের চক্ষের দিকে চাহিয়া কথাটি কহিতে হইলেও লজ্জায় একবারে যেন মরিয়া যাইতেন,—যিনি এতকাল প্রেমবিহ্বলা যুবতীর ন্যায় প্রেমের আনন্দ ও প্রমোদ-প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন প্রসঙ্গে প্রাণপ্রিয় পতির সহিত আলাপ করিতে ভালবাসেন নাই,—স্বপ্নেও কখনও পতিহৃদয়ের প্রতিকূলতা করেন নাই, আজি সেই জানকী, বৃদ্ধদিগের কাছে ভীরুস্বভাবা বালিকাটি হইয়াও, অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা তাপসীর ন্যায়, সকলকে পতিব্রতা ধর্ম্মের সারতত্ত্ব কথাচ্ছলে বুঝাইলেন,—কথাপ্রসঙ্গে আপনার গভীর প্রাণ-নিহিত প্রেমের রহস্য পরিব্যক্ত করিয়া, আদর্শসতী অরুন্ধতীকেও ভক্তি ও বিস্ময়ে মাথা নোয়াইতে বাধ্য করিলেন।

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা বুঝিতে হইলে, জানকীচরিত্রের এই অংশ,—ঐতিহাসিক কাব্যের এই অতুল চিত্র সকলেরই একান্ত মনঃসন্নিবেশের সহিত পাঠ করা আবশ্যক;—জানকীর মুখে এ সময় যে সকল কথা ফুটিয়াছিল, তাহা রমণী মাত্রেরই হৃদয়ে, চিরকালের তরে, দৃঢ় মুদ্রিত থাকা প্রার্থনীয়। জানকী কি প্রকৃতির মেয়ে,—তিনি কিরূপ প্রাণ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন,—তিনি তাঁহার প্রেমভক্তির ইষ্টদেবতা প্রাণারাধ্য রামচন্দ্রকে কিরূপ তপস্বিনীর প্রাণে ভালবাসিতেন, তাহার কতকটা না বুঝিলে, তাঁহার অগ্নিপরীক্ষার মর্ম্মার্থ বোধগম্য হইবে কেন? জানকী কহিলেন,—

"নাথ, পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, প্রিয়সখী অথবা আপনার প্রাণটাও, পতিপ্রাণার নিকট, পতির তুলনায় কিছুই নহে। * কেন না, কিবা ইহলোকে, কিবা পরলোকে, পতিই অবলার একমাত্র গতি। অতএব, তুমি যদি অদ্যই বনবাসী হইয়া দুর্গম বনে প্রবেশ কর, আমিও পদতলে পথের কুশ-কণ্টক দলন করিয়া তোমার আগে আগে যাইব। আমি তোমার কথা রাখিলাম না বলিয়া, ক্রোধ করিও না,—বিরক্ত হইও না। পথিক যেমন আপনার পানাবশেষ শীতল জলটুকু প্রীতির সহিত সঙ্গে লইয়া যায়, তুমিও সেইরূপ তোমার এ সাথের সাথীকে প্রীতির সহিত সঙ্গে লইয়া যাও। আমি ত তোমার কাছে আর কখনও কোন অপরাধ করি নাই। এমন অবস্থায়, তুমি কি হেতু, আমায় গৃহে রাখিয়া, একাকী বনে যাইবে? আমি ত্রৈলোক্যের সুখসম্পদও চিন্তা করি না, চিন্তা করি পতিপদ-সেবা,—চিন্তা করি আমার পতিব্রতাধর্ম্ম। সুতরাং আমি আমার পিতার রাজভবনে যেমন সুখে ছিলাম, তোমার সহিত গহন-বনেও সেইরূপ সুখে থাকিব। আমি, নিয়মধারিণী ব্রহ্মচারিণীর ন্যায়, তোমার নিত্যসঙ্গিনী হইয়া, নিয়ত তোমার সেবাশুশ্রূষা করিব; এবং বনফুলের

* "ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ,
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব,
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্।
ঈর্ষারোষৌ বহিষ্কৃত্য পীতশেষ মিবোদকম্
নয় মাং বীর বিশ্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে।
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ,
অচিন্তয়ন্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্।
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী,
সহরংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু।
নাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ,
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি,
ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ।
সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী,
এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ।"

অযোধ্যাকাণ্ড ২৭শ সর্গঃ। অনুবাদে যাহা আছে, তাহার সমস্ত মূল অংশ স্থানাভাববশতঃ উদ্ধৃত হইল না।

সুরভি গন্ধেই সন্তৃপ্ত রহিয়া তোমার সঙ্গে বনে বনে বেড়াইব। তুমি এখন আমার মনের কথা বুঝিলে ত, নাথ? আমি তোমার সেই জানকী।

"মহাভাগ, আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত বনবাসিনী হইব; তুমি কখনও আমার এই সাধু সঙ্কল্পে বাধা দিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যেমন ফল মূল খাইয়া জীবন ধারণ করিবে; আমিও, ক্ষুধা পাইলে, সেইরূপ ফল মূল মাত্র খাইয়া, তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। আমি কখনও কোনরূপ সুখ-লালসায় তোমায় কোন কষ্ট দিব না,—কোনরূপেই তোমার দুঃখের কারণ অথবা দুর্ব্বহ বোঝা হইব না। আমি তোমার আগে আগে যাইব, এবং তোমার ভুক্তাবশিষ্ট যাহা কিছু পাই, তাহাতেই পরিতৃপ্ত রহিয়া বন-নদী, বন-গিরি, বনের পল্বল ও বন-সরোবরের টল-টল জল মনের সুখে দেখিব। এক দিন নয়, দু দিন নয় নাথ, তুমি যদি শত বৎসর অথবা সহস্র বৎসর বনে বাস কর, আমিও তাহা হইলে, ঐ শত বৎসর কিংবা সহস্র বৎসরই, তোমার সহিত বনে রহিব এবং কোনরূপে তোমার সঙ্গে থাকিতে পারিলে, তাহাতেই আমি যার-পর-নাই আনন্দে থাকিব।

"আমার হৃদয়, মন ও প্রাণ,—আমার স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি, এ জগতে একমাত্র তোমাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। * আমি তোমা বই আর জানি না, তোমার চরণ চিন্তা ভিন্ন আর কিছুতেই শান্তি পাই না। অতএব মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমায় ফেলাইয়া যাইওনা,—আমি কোন অংশেও তোমার ক্লেশের কারণ হইব না। কিন্তু তুমি আমায় তোমার সঙ্গিনী করিয়া না লইলে,—তোমার সহিত বিযুক্ত হইলে, আমি নিশ্চয়ই মৃত্যুর গ্রাসে গড়াইয়া পড়িব। আমি যখন তোমার পিছে পিছে যাইব, তখন সে বনপথ আমার কাছে বিহারশয্যার ন্যায় সুখ-সেব্য বোধ হইবে। বনের কুশ, কাশ, শর ও ইষীকা প্রভৃতি কণ্টক-বৃক্ষ আমাকে কোনরূপ ক্লেশ দিতে পারিবে না। আমি উহাদিগকে সুকোমল তুলাচ্ছদ-মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ মনে করিব। বনে যদি প্রবল-বায়ু-সমুত্থিত ধূলিজালে আচ্ছন্ন হই, আমি সে ধূলিপটলকে সুশীতল চন্দন জ্ঞানে আদর করিব; এবং বনে যখন তোমার পদপ্রান্তে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিব, তখন অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের কম্বলাস্তীর্ণপর্য্যঙ্ককেও তুচ্ছ বলিয়া ভাবিব।

"পুনরপি কহিতেছি নাথ, আমি বনে, পিতা মাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, এবং অযোধ্যার প্রাসাদের কথা ভুলিয়াও চিন্তা করিব না। আমি তোমায় সত্য বলিতেছি, আমার জন্য তুমি কোন প্রকারেও ক্লেশ পা-

* অনন্যভাবামনুরক্তচেতসাং
ত্বয়া-বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং
নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি।
ইত্যাদিকানি।

হইবে না। তোমার সাহচর্য্যই আমার সাক্ষাৎ স্বর্গ, তোমার সহিত বিচ্ছেদই নরক।* তুমি ইহা জানিয়া হৃদয়ে প্রীত হও, এবং আমারে তোমার সঙ্গে লও। যদি তাহা না কর, তাহা হইলে অদ্যই আমি বিষপানে এ দেহ বিসর্জ্জন করিব। যাহারা তোমাতে বিদ্বেষী, তোমার জানকী কখনও তাহাদিগের বশতাপন্ন হইয়া পৃথিবীতে বাস করিবে না।"

দশরথ ও রামের অযোধ্যা সে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধানা নগরী,—এবং অসংখ্য সমৃদ্ধ নর-নারীর নিবাসভূমি। অযোধ্যার বৃদ্ধ ও যুবা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত,—অযোধ্যাবাসিনী পতিসোহাগিনী এবং অযোধ্যার কাঙ্গালিনী, সকলেই জানকীর সর্ব্বত্যাগি অধ্যবসায় দেখিয়া রমণীচরিত্রের চরম-উৎকর্ষ চিন্তা করিতে বাধ্য হইল,—যাহারা স্বার্থসুখকেই সংসারের সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিত, তাহারাও জানকীর কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল আপনাদিগের স্বার্থমুগ্ধতা ভুলিয়া গেল। জানকীর কথাগুলি, দেবার্চ্চনার নির্ম্মাল্য ফুলের মত, কালের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া পৃথিবীর অসংখ্য কাব্য ও সংগীতের উপাদানস্বরূপ হইয়া রহিল।

জানকীর চতুর্থ পরীক্ষা চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে। অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্য,—দণ্ডকারণ্য হইতে দক্ষিণাপথে জনস্থানের প্রান্তপরিসর পদব্রজে একমাস কি দুই মাসের পথ নহে; এবং বন বলিলে এখন লোকে যাহা বুঝে, সে বনভূমিও সে প্রকারের বন নহে। কিন্তু জানকী, জনক-হেন রাজার কন্যা, দশরথ-হেন রাজাধিরাজের পুত্রবধূ, এবং ভারতসাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও, শুধু পতিপ্রেমের আকুলতায়, এই সমস্ত পথ পাদচারে চলিয়া গিয়াছেন;—পথক্লেশে অবসন্ন হইয়া পড়িলেও, পতির মুখমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই প্রাণে প্রফুল্ল রহিয়াছেন;—পায়ে কুশাঙ্কুর ফুটিলে হাসিমুখে তাহা সহিয়া লইয়াছেন;—গাছের তলায় কঙ্কর-সংকীর্ণ ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়াও আপনার প্রাণাধিক পতিকে প্রীত-প্রফুল্ল রাখিতে যত্ন পাইয়াছেন;—এবং গৃহবাসে বহুসংখ্য দাস-দাসীর দ্বারাও যাহা না সম্ভবে, আপনি একা তাহা, সে সুকুমার বয়সে, অহরহঃ অক্লান্ত-শরীরে সম্পাদন করিয়া,—দূরস্থিত গোদাবরী হইতে জলের কলসী কাঁখে বহিয়া,—ফুল তুলিয়া, ফল আহরিয়া,—বিবিধ সুখাদ্য ও সুপেয় বস্তু সতত কুটীরে প্রস্তুত রাখিয়া, রাজ্যাধিকার-বঞ্চিত নির্ব্বাসিত পতির তাপিত প্রাণ সুখশান্তিতে শীতল রাখিয়াছেন।

তার পর সে বন। যাঁহারা বাল্মীকির মহাকাব্য এবং তদীয় পদাঙ্কচারী প্রসিদ্ধ কবি ভবভূতির উত্তরচরিত পড়িয়াছেন,—উত্তরচরিতে দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি গিরি-নদী-নির্ঝর-সমাকুল বিশাল-বনভূমির সে বিচিত্র বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানকীর বন-বাস-দুঃখ কতকটা অনুভব করিতে সমর্থ

* যস্তয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্তয়া বিনা,
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ।
অথ মামেবমব্যগ্রাং বনং নৈব নয়িষ্যসে,
বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্।

হইবেন। বনে কোথাও বিত ব্যা ঘ্র নিবহ, ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া, বনভূমিকে নিনাদিত করিতেছে; কোথাও উচ্চণ্ড ভল্লুক-সকল, পালে পালে ও দলে দলে পরিভ্রমণ করিয়া, বন্য জন্তুরও শঙ্কা জন্মাইতেছে;—কোন স্থানে বা বৃহৎকায় অজগর সকল, নিশ্বাস-বহ্নিতে দাবানল সৃষ্টি করিয়া, বনের ছায়াবহুল শ্যামল প্রদেশ-সমূহ পোড়াইয়া ফেলিতেছে; এবং বিকটমূর্ত্তি বনেচর রাক্ষসেরা, হাতে বিবিধ বিষাক্ত অস্ত্র লইয়া, মানুষের সর্ব্বনাশ-বাসনায়, সর্ব্বদা চারি দিকে ঘুরিতেছে। পতিপ্রাণা ও প্রেম মাত্র পরায়ণা জানকী, ইহার মধ্যেও, নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত হৃদয়ে, দিবারাত্রি পতিসেবায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন; এবং পতির মুখখানি মুহূর্ত্তের তরেও মলিন দেখিলে, তাঁহাকে একটু প্রফুল্ল করিবার জন্য, আপনার একটা প্রাণকে যেন শত প্রাণে প্রসারিত করিয়া তাঁহার পদতলে পাতিয়া দিয়াছেন।

জানকীর জীবনব্যাপি অগ্নিপরীক্ষার পঞ্চম পরিচ্ছেদ রাবণের অশোকবনে। তিনি তিলার্দ্ধকাল যে রামের বিরহবেদনা সহিতে পারেন নাই,—যাঁহারে নয়নের অন্তরালে রাখিয়া পিতৃভবনে যাইতেও প্রাণে স্ফূর্ত্তি বোধ করেন নাই, এখন কোথায় তাঁহার সে প্রেমময় রাম, আর কোথায় তিনি! তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা একটি পুরাতন কবিতায় সুন্দররূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। জানকী সাধুমতি বিভীষণের সহধর্ম্মিণী সরমারে সম্ভাষণ করিয়া কহিয়াছিলেন,—

"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে
ময়া বিশ্লেষ-ভীরুণা,
ইদানীমাবয়োর্ম্মধ্যে
সরিৎসাগর-ভূধরাঃ।

"সখি, আমি কখনও গলায় হার পরি নাই। গলায় হার পরিলে, রাম-হৃদয়ের সহিত আমার এ তৃষাতুর হৃদয়ের অতটুকু বিচ্ছেদ হইবে, এই ভয়েই আমি হার পরিতে ভালবাসি নাই;—একগাছি সূক্ষ্ম সূত্রের মত হারের দ্বারা যতটুকু বিচ্ছেদ অথবা ব্যবধান সম্ভবে, তাহাও আমার প্রাণে ভাল লাগে নাই। এখন পৃথিবীর কোন্ দেশে আমার সে রাম, আর কোন্ দেশে সেই আমি; এবং আমাদিগের দুইয়ের মধ্যে কত সরিৎসাগর ও পর্ব্বতের ব্যবধান!"

জানকী রামের প্রেমে এমনই উন্মাদিনী ছিলেন বটে। কিন্তু, তিনি আর কি তাঁহার প্রাণাধিক রামচন্দ্রের পদারবৃন্দ দর্শন করিতে পাইবেন? আর কি ফিরিয়া, রামের সহিত, প্রাণ-শীতল ভালবাসার অমিয়-সাগরে মরালের মত ভাসিয়া ভাসিয়া, পৃথিবীর মনুষ্যকে স্বর্গীয় প্রেমের প্রতিভা দেখাইবেন? আবার কি কখনও, সমুদ্র-পরীখা পার হইয়া, পুণ্যময় ভারতভূমিতে, ভারতেশ্বরীর স্বর্ণসিংহাসনে, রামের বামে উপবিষ্ট হইবেন? আবার কি কখনও, অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইয়া, অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মত, অসংখ্য-লোকপালন এবং অসংখ্য-লোকের দুঃখমোচন ও সুখ-শান্তি বিধানের দ্বারা আপনার পরার্থ-জীবন সফল

করিবেন ? মনে এখন আর সে আশা নাই। রাক্ষসের সে নরক-নিবাসে দেহ-প্রাণে রক্ষা পাইবেন, এখন এমনও ভরসা নাই। আছে একমাত্র আপনার অমল-তেজঃপুঞ্জ ঊর্দ্ধোন্মুখ আত্মার অজেয় বল, আর আছে আপনার হৃদয়নিহিত দেবদুর্লভ পবিত্রতা ও পতি-প্রেমের পুণ্যসম্বল। কিন্তু সে বল ও সে সম্বল উভয়ই এত বেশী যে, তিনি পাপাত্মা লঙ্কাধিপতির অশোকবনে, অসহায়া হইয়াও, আপনাতে আপনিই অমিত-সহায়-শৌর্য্য-সম্পন্না,—একাকিনী হইয়াও অলৌকিক-শক্তিশালিনী দেবতার মত, সরমা ও ত্রিজটা প্রভৃতি ভক্ত ভিন্ন, অন্য সকলেরই অনধিগম্যা।

বিকট-দশনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা, দূরে দূরে জানকীরে অহোরাত্র বেষ্টিয়া রহিয়া, কখনও কল্পনার অতীত ভয় দেখাইতেছে, কখনও সুখ-সম্পদের লোভ দেখাইয়া মন ভুলাইতে প্রয়াস পাইতেছে;—রাবণ আপনি সেখানে পুনঃ পুনঃ আসিয়া কখনও খড়্গহস্তে তর্জ্জন করিতেছে,—কখনও কর-পুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, লঙ্কার সাম্রাজ্যসম্পদ্ জানকীর পায়ে উপহার দেওয়ার জন্য, যাচমান হইতেছে। কিন্তু, পতিপ্রাণা জানকীর অত্যুগ্র পবিত্রদৃষ্টি, প্রদীপ্ত দামিনীর ন্যায়, কেমন এক লোকাতীত শক্তি প্রকাশ করিয়া, সকলকেই শত হস্ত দূরে রাখিতেছে;—যে রাবণ পৃথিবীর কোথাও পরাভূত হয় নাই, সেও সেখানে, সতীর সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে, কেমন এক প্রকার পরাভব পাইয়া, ক্রোধে দুঃখে ও মনঃক্ষোভে, থর থর কাঁপিতেছে। সতীচরিত্রের অগ্নিপরীক্ষা সাহিত্যজগতে শত শত কাব্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ সমস্ত কাব্যই, জানকীর চরিত্রপরীক্ষারূপ জগদ্দুর্লভ দেব-কাব্যের নিকট, মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর জ্যোতিস্মান্ সান্নিধ্যে, সামান্য দীপশিখার ন্যায়, ক্ষণকাল নিবু নিবু জ্বলিয়া, একবারে নিবিয়া যাইতেছে। ধন্য ভারতভূমি! ধন্য ভারতীয় আর্য্যের ধর্ম্মপ্রাণা সভ্যতা! ধন্য ভারতের আদি কবি বাল্মীকি! ধন্য কাব্য ও ইতিহাসের চির-আরাধ্যা জগৎপাবনী মা জানকী!

জানকীজীবনের ষষ্ঠ পরীক্ষা আজি সমুদ্রের তটে স্বামিসান্নিধ্যে। এ পরীক্ষা রূপক নহে, ইহা সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্ববিধ অর্থেই প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা। জন্মদুঃখিনী জানকী, দশমাস কাল, রাবণের অশোকবনে, মনোবুদ্ধির অচিন্তনীয় অসহ্য যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া, এবং অতি ভয়ঙ্কর চরিত্রপরীক্ষায় শুধুই আপনার অপ্রতিহত আত্মার সামর্থ্যে চারিত্র-পবিত্রতা রক্ষা করিয়া, পতির সন্নিহিত হইয়াছেন;—এত দুঃখ, এত কষ্টের পর, পতি আজি প্রাণভরা ভালবাসার প্রিয় কথায় তাঁহার প্রাণ জুড়াইবেন ভাবিয়া, আশাপথ চাহিয়া আছেন। তাহাতে অকস্মাৎ এ কি হইল! তিনি মনে করিয়া আছেন, তাঁহার প্রাণারাম রাম, আজি তাঁহাকে নয়নজলে স্নান করাইয়া, নির্ম্মল মুক্তামালার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিবেন; রামের সে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে আজি কোথা হইতে, কি কারণে, এ দুর্ব্বার-দারুণ পরিবর্ত্ত ঘটিল? •

পতিপ্রাণা রমণীরা, এ পৃথিবীতে, মনুষ্যের পাপাচারে, অনেক সময়ই অনেক প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু জানকীর আজিকার দুঃখ সমুদ্র হইতেও গভীর; এবং শৈল-দেহব্যাপি দাবানল হইতেও দুর্নিরীক্ষ্য। তিনি যে পতিকে, আপনার প্রাণের মধ্যে, প্রীতির পবিত্রতম আসনে দেবতার ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া, অহোরাত্র পূজা করিয়াছেন;—যাঁহাকে চিরকাল আপনার দ্বিতীয় প্রাণ অথবা দ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি জ্ঞানে, নির্ভয় নির্ভরের ভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন ও ভালবাসিয়াছেন, সেই পতি আজি তাঁহার প্রতিকূলচারী,—সেই রাম তাঁহার প্রতি বাম, তিনি কি প্রকারে ইহা বুঝিবেন, অথবা প্রাণে ইহা সহ্য করিবেন ?

রামের এ আকস্মিক চিত্তপরিবর্ত্তের দুইটি কারণ সম্ভব। এক কারণ লৌকিক, আর এক কারণ অলৌকিক। অলৌকিক কারণ অদৃষ্টের কর-রেখা;—যে নিয়তি, ধীরে ধীরে, জানকীর বিচিত্র জীবনে, রমণীচরিত্রের বিবিধ লোকোত্তর সৌন্দর্য্য, যেন পটের পর পটে, চিত্রিতবৎ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, উহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য অর্থাৎ সতীত্বের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য, সেই আপাত-নিষ্ঠুর অবোধ্য নিয়তিরই প্রাক্তনী লেখা। অলৌকিকের অর্থগ্রহ সম্ভব হইলেও সহজ নহে।

লৌকিক কারণ বিভীষণের মত বীরপুরুষের বুদ্ধির ভুল, অথবা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। মহামতি হনুমান্ মা জানকীরে রাবণের অন্তঃপুরে অনেক বার দেখিয়াছেন। প্রথমদর্শন অপহৃতা জানকীর অনুসন্ধান-সময়ে; এবং শেষদর্শন রাবণ-নিধন ও লঙ্কাবিজয়ের পরে। হনুমান্ যখন প্রথমবার অশোকবনে জানকীর দর্শনলাভ করেন, তিনি তখন তাঁহার তদানীন্তন মূর্ত্তি দেখিয়া তদ্গতভক্তিতে প্রণত হইয়াছিলেন। এক-বস্ত্র-পরিধানা অঙ্গাভরণ-হীনা অসহায়া রমণী, অশ্রুজলে ভাসিতেছেন; অথচ আপনার জলদগ্নিশিখারূপিণী অলৌকিক তেজস্বিতায় সশস্ত্র রাবণকেও শাসিত করিয়া দেবপূজ্যা সতীর দুরাধর্ষ সম্মান অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিতেছেন, এ মূর্ত্তি দেখিয়া হনুমান্ও বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়াছিলেন। হনুমান্ যখন রাবণের মৃত্যুসংবাদ লইয়া লঙ্কায় শেষ প্রবেশ করেন, তখনও দেখেন, তাঁহার সেই আরাধ্যদেবতারূপিণী জানকী সেই ভাবেই উপবিষ্ট আছেন।

"দদর্শ মৃজয়াহীনাং সাতঙ্কামিব রোহিণীং
বৃক্ষমূলে নিরানন্দাং রাক্ষসীভিঃ সমাবৃতাম্।"

মা অস্নাত, এবং রামের কথন কি হয় এই একমাত্র ভাবনায়ই আতঙ্কিত। তাঁহার শরীর, অঙ্গসংস্কারের অভাবে, ধূলিধূসরিত। তিনি বৃক্ষমূলে, আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, নিরানন্দ বসিয়া আছেন; কিন্তু সেখানেও রাক্ষসীদিগের দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত। রাম যদি আপনি অশোকবনে প্রবেশ করিয়া জানকীর এই মূর্ত্তি চক্ষে দেখিতেন,—জানকীরে লইয়া আসিবার জন্য অন্য লোক না পাঠাইয়া আপনি যাইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার চিত্তে কখনও এবংবিধ বিকলতা ঘটিত না। তিনি নিশ্চয়ই ভক্তিবিহ্বলতায়

অনিবার্য্য উচ্ছ্বাসে তাদৃশী জগদাদর্শ সতীর সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া রাম-নামের সার্থকতা করিতেন ;—এবং প্রেমময়ীর প্রেম-তপস্যায়, আপনিও প্রাণে পরমা শান্তি লাভ করিয়া, শীতল হইতেন। কিন্তু, বিধাতার কেমন ইচ্ছায়, তিনি বিভীষণকে সে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন ; এবং জানকীরে সুগন্ধি-দ্রব্যসংযোগে স্নান করাইয়া, দিব্যাঙ্গরাগা ও দিব্যাভরণ-ভূষিত অবস্থায় লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন।

"দিব্যাঙ্গরাগাং বৈদেহীং দিব্যাভরণভূষিতাম্
ইহ সীতাং শিরঃস্নাতামুপস্থাপয় মাচিরম্।"

রামের মনে যে এমন অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল,—অসঙ্গত কথা ফুটিল, ইহা বিধিলিপি। আর, বিভীষণের মত বুদ্ধিমান্ ও প্রকৃততত্ত্বজ্ঞ ধার্ম্মিকব্যক্তিও যে একবার সে কথার প্রতিবাদ না করিয়া,—সে কথার প্রত্যুত্তরে একটি মাত্র কথা না কহিয়া, অমনি জানকীরে অঙ্গরাগে উপস্কৃত, এবং নানাবিধ উজ্জ্বল আভরণে সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে, অশোকবনের দিকে ধাবিত হইলেন, ইহাও বিধিলিপি। কিন্তু পতিপ্রাণা জানকী প্রথমতঃ কিছুতেই লঙ্কার আভরণ স্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন না। বিভীষণ যখন, তাঁহাকে স্তুতি মিনতি ও প্রণতিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, অঙ্গাভরণ পরিধানের জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি স্পষ্ট কহিলেন,—"না আমার দ্বারা তাহা হইতেছে না; আমি যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায়ই পতিদর্শনে যাইব,—আমি এ অস্নাত অবস্থায়ই রামসান্নিধ্যে উপস্থিত হইব।"—

"এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রত্যুবাচ বিভীষণম্
অস্নাত্বা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্ত্তারং রাক্ষসেশ্বর।"

কিন্তু প্রভুবাক্যপরায়ণ অবোধ বিভীষণ জানকীর মনোগত ভাব বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তিনি, পরিচারিকাদিগকে নিপুণ-সহকারে নিযুক্ত করিয়া, জানকীরে সুরভি-সলিলে স্নান করাইলেন; এবং রাবণগৃহের বহুযত্নরক্ষিত বহুমূল্যবস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া, শিবিকাযানে, রাম-সন্নিধানে লইয়া চলিলেন।

স্বভাব-সরলা জানকী ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না। কিন্তু, তাঁহার পবিত্র দেহ, বুঝি আজি পরের বুদ্ধিতে, লঙ্কার পাপার্জ্জিত বস্ত্রস্পর্শে একটুকু অপবিত্র হইল। যাহা সাধারণ লোকের শরীরে অনায়াসে সহ্য হইয়া থাকে, অনন্যসাধারণ উচ্চশ্রেণিস্থ ব্যক্তিদিগের সূক্ষ্মতর-তত্ত্বময় নির্ম্মল শরীরে তাহা সহ্য হয় না। লঙ্কার মত কলুষ-নিবাসের মণিমুক্তাও জানকীর নির্ম্মল তনুতে সহিল না। উহা সে দেব-শরীরকে যেন একটু কলুষিত করিল। যে জানকী, দশ মাস কাল, রাবণগৃহে, যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল খাইয়া, জীবন রক্ষা করিয়াছেন, এবং লঙ্কার একগাছি সূতাও শরীরে স্পর্শ না করিয়া, আপনার সেই একমাত্র মলিন বস্ত্রে আপনাকে আবরিয়া রাখিয়াছেন, সেই জানকী, বুঝি আজি, বিভীষণের বুদ্ধিদোষে, রাক্ষসের উপচার ও উপহার গ্রহণ করিয়া, দেবতাদিগের চক্ষেও

একটুকু অপরাধিনী হইলেন। তিনি যখন এইরূপে স্নাত, অনুলিপ্ত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্ত্রাভরণে অলঙ্কৃত অবস্থায়, আপনার অতুলরূপে ঝল-মল হইয়া, রামের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রামের চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধি-বিবেক সহসা একবারে অন্ধকারে ডুবিল;—এমন অনিন্দ্যমূর্ত্তি অপ্রতিম-রূপসী রাবণের মত পাপিষ্ঠের পুরীতে সতীর পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, সে বিষয় রামের মনে সহসা ঘোরতর সংশয় জন্মিল। রাম, যখন বিভীষণকে অশোকবনে প্রেরণ করেন, তখনও তাঁহার হৃদয় সংশয়ে ঈষৎ কলুষিত। সে সংশয় এখন, মহামোহময় করাল মেঘের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার মুখচ্ছবিকে ঢাকিয়া ফেলিল;—তাঁহার স্নেহময় চক্ষু হইতে অগ্নি বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাম, জানকীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মুহূর্ত্তকাল তুষ্ণীম্ভূত রহিলেন;—দুই একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলাইলেন;—তার পর, হৃদয়ের জ্বালাময় বিষরাশি অজস্র উদ্গিরণ করিয়া, জানকীরে মর্ম্মঘাতি কটুকথা বলিলেন।

এ সংসারে যেখানে অমৃত, সেই খানেই বিষ। পৌরাণিক কবিরা, এ তত্ত্বের মর্ম্ম-রহস্য বুঝিয়াই, সমুদ্রমন্থনে আগে তুলিয়াছেন অমৃত, তার পর তুলিয়াছেন কালকূট বিষ-রাশি। কিন্তু রামের হৃদয় শুধুই প্রেম, ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার অপার ও অগাধ সমুদ্র বলিয়া পরিচিত। নয়নাভিরাম রামচন্দ্রকে যে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে-ই চিরজীবনের তরে তাঁহার কাছে বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্র সমাজের বহির্ভূত ও সামাজিকদিগের অস্পৃশ্য নিষাদনায়ক গুহকচণ্ডালকেও প্রেমের আবেশে গাঢ় আলিঙ্গন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এবং দুরক্ষর-ভাষিণী সর্ব্বনাশিনী বিমাতাকেও স্নেহের ভাষায় সম্ভাষণ করিতে কৃপণতা প্রদর্শন করেন নাই। দীন-দুঃখী কাঙ্গালের কথা দূরে থাকুক, অযোধ্যার পশুপক্ষীও রামের গুণে বশীভূত রহিত; এবং রাম যে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, সে পথের শিশু হইতে বৃদ্ধ, সকলেই সে নবদূর্ব্বাদল-শ্যামল, স্মিত-মধুর-স্নেহশীতল, শান্তনেত্র মূর্ত্তিনিরীক্ষণে, নয়নে ও মনে, ক্ষণকাল কেমন এক প্রকার অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইত। রামের সেই হৃদয়ে—সেই সুশীতল অমৃতসমুদ্রে সহসা এমন বিষ উথলিয়া উঠিবে, ইহা কেহই কি অনুমান করিতে পারিয়াছে? সুতরাং যাহারা চারি দিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার তদানীন্তন মুখচ্ছবি দেখিতেছে, তাহারা সকলেই ভয়ে ও দুঃখে মর্ম্মস্থলে দগ্ধ হইতেছে,—সকলেই ভাবিতেছে, হা! রামের এ কি হইল! —জানকীর ললাটে এ কি ঘটিল!—রাম-জানকীর চির-কীর্ত্তিত পীযূষ-স্নিগ্ধ প্রেমে, কে কোথা হইতে এ দ্রবীভূত কাল-কূট-ধারা ঢালিয়া দিল!

উপস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের মধ্যে সুগ্রীব, বিভীষণ ও হনুমান্ প্রভৃতি বীরেরা, রামচরিত্র কতকটা বুঝিয়া থাকিলেও, সম্যক্ বুঝিবার সুযোগ পান নাই। রামচন্দ্র তাঁহাদিগের চক্ষে বীরের মধ্যে বীর,—বীরচূড়ামণি মহা-

বীর,—রণক্ষেত্রে দুর্জ্জয়, রাজনীতিতে যার-পর-নাই নীতিকুশল হইয়াও, দেবপুরুষবৎ দয়াধর্ম্মময়। কিন্তু রাম, পৌরুষে ও সাহসে, —সমরাঙ্গনের কঠোর কর্ম্মে এবং শত্রু-মিত্র-শাসনের কঠোর-কোমল প্রখর ধর্ম্মে, মহামহিমময় দৃপ্ত পুরুষ হইয়াও, হৃদয়ের অভ্যন্তরে সততই কিরূপ সরস-মধুর প্রেম-পুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহারা সম্যক্ জানিতেন না, সম্যক্ বুঝিতেন না। তাঁহারা, এই হেতু, শুদ্ধস্বভাবা জানকীর প্রতি রামের তথাবিধ কর্কশ ব্যবহার দর্শনে, চিত্তে যার-পর-নাই ক্লিষ্ট হইলেও, কতকটা স্তম্ভিত-ভাবাপন্ন।

পক্ষান্তরে, লক্ষ্মণের অবস্থা অন্যরূপ। লক্ষ্মণও, অন্যের ন্যায়, আগা গোড়া সমস্তই দেখিয়া আসিতেছেন ও কাণে শুনিতেছেন; কিন্তু তিনি, রামের আজিকার কার্য্য পর্য্যালোচনায়, ক্রোধে একবারে ভস্মীভূত হইয়া, প্রকৃতই দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছেন। কারণ, লক্ষ্মণ এ জগতে যদি কিছু জানিয়া থাকেন, সে বস্তু রামের হৃদয়; যদি কোন পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকেন, সে পদার্থ রামচরিত্র। লক্ষ্মণ বেদ-বেদান্ত পাঠ করেন নাই, পাঠ করিয়াছেন রামের লোকোত্তর জীবন-বৃত্তান্ত; পিতা-মাতারও উপাসনা করেন নাই, উপাসনা করিয়াছেন রামের শ্রীপাদপদ্ম। তিনি আজি তাঁহার সেই চির-পরিচিত ও চির-জীবনারাধিত রামচন্দ্রকে চিনিয়াও যেন চিনিতে পারিতেছেন না। যে রাম, এ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার শক্তিসম্পদ, সুকীর্ত্তি ও সম্মান এক দিকে রাখিয়া, পতিপ্রাণা ও পবিত্রহৃদয়া জানকীরে আর এক দিকে রাখিতেন, এবং সংসারের সমস্ত সুখ-সমৃদ্ধি হইতে জানকীরে শতসহস্র গুণে বেশী মনে করিতেন, আজি সেই রাম, জানকীর সম্পর্কে, কালান্তক যমের মত ক্রূর ও ভয়ঙ্কর হইয়াছেন, রামের এ অস্বাভাবিক ভাববিপর্য্যয় কিছুতেই লক্ষ্মণের প্রাণে সহিতেছে না।

অপিচ, লক্ষ্মণ যেমন জানিতেন রামচন্দ্রকে, ঠিক তেমনই জানিতেন রাম-হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী,—প্রীতি ও পবিত্রতার প্রত্যক্ষ বিগ্রহরূপিণী জানকীকে। তিনি, অনন্ত অগ্নিশিখায়, দুর্য্যোধার সম্পর্কে, কলঙ্কস্পর্শ সম্ভাবনা করিয়াছেন; তথাপি জগৎপাবনী জানকীর চরিত্রসম্পর্কে, স্বপ্নে কিংবা কল্পনায়ও, অণুমাত্র কলঙ্ক সম্ভাবনা করেন নাই। জানকী, তাঁহার চক্ষে, শুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের আদর্শভূতা শরীরিণী দেবতা, এবং বয়ঃকনিষ্ঠা হইয়াও, শুভ্র চারিত্রসম্পদে, সুমিত্রার মত আর এক মাতা। তিনি জানকীর পা দুখানি ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইহজীবনে চক্ষে দেখেন নাই: এবং যখন অপহৃতা জানকীর পরিত্যক্ত আভরণ উপলক্ষে রামের সহিত তাঁহার আলাপ হয়, তখন মায়ের পাদাভরণ নূপুর ভিন্ন অন্য কোন আভরণ তিনি চিনিয়া লইতে সমর্থ হন নাই।* আজি সেই সর্ব্বজন-পূজ্যা, সর্ব্ব-

* পৃথিবীর অনেক প্রবীণ পণ্ডিত ভারতীয় সভ্যতাকে জগতের আদিসভ্যতা ও

বিধ-সম্মানার্হা জানকীর ঈদৃশী লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা দর্শনে, তিনি একবারে মরমে মরিয়া গিয়াছেন; এবং আকাশের চন্দ্রসূর্য্যকেও মনে মনে ধিক্কার দিয়া, মানবজীবনের অস্তিত্ব বিষয়েই কেমন যেন সন্দিহান হইয়াছেন।

লক্ষ্মণ, এক এক বার তাঁহার নয়ন-প্রান্তে রামচন্দ্রের তদানীন্তন মুখচ্ছবি দেখিতেছেন, আর যেন ভাবিতেছেন,- যাঁহাকে এতকাল দয়ার সাগর এবং মহত্ত্ব ও মাধুর্য্যের প্রস্রবণ-স্বরূপ জানিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছি, এই রামই কি সেই রাম? যিনি বিবাহের সময় হইতে দণ্ডে দশবার জানকীর চন্দ্রমুখ না দেখিলে অধীর হইতেন, এবং জানকীরে যথার্থই জীবনসর্ব্বস্ব জ্ঞানে আকুল-প্রাণে উপাসনা করিতেন, এই রামই কি সেই রাম? যিনি অযোধ্যার রাজভবনে, অথবা অতি দুর্গম দণ্ডকারণ্যে, কোন স্থানেও জানকীরে আপনার বর্ত্তুল-মসৃণ সুকোমল বাহু ভিন্ন আর কোন উপাধান ব্যবহার করিতে দেন নাই; এবং জানকীর নয়ন-পথ-পরিভ্রষ্ট হইয়া এক পা দূরে যাইতে সমর্থ হন নাই, এই রামই কি সেই রাম? পরন্তু, যিনি জানকীর বিরহে, বন-পথে ও গিরিপ্রস্থে, বিকলমতি উন্মত্তের মত বিলাপ করিয়াছেন,—কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়াছেন,—কখনও চৈতন্যের অবস্থায় কঠিন পাষাণকেও অশ্রুজলে ভাসাইয়াছেন;—এবং বনের লতা, পাদপ ও বিহঙ্গদিগকে সম্ভাষণ করিয়াও আপনার গভীর হৃদয়ের দুঃসহ দুঃখ জানাইয়াছেন, এই রাম কি সেই রাম?

এইরূপ অনেক কথাই তখন লক্ষ্মণের মনে পড়িল; এবং লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহবিভোর অথচ অনাবিল-ন্যায়-ধর্ম্মময় উদার প্রাণ পুড়িয়া পুড়িয়া তাঁহাকে পাগলের মত করিয়া তুলিল। শ্রীরামচন্দ্র, জানকীর পরিত্যক্ত আভরণ দর্শনে, কিছুকাল সংজ্ঞাশূন্য রহিয়া, শেষে কিরূপ করুণ-স্বরে কাঁদিয়াছিলেন, * আজি সে কথা লক্ষ্মণের মনে পড়িল। রাম, সুগ্রীবের সহিত সৌহার্দ্দপ্রতিষ্ঠার পর, প্রস্রবণ

সর্ব্বাংশে দেব-সভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা এ কথায় বিশ্বাস না করেন, লক্ষ্মণ-মুখ-নিঃসৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের বিস্ময় জন্মাইবে। রাম যখন লক্ষ্মণকে, জানকীপরিত্যক্ত আভরণের মধ্যে কেয়ূর ও কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণগুলি চিনিয়া লইতে বলিলেন, তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,—

"নাহং জানামি কেয়ূরে
নাহং জানামি কুণ্ডলে।
নূপুরে ত্বভিজানামি
নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ॥"

অর্থাৎ,—"আমি এ কেয়ূর চিনি না, ইহা হাতের আভরণ; আমি এ কুণ্ডলও চিনি না, ইহা কর্ণাভরণ; আমি চিনি পায়ের এ নূপুর দুগাছি; কেন না, নিত্য মায়ের পদ-বন্দনা করিতাম।

* "হা প্রিয়েতি রুদন্ ধৈর্য্য-
মুৎসৃজ্য ন্যপতৎক্ষিতৌ।
হৃদি কৃত্বা স বহুশ-
স্তমলঙ্কারমুত্তমম্॥"

পর্ব্বতের সুরম্য-পাদদেশে, কুন্দ কদম্ব, সিন্দুবার, শাল, শিরীষ ও মালতী প্রভৃতি বনজ-পুষ্পের শোভা দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ জানকীর নাম উল্লেখে কত কথা কহিয়াছিলেন, এবং বর্ষাসমাগমে, নবজলধরের গুরুগম্ভীর শ্রোত্র-পেয় নিঃস্বন, ময়ূরের কেকারব ও মৃদুকূজিত-বিহঙ্গদিগের মধুর-কূজন শুনিয়া, জানকীর কথা কহিয়া কহিয়া, কতই পরিতাপ করিয়াছিলেন, তাহাও লক্ষ্মণের মনে পড়িল।

আর মনে পড়িল সমুদ্র তটের সেই চিরস্মরণীয় কথা। প্রেমাবতার রামচন্দ্রের সে অপূর্ব্ব প্রেম-কথা, বাল্মীকির প্রসাদাৎ, প্রেম-গাথার ন্যায়, স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া রহিয়াছে; এবং এই পৃথিবীর যেখানে যে প্রেমের তপস্যায় দীক্ষিত হইতেছে, উহা তাহার প্রাণে পীযূষধারাবৎ স্পৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং রাম-জানকীর প্রেম-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সময়ে, সে কথার একটি অক্ষরেও আজি আমরা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারি না। আমরা জানকীর পতিপ্রেম কতকটা বুঝিয়াছি, রামচন্দ্রের জানকী-প্রেমও আমাদিগের বুঝা আবশ্যক। আর রামচন্দ্র জানকীনিগ্রহের দ্বারা কি পরিমাণে আত্ম-নিগ্রহ করিতেছেন, তাহাও আমাদিগের পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যাকাল। আকাশে শরৎকালীন চন্দ্রের সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না,—সম্মুখে উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল অপার সমুদ্র, এবং সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে, নীলাঞ্জন আভার উপরে, চন্দ্রের প্রতিবিম্বিত লীলা ও জ্যোৎস্নার ক্রীড়া-বিলাস। রামচন্দ্র, সঙ্গীয় সেনার জন্য সমুদ্রের উপকূলে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতের * শিখরে, প্রাণাধিকা জানকীর ধ্যানে, একাকী উপবিষ্ট আছেন; এবং বুঝি ঐ তরঙ্গ-বিলসিত জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য দর্শনে, জানকীর রূপের জ্যোৎস্না স্মরণ করিয়া, অথবা কিরূপে জানকীর উদ্ধারার্থ ঐ দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিবেন, তাহাই ভাবিয়া ভাবিয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলাইতেছেন। তখন সমুদ্র পাগলের মত এক একবার অট্টহাস্যে হাসিতেছে, আবার মধুর-শ্রুত শোঁ শোঁ শব্দে শোকাতুরের মত বিলাপ করিতেছে।—

"সাগরঞ্চাম্বরপ্রখ্যমম্বরং সাগরোপম্
সাগরঞ্চাম্বরঞ্চেতি নির্ব্বিশেষমদৃশ্যত।"

রামের বোধ হইতেছে যে, তাঁহার মাথার উপর যে মেঘাবৃত আকাশ বিলম্বিত রহিয়াছে, উহা যেন একটা মহাসমুদ্র; আর আকাশের ছায়া ঢাকা অপার সমুদ্র যেন একটা অধঃক্ষিপ্ত আকাশ। দেখিতে দেখিতে রামের হৃদয় একবারে অবসন্নবৎ হইল; এবং সমুদ্রের শীকরসিক্ত বায়ুস্পর্শে তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। রামের সুখ-দুঃখসঙ্গী,—সুহৃৎ, সহায় ও নিত্যসেবক লক্ষ্মণ, সে সময়েও, সে শৈল-শিখরে, অলক্ষিত রূপে কাছে ছিলেন। লক্ষ্মণ কাছে আছেন জানিয়া, রাম সমুদ্রবায়ুকে সম্ভাষণ করিয়া, এবং ঊর্দ্ধে একবার সায়ন্তন চন্দ্রের

* মহেন্দ্রমথ সংপ্রাপ্য রামো রাজীবলোচনঃ।
আরুরোহ মহাবাহুঃ শিখরম্ দ্রুমভূষিতম্॥

দিকে চাহিয়া, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, বড়ই কাতরতার সহিত কহিলেন,—

"বাহি বাত যতঃকান্তা, তাং স্পৃষ্ট্বা মামপিস্পৃশ,
ত্বয়ি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চন্দ্রে দৃষ্টিসমাগমঃ।"

যাও বায়ু, যাও; যেখানে আমার বিরহ-বিধুরা, দুঃসহ-দুঃখকাতরা প্রাণাধিকা একা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ধীরে, ধীরে,—ধীরে বহিয়া, একবার সেখানে তুমি যাও; এবং তাঁহার স্পর্শে শীতল ও সুরভি হইয়া, ফিরিয়া এখানে আসিয়া আমাকে স্পর্শ কর। আমি তাহা হইলে, তোমার স্পর্শেই তাঁহার তনুস্পর্শলভ্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিব; এবং তিনিও, আমারই মত, আকাশের ঐ চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন বলিয়া, ঐ চন্দ্রদর্শনেই আমি তাঁহার দৃষ্টি-সমাগম লাভে কৃতার্থ হইব। *

কহিতে কহিতে রামের অগাধ হৃদয় উথলিয়া উঠিল।—একবার বোধ হইল, বুঝি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, সাগরের প্রবাল শয্যায় অনন্ত কালের তরে শয়ন করিলে, তাহাতে তাঁহার প্রাণের জ্বালা প্রশান্ত হইবে। তার পর, এক দিকে পৌরুষী প্রতিহিংসা, আর এক দিকে প্রাণধন-জানকী-দর্শনের অতৃপ্ত পিপাসা, উভয়ই আবার জাগিয়া উঠিল। তখন বলিলেন—না, ইহা হইতে পারে না। এইপ্রকার আচরণ আমার মত পুরুষের যোগ্য হইতেছে না;—

"বাঢ়মেতৎ কাময়ানস্য শক্যমেতেন জীবিতুম্,
যদহং সা চ বামোরুরেকাং ধরণীমাশ্রিতৌ।"

আমি আর আমার প্রাণের জানকী এক পৃথিবীতে আছি, ইহাই এইক্ষণ আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি শুধু এই কথা ভাবিয়া, ও এই ভাবে জানকীরে হৃদয়ে অনুভব করিয়াই, জীবনধারণ করিব; এবং জানকীর উদ্ধার সাধন দ্বারা জগতের নিকট ঋণ-মুক্ত হইব। নির্জ্জল শস্যক্ষেত্র যেমন সন্নিহিত সজলা ভূমির অন্তঃপ্রবাহিত জলস্পর্শে আর্দ্র থাকে, আমিও সেইরূপ, জানকী আমার জীবিত আছেন এই সংবাদেই হৃদয়ে আর্দ্র হইয়া, জীবনধারণে সমর্থ রহিব।

রামের মুখে সে সময় আরও অনেক কথা ফুটিল। প্রত্যেক কথারই এই অর্থ যে, রামের হৃদয় একটি মনোহর পিঞ্জর, সেই পিঞ্জরের নিত্যবিহারিণী বিহঙ্গী রাম-মনোমোহিনী জানকী;—রামের শরীর সর্ব্বপ্রকার পৌরুষ-শক্তির পূর্ণবিকশিত বিগ্রহ, সে বিগ্রহের প্রাণ-দেবতা পুণ্যময়ী জনক-দুহিতা। সুপুরুষ মাত্রই আপনার জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে। কিন্তু জানকীর প্রতি রামের ভাল-

* আমাদিগের চিরপ্রীতিভাজন পূজনীয় সুহৃৎ পণ্ডিতবর হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন বাল্মীকীয় রামায়ণের বঙ্গানুবাদ প্রচার করিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যেমন বঙ্গানুবাদ-প্রসঙ্গে, অনেক স্থলে, মূল শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া, রামানুজ-বিবৃত ভাবার্থের ব্যাখ্যা সঙ্কলন করিয়াছেন, আমরাও, তাঁহারই অনুসরণে, সেইরূপ ভাবার্থ বিবৃতি সঙ্কলন করিয়াছি।

বাসা একটুকু পৃথগ্বিধ। উহাতে প্রীতি, ভক্তি, প্রাণের পিপাসা, প্রেমাকুল তনুর প্রতপ্ত লালসা, সমস্তই অত্যধিক ও অতি সুচারু রূপে মিশিয়া সর্ব্বদা এক বিচিত্র বস্তুর ন্যায় বিকসিত রহিত; এবং জানকীর নিবিড়-কৃষ্ণ কেশরাশি, নীলপদ্ম-প্রতিম নিত্যস্নিগ্ধ চক্ষু, লাল টুক্ টুক্ ঠোঁট দুখানি অবধি করিয়া, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সর্ব্বদা, ধ্যানস্থ বস্তুর মত, রামের মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ হইত।

জানকী রাবণ-গৃহে রহিয়াছেন; কিন্তু রামের আত্মা—রামের হৃদয় মন ও প্রাণ, যেন প্রেম-ধ্যানের কিরূপ এক অলক্ষিত ও অপরূপ শক্তিতে, সূক্ষ্মশরীরি পদার্থের ন্যায়, সকল সময়েই জানকীর কাছে কাছে থাকিত। রামের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তাঁহার প্রেমের পুতুল জনক-দুহিতা নবযুবতী হইলেও, দেব-কন্যার ন্যায় তেজস্বিনী সতী; এবং আপনার সর্ব্বাতিশায়ি সম্মান ও সতীত্ব রক্ষায় দেবাঙ্গনার ন্যায় শক্তিশালিনী। লঙ্কায় এক রাবণ; কিন্তু রামের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ঐরূপ এক লক্ষ রাবণ একত্র হইয়া ভয় প্রদর্শন করিলেও, সতী সাধ্বী জানকীর স্বাভাবিক তেজঃশক্তিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না। রাম এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভাই লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া পুনরপি গদগদশ্রুলোচনে কহিলেন,—

"আমার সে অসিতাপাঙ্গী সতী জানকী এইক্ষণ রাক্ষসের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। হা! আমি যাঁহার নাথ, তিনি অনাথার ন্যায় আশ্রয় খুঁজিতেছেন, অথচ কেহই তাঁহার পরিত্রাণার্থ অগ্রসর হইতেছে না; আমি ইহা কেমন করিয়া সহিব! তিনি রাজর্ষিজনকের কন্যা, রাজাধিরাজ দশরথের পুত্রবধূ, এবং আমার প্রাণাধিকা। আমার এ হেন জানকী রাক্ষসের দুরক্ষর বাক্যযন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতেছেন, আমি কোন্ প্রাণে ইহা সহ্য করিব! শরৎ কালের শশাঙ্কলেখা যেমন সুনীল মেঘপটল ভেদ করিয়া আপনার শক্তিতে সমুদিত হয়, জানকীও আমার সেইরূপ, আপনার স্বভাব-শুদ্ধ চারিত্রশক্তিতে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগকে পরাভব করিয়া আমাকে দেখা দিবেন। তিনি একেই ত কৃশতনু, তাহাতে আবার বিদেশে, বিপাকে, অনাহারে ও অন্তর্দ্দাহি শোকে, অধিকতর কৃশা হইয়াছেন! কবে আমি তাঁহার সমস্ত দুঃখের মূলীভূত মহাপাপ রাবণের বক্ষঃস্থলে নিদারুণ আঘাত করিব? এবং কবেই বা, ঐরূপ আঘাতের দ্বারা রাবণকে নিধন করিয়া, তাঁহার প্রাণ জুড়াইব? হা কবে! কবে আবার সে স্বর্গসমুচিতা দেবতা-সদৃশী সতী, সে প্রীতিমতী জানকী, উৎকণ্ঠাকুল হৃদয়ে আমাকে কণ্ঠে জড়াইয়া, আনন্দজনিত নয়নজলে আর্দ্র হইবেন; এবং কবে,—কত দিনে, আমিই বা, মলিন বসন পরিত্যাগের পর, শুক্লাম্বর ধারণের ন্যায়,

"কদা নু খলু মে সাধ্বী সীতাহমরসুতোপমা।
সোৎকণ্ঠা কণ্ঠমালম্ব্য মোক্ষ্যত্যানন্দজং জলম্॥
কদা শোকমিমং ঘোরং মৈথিলীবিপ্রযোগজম্
সহসা বিপ্রমোক্ষ্যামি বাসঃ শুক্লেতরং যথা।"

আমার এই মর্ম্মনিহিত শোক-শৈল্য উদ্ধার করিয়া জানকীরে হৃদয়ে ধারণ করিব।"

রামচরিত্রের এ সকল চিত্র ও রামের এ সকল কথা, একে একে, লক্ষ্মণের মনে পড়িল; এবং যে রাম সত্যই জানকীরে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, সেই রাম আজি, জানকীরে পাপস্পৃষ্ট নিকৃষ্ট বস্তু জ্ঞানে, বহুলোক-সমক্ষে, পরুষ-বাক্যে নিগ্রহ করিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন, এই দৃশ্য লক্ষ্মণের প্রাণে কেমন একটা আগুন জ্বালিল। কিন্তু রাম পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তাঁহার না হইতেছে দয়া, না হইতেছে দুঃখ, না হইতেছে হৃদয়ে পূর্ব্বসঞ্চিত প্রীতির অণুমাত্র সঞ্চার। তিনি যেন আপনাকেও একবারে ভুলিয়া ও আত্মজীবনের আদ্যোপান্ত সমস্ত ইতিবৃত্ত বিস্মৃত হইয়া, নীল-কুঞ্চিত-কুন্তলা রূপোজ্জ্বলা জানকীর দিকে এক এক বার নয়নকোণে চাহিতেছেন; আর কেমন এক অভাবনীয় ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া জানকীরে কহিতেছেন,—

"ভদ্রে, তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলিয়া যাও, আমি তোমায় আর চাহি না। নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন দীপ-শিখার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, আমিও সেইরূপ তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছি না। যে স্ত্রী, পরাধীন রূপে, পরগৃহে বাস করিয়াছে, কোন্ সৎকুল-জাত তেজস্বী পুরুষ, পুরাতন সৌহার্দ্দ ও স্নেহের লোভে, সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে? রাবণ অতি পাপিষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। সে যখন তোমায় পাপ-চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছে, তখন কিরূপে আমি মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় তোমায় স্পর্শ করিব?"

রাম এ সকল কথা এবং ইহা হইতেও অধিকতর কটু আরও বহু অনুচ্চার্য্য কথা কহিয়া জানকীর মর্ম্মচ্ছেদ করিতে লাগিলেন; এবং তখন সমুদ্রের তটে, সে নীরব-নিস্পন্দ লোকারণ্যের মধ্যে যত প্রকারের লোক দণ্ডায়মান ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকেও দুঃসহ শোক-দুঃখে আকুল করিয়া তুলিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ এখন আর আকুল নহেন। তাঁহার হৃদয় ইতঃপূর্ব্বে যার-পর-নাই আকুল হইয়াছিল। তাঁহার সে আকুলতা এখন আর নাই। এখন তিনি ধ্যান-স্তিমিত ঋষির ন্যায় আপনাতে আপনি অবস্থিত। তাঁহার মুখশ্রী মলিন; মুখ খানি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে, অথচ সে মুখে কথা ফুটিতেছে না। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তিনি যেন ঈশ্বরের ধ্যানে আত্ম-নিবিষ্ট হইয়া ইহ লোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

ইহা বলা বাহুল্য যে, জানকীর অবস্থা তখন আর এক প্রকার। জানকী, আপনার সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষায় স্বর্গীয় বীরাঙ্গনার মত তেজস্বিনী মেয়ে হইলেও, শিশুকাল হইতেই যার-পর-নাই নম্রস্বভাবা, নবনীত-কোমলা ও স্নেহশীলা। তিনি স্বামীর কাছে চির দিনই পাদপ-কণ্ঠ-শোভিতা লতাটির মত;—স্বামী গৃহে আসিয়াছেন অবধি, সকল

সময়েই, স্বামীর স্নেহে ও আদরে এবং প্রেমাকুল ভালবাসার শত প্রকার উপচারে, লালিত ও সংবর্দ্ধিত। তিনি রামচন্দ্রকে যেমন জগদেকশরণ্য মহাবীর ও মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন, আপনাকেও সেইরূপ রামহৃদয়ের উপযুক্ত রাজরাণী,—রামের যোগ্য দেবরমণী জ্ঞানে সম্মান করিতেন। এ আত্মসম্মানের ভাব স্বামী সোহাগেই পর্য্যবসিত রহিত, কখনও স্বামীকে লঙ্ঘন করিয়া অভিমানে ফুটিত না। ফলতঃ, জানকীর চক্ষে কেহ কখনও রুক্ষ দৃষ্টি দেখিতে পাইত না,—জানকীর অপ্রিয়কারিণী রমণীরাও কখনও তাঁহার মুখে একটি রুক্ষ কথা শুনিয়া ক্লিষ্ট হইত না। আজি সে জানকীর চরিত্রে মুহূর্ত্তের তরে একটুকু পরিবর্ত্ত ঘটিল,—জানকী মুহূর্ত্তকাল আপনার স্বাভাবিক মৃদুলতা বিস্মৃত হইয়া,—তিক্ত নহে, কিন্তু—একটুকু উচ্ছ্রিত—গভীর উচ্চ ভাব ধারণ করিলেন।

জানকী ইচ্ছা করিলে শ্রীরামকে বহু কটু কথা বলিতে পারিতেন। তিনি বলিতে পারিতেন,—"নাথ তুমি অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বঞ্চিত হইয়া বনবাসী হইয়াছ, ইহা আমার দোষ, না তোমার বিমাতার দোষ? তুমি বনবাস-সময়ে আমাকে ঋষি-তপস্বিদিগের আশ্রমের অদূরে—প্রহরি-পরিরক্ষিত ও প্রাচীর-বেষ্টিত উত্তম কুটীরে না রাখিয়া, লতাপাতার কুটীরে রাখিয়াছ, ইহা আমার দোষ, না তোমার দোষ? তুমি শূর্পণখার অপমান এবং খর-দূষণ-প্রভৃতি রাক্ষসের নিধন-বিধান করিয়া লঙ্কার পাপিষ্ঠ রাবণকে শত্রু করিয়াছ, ইহা আমার দোষ না তোমার দোষ? আর সেই রাবণকে আমার অপহরণ-সংবাদ শ্রবণ মাত্রই সমূলে ধ্বংস করিতে পার নাই, ইহাও আমার দোষ, না তোমার দোষ?"

কিন্তু জানকী শ্রীরামচন্দ্রকে কটুর প্রত্যুত্তরে কটু কথা কহিলেন না। তিনি রামের উল্লিখিতরূপ বিবিধ দুরুক্তি শুনিয়া প্রথমতঃ লজ্জায় একবারে জড়সড় জড়ীভূত হইলেন; রাম এত লোকের সমক্ষে ঐরূপ জনতাপূর্ণ স্থলে তাঁহাকে বিষাক্ত বাক্যশৈল্যে বিদ্ধ করিয়া, আপনার ও তাঁহার উভয়েরই তাদৃশ নিগ্রহ করিতেছেন, এই চিন্তায় লজ্জায় একবারে মরিয়া গেলেন;—যেন আপনার তনুতে আপনি প্রবিষ্ট হইয়া লোকলোচনের অদৃশ্য হইতে চাহিলেন*। তার পর, কিছুক্ষণ অতি করুণ ও অস্ফুট স্বরে কাঁদিলেন। জানকী আর কোন দিন কাঁদেন নাই, আজি কিছুক্ষণ বড়ই বেশী কাঁদিলেন। পিতা জনক—সে প্রশান্তমূর্ত্তি রাজর্ষি তাঁহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন; তাঁহার গৃহে তিনি কোন দিন কাঁদেন নাই। অযোধ্যায় শ্বশুর ও শাশুড়ীর স্নেহময়বাৎসল্যে পিতাকে স্মরণ করিবারও সুযোগ পান নাই; এবং স্বামীর সোহাগে সংসারের কোন কথাই চিন্তা করেন নাই। তিনি যে পথে চলিয়া গিয়াছেন,

*"প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বান্যেব জনকাত্মজা বাক্‌শরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্ত্তয়ৎ।"

দাস-দাসীরা আগে আগে সেই পথে ধাবিত হইয়া পথের কাঁটাটি পর্য্যন্ত দূর করিয়াছে। সুতরাং অযোধ্যায় তাঁহার চক্ষে কখনও এক ফোটা অশ্রু ঝরে নাই। আজি তাঁহার সে স্ফুট-নীল-পদ্ম-সদৃশ চক্ষু দুটিতে কিছুক্ষণ অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরিল। তাঁহার প্রাণের রাম—প্রাণাধিক ধন—প্রাণ-সখা—প্রাণবন্ধু, প্রাণারাধ্য পতি, প্রাণের মর্ম্মাস্থি পর্য্যন্ত স্বপ্নাতীত পাপকথায় পোড়াইয়া পোড়াইয়া, সর্ব্বজন সমক্ষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন, এই অভাবনীয় ঘটনায় কিছুক্ষণ তাঁহার বক্ষঃস্থল চক্ষের দরদরিত ধারায় আর্দ্র হইল। অগ্নিপরীক্ষা আর কাহাকে বলে? ইহাই ত জানকীর সহস্র অগ্নিপরীক্ষা। যখন এ নিদারুণ দাহে, নিরন্তর অশ্রুবর্ষণে, প্রাণটা একটু লঘু হইল,—জানকীর যখন এইরূপ বোধ জন্মিল যে, তাঁহার পার্থিব-জীবনের শেষ হইয়াছে,—পৃথিবীতে তাঁহার আর কেহ নাই, তখন তিনি আঁচলে চক্ষু মুছিয়া, রামের দিকে চাহিয়া, গদ-গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন—

"কিং মামসদৃশং বাক্যমীদৃশং শ্রোত্রদারুণম্,
রূক্ষং শ্রাবয়সে বীর প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব।
ন তথাস্মি মহাবাহো যথা মামবগচ্ছসি,
প্রত্যয়ং গচ্ছ মে স্বেন চারিত্রেণৈব তে শপে।
পৃথক্‌স্ত্রীণাং প্রচারেণ জাতিং ত্বং পরিশঙ্কসে,
পরিত্যজৈনাং শঙ্কান্তু যদি তেঽহং পরীক্ষিতা।

পাঠক, দেখিতেছেন যে, যে জানকী শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডে দশবার প্রাণনাথ শব্দে সম্ভাষণ করিয়াও প্রাণের লালসায় তৃপ্ত হইতেন না, সেই জানকী আজি শ্রীরামচন্দ্রকে শুধু বীর ও মহাবাহু প্রভৃতি নামেই সম্ভাষণ করিতেছেন,—রামের রণদুর্ম্মদা বীর-শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সম্বোধন-শব্দ যোজনা করিতেছেন; একবারও তাঁহার চিরপরিচিত স্নেহকরুণা ও মহত্বের পরিচায়ক কোন শব্দ প্রয়োগ করিয়া, তাঁহাকে করুণ রসে আর্দ্র করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন না। ইহাই স্নেহকোমলা জানকীর কোমল হৃদয়ে ক্রোধের শেষসীমা,—কটূক্তির পরাকাষ্ঠা। ক্রোধের আর একটুকু পরিচয় উপদেশের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে। জানকী, যুবতী হইয়াও, চরিত্রের দুর্নিরীক্ষ্য উচ্চতায়, এইক্ষণ বর্ষীয়সী তাপসীর মত। তিনি ইচ্ছা করিতেছেন না, অথচ তাঁহার অলোকসামান্য ঊর্দ্ধচারি উচ্চপ্রকৃতি, এ ঘোরতর বিপত্তি অথবা পরীক্ষাসময়ে, আপনা হইতেই উচ্চতর গ্রামে উঠিয়া, রামচন্দ্র-সম্ভাষণে, সমগ্র পৃথিবীকেই যেন, স্ত্রীচরিত্র বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেছে। জানকী কহিলেন—

"বীরবর, পৃথিবীর নিম্নশ্রেণিস্থ পুরুষেরা নিম্নশ্রেণিস্থা রমণীদিগকে যেরূপ রূক্ষ কথা বলে, তুমি কেন আমায় সেইরূপ অযোগ্য, অশ্রোতব্য রূক্ষ কথা কহিয়া আত্মনিগ্রহ করিতেছ। তুমি আমায় যেরূপ মনে করিয়াছ, আমি তাহা নহি। চরিত্রবলই আমার একমাত্র সম্বল; আমি 'আমার সেই চরিত্রের' উল্লেখে শপথ করিয়া কহিতেছি, আমি সম্মানার্হ ও সর্ব্বথা প্রত্যয়যোগ্য। তুমি আমাকে সম্মান ও বিশ্বাস করিয়া চিত্তে

শান্তি লাভ কর। তুমি নিকৃষ্টপ্রকৃতি স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র চিন্তা করিয়া সমস্ত স্ত্রীজাতিকে এক বস্তু মনে করিয়াছ,—স্ত্রীজাতি মাত্রেরই চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছ। ইহা তোমার যোগ্য নহে। তুমি যদি আমায় চিনিয়া থাক,—আমি যদি তোমার কাছে পরীক্ষিতা হইয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি তোমার সে শঙ্কা ও সন্দেহ একবারে পরিত্যাগ কর।"

জানকী পুনরপি কহিলেন,—"তুমি আর আমি সুদীর্ঘ কাল একসঙ্গে বাস করিয়াছি,—সুদীর্ঘ কাল একে অন্যকে প্রবর্দ্ধিত অনুরাগে ভালবাসিয়াছি। যদি তাহাতেও তুমি আমাকে সম্যক্ না বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আমি এমনিই ত মরিয়া আছি, নূতন আর মরিব কি? তুমি যখন বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌কে আমার অনুসন্ধানের জন্য লঙ্কায় পাঠাইয়াছিলে, আমায় তখন কেন এ পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি তাহা হইলে, তখনই ত এ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া তোমার সকল যন্ত্রণার শেষ করিতে পারিতাম! আমি তখন ঐরূপে উদ্ধার পাইলে, তুমি তোমার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া বৃথা এত কষ্ট পাইতে না; এবং তোমার সুহৃৎস্বজনদিগেরও কোন কষ্ট হইত না।

যাহার শরীরে কিংবা মনে কোন প্রকার পাপ-স্পর্শ থাকে,তাহার মন ও প্রাণ, বিচারস্থলে, আপনা হইতেই একটুকু কম্পিত হয়,—মুখচ্ছবি মলিন হইয়া উঠে। জানকী দৈবদুর্বিপাক-বশতঃ, বিপন্ন হইয়া থাকিলেও, তাঁহার মন ও প্রাণ পর্ব্বতের মত অটল,—মুখচ্ছবি পবিত্রতার স্বাভাবিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার সমস্ত কথাই উপদেশপূর্ণ, অথচ প্রত্যেক কথাই আত্মসম্পর্কে কাতরতাশূন্য। রাম, তাঁহার রাজ-শক্তি, পৌরুষী কীর্ত্তি ও রণাঙ্গণ-শৌর্য্যে, যত বড় পুরুষ হউন না কেন, হৃদয়ের উচ্চতা, উদারতা ও অমল-প্রেম-মহত্বে, তিনি এ সময়ে, জানকীর নিকট কতকটা নিষ্প্রভ হইয়াছেন। কারণ, রামের চিত্ত সংশয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন; জানকীর চিত্ত সত্য ও পবিত্রতার দীপ্তিতে পরিপূর্ণ। রামের প্রেম, পৃথিবীর পঙ্কিলা নীতির নিকট পরাভূত হইয়া, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় বিশীর্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; জানকীর প্রেম, সে পঙ্কিলা নীতিকে পদতলে দলন করিয়া, আপনার পূর্ণজ্যোতি ও পুণ্যময় পরার্থপরতায় প্রতিভাসিত হইতেছে। তাই, জানকীর মুখে এখন যে সকল কথা ফুটিতেছে, তাহা মানুষীর কথার মত নহে,—উর্দ্ধতন-ধামবাসিনী দেব-শক্তি-বিলাসিনী স্বর্গীয় রমণীর কথার মত। জানকী সে কথার উদারগাম্ভীর্য্যে কতকটা আত্মবিস্মৃতবৎ হইয়া আবার কহিলেন,—

"ত্বয়া তু নৃপশার্দ্দূল রোষমেবানুবর্ত্ততা,
লঘুনেব মনুষ্যেণ স্ত্রীত্বমেব পুরস্কৃতম্।
অপদেশো মে জনকান্নোৎপত্তির্বসুধাতলাৎ,
মম বৃত্তঞ্চ বৃত্তজ্ঞ বহু তে ন পুরস্কৃতম্।
ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে মম নিপীড়িতঃ,
মম ভক্তিশ্চ শীলঞ্চ সর্ব্বস্তে পৃষ্ঠতঃ কৃতম্।

অর্থাৎ,—

রাজাধিরাজ,তোমার সম্পর্কে ইহাই আমার দুঃখ যে, তুমি, লঘুপ্রকৃতি পুরুষের ন্যায়, রোষের বশীভূত হইয়া, আমা-হেন স্ত্রীকেও সাধারণ শ্রেণির স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করলে। তুমি বিচারবিজ্ঞ পুরুষ, অথচ আমায় একবারেই না চিনিয়া,—আমার জানকী নাম এ জগতে কি নিমিত্ত এত সম্মানিত, তাহা একবারও না ভাবিয়া, আমার বহুমান-যোগ্য চরিত্রে উপেক্ষা করিলে; আর, তুমি বাল্যে যে সংকল্পে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তাহা, এবং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তি, সমস্তই একবারে পিছনে ঠেলিয়া ফেলিলে।"

কহিতে কহিতে জানকীর শরীরে কেমন একপ্রকার স্বর্গীয় জ্যোতির আবির্ভাব ও হৃদয়ে কিরূপে এক অনির্ব্বচনীয় দৈবী শক্তির স্ফূর্ত্তি হইল,—বাষ্প-গদ-গদ-ভাষিণী জনকনন্দিনী লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, —"সুমিত্রাকুমার!"—মা লক্ষ্মী লক্ষ্মণকেও এখন আর দেবর কিংবা বৎস লক্ষ্মণ বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছেন না, লক্ষ্মণও যেন একটু পর হইয়াছেন। এই হেতুই, সে পর-পর ভাবে সম্ভাষণে কহিলেন,—"সুমিত্রাকুমার! আমার একটি শেষ কার্য্য কর; আমার জন্য এখনই এখানে চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও। চিতার উদ্দীপ্ত অগ্নি আমার এ আকস্মিক দুঃখের একমাত্র ঔষধ। আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া মুহূর্ত্তকালও বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না। পতি আমার গুণে অপ্রীত। তিনি যখন সর্ব্বসমক্ষে আমায় বিসর্জ্জন করিলেন, তখন অগ্নিই আমার একমাত্র গতি। আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া এ দেহ বিসর্জ্জন করিব।"

পূর্ব্বে কহিয়াছি, লক্ষ্মণ এতক্ষণ ধ্যানস্থবৎ নিঃস্তব্ধ ছিলেন। জানকীর কথায় সহসা যেন তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি, সহসা চৈতন্য লাভ করিয়া, ক্রোধ-স্ফুরিত চক্ষে, রামের দিকে একবার তাকাইয়া চাহিলেন; এবং জানকীর অগ্নিপরীক্ষাই রামের মনোগত সঙ্কল্প, ইহা তাঁহার আকারে ও প্রকারে বুঝিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিলেন।

লোকে প্রতিমা বিসর্জ্জন করে সমুদ্রে, কিংবা নদীর জলে। আজ্ঞানুবর্ত্তী লক্ষ্মণ, অযোধ্যার এ সোনার প্রতিমা,—রাম হৃদয়ের এ স্বর্ণলক্ষ্মীকে, সুদূর-লঙ্কার বহির্দ্বারে, চিতার অনলে বিসর্জ্জন করিবার জন্য, সমস্ত সামগ্রীই ক্রতহস্তে প্রস্তুত করিলেন। লক্ষ্মণ কি এ সময়ে মিথিলা ও অযোধ্যার কথা মনে করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন? হা মিথিলাধিপতি বৃদ্ধ জনক! তুমি এখন কোথায়!—[illegible]মি যাঁহাকে নিমেষ মাত্র না দেখিলে এ সং[illegible] নয়নে অন্ধকার দেখিতে,—যাঁহাকে [illegible]রূপে লাভ করিয়া আপনাকে এতই গৌরবান্বিত মনে করিতে, তোমার সে প্রাণের জানকী জন্মের মত চলিয়া যাইতেছেন, তুমি একবার দেখিতে পাইলে না। আর অযোধ্যার রাজরাণী তুমি দুঃখিনী কৌশল্যা! তুমিই বা এইক্ষণ কোথায়। তুমি রাম-হেন

পুত্র হইতেও যে পুত্রবধূকে এত বেশী ভালবাসিতে,—যাঁহার স্বভাবের অমল মাধুর্য্যে ও মুখচ্ছবির অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে সংসারের সকল দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে, তোমার সে প্রাণাধিক পুত্রবধূ,—তোমার সে বুকের ধন আজি চিতার আগুনে জীবন্ত ভস্ম হইতেছেন; তুমি একবার তাঁহার সে চন্দ্রমুখ চক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইলে না!

চিতার অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। যাহারা চারিদিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাঁহারা স্তিমিত-নেত্রে সে অগ্নির জ্বলন্ত শিখা চাহিয়া দেখিল। তাহারা রামের ক্রোধকে এতক্ষণ সাধারণ লোকের ক্রোধ বলিয়া মনে করিয়াছিল। রাম কি উদ্দেশ্যে জানকীর প্রতি ঐ রূপ ক্রোধের অগ্নি বর্ষণ করিয়াছিলেন, এতক্ষণে তাহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল। কিন্তু জানকী, তাঁহার সে মহামুহূর্ত্তেও, আপনার চারিত্র-গৌরবে ধীর, স্থির, এবং পতিপ্রাণা সতীর পাতিব্রত্য ধর্ম্মে অটল। রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি রামকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি স্বামিপরিত্যক্তা সাধারণ রমণীর ন্যায়, আগুনের দিকে প্রধাবিত না হইয়া, সুদূর-তীর্থযাত্রিনী পতিপরায়ণা তাপসীর ন্যায় স্বামীকে তখন পুনঃ পুনঃ ভক্তির সহিত প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং তদনন্তর অগ্নিকেও প্রদক্ষিণ করিয়া, দেবধর্ম্ম উদ্দেশ্যে, ঊর্দ্ধনয়নে, করপুটে কহিলেন—

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ,
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ।
যথা মাং শুদ্ধচারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ,
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ।"

অর্থাৎ,—"আমার হৃদয় যদি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র হইতে মুহূর্ত্তের তরেও পরিভ্রষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বলোক-সাক্ষী এই অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমাকে রক্ষা করুন। রাম যদি শুদ্ধচারিণী সাধ্বী জানকীরে বুদ্ধির ভুলে বিপথগামিনী মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সর্ব্বলোকসাক্ষী অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।" মা জানকী তখন অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পুনশ্চ কহিলেন—

"বচসি মনসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্যপুংসি।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী।"

—অর্থাৎ,—"আমি যদি কায়-মনোবাক্যে শুদ্ধচারিণী সতী না হই,—আমি যদি বাক্যে কিংবা মনে, অথবা আমার এ শরীরে,—স্বপ্নে কিংবা জাগরণে, কখনও রঘুনাথ রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতিভাবে জানিয়া থাকি, তাহা হইলে জীবের সুকৃত-দুষ্কৃত-কর্ম্মসাক্ষী এই অগ্নি আমার দুরিত-স্পৃষ্ট শরীরকে এখনই দগ্ধ করুন।"

জানকী, এইরূপে, এক দুই ক্রমে, তিন বার উল্লিখিত মহাশপথ-বাক্য উচ্চারণ করিয়া, অগ্নির পূজা করিলেন; এবং হৃদয়ে ও মনে মুহূর্ত্তের তরেও ভীত কিংবা বিচলিত না হইয়া, সমুদ্রবায়ুসন্ধুক্ষিত অনন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। সে

তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা, তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা, জগন্মোহিনী সুন্দরী যখন প্রথমতঃ অগ্নির সন্নিহিত হন, তখন দর্শকদিগের এইরূপ মনে লইয়াছিল যে, যেন স্বর্গের একটি দেবতা পৃথিবীর পাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরকে পড়িতেছেন। কিন্তু জানকীর সুকুমার তনু,—সে প্রস্ফুট-প্রফুল্ল লাবণ্যের ছবি,—সে স্নেহ-করুণা, মাধুরী ও মহিমার মোহন-মূর্ত্তি, যখন অগ্নির লক-লক জিহ্বায় আচ্ছাদিত হইয়া, ক্ষণকালের তরে অদৃশ্য হইল,—অগ্নি যখন ঘৃতধারাসন্ধুক্ষিত যজ্ঞীয় বহ্নির ন্যায় হুহুঃশব্দে বর্দ্ধিত হইয়া সে উচ্ছলিত রূপরাশি একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল, তখন চারিদিকে একটা ভয়ঙ্কর হাহাকার ও চীৎকারের ধ্বনি উঠিল। স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল; বালক ও বৃদ্ধেরা মাটীতে লুটাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; এবং যে বিশাল লোকারণ্য এতক্ষণ কেমন একটা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে সকলকে বিস্মিত রাখিয়াছিল, উহা এক্ষণ শুধুই বিলাপ, পরিতাপ ও হাহাকারের হৃদয়বিদারি সঙ্কুল-শব্দে ভয়ঙ্কর হইয়া পড়িল!

আদিকবি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের অনেক কবিই জানকীর এই অগ্নি-পরীক্ষা-বৃত্তান্ত কবিতায় বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গের কবি কৃত্তিবাসও, এই প্রসঙ্গ বর্ণনায়, বঙ্গীয় নরনারীকে নয়নজলে ভাসাইয়াছেন। আমরা বাঙ্গালি। কৃত্তিবাসকে বড়ই ভালবাসি। তাই এখানে কৃত্তিবাসের লেখা হইতে কএকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব।

"লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড,
বানর কটক বহু আনিল শ্রীখণ্ড।
কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জলন্ত অগ্নিরাশি,
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী।
সাত বার রামের চরণ প্রদক্ষিণ,
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন।
কনক অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে,
যোড় হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে।
শুন বৈশ্বানর দেব, তুমি সর্ব্ব আগে,
পাপ পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে।
কায়-মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী
তবে অগ্নি তব ঠাঁই পাব অব্যাহতি।
শিরে হাত দিয়া কাঁদে সবে সবিশেষ,
সীতা সতী অগ্নি মধ্যে করেন প্রবেশ।
অগ্নিতে প্রবিষ্ট মাত্র রামের মহিষী,
ঢালিয়া দিলেক তাতে ঘৃতের কলসী।
অগ্নি ঘৃত পাইলে অধিক উঠে জ্বলে,
কুণ্ডের ভিতরে রাম সীতারে নেহালে।
কুণ্ড মধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি,
শ্রীরামের ঝুরিতে লাগিল দুটি আঁখি।"

বাল্মীকির বর্ণনায়ও রামের অশ্রু-বিসর্জ্জনের কথা আছে। রাম, জানকীর অগ্নিপ্রবেশ সময়ে, অধোবদনে নীরব ছিলেন। কিন্তু জানকী যখন, সত্য সত্যই সহমৃতা সতীর ন্যায়, ঊর্দ্ধজিহ্ব অগ্নির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, তখন আর রামের সহিষ্ণুতা রহিল না। তিনি তখন দুই চক্ষুর দর-দরিত ধারায় ব্যাকুল হইলেন, এবং জানকী আর নাই ইহা মনে করিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই শোক-

বর্ণনা কৃত্তিবাসি কবিতায় একটুকু বেসী ফুটিয়াছে।

"কুণ্ড মধ্যে চান রাম সীতারে না দেখি,
শ্রীরামের ঝুরিতে লাগিল দুটি আঁখি।
দেখেন সংসারশূন্য যেমন পাগল,
ভূমে গড়াগড়ি যান হইয়া বিকল।
কি করি লক্ষ্মণ ভাই সীতা কি হইল,
সাগর তরিয়া নৌকা তীরেতে ডুবিল।
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার,
অযোধ্যায় ছত্র দণ্ড না ধরিব আর।
অগ্নি হৈতে উঠ সীতে জনককুমারি,
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি।"

জানকীর জন্য রামের উল্লিখিত-রূপ শোক-ব্যাকুলতার কথাগুলি পাঠ করিয়া সুন্দরীদিগের মধ্যে অনেকে হয় ত অন্তরে একটুকু ক্লিষ্ট হইবেন। তাঁহারা হয় ত শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ বলিবেন যে, "নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, তুমি এই মুহূর্ত্তে যাঁহাকে এত প্রকারে নিগ্রহ করিয়া আপনিই অগ্নির মধ্যে আহুতি স্বরূপ অর্পণ করিলে, তাঁহার জন্য এক্ষণ আবার এ ভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ কেন?" রামের সম্পর্কে এরূপ কথা অসম্ভব নহে। ভবভূতিচিত্রিত বন-তাপসী বাসন্তী, শ্রীরামচন্দ্রকে এমনই দুই একটি কথা কহিয়া, দুঃখের আবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাসন্তী কহিয়া ছিলেন, "রাম তুমিই না সর্ব্বদা জানকীর দিকে চাহিয়া বলিতে—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে,—
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরণুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ।"

অর্থাৎ, "তুমিই আমার জীবন,—তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নে আমার চন্দ্রের জ্যোৎস্না; অঙ্গে সুশীতল অমৃত;—রাম, তুমি না এইরূপ শত শত মধুর কথা কহিয়া, সে মুগ্ধস্বভাবা অবলাকে মোহিত রাখিতে? সেই রাম তুমি কি প্রকারে—হা! সে কথা আর কহিয়া কাজ কি?"

কিন্তু এই বাসন্তীই আবার সময়ান্তরে রামচরিত্র অথবা জানকীর প্রতি রামের অতুল-প্রেমাকুলতা সমালোচনা করিয়া কহিয়াছিলেন,—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি,
লোকোত্তরাণাংচেতাংসিকোহিবিজ্ঞাতুমর্হতি"

আমরাও এখানে এই হেতুই, রাম-চরিত্রের আর সমালোচনা করিব না। আমরা, বনতাপসী বাসন্তীরই চরণ-রেখা অনুসরণ করিয়া, এইমাত্র কহিব যে,—যাঁহারা রামের মত লোকোত্তর পুরুষ, তাঁহাদিগের চিত্ত ও চরিত্র, উভয়ই সাধারণের দুরধিগম্য। তাঁহাদিগের হৃদয় এক দিকে কুসুম হইতেও অধিকতর কোমল, আর এক দিকে বজ্র হইতেও অধিকতর কঠোর। তাঁহারা কখন কি উদ্দেশ্যে কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাধারণ লোকে বিচার করিয়া অবধারণ করিতে সমর্থ হয় না। নহিলে, স্নেহ ও প্রীতির অগাধ-জলধিস্বরূপ রাম তাঁহার প্রাণাধিকা জানকীরে অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিবেন, এমন সম্ভব হইতে পারে না।

কিন্তু রামের নাম যদি রাম, জানকীর নাম জানকী। জানকীর পিতা মহাত্মা জনক,—যাজ্ঞবল্ক্যের প্রজ্ঞাবান্ ছাত্র প্রাতঃস্মরণীয় সীরধ্বজ, রাজা হইলেও, স্বকীয় জীবনের অগ্নিকল্প পবিত্রতায়, ঋষিদিগের নিকট দেবতার মত পূজা পাইয়াছেন। তিনি জানকীর এই অগ্নিপরীক্ষার কথা শুনিয়া একবার বলিয়াছিলেন যে,—"আমার কন্যাকে পরীক্ষা করে, সে অগ্নি আবার কেমন অগ্নি।"* জানকী সেই জনকেরই শিষ্যা, শিক্ষিতা ও শতযত্নসংবর্দ্ধিতা স্নেহলালিতা দুহিতা। রামচন্দ্র, জানকীর জনকসম্পর্ক উল্লেখ করিয়া, সর্ব্বদা অতিমাত্র অভিমানের সহিত নানা কথা কহিতেন; এবং অমন পুণ্যশ্লোক ও তপঃপূত মহাপুরুষের কন্যা চারিত্রসম্পদে স্বভাবতঃ কিরূপ উচ্চশ্রেণিস্থ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া, জানকীরে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করিতেন। বস্তুতঃ, সে অংশে রাম এ মানবজগতে যেরূপ আরাধ্য হইয়া রহিয়াছেন, জানকী তাঁহা হইতেও অধিকতর আরাধ্য পদবী লাভ করিয়া সমগ্ররমণীজাতির শীর্ষস্থানীয়া হইয়া আছেন। তিনি জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, এই ভারতভূমি, পুণ্যভূমি নামের জন্য, অধিকতর যোগ্য হইয়াছে; এবং তাঁহার জন্মসম্পর্কে পৃথিবীর সমস্ত রমণীই আপনাকে শ্রেষ্ঠতর পদার্থ বলিয়া মনে করিবার অধিকার পাইয়াছে। জানকী, রাবণের অশোকবনে, আত্মার অলৌকিক ও অপরিভব্য শক্তিতে আপনাকে আপনি রক্ষা করিয়াছিলেন। আজি এ শপথপরীক্ষার সময় পৃথিবীর সামান্য অগ্নি কি তাঁহাকে ভস্ম করিবে? ইহা সম্ভবপর নহে।

রাম যে সময়ে জানকীর শোকে আকুল হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, এবং দ্রষ্টৃবর্গের মধ্যে যখন সকলেই রামকে বেষ্টিয়া, অথবা সমুদ্র-তটবর্ত্তি প্রান্তর-ভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া, বিলাপ করিতেছে, জানকী তখন সে অগ্নিরাশি হইতে অস্পৃষ্টতনুতে বাহির হইয়া সম্মুখস্থ সকলকেই বিস্ময় ও হর্ষে অভিভূত করিলেন; এবং কতিপয় দেবপুরুষও, সে সময়, সেখানে, রাম ও লক্ষ্মণের দৃষ্টিপথে, প্রকট হইয়া, জানকীর অনবদ্য চরিত্র সম্পর্কে জয়-জয়-শব্দ-সহকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেই দেখিয়া আশ্চর্য্য মনে করিলেন যে, জানকীর সুললিত-সুকোমল তনু অগ্নিতে সন্তাপিত হওয়া দূরে থাকুক, উহা যেন অনল-স্নাত হইয়া আরও বেশী স্নিগ্ধকান্তি লাভ করিয়াছে; এবং তাঁহার অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্রনিচয় ও শিরোভূষণ কুসুমদামও, যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে।

দেবপুরুষদিগের মধ্যে যিনি সে অগ্নিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন,—বাল্মীকি যাঁহাকে অগ্নিদেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রামকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—"এই নাও রাম,—এই নাও তোমার জানকী। ইনি বিদেহাধিপতি জনকের দুহিতা, ইঁহার তনুতে অণুমাত্রও পাপস্পর্শ নাই। জানকী কায়মনোবাক্যে সতী, এবং এ জগতে এক

*"আ কোঽয়মগ্নির্নামাস্মৎপ্রসূতিপরিশোধনে।"

মাত্র তোমাতেই প্রীতিমতী। জানকী যখন, রাক্ষসের পুরীতে, বহু রাক্ষসীর দ্বারা পরিরক্ষিত অবস্থায়, অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন ইহার চিত্ত ও চরিত্র নিমিষের তরেও কলুষিত হয় নাই। ইঁহার আত্মা, এক মাত্র তোমাতেই ধ্যানরত রহিয়া, আপনার শক্তিতে ইঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। জানকী বিশুদ্ধভাবা ও নিষ্পাপা। এ বিষয় কিছুমাত্র আর বক্তব্য নাই। অতএব আমি আজ্ঞা করিতেছি, রাম, তুমি জানকীরে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হও।"

রাম, দেবাত্মার বাক্য শুনিয়া, কিছুক্ষণ হর্ষবিস্ফারিত-লোচনে নিস্তব্ধবৎ রহিলেন; তার পর মুক্তকণ্ঠে বলিলেন,—"আমিও জানকীরে জানি। জানকী অনন্যহৃদয়া, মদেক-পরায়ণা, এবং প্রকৃত পতিপ্রাণা। এ সংসারে আমি ভিন্ন আর কাহারও মূর্ত্তি জানকীর চিত্তে কদাপি অঙ্কিত হয় নাই, —কোনরূপ কল্পিত কলঙ্কও জানকীর নির্ম্মল চরিত্রকে কলুষিত করিতে পারে নাই। আমি ইহাও জানি, জানকী আপনার তেজঃপুঞ্জময় চারিত্রশক্তিতেই সর্ব্বত্র সুরক্ষিত, এবং সমুদ্রের পক্ষে শিলাময়ী বেলাভূমির ন্যায়, রাবণের অলঙ্ঘ্য। সে দুরাত্মা মনেও কখনও ইঁহার অপমান করিতে সমর্থ হয় নাই। কেন না, মহাসতী জানকী, রাবণের অন্তঃপুরে, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায়, সর্ব্বতোভাবে তাহার অস্পৃশ্য ছিলেন। ফলতঃ, প্রভা যেমন সূর্য্য হইতে স্বভাব-গুণে অবিচ্ছিন্ন, জানকীও সেইরূপ, আমা হইতে সতত অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন। জানকী ত্রিলোকমধ্যে পবিত্র, এবং কীর্ত্তি যেমন মনস্বি-পুরুষের অত্যাজ্য, জানকীও সেইরূপ আমার অত্যাজ্য।"

রাম পুনরপি কহিলেন,—"দেবগণ, আপনারা জগতের পরিরক্ষক, করুণার্দ্রহৃদয় এবং স্বভাবতঃ হিতবাদী। আপনারা যাহা কহিলেন, তাহা সজ্জন-মঙ্গলজনক। আমি জানকীরে যার-পর-নাই শুদ্ধচারিণী ও সতী সাধ্বী জানিয়াও যে শ্রুতিপীড়ক কটুবাক্যের দ্বারা অগ্নিপরীক্ষায় প্রণোদিত করিয়াছিলাম, তাহা শুধুই লোকাপবাদ হইতে অব্যাহতির জন্য। আমি এইক্ষণ, আপনাদিগের বাক্যে, সে অংশেও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া, জানকীরে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলাম।"

রামের কথা যখন সমাপ্ত হইল, তখন সে সহস্রকণ্ঠ-সভাস্থলে পুনরায় একটা গগনস্পর্শি জয়-জয়-শব্দ সমুত্থিত হইল; এবং এবার জানকীর পরিম্লান অধরেও একটুকু প্রফুল্ল হাসি ফুটিল। জানকী, অগ্নিপরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং দেবচরিত্রের গতি ও পরিণতি সম্যক্ বুঝিয়া, রামের প্রতিও প্রসন্ন হইলেন। রাম, একে একে, আবির্ভূত দেবপুরুষদিগকে প্রণতিজ্ঞাপনে পূজা করিতেছেন, এইরূপ সময়ে একটি শ্বেতাম্বর-বিভূষিত শুভ্রমূর্ত্তি দেবপুরুষের প্রতি সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন, এবং সে দেবপুরুষের চরণোপান্তে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। দেবপুরুষ

রামচন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গনে সন্তর্পণ করিয়া স্নেহশীতল মধুর স্বরে কহিলেন,—

"বাছা রাম, আমায় চিনিতে পাইতেছ কি? আমি তোমার পিতা দশরথ। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দেবতা-দিগের সঙ্গে এখানে আসিয়াছি। আমি তোমা-হেন পুত্রের গুণে, স্বর্গবাসী হইয়া থাকিলেও, আজি তোমায় এখানে বিজয়ী দেখিয়া যেরূপ সুখ লাভ করিতেছি, স্বর্গ-বাসেও আমার তেমন সুখ বোধ হয় নাই। কৈকেয়ী যে সকল কটু কথা কহিয়া তোমায় বনবাসী করিয়াছিল, সেগুলি আমার হৃদয়ে শেলের মত বদ্ধ ছিল। আমি আজি, তো-মায় লক্ষ্মণের সহিত নিরাপদ দেখিয়া, নীহার-মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় দুঃখমুক্ত হইলাম। কৌ-শল্যা এত দিনে কৃতার্থ হইলেন। তুমি অরণ্যবাস হইতে গৃহবাসে ফিরিয়া যাইবে, তিনি ইহা দেখিয়া সুখী হইবেন। পুর-বাসিগণেরও পরম ভাগ্য, তাহারা তোমায় রাজসিংহাসনে রাজ্যেশ্বররূপে অভিষিক্ত দে-খিবে। বাছা, ভরত সত্যই ধর্ম্মচারী বীর; সে শুদ্ধস্বভাব ও তোমাতে একান্ত অনু-রক্ত। তুমি ভরতের সহিত যাইয়া সম্মিলিত হও, এইটিই আমি এইরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ বনবাসী হইয়াছিলে;—লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নিয়মনির্দ্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে, এবং দুর্ব্বৃত্ত রাবণকে নিহত করিয়া দেবতাদিগেরও প্রীতি জন্মাইলে। তুমি এ দুষ্কর কার্য্য সাধনের দ্বারা যশস্বী হইয়াছ। এইক্ষণ ভারত-সাম্রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হও।"

দেবমূর্ত্তি দশরথ লক্ষ্মণকেও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—"বৎস, তুমি নিরন্তর কায়মনোবাক্যে রাম ও জানকীর সেবা করিও, ইহাতে তোমার ধর্ম্মলাভ হইবে। রাম সততই সর্ব্বলোকের হিতসাধনে ব্যা-পৃত; রাম প্রসন্ন রহিলে তোমার যশ ও পুণ্য বৃদ্ধি পাইবে।" রাম-লক্ষ্মণের পশ্চাদ্ভাগে জানকীও দশরথের দিকে চাহিয়া বদ্ধাঞ্জলি দণ্ডায়মানা ছিলেন। দশরথ, জানকীকে মৃদুমধুর ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—

"বাছা বৈদেহি, আমি তোমাকে আমার কন্যাটির মত ভালবাসি। তুমি রামের প্রতি মন্যু ত্যাগ করিয়া মনে প্রফুল্ল হও, এইটি আমার অনুরোধ। রাম যে তোমার জন্য অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ইহা প্রকৃতই তোমার হিতার্থ,—তোমার বিশুদ্ধচরিত্রের যশঃখ্যাপনার্থ। তুমি সুদু-ষ্কর শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা আপনার চরিত্র-পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছ; এবং এ অগ্নি-পরীক্ষার কঠোর অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত সং-সারে,—সকল শ্রেণির কুলকামিনীর মধ্যে কীর্ত্তিমতী ও যশস্বিনী হইয়াছ। তোমা-হেন সতীকে পতিসেবায় উপদেশ করা অত্যুক্তি মাত্র। আমি তথাপি বলিতেছি, তুমি তোমার পতিকে পরম দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিও।"

এইরূপ কথার অবসরে রাম আবার কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন—"পিতঃ, আপনি

আমার বনবাস-যাত্রাসময়ে মাতা কৈকেয়ীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, কৈকেয়ী ও ভরত উভয়কেই ঘোরতর অভিসম্পাতের সহিত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহাদিগের প্রতি পুনরায় প্রসন্ন হইলে আমার প্রাণটা শীতল হয়।" যথা বাল্মীকির যুদ্ধকাণ্ডে,—

"ইতি ব্রুবাণং রাজানং রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ
কুরু প্রসাদং ধর্ম্মজ্ঞ কৈকেয্যা ভরতস্য চ॥
সপুত্রাং ত্বাং ত্যজামীতি যদুক্তা কৈকেয়ী ত্বয়া।
স শাপঃ কৈকয়ীং ঘোরঃ সপুত্রাং ন স্পৃশেৎ প্রভোঃ।

দশরথ প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"বাছা, আমি তোমার বাক্যে প্রীত হইলাম, এবং কৈকেয়ী ও ভরত উভয়কেই আজি সরল হৃদয়ে ক্ষমা করিলাম।" এই কহিয়াই, দশরথ, লক্ষ্মণ ও জানকীরে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া, অন্তরীক্ষে চলিয়া গেলেন। দেবতারাও দেখিতে না দেখিতেই অদৃশ্য হইলেন। এ দিকে, পুরুষ-প্রবীর রামচন্দ্র,প্রেমস্নেহময়ী জানকীরে গাঢ় আলিঙ্গনে কণ্ঠে গাঁথিয়া, ও সমবেত বীরবৃন্দকে স্ব স্ব স্থানে নিশাযাপনের উপদেশ দিয়া, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত, আপনার লতাপত্ররচিত প্রবাস-কুটীরে প্রফুল্লচিত্তে প্রবেশ করিলেন; এবং দীর্ঘস্থায়ি দুঃস্বপ্নের পর সানন্দ-জাগরণ, অথবা সুদীর্ঘকাল-ব্যাপি কঠোর তপস্যার পর সুখশীতলা সিদ্ধির মত, শান্তি ও আনন্দ, উভয়ই এক সঙ্গে লাভ করিয়া, সর্ব্বাংশে কৃতার্থ হইলেন।

জানকীর অগ্নিপরীক্ষাসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাহিনী এখানে পরিসমাপ্ত হইল। কিন্তু এ স্থলে দুই তিনটি কঠোর বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সমাধান ও উত্তরদান অবশিষ্ট রহিল। প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই বান্ধবের আগামি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

# দার্শনিক মতের সমন্বয়।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ এবং বুদ্ধদর্শনের আত্মবাদ—এই উভয় মতেরই এতদ্দেশে বিকৃত ব্যাখ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমাদের মনে হয় যে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও এই দুই মতবাদের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া, নানাপ্রকার অসদর্থের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে "আরতি"-নামক পত্রিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, মূল মত লইয়া প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলে, সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনে বিশেষ কোন পার্থক্য উপলব্ধ হইবে না। যাহা কিছু মতদ্বৈধ তাহা কেবল বাহিরের দিক্ হইতে। অদ্য আমরা এই প্রবন্ধের বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে এই

বিষয়েরই একটু বিস্তৃত সমালোচনা করিব ইচ্ছা করিয়াছি। পাঠক দয়া করিয়া "আরতি"র সেই প্রবন্ধ কয়েকটিও এতৎসঙ্গে পাঠ করিয়া দেখিলে, আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

বুদ্ধ আত্মা অস্বীকার করিলেও, এক নিত্য আত্মার অস্তিত্ব তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। বস্তুতঃ, হিন্দুর অন্যান্য দর্শন হইতে বৌদ্ধদর্শনের পার্থক্য বাস্তবিক পক্ষে অতি সামান্য। একই তত্ত্বের বিভিন্ন দিক্ হইতে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ভিন্ন ভিন্ন সত্য দেখিয়াছেন বলিয়া, আপাততঃ দর্শনগুলিকে নিতান্ত ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধের বিজ্ঞান-স্কন্ধ এবং বেদান্ত ও সাংখ্যের অন্তঃকরণ একই পদার্থ। আমরা বিজ্ঞানস্কন্ধ ও অন্তঃকরণকে একই ধরিয়া লইতেছি। বুদ্ধ বলেন যে, মৃত্যুর পরে এই বিজ্ঞানই নূতন-দেহ সৃষ্টির বীজভূত হয়। গর্ভে এই বিজ্ঞানই প্রবিষ্ট হইয়া শরীরের আকার গ্রহণ করে। "From consciousness (বিজ্ঞান) come name and material form." অতএব এই বিজ্ঞানকেই আকৃতিগ্রহণের বীজ বা Formative power বলা যাইতে পারে। গর্ভে এই বিজ্ঞান যে জড়ীয় উপাদান প্রাপ্ত হয়, ইহাই তাহাতে আকার প্রদান করিয়া দেহরূপে পরিণত করে। এইরূপ হইলেই, ইন্দ্রিয়ের প্রাদুর্ভাব হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়ই বৌদ্ধের রূপস্কন্ধ। এই ইন্দ্রিয়, বিষয়-সংস্পর্শে উপরঞ্জিত হইলে, বৈষয়িক sensation বা উপলব্ধি জন্মে। এই বিজ্ঞানই এই সংস্পর্শের হেতুভূত। এইরূপে বিজ্ঞানবলে যখন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত সংস্পর্শ জন্মে, তখন বাসনা দেখা দেয়। এই বাসনাই, বুদ্ধমতে, যাবতীয় দুঃখের নিদান। সুখাদির বাসনা আমরা নিয়ত করি বলিয়া আমাদের ক্রমাগত জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই বাসনা যিনি বশীভূত করিতে পারেন, তাঁহার আর দুঃখাদি থাকে না। এই বাসনা বশতঃই জীবনে এত আসক্তি। এই আসক্তিকেই বৌদ্ধ "উপাদান" নামে অভিহিত করিয়াছেন। যতদিন দাহ্য আছে, ততদিন এই বাসনাগ্নি নিবিবে না। এই অগ্নি এক জন্ম হইতে অন্য জন্মে, দূরে—ক্রমে বহুদূরে বাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই বাসনাগ্নি নির্ব্বাপিত করাই "নির্ব্বাণ"-লাভ। অতএব এই আসক্তি বা বাসনাগ্নি নির্ব্বাণ করিতেই বৌদ্ধের একমাত্র চেষ্টা। আমরা নানাবিধ বৌদ্ধ-গ্রন্থ হইতে উপরোক্ত সার-মর্ম্ম সংগ্রহ করিলাম। পাঠক! ইহা ঠিক্ বেদান্ত ও সাংখ্যেরই অনুরূপ কথা কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এখন আমরা দেখিব যে, এই বিজ্ঞান বা consciousness কোথা হইতে আসিল? বুদ্ধগ্রন্থে আছে যে, সংস্কার হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এই সংস্কারই বা কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তর আমরা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিব। যাহাকে তুমি "রাম" বলিয়া মনে করিতেছ, এই রাম তাহার পূর্ব্বজন্মে এবং তাহারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্ব

পূর্ব্ব জন্মে যে সকল সংস্কার অর্জ্জন করিয়াছিল, এ জন্মেও সেই সংস্কার লইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারগুলিই বিজ্ঞানাকারে এজন্মে দেখা দিয়াছে। আবার বর্ত্তমান জীবনে রাম যে যে কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মবশতঃ অন্তঃকরণে যে সমস্ত সংস্কার জন্মিবে, মৃত্যুর পরেও রাম সেই সংস্কারগুলি লইয়া যাইবে। সুতরাং তুমি রাম বলিয়া যাহাকে একটি ব্যক্তি (particular individual মনে করিতেছ, বাস্তবিক পক্ষে রামের সেরূপ কোন ব্যক্তিত্ব (entity) নাই। কেবল পরিবর্ত্তন-প্রবাহ মাত্র। রাম অর্থ এই যে, উহা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কালের সংস্কার-সমষ্টিমাত্র। পূর্ব্বজন্মে উহা একরূপে ছিল, বর্ত্তমান জন্মে অন্যরূপে দেখা দিয়াছে। এইরূপে যতদিন না নির্ব্বাণ হয়, ততদিন ইহা চলিবেই চলিবে। কাজেই বুদ্ধের মতে, স্থির আত্মা থাকিতে পারিতেছে না। বৌদ্ধমতে প্রত্যেক সত্তাই কেবল পরিবর্ত্তনপ্রবাহ মাত্র। "The "made" has existence only in the *process* of being made." Whatever is, is not so much a something which *is*, as the *process* rather of a being, self-generating and self-again-consuming being." আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেরই কর্ম্মের ফলসমষ্টিমাত্র। মনুষ্যের মন ও শরীর, উভয়ই মনুষ্যের অতীতক্রিয়াফলসমষ্টির সমবায় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অতএব আত্মা সংস্কার-সমষ্টি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বৌদ্ধের "আত্মা" এইরূপ। বুদ্ধ এইরূপ অর্থেই "আত্মা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একটিমাত্র জন্মের একটি লোককে 'ব্যক্তি' বলা যায় না। কেন না যাহাকে তুমি ব্যক্তি বলিতেছ, তাহার পূর্ব্বজন্মে কতবার সে ছিল এবং পর জন্মেও সে অন্য এক আকারে থাকিবে। এই সমস্ত জন্ম মিলিয়া বরং তাহার ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে। অতএব যখন এই হিসাবে ব্যক্তিত্ব থাকিতেছে না, তখন আত্মাও থাকিতেছে না। কিন্তু এইরূপ বিবরণে, সমস্ত পরিবর্ত্তনক্রিয়ার মূলে যে এক নিত্য সত্তা আছে, তাহা অস্বীকৃত হইতেছে না। যে নিত্যসত্তা বা substratum এর উপরে জাগতিক পরিবর্ত্তন-প্রবাহ চলিতেছে, সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাহা নিত্য স্থির থাকিয়া যায়, সেরূপ আত্মা বুদ্ধ অস্বীকার করিতেছেন না। তিনি কেবল জগৎকে পরিবর্ত্তনের দিক্ হইতে দেখিয়া গিয়াছেন; পরিবর্ত্তনের অপর অংশের কথা তোলেন নাই।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইব। একটি বৃক্ষ-বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মিল, পরে যত দিন যাইতে লাগিল ততই ক্রমে সেই অঙ্কুর হইতে, পত্র পুষ্প জন্মিতে লাগিল, এইরূপে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে তাহা এক প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়। ক্রমে তাহাতে ফুল ফুটিল, আবার ফুল বীজে পরিণত হইল। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত এই যে বৃক্ষটিতে কত শত পরিবর্ত্তন ঘটিল, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই বহুপরিবর্ত্তন-ক্রিয়ার

মধ্যে উহার বৃক্ষত্বটুকু চিরনিত্য, অপরিবর্ত্তিত রহিয়া যাইতেছে। বাহ্যিক প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। এই স্থির অংশটিই উহার (Matter) বা জড়ত্ব। অন্তর্জগতেও এই নিয়ম। মনে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কত শত চিন্তাস্রোত চলিয়া যাইতেছে, কত সহস্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে, একটি বস্তু অপরিবর্ত্তিত রহিয়া যাইতেছে। এই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুটি না থাকিলে, আমরা পরিবর্ত্তন ক্রিয়াই বুঝিতে পারিতাম না। এক অপরিণামি সত্তার বক্ষঃস্থলে পরিণামক্রিয়া সংঘটিত হইতেছে। যাহার বক্ষে এই পরিবর্ত্তনপ্রবাহ চলিতেছে, তাহা স্থির, নিত্য, নিষ্ক্রিয়। অন্তর্জগতে ইহাকে "আত্মা" বলিতে পার; বহির্জ্জগতে ইহাকে "জড়" বলিতে পারে। দুই-ই নিষ্ক্রিয়, নিত্য। বেদান্ত এই দুই নিত্য বস্তুকে এক ধরিয়া লইয়া, জগতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। সাংখ্য এই নিত্যবস্তুদ্বয়কে পাশাপাশি রাখিয়া, জাগতিক পরিবর্ত্তন বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধ এই নিত্যবস্তুদ্বয়ের আদৌ কোন কথা উত্থাপন করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র পরিবর্ত্তন-ক্রিয়ারই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। কেবল পরিবর্ত্তনক্রিয়া কি নিয়মে জগতে চলিতেছে—প্রকাশিত হইতেছে, আবার অপ্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে, পুনরায় দেখা দিতেছে—ইহা বুঝাইয়া দেওয়াই যাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার উক্তিতে কাজেই সেই নিত্যবস্তুর কোন কথা আশা করা যাইতে পারে না। এই জন্যই বৌদ্ধদর্শনে নিত্য-আত্মার স্থান নাই। এইজন্যই কেবল কর্ম্ম বা সংস্কার-রাশিই, একজন্ম হইতে অন্য জন্মে গমনাগমন করিতে থাকে,—ইহাই বুদ্ধের উপদেশ। এই ক্রিয়া বা সংস্কাররাশিকে ধরিয়া রাখে কে, সে কথা বুদ্ধ উত্থাপন করেন নাই। এই জন্যই তাঁহার মতে সংস্কার-সমষ্টিই "আত্মা" পদবাচ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া, তিনি যে সেই নিত্য-পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে; তিনি সে কথা উত্থাপন করেন নাই এইমাত্র। বুদ্ধকে এই ভাবে বুঝিতে হইবে। এই ভাবে দেখিলে, বাস্তবিক পক্ষে সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনে কোনই প্রভেদ নাই, ইহা বুঝা যাইবে। প্রভেদ কেবল ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিবার জন্য। এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথার আলোচনা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা বারান্তরে বলিব। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এম, এ।

# যমুনা-বন-দর্শন।

শুন শুন সখে, বিরলে বসিয়া
মরমের কথা কই ;—
গত নিশা-শেষে যমুনা-বিপিনে
যেয়ে উপনীত হই।

চিত্ত জর জর মধুবন-বাত
মকরন্দ পরশনে,
বিবশ সুখোর্ম্মি সহিতে নারিনু
পড়ি রৈনু ধরাসনে।

হেন কালে আসি ধীরে পৌর্ণমাসী
সর্ব্ব-শুক্লা দয়াবতী,
পরশি পরশি কহে উঠ দীন
কৃষ্ণবনে হোক্ রতি।

কান্দিয়া শীতল ধরিনু চরণ
মুখে গদগদ ভাষ,
"জননি, জননি" কহিবারে চাই,
মুখে নৈল পরকাশ।

হাসিয়া সারদা স্নেহ স্বরূপিণী
আশীর্ব্বাদ করি কহে,
দিনু বর, বৎস, পশ বনমাঝে
নৈলে কারো ভাগ্যে নহে।

পূজিয়া সারদা বৃন্দাবন-দেবী
পশিনু যমুনা-বনে ;
কোটি হর্ষ কম্প লুঠয়ে শরীরে
মন তাহা নাহি গণে।

বাড়াইতে পদ কল-পদ বেণু
কাকলীর কলধ্বনি
প্রতিধ্বনি আসি পশে শ্রুতি মূলে
পড়িনু ঢলি অবনী।

পড়ি তরুমূলে ছট্ ফট্ করি
গড়াগড়ি ভূমিতলে,
অবশ অঙ্গ ধূলিতে ধূসর
নেত্রে অশ্রুবারি ঝরে।

অহো ভাগ্য ভাগ্য ! বৃন্দাবন রজঃ
লাগিলরে মোর গায় !
কোটি কল্প তপে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র
দৈবে কভু কি না পায়।

ধন্য হইল অভাগ্য জনম
বৃন্দাবনে লুঠি তনু,
আজি পরশিয়া যমুনার বারি
সফল করিনু জনু।

এ কি বৃন্দাবন মধুবন মণি ?
এ কি শুক শারী গাহে ?

এ কিরে তমাল কদম্ব পিয়াল
কণ্টক-কানন-মাঝে ?

পুষ্পিত কাননে গুঞ্জে মধুব্রত
পিক করে কুহু নাদ ;
কানন-বর্হিণ নাচে পুচ্ছ মেলি
হায় হায় পরমাদ।

উঠি দ্রুত গতি যমুনার পানে
চঞ্চল চরণে ধাই ;
হরিণ শার্দ্দূল গবয় মাতঙ্গ
—সঙ্গে রঙ্গে দেখা পাই।

পুষ্প মকরন্দ ক্ষরে অনিবার
মলয় মারুত বয়,
পর্ণান্তর দিয়া সুধাংশু কিরণ
ঝর ঝর নিঝরয়।

যমুনা কল্লোল কলনাদ আসি
ধীরে ধীরে পশে কানে,
বাজে দূর বনে মুরলী মধুর
শুনি চিত্ত নাহি মানে।

তমালের মূলে হেরি চন্দ্রকান্ত
—বদ্ধ-বিক্রমিত শিলা
চন্দ্র করে গলি যমুনার পানে
বহে কুল্যা বেগশীলা।

হেরিয়া অদ্ভুত তমাল কুট্টিম
স্ফটিকে নেহার করি ;

একি একি হরি! এ যে মোরে হেরি *
নারী-দেহ, লাজে মরি।

পৃষ্ঠে ফণী জিনি বিলম্বিত বেণী
নয়নে কজ্জল রেখা,
সুনীল দুকূল পরিধানে হেরি
ভালে যে তিলক লেখা।

তুলসীর মালা মুকুতা মণ্ডিত
কণ্ঠে দোলে ঝল মল,
চরণে মঞ্জীর বাজে রুণু ঝুণু
করে লীলা শতদল।

তুলসী মঞ্জরী দোলে শ্রুতিমূলে
সীমন্তে সিন্দূর ভায়,
গোপী মলয়জে লোহিত অলক
হেরি যম শঙ্কা পায়।

জৃম্ভা অলসতা হাবভাব লীলা
নয়নে কটাক্ষ শর ;
হেনকালে এক আসি গোপ-বালা
হাসি ধরে মোর কর।

রতন মণ্ডিত স্বর্ণকুম্ভ আনি
কাঁখে বসাইয়া দিলা,

* তমালের মূলে স্ফটিকবদ্ধ কুট্টিমে দৃষ্টি করিবামাত্র তাহাতে আমার যে প্রতিবিম্ব দেখিলাম সে প্রতিবিম্ব নারী দেহ বা বা স্ত্রী মূর্ত্তি, প্রতিবিম্ব দর্শনে নিজের নারী মূর্ত্তিতে পরিণতি বুঝিয়া লজ্জিত হইলাম।

* মণিবারি কুল্যা  তটে তট ধরি
যমুনার তীরে নিলা।

বসন্ত সমীরে  নাচে কল কল
যমুনার কাল বারি ;
উদ্দীপন-রবি  চন্দ্রমা পীযুষ
বরষে সহিতে নারি।

গোপী কহে সখি, আন্ ভরি বারি
সখীকৃত্য কিছু জান্
অঞ্চলে বাঁধিয়া  অয়ি কটিতট
বারি তীরে আগুয়ান।

শাঁ শাঁ করি বাজে  হৃদয় বিদারি
দূর হতে বংশীবর,
যমুনায় পূজে  হয়ে কৃতাঞ্জলি
বসন্তের পরিকর।

অহো ধন্য ধন্য !  হেরিনু যমুনা
কহিতে অঙ্গ বিকল,
তরঙ্গ-সমীর  —পরশে গড়ায়ে
পড়িনু যমুনা জল।

ডুবি পুনঃ ভাসি  যমুনা উজান
জলে হেম কুম্ভ ভাসে,
ধরি ধরি করি  ডুবিয়া সাঁতারি
তীরে গোপী সখি হাসে।

"নূতন রূপসী  ইনি প্রবাসিনী
নূতন ভরিতে জল
চরণ পিছলি  ভাসে ছলে জলে"
কহি হাসে খল খল।

সোনার কলসী  চলিল উজান
পরশি ধরিতে নারি ;
আকণ্ঠ পূরিয়া  পিরি কাল জল
তৃষা না বারিতে পারি।

গগনে চন্দ্রমা  কর্ণে বংশীধ্বনি
ভাসি যে যমুনা জলে ;
প্রতি রোম কূপে  পশিল সে জল
কে শোনে কূলে কি বলে।

ভাসিয়াছি সখে  যমুনার নীরে
কূলে নাহি প্রয়োজন,
নব মেঘ নিন্দি  কালিয়া বরণ
স্নিগ্ধ যার পরশন।

হেনকালে সেই  গোপের বালিকা
যমুনায় ঝাঁপ দিল।
(মোরে) কেশেতে ধরিয়া  টানিয়া টানিয়া
বংশীবট তট নিল।

শোয়াইয়া ঘাটে  যমুনা-বালুকা
কর্দ্দম মাখিল গায়।
বুকেতে চাপড়  মারিয়া সুস্বরে
কৃষ্ণনাম ঘন গায়।

* তমাল কুট্টিমস্থ চন্দ্রকান্ত মণি হইতে নির্গত জলের স্রোতের ধার দিয়া যমুনার পারে নিল।

কহে ধৈর্য্য ধর বাউরী হইলে
মিলিবে কি কৃষ্ণধন ?
আত্ম সুখে হেন ব্যাকুলা হইলে
কৈছে কৃষ্ণের ভজন।

না হেরিলা কৃষ্ণ নবজলধর
বরণ সুন্দর বড়,
যদি রাখ আশা সম্বরিয়া চিত
ভজন করহ দঢ়।

জলের পরশে দ্রবিলে অমনি
জল-কেলি কৈছে হয়,
কন্দর্প দর্পহা কান্তা কোটিবৃত
যবে কৃষ্ণ হংসোদয়।

অসিত দেবল শ্বেতকেতু ঋভু
শ্রুতি স্মৃতি কীর্ত্তিগণ,
নিদাঘ সম্বর্ত্ত দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি
ধরে গোপী সংহনন ;

যমুনা পরশে হেনই অবশ
গোপী গুরু করি মানে,
শিখি দাসী কৃত্য সংস্রৈক যুগ
তবে সেবা কিছু জানে।

এত কহি টানি অবশ এ অঙ্গ
তমালের তলে নিল।
তমাল কণ্টকে বিঁধি তনু, রন্ধ্রে
তমালের রস দিল।

তমালের পত্রে ঢাকিল এ তনু
রোম কূপে রস ধায়,
কণ্টকের ব্রণে পশিল বা কত,
অমৃতে জড়িল কায়।

কৃষ্ণ নামাঙ্কিত মেলিপুচ্ছ কেকী
বীজন করিয়া যায়।
ডালে শুকশারী করে কৃষ্ণ নাম
ধবলী শ্যামলী ধায়।

শ্রীদাম সুদাম সমধু মঙ্গল
নন্দ গোপ গৃহে ধায় ;
অক্রুর আসিয়া বুঝি কৃষ্ণ লয়ে
কংস রাজধানী যায়।

চরণে ধরিয়া বিলাপ করিয়া
কহি কিছু দেখা সখি,
পাছে কোটি যুগ তোর দাসী হয়ে
বদন তোর নিরখি।

বৃন্দাবনে ধাম কিবা তোর নাম
দীন হীনে দয়া কেন ?
ব্রহ্মর্ষি পুজিত পেয়ে গোপী দেহ
নরকে আপন জ্ঞান ?

কহে বালা হাসি বসি বৃন্দাবনে
বিশাখা আমার নাম ;
শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইনু অমনি
দেহ ছাড়ি যায় প্রাণ।

( ৪৬ )

হায় হায় হায়! প্রাণ যায়, একি
সেই রে বিশাখা বটে?
নবমেঘনিন্দী কালিয়া বরণ
আঁকিল যে চিত্র পটে।

( ৪৭ )

হায় হায় হায়! দেখিনু বিশাখা,
পাষাণে ভাঙ্গিনু শির!
কান্দিতে কান্দিতে জাগিনু অমনি
কৈতে নারি কিছু স্থির।

( ৪৮ )

কহ কহ সখে, আমি কি হেরিনু
বিশাখা কি বৃন্দাবন।
স্বপন স্মরিয়া সেরূপ ভাবিয়া
জলে প্রাণ অনুক্ষণ।

( ৪৯ )

কহয়ে বসন্ত পিপাসা আছান
বটে দূরে বৃন্দাবন।
হেরিবেরে যদি রাগ-মার্গ ধরি
চিন্ত সদা মধুবন।

শ্রীবসন্তকুমার রায় এম্, এ, বি, এল।

# ছায়া-দর্শন।

"Born now in that undying life,
They leave us but to come again."

## ষোড়শ অধ্যায়।

উপক্রম।

একটি বৈরাগ্য-উদ্দীপক বিষাদ-সঙ্গীত, এ দেশের সর্ব্বত্রই, মনুষ্যের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রচারিত রহিয়াছে। গীতের প্রথম দুইটি পংক্তি এইরূপ;——

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে কথা কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

পৃথিবীর সকল কথা মিথ্যা হইতে পারে;—জ্যোতির্ব্বিদের গণনা, ভাবিদর্শীর ভবিষ্যদ্বাণী, স্তাবকের মধুর-স্তুতি, নিন্দকের বিষাক্ত-নিন্দা, সুহৃৎস্বজনের আশীর্ব্বাদ ও সন্তপ্তের অভিসম্পাত, ইহার সকলই মিথ্যা হইতে পারে। কিন্তু ঐ গীতাক্ষরবর্ণিত—"শেষের সে দিন"—মিথ্যা হইতে পারে না। উহা সকলেরই সঙ্গে সঙ্গে আছে; এবং তিল তিল করিয়া, অগ্রসর হইয়া, সতত্তই অধিকতর সন্নিহিত হইতেছে। উহা অপরিহার্য্য। কিবা বড়, কিবা ছোট, কিবা সুখী, কিবা দুঃখী, কিবা উৎপীড়ক, কিবা উৎপীড়িত,—কিবা প্রশান্ত ধীর, কিবা রণ-দুর্ম্মদ দুর্জ্জয়-বীর, উহা সকলেরই নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তাহারা প্রকৃতই নিতান্ত দীন-সত্ত্ব মূর্খ, যাহারা ঐ "শেষের সে দিন" একবারে ভুলিয়া রহে; এবং পৃথিবীর ক্ষণিক সুখ-

সম্পদে উদ্ভ্রান্ত ও আত্মপ্রতারিত হইয়া, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অসহায় হৃদয়ের মর্ম্মচ্ছেদে আনন্দ অনুভব করে।

জ্ঞানীরা এই হেতু বলিয়া থাকেন যে, "শেষের সে দিন" কাহারও বিস্মৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যাঁহারা আজি এ জগতে রাজার আসনে অভিষিক্ত, রাজশক্তিতে সমুচ্ছ্রিত,—অথবা রাজপুরুষরূপে কোটিহৃদয়ের সুখ-দুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ, এবং আশা ও আশঙ্কা লইয়া ক্রিয়া করিবার উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা যদি, মুহূর্ত্তের তরেও, "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"রূপ মহাসত্যকে মনে রাখিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে কি পৃথিবীর রাজনীতি, পারমার্থিকের তত্ত্বগীতে, কিংবা কবিসম্প্রদায়ের সরস-ভণিতিতে, বৃক-ভল্লুকের ব্যবহারযোগ্য শোণিত-শোষণী রাক্ষসী নীতি বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে? অপিচ, যাঁহারা ধন-বলে অথবা জন-বলে সমাজ-শক্তির নায়ক ও চালক,—যাঁহাদিগের ইঙ্গিত মাত্রে সমাজের একদিক্ ধ্বসিয়া যায়, আর একদিক্ ভাসিয়া উঠে,—এক দিকে লক্ষহৃদয় ভেদ করিয়া হাহাকার-ধ্বনি উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়, আর এক দিকে লক্ষ প্রাণ আশার মৃদুস্পর্শে উৎফুল্ল রহে, তাঁহারাও যদি, মুহূর্ত্তের তরে, "শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" স্মরণে রাখিয়া, নিত্যজীবনের গতিবিধি নিয়মিত করেন, তাহা হইলে কি মনুষ্যের সমাজ অদ্যাপি এইরূপ অধঃপতিত রহিতে পারে?

অধ্যাত্মবিজ্ঞান শেষের সে দিনের কথা কহিয়াই সন্তৃপ্ত রহে না। উহার দৃষ্টি, দিব্য চক্ষুর দৃষ্টির ন্যায়, বহুদূরগামিনী। বস্তুতঃ অধ্যাত্মবাদীরা, যে সকল আশ্চর্য সত্যকে, অশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, প্রমাণ-সিদ্ধ প্রত্যক্ষ সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে সকল তত্ত্ব বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়া পারলৌকিক-জীবনের বিবিধ সত্য সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া আসিতেছেন, তদনুসারে যাহা পৃথিবীতে "শেষের সে দিন," তাহা লোকান্তরে পুনর্জ্জন্মের প্রথম-মুহূর্ত্ত। এ প্রসঙ্গে, এখানে, একটি বড় কবির কএকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিব,——

"When from flesh the Spirit freed
Hastens homeward to return,
Mortals say 'a man is dead,'
Angels say 'a child is born.'"

কবিতায় যাহা মধুরাক্ষরে ও সূত্র-রচনার সংক্ষিপ্ত প্রণালী অনুসারে ব্যক্ত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকেরা, তাহাই প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে, বহু কথায় বুঝাইয়া থাকেন। কবিতার সারার্থ এই,—মানুষ, পৃথিবীর স্থূল জগতে, স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া, দ্রষ্টব্যে মৃত্যুর গ্রাসে গড়াইয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, সে তন্মুহূর্ত্তেই, তদীয় স্থূল দেহের অনুরূপ সূক্ষ্মদেহ লাভ করিয়া, সূক্ষ্মতর অধ্যাত্মজগতে, নূতন প্রবিষ্ট জীবের ন্যায় [illegible]ণায়মান হয়। তাহার পূর্ব্বতন পার্থিব দেহ [illegible]খানে নিরুত্তর অবস্থায় পড়িয়া রহে। কিন্তু তাহার নবসঞ্চিত সূক্ষ্মতর দেহে, সেই সময় হইতেই, পৃথিবীর কৃতকর্ম্মজনিত পাপ-

পুণ্যের তারতম্য ক্রমে, নানারূপ ক্রিয়ার আরম্ভ হয়। সে হয় ত, একটি সুখ-শীতল সুন্দর তনু লাভ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করে; না হয় ত, কর্ম্মসূত্রিত কুৎসিত তনু লাভে হৃদয়ে যার-পর-নাই ক্লিষ্ট হইয়া, ঘৃণায় ও দুঃখে জর্জ্জরিত রহে।

জীবনের এইরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে,—"শেষের সে দিনে," অথবা অনন্তকাল-স্থায়ি অধ্যাত্ম জীবনের সে প্রথম-মুহূর্ত্তে, পৃথিবীর সুহৃৎস্বজনদিগকে পুনরায় দর্শন দান করিয়া চলিয়া যাওয়া প্রকৃতই সকলের ভাগ্যে ঘটে না। অনেকে, আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ স্নিগ্ধ তনু লাভ করিয়াও, পৃথিবীতে তখন ক্ষণকালের তরে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহাদিগের হৃদয় ও মন যে স্থানে আকৃষ্ট রহিয়াছে,তাঁহারা ঈশ্বরের নাম লইতে লইতে সেই উর্দ্ধতর ধামে চলিয়া যান। অনেকে আবার, ইচ্ছা সত্ত্বেও, পৃথিবীতে দর্শনদানে অসমর্থ রহেন। যাঁহারা তৎকালে তাঁহাদিগের প্রভু,—হিন্দুশাস্ত্র যাঁহাদিগকে শিবদূত, বিষ্ণুদূত অথবা কাল-দূত প্রভৃতি সর্ব্বজনবোধ্য বিবিধ নামে বর্ণনা করে; এবং ইয়ুরোপীয় অধ্যাত্মবাদ যাঁহাদিগকে জীবরক্ষক দেবপুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, তাঁহারা অনুমোদন করেন না বলিয়া, তাদৃশ ব্যক্তিরা তৎক্ষণাৎই স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে বাধ্য হন।

এইরূপ নানাবিধ প্রতিবন্ধি সত্ত্বেও, যে সকল প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, পৃথিবীর দেহত্যাগ অথবা পারলৌকিক-নূতন-দেহ লাভের সময়ে, আপনার প্রাণপ্রিয় আত্মীয় স্বজনকে দর্শনদানে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছেন, তাঁহারা সংখ্যায় অসংখ্য। লণ্ডনের ( Psychic Research Society ) অধ্যাত্ম তত্ত্বানুসন্ধান-সমিতি, বহুসংখ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সাহায্যে,এই প্রকার দর্শন লাভের যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অষ্টোত্তর-শত-পর্ব্বাত্মক বিশাল গ্রন্থে পরিসমাপ্ত হয় কি না, সন্দেহের কথা। লোকে সে সকল গ্রন্থের সংবাদ রাখে না, অথবা সংবাদ রাখিলেও, গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বৃত্তান্তনিচয়ের সত্যানুসন্ধানে সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে না, ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে। কিন্তু যাঁহারা সে সকল গ্রন্থ লইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করেন যে, মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ, পারলৌকিক জীবনে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া, তৎক্ষণাৎই আপনার স্ত্রীপুত্র-পরিজন কিংবা প্রণয়াস্পদ আশ্রিত ব্যক্তিকে একবার দেখা দিয়া গিয়াছেন; এবং কেহ কেহ, সেরূপ দেখা দেওয়ার সময়, শক্তিতে কুলাইলে, দুই একটি কথা কহিয়া, তাপিত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন।

জর্ম্মণীর বিখ্যাত বীর ভন্ মল্ট্‌কে, রাত্রি ঠিক দুটার সময়ে, বার্লিনের সাংগ্রামিক সচিব-প্রাসাদে, এই ভাবে, প্রহরিদিগকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। এ কথা লইয়া ইয়ুরোপের সমস্ত সংবাদ পত্রে আলোচনা হইয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের বহু সংবাদপত্রও নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-

ছিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া দুইটা বাজিয়াছে,—প্রহরিসৈনিকেরা প্রাসাদের দ্বারদেশে সশস্ত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে, এমন সময়ে জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের প্রধান-সেনাপতি ভন্ মল্ট্‌কে স্বয়ং সেখানে আসিয়া উপস্থিত !

হাঁ! সেনাপতি এমন সময়ে সমরপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন কেন ? তবে কি পৃথিবীর কোথাও বৃহৎ কোন যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে ? সৈনিক ও অধঃস্তন সেনাপতিরা, এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া, কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে, কেহ তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ অবস্থার মধ্যে মল্ট্‌কের অধ্যাত্মমূর্ত্তি অকস্মাৎ আকাশে মিশিয়া গেল ; এবং রাত্রি দুটার সময়েই, নগরের উপকণ্ঠস্থ অন্য প্রাসাদে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ লইয়া, দুইজন অশ্বারোহী সৈনিক অতি দ্রুতগতি সেখানে আসিয়া উপনীত হইল।

আজি সাত আট মাস হইল ইংলণ্ডের অন্যতম সেনাপতি সার্ ডোনাল ম্যাক্‌গ্রীগর * কেরো নগরের সেনানিবাসে তদীয় স্নেহাশ্রিত কতিপয় সৈনিককে এইরূপ দর্শন দান করিয়াছেন ; এবং মনুষ্যের "শেষের সে দিন" যে, কোন অংশেই, অনন্তজীবনের শেষ দিন,—শেষ পরিচ্ছেদ—অথবা শেষ সীমা নহে, যেন ইহা বুঝাইবার জন্যই, বহুক্ষণ সকলের দিকে ভাবগম্ভীর-স্নিগ্ধনয়নে তাকাইয়া রহিয়া, দৃষ্টির সে বিচিত্র ভঙ্গীতে, প্রাণের কথা বুঝাইয়াছেন।

আমরা আজি পাঠকের নিকট যে কাহিনীটি লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাও এইরূপ দর্শন-দানের কথা। যে দর্শন দান করিয়াছিল, সে মল্টকে কিংবা ম্যাক্ গ্রীগরের মত বিশ্রুতনামা সৈনিক না হইলেও, সেনাপতি-শ্রেণিস্থ যুবা। তাহার চরমদর্শন বহু চক্ষুর বিশ্বস্ত সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইয়াছিল বলিয়াই কাহিনীটি স্থায়ি গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। কাহিনীটি পড়িবার সময়ে পাঠকের মনে লইবে যে, পৃথিবীর প্রেম ও নৈরাশ্য, আমোদ ও ঔদাস্য, সকলেরই শেষ পরিণাম—"শেষের সে দিন ভয়ঙ্করে।"

## আত্মিক কাহিনী।

কানেডা উত্তর আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য। উহা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম উচ্চ কানেডা, আর এক ভাগের নাম নিম্ন কানেডা। এই উভয় ভাগই এইক্ষণ ইতিহাসের ক্রীড়াভূমি। উচ্চ কানেডা উত্তর আমেরিকার সাগর-তটবর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রদেশ। এক সময়ে, উচ্চ কানেডায় একদল ইংরেজ সৈন্য অধিষ্ঠিত ছিল। মিষ্টার ডব্লিউ [Mr. W] * এই সৈন্যদলের এক-

* নামটি ম্যাক্‌গ্রিগর কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের একটু সংশয় আছে। যে পুস্তকে নামটি লিখিত রহিয়াছে, তাহা এইক্ষণ আমাদিগের সম্মুখে নাই।

* নাম সম্ভবতঃ উইলিয়ম। যাঁহার এইরূপ পারলৌকিক কাহিনীতে লোকান্তরিত আত্মীয়স্বজনের নাম প্রকাশ করা ভাল বাসেন না, তাঁহাদিগের অনুরোধের সম্মানার্থ

জন সুপরিচিত অধ্যক্ষ-সৈনিক। ডব্‌লিউ অকৃতদার যুবক। সে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে, সর্ব্বাংশেই প্রিয়দর্শন ও প্রীতিভাজন। তাহার সরস-মধুর ব্যবহার ও মিষ্ট আলাপে সকলেই তাহাকে ভালবাসিত,—সুন্দরী যুবতীরা তাহাকে বিশেষ আদর করিত। সে রণ-ক্ষেত্রে সাহসী বীর; ঘোড়দৌড়ের চক্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নির্ভীক আরোহী; নৃত্যাগারে [ ballroom ] নটনিপুণ নর্ত্তক; এবং জন-সমাজে পরিহাসপটু সামাজিক। সুতরাং সকলেই তাহাকে আদর করিত ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। কিন্তু ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিরা, সময়ে সময়ে, তাঁহার মুখে, ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে, সংশয়ের দুই একটি কথা শুনিয়া, মনে একটুকু ক্লেশ পাইতেন। এইরূপ যুব-সৈনিকদিগের মধ্যে অনেকেই পরলোকে অবিশ্বাসী; যাহারা অবিশ্বাসী নহে, তাহারা উপেক্ষান্বিত অথবা উদাসীন।

অবিশ্বাসী ডব্‌লিউর ঘোড়দৌড়ে শুধু সখ নহে, সে সখের নাম নেশা। সে এই নেশায় কোন কোন সময়ে বিপন্ন হইত। একবার ঘোড়দৌড়ে তাহার পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে, এবং তাহাতে একখানি হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। সেই অবধি তাহার একটি পা যেন একটু বিকল হইয়া রহিয়াছে। এই বিকলতা, তাহার সুঠাম ও সুগঠিত দেহে, কবি বায়-রণের পদ-বিকলতার মত, একটি কমনীয় খুঁত স্বরূপ হইয়াছিল।

সেনানিবাসের সন্নিকটে কানাডা-দেশীয় একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বাস করিতেন। ভদ্রলোকের একটি মাত্র কন্যা। সুতরাং পিতা মাতার প্রাণাধিকা। কন্যাটি যুবতী ও সুন্দরী। এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। সুন্দরী, অল্পদিনের মধ্যেই, ইংরেজ সৈনিক ডব্‌লিউর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে মনও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। যুবকের অবকাশ-সময়ের অধিকাংশ ভাগই কানাডানিবাসী এই ভদ্রলোকের গৃহে পিতা পুত্রীর প্রিয়সাহচর্য্যে, সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। পিতা, যুবকের অমায়িক নম্র ব্যবহারে, অত্যন্ত প্রীত;—কন্যা, যেন আপনার হৃদয় ও মনের অজ্ঞাতসারে, রীতি-মত মোহিত। যখনই দুই জনের সাক্ষাৎকার ঘটিত, তখনই চোখে চোখে সহস্র প্রকার আলাপ হইতে থাকিত।

একদিন, সেনানিবাসের নিকটবর্ত্তী ঘোড়দৌড়ের মাঠে, বৃহৎ আড়ম্বরে ঘোড়-দৌড়ের আয়োজন হইল। মিষ্টার ডব্‌লিউ অদ্যকার ঘোড়দৌড়ে একজন অগ্রগণ্য সও-য়ার। চারিদিকে লোকের কলরব। দর্শক-দিগের মঞ্চ স্ত্রীলোক ও পুরুষে পরিপূর্ণ। তখনও দৌড়ের নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত হয় নাই,—একটু বিলম্ব আছে। এই সময়, ডব্‌লিউ, অশ্বে আরোহণ করিয়া, ধীর-গতিতে দর্শকদিগের মঞ্চের সন্নিহিত হইল। তা-হার চঞ্চল নয়ন, কি যেন দর্শনীয় প্রিয় সামগ্রীর অন্বেষণে, কিঞ্চিৎকাল, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া, অবশেষে এক যুবতীর বদন-

---

প্রকৃত নাম গোপন করিয়া, নামের প্রথম অক্ষর মাত্র ব্যবহার করা হয়।

বিষে যাইয়া স্থির হইয়া রহিল। এই যুবতীই তাহার বিশ্রামসঙ্গিনী প্রতিবেশিনী সুন্দরী।

যুবতী পিতার সঙ্গে ঘোড়দৌড় দেখিতে আসিয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থলে বুতামের ছিদ্রে, একটি সদ্যঃসমাহৃত প্রস্ফুট গোলাপ বড়ই শোভা পাইতেছে। উভয়ের নয়নে নয়নে সম্মিলন হইল,—উভয়েরই অধর-প্রান্তে ঈষৎ একটু হাসির রেখা ফুটিল। ঐ গোলাপটি—আর এই হাসিটুকু,—কোন্‌টি অধিকতর সুন্দর ও পবিত্র, যুবক যেন, তাহাই ভাল করিয়া তৌলাইয়া দেখিবার নিমিত্ত, যুবতীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল; এবং যাচকের সঙ্কুচিত কণ্ঠে কহিল,—"ঐ সুন্দর গোলাপটি আজিকার ঘোড়দৌড়ে পুরস্কাররূপে ব্যবস্থিত হইলে, বড়ই ভাল দেখায়। কেমন, কোন আপত্তি আছে কি?"

যুবতী কোন উত্তর করিল না, একটু হাসিল। পিতা বলিলেন,—"কোন আপত্তি নাই। আর সেই বিজয়ী জন যদি হয়, আমাদিগের প্রিয় প্রতিবেশী ডব্‌লিউ, তাহা হইলে,—শুধু আপত্তি নাই এমন নহে,—গোলাপটি একটু বিশেষ প্রীতির সহিতই তদীয় সংবর্দ্ধনায় সার্থক নিয়োজিত হইবে। যুবতীর নির্ম্মল কপোলে সহসা একটু আলোহিত আভা ফুটিয়া অমনিই আবার মিশিয়া গেল। বোধ হয়, যুবার প্রতি পিতার ঐরূপ প্রবর্দ্ধিত অনুরাগ দর্শনে, লজ্জা আর আনন্দ, যুগপৎ তাদৃক্‌ রক্তিম আভায় প্রস্ফুটিত হইয়া, তৎক্ষণেই আবার অন্তর্হিত হইল।

ঘোড়দৌড়ে যুবসৈনিক ডব্‌লিউরই জয় লাভ হইল; এবং সে উপন্যাস-কীর্ত্তিত আইভান্‌হোর মত, দর্শকদিগের আনন্দকোলাহলের মধ্যে, প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায়, কানাডা-সুন্দরীর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। যুবতী, হর্ষোৎফুল্ল-বদনে, আপনার বক্ষঃস্থল হইতে গোলাপটি ধীরে ধীরে খুলিয়া লইল; এবং পিতার প্রফুল্ল ইঙ্গিত অনুসারে, ঈষৎকম্পিত করে, উহা যুবকের বক্ষে বুতামের ছিদ্রে বান্ধিয়া দিল। যুবতীর পিতা, এই সময়ে, ঐ দিন রাত্রিতে তাঁহার গৃহে, ভোজ ও নাচের উৎসবে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, ডব্‌লিউকে বিশেষ আদর ও আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ করিলেন। যুবতী, অদ্যকার ভোজে, ডবলিউর সহিত এক সঙ্গে নৃত্য করিতে সম্মত হইল। কি কি প্রকারের নৃত্য হইবে, তাহাও ঐ স্থানেই অবধারিত হইয়া রহিল। যুবক, এই আদরের আমন্ত্রণ আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিয়া, সেনানিবাসের দিকে চলিয়া গেল। যুবতীও, পিতার সঙ্গে, প্রফুল্ল মনে, গৃহে ফিরিল।

সন্ধ্যা অতীত আকাশে তারা ফুটিল, লোকালয়েও তারাফুলের মত আলোর অসংখ্য ফুল ফুটিল। যুবতীর পিতৃগৃহে আজি ভোজ ও 'বল' অর্থাৎ নৃত্য-উৎসব। গৃহ আলোকমালায় উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত হইল। পিতা, প্রাণপ্রিয় দুহিতারে লইয়া, সমাগত ভদ্রলোক ও কুল-মহিলাদিগের অভ্যর্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন; গৃহকর্ত্রী,—অর্থাৎ যুবতীর জননী ভোজগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃতা রহিলেন। একে একে নিমন্ত্রিতদিগের সকলেই আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। যুবতী, যাহার আগমন-প্রতীক্ষায় বারংবার তৃষিত নেত্রে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, কেবল আসিল না সেই ডব্‌লিউ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে আসিল না। যুবতী প্রথম একটু দুঃখিত ও বিরক্ত হইল। ইহার পরে, তাহার মনে অভিমান ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। সে ডব্‌লিউর অপেক্ষায় আর বিলম্ব করা অনুচিত মনে করিল।

নৃত্য আরম্ভ হইল। কিন্তু যুবতী স্বয়ং নৃত্য-উৎসবে যোগদান করিল না। সে যুবকের প্রীতি ও প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, এখনও তাহার আগমন বিষয়ে একবারে নিরাশ হইল না। তাহার এখনও দৃঢ় ধারণা, ডব্‌লিউ অবশ্যই আসিবে। মনে এইরূপ ধারণা থাকিলেও, ডবলিউর বিলম্ব হেতু, যুবতী চিত্তে একান্ত উদ্বিগ্ন ও অপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল; এবং দুইএকটি পার্শ্ববর্তিনী সুন্দরীর কাছে, মনের কথা মুখে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অনেকে অনুরোধ করিল, কিন্তু সে কিছুতেই অন্য কাহারও সহিত নৃত্য করিতে সম্মত হইল না।

নৃত্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যুবতী, বিষণ্ণভাবে, গৃহের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। মিষ্টার ডি—আর— ও মিষ্টার আর পি, * তাহার কাছে দণ্ডায়মান। সে তাঁহাদিগের সহিত মাঝে মাঝে দুই একটি কথা কহিতেছে, আর উন্মনস্কার মত এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া দেখিতেছে,—এই সময়ে, প্রার্থিত-দুর্লভ ডব্‌লিউ ঐগৃহে নিঃশব্দ প্রবেশ করিল। মিষ্টার ডি—আর্ ও মিষ্টার আর্—পি, যুবতীর প্রতি সস্মিত-নয়নে তাকাইয়া এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—"ঐ ত তোমাদিগের প্রিয় অতিথি এতক্ষণে উপস্থিত।" যুবতীও দেখিল,—তাহার প্রণয়াস্পদ ডব্‌লিউ প্রকৃতই আসিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজি ডবলিউর মুখচ্ছবিতে সে প্রণয়ের হাসি নাই,—প্রফুল্লতা নাই। আকৃতি গম্ভীর, যেন একটু ক্লিষ্ট। সে কাহাকেও অভিবাদন কিংবা সম্ভাষা করিল না। কাহারও সহিত একটি কথাও কহিল না। যুবতীর সঙ্গে চারি চক্ষে সাক্ষাৎ হইল; অথচ সে তাহার নিকটে আসিল না,—তাহাকে কিছুই বলিল না। গায়ে লাল জ্যাকেট, পরিধানে সায়াহ্ন-ভ্রমণের পরিচ্ছদ,—বক্ষঃস্থলে সেই প্রেম-পুরস্কারের গোলাপ। ডব্‌লিউ, কিছুক্ষণ, ধীর-প্রশান্ত দৃষ্টিতে ও নিস্পন্দনয়নে যুবতীর মুখ পানে তাকাইয়া থাকিয়া, নিতান্ত অপরিচিত অশিষ্টর ন্যায় ভোজ-গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

যুবতীর পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোক দুটি ডব্‌লিউর এই অদ্ভুত ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। যুবতী কহিল,—"এ কি, ইহার আজ এরূপ বিসদৃশ ভাব কেন? আমি আর কখনও ত ইহার এরূপ আচরণ দেখি নাই। বলিতে কি, ডবলিউ এরূপ অশিষ্ট ও অসামাজিক, ইহা এই ভাবে চক্ষে দেখিলেও ত আমার বিশ্বাস হয় না। ইহার অভ্যন্তরে

* নামের আদ্যাক্ষর। এইরূপ নাম ব্যবহার ইংরেজীতে চির প্রসিদ্ধ।

অবশ্যই বিশেষ কোন কারণ আছে। সম্ভবতঃ, ডবলিউ, কোন গুরুতর শোক-সংবাদে হৃদয়ে আহত হইয়া, এইরূপ বিকল হইয়াছে। যুবতী এই প্রকার উক্তি করিয়া, বিষাদ-ব্যঞ্জক হাস্যসহকারে, ডব্লিউর অনুসরণে, ভোজন-গৃহের দিকে প্রস্থান করিল।

যুবতী ভোজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল ডব্লিউ সেখানে নাই। জননী সেখানে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনিও ডব্লিউকে ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন, এবং তাহাকে নিতান্ত শোকাভিভূতবৎ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু সে ভোজগৃহ হইতে, কোন্ সময়ে, কোন্ পথে, কোথায় চলিয়া গেল, তিনি তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার সাহস হয় নাই। রাত্রি তখন সওয়া দশটা। যুবতী মায়ের কাছে সমস্ত শুনিল; শুনিয়া—যার-পর-নাই দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হইয়া, খানিক কাল সেই ঘরেই বসিয়া রহিল।

নৃত্য ও ভোজের অবসানে সকলেই, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু যুবতীর সে রাত্রিতে সুনিদ্রা হইল না। ডব্লিউর তথাবিধ বিসদৃশ ব্যবহার, ও প্রীতিসম্পর্কশূন্য অশিষ্ট আচরণের কথা বারংবারই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে, যত দূর হইতে হয়, ক্লিষ্ট, ক্ষুব্ধ, অবসন্ন ও উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে রাত্রি যাপন করিল। প্রভাতেও ঘরের বাহিরে যাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে আপন কক্ষেই কেমন এক প্রকার দুশ্চিন্তায় একা রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইবার কিছুকাল পরে, যুবতী তাহার ঘরের দ্বারে কাহার যেন পদশব্দ শুনিতে পাইল। সে দ্রুত উত্থিত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল। তাহার পিতা ত্রস্তব্যস্ত ভাবে ও দ্রুতগতিতে তাহার কোঠায় প্রবেশ করিলেন। যুবতী পিতাকে বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, এবং ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা আজ আপনাকে এমন দেখিতেছি কেন?" পিতা, ক্ষণকাল কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া, কি যেন একটু চিন্তা করিলেন; তার পর একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"ভাল, জিজ্ঞাসা করি, কল্য রাত্রিতে নৃত্যগৃহে, তোমরা মিষ্টার ডব্লিউকে দেখিয়াছিলে ত?—তখন ক টা বাজিয়াছিল, ঠিক বলিতে পার কি?"—

যুবতী বলিল,—"তখন রাত্রি সওয়া দশ টা। কেন, সে কথা কেন বাবা? দেখিয়াছিলাম ত। কিন্তু সে যেই দেখা দিল, অমনিই চলিয়া গেল। শুধু আমিই দেখিয়াছিলাম, এমন নহে; তাহার পরিচিত আরও দুই তিনটি ভদ্রলোক আমার কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিয়াছিলেন। ভোজগৃহে মা'র সঙ্গেও তাহার দেখা হইয়াছিল। আমার সহিত ত নয়ই, সে অন্য কাহারও সহিতও একটি বাক্য ব্যয় করিল না। কিছুক্ষণ আমার দিকে আন-মনে তাকাইয়া থাকিয়া, কি ভাবিয়া, কোন্ পথে চলিয়া গেল। তা-

হার এই অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ কি, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তাহার কি কোন সংবাদ পাইয়াছেন বাবা ?"

পিতা বলিলেন,—"হাঁ, তারই সংবাদ বটে,—তারও, তোমারও : কিন্তু বড় ভয়াবহ, বড় মর্ম্মান্তিক সংবাদ মা। আমার সে একান্তপ্রিয়, প্রিয়দর্শন ও অমায়িক যুবা ডবলিউ আর ইহ লোকে নাই। আজ প্রাতে তাহার মৃত দেহ নদীর জলে 'ভাসমান' অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। শব উত্তোলিত হইলে, দৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহার পকেট ঘড়ীটি বন্ধ। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা সওয়া দশটার ঘরে। তোমরা যে সময়ে, তাহাকে নৃত্যগৃহে দেখিতে পাইয়াছিলে, ঠিক সেই সময়েই তাহার পকেট ঘড়ী বন্ধ হইয়াছে। ঐ সময়েই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ঘোড়দৌড়ের পর, তুমি যে গোলাপটি তাহার বক্ষে পরাইয়া দিয়াছিলে, আহা! দেখিলাম সে গোলাপটি, তেমনই ভাবে, তাহার বুকে বুতামের রন্ধ্রে, নিবদ্ধ রহিয়াছে।"

যুবতী অকস্মাৎ এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া, বজ্রাহত ব্রততীর ন্যায়, নিস্পন্দ বসিয়া পড়িল। তাহার স্নেহপূর্ণ চক্ষু দুটি, মুহূর্ত্ত পরেই, লজ্জার সমস্ত বাধনি অতিক্রম করিয়া, অবিরল অশ্রুধারায় আপ্লুত হইল।

এ প্রসঙ্গে ইহার পরে যাহা যাহা ঘটিল, তাহার সহিত মূল বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই। যুবতীর পিতা ও প্রতিবেশীরা, সকলেই বুঝিতে পাইলেন যে, যুবকের যখন মৃত্যু হয়, ঠিক সেই সময়ে, কিংবা ক্ষণকাল অন্তরে, তাহাকে নৃত্যগৃহে তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা যুবকের পার্থিব-দেহ নহে—ছায়ামূর্ত্তি। যুবতীর প্রতি তাহার প্রাণে অপরিসীম আকর্ষণ ছিল। এই হেতুই সে, তাহাকে পার্থিব-জীবনের অবসান সময়ে, একবার চোখের দেখা দেখিয়া যাইতে আসিয়াছিল। দেখা দিয়াছিল মাত্র, কথা কহিতে পারে নাই ; অনেকক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকিতেও সমর্থ হয় নাই।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "উড়িষ্যার চিত্র। উপন্যাস।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। কলিকাতা ভারতমিহির প্রেসে মুদ্রিত।" গ্রন্থকার এই পুস্তকখানিকে উপন্যাস নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই পুস্তক কিয়দংশে ইতিহাস ও কিয়দংশে উপন্যাস ; এবং ইহার সর্ব্বত্রই রস-ভাবকতার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস। যাঁহারা উড়িষ্যায় কখনও যান নাই, এই পুস্তক পড়িলে, সেই ইতিহাস-কীর্ত্তিত, সামুদ্র-সমীর-সেবিত, শৈল-কান্তার-সরিৎ-শোভিত

বিচিত্র দেশ, দৃষ্টবস্তুর ন্যায় তাঁহাদিগের চক্ষে ভাসিবে; এবং উড়িষ্যার গ্রাম নগর পল্লী প্রান্তর,—উড়িষ্যার পূজাস্পদ পুরী, এবং পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাদিগের হৃদয়ে চিত্রিত রহিবে। বাবু যতীন্দ্রনাথ চক্ষুষ্মান্ দ্রষ্টা ও নিপুণ চিত্রকর। তাঁহার এই শব্দচিত্রময় সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইবে; যাঁহারা প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী, ইহা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের প্রীতি জন্মাইবে। ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই একান্ত ঔৎসুক্যবর্দ্ধক ও গুণপনার পরিচায়ক। আমরা সুযোগ পাইলে, ইহার কোন কোন কথা লইয়া সাহিত্যপ্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

২। "সরল বেদান্তদর্শন। শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল,—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর প্রণীত। চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।" ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় অপ্রবিষ্ট, অথচ পৃথ্বীবিখ্যাত বেদান্তদর্শনের সারতত্ত্ব বুঝিবার জন্য প্রাণে উৎসুক, এই পুস্তক তাঁহাদিগের উপকারে আসিবে। ইহার ভাষা, বিষয়ের কঠোরতা হেতুই, একটুকু বেশী কঠিন। কিন্তু পাঠক গ্রন্থখানি দুই তিনবার পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলে, সে কাঠিন্যে তিনি ক্লিষ্ট হইবেন না।

৩। "হিন্দু-বিজ্ঞানসূত্র।—মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?—পবিত্রহিন্দুত্ব সাধন;—কেন?—তবে শুনুন। মূল্য কত? এখন বিনা মূল্যে।—সময়ান্তে? পরার্দ্ধ মুদ্রা।—মূল্য এত কেন?—এতৎ-হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্রং। শ্রীবিশ্বনিন্দুক রায়, ওরফে বি, এন রায় প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ।" গ্রন্থের এই অদ্ভুত, অশ্রুতচর ও অনন্যসাধারণ নামকরণ পাঠ সময়ে, প্রথম এইরূপ মনে লইতে পারে যে, গ্রন্থকার বোধ হয় উন্মাদগ্রস্ত।—উন্মাদগ্রস্ত ধনি-সন্তান,—ভাল লেখা পড়া জানেন; তাই আপনার প্রাণের সখ মিটাইবার জন্য পাগলের সুরে পাঁচ রকমের কথা কহিয়া প্রাণের তৃষ্ণা পরিতর্পণে যত্নপর হইয়াছেন। এ অনুমানের প্রমাণ গ্রন্থকারের নাম-নির্দ্দেশ। তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে, আত্মপরিচয়-দানে, স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—গ্রন্থকার শ্রীবিশ্বনিন্দুক পাগলা। কিন্তু গ্রন্থের দুই চারিটি পৃষ্ঠা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার পাগলামীতে, যেমনই হউক, একটা প্রণালী আছে। পাগলামীর সে প্রণালী, সকল স্থলে প্রীতিকর না হইলেও, কোন কোন স্থলে সহৃদয়-সাহিত্যিকের প্রমোদজনক। গ্রন্থকারের ভাষা, ভাবরস-বিহ্বলা ভক্তি ও ভোগ-লালসা-ব্যাকুলা প্রীতির আবেগে, বেগবতী স্রোতস্বিনীর মত;—কখনও কলকলায়মানা, কখনও কূল-প্লাবিনী।

৪। "রামচন্দ্র-গীতাবলী। প্রথম খণ্ড। শ্রীরামচন্দ্র রায় প্রণীত। কলিকাতা ৫নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর বিশ্বকোষ প্রেসে, এ বসু এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।" এই গ্রন্থে এক শত সাতাশিটি গীত গ্রথিত হইয়াছে। প্রথম গীত—শ্রীশ্রীগণে-

শায় নমঃ ; শেষ গীত জয় শ্রীনারায়ণঃ। এ সকল গীতে নূতন ভাবের নূতন কথা আশা করা অনুচিত। কিন্তু অনেক গীতেই শব্দ-বিন্যাসের সুচারু পারিপাট্য আছে। শব্দের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি বিষয়েও গ্রন্থকার সতর্ক। যথা—"পায়ে ধরি ক্ষমা কর এ অধীনাগণে।" ব্যাকরণে একটুকু বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে, লেখক নিশ্চয়ই 'অধিনীগণে' লিখিতেন। তাঁহার সকল গীতেরই শেষ ভণিতিতে রস-মধুর রাম নাম নিবেশিত হইয়াছে। এ পদ্ধতি দাসু রায় ও মধুসূদন প্রভৃতির পূর্ব্বেও বঙ্গে প্রবর্ত্তিত ছিল।

৫। "সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি। নানাবিষয়িনী গীতি। শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরী রচিত। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" ইহাও একখানি সঙ্গীত-পুস্তক। ইহার গীতগুলি,"স্তোত্র-সঙ্গীত, স্তোত্র-ভাবাপন্ন-সঙ্গীত, আত্মোপদেশ-সঙ্গীত, আগমনী-সঙ্গীত ও ব্যক্তিগত-সঙ্গীত"এই পাঁচ নামে, পাঁচ অধ্যায়ে, বিভক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার আধুনিক কবিতার অনুকরণে 'গাহিছে,' 'গাহিছ' প্রভৃতি পদপ্রয়োগ না করিয়া বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির প্রণালীতে 'গাইছে,' 'গাইছ' প্রভৃতি পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা আমাদের নিকট ভাল লাগিল। গীতগুলি সুর-সংযোগে কেমন শুনায়, তাহা জানি না ; শব্দমাত্র পাঠে সকল স্থলে ভাল লাগে না। যথা,——

"তব গুণ কথনে অর্জ্জিত পুণ্যেতে,
মম এই বাণী পবিত্র হইতে পারে।"

কিন্তু কোন কোন গীতের শব্দরচনা সুন্দর ও সুখ-শ্রুত। যথা,—

"শুভ্র ভস্ম তব অঙ্গের লেপন,
শুভ্র হাস্যযুক্ত বিমল বদন।"
"শুভ্র-ফেন গঙ্গা জটা সুশোভন,
শুভ্র চন্দ্রমা শিরোভূষণ।"

৬। "চরিত্রবান্ কুলীন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা—ভবানীপুর, বকুলবাগান, অরুণ-যন্ত্রে মুদ্রিত।" এখানি, ষোল আনা গীতি পুস্তক না হইলেও, গীতিমিশ্র গল্পপুস্তক। গ্রন্থকার, গ্রন্থ-প্রকাশের প্রয়োজন সম্পর্কে, বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি তৈয়ার করিবার কারণ এই যে, বাল্যকাল হইতে এই পর্য্যন্ত আমি কতকগুলি গীত রচনা করিয়াছি। * * * সম্প্রতি সুযোগ পাইয়া কতকগুলি সাংসারিক ঘটনা ও ক্রিয়া অবলম্বনে নাটকচ্ছন্দে এই পুস্তক রচনা করিয়া ঘটনার অবস্থানুসারে মধ্যে মধ্যে এক একটি করিয়া একাত্তরটি গীত সন্নিবেশীত করিলাম।" পাঠক, উপরিধৃত পংক্তি নিচয় পাঠ সময়ে বুঝিতে পাইবেন যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালা গদ্য রচনায় কৃতী নহেন। গীতিরচনায়, সুকৃতী না হইলেও, সৌখীন ও সমর্থ। তাঁহার কোন কোন গীতে শব্দ-গ্রন্থনে অনেক দোষ ঘটিয়াছে। যথা,—
"পড়রে জ্ঞান গুরুর বিদ্যালয়ে। (মূঢ় মন বালক) প্রেমরূপ পুস্তকের প্রতি, প্রাণ্পণে প্রীতি রাখিয়ে। প্রবৃত্তি পত্রিকা রবে, ধৈর্য্যতা লেখনী লবে, কালী নাম তাহি কালী

হবে, মহেন্দ্রের মূর্খতা গিয়ে।”

ধৈর্য্যতা ও মাধুর্য্যতা প্রভৃতি শব্দ গীতের অনুরোধেও ব্যবহার করা যায় না। ওখানে ধৈর্য্যতা না লিখিয়া ধীরতা লিখিলে, ছন্দের রীতি রক্ষা পাইত, শব্দশাস্ত্রও অক্ষুণ্ণ রহিত। কিন্তু এরূপ দোষ সর্ব্বত্রই দৃশ্যমান নহে। কোন কোন গীতের ভাব ভাল, রচনাও অপেক্ষাকৃত সুন্দর।

৭। “সচিত্র কবিতাকোরক। শ্রীরমেশ-চন্দ্র জোয়ারদার বিরচিত। কলিকাতা দাস-যন্ত্রে শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।” কবিতাকোরকের দুই একটি কবিতা সুখ-পাঠ্য, কোন কোন কবিতা কবিতাপুস্তকে স্থান লাভের অযোগ্য। যথা,—

“পুনরায় কর্ণোলিস্ আসিলেন ভারতে।
আয়ু তাঁর হ'ল শেষ গাজিপুর বাসেতে।
লর্ড মিণ্টো মহামতি, তাঁর পদে হয়ে স্থিতি,
যাপিলেন অষ্ট বর্ষ সুখে এই ভারতে।
ঊনবিংশ শতাব্দী অই চলি যাইছে!”

কবিতার শেষ পংক্তিটি সুতাছেঁড়ার মত। তা ছাড়া, “তাঁর পদে হয়ে স্থিতি”, এইরূপ রচনা বাঙ্গালা ভাষার idiom অর্থাৎ বাঙ্ নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। ভাষার উপর এইরূপ অথবা ইতোধিক অত্যাচার আরও অনেক স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা উৎ-সর্গপত্রে,—“জগতে অপরিশোধনীয় মাতা পিতৃ স্নেহের কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ।” • • কিঞ্চিৎ অর্থে ‘কথঞ্চিৎ’ এবং পিতা মাতার স্নেহ এই অর্থে ‘মাতা পিতৃ স্নেহ’ ভাষায় দুঃসহ। কিন্তু এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল শব্দ প্রয়োগ সত্বেও, কোন কোন কবিতায়, দুই একটি পংক্তি হৃদয়কে একটু স্পর্শ করে। যথা,—

“ইন্দুপ্রভে! মা আমার, স্বর্গের পুতলি,
মর্ত্তে কেন এসেছিলি দুদিনের তরে?

এখানে, ঐ ‘মর্ত্তে’ শব্দটি শুদ্ধ হইলেও বাঙ্গালায় দুই প্রকার অর্থদ্যোতক। কেন না, বাঙ্গালায় অনেকে কবিতায় মরিতে স্থলে ‘মর্ত্তে’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ‘মর্ত্তে’ স্থলে মর্ত্ত্যে বলিলে কোন দিকেই অর্থসংশয় থাকে না।

৮। “অমিয়গাথা। ৯। ব্রজগাথা।— শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত। কলি-কাতা-যন্ত্রে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মু-দ্রিত ও প্রকাশিত।” এই দুখানিই উপাদেয় কবিতাপুস্তক; এবং কাব্যরচয়িত্রী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী সুকবী বলিয়া সম্মান-যোগ্যা। ইদানীং বঙ্গদেশে অনেক ভদ্র-মহিলা ভাল কবিতা লিখিয়া কবীর আসন পাইয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষা ও শক্তির বিকাশ-সম্পর্কিত তারতম্য অনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর আদর্শ অথবা শিক্ষাস্থান ইংরেজী কবিতা; আর এক শ্রেণীর আরাধ্য-অপাদান মহাজন-কবিদিগের প্রেম-গাথা। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা, এই শে-ষোক্ত শ্রেণীর কবী হইলেও, ইংরেজী কবি-তার গন্ধশূন্য নহেন। অমিয়গাথার অনেক কবিতাই ইংরেজী কবিতার ধরণে লিখিত হইয়াছে; এবং ভাবের বিকাশ, সকল স্থলে প্রয়োজনের অনুরূপ না হইয়া থাকি-

লেও, প্রায় সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে। ব্রজগাথার রাধা হৃদয়হারিণী। এতৎ সম্পর্কে ইহার অধিক আর বলিতে পারি না। আমরা যদি রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কে কখনও একটি প্রবন্ধ লিখিতে পারি, তখন ব্রজগাথার প্রেম-তত্ত্ব সমালোচনা করিতে যত্নপর হইব।

১০। "পরিত্রাণ। ( কাব্য )—সেখ ফজলল করিম প্রণীত। প্রকাশক মোহাম্মদ মেহের উল্লা। ছাতিয়ানতলা—যশোহর। প্রথম সংস্করণ। কলিকাতা, ১৫৯নং কড়েয়া রোড্—রেয়াজুল-ইস্‌লাম প্রেসে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন অহ্‌মদ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।" গ্রন্থকার, নূতন কবি হইলেও, সুকবি। তাঁহার লেখায়, অনেক স্থলেই, রসের স্ফূর্ত্তি এবং উদ্দীপনার দীপ্তি আছে। যাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মে অনুরাগী নহেন, তাঁহারাও এই কাব্য-পুস্তক পড়িয়া সুখী হইবেন। বঙ্গদেশের অনেক মুসলমান ভদ্রলোক ইদানীং ভাল বাঙ্গালা শিখিয়া বাঙ্গালা রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টি হইলে দেশের উপকার হইবে। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত ফজলল করিম সাহেব ভাল বাঙ্গালা শিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।—

"অয়ি দিগঙ্গনে! অয়ি সৌন্দর্য্যের খনি—
অয়ি বিধাতার ছবি—লো চারু-আননি!
এই দেহলতিকার সুঠাম সুন্দর
চিকন-কাচুলি পরা রাগ-রস ভরা
কোমল চার্ব্বঙ্গে সতি! কি আমি দেখিনি?
কল্পনে লো। চল আঁজি পুনঃ মদিনায়,
প্রাণ ভরি হেরি কোথা মহান্-পুরুষ,
ইস্‌লামের কর্ণধার! চল লো সুমতি"

উদ্ধৃত পংক্তি নিচয়ের মধ্যে 'মহান্-পুরুষ' এই পদটি দুষ্য হইয়াছে। ওখানে সমাস চিহ্ন না দিয়া, মহান্ ও পুরুষ এই দুইটি শব্দকে পৃথক্ রাখিলে কোন অংশেও আর কথা থাকে না। কোমল শব্দের পর চার্ব্বঙ্গ পদও একটু শ্রুতিকটু। কিন্তু এই বিংশতিসর্গাত্মক বৃহৎ কাব্যে এইরূপ দোষ অতি অল্প আছে।

১১। "সটীক-সানুবাদ—কলাপব্যাকরণ।—সন্ধিবৃত্তি। মূল্য ।০।—:২। চতুষ্টয় বৃত্তি। মূল্য ২ টাকা।" পর্ব্বত যেমন ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, কলাপ-ব্যাকরণরূপ শব্দশাস্ত্র-পর্ব্বতও সেইরূপ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার সূত্রকার সুপ্রসিদ্ধ জৈনসন্ন্যাসী মহাত্মা শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য। তিনি, এক সুখপ্রিয় রাজকুমারের অক্লেশ-শিক্ষার্থ, ইহার সূত্র রচনা করেন। এই জন্য এ ব্যাকরণের আর এক নাম কৌমার। সে সূত্রনিচয়ে ব্যাকরণের সার মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া, উহার তৃতীয় নাম কাতন্ত্র-ব্যাকরণ। বিখ্যাত বৈয়াকরণ দুর্গসিংহ, শর্ব্ববর্ম্মকৃত সূত্রনিচয়ের বৃত্তি রচনা করিয়া, সেই কাতন্ত্র শাস্ত্রকে এক বিস্তৃত অথবা বৃহৎতন্ত্র ব্যাকরণে পরিণত করেন। তৎপর কাত্যায়ন উহার কৃদ্‌বৃত্তি, শ্রীপতি উহার পরিশিষ্ট, এবং ত্রিলোচন ও গোপীনাথ প্রভৃতি শাব্দিক পণ্ডিতেরা, ভিন্ন ভিন্ন নামে, উহার বিবিধ টীকা রচনা করিয়া

উহাকে এক আশ্চর্য্য বস্তু রূপে বিকশিত করিয়া তুলেন।

এই কলাপ ব্যাকরণই, বহু কাল হইতে, বঙ্গদেশের ব্যাকরণ। ইহা এক সময়, সমস্ত বঙ্গের সাধারণ সম্পত্তি ছিল। ভট্টোজি-দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী, বোপদেবের মুগ্ধ-বোধ, এবং ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি নব্যব্যাকরণ-নিচয় যখন বঙ্গে প্রবেশ-পথ পায় নাই, তখন বঙ্গদেশের সংস্কৃত শিক্ষার্থি ব্যক্তি মাত্রই কলাপের সূত্রবৃত্তি কণ্ঠস্থ করিত। কলাপের সে প্রচারক্ষেত্র সামান্যতঃ একটুকু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিলেও, উহার পুরাতন গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। বঙ্গদেশে এখনও শত শত টোলে সুকুমার-মতি বালকেরা কলাপের—"এ অয়্—ঐ আয়্—ও অব্—ঔ আব্" প্রভৃতি সুখ-বোধ্য সূত্রগুলি আবৃত্তি করে; এবং যাঁহারা ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত, তাঁহারাও কলাপের টীকা, পঞ্জী ও পরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যমহাশয়, সম্প্রতি সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদ সহিত কলাপব্যাকরণখানি খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষার্থিদিগের জন্য প্রকৃতই এক সুখ-সেব্য রাজপথ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাঁহার অনুবাদ এমনই সরল হইয়াছে যে, যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকামাত্র পাঠ করিয়াছে, তাহারাও উহার সাহায্যে অনায়াসে কলাপ ব্যাকরণে প্রবেশ করিতে পারিবে। সানুবাদ কলাপ কলিকাতা ৩৯নং বসুপাড়া লেনস্থিত সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতে প্রচারিত হইতেছে।

১৩। "মূক-শিক্ষা। ( তিনখণ্ডে সম্পূর্ণ।) শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার প্রণীত।—কলিকাতা ৪নং কলেজস্কোয়ার হইতে এম্, এম্, মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" ইহা একখানি নূতন পথের ও নূতন প্রণালীর উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বোবার মুখে কথা ফোটে না, ইহা প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে প্রতীত হইবে যে, বোবার লেখনী-মুখে সকল কথাই সহজে ফুটিতে পারে। বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার মূক-শিক্ষার এই গ্রন্থপ্রণয়নের দ্বারা দেশহিতৈষীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এ পুস্তক সম্পর্কে দুই এক ছত্তরে কিছুই ব্যক্ত করা যায় না। কারণ, মূক ও বধিরের শিক্ষাবিধান আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর এক আশ্চর্য্য তত্ত্ব, এবং উহা বহুবিধ বিচিত্র বৃত্তান্তে জড়িত। যাঁহারা এ অংশে কিছু শিখিতে কিংবা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের এ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থ অতি সরল ও সুখ-পাঠ্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে। সকলেই ইহা পড়িয়া সুখী হইবেন।

১৪।"শঙ্করাচার্য্যচরিত।—কলিকাতা রাজকীয় বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত।" শাস্ত্রিমহাশয়ের এ গ্রন্থ সুশিক্ষিতের জন্য লিখিত হইয়াছে; এবং সুশিক্ষিত মাত্রেরই ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাঁহার ভাষা সরল, বিষয়বিন্যাসের প্রণালী সুন্দর। আমরা তাঁহার এ পুস্তক পড়িয়া

অনেক নূতন কথা শিখিয়াছি। শঙ্করাচার্য্যের নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেবতার নামের মত উচ্চারিত হইতেছে। আমরা শাস্ত্রিমহাশয়ের গ্রন্থ পড়িয়া সে শঙ্করকল্প শঙ্করকে সজীববৎ দেখিতে পাইয়াছি।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের দুই একটি মাত্র কথা বক্তব্য। বৈজ্ঞানিকপণ্ডিতেরা, ইদানীং, অলৌকিক আর অপ্রাকৃত এই দুই তত্ত্বের পার্থক্য লইয়া, অশেষপ্রকারে বিচার করিয়াছেন; এবং তাঁহারা অলৌকিকের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও অপ্রাকৃতকে সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের মতে অলৌকিক আর লোকোত্তর এই দুই শব্দ একার্থবোধক। সুতরাং, যাহা লোকজগতে অহরহঃ পরিলক্ষিত হয় না, অথচ প্রকৃতির কোন অজ্ঞাত ও উচ্চতর নিয়মানুসারে সংঘটিত হইতে পারে, তাহার নাম অলৌকিক; আর যাহা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহার নাম অপ্রাকৃত। এমন অবস্থায়, অলৌকিক ঘটনায় সকলেই বিশ্বাস করিতে পারে; কিন্তু যাহা অপ্রাকৃত, তাহাতে কাহারও বিশ্বাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। শাস্ত্রিমহাশয়, শঙ্করের জীবনবৃত্তান্তে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই উভয়কে এক সঙ্গে মিশাইয়াছেন; এবং উভয়ভারতী নাম্নী শাস্ত্রার্থরসিকা রমণীর সহিত বিচারযুদ্ধে সর্ব্বজ্ঞ শঙ্করাচার্য্যকে শাস্ত্রবিশেষের মর্ম্মজ্ঞানের জন্য মৃতদেহে প্রবেশ করাইয়া, বোধ হয়, তাঁহার ঐতিহাসিক মাহাত্ম্য একটুকু খর্ব্ব করিয়াছেন। এই সম্বন্ধেই শাস্ত্রিমহাশয়ের সহিত আমাদিগের সামান্য একটুকু মত-ভেদ। আমরা তথাপি ইহা হৃদয়ের সহিত স্বীকার করি যে, তাঁহার গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ।

১৫। "উমা।—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস; এবং উপন্যাস অংশে ভাবপুষ্ট ও উৎকৃষ্ট। যাঁহারা ইদানীং বঙ্গীয়-সাহিত্যসমাজে সুলেখক বলিয়া পরিচিত, বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে আদরের আসন পাইবার যোগ্য। তিনি সামাজিক-জীবনের রহস্যবিশ্লেষে পটু, এবং সুনিপুণ শব্দশিল্পী। আমরা তাঁহার এই পুস্তক পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে যার-পর-নাই প্রীত হইয়াছি। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, ইহার দুই তিনটি পৃষ্ঠা পড়িবার সময়ে হৃদয়ে অতি গভীর দুঃখ অনুভব করিয়াছি। গ্রন্থকার যদি, স্বদেশীয় সমাজের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া, সে দুই তিনটি পৃষ্ঠা দ্বিতীয় সংস্করণে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার এই গ্রন্থ বঙ্গে সহস্রকুলবালার শিক্ষাগ্রন্থরূপে আদৃত হইবে। তাঁহার গ্রন্থনায়িকা উমা, রূপে ও গুণে,—রসময় প্রেমে ও রমণীজনপূজ্য পবিত্রতার ধর্ম্মে, দেবরমণীর চরণোপান্তে স্থান লাভের উপযুক্ত। এ চিত্র চিত্তচক্ষে নিরীক্ষণ করিলে পুণ্য হয়, এবং তাপিত প্রাণও শীতল হয়।

পাঁচকড়ি বাবুর ভাষায় সাধারণতঃ ভ্রম

প্রমাদ থাকে না। কিন্তু আমরা দুই একটি শব্দ বুঝি নাই। যথা, "কতুহলীর মূলে জল সেচন"। সমগ্র গ্রন্থে এইরূপ দুই চারিটি মাত্র শব্দ আমাদিগের নিকটে অযুক্ত বোধ হইয়াছে। হয়ত ইহার কোন যুক্তি থাকিতে পারে। আমরা হৃদয়ের সহিত আশা করি, বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চতর অঙ্গের উপন্যাস রচনার দ্বারা দেশীয় সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিবেন।

১৬। ধূমকেতু। মাসিক-পত্র—শ্রীনীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। ধূমকেতুর প্রথম বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল। এই এক বৎসরে ধূমকেতু ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিয়াছে; এবং কএকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও উপাদেয় কবিতা প্রকাশের দ্বারা সাহিত্যের যথাসম্ভব সম্পদ বাড়াইয়াছে। ধূমকেতু অকালে লয় পাইবে না। উহার আশ্রয় উৎসাহশীল সাহিত্যসেবক, এবং সৎসংকল্পে দৃঢ়।

১৭। "Hints on English Pronunciation, by Abdulkarim B. A.—Inspector of schools &c." আবদুল করিম সাহেব শিক্ষাকার্য্যে নিত্যনিবিষ্ট। সুতরাং তিনি যাহা কিছু রচনা কিংবা প্রকাশ করেন, তাহাই শিক্ষার্থীর উপকারজনক হইয়া থাকে। তাঁহার এ পুস্তকও, অনেক দুরুচ্চার ইংরেজী—এবং ইংরেজীভাষায় গৃহীত বহুসংখ্য ফরাশি—শব্দের উচ্চারণশিক্ষাবিষয়ে, বালকদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ গুলির অর্থও যদি লিপিবদ্ধ হইত, তাহা হইলে আরও বেসী উপকার দর্শিত। কেন না, শব্দ কখনও, অর্থবোধ বিনা, স্মৃতিতে গ্রথিত রহে না।

১৮। "The Telegraph – টেলিগ্রাফ।—ইংরেজীতে লিখিত সুলভ দৈনিক; মূল্য এক পয়সা মাত্র। – কলিকাতা ৩৮। ২ ভবাণীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মফঃস্বলের জন্য মাসিক মূল্য এক টাকা।" এইরূপ সুখ-পাঠ্য, সুলভ ইংরেজী দৈনিক বঙ্গে এই নূতন। ইহা সর্ব্বাংশেই বিদ্যালয়স্থ বালক এবং বহুকার্য্যব্যাপৃত বিষয়িদিগের বিশেষ উপযোগী। ইহাতে প্রতিদিনের জ্ঞাতব্য টেলিগ্রাম ও যুদ্ধবিগ্রহের সর্ব্বপ্রকার সংবাদ থাকে;—আর থাকে দেশ-দেশান্তরের নানাবিধ ঐতিহাসিক কথা,—সাহিত্যিক কথা ও সামাজিক কথা। ইহার ইংরেজীও সকলের পক্ষেই সহজবোধ্য—মুদ্রণ অতি সুন্দর ও মনোহর। ইহা যেরূপ বিজ্ঞতার সহিত চালিত হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের ভরসা আছে, ইহা অচিরেই সমস্ত বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িবে; এবং বিদ্যার্থী ও ব্যবসায়ী উভয়শ্রেণিরই অবসর-সঙ্গী রূপে বিশেষ আদর পাইবে।

১৯। "শ্রীলালমোহন সাহা শঙ্খনিধির সারস্বত পঞ্জিকা।—শ্রীযুক্ত উমাচরণ জ্যোতির্ভূষণ কর্ত্তৃক গণিত।" শঙ্খনিধিমহাশয়ের সারস্বত পঞ্জিকা সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। সুতরাং, ইহার নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বিশেষতঃ, আমরা পঞ্জিকার দোষ-গুণ-বিচারে অপটু। এই পঞ্জিকা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহা আকারে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মত ছয়শত-পৃষ্ঠাত্মক বৃহৎ পুস্তক, অথচ ইহার মূল্য দুই আনা। আমরা ঢাকার অধিবাসী; আমাদিগকে চট্টগ্রামের পঞ্জিকা উপহার না দিয়া, ঢাকার পঞ্জিকা উপহার দিলেই ভাল হইত।

দ্বিতীয় খণ্ড ]　　চৈত্র, ১৩১০ ।　　[ ১২শ সংখ্যা ।

# বান্ধব।

মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন।

১২

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|


ঢাকা-গিরিশ-যন্ত্রে

শ্রীহরিহর নন্দী প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই সংখ্যার মূল্য ৷৶০ আনা।

## বান্ধবের মূল্যাদি সম্বন্ধীয়
## নিয়মাবলী।

### অগ্রিম।

| | মূল্য | ডাকমাশুল | মোট |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৩৲ ... | ।৵০ ... ... | ৩।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২৲ ... | ৶০ ... ... | ২৶০ |

### পশ্চাদ্দেয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| বার্ষিক | ৪৲ ... | ।৵০ ... ... | ৪।৵০ |
| ষাণ্মাসিক | ২৷০ ... | ৶০ ... ... | ৩৷৶০ |

১। বান্ধবের প্রবন্ধাদি সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধাদি ব্যতীত, সকলেই সর্ব্বপ্রকার বৈষয়িক পত্র ও মানিঅর্ডার প্রভৃতি—"ঢাকা বান্ধব কুটীর" এই ঠিকানায়, বান্ধবের সহকারী সম্পাদক অথবা কার্য্যাধ্যক্ষ, এই নির্দ্দেশ সহকারে, আমাদিগের কাহারও বরাবরে, পাঠাইবেন। সম্পাদকের নামে মূল্য পাঠাইলে কার্য্যাদি সম্পর্কে আমাদের নিতান্ত অসুবিধা হয়

২। বিদেশে, বিশেষ পরিচয় ব্যতিরেকে, অগ্রিম মূল্য বিনা বান্ধব প্রেরিত হইবে না। কারণ, তাহাতে গ্রাহকদিগের অসুবিধা হয়, এবং অনেক স্থলেই আমাদিগের যার-পর-নাই ক্ষতি হয়।

৩। বান্ধবে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে, তাহার মূল্য প্রতি পংক্তি প্রতি মাসে ৵০, প্রতি কলম ৩৲, প্রতি পৃষ্ঠা ৫৲, এবং প্রতি আট পৃষ্ঠা ৩৬৲ হিসাবে লওয়া যায়। তিন বারের অধিক হইলে, পৃথক্ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। যদি কেহ তিন বারের অধিক সময়ের জন্য চুক্তি করিয়া, চুক্তির সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই, বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে, চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে না দিয়া, প্রথম তিন বারের জন্য যে হারে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল, সেই হারে মূল্য প্রদান করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

ঢাকা,
বান্ধব-কুটীর।
১৩১০ সন ২রা বৈশাখ।

শ্রীহরকুমার বসু
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শ্রীউমেশচন্দ্র বসু
সহকারী সম্পাদক।

---

# বর্ষবিদায়

"Day buries day; month month;
and year the year." ... ... *Thomson.*

যাও—তবে তুমি যাও,—যে পথে প্রাগৈতিহাসিক কালের অনন্ত কোটি বৎসর অনন্তের অতল গহ্বরে যাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে;—যে পথে যুগের পর যুগ—মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, মানবজাতির ক্রম-বিকাশ ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস-কথা লইয়া, মনোবুদ্ধির অগম্য মহাকালের অঙ্গে যাইয়া মিশিয়াছে;—যে পথে স্বচ্ছসলিলা রামায়ণী গঙ্গার অশ্রুময় তরঙ্গরাশি—শ্যাম-সলিলা ভাগবতী যমুনার ভাবময় বীচিমালা;—পৌরব ও যাদব প্রভৃতি আর্য্যবীরদিগের অতুলপ্রতাপ, এবং আসিরীয় ও মৈসরীয়,—গ্রীক, রোমক ও কার্থিজীয় প্রভৃতি অসংখ্য অনার্য্যজাতির উত্থান ও পতনের কাহিনী লইয়া, তোমার মত শত সহস্র সংবৎসর অপার ও অচিন্তনীয় কাল-সমুদ্রের কুক্ষিমধ্যে যাইয়া বিলীন হইয়াছে, তুমিও, বুদ্‌বুদের মত, মুহূর্ত্তবিলাসে মুগ্ধ রহিয়া, সেই কাল-সমুদ্রে যাইয়া চিরকালের তরে ডুবিয়া যাও।

সেই ত ছিল এক কাল, যাহা বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,——

"নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমি
র্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শ্রোত্রাদিবুদ্ধ্যানুপলভ্যমেকং
প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ।"

ইহার এই ভাবার্থ,—

নাহি ছিল দিবা,—না ছিল যামিনী,
না ছিল আকাশ,—না ছিল মেদিনী,
আলোক-সঞ্চার কিংবা অন্ধকার,
ছিল না কিছু তখন;
আছিলা পুরুষ প্রকৃতিসংলীন—
জগদাদিভূত মহাযোগাসীন—
জ্ঞান-পথাতীত আত্ম-অবস্থিত
এক ব্রহ্ম সনাতন। *

তুমি যে চলিয়া যাইতেছ, সংবৎসর! তুমি কি সেই অনাদি অথবা আদিস্বরূপ কালেরই একটি অঙ্গগ্রন্থি? সে কাল ত দিবা দেখে নাই, রাত্রি দেখে নাই,—আলো দেখে নাই, অন্ধকার দেখে নাই; এবং ঊর্দ্ধে নভস্তল ও অধোজগতে অবনী কিংবা ভূমি, ইহার কিছুই দেখে নাই। তুমি কি দেখিয়াছ, বল দেখি। তুমি দিবসে, সূর্য্যের আলোকে, রাত্রিতে

* ঋষিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীর টীকায় যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উপরিধৃত অনুবাদের শেষাংশে তাহা বর্ণবদ্ধ করিতে সমর্থ হই নাই।

চন্দ্রমার রমণীয় জ্যোৎস্নায়, অথবা দিবা-রাত্রির সন্ধিসমাগমে—আঁধারমাখা আলোক কিংবা আলোক-মিশ্র অন্ধকারে, কত কি দেখিয়াছ, তাহা আমায় বুঝাও দেখি। সেই পুরাতন দিবারাত্রি-শূন্য শূন্যজগৎ, এইক্ষণ, অনন্তকোটি সূর্য্য এবং অনন্তকোটি নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের রূপ-বৈভবে উদ্ভাসিত হইয়াছে;—সূর্য্য স্বাধিকারস্থিত গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া, এবং নক্ষত্র, নক্ষত্রের দ্বারা প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, প্রকৃতি-পুরুষের প্রেম-সঙ্গীত গাইতেছে। তুমি ইহার কি দেখিয়াছ, কি শুনিয়াছ, তাহা আমায় একটু বুঝিতে দাও দেখি?

তুমি প্রকৃতির অনন্ত রূপ-বিলাস ও অনন্তবিধ শক্তিবিকাশ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছ,—প্রকৃতির বিশাল বিস্তারে বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থের বিস্ময়াবহ ক্রীড়া,—অসংখ্যপ্রকার জীবের উৎপত্তি ও জীব-জগতের পার্থিব-প্রভুস্বরূপ মনুষ্যজাতির মহিমা ও প্রভাব দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছ; এবং মনুষ্য মনুষ্যকে ভালবাসে,—মনুষ্য, ভালবাসার পবিত্র পিপাসায়, আপনার সুখ-স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া, অম্লানমুখে পরের অধীন হয়, এবং ন্যায় ও প্রেম-ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ, টলষ্টয়ের * অনুকরণে, সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ছিন্নকন্থাধারী ভিখারীর ন্যায়, গৃহবাসে সন্ন্যাস-ব্রত অনুষ্ঠান করে, ইহা দেখিয়া তুমি ভক্তিতে মাথা নোয়াইয়াছ।

কিন্তু হায়! তুমি ইহাও দেখিয়াছ যে, মানবজাতি, শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরবে যত কেন উন্নত হউক না, আর মনুষ্যের মধ্যে চ্যানিঙ্, * পার্‌কার, গ্লাডষ্টোন ও টলষ্টয়ের বিখ্যাত ভূম্যধিকারী,—ঋষির মত জ্ঞানী,—লোকহিতার্থ সর্ব্বত্যাগী। টলষ্টয়ের বিপুল ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি, প্রজার দুঃখে প্রাণে কষ্ট অনুভব করিয়া, সেই ভূসম্পত্তি কৃষিজীবী প্রজাদিগকে খণ্ডশঃ বিলাইয়া দিয়াছেন; এবং আপনার জন্য যে এক খণ্ড মাত্র রাখিয়াছেন, তাহাতে কৃষিকার্য্যের দ্বারা শস্য উৎপাদন করিয়া, সেই শস্যসম্পদেই সংসার নির্ব্বাহ করিতেছেন। টলষ্টয় প্রসিদ্ধ কবি, প্রজাবন্ধু রাজনৈতিক,—রাজপুরুষদিগের কর্ম্মশাসক,—ধর্ম্মে উদার-তন্ত্রী,—ভক্তিযোগে তন্ময়। তিনি, পৈতৃক প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, এইক্ষণ কুটীরে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চারিত্র-প্রভাবে সে কুটীর ইদানীং তীর্থস্বরূপ হইয়াছে। কেন না, সুকৃতি ব্যক্তিরা, সুদূর আমেরিকা হইতেও, সে পুণ্য তীর্থ দর্শনের জন্য, তীর্থযাত্রীর ন্যায়, রুষরাজ্যে গমন করেন।

* টলষ্টয় আজও সহস্র দুঃখীর শান্তি-নিকেতন এবং হৃদয়ের আশ্রয় সহস্র পাদপ-স্বরূপ জীবিত আছেন। তিনি রুষের একটি

* আমেরিকার স্বনামধন্য ধর্ম্মোপদেষ্টা (William Ellery Channing) উইলিয়ম এলারি চ্যানিঙ উনবিংশ শতাব্দীর অতি প্রসিদ্ধ আভরণ বলিয়া জগতে পরিচিত। মহাত্মা চ্যানিঙ অর্থবিত্ত সঞ্চয় করিবার অবসর পান নাই। কিন্তু, আমেরিকার অধি-

মত ক্ষণজন্মা পুরুষেরা, নিজ নিজ জীবনের দ্বারা, যাহাই কেন শিক্ষা দিউন না, পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্য, অদ্যাপি, হৃদয়ের অভ্যন্তরে ও কর্ম্মভূমির বহিশ্চত্বরে, সেই পূর্ব্বতনী পশুবৃত্তিরই অধীন রহিয়া, একে অন্যের বুকের রক্ত শোষণ করিবার জন্য, অহোরাত্র ব্যাপৃত রহিয়াছে; এবং পশু যেমন, সন্নিহিত পশুর মুখের গ্রাস কাড়িয়া আনিবার জন্য, ক্রূর-কঠোর তীব্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, মনুষ্যসমাজের অধিনায়ক অথবা অধ্যক্ষ-পুরুষেরাও, একে অন্যের সর্ব্বস্বগ্রাসের অভিলাষে, ঠিক সেইরূপ তাকাইয়া আছে। তুমি দেখিয়াছ, মনুষ্য মনুষ্যের জীবন-রক্ষা ও সুশিক্ষার নিমিত্ত, আপনার সঞ্চিত অর্থের কপর্দ্দকমাত্র-ব্যয়েও যক্ষের ন্যায় কুণ্ঠিত; অথচ বহুসংখ্য মনুষ্যকে একই আঘাতে—একই উদ্যমে—এক নিমিষে—কৃতান্তের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া, শত শত সুন্দরীর অকাল-বৈধব্য-সংঘটন, এবং শত শত মাতার শোকাকুল হাহাকার ধ্বনি ও শত সহস্র অনাথ শিশুর অন্তর্বিদারি আর্ত্তনাদ শ্রবণের জন্য, পর্ব্বতবৎ পুঞ্জীকৃত অর্থের সমস্ত ব্যয়ে মুক্তহস্ত! তুমি দেখিয়াছ, কোটি প্রজা, কাঙ্গালের ন্যায় করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, আশঙ্কিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য ঊর্দ্ধমুখে চীৎকার করিয়াছে, অথচ প্রজারঞ্জন-ব্রত রাজাধিরাজ, প্রজার দুঃখে বধির রহিয়া, যেন আপনার চিত্তবিনোদনের অকিঞ্চিৎকর উদ্দেশ্যে, দেশান্তরে মহাযুদ্ধের * দাবাগ্নি সৃষ্টি করিয়াছে। তুমি দেখিয়াছ, পুত্র পিতা কিংবা পিতৃবৎ পূজাস্পদ হিতৈষী আত্মীয়ের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া পিশাচীর প্রীতিতে পুষ্ট রহিয়াছে;—ষণ্ডমূর্ত্তি মনুষ্য শত শত স্থলে সতীর পবিত্র ধর্ম্ম সমূলে ধ্বংস করিয়া অট্টহাস্যে হাসিয়াছে,—সতী বলিয়া সমাদৃতা শিক্ষিতা রমণী, পতির ব্রহ্মরন্ধ্রে পদাঘাত

বাসীরা তথাপি তাঁহাকে, তত্রত্য President অর্থাৎ প্রধানতম রাজ্যাধ্যক্ষ হইতে অধিকতর সম্মান করিত; এবং রাজনীতি ও সমাজনীতির সমস্ত কথায়ই তাঁহার উপদেশ পাইবার জন্য আকুল রহিত। শান্তমূর্ত্তি চ্যানিঙের প্রকৃতিতে সত্বগুণের এত বেশী আধিক্য ছিল যে, উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিরাও, তাঁহার সান্নিধ্যে আনীত হইলে, তদীয় দৃষ্টির স্নেহ-মধুর শাসনে, তৎক্ষণাৎ শান্ত ভাব ধারণ করিত। ফরাশি দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত মঁস্যু রেণাঁ চ্যানিঙকে কলিকালের মহাতাপস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। Studies in Religious History By Ernest Renan. থিয়োডোর পার্কার উনবিংশ শতাব্দীর অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীর,—চ্যানিঙেরই শিষ্য, অথচ শিক্ষার সর্ব্বতোমুখ-বিস্তারে ও কর্ম্মশক্তির অমিত-প্রভাবে গুরু হইতেও উচ্চ পদবীরূঢ়। বর্ষশেষে এ সকল পুণ্যশ্লোক পুরুষের নাম-উচ্চারণে প্রাণ শীতল হয়।

* রুষ-সম্রাটের নিকট ফিনিশিয়ানদিগের অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা-প্রত্যাখ্যান, এবং তদনন্তর জাপযুদ্ধের ভীষণ আয়োজন।

করিয়া, আপনার রূপের পতাকা উড়াইয়াছে; এবং যাহারা সুমানুষ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, তাহারাও, উপকারিজনের অপকার ও অবমাননা দ্বারা ত্রিলোক-পূণ্য কৃতজ্ঞতাধর্ম্মের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া, মনের আনন্দে অভিমানে ফুলিয়াছে।

তুমি আরও কত কি দেখিয়াছ, তাহা কে বলিতে পারে? আর, তোমার পরবর্ত্তি বর্ষচয়ও, কত কাল পর্য্যন্ত, এমনই কত কি দেখিবে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? তবে যাও তুমি যাও,—চিরকালের তরে চলিয়া যাও;—মানবজাতির সুখ দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্য, এবং সুকৃত ও দুষ্কৃতের দুর্ব্বহ বোঝা বুকে লইয়া, অনন্তকালে যাইয়া মিশিয়া যাও। আকাশের ঐ চন্দ্রসূর্য্যকে আরও বহুকাল দেখিব;—আকাশের নক্ষত্রনিচয়, অবনীর পর্ব্বত ও প্রান্তর, সরিৎ-সাগর, গ্রাম ও নগর সমস্তই অনেক কাল দেখিব। কিন্তু হায়! তোমায় ইহ জীবনে আর দেখিব না,—যদি সম্মুখবর্ত্তী অনন্তকালে সর্ব্বতোভাবে সচেতন রহিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল পথে অশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেও, এ বিশাল জগতের কোন স্থলে, তোমায় আর খুঁজিয়া পাইব না!

তুমি বিলয় পাইলে বটে; কিন্তু তোমার অধিকার-কালে মনুষ্য যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, তাহারও বিলয় ঘটিবে কি? কর্ম্মফল অনন্তস্থায়ি। কালের বিলয় আছে, কর্ম্মফলের বিলয় নাই। কাল, চলিয়া যাইতেছে, চলিয়া যাউক; কিন্তু মনুষ্যের নিত্যকর্ম্ম, উত্তরোত্তর অধিকতর নির্ম্মল হইয়া, জগতে নির্ম্মল ও মঙ্গল্য ফল প্রদান করুক।

# ভারতীয় শিল্প।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর, ডাক্তার রায়লি (Roylo) স্যর উইলিয়ম জোন্স; ডবলিউ, ডবলিউ, উইলসন; স্যর, ডবলিউ কানিংহাম; স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহ বহুকাল পূর্ব্বে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ যে সকল জাতি তাহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় পৃথিবীর মধ্যে বরণীয়, সম্মাননীয় বলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা সুসভ্য হইবার বহুপূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যমুনি ঋষিগণ তাঁহাদের অত্যুৎকৃষ্ট বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের কোন বিষয়েরই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস নাই, কাযেই শিল্প, বিজ্ঞানও এ নিয়মের বহির্ভূত হইতে পারে না। এই সকল বিষয়ের প্রাচীনত্বের কথা আলোচনা করিতে হইলে, অনেক

কথা বলিতে হয়, সেরূপ স্থান ও সুযোগ এস্থলে নাই। কেবল সংক্ষেপে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল ও ভারতীয় সুনিপুণ শিল্পীর হস্তপ্রসূত হইয়া প্রাচ্য ভূমিখণ্ডেও বিশেষ আদৃত হইয়াছিল।

আমাদের শিল্পসমূহের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদেশীয় পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বেদের সূক্তগুলি খৃষ্টের আবির্ভাবের অন্ততঃ ১২০০ হইতে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই বেদে পুরাকালে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প ও ললিত কলা প্রচলন থাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে 'বিস্তৃত বাসস্থান' (১৷৩৬৷৪), 'সহস্র স্তম্ভরক্ষিত প্রাসাদ' (২৷৪১৷৫), 'সহস্রদারবিশিষ্ট গৃহ' (৭৷৪৪৷৫), 'চক্রপ্রস্তর' (৩৷২২৷৫) প্রভৃতি বহুল প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয়। অধ্যাপক উইলসন্ তাঁহার বেদের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন,—"There were a manufacturing people; for the art of weaving the labours of the carpenters, and the fabrication of golden and iron mail are alluded to; and what is more remarkable, there were a maritine and mercantile people."

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ঐত্তরীয় ব্রাহ্মণ ও মনুসংহিতাতেও আমরা বহুতর স্থানে হিন্দু শিল্পীদিগের মানসিক শক্তি ও কার্য্যকরী বুদ্ধির পরিচয় পাই। অমর কোষে শিল্পের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—"বাৎস্যায়নোক্ত-নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিশ্চতুঃষষ্টি ক্রিয়াঃ তথা আলিঙ্গন চুম্বনাদি চতুষষ্টিঃ অভ্যন্তর ক্রিয়াঃ কলাঃ। আদিনা স্বর্ণকারাদিকারুকর্ম্মগ্রহঃ। এতৎ সর্ব্বং শিল্পং কথ্যতে।" নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি আলিঙ্গন চুম্বনাদি ১২৮টি বাহ্যাভ্যন্তর ক্রিয়াগুলিও ভরতপ্রস্থান অনুসারে শিল্পশ্রেণীভুক্ত।

বৈদেশিক ভ্রমণকারী, রাজকর্ম্মচারীদিগের গ্রন্থ হইতেও ভারতের শিল্পের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। অনেকে ভারতের অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পের বিপুল যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া তদ্দর্শনার্থ ভারতে আগমন করিয়াছেন। ইজিপ্ত, ব্যাবিলন প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের ভগ্নপ্রায় অতীত স্মৃতির মধ্যকার প্রস্তর-ফলক, লিপি হইতে জানা যায় যে, ভারতের মহান্ ঐশ্বর্য্য এবং শিল্পীর অতুলনীয় প্রতিভা দর্শনে তাহাদিগকে তৎপ্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমাদের দেবমন্দিরের প্রস্তর-ফলক ও দেবদেবীর পোষাক ও অলঙ্কার হইতেও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ভারতের শিল্প আধুনিক নহে; বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাহা উদ্ভাবিত, নির্ম্মিত এবং উৎকর্ষতালাভ করিয়াছে। কিন্তু নিয়তি-চক্রের আবর্ত্তনে ও বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দিগণের প্রতিযোগীতায় বর্ত্তমান সময়ে উহা অবনতির নিম্নতমসোপানে পৌঁছিয়াছে। এখনও যদি তাহার উন্নতি করে আমরা মনোযোগী না হই, গবর্ণমেণ্ট ব

আমাদের দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ তৎপ্রতিকারে যত্নশীল না হন, তবে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমরা দেখিতে পাইব, ভারতের অতুলনীয় শিল্প গৌরব শ্বেতাঙ্গের পদতলে দলিত মর্দ্দিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ১৬৬৫ সালে টেরি ( Terry ) তাঁহার Voyage to the East Indies গ্রন্থে ভারতের লোক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"রেশমী বস্ত্রাদি নিপুণতার সহিত বয়ন করিয়া তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার দক্ষতা ভারতবাসিদিগের দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দ্রব্যাদির সহিত স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা উভয়ই সুন্দররূপে জড়িত থাকে। তাহারা রঞ্জিত বস্ত্রের কিংবা pintadoes আস্তর করিয়া, উজ্জ্বল চিত্রিত তাফাতা ( taffata ) বস্ত্রদ্বারা অথবা সাটিন ও তাফাতার মধ্যে কার্পাস, পশম দিয়া অত্যুৎকৃষ্ট লেপ করিতে পারে। সুন্দর মিশ্রিত রঙ্গের পশম ও কার্পাস দিয়া তিন গজ প্রস্থ সুদীর্ঘ গালিচা প্রস্তুত করিতেও তাহারা অক্ষম নহে। এতদপেক্ষা মূল্যবান্ গালিচার উপর রেশমদ্বারা এরূপ অদ্ভুত কৌশলে পুষ্পাদি অঙ্কিত করে, যে দেখিলে মনে হয় কে যেন সজীব প্রস্ফুটিত প্রসূন গালিচার উপর রাখিয়া দিয়াছে। ইহা অপেক্ষাও মূলবান্—স্বর্ণ, রৌপ্য সংযুক্ত রেশমী গালিচা তাহারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। দেরাজ, বাক্স, ট্রাঙ্ক, কলমদানি ইত্যাদি নির্ম্মাণেও তাহাদের অসাধারণ নৈপুণ্য বিকশিত হইত। এই সকল দ্রব্য হস্তীদন্ত, বড় মুক্তাফল, কচ্ছপের খেলোর সূত্রাদিদ্বার অলঙ্কৃত হইত। তাহারা বাটী এবং এগেট্ ( agate ) ও কর্ণেলিয়ান ( cornelian ) প্রস্তরের অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার প্রস্তর, হীরক ও অন্যান্য কঠিন দ্রব্য কাটিতে পারে। তাহারা বাক্স, সিন্দুক, খাট, ফলাধার বড় সানক প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করে। প্রথমে কাঠ সুন্দররূপে পালিস করিয়া, তরল রৌপ্য বা স্বর্ণ কিংবা অন্য কোন উজ্জ্বল রং দ্বারা তাহার উপর নক্সা কাটে, পরে পরিষ্কার করিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট বার্ণিস প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহারা তসবীর ও আদর্শ দেখিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতেও সুদক্ষ।"

আবুল ফজল বলেন যে, এইরূপ প্রায় তিন শত প্রকারের শিল্প ও ললিত কলা হিন্দুদিগের নিকট পরিচিত ছিল। আমাদের গ্রন্থে চৌষট্টি প্রকারের কলার উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু সেগুলি প্রধান। তাহার এক একটি কলার অধীন অনেকগুলি করিয়া উপবিভাগ আছে। ভারতবর্ষে প্রত্যেক দ্রব্যই হস্তে নির্ম্মিত হইত। তজ্জন্য সুলভ খেলনা বা মৃণ্ময় পাত্রাদি পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে শিল্প দ্রব্য বলিয়া দাবী করিবার অধিকার রাখে।

প্রাচীন ভারতের প্রচলিত সমস্ত প্রকার শিল্প ও কলার উল্লেখ করা সম্প্রতি অসম্ভব। এ প্রস্তাবে আমি কেবল বৃহৎগুলির উল্লেখ

করিয়া পাঠকগণের মনে পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছি।

রাসায়নিক শিল্প। কেমিষ্ট্রী যে দেশে বেসী উন্নতি লাভ করিয়াছিল, রাসায়নিক শিল্প সম্ভতঃ সেই দেশ হইতে উদ্ভূত হয়। প্রাচীন ভারতে Alchemyর সমধিক প্রচলন ছিল; উহা হইতে কেমিষ্ট্রীর উদ্ভব একথা বলা যাইতে পারে। বহুতর প্রমাণ পরম্পরা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ বহুকাল হইতে রসায়নিক দ্রব্যের সহিত পরিচিত এবং অনেক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে। ষ্টীল সমেত সাধারণ ধাতু তাহাদের সুপরিচিত এবং তাহারা দস্তা, টিন, সীসা ও লৌহের অক্সাইড্ (oxides) প্রস্তুত করিত। সুতরাং তাহারা যে, রাসানিক দ্রব্য ব্যবহার ও প্রস্তুত করিতে জানিত তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

প্রধান প্রধান রাসায়নিক শিল্পের অভ্যন্তরে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প অবস্থিত, তন্মধ্যে অনেকগুলির বিশেষ পরিচয় প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রথম ধাতবী বিদ্যা (metallurgy)। যদিও আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, কিরূপে পুরাকালে লোকে লৌহ, ষ্টীল প্রভৃতি তরল করিবার কৌশল পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, তথাচ ইহা ধ্রুব সত্য যে হিন্দুগণ বহুকাল হইতে উহা জানিত এবং অন্যান্য জাতির অপেক্ষা এই কার্য্যে উন্নতি লাভ করিবার পথে যে সকল বাধা বিপত্তি, তাহা তাহারা পরাজয় করিয়াছিল। অনেকেই অবগত আছেন যে, ভারতের ইস্পাতের দ্রব্য, ইয়ুরোপের নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট ইস্পাতের দ্রব্যের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিত। যদিও কোন কোন প্রাচীন সভ্য জাতির নিকট পুরাকালে লৌহ ও ইস্পাত অজ্ঞাত ছিল, আর্য্যগণ কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে তাহাদের ব্যবহার জানিতেন। ভারতের নানা স্থানের লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য দেখিয়া অনেক ভ্রমণকারী অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন। মিঃ হিথ্ (Heath, managing director of a steel and iron factory) লিখিয়াছেন,—"We can hardly doubt that the tools with which the Egyptians covered their obelisks and temples of porphyry and syenite with hieroglyphics were meade of Indian steel." বর্ত্তমান কালের ন্যায় পুরাকালেও যে দুর্গ ও মন্দিরাদির চূড়া ইস্পাতের অস্ত্র দ্বারা মণ্ডিত করা হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহাদের ইস্পাতের দ্রব্য আলেক্‌জেণ্ডার দি গ্রেটের সময়ে বিশেষ আদৃত হইত। পোরাস (Porus) তাঁহাকে প্রায় তিন শত পাউণ্ড ষ্টীল উপহার দিয়াছিলেন। বৈদিককালেও রথসমূহ লৌহ ও ইস্পাতের অস্ত্র শস্ত্র, তীক্ষ্ণধার কুঠারাদিতে সজ্জিত হইত। এখনও উৎকৃষ্ট পারশিয়ান তরবারী, ভারতের ইস্পাতে নির্ম্মিত হয়। মিঃ উইলকিন্‌সন্ বলেন যে, বোম্বাই ও পারস্য-সাগরের (Persian Gulf) সহিত পূর্ব্বকার বাণিজ্যের প্রধান পণ্য—সুবিখ্যাত দামাস্কাস্ ফলাও

( Damascus blade ) ভারতীয় ইস্পাতে নির্ম্মিত হইত।

বর্ত্তমান কালে বিলুপ্ত হইলেও, আমরা পূর্ব্বকালের গৃহনির্ম্মিত বহুতর অস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। চেন ও জরিপের সরঞ্জাম, মস্তক-রক্ষণী, ঢাল, বর্শা, যুদ্ধকুঠার, তীর, ধনুক ইত্যাদি সে কালে নির্ম্মিত হইত। ঋগ্বেদে কথিত আছে, আর্য্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ বর্ম্ম হস্তঘ্ন, চর্ম্ম ( ঢাল ) ব্যবহার করিতেন এবং বর্শা, পরশু, বাশী ( বোধ হয় বাইশ), ধনুর্ব্বাণ ও লৌহাগ্র কাষ্ঠময় বিষাক্ত বাণদ্বারা শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিতেন। রণবাদ্যের মধ্যে দুন্দুভি, ক্ষোণী, কর্করী ও ঢক্কা তাঁহাদের পরিচিত ছিল। তাঁহারা এই সকল দ্রব্যগুলি ব্যবহার করিতে যেমন দক্ষ ছিলেন, নির্ম্মাণ করিতেও তেমনি সুনিপুণ ছিলেন,—আধুনিকদিগের অপেক্ষা তাঁহারা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না। আর্য্যগণ দুই ফলা বিশিষ্ট তরবারী প্রস্তুত করিতেন, ফলার মধ্যস্থানে মুক্তা বসাইতেন এবং এক-খানির মধ্যে আর এক খানি ছোরা এমনই ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া সংযোগ স্থল বন্ধ করিতেন যে, অতি উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণের সাহায্যেও তাহা পরিলক্ষিত হইত না। কোন কোন ছোরা ছুড়িলে পাঁচটি ফলা বহির্গত হইত এবং পুনরায় সুন্দররূপে পূর্ব্ববৎ করা যাইত। এই সকল আদর্শ বহুদেশে আদৃত হইয়াছে। সুতরাং বহু পুরাতন কাল হইতে ভারতীয় ইস্পাত খ্যাতিলাভ করিয়াছে এবং দামাস্কাসের ফলা টোলেডোর ( Toledo ) ফলার খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবার বহু পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পুরাকালে স্বর্ণ রৌপ্যের যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদি নির্ম্মিত হইত, তাহার উল্লেখ না করিয়াও নিবৃত্ত হওয়া যায় না। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ ইহার জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতীয় স্বর্ণকারগণ এত প্রকাণ্ড আয়তনে কার্য্য করিয়াছে যে, কোন বৈদেশিক শিল্পী তদ্রূপ করিবার চেষ্টা মাত্রও করে নাই। বেদের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারের উল্লেখ আছে। অঙ্গুরীয়, চিত্রিত কণ্ঠমালা ( ২।৩৩।১০ ), সুবর্ণকুণ্ডল, মল, মেখলা ( ২।২২।১৪ ), বলয় ( ৪।৫৩।৪ ) প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। 'রুক্ম' নামক আর এক প্রকার অলঙ্কারের নাম পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকগণ আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত 'শালগুঞ্জিকা' ( ৩।৩২।২৩ ) ব্যবহার করিতেন। বর্ত্তমান কালের কারীকরগণ তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের সেই অমানুষিক প্রতিভা ও অনতিক্রমণীয় নৈপুণ্য লাভ করিতে না পারিলেও পৃথিবীর অনেকানেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রতিযোগিতায় উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে।

কাঁসা, তামা, বিদ্রী, কাঁচ প্রভৃতি বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত ছিল। তাহারা মীনাহের কার্য্যে, যোড় দিতে, বস্ত্রাদি পরিষ্কার ও রঞ্জিত করিতে, কালিকো ও অন্যান্য শিল্পকার্য্যে এবং বিভিন্ন প্রকারের হাঁড়িকুড়ি ও মৃণ্ময় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে বিশেষ পারদর্শী

ছিল। সর্ব্বশেষে আর একটি কথা বলিতেছি যে, তাহারা সাবান, বার্ণিশ, মোহর করা মোম, কাগজ এবং চামড়া প্রস্তুত করিতেও পারিত। ভিস্তিরা চর্ম্মদ্বারা রাজপথ জলসিক্ত করিত; আর্য্যগণ বহুবিধ জুতা ব্যবহার করিত।

তান্তব দ্রব্য। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলে একখানি প্রকাণ্ড মহাভারত হইয়া পড়ে। আমরা সংক্ষেপে গুটিকতক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া এই বিষয়ের উপসংহার করিব। তান্তব দ্রব্য নির্ম্মাণের সহিত আমরা পূর্ব্বকালের সভ্যতা, রুচি এবং উচ্চশ্রেণীর শিল্প সমূহের উন্নতির প্রমাণ পাই। শরীর আবৃত ও সজ্জিত করাই মনুষ্যের একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষা। কার্পাস, রেশম, পশম—তান্তব দ্রব্যের প্রধান উপাদান; উহা নানা প্রকার দ্রব্যে পরিণত করিতে মনুষ্যমস্তিষ্কের বিশেষ পরিশ্রম হইত। কাজেই অন্য কোন বিষয়ের ইতিহাস অপেক্ষা ইহার ইতিহাস অধিক কৌতুকাবহ,—ইহাতে জনসাধারণের কল্যাণকর বিষয় বিবৃত আছে।

যে সময় হইতে ইতিহাস লিখিত হইতেছে, সেই সময় হইতে পূর্ব্বদেশ তান্তব দ্রব্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ এবং বিলাতী যন্ত্রের আবিষ্কার সত্বেও ভারতবর্ষ এখনো 'হাওয়ার চাদরের' (webs of woven air) জন্য প্রাধান্য রক্ষা করিতে সক্ষম। বিদেশীয়গণ 'the shadow of a commodity' বলিয়া উহার সম্মান হ্রাস করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিল।

কার্পাস। ঋগ্বেদের সময় হইতে কার্পাস এবং উহার সূতার ব্যবহার ভারতবর্ষে প্রচলিত। তৎকালে বস্ত্র বয়নের চারিটি মূ উপাদান ছিল,—পশম, চর্ম্ম, কার্পাস এবং মেষলোম (৩।৫।৪)। শ্বেতবস্ত্রই তৎকালে বিশেষ আদৃত হইত। স্ত্রীলোকগণ টানা ও পড়েন দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিতে বিশেষ পটু ছিল (৬।৯।২)। মনুসংহিতাতেও তন্তুবায়গণের উল্লেখ ও তাহাদের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে।

কাপাস-কাটা ভারতের স্মরণীয় বিষয়। পৃথিবীর কার্পাস দ্রব্য নির্ম্মাণের [illegible] অবস্থার দ্রব্য—গরভ, গাজী প্রভৃতি কঠিন কার্পাস দ্রব্য এবং উহার চরমোৎকর্ষের নাম মস্‌লিম বা মলমলখাস, ভোগবিলাসী মোসলমান বাদসাহগণের সময়ে বিদেশেও শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল। নুরজাহান এই ব্যবসায়ের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে, ৪০০ টাকার কমে তিন গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া একখণ্ড পাতলা মস্‌লিম প্রস্তুত হইত না। নবাবী আমলেই যে, ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা উহার প্রচলিত নামগুলি হইতেই অনুমান করা যায়। যখন ইজিপ্তের পিরামিড্‌ নির্ম্মিত হয়, জেরুজিলামে শোলমন রাজত্ব করেন, রোমিউলাস্‌ রোমনগরী আবিষ্কার করেন, হারুণ-অল-রসিদ বোগদাদে যাত্রা করেন, সে সময়েও ভারতে 'আব-রোয়ান' (Running

water,—প্রবাহিত জল।) 'সব-নম' ( Evening Dew—সান্ধ্য-শিশির ) প্রভৃতি বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই বস্ত্র সমূহের গুণ এই যে, নদীবক্ষে বা শিশির সিক্ত স্থানে উহা পাতিয়া দিলে, জল বা শিশিরের সহিত এমনি ভাবে মিশিয়া যায় যে, হঠাৎ আর উহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঢাকার মস্‌লিন্‌ সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখিতে হইলে, স্বতন্ত্র একখানি পুস্তক হয়। তবে সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, মোসলমান রাজত্বকালে উহা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোসলমান রাজত্বাবসানে—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে উহার অবনতিসূচিত হইয়া, বর্ত্তমান সময়ে এই দারুণ শোচনীয় দশায় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে মসলিনের মূল্য চারি শত টাকা ছিল এখন সেই মসলিম দশ টাকায় বিক্রীত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার কেবল এক জন মাত্র শিল্পী এইরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নে সক্ষম। সময়ের কি বিচিত্র গতি।

যে উপায়ে তুলা হইতে এইরূপ কোমল ও মসৃণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা অতি সহজ। তাঁত, টেকুয়ার দণ্ড এবং চর্কা প্রাচীনদিগের ইহাই সম্বল ছিল। এই সকল যন্ত্র বাঁশ, দড়ি, বেত বা বাখারি, শণ প্রভৃতি যৎসামান্য উপকরণে নির্ম্মিত হয়। হিমালয়ের তুষারধবল সুউচ্চ শৃঙ্গ হইতে কোমরিনের তীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই কার্পাস দ্রব্য বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বকালে কার্পাস দ্রব্য সমূহ দেশ বিদেশে কিরূপ প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা বিদেশীয়দিগের মুখেই শ্রবণ করুন;—"India in times past not only clothed her own people with her own cotton, but the European including the small British demand for cotton-goods or calicoes before the seventh century was met by importations from India itself." ভারতবর্ষ নিজের কার্পাস দ্বারা কেবল যে তাহার নিজের সন্তানকে বিভূষিত করিত তাহা নহে, সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে ক্ষুদ্র বৃটনের সহিত ইয়ুরোপীয় দেশ সমূহেও ভারতবর্ষের কার্পাস দ্রব্য বা কালিকোবস্ত্র আমদানী হইত। আর্য্য বিজয়ের পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও অধিকাংশ জনসাধারণ কার্পাস ব্যবসায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিত।

ভারতের এই সকল দ্রব্য অতি গৌরবের সামগ্রী। বিলাতি মস্তিষ্ক প্রসূত কল কারখানা হইতে বহুবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া দেশে আদৃত হইলেও, সুখের বিষয় আমাদের হস্ত নির্ম্মিত মাকড়সার জালের মত পাত্‌লা ও সুকোমল বস্ত্র সমূহ বর্ত্তমান সময়েও বিলাতীবস্ত্র হইতে বহুঊর্দ্ধে আসন প্রাপ্ত হইতেছে। উৎকৃষ্ট কার্পাসের জন্য যে, এইরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, এ ধারণা ভ্রান্ত, কারণ ইংরেজতন্তুবায়গণ বলিয়াছেন যে, ভারতীয় কার্পাস হইতে অতি কোমল সূত্র বাহির হয় না। এইরূপ উৎকর্ষতার

একমাত্র কারণ, ভারতীয় তন্তুবায়গণ প্রত্যেক কার্য্য অতি সতর্কতার এবং নিপুণতার সহিত নির্ব্বাহিত করে। আমি শুনিয়াছি যে, তূলা হইতে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১২৬ রকম ছোট বড় কার্য্য করিতে হয়। বিদেশীয়গণ একটি কার্য্যে এত সময় অতিবাহিত করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তাহাদের নিকট সময় বৃথা অতিবাহিত করা ঘৃণনীয়।

রেশম। ভারতবর্ষ চিরকাল তাহার স্বর্ণ রৌপ্য খচিত রেশমী বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। রামায়ণ ও মহাভারতেও অত্যুৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বার্ডউড্ সাহেব বলেন, "ইউলিসিস ট্রয়নগরের হেলেনকুমারী, সোলমন, রাণী এসথার এবং হেরড—ইঁহারা কিন্কব বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন।" যৎকালে হেরড্, টাইরি এবং সিডনের বণিককুলের মধ্যে তাঁহার শেষ বক্তৃতা করেন, জোসেফাস বলেন, তিনি তৎসময়ে রৌপ্য খচিত 'রূপারি' নামক ভারতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ইয়ুরোপীয় সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী, এবং যুবরাজগণ (অবশ্য এসিয়ার সম্রাট্গণ নহেন), চাঁদ তারা (চন্দ্র এবং তারকা), 'মাজচর' (রৌপ্য তরঙ্গ) 'ডাপ-চন' (সূর্য্য কিরণ এবং ছায়া), বুলবুল-কাটন' (বুলবুলের চোক্), 'ময়ূরগলা' (শিখী-স্কন্ধ) 'এবং শীকার ঘর' প্রভৃতি খাঁটি স্বর্ণ অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত ভারতীয় রেশমী বস্ত্র সকল অতি আহ্লাদের সহিত ব্যবহার করিতেন। মেকলে বলেন, বেনারসের চর্কানিঃসৃত রেশমীবস্ত্র দ্বারা সেণ্ট জেমস এবং পেটিট্ ট্রিয়ানের (Petit Trianon) চূড়া সুশোভিত হইয়াছিল।' চীন, জাপান এবং বিলাতী রেশমের ঘোরতর প্রতিযোগীতা সত্ত্বেও—সুরাট্, আহম্মদনগরের রেশমী দ্রব্য, আহম্মদাবাদ, বেনারস, হায়দারাবাদ, সিন্ধ্ প্রভৃতির স্বর্ণ রৌপ্য খচিত রেশমী বস্ত্র বৈদেশিক বিপণীতে বিক্রীত হইতেছে। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কাট্তির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা খুব কম। মালবেরি রেশম, তসর, এড়ি, মুগা, ক্রিপুলা এবং বর্ম্মার রেশমী ২০। ২৫ লক্ষ টাকার দ্রব্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর দ্বারা বিদেশে প্রেরিত হইত।

পশম। অন্যান্য তান্তব দ্রব্যের ন্যায় পশমী দ্রব্যও বহুকাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। উহার ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, বহুপুরাকালের নানা কথার অবতারণা করিতে হয়। পূর্ব্বকালে মেষচর্ম্ম যেমন পাত্র আবৃত করিতে ব্যবহৃত হইত, তদ্রূপ তাহার পশমও কোন না কোন প্রকার বস্ত্র বয়নে প্রযোজিত হইত। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশ ভারতবর্ষে কখনো পশমী দ্রব্য পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তাহার উত্তর এই যে, ভারতের আব হাওয়া বৎসরে অনেকবার পরিবর্ত্তিত হয়; এবং এই পরিবর্ত্তনের জন্যই শাল, পট্টু, মেরিনো প্রভৃতির উদ্ভব। পুরাকালে বিবাহ সময়ে মেষলোমের বস্ত্র

ব্যবহৃত হইত এবং যৌতুকরূপে উহা উপহার প্রদত্ত হইত।

পশমী দ্রব্যের আলোচনায় শালের ইতিহাস নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের শালের প্রধানত্ব প্রমাণ করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না। বাল্মীকি বর্ণিত সীতাদেবীর রেশমী উত্তরীয়—হীরেণের মতে কাশ্মীরী শাল ভিন্ন আর কিছু নহে। (Vide Heeren's Historical Researches) পূর্ব্বকালে ত্রিশ হাজার শালের চর্কা অনবরত কার্য্য করিয়াও লোকের অভাব মিটাইতে পারিত না। উৎকর্ষতা অনুসারে এই শাল—তরল সূর্য্যরশ্মি, পতিত সলিল প্রভৃতি আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

গালিচা। তান্তব দ্রব্যের মধ্যে গালিচা আর একটি উল্লেখ যোগ্য দ্রব্য। দেশের জলবায়ুর প্রকৃতি অনুসারে লোকের বস্ত্রাদি নির্ম্মিত হয়। প্রাচ্য জাতির মধ্যে যাঁহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করেন, তাঁহারা সচরাচর নির্ম্মুক্ত সমীরণে উপবেশন করেন। সুতরাং গালিচা, ডুরি, মাদুর প্রভৃতির উন্নতি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মুলতান, মৃজাপুর, তাঞ্জোর, হায়দারাবাদ, গোরক্ষপুর ও ক্ষীরপুর হইতে এখনো অতি উৎকৃষ্ট গালিচা আমদানী হয়।

হস্তনির্ম্মিত শিল্প। এই দফায় সুচিক্কণ জরীর কায প্রথম উল্লেখযোগ্য। ভারতের সূক্ষ্ম এবং জরীর দ্রব্য ইয়ুরোপের বিপণীতে অতিশয় আদৃত হইত, এবং বর্ত্তমান সময়েও হইতেছে। অলঙ্করাদি ইহার উৎপত্তি এবং পূর্ণতা সম্বন্ধে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

প্রস্তর এবং কাষ্ঠ খোদাইর কাযও প্রাচীন ভারতে পূর্ণতালাভ করিয়াছিল। ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আর্য্যদিগের দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিলে এবং বর্ত্তমান সময়েও যে সকল মন্দির ও দেবালয় জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে তৎপ্রতি নেত্রপাত করিলেই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরাকালে ভারতের শিল্পের অবস্থা এইরূপ উন্নত ছিল। একটি ক্ষুদ্র ভারতীয় পল্লীতে সমস্ত প্রকার প্রয়োজনীয় শিল্প উৎপন্ন হইত। স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্ বলিয়াছেন,—"ভারতের কোন একটি পল্লীতে প্রবেশ কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাস্তার ধারে উচ্চভুমির উপর বসিয়া কুম্ভকার তাহার সুনিপুণ হস্তদ্বারা চাকা চালাইয়া মাটীর বাসন প্রস্তুত করিতেছে। তাহাদের গৃহের পশ্চাতে অপ্রশস্ত পথের ধারে দুই তিন খানি তাঁতে নানারূপ সূত্র ও জরির কায হইতেছে; তাঁতের কাঠাম achcacia বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে বিলম্বিত, তাহার পার্শ্বে বসিয়া তন্তুবায় কাপড় বোনাইয়া যাইতেছে ঐ সকল বৃক্ষ হইতে পীতবর্ণ পুষ্প সকল তাহার উপর পতিত হইতেছে। রাস্তার উপরেই কাংস বা তাম্রকারগণ হাতুর পিটিয়া দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; এবং আর একটু অগ্রসর হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনীব্যক্তির গৃহের বারান্দায় বসিয়া স্বর্ণকারগণ

টাকা মোহর গলাইয়া চতুর্দ্দিকস্থ ফলফুল হইতে অথবা পদ্মবন সমন্বিত জলাশয়ের তীরে অবস্থিত তাল ও আম্র বাগানের মধ্যস্থিত সউচ্চদেবালয়ের গাত্রে অঙ্কিত বা খোদিত মূর্ত্তি হইতে আদর্শ গ্রহণ করতঃ ইয়ারিং চন্দ্রহার, বালা, মঞ্জির, অনন্ত প্রভৃতি স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে। অপরাহ্ন তিন চারি ঘটিকার সময় সমস্ত জন-পথ সীমন্তিনীগণের উজ্জ্বল বস্ত্রের আভায় আলোকিত হইয়া উঠে। গৃহ লক্ষ্মীগণ কেহ কেহ ২।৩টি কুম্ভ কক্ষে কিংবা হস্তে ও মস্তকে করিয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে জল আনয়ন করিতে বহির্গত হয়। যখন তাহারা শ্রেণীবদ্ধ ভাবে জল আনয়নার্থ গমন করে বা জল লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখনকার সে দৃশ্য দেখিলে টিটানের Titan জাহাজের পালির কথা মনে পড়ে। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষকগণ মাঠ হইতে শান্ত ধেনুগণ লইয়া গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করে, তাঁতবন্দ হয়, কর্ম্মকার গৃহ নিস্তব্ধ হয়, বয়োজ্যেষ্ঠগণ বাড়ীর দরজার নিকট সমবেত হন, স্বল্পান্ধকারের মধ্য হইতে প্রদীপের জ্যোতি প্রকাশিত হইতে থাকে, আহারাদির কলরব এবং সঙ্গীতের সুখতান চতুর্দ্দিক হইতে কর্ণে প্রবিষ্ট হয় এবং রাত্রি একটু বেসী হইলে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ আরম্ভ হয়। অতঃপর সকলে নিদ্রিত হয়। প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপণ করিয়া পুনরায় তাহারা প্রাত্যহিক কার্য্যে নিযুক্ত হয়।”

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের পল্লীবাসিগণ এই রূপে প্রাত্যহিক কার্য্য সম্পন্ন করিত; এবং বিলাসিতা হীন সরল ও মিতব্যয়ী লোকগণের সহিত সুখে জীবনাতিবাহিত করিত। তাহারা কখনো ধর্ম্ম ত্যাগ করিত না, স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহা উপায় করিতে পারিত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। তাহাদের সাহিত্য শিল্প এবং সভ্যতা চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণতা লাভ করিয়া জগতের চক্ষু বিমোহিত করিয়াছিল।

কিন্তু সে সময় এখন ইতিহাসের ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছে। আমাদের জন্য কেবল সুকরুণ স্মৃতিটুকু রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আলোচনা করিয়া আমরা ধীরে ধীরে অবনতি এবং দুর্ভাগ্যের নিম্নতম গহ্বরে নিমজ্জিত হইতেছি, উত্থানের উপায় উদ্ভাবন আমাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তির বহির্ভূত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় শিল্পিগণ —যাহাদের নিমিত্ত সমগ্র জগৎ তিন হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবার্ষে অনবরত অর্থ বর্ষণ করিয়াছে; যাহারা অত্যুৎকৃষ্ট জরির এবং অন্য মূল্যবান্ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়াও কোন নদীর জল অপবিত্র করে নাই, কোন স্থানের দৃশ্য অপকৃষ্ট করে নাই কিংবা কোন বায়ু বিষাক্ত করে নাই, যাহাদের দক্ষতা এবং বংশানুক্রমিক যোগ্যতা পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছিল, সেই ব্যবসায়ী শিল্পিগণ আজ দলে দলে হাজারে হাজারে সুখময় পল্লীসমাজ ত্যাগ করতঃ গবর্ণমেণ্টের অন্নছত্রে প্রবেশ করিতেছে, এক স্থান হইতে মাটী

কাটিয়া তাহাদের নিস্তেজ মস্তকে বহন করিয়া অন্য স্থানে ফেলিতেছে এবং তদ্দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতেই কোন প্রকারে কায়ক্লেশে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া নশ্বর দেহে অবিনশ্বর আত্মাকে পোষণ করিতেছে।

সকলই স্বীকার করিবেন যে, ভারতীয় শিল্প এবং ললিতকলা দিন দিন মৃত প্রায় হইতেছে। বৃটীশসিংহের দুই শতাব্দীকাল রাজত্বের পর আজ দেশের সর্ব্বত্র হইতে যে অরুন্তুদ ক্রন্দন-রোল উত্থিত হইতেছে, তাহা কেহই প্রশান্ত চিত্তে শ্রবণ করিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে যাঁহা অপেক্ষা অধিকতম অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া সুকঠিন, সেই স্যর জর্জ বার্ডউড্ মহোদয়ই তাঁহার পুস্তকে এই বিলাপধ্বনি উত্থিত করিয়াছেন এবং প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দেশীয় শিল্পের অবনতিতে ভারতবর্ষের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। স্যর আলেকজেণ্ডার কনিংহাম, মিসেস্ ফারগুসন এবং হারিংটন ভাস্কর্য্য, স্থপত্য প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারাও এই মতে মত দিয়াছেন। স্যর জেমস্ কার্ড (caird) এবং ডাঃ জর্জ্জ ওয়াটের নামও ভারতে অপরিচিত নহে, তাঁহারাও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশীয় শিল্প এবং কার্য্যকারকগণের দিন দিন কার্য্যের অভাব হইতেছে। কএক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ সেমুয়েল স্মিথ, হাউস অব্ কমনস্ গৃহে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে হস্ত-শিল্প দ্বারা দশ পনর লক্ষ লোক জীবীকা অর্জ্জন করিত, তাহা বৈদেশিক শিল্পের প্রবর্ত্তনে বিনষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সহস্র প্রকারের বিভিন্ন শিল্পী এবং শ্রমজীবী বর্ত্তমান আছে, তাহাদেরও অদৃষ্ট বাত্যাতাড়িত কদলী বৃক্ষের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে। এখন যদি তাহাদিগকে সাহায্য করা না যায়, তবে অচিরেই তাহারা দেশের সমূহ ক্ষতি করিয়া অন্তর্হিত হইবে। প্রাচীন শিল্পের অবনতির দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিলে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ না করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিতে পারেন না। মহীশুর, লক্ষৌ এবং কাশ্মীরের জহরতের; কটক, ঢাকা, মুর্শিদাবাদের জড়াও কাজ, জয়পুরের মীনাহ ও মসলিনের কাজ; পেশোয়ার, বর্দ্ধমানের লৌহদ্রব্য, আগ্রার প্রস্তরের কার্য্য; চট্টগ্রামের বেতের কার্য্য; মুলতানের উজ্জ্বল মৃণ্ময় দ্রব্য; লাহোর, অমৃতসর এবং বেনারসের গালিচা ও কম্বল এবং হস্তীদন্তের ও চামড়ার খেলনা প্রভৃতি সহস্র প্রকারের কার্য্য কি জন্য দেশ হইতে বিলুপ্ত হইতেছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ একবার কি তাহা স্থির চিত্তে বিবেচনা করিবেন? কটন মহোদয় লিখিয়াছেন, গালিচা প্রস্তুত, সুক্ষ্মকারচুরি, জুয়েলারি, ধাতব কার্য্য, তরবারি, জিন লাগাম, খোদাই, কাগজ প্রস্তুত, এমন কি গৃহনির্ম্মাণ প্রণালীও লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষ, ইংলণ্ডকে কাঁচা মাল যোগাইতেছে এবং সে তৎপরিবর্ত্তে তাহার যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত তৎপ্রতি লোলুপ-নেত্রে

দৃষ্টিপাত করিতেছে। অন্যান্য ইংরেজগণও বলিতেছেন যে, ভারতীয় হস্তশিল্প—যাহার প্রত্যেকটি নিজ নিজ সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা ইংরেজগণের প্রতিযোগিতাস্বরূপ কিংবা ভ্রান্ত সংস্কারকস্বরূপ উপস্থিত হওয়াতেই বিনষ্ট হইয়াছে। স্যার আলফ্রেড্ লায়াল সত্যই বলিয়াছেন,—"রোমকদিগের সময় হইতে আমাদের সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্য ইয়ুরোপীয় স্বর্ণ রৌপ্য চুষিয়া লইয়াছে।" কিন্তু আমাদের পক্ষে কি কষ্টের কথা যে, বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় শিল্পিগণ উপেক্ষিত হইয়া মৃত প্রায় হইতেছে এবং সেই ঐশ্বর্য্যশালী ভারতবর্ষ এখন ঘৃণিত ভিক্ষুকের ন্যায় জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমোদের শিল্পের অবনতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, বিভিন্ন প্রকারের বহুতর শিল্পী জীবনোপায় সংগ্রহের নিমিত্ত কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্যেক শিল্পের উপর মৃত্যুর করাল ছায়া পতিত হইয়াছে এবং অচিরেই তাহা অতীতের চির অন্ধকারময় শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল জ্বালার উপশম করিবে।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

# অভিশাপ।

## নবম পরিচ্ছেদ।

### শচীকান্তের উদ্বেগ।

আশ্বিন মাস আগত প্রায়। মাণিক নগরের রায়দের বাড়ী পূজায় মহাধূম, এ প্রদেশের মধ্যে এত ধূম আর কোথাও হয় না। গত বৎসর বড় বাবু গত হওয়াতে আমোদ প্রমোদ কিছু কম হইয়াছিল বলিয়া, এবার যাহাতে কোন বিষয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, শচীকান্ত বাবু তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আয়োজন করিতেছেন। একণে যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ ও সংসারের অন্যান্য সকল বিষয় তাঁহাকেই দেখিতে হয়, কারণ বড় বাবুর মৃত্যুর পর ইহাতে সকল ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

শচীকান্ত বাবু উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের অনেক ভরসা রাখেন, তিনিই এখন খুল্লতাতের প্রধান সহায়। সত্যেন প্রায় পাঁচমাস হইল অসুস্থতার কারণ কলিকাতায় গিয়াছেন, এক্ষণে বাটী আর না আসিলে চলে না। ছোট বাবু সত্যেনকে বাটী আসিবার জন্য দুই তিন খানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি কোন না কোন ওজর করিয়া লিখিয়াছেন শীঘ্রই আসিবেন। শচীকান্ত বাবু বাটীর মধ্যে একমাত্র পুত্র সত্যেনের বাসনার বিরুদ্ধে কিছু করিতে ইচ্ছা করেন না। তাঁহার মনের কথা, সত্যেন যাহা

করিয়া ভাল থাকে, তাহাই করুক। তিনি জানেন যে ইচ্ছা করিলেই সত্যেনকে বাটীতে আনিতে পারেন। সত্যেনের সন্তোষে তাঁহার বাটীর সকলেরই সন্তোষ। প্রকৃতই শচীকান্ত বাবু তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। অগ্রহায়ণ মাসে সত্যেনের বিবাহ স্থির করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি ভাবে খরচপত্র করিবেন, কি ভাবে আমোদ আহ্লাদ করিবেন, বধূমাতাকে কিকি গহনা দিবেন এখন হইতেই চিন্তা করিয়া থাকেন। তাঁহার মনের সাধ এ প্রদেশে যাহা কখনও হয় নাই, তাহা ভ্রাতষ্পুত্রের বিবাহে করিবেন।

বলিতে ভুলিয়াছি কুসুমহাটীর বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত সত্যেনের কোষ্টীর ভালরূপ মিল হইয়াছে। কন্যাটি প্রকৃতই লক্ষণযুক্তা। আশ্বিন মাসে পূজার পর আশীর্ব্বাদ হইবে।

কয়েকখানি পত্র লেখাতেও যখন সত্যেন্দ্র নাথ বাটী আসিলেন না, তখন শচীকান্ত বাবু মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার বাটী না আসার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক তিনি বয়স কাল বিবেচনা করিয়া ভ্রাতষ্পুত্রকে আর কলিকাতায় থাকিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। হঠাৎ একদিন মনে হইল, হয়ত অমর সত্যেনের বাটী না আসার প্রকৃত কারণ অবগত থাকিতে পারে। অমর নাথকে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার নিজ বাটীতে কোন প্রয়োজনের কারণ কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। তিনি কলিকাতায় দুইতিন সপ্তাহ মাত্র ছিলেন।

শচীকান্ত বাবু অমর নাথকে ডাকাইলেন। অমর সংবাদ পাইবামাত্র, নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—

অমর! তুমি এর মধ্যে সত্যেনের চিঠি পত্র কিছু পেয়েছ কি?

আজ্ঞা হাঁ, অনেক দিনের পর এই সোমবার দিন একখানা চিঠি পেয়েছি।

কি লিখেছে?

সব ভাল আছে আস্‌বে লিখেচে।

সে বাড়ী আস্‌চে না কেন কিছু বলতে পার?

আমি প্রতি চিঠিতেই আসবার জন্য লিখি,—তার বিশেষ কিছু উত্তর দেয় না।

আমার ২।৩ খানা চিঠির উত্তরেই লিখেচে শীঘ্র যাব। পূজা ক্রমে নিকটে আস্‌চে, তার না আস্‌বার কারণ কি কিছু বুঝতে পারচি না।

আমি মনে করচি যে, একবার সত্যেন দার কাছে যাব।

শচীকান্ত বাবু হর্ষান্বিত হইয়া বলিলেন,— আমিও মনে করেছিলাম যে, তোমাকে একবার যেতে বল্‌ব। তা তুমি কাল যাইলেই ভাল হয়। আমি একটি ভাল দিন দেখে দি, তুমি আমার নাম ক'রে আস্‌তে বল্‌বে এবং সম্মত হলে সব এক সঙ্গেই আস্‌বে।

ছোট বাবু একজনকে পাঁজিখানা দিতে বলিলেন, তৎপরে নিজেই দেখিয়া বলিলেন,—

"এর মধ্যে দিন তেমন ভাল নাই। ও মাসের ৪ঠা একটা দিন আছে। আচ্ছা তুমি যাও, যদি ঐ তারিখে আসা মত হয়, সংবাদ পাইলেই আমি আসবার সব উদ্‌যোগ করিয়া দিব।"

অমরনাথ আগত-কল্য কলিকাতায় যাইবেন স্বীকার করিয়া বিদায় হইলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ।

### দুই বন্ধুতে।

"এখনো উপায় আছে। সামান্য লজ্জা ও আত্মীয় জনের অপ্রীতির ভয় করিতে গিয়া, নিজের বাসনার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিয়া সারা জীবন যাতনা ভোগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কাজ। আর যদি বল কথা দেওয়া হইয়াছে, অবশ্য ভদ্রলোকের কথার ঠিক থাকাই উচিত, কিন্তু তা বলিয়া সকল বিষয়ে নহে। বিবাহ একটি সামান্য বিষয় নয়।"

সম্মুখে কলনাদিনী ভাগীরথীর বীচিমালা ভীষণ ঝটিকাস্পর্শে আলোড়িত হইয়া তরণী শ্রেণীকে আন্দোলিত করিতেছে। নাবিকগণ ও মাঝিগণ ব্যস্ত ও ভীত হৃদয়ে নিজ নিজ নৌকা সাবধান করিতেছে। আকাশে কৃষ্ণ মেঘ চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। আর পশ্চাতে কলিকাতার জনাকীর্ণ রাজপথ সকল ধূলিকণায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গাঢ় ভাব ধারণ করিয়াছে।

নদী তীরে যে যুবক উল্লিখিত বাক্য বলিলেন, তাঁহার হৃদয়েও প্রকৃতির ন্যায় ঐরূপ প্রবল ঝটিকা বহিতেছে, তাঁহার হৃদয়ও ঐরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর সেই কারণেই বুঝি বাহ্যিক প্রকৃতির এই ভীষণ ভাব তাঁহার অনুভূতির বিষয় হইতেছে না।

বন্ধুবর সত্যেন্দ্রনাথের কথায় অমর উত্তর দিলেন,—"বিবাহ সামান্য বিষয় নয় তাহা সত্য, কিন্তু বিনা কারণে কাহাকেও আশা দিয়া নিরাশা করা কি ভদ্রোচিত কার্য্য? আর, তাহা ভিন্ন সে কন্যাটিকে তোমার এত অমতেরই বা কারণ কি? আমি শুনিয়াছি এবং আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস কুসুমহাটীর মেয়েটি পরমা সুন্দরী। সুন্দরী না হ'লে তোমার কাকা কখনই মত কর্‌তেন না। আর তিনি আমায় নিজে বলিয়াছেন, যে, বালিকা বিশেষ সুলক্ষণা এবং তোমার কোষ্ঠীর সহিত তার কোষ্ঠীর বেশ মিল হয়েছে।"

"অমর! ভাই বালিকা সুন্দরী ও সুলক্ষণা হইতে পারে, আর আমার সহিত তাঁর কোষ্ঠীরও মিল থাকিতে পারে, কিন্তু আমার সহিত তাহার প্রাণের মিল হইবে কি না সন্দেহ।"

"কেন সত্যেন দাদা, আজ তোমার মুখে নূতন রকমের কথা শুনিতেছি, প্রাণে মিল না হবার সম্ভাবনা কিসে দেখিলে?"

"ভাই অমর, তোমার কাছে কোন কথা লুকাব না, আজ কয় মাস ধরিয়া যে কথা হৃদয় মাঝে লুকায়িত রাখিয়াছি, সে ঘটনার পরিণামে হয় ত আমার হৃদয়কে মরুভূমিতে

পরিণত করিবে,' যে সীমাহীন সমুদ্রে রত্ন আশায় ঝাঁপ দিয়া জীবনতরীকে অতল তলে নিমগ্ন করিতে চলিয়াছি, জানি না তথা হইতে কখনও উঠিতে পারিব কি না। এখন আমার হৃদয়ে যে তুমুল ঝটিকা বহিতেছে, তাহা আজি তোমার সম্মুখে খুলিব; আর কাহাকেও সে গোপনীয় কথা বলিব না। তুমি ঘৃণা করিতে হয় করিও, কোন সদুপদেশ থাকে বলিও, পারি শুনিব।"

অমর নাথ সত্যেনের কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, সত্যেন পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তবে শোন। ভাই অমর, আমি এখানে এক যুবতীকে ভাল বাসিয়াছি। বলিতে কি, যদি হিন্দু শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আমি তাহার এক প্রকার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। সে পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলের একটি বিধবা বালা। আমার আজন্ম ধরিয়া যে বিশ্বাস আজিও তাহাই আছে, আমার উপস্থিত মুহূর্ত্তেও মনের ধারণা প্রণয় পবিত্র, উহাতে পাপ নাই। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতায় মহাপাপ। আমার যে সামান্য ভালবাসার প্রতিদানে সরলা যুবতী হৃদয়ের সর্ব্বস্ব আমারই জন্য উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। ভাইরে, যদি সুহৃদ্ হও, যদি প্রেমের পবিত্র সুবর্ণ-জ্যোতি একদিনের তরেও তোমার হৃদয় আলোকিত করিয়া থাকে, আশা করি, তাহা হইলে আমায় আর বাধা দিবে না; কুসুমহাটির সেই কোমলহৃদয়া নির্ম্মলা বালিকাকে জীবনে মৃত্যু যাতনা দিবার জন্য বিবাহ করিতে আর অনুরোধ করিবে না। আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। অবশেষে মনে স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি বালিকাকে বিবাহ করিব।"

অমর নাথ, সত্যেনের কথা শুনিয়া অকস্মাৎ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার এইমাত্র মনে হইতে লাগিল,—'সত্যেন না বুঝিয়া মহা অন্যায় কাজ করিয়াছে, না জানি অদৃষ্টে কি আছে!'

প্রকৃত পক্ষেই সত্যেন অন্যায় করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি প্রেমে আত্মহারা হইলেও, প্রথম প্রথম যে একেবারেই বুঝেন নাই, আমরা এরূপ বলিতে পারি না। বুঝিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যাহা সচরাচর হইয়া থাকে, তাহাই হইয়াছে। প্রেমের ক্ষমতা অসীম, তাহার নিকট সকলই ভাসিয়া যায়। নূতন যৌবনের সহিত মানব হৃদয়ে যখন নবীন আশা, বাসনা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মুকুলিত হইয়া মনোমধ্যে এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যাপ্ত করিতে থাকে, যখন অন্তরে এক অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা উদিত হইয়া, তাহার পরিতৃপ্তি সাধনের জন্য মন প্রাণকে সর্ব্বদা লালায়িত করিতে থাকে, যখন এক অদম্য পিপাসা মনুষ্য হৃদয়কে আকুলিত করিতে থাকে, তখন কোন্ যুবক সম্মুখে অমৃত পূর্ণ ভাণ্ড দর্শন করিয়া

বাসনা বা পিপাসা দমন করিতে সমর্থ হন? তখন ভবিষ্যতের অন্ধকারময় পরিণামের প্রতি চাহিয়া কে উপস্থিত সুখের পথ ত্যাগ করিতে যায়? সত্যেন সামান্য মানব তিনি তাহা পারিবেন কি প্রকারে?

অমর কিছুক্ষণের পর বলিলেন,—"সত্যেন দাদা, এ সব কি স্বপ্ন না সকলই সত্য? যদি সত্যই হয়, তবে কেন ভাই, এত দিন এ বিষয় আমার নিকট অজ্ঞাত ছিল? বাসনানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য পবিত্র ভালবাসায় পাপ নাই সত্য, কিন্তু যে ভালবাসা আত্মীয় গুরুজনের চক্ষে, সমাজের চক্ষে দূষণীয়, যে প্রণয়ের প্রভাবে মনকে সঙ্কুচিত করে, তাহা ত পবিত্র নহে। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা পবিত্র, যাহা অবৈধ এবং অপবিত্র তাহা করা কর্ত্তব্য নহে।"

"না অমর, তুমি ভুল বুঝিয়াছ, প্রণয় সকল স্থানেই পবিত্র, উহাতে পাপের সংস্পর্শ মাত্র নাই। সমাজের কথা তুলিও না, আমাদের বাঙ্গালির সমাজ অচিরে অধঃপাতে যাউক। যে সমাজে বালিকা বিধবার ব্রহ্মচর্য্য, কৌলিণ্যপ্রথা প্রভৃতি এই সভ্যতা-প্লাবিত যুগেও পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত রহিয়াছে, সে নিষ্ঠুর সমাজের কথা আর তুলিও না। আর এই পোড়া সমাজের মুখ চাহিলে, অকাল মেঘে আমার হৃদাকাশের উদয়োন্মুখ তরুণ অরুণকে চিরদিনের জন্ম ঢাকিয়া ফেলিয়া, হৃদয়কে চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন করতঃ বিষাদময় করিয়া তুলিবে।"

"বহু দূরস্থিত দাহ্যমান গৃহ শ্রেণীর গগন-স্পর্শি লোহিত অগ্নিশিখা আপাততঃ দেখিতে মনোরম হইলেও, তাহাতে চিত্তবিনোদন সম্ভবে না। তোমার এই ভালবাসা আপাততঃ যতই মধুর বোধ হউক, ইহার পরিণাম বড় তীব্র। তোমার ধন, মান, বিদ্যা, বংশ-মর্য্যাদা, সম্পদ্ সবই আছে; তোমার উদ্যম আছে, উৎসাহ আছে, আশা আছে, বুদ্ধি বিবেচনা সকলই আছে, চিত্তদমন কর। বাটী চল, নিজে দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ কর। দেখ, দাম্পত্যপ্রেম কি স্বর্গীয় সামগ্রী এবং এই ভালবাসার সহিত কত প্রভেদ।"

"যাহা অদম্য, তাহা দমন করিব কিরূপে? অমর! ভাই তুমি যত সহজ ভাবে কথাগুলি বলিলে, আমার পক্ষে তত সহজ নয়; ধন, মান, সম্ভ্রম সে ভালবাসার তুলনায় তুচ্ছ,—তাহা স্বর্গীয়। সমাজ দেখিতে হয়, আমায় তোমরা ত্যাগ কর, দেখি যে প্রণয়সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, তাহা হইতে অমৃত কি হলাহল আনিতে পারি।"

অমরনাথ ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন,—"আমি যত সহজ ভাবে বলিলাম, প্রকৃতই উহা তত সহজ। তোমার ন্যায় অনেকেই এক সময় না এক সময় এইরূপ মোহে বিবেকহীন হয়, তোমার এ ভালবাসাও বোধ হয় রূপজ-মোহের নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহা হউক, অনেক দিন কলিকাতায় আসিয়াছ এইবার বাটী চল।"

"পূজার সময় যাইব, তুমি কাকাকে

একটু বুঝাইয়া বলিও, যে আমি এখানে স্বচ্ছন্দ শরীরে মনের সুখে আছি, আর দিন পঁচিশ পরে য়াইব, তিনি যেন না চিন্তিত হন।"

যদিও শচীকান্ত বাবু কএকবার পত্র লিখিয়া এবং বলিয়া পাঠাইয়াও, সত্যেনকে বাটী যাইবার মত করাইতে পারেন নাই, তথাপি অমরনাথ, বাটী হইতে আসিবার কালে মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ছিলেন যে, সত্যেনকে দুই চারি দিবসের মধ্যেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। যাইবার জন্য অনেকক্ষণ ধরিয়া বলিলেন, কিছুতেই মত করাইতে পারিলেন না। যদ্যপি অমর এরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন, যে এক্ষণে বাটী না যাইলে খুড়া মহাশয় অসন্তুষ্ট বা রুষ্ট হইবেন, তাহা হইলে, হয়ত, সত্যেন বিশেষ অনিচ্ছা সত্বেও যাইতেন। কিন্তু অমর নিতান্ত অনুরোধে বাধ্য হইয়া সে ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক অস্থায়ি রূপজমোহে আক্রান্ত হইয়াই যে সত্যেনের মনোভাব এরূপ হইয়াছে, ইহা অমরের স্থির সিদ্ধান্ত হইলেও, তাঁহার মনে সত্যেনের জন্ম আজি একটু দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিল।

দুই বন্ধু কথা কহিতে কহিতে, তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে, নদী তীরে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন অমর ঊর্দ্ধ দিকে চাহিলেন, দেখিলেন আকাশে চাঁদ নাই, তারকাকুল লুকাইয়াছে, একখানা কৃষ্ণমেঘ মাথার উপর রহিয়াছে। আশু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া উভয়েই গাত্রোত্থান করিয়া বাসাভিমুখে চলিলেন।

অমরনাথ বৈকালে আসিয়া কিছুই জল-যোগ করেন নাই, বাসায় পৌঁছিবার অল্প পরেই সত্যেন্দ্রনাথের খুড়িমাতা উভয়কেই আহারের জন্য ডাকিলেন। তৎপরে তাঁহা-দিগকে নিকটে বসাইয়া নিজে খাওয়াইতে লাগিলেন। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া অমরকে বাটীর ও পাড়াপ্রতিবাসী সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—"আমার বাছা, আর এখানে ভাল লাগে না, লোক নেই, জন নেই, কি একলাটি চুপ্ করে বসে থাকা আমার পোষায় না।"

অমর—আমিও সেই কথাই সত্যেন দাদাকে বল্‌ছিলাম।

খুড়িমাতা।—সত্যেনের কি, বল না, ও এখন সমস্ত দিন কত কি দেখে শুনে বেড়ায়, ও যেতে চাইবে কেন? আমি কি আর থাক্‌তে পারি, বাড়িতে কে আছে বল না পূজো ত এল?

সত্যেন।—তুমি কেন যাও না, আমি আর দিন কতক পরেই যাব। দেখ, যদি যাও ত আমি যোগাড় করে অমরের সঙ্গেই পাঠিয়ে দি।

অমর।—তুমিও কেন চল না, আর দিন কতক থেকেই বা হবে কি?

খুড়িমাতা।—অমর ত বেস কথা বলেচে, সত্যেন চল, বাবা সব্ এক সঙ্গেই বাড়ি যাই চল।

সত্যেন অমরের দিকে চোখ টিপিয়া বলি-

লেন,—"না পূজর সময় ষ্টারে দুই তিনটা নূতন ভাল প্লে খুলবে, আমি না দেখে যাচ্ছি না।"

*　　*　　*

আহার করিতে করিতে এই প্রকার অনেক কথোপকথন হইতে লাগিল। রাত্রে উভয় বন্ধুতে একত্র শয়ন করিয়া, অনেক কথা হইল। কিরূপে সেই যুবতীর সহিত সত্যেনের ভালবাসা জন্মিল, তাহা তিনি আদ্যোপান্ত বলিলেন। সত্যেন ঘুমাইলেন, অমর অনেকক্ষণ বিনিদ্র থাকিয়া, কি উপায়ে সত্যেনকে ফিরাইতে পারিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন।

দুই দিবস পরে অমরনাথ একাকী বাটী ফিরিয়া আসিলেন।　　ক্রমশঃ

শ্রীহরিহর শেঠ।

# দৈন্য ও দীর্ঘশ্বাস

## তুমি।

ঊর্দ্ধে অনন্ত শান্ত সুনীল গগন,
নিম্নে স্তব্ধ ধরণীর শ্যামল বসন
পাতিয়া রেখেছ তুমি ওহে বিশ্বরাজ!
তা'রি মাঝে আমি আজ নাহি ভয় লাজ;—
পড়ে আছি শূন্য বক্ষঃ স্তিমিত নয়ন
ভাবি সদা ভবে কার শুধু লইব শরণ।
তুমি অই দূর হ'তে শত চক্ষু মেলি
র'য়েছ চাহিয়া সৌম্য। আমি গেছি ভুলি
জন্ম জন্মান্তর ব্যাপি স্মৃতি করুণার।
ফুলদলে কত পূজা করেছি তোমার,
অকৃতজ্ঞ ধরাবাসী মনে নাহি মোর
এমনি চঞ্চল চিত্ত। নিশি হলে ভোর
এখনি এধীর প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া
আমার চরণ প্রান্তে লইও তুলিয়া।

শ্রীদী——

## দীর্ঘশ্বাস।

ভারতের সে দিন কোথায়?
যে দিন "সন্তোষ ক্ষেত্র," দেখে পবিত্রিল নেত্র,
বিদেশী হিউএন্থসঙ্গ মানিল বিস্ময়!
কোথা কোন্ মহারাজ, ধরিয়া ভিক্ষুর সাজ,
সর্ব্বস্ব দরিদ্রে দান করিল ধরায়?
কে বলিল "এই বিত্ত," বিনা সেই শিলাদিত্য,
"সকলের তরে আমি রক্ষিতেছি হায়!"
কে দান করিয়ে কবে, বলিয়াছে এই ভবে,—
"আজ আমি নিরাপদ দিয়ে সমুদায়?"
এক দিন দুই দিন, নহে পঁচাত্তর দিন,
বর্ষে বর্ষে এইরূপ তুষিলা সবায়
যে দিন করিয়া শ্রেষ্ঠ ভারত মাতায়,
ভারতের সে দিন কোথায়!

# জানকীর অগ্নিপরীক্ষা।

## কাব্য—ইতিহাস—বিজ্ঞান।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ইহ প্রত্নপথেনৈব তত্ত্বং ব্যাখ্যায়তে পরং।
নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্নানপেক্ষিতমুচ্যতে।"

আমরা জানকীর অগ্নিপরীক্ষা-সংক্রান্ত কাহিনীটিরে ঐতিহাসিক কাহিনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি; এবং উহার বিশ্বাসের পথে প্রকৃতই কএকটি কঠিন বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন অন্তরায় স্বরূপ বিদ্যমান আছে, ইহাও পাঠককে জানাইয়াছি। বিজ্ঞানের পূর্ব্বে ইতিহাস; সুতরাং প্রথম প্রশ্ন—কাহিনীর ঐতিহাসিকতা। জানকীর কি সত্য সত্যই অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, না এ কথার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কাব্যকল্পতরু কবিগুরু বাল্মীকির কল্পনা মাত্র?

অগ্নিপরীক্ষার কাহিনী যদি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও উল্লিখিত না থাকিত,—যদি এ পৃথিবীতে আর কোন দেশে, কোন কালে, অন্য কোন নরনারীর অদৃষ্টে অগ্নিপরীক্ষার নিদারুণ ব্যবস্থা সংঘটিত না হইত, তাহা হইলে জানকীর অগ্নিপরীক্ষা-সম্বন্ধিনী সমস্ত কথাই ধর্ম্মানুরাগ-বিহ্বলা কবিকল্পনার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারিত। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, অগ্নিপরীক্ষার কোন না কোন রূপ কথা পুরাতন ইতিহাসের প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত। সকল দেশের ইতিহাসেই, কখনও সাধারণ ভাবে, কখনও বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত, ইহার উল্লেখ আছে; এবং যাঁহারা ঐতিহাসিক সত্যের নানারূপ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত-সংগ্রহে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের লেখায়ও ইহার প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। এমন অবস্থায়, পুরাতন ইতিহাসের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিলে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অগ্নিস্পর্শের দ্বারা চারিত্র-শুদ্ধির সাক্ষ্যদান শুধুই ভারতীয় কবির কাব্যসৃষ্টি নহে।

অগ্নিপরীক্ষা গ্রীকজাতির মধ্যে সময়ে সময়ে ব্যবস্থাপিত হইত। ইহার প্রমাণ গ্রীক-কবি সফোক্লিশের লেখা। সফোক্লিশ (Sophocles) অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার একখানি নাটকে অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা আত্মশুদ্ধি-প্রমাণের প্রার্থনা স্পষ্ট লিখিত রহিয়াছে। যাঁহার সম্বন্ধে, বিষয়-বিশেষে, দেশীয়দিগের সংশয় হইতেছে, তিনি আত্মসাধুতার উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া নির্ভীক কণ্ঠে কহিতেছেন,—"এস,—তোমরা অগ্নিদগ্ধ লৌহফলক লইয়া আমার

সম্মুখে এস, আমি জলদগ্নি-লৌহফলক হাতে তুলিয়া লইয়া বুকে রাখিব, অথবা অগ্নির উপর হাঁটিয়া যাইব।" * ঈদৃশী পরীক্ষা অবশ্যই জানকীর অগ্নিপরীক্ষার সমশ্রেণীস্থ নহে। কিন্তু তথাপি ইহা অগ্নিপরীক্ষারই প্রকারবিশেষ; এবং নাট্যসাহিত্যে উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও প্রমাণের পরিপোষক। যে দেশের লোকেরা অগ্নিপরীক্ষার কোন [illegible]ন চক্ষে দেখে নাই, অথবা কোন কথা কানে শুনে নাই, সে দেশের কাব্য নাটকে ইহার এইরূপ উল্লেখ থাকা একবারে অসম্ভব

আমাদিগের যেমন বেদ, অথবা রামায়ণ ও মহাভারত, ইহুদি জাতির সেইরূপ (Old Testament) পুরাতন টেষ্টেমেণ্ট। এ গ্রন্থ একদিকে মহাকাব্য, আর একদিকে মহাগৌরবময় জাতীয় ইতিহাস। ইহুদিদিগের এই জাতীয় ইতিহাসে,—ডানিয়েলের গ্রন্থ (Book of Daniel) নামক পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে,—একসঙ্গে তিনটি ঈশ্বরপরায়ণ ভক্ত যুবার অতি ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষার বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক-পদ্ধতিতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে; এবং যাঁহারা পরীক্ষিত হইলেন, আগুনে তাঁহাদিগের মাথার একগাছি কেশ ও পরিধেয় বস্ত্রের একগাছি সূতাও স্পৃষ্ট হইল না দেখিয়া রাজ্যেশ্বর ও রাজপুরুষেরা কিরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়ের ভাষায় বর্ণিত রহিয়াছে।

রাজ্যেশ্বর দ্বিতীয় নেবুকদ্‌নেসর। ইনি পূর্ব্বে ছিলেন বাবিলন ও নেনেভার সম্রাট্, এখন হইয়াছেন ইহুদি রাজ্যেরও অধীশ্বর। ইনি ৬০৬ খৃঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; এবং সুখে দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে পঁচাত্তর বর্ষ কাল সাম্রাজ্যের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া, ৫৮১ খৃঃ পূঃ অব্দে, পরলোক গমন করেন। আমরা এক্ষণে যে অগ্নিপরীক্ষার বৃত্তান্ত কহিতেছি, তাহার অনুষ্ঠাতা অথবা বিধাতা উল্লিখিত (Nebuchadnezzor) নেবুকদ্‌নেসর।

নেবুকদ্‌নেসর যখন বহু যুদ্ধের পর ইহুদি রাজ্য আপনার আয়ত্ত করিয়া লইলেন, তখন ধর্ম্মাভিমানী ইহুদিদিগের জাতীয় ধর্ম্ম উন্মূলন করাই, কিছু কাল, তাঁহার জীবনের প্রধান অধ্যবসায় হইয়া উঠিল। ইহুদিরাজ্যের রাজধানী জারুসালম-নগরে একটি পুরাতন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ছিল। ইহুদিরা সে মন্দিরকে স্বর্গ হইতেও অধিকতর পবিত্র মনে করিত, এবং প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। নূতন সম্রাট্, সে মন্দির লুণ্ঠন করিয়া, উহার সমস্ত সম্পত্তি তদীয় পুরাতন রাজধানী বাবিলনে লইয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে, তিনি সে দেবমন্দিরের অদূরে, দূরা (Dura) নামক রমণীয় প্রান্তরে, আপনার এক স্বর্ণময় প্রতিমা * প্রতিষ্ঠিত

* Sophocles as translated and quoted by Eppes Sargent. Author of The Despair of Science. &c. &c.

* এই প্রতিমা সম্রাটের নিজ প্রতিকৃতি, না তাঁহার মনঃকল্পিত দেবতাবিশেষের প্রতিমূর্ত্তি, তাহা নিশ্চয় করিয়া কহিতে পারিলাম না।

করিলেন; এবং সেই প্রতিমার নিকট প্রাতে, ও সায়াহ্নে, প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠ-নিঃসৃত বেণু, বীণা ও বীরবংশীর নিনাদ-নির্দ্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ সময়ে, তদ্গত ভক্তির সহিত প্রণত হইবার জন্ত, সমস্ত ইহুদিদিগের মধ্যে, এক সাধারণ আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন।

এই উদ্ভট ও অশ্রুতপূর্ব্ব আজ্ঞা উপলক্ষে ইহুদিরাজ্যে এক ভয়ানক গোলযোগ ঘটিল। বহু লোক এদিকে ওদিকে পালাইয়া রহিল; পালাইয়া প্রাণে রক্ষা পাইল। পলাতকদিগের মধ্যে অনেকে, নিষ্ঠুর সৈনিকের হাতে ধরা পড়িয়া, শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দিরূপে, বাবিলনে প্রেরিত হইল। যাহারা হৃদয়ে দুর্ব্বল, তাহারা দলে দলে উপস্থিত হইয়া, সে স্বর্ণপ্রতিমার নিকট আনুপাত সহকারে প্রণাম করিল। কিন্তু তিনটি ভগবদ্ভক্ত নির্ভয় যুবা, বিজেতৃ সম্রাটের সান্নিধ্যে আনীত হইয়া, তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার নিকট প্রণত হইতে সর্ব্বতোভাবে অসম্মত হইল।

যুবকত্রয়ের নাম সাদ্রাক, মেসাক ও আবেদনিগো।* এই তিনটি যুবকই বিজেতৃ রাজ্যেশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ছিল; এবং তাঁহার অনুগ্রহে, রাজাধিকারে, তিনটি অধ্যক্ষতার পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। রাজা কখনও এমন মনে করিতে পারেন নাই যে, যাহারা এত প্রকারে তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত, এবং তাঁহারই অন্নে প্রতিপালিত, তাহারা তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলচারী হইবে; এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে। সুতরাং, তিনি সাদ্রাক প্রভৃতির তাদৃশ অসম্মতির কথা শুনিয়া একবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং উহাদিগকে তৎক্ষণাৎই, হাতে পায়ে দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া, জ্বলন্ত লৌহচুল্লীতে নিক্ষেপ করিবার জন্ত আদেশ করিলেন। *

যে কথা সে-ই কার্য্য; রাজ্যেশ্বর যদি অতি বড় নিদারুণ পাপিষ্ঠ হয়, তথাপি তাহার আজ্ঞা সেবকগণের শিরোধার্য্য। সেবক-সৈনিকেরা, সাদ্রাক, মেসাক ও আবেদনিগো এই তিন জনকেই, দ্রুতহস্তে, হাতে পায়ে অতি দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, অগ্নিকুণ্ড অথবা অগ্নিময় লৌহচুল্লীতে নিক্ষেপ করিল। § কুণ্ডের অগ্নি এত বেসী জ্বলিয়া উঠিয়াছিল যে, যাহারা ঐ সাধু যুবক তিনটিকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবার জন্য কুণ্ডের সন্নিহিত হইল, তাহারা আগুনের তাপে অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর গ্রাসে গড়াইয়া পড়িল। তাহাদিগের এ অবস্থা দেখিয়া রাজ্যেশ্বর ও তদীয় পার্শ্বচরদিগের চিত্তে

---

* Shadrach, Meshach, and Abed-nego.

* "And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abed-nego, and to cast them into the burning fiery furnace".

§ "Then these men were bound in their coats, their hosen, and their hats, and their garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace".

কিরূপ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল, তাহা বর্ণনার অতীত।

রাজা নেবুকদনেজর, ক্ষণকাল পরে, স্বয়ং কুণ্ডের দিকে চাহিয়া, সাদ্রাক প্রভৃতির তদানীন্তন অবস্থা জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন, সাদ্রাক মেসাক ও আবেদনিগো, তিনজনই সেই জলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে নিরাপদে দণ্ডায়মান রহিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছে; তাহাদিগের শরীরের সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া কিংবা পুড়িয়া গিয়াছে; এবং একটি দেবতার মূর্ত্তি, যেন আশ্বাস ও অভয়দানের জন্য, তাহাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে, নেবুকদনেজরের মনে, সেই মুহূর্ত্তেই এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত ঘটিল; এবং অগ্নিপরীক্ষিত যুবকত্রয়, তাঁহার আজ্ঞাক্রমে, তখনই অগ্নিকুণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া, আশাতীত সম্মানের সহিত অভিনন্দিত হইল। রাজা, রাজকুমারবর্গ, রাজ্যশাসনের প্রধান অধ্যক্ষ ও সেনাপতিবৃন্দ, এবং রাজার সচিবনিচয়েরা, সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে, সমবেত ভাবে, পরীক্ষিত যুবকত্রয়ের সন্নিহিত হইয়া, তাহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বস্ত্রাদি, সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, অগ্নি সে নিরীহ যুবকত্রয়ের উপর কোন অংশেও কিছুমাত্র কার্য্য করে নাই,—তাহাদিগের মাথার এক গাছি চুলে আগুনের আঁচ লাগে নাই,—পরিধেয় বস্ত্রে অগ্নিস্পর্শের চিহ্ন নাই, এবং শরীরেও আগুনের গন্ধ নাই। * ইহা কিরূপে সম্ভবে? সে কথার উত্তর পরে দিব। কিন্তু পাঠককে আপাততঃ ইহাই মনে রাখিতে বলি যে, সাদ্রাক প্রভৃতির অগ্নিপরীক্ষাবিষয়িনী এই আশ্চর্য্য কাহিনী, যেমন ইহুদিদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে, তেমন বাবিলনের ইতিহাসে, বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ আছে; এবং এই ঘটনা, পরবর্ত্তি ইতিহাসনিচয়েও, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে।

ইংলণ্ডের ইতিহাস ও ব্যবস্থাবিজ্ঞান উভয়েই অগ্নিপরীক্ষার প্রামাণিক সাক্ষী। একাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞী, § রূপবতী এমা,—নর্ম্মাণ-ডিউক রিচার্ডের কন্যা ও

---

* "And the princes, governors, and captains, and the King's counsellers, being gathered together, saw these men, upon whose bodies the fire had no power, nor was an hair of their head singed, neither were their coats changed, nor the smell of fire had passed on them. &c. &c. ডেনিয়েলের এই বর্ণনার সহিত বাল্মীকির নিম্নলিখিত পংক্তিদ্বয় মিলাইয়া পাঠ করিলে, পাঠক নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন। যথা যুদ্ধকাণ্ডে,—

"রক্তাম্বরধরাং বালাং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজাং।
অক্লিষ্টমাল্যাভরণাং তথারূপামনিন্দিতাং॥"

§ "Queen Emma, daughter of Richard II, Duke of Normandy, and mother of Edward the Confessor,

ইংলণ্ডের রাজা এড্ওয়ার্ড-দি-কনফেসরের মা,—কিরূপে অগ্নিপরীক্ষায় আপনার অমল স্বভাব প্রতিপাদন করিয়া, প্রাণে রক্ষা পাইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার বর্ণনা আছে; এবং অগ্নিপরীক্ষার প্রণালী, প্রক্রিয়া ও ভয়াবহ পদ্ধতির বৈচিত্র্যবিষয়ক বহু কথা ব্লাকষ্টোনের * ব্যবস্থাবিজ্ঞানে সুচারুরূপে বিবৃত রহিয়াছে। যাঁহারা অবিশ্বাসী ওয়ালটার স্কটের ঐতিহাসিক কাহিনিচয়,—বিশেষতঃ তাঁহার ফেয়ার-মেইড অব্-পারথ্ ( Fair Maid of Perth ) নামক উপন্যাসের অঙ্গীভূত টীকাগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই ইংলণ্ডীয় অগ্নিপরীক্ষার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বিষয়ে অনেক কথা অবগত আছেন।

অগ্নিপরীক্ষা যখন এই ভাবে আধুনিক ইতিহাসে এবং ইয়ুরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রেও সুপরিচিত, তখন জানকীর অগ্নিপরীক্ষা-কাহিনীকে আর্যকবিবর্ণিত অপ্রাকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা বিচারসঙ্গত হয় কি ?

the king of England. She lived in the 11th. Century."

* "Fire-ordeal was performed either by taking up in the hand, unhurt, a pece of red-hot iron, of one, two, or three pounds' weight ; or else by walking, barefoot and blindfold, over nine red-hot ploughshares, laid lengthwise, at unequal distances : and if the party escaped being hurt, he was adjudged innocent ; but if it happened otherwise, he was then condemned as guilty.

বাল্মীকির পৃথ্বীখ্যাত রামায়ণে, ঐতিহাসিক সত্য, ইলিয়দের মূল-নিবদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যবৎ, অনেক স্থলেই কল্পনার কুসুম-কিশলয়ে আচ্ছাদিত হইয়াছে। সে কল্পনা, কখনও বাণের মুখে, বজ্রাবস্ফোটবৎ বিশ্বগ্রাসি অগ্নি জ্বালিয়াছে ; কখনও নীরন্ধ্র-নিবিড় প্রলয়-জলদের অজস্র ধারা বর্ষণে আগুন নিবাইয়াছে। বস্তুতঃ, বাল্মীকির কল্পনা, দেশীয় চিন্তার চির-পরিগৃহীত পদ্ধতিতে, কত প্রকার আশ্চর্য্য ঘটনা সৃষ্টি করিয়াছে,—সম্ভবের সহিত অসম্ভব, এবং লৌকিকের সহিত অলৌকিক ও অদ্ভুতকে মিলাইয়া মিশাইয়া, কিরূপ লোকোত্তর সৌন্দর্য্য ফলাইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু, কবিকল্পনার এইরূপ উদ্দাম-বিলাস ও উন্মাদ-লীলা সত্ত্বেও, রামায়ণী কথায় যে সকল মৌলিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটিও অসত্য নহে।

লোকাভিরাম রামচন্দ্রের উদারকীর্ত্তি,—রামকর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের আশ্রমে তাড়কাবধ ও মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গপণে জানকীর পাণিগ্রহণ,—মন্থরার মন্ত্রণায় রামজানকীর বনবাস, রামের শোকে দশরথের মৃত্যু,—বনে জানকী-হরণ, জানকীর উদ্ধারার্থ বন্যসেনা-সংগ্রহ,—রাম-রাবণের দীর্ঘকাল-ব্যাপি দারুণ সংগ্রাম ও সংগ্রামে সবংশ-রাবণ-নিধন, সমস্তই ঘটনামূলক প্রকৃত বৃত্তান্ত। জানকীর অগ্নি-পরীক্ষাও ঐরূপ একটি মৌলিক ঘটনা। বাল্মীকির পরবর্ত্তী ঋষি ও কবিরা,—ঋষিদিগের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, এবং কবি-

দিগের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, মুরারি ও মহানাটককার প্রভৃতি সকলেই উল্লিখিত অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্তকে মৌলিক ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন; এবং ভারতবর্ষের অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও, আবহমান পুরাতন কাল হইতে, এই প্রসিদ্ধ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া, জনক-দুহিতার পবিত্র স্মৃতিকে অশ্রুজলে তর্পণ করিয়াছেন। এমন পূর্ব্বাপর-প্রত্যয়-স্থলে, আমরা আজি, কিরূপ অসার যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া, এই জগদ্বিশ্রুত বৃত্তান্তকে অমূলক জ্ঞানে উপেক্ষা করিব; এবং যাঁহার চারিত্রকীর্ত্তি সতত শতসহস্র কণ্ঠে গীত হইতেছে,—যাঁহার ইতিহাস, বৈদ্যুতিক শক্তি হইতেও অধিকতর বশীকরণ-শক্তি প্রয়োগ করিয়া, সংসারের অসংখ্য রমণীকে অহোরাত্র উচ্চতর পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিতেছে, তদীয় জীবনের মুখ্যতম বৃত্তান্তকে মিথ্যা জ্ঞানে উড়াইয়া দিব?

কিন্তু যাঁহারা জড় বিজ্ঞানকেই জগতের একমাত্র বেদ বলিয়া পূজা করেন, এখানে তাঁহাদিগের দ্বিতীয় ও কঠিনতর প্রশ্ন। তাঁহারা এ স্থলে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবেন-যে, মানুষ আগুনে হাত দেয়, অথচ সে আগুনে তাহার হাত পোড়ে না, ইহা কি কখনও সম্ভবে? দাহিকা শক্তি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অগ্নি কি কখনও, মনুষ্যের অনুরোধে ও উপরোধে, অথবা অন্য কোন কারণে, সে দাহিকাশক্তিতে বঞ্চিত হইয়া, শীকর-সিক্ত সমীরণের ন্যায় শীতল ও সুখস্পর্শ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগের বহু কথা বলিবার আছে। আমরা কথাগুলি ধীরে ধীরে কহিব; এবং জানকীর অগ্নিপরীক্ষা বৃত্তান্তকে যে জন্য আমরা সতীর চারিত্র-কীর্ত্তি-খ্যাপক জগন্মঙ্গল্য সত্য বলিয়া হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি, তাহা ধীরে ধীরে বুঝাইতে যত্নবান্ হইব।

প্রথম কথা,—আমরাও প্রশ্নকারিদিগের ন্যায় বিজ্ঞানের ভক্ত উপাসক, এবং বৈজ্ঞানিক সত্যেরই নিয়ত-পোষক। বিজ্ঞান আমাদিগের চক্ষে বিশ্বময়-ভাগবত-কাব্যের ভাবার্থবোধিনী আক্ষরিক ব্যাখ্যা। সুতরাং, আমাদিগেরও ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস, এবং ইহা আমরা শত প্রকারে বলিয়া আসিতেছি যে, এই অনন্তপ্রভাবময়ী প্রকৃতির রাজ্যে অপ্রাকৃত ঘটনা একবারে অসম্ভব। যাহা অস্বাভাবিক, তাহা স্বভাবজগতে কখনও সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু, অপ্রাকৃত অথবা অস্বাভাবিক এক কথা, এবং অসাধারণ,—অলৌকিক, অথবা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব আর এক কথা। এই পৃথিবীর অনেক দেশে, জল অহরহঃই জমিয়া বরফ হয়; এবং সে বরফ লইয়া লোকে বাণিজ্য করে। কোন কোন দেশে বরফ এমনই দৃঢ় ও ঘনীভূত হয় যে, মানুষ তাহার উপর এক প্রকার ক্ষুদ্র গাড়ী চালাইয়া চলিয়া যায়। যাঁহারা এইক্ষণ বিনা বরফে জল খাইতে পারেন না, তাঁহাদিগের নিকট জল ও বরফের এই প্রকার অবস্থাপার্থক্য বর্ণনা করিয়া বুঝান অনাবশ্যক। অথচ, এ কথা ইতিহাসে লিখিত

আছে যে, আমেরিকার এক জন বিজ্ঞ পরিব্রাজক,—বহু দিন হয়,—দেশ-বিশেষের রাজার নিকট জলের এইরূপ রূপান্তর-প্রাপ্তির কথা কহিয়া, বিপন্ন হইয়াছিলেন।

জল যেমন অবস্থা-বিশেষে শীতল ও ঘনীভূত রহে, অবস্থাবিশেষে উত্তপ্ত অথবা অতি সূক্ষ্ম বাষ্পে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়, অগ্নিও সেইরূপ,—অবস্থাবিশেষে—অর্থাৎ অজ্ঞাত ও উচ্চতর দিব্যশক্তির প্রভাবে,—অজ্ঞাত ও উচ্চতর প্রাকৃত নিয়মের বিশিষ্ট বিধানে,—দাহজনক না রহিয়া, জলের ন্যায় সুখ-স্পর্শ হইতে পারে না কি ?

অগ্নির এইরূপ অবস্থাপরিবর্ত্ত অথবা শক্তিলোপ অসংখ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, তাঁহারা, অশেষ-প্রকারে সাবধান রহিয়া, রসায়নের অবিজ্ঞেয় অধ্যাত্মক্রিয়ার সহিত অগ্নির সম্পর্ক পরীক্ষা করিয়াছেন ; এবং একই অগ্নি এক জনকে পোড়াইতেছে, আর এক জনের শরীরে শিশিরসিক্ত পুষ্পের ন্যায় অনুভূত হইতেছে,—অথবা একই-জন-সম্পর্কে, এই মাত্র সমীরবৎ শীতল স্পর্শে আনন্দ জন্মাইয়া, মুহূর্ত্ত পরেই আবার, দাহিকা শক্তির জ্বালাময় ক্রিয়ায় অঙ্গদাহ ঘটাইতেছে, ইহাও তাঁহারা, দিবা-দ্বিপ্রহরের সময়, দশ জনে একত্র হইয়া প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। সুতরাং, মানুষ আগুনে হাত দেয়, অথচ সে আগুনে তাহার হাত পোড়ে না ; এবং দেব-প্রভাব-পরিরক্ষিত ব্যক্তিরা, জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াও, অনুমাত্র দগ্ধ হন না, ইহা এখন আর ইতিহাসজ্ঞ মনুষ্যের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে না।

জানকীর ইতিহাস যুগ-যুগান্তরের কথা। মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা দূরে থাকুক, কল্পনাও সেখানে, বহু সহস্র বৎসরের কাল-ব্যবচ্ছেদ পার হইয়া, সহজে পহুঁচিতে পারে না। ইংলণ্ডীয় রাজ্ঞী এমার বৃত্তান্ত, আধুনিক ইতিহাসে পরিগৃহীত হইয়া থাকিলেও, এক প্রকার পুরাতন কাহিনী। এমা একাদশ শতাব্দীতে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। আজি বিংশতি শতাব্দীর আরম্ভ। এমার সে পরীক্ষা, তদানীন্তন বিজ্ঞব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়া থাকিলেও, বৈজ্ঞানিকের বিশেষ প্রণালীতে অনুধাপিত হয় নাই। আমরা, এই হেতু, এই স্থলে, পাঠকের নিকট কএকটি আধুনিক ও অতি কঠোর বিজ্ঞান-পরীক্ষিত অগ্নিবৃত্তান্ত উপস্থিত করিব। যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিরা, আপনাদিগের পুরাতন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, দৈবী ক্রিয়ায় একবারে অবিশ্বাসী, তাঁহারাও এই বৃত্তান্ত নিচয়ের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে, ইহা হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, যে অগ্নি, কাঠ পাথর পোড়াইয়া নগর দগ্ধ করে, এবং বনে দাবানল সৃ করিয়া জগজ্জিঘৎসু জিহ্বা প্রসারণ করিয়া থাকে, সেই অগ্নিই, অন্তরীক্ষচারী দেবতাদিগের ইচ্ছা হইলে, জগতের জ্ঞানোৎকর্ষ-সম্পাদক ও বিশেষ কোন মঙ্গলজনক প্রয়ো-

জনে, জানকীর মত দেবচরিত্রা রমণীর অঙ্গস্পর্শ সময়ে, অমৃতসম শীতল হইতে পারে।

বঙ্গীয় শিক্ষিতসমাজের যে সকল অধীতি-ব্যক্তি, ইংলণ্ড ও আমেরিকার অতীত অর্দ্ধ শতাব্দীর তাত্ত্বিক-ইতিহাস লইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই (Daniel. D. Home) ডানিয়েল ডি হোম নামক আশ্চর্য্যকর্ম্মা অলোক-সাধারণ পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। যাঁহারা হোমকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না জানিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে অদ্ভুত-ক্ষমতাপন্ন ঐন্দ্রজালিক মনে করিয়া নানারূপ কল্পনা ও জল্পনার আশ্রয় লইতেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা, সত্যলিপ্সু সাধুহৃদয়ে, সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত লোকদিগের সাহচর্য্যে, হোমের সন্নিহিত হইতেন, এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন। রুষের সম্রাট্ প্রথম আলেকজেণ্ডার, জর্ম্মণ-সম্রাট্ প্রথম উইলিয়ম, এবং ফরাশি-সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রভৃতি দিক্‌পাল ব্যক্তিরা, হোমকে অশেষপ্রকারে ও অতি দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়া, তাঁহাকে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন অথচ অমায়িক-স্বভাব আধ্যাত্মিক (Psychic) জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিয়াছেন; এবং ইংলণ্ড ও ইয়ুরোপের তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক ও বিশ্রুতকীর্ত্তি পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই, তদীয় সত্যনিষ্ঠা, সৌজন্য ও শুদ্ধচারিতা প্রভৃতি গুণের গৌরবে, তাঁহার প্রতি যার-পর-নাই প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি দেখাইয়াছেন।

হোমের জন্মস্থান স্কটলণ্ড,—প্রথম বয়সের শিক্ষাস্থান আমেরিকা, এবং কর্ম্মস্থান প্রধানতঃ ইয়ুরোপ। কিন্তু কর্ম্ম বলিলে এখানে কি বুঝিব? হোমের কোনরূপ বিষয়বাণিজ্যের ব্যবসায় ছিল না। তিনি যে সকল কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা জগতে পরিচিত, তৎসম্পর্কে তিনি কাহারও নিকট কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না। তথাপি তাঁহার কর্ম্ম ছিল। সে এক মাত্র কর্ম্ম—উদার ও অনন্ত উন্নতিপ্রমুখ অধ্যাত্ম ধর্ম্ম-সংস্থাপন; —লৌকিক-জগতে অলৌকিক অধ্যাত্মশক্তি অথবা দেবাত্মাদিগের প্রভাব প্রদর্শন; এবং পূর্ণানন্দ পরব্রহ্মের প্রেম-মঙ্গলময় বিশেষ বিধান ও পরলোকের অস্তিত্বে নিঃসংশয় বিশ্বাস-উৎপাদন।

হোম পরলোককে প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া উপদেশ করিতেন; এবং পারলৌকিক জগতের জল স্থল গিরি-কাননময় নানাবিধ দৃশ্য ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যক্ষবৎ চক্ষে দেখিতেন। তিনি সকলকেই সরল হৃদয়ে বলিতেন যে, তাঁহার শরীরে কিরূপ এক (Magnetic) ম্যাগন্যাটিক অর্থাৎ চৌম্বক পদার্থ আছে, তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু সেই পদার্থের আকর্ষণে, লোকান্তরবাসী সুপরিচিত সুহৃৎস্বজন ও উজ্জ্বল-মূর্ত্তি দেবতারা, সময়ে সময়ে, তাঁহাকে দর্শন দান করেন; এবং সময় বিশেষে, তাঁহার দেহে আবিষ্ট হইয়া, পৃথিবীর জল, অগ্নি, সোনা, রূপা ও

কাষ্ঠ-প্রস্তর প্রভৃতি জড় পদার্থের উপর, অজড় অধ্যাত্ম-প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন।

হোমের শরীরে বিশেষ কি পদার্থ এবং সে পদার্থে বিশেষ কি শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বৈজ্ঞানিকেরা সম্যক্ নিরূপণ করিতে পারেন নাই।* কিন্তু তাঁহারা সে পদার্থ অথবা শক্তির অশেষ-বিধ ক্রিয়া চক্ষে দেখিয়াছেন,—ক্রিয়াসম্পর্কে শত প্রকারে পরীক্ষা করিয়া চিত্তে প্রত্যয় পাইয়াছেন; এবং উহার অলৌকিক আকর্ষণে, সূক্ষ্মশরীরি আত্মিক-নর-নারীরা, হোমের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া, জড়বস্তুর উপর কতপ্রকার অভাবনীয় কার্য্য করিতে পারেন, ইহা তাঁহারা, দিবসে ও রাত্রিতে, সূর্য্যের প্রখর-জ্যোতিতে ও সূর্য্যবৎসমুজ্জল বৈদ্যুতিক আলোকে, পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ডি ডি হোম কর্ত্তৃক প্রদর্শিত অধ্যাত্ম-শক্তির বিবিধ ক্রিয়া, অষ্টাদশ-পর্ব্বাত্মক মহাভারতের মত, খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, বিশাল গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। সে বিস্তারিত বৃত্তান্ত-বিবৃতি এখানে এক কিংবা এক শত পৃষ্ঠায়ও পরিসমাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু তথাপি, এ স্থলে, তৎসংক্রান্ত কএকটি কার্য্য অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। নহিলে, জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা-সম্বন্ধি দুর্জ্ঞেয় বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক পাঠকের নিকট কখনও দেবকার্য্য বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য হইবে না।

---

* সে পদার্থ অথবা শক্তির প্রকৃত পরিচয় দুরাধিগম্য হইলেও, বৈজ্ঞানিকেরা উহাকে Mediumistic Element অর্থাৎ মাধ্যমিক-শক্তি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মিডিয়ম শব্দ যেমন ইংরেজীতে নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, মাধ্যমিক শব্দও সেইরূপ বাঙ্গালায় নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইল। অর্থ এই,—যাঁহারা জড় ও অজড়, অথবা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যস্থলে সেতুস্বরূপ,—অর্থাৎ যাঁহাদিগের শরীরনিহিত তথাবিধ বিশেষ শক্তির আশ্রয় লইয়া সূক্ষ্মশরীরী আত্মিকেরা জড়জগতে প্রবেশ ও জড়বস্তুর উপর কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহারাই মিডিয়ম অথবা মাধ্যমিক। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও বহু পরীক্ষার দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, এই মাধ্যমিকী শক্তি সমস্ত নর-নারীর শরীরেই অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। উহা যত্নে বাড়ে, অযত্নে নষ্ট হয়,—এক জনের শরীর হইতে আর এক জনের শরীরে সঞ্চারিত হইতে পারে; এবং দশ জনে একত্র হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চেষ্টা করিলে বিশেষরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। তবে, এ শক্তি হোম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মিডিয়মের দেহে যে পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছে, সাধারণতঃ অন্যের দেহে তেমন পরিলক্ষিত হয় না। বিদ্যুৎ যেমন চিরন্তন পদার্থ, মাধ্যমিক শক্তিও সেইরূপ চিরন্তন পদার্থ। বিদ্যুতের শক্তি, অল্প দিন হইল আবিষ্কৃত হইয়া, মনুষ্য-জগতের প্রয়োজনসাধক হইয়াছে। মাধ্যমিক শক্তিও সেইরূপ, অল্প দিন হয় আবিষ্কৃত হইয়া, পারলৌকিক-জগতের জ্ঞান লাভে, মনুষ্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছে।

হোমের বয়স যখন সাত আট বছর, তখন হইতেই, তিনি যে গৃহে অবস্থান করিতেন, সে গৃহে, সময়ে সময়ে, দেবানুভূতির বিবিধ কার্য্য মনুষ্যের দৃষ্টি ও শ্রুতির বিষয়ীভূত হইত। ঘরে হোম ছাড়া আর কেহ নাই, —হোম বাল্যকালের নিশ্চিন্ত-সুখে নিদ্রাভিভূত; অথচ সেই ঘরে, সুদূরবর্ত্তি টেবল, চেয়ার ও অন্যান্য কাষ্ঠনির্ম্মিত বস্তুর উপরে, মনুষ্যের কর-তালি-তুল্য শব্দ হইত। ঘরের বিবিধ বস্তু, মনুষ্যের কর-সম্পর্ক বিনা, কিরূপ এক অজ্ঞাত শক্তির আকর্ষণে, শূন্যে উঠিয়া, এক স্থান হইতে আর এক স্থানে যাইত।

হোম যখন উনবিংশতি-বর্ষীণ অর্দ্ধশিক্ষিত যুবা, তখন তাঁহার উল্লিখিত অধ্যাত্ম শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে বিকশিত হইল যে, তাঁহার নাম উপলক্ষে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার প্রাসাদ হইতে পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত একটা হৈ চৈ হুল-হুলা শব্দ উঠিল। তিনি তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ শক্তি দেখাইয়া কাহারও নিকট কিছু চাহিতেছেন না, তথাপি লোকে সহস্র জিহ্বায় তাঁহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করিল; কাহারও কোন অপকার করিতেছেন না, তথাপি অসংখ্য লোক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার যশ ও সম্মান বহু লোকের হৃদয়ে কঙ্করবৎ বিঁধিল; এবং প্রচলিত ধর্ম্মের প্রচারকেরা,—যাঁহারা অনন্ত নরকের ভয় দেখাইয়া মনুষ্যকে অহোরাত্র আতঙ্কিত রাখিতে ভালবাসেন, সেই হৃদয়-শূন্য যাজকেরা, তাঁহাকে অপদেবতার আশ্রিত মনে করিয়া, নানাপ্রকারে তাঁহার অনিষ্ট করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, দেশের ধীর, স্থির, সত্যপ্রিয়, সদাশয়-সুপণ্ডিতদিগের হৃদয়, হোমের প্রসাদাৎ, পরলোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া, যেন কৃতার্থ হইয়া, একবারে তাঁহার দিকে গড়াইয়া পড়িল; এবং তাঁহাদিগের সাক্ষ্যের নির্ভরে, শত শত সংবাদপত্র, রাজনীতির কথা বিস্মৃত হইয়া, পারলৌকিক জীবনের অস্তিত্ব বিষয়ে, প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

হোমকে লইয়া লণ্ডনে যাঁহারা অলক্ষিত সূক্ষ্মশরীরীর শক্তি পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা সহস্রেরও অধিক। এখানে, তন্মধ্যে, আধুনিক বিজ্ঞান-গুরু (Sir William Crooks) সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স, (Alfred Wallace) আলফ্রেড্‌ ওয়ালেস, (Lord Lindsay) লর্ড লিণ্ডসে, (Lord Adare) লর্ড এডেয়ার, (Lord Danraven) লর্ড ডান্‌রাভেন, (Lord Brougham) লর্ড ব্রুহাম প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা, ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে দলবদ্ধ হইয়া, পরীক্ষার উপযোগি বিবিধ রাসায়নিক যন্ত্র ও বহুসংখ্য পরীক্ষণ-পটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি পণ্ডিত ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়াছেন; এবং এক এক দিন অধ্যাত্ম শক্তির এক এক প্রকার আশ্চর্য্য ক্রিয়া অবলোকন করিয়া বিস্ময়হর্ষে রোমাঞ্চিত ও চমৎকৃত হইয়াছেন।

বাহাদুরী কাটের বড় টেবল। টেবলের ভার বিশ মণ। টেবলের উপর সাত আট জন বলিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত লোক উপবিষ্ট।

হোম, কোন দিন, সে টেবলকে বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে স্পর্শ মাত্র করিয়াছেন,—কোন দিন তাহাও না করিয়া এবং টেবল হইতে আট দশ হাত দূরে রহিয়া, উহাতে আবিষ্টবৎ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়াছেন। ঐ অবস্থায়ও, উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের দুর্ব্বহ বোঝা লইয়া, টেবল কখনও বেলুনের মত শূন্যে উঠিয়াছে; কখনও বা অল্প কিছু উপরে উ-ঠিয়া, তরঙ্গ-দোলায়িত তরণীর ন্যায়, দক্ষিণে ও বামে মৃদু মৃদু দুলিয়াছে, অথবা শূন্যের উপরই এক দিকে বহুক্ষণ কা'ত রহিয়া, অধ্যাত্মশক্তির মহিমা দেখাইয়াছে। টেব-লের উপর জল, দুগ্ধ ও মদিরা প্রভৃতি দ্রব-বস্তুতে পরিপূর্ণ বিবিধ কাচ পাত্র;—কাটা, ছুরি, চামচা ও কুসুম-স্তবক-শোভিত ফুল-দান,—এবং কামিনী-জন-স্পৃহনীয় দর্পণাদি ভঙ্গুর বস্তু। অথচ টেবলের উপরিস্থিত জলের পাত্র, ফুলের আধান প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রীই, বজ্রলেপবদ্ধ বস্তুর মত, যেমন ছিল তেমনই অবিচলিত রহিয়া, পরীক্ষকদিগের বিস্ময় জন্মাইয়াছে।

হোম কখনও চক্ষে দেখেন নাই, এমন একটি হারমোনিয়ম, গৃহস্বামী ক্রুকস্ অথবা অন্য কাহাও বাড়ীতে, চাবি দ্বারা বন্ধ,—ভূতলে বিপর্য্যস্ত—এবং লৌহ অথবা তাম্র-জাল নির্ম্মিত ডবল খাঁচায় বেষ্টিত। হার-মোনিয়মের চাবি গৃহস্বামীর পকেটে। কিন্তু তথাপি উহাতে, অধ্যাত্মশক্তির অলৌকিক প্রভাবে, অমিয়মধুর গীত অথবা সুরলয়-সমন্ত সঙ্গীতের গত মহুর্ম্মুহু বাজিয়াছে; এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ কখনও মনে মনে কোন গীতের প্রস্তাব করিলে, সে গীতও উহাতে ধ্বনিত হইয়াছে। হোম যখন সে হারমোনিয়মটি অঙ্গুলিদ্বারাও স্পর্শ করেন নাই, তখনও উহা, কোন দিন, কাহারও বাড়ীতে, ঘরের চারি দিকে, শূন্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সঙ্গীতের শ্রুতিহারি আলাপে, সকলেরই হৃদয়ে সুধা প্রবাহ ঢালিয়াছে।

টেবলের উপরে, ফুলের তোড়ায়, অথবা কাহারও বক্ষে বোতামের ছিদ্রে, একটি সুরম্য গোলাপ, সুন্দরীর অধরের মত, মৃদু-হাস্যে শোভা পাইতেছে। কিন্তু সেখানে, বহু চক্ষের দৃষ্টিসান্নিধ্যে, কখনও এক খানি বাহুবিছিন্ন সুগঠিত হস্ত, কখনও বা শিশুর অঙ্গের মত, সুকোমল বাহুসম্পৃক্ত, ছোট্ট এক খানি হাত, কখনও বা হাতের দুইটি অঙ্গুলি মাত্র, টেবলের মধ্যস্থল অথবা ঘরের এক পার্শ হইতে, ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠি-য়াছে, এবং সে গোলাপটি কাড়িয়া লইয়া আর একজনকে নিয়া উপহার দিয়াছে। ঐ রূপ অপার্থিব হস্ত, কখনও দ্রষ্টৃবর্গের মধ্যে কাহারও হস্তস্পর্শ করিয়া, প্রীতির পরিচয় দিয়াছে; কখনও একর্ডিয়ন্ (Accordion) নামক বাদ্য যন্ত্রের উপর ক্রীড়া করিয়া আনন্দ-লহরী সৃষ্টি করিয়াছে; কখনও বা কাহারও হস্ত হইতে পেন্সিলটি কাড়িয়া নিয়া, একখানি কাগজের উপর, পত্র লেখার মত, কোন না কোন বিষয়ে দুই চারিটি পংক্তি লিখিয়া, দেখিতে না দেখিতে শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে।

হোমের সান্নিধ্যে, লোকান্তরবাসী সূক্ষ্মদেহিদিগের অলৌকিক প্রভাবে, এইরূপ আরও কত আশ্চর্য্য ও বুদ্ধির অগম্য বিস্ময়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা, এ স্থলে, এই প্রবন্ধের অনুরোধে, সংক্ষেপে বিবৃত হওয়া আবশ্যক। মানুষ, পশুপক্ষীর ন্যায়, জলে স্নান করে,—গায়ে জল ঢালিয়া শীতল হয়, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু হোম, কখনও কখনও, পরের গৃহে,—পরকীয় প্রার্থনার অনুরোধে,—সে আকস্মিক প্রার্থনা-সম্পর্কে পূর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত না থাকিয়া, ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কোনরূপ সুদূর-কল্পিত সাহায্যগ্রহণেরও অবকাশ না পাইয়া, জলন্ত অগ্নিতে স্নান করিতেন; এবং উদ্দীপ্ত অগ্নিরাশির মধ্যে আপনার মাথা ও শরীরের একার্দ্ধ প্রবেশিত করিয়া, অগ্নির উপর অধ্যাত্মশক্তির কিরূপ আধিপত্য আছে, তাহা সকলকে দেখাইতেন।

এইরূপ অগ্নিস্নানের সময়ে হোমের শরীরে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৈবী আভা উদ্ভাসিত হইত। তিনি, ক্ষণকাল, ধ্যানস্থবৎ রহিয়া, মনে মনে প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনার পর যখন তিনি নীরব-গাম্ভীর্য্যে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, এবং ধীরে ধীরে শ্বেত-শিখাময় ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখীন হইতে থাকিতেন, তখন সকলেরই মনে কেমন এক প্রকার ভয় ও ভক্তির সঞ্চার হইত। যে একবারে অবিশ্বাসী, তাহার মনও তখন আপনা হইতে বিশ্বাসের দিকে গড়াইয়া পড়িত। সকলেই তখন স্পষ্ট বুঝিত যে, হোমের শরীরে আর কেহ প্রবেশ করিয়াছেন; এবং পৃথিবীর হোম, কোন অপরিজ্ঞাত অপার্থিব শক্তির আকর্ষণে, উচ্চতর প্রভাবে পঁহুচিয়া, মনুষ্যকে দেবাত্মার মহিমা দেখাইতেছেন।

হোম, উল্লিখিতরূপ তন্ময় আবিষ্ট অবস্থায়, ঈশ্বরের প্রেম,—পরলোকের অস্তিত্ব,—লোকান্তরবাসী পুণ্যাত্মাদিগের সুখ-সম্পদ্‌,—পাপাত্মার তমিস্র দুঃখদুর্ভোগ এবং বহুদুঃখের পর ক্রমোন্নতি ও শান্তিলাভ,—আর, মানবজীবনে—সর্ব্বজনে নিরভিমান-প্রীতিদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে, যে সকল উপদেশ-বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাহা সকলের প্রাণেই তখন দেব-বাক্যের ন্যায় অনুভূত হইত;—যে শুনিত, তাহারই শরীর শিহরিয়া উঠিত। তিনি ঐরূপ সময়ে ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে, পৃথিবীর মনুষ্য যেমন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া, অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি পদার্থের উপর অসাধারণ প্রভুত্ব লাভ করে; লোকান্তরবাসী দেবাত্মারাও সেইরূপ, অধ্যাত্মশিক্ষায় উন্নত হইয়া, জড় ও অজড় উভয় জগতের উপর আশ্চর্য্য প্রভুত্বলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রভুত্ব অসীম। তাঁহারা যখন ইচ্ছা করেন, তখনই, তাঁহাদিগের আকর্ষণী ও বিকর্ষণী প্রভৃতি বিবিধ দিব্য শক্তির মহিমায়, জলে আগুন জ্বলে, এবং অগ্নি জলের মত শীতল অথবা সুখ-স্পর্শ হইয়া থাকে। হোমের অগ্নিস্নান কার্য্যে এ কথা অক্ষরে অক্ষরে

প্রমাণিত হইত; এবং তিনি যাঁহাদিগের দেহে আত্মশক্তি সঞ্চারণ করিতেন, অগ্নির সুশীতল স্পর্শ তাঁহাদিগকেও ক্ষণকাল কিরূপ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত রাখিত।

অগ্নিস্নানের এই অদ্ভুত বিবরণ উপলক্ষে, লণ্ডনের মত কূট-তর্ক ও ক্রুর-পরীক্ষার স্থলে, কত প্রকারের আন্দোলন ঘটিয়াছে, এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কত প্রকারের আলোচনা হইয়াছে, তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা, এ প্রসঙ্গে, নিজ নিজ গ্রন্থপত্রে, আপনার মত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমরা স্থানাভাববশতঃ সম্প্রতি তিনটি মাত্র লোকের কথা কহিব। ১। ( Dr. Alfred R. Wallace ) ডক্টর এলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। ২। ( Eugene Crowell, M. D. ) ইউজিনি ক্রোয়েল। ৩। ( S. C. Hall. ) এস, সি, হল।

ডক্‌টর ওয়ালেস আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে অদ্যাপি একটি জ্যোতিঃস্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন ; এবং তৎপ্রণীত অধ্যাত্মতত্ত্বসংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থাদি সকলেরই সহজ লভ্য। ইউজিনি ক্রোয়েল আমেরিকার পণ্ডিত। তিনি, সাধারণতঃ চিকিৎসক বলিয়া সম্মানিত হইলেও, বৈজ্ঞানিক সমাজে সুপরিচিত ; এবং লোক-হিতৈষি-ধার্ম্মিক ও সুলেখক বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত। তিনিও, তাঁহার অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক সুবৃহৎ গ্রন্থচয়ে, আবিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা অগ্নিস্পর্শ ও অগ্নিস্নানের অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, এ বিস্ময়াবহ সত্যে আপনার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। আমরা এখানে পণ্ডিতবর হলের কথাই একটুকু বিবরিয়া লিখিব। কারণ হল, ডি ডি হোমের অনুগ্রহে, আপনিও অগ্নিস্নান করিয়াছেন ; এবং মানুষ আগুনের বোঝা মাথায় লইয়াও, ঈশ্বরের উচ্চতর নিয়ম-বিধানে, কিরূপ নিশ্চিন্ত রহিতে পারে, তিনি আত্মদেহে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

হল, বিজ্ঞদিগের নিকট বারিষ্টর বলিয়া পরিচিত হইলেও, পণ্ডিতদিগের মধ্যে আপনার অসামান্য পাণ্ডিত্য হেতু উচ্চপদবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; এবং বিয়াল্লিশ বৎসরকাল, ( Art Journal ) শিল্পসন্দর্ভনামক পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া ও বহুবিধ গ্রন্থ লিখিয়া, স্বদেশীয় সমাজে বড় লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। গুণগ্রাহিণী ভিক্টোরিয়া, হলকে, তদীয় জ্ঞানগৌরবে, বিশেষ সম্মান করিতেন; এবং লণ্ডনের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তাঁহাকে সম্মান করিতে ভালবাসিতেন। হল অধ্যাত্মসত্যের একটি সম্ভ্রান্ত সাক্ষী। তিনি তাঁহার সাক্ষ্যদানসম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একখানি গ্রন্থের একটি বিশেষ প্রবন্ধের নাম—( "Wonders I have seen" ) —"অর্থাৎ আমার চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ আশ্চর্য্য ঘটনাবলী।" এখানে সে সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবৃতি অনাবশ্যক। কিন্তু হল, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে, জ্বলন্ত অগ্নিরাশি মাথায় লইয়া, কিরূপ বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া-

ছিলেন, সেটুকু পাঠকের অবশ্যই পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়।

হলের অগ্নিস্নান অথবা অগ্নিধারণ সময়ে, লণ্ডনের অন্যতম প্রসিদ্ধ বারিষ্টার ( H. D. Jencken ) এচ্, ডি, জেন্‌কেন্, ( Lord Lindsay ) লর্ড লিণ্ড্‌সে, ( Lord Adare ) লর্ড এডেয়ার প্রভৃতি বহু বিচারপটু বিচক্ষণ ব্যক্তি চারি ধারে উপবিষ্ট। ঘরের অগ্নিকুণ্ডে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে; এবং হোম তখন, দেবাবিষ্ট অবস্থায়, পুনঃ পুনঃ সেই অগ্নির কাছে যাইয়া, আপনার শরীরের কটি পর্য্যন্ত অগ্নির মধ্যে ডুবাইয়া দিতেছেন। এ সময়ে, দর্শকদিগের মধ্যে এক জনে, একটুকু সংশয়াকুল মনে, জিজ্ঞাসা করিলেন, —"এ অগ্নি আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে কি?" হোম বলিলেন,—"যাহারা ঈশ্বর ও দেবশক্তিকে সজীব সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করে, তাহারা পারে।"

হোমের ভাব-গদ্গদ বাক্য শুনিয়া, বিশ্বাস-ভক্তিপরায়ণ বৃদ্ধপণ্ডিত হল নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং হোম তৎক্ষণাৎই, সম্মুখবর্ত্তি অগ্নিকুণ্ড হইতে, একটা অতিবৃহৎ জ্বলদঙ্গার-পিণ্ড হাতে তুলিয়া, হলের মাথার উপর আনিয়া স্থাপন করিলেন। দর্শকেরা চমকিত হইয়া হলকে জিজ্ঞাসা করিল,— "কেমন—আপনার কিরূপ বোধ হইতেছে?" হল প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আগুনের মত লাগে না, কিন্তু স্পর্শটা মৃদু তাপযুক্ত।" হোম তখন হলের কাছে যাইয়া, তাঁহার সুদীর্ঘ শুভ্র কেশগুলি সেই আরক্ত অঙ্গার-পিণ্ডের উপর পিরামিডের ধরণে সাজাইয়া, ধীরে ধীরে একটি চূড়া বাঁধিলেন। সকলে দেখিল যে, হলের মাথার উপর লাল রঙের আগুন জ্বলিতেছে; এবং মাথার কেশনিচয়, সে আগুনের মধ্যে, অতি সূক্ষ্ম রজত-রেখার মত শোভা পাইতেছে! *

অগ্নিকুণ্ডের ঐরূপ লাল আগুন মা জানকীর নীল-কুঞ্চিত-কেশরাশি এবং শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কিরূপ আশ্চর্য্য শোভা ফলাইয়াছিল, তাহা বাল্মীকির অল্লা-

* "Mr. Hall was seated nearly opposite to where I sat; and I saw Mr. Home, after standing about half a minute at the back of Mr. Hall's chair, deliberately place the lump of burning coal on his head! I have often wondered that I was not frightened, but I was not; I had perfect faith that he would not be injured. Some one said, 'Is it not hot'? Mr. Hall answered, 'warm, but not hot.' Mr. Home had moved a little way, but returned, still in a trance; he smiled, and seemed quite pleased, and them proceeded to draw up Mr. Hall's white hair over the red coal. The white hair had the appearance of silver thread over the red coal. Mr. Home drew the the hair into a sort of pyramid, the coal, still red, showing beneath the hair." Mrs. Hall's letter printed in the *Spiritual Magazine*,—1870.

ক্ষর-গ্রথিত কথার কবিসমুচিত সম্প্রসারণে একখানি পরবর্ত্তি কাব্যে* অতি সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। যথা, মহানাটকীয় নবমাঙ্কে,—

"বাহ্নৌ প্রবিষ্টায়াং সীতায়াম্।"

"পদে পানৌ লাক্ষা, বসনমিব কৌসুম্ভরঞ্জনং
কটীদেশে, কেশেষরুণরুচি কহ্লারকুসুমম্;
হরিদ্রামুদ্রাস্যে ঘনকুচতটে কণ্ঠনিকটে,
কৃশানুর্বৈদেহ্যাঃ শপথসময়ে ভূষণমভূৎ।"—

অর্থাৎ,—মা জানকী যখন অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সে অগ্নি তাঁহার জন্য অপূর্ব্ব আভরণের মত হইল। অগ্নির জলন্ত শিখা, তাঁহার পাদ-যুগলে ও করকমলে অলক্তরাগের ন্যায়,—কটিদেশে কুসুম্ভরাগ-রঞ্জিত বিচিত্র বসনের ন্যায়, কেশরাশিতে রক্তোৎপলের ন্যায়, এবং বদনে,—বক্ষঃস্থলে ও কণ্ঠদেশে হরিদ্রাবিলেপের ন্যায়,—প্রতিভাত হইয়া, এক অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিল।

শ্বেতশীর্ষ বৃদ্ধ হুলের রজতসূত্রান্বিত কেশ-রাশিতে তাদৃশী শোভা অসম্ভব। কিন্তু অগ্নিশিখার লোহিত আবরণে সে কেশও ক্ষণকাল দর্শনীয় হইয়াছিল। অগ্নিপিণ্ড যখন হুলের মস্তক হইতে অপসারিত হইল, তখন সকলেই দেখিল যে, তাঁহার একগাছি কেশেও আঁচ লাগে নাই, এবং তাঁহার শরীরেও কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে নাই।* ইহাতে অনেকের মনে সাহস বাড়িল। বোধ হয়, কাহারও মনে, অগ্নির স্বাভাবিকতা সম্পর্কেও সামান্য একটুকু সংশয় জন্মিল। কিন্তু সে সাহস অথবা সংশয় বহুক্ষণ রহিল না। কারণ, যেই তাহারা হাত বাড়াইয়া আগুন ধরিল, অমনিই তাহাদিগের হাত পুড়িল।

হুলের অনুকরণে, লর্ড লিণ্ড্সে এবং মিস্ ডগলাস্ও, ঐরূপ জ্বালাময় অগ্নিপিণ্ড হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন; অগ্নি তাঁহাদিগের হাতে কোন অংশেও সন্তাপ-প্রদ না হইয়া শীতল অনুভূত হইয়াছিল।§ আর এক জনে, একখানি সংবাদপত্রকে আট দশ

* সে কাব্য সাধারণ নাটক নহে—মহানাটক। মহানাটক সংস্কৃতসাহিত্যভাণ্ডারে এক অপূর্ব্ব বস্তু। উহা কিয়দংশে নাটক, কিয়দংশে আখ্যায়িকা। রচনা-পর্য্যালোচনায় সকলেরই এই প্রতীতি হইবে যে, উহা অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি নব্য নাটকনিচয়ের বহু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু লেখক কে, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। প্রতিভান্বিত লেখক আপনাকে হনূমৎ কবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

* "When taken off the head, without in the slightest degree injuring it or singing the hair, others attempted to touch the coal and were burnt." Dr. Wallace.

§ "Lord Lindsay and Miss Douglas have also had hot coals placed in their hands, and describe them as feeling rather cold than hot; though, at the same time, they burn any one else, and even scorch the face of the holder if approached too closely." Dr. Wallace.

পটলে পটলিত করিয়া, সে অগ্নি গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সংবাদপত্রখানি তৎক্ষণাৎই, পটলে পটলে, এ পিঠে ও পিঠে পুড়িয়া গিয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে ডক্টর ওয়ালেস, বহু পর্য্যালোচনা করিয়া, লিখিয়াছেন,—"এ সকল ঘটনা এত লোকের সমক্ষে এত বার সংঘটিত হইয়াছে যে, ইহাদিকের সত্যতা সম্বন্ধে এখন আর অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। তবে এই এক কথা, এ সকল সংঘটন জড়বিজ্ঞান ও তাপতত্ত্বের পরিজ্ঞাত নিয়ম অনুসারে বুদ্ধির অগম্য।"*

অগ্নি লইয়া এইপ্রকার পরীক্ষা শুধু হোম ও হল প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের দ্বারাই প্রদর্শিত হয় নাই। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, সিকাগো নগরে, (Miss Suydam) মিসেস সুইদাম নাম্নী একটি অধ্যাত্ম-মাধ্যমিকা, দেবশক্তির আবেশে, অগ্নি লইয়া দীর্ঘকাল নানারূপ অদ্ভুত দৃশ্য প্রদর্শনের দ্বারা, বহু লোকের হৃদয়ে বিস্ময় ও ভক্তি প্রভৃতি উচ্চতর ভাব সঞ্চারণ করিয়াছিলেন। তিনি অগ্নিতে স্নান করিতেন না। কিন্তু অগ্নিময় অঙ্গার, কাষ্ঠ, কিংবা লৌহপদার্থ হাতে তুলিয়া লইতেন। গ্যাসের আলো অথবা অন্য কোন প্রকার দীপশিখার উপর আপনার হাতখানি রাখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন যে একটি লোকান্তরবাসিনী দেবত্ব-প্রাপ্ত রমণী তাঁহার দেহে আবির্ভূত হইয়া শক্তি সঞ্চারণ করেন; এবং সেই শক্তিরই আবেশ-সময়ে, তিনি অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতে পরিরক্ষিত রহিয়া, আগুনের পিণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। দর্শকেরা সুইদামের বর্ণিত সূক্ষ্মশরীরিণীকে (Fire Queen) অর্থাৎ অগ্নিরাজ্ঞী বলিয়া বর্ণনা করিতেন; এবং সুইদামের হাত আগুনের উপর কিংবা আগুনের মধ্যে বহুক্ষণ প্রসারিত থাকিয়াও যে একবারে বরফের মত শীতল রহিত, ইহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন।*

এ স্থলে অতি বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করি যে, হোম, হল ও সুইদামের মত সাধারণ নর-নারীরাও যদি, অধ্যাত্মশক্তির অজ্ঞের মহিমা অথবা দেবাত্মার অনুগ্রহ-প্রভাবে, গায়ে আগুন মাখিয়া,—আগুনের বোঝা বুকে ও মাথায় রাখিয়া, অথবা অগ্নির লক-লক জিহ্বা-সদৃশ শিখাসমূহের মধ্যে কিয়দংশে অবগাহন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে অস্পৃষ্ট রহিতে পারেন; তাহা হইলে, যিনি জগতের রমণীজাতিকে সতীত্বধর্ম্মের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া শতপ্রকার দুঃখ-

* "These phenomena have now happened scores of times in the presence of scores of witnesses. They are facts of the reality of which there can be no doubt, and they are altogether inexplicable by the known laws of Physiology and heat." Dr. Wallace.

* "While She is under the control of the "Fire Queen"—so they term the spirit that controls her—her hands are cold and clammy; as cold ae ice." The Religio-Philosophical Journal, as quated by Dr. Crowell, M. D.

বিড়ম্বনায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, এবং একই আধারে অগ্নিকল্প-তেজস্বিতা ও অমৃত-শীতলা স্নেহমমতা,—ঋষি-তাপস-পূজ্য পবিত্রতা ও রমণীহৃদয়-শোভিনী সুকুমার-কোমলতা প্রভৃতি গুণরাশি লইয়া, তদানীন্তন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশে ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজে, রাম-হেন জগদাদর্শ পুরুষের জীবনসঙ্গিনীরূপে বিরাজমানা ছিলেন, দেবতারা তাঁহাকে, আগে রাবণের অশোকবনে, তার পর অগ্নিপরীক্ষার জলন্ত দহনে, প্রীতির সহিত আবরিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহাতে কিছুই অবিশ্বাসের কথা থাকে কি? মনুষ্য যদি অতীন্দ্রিয় শক্তির বিশেষ প্রয়োগে,—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে,—বৈজ্ঞানিক সভ্যতার শীর্ষস্বরূপ লণ্ডন, বোষ্টন কিংবা সিকাগো নগরে, শতবৈজ্ঞানিকের দিদৃক্ষু-নয়ন-গোচরে, অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে, ভারতের বাল্মীকি-ব্যাস-প্রমুখ মহাতপা মহর্ষিবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, সহস্র কোটি হৃদয়, আজি * সাত হাজার বৎসর, যাঁহাকে পুণ্যময়ী দেবতার অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই রামায়ণী গঙ্গাস্বরূপিণী আশৈশব-শুদ্ধচারিণী জনকনন্দিনী, বিশুদ্ধ স্বর্ণপ্রতিমার মত, অগ্নিপরীক্ষায় অক্লেশে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাতে সংশয়ের সামান্য মাত্র স্থল থাকাও সম্ভবপর হয় কি?

বুদ্ধি যত কাল, বিজ্ঞানের উচ্চতর গ্রামে আরূঢ় হইয়া, বিশ্বরহস্য অধ্যয়নে অসমর্থ রহে, তত কাল পর্য্যন্ত, নিত্যপরিলক্ষিত আহার-নিদ্রা এবং আমোদ-প্রমোদের কথা ছাড়া, আর সকল কথাই উহার নিকট অবিশ্বাস্য। চতুর্দ্দশ লক্ষ পৃথিবীর মত বৃহৎপিণ্ড-সূর্য্য আকাশে শূন্যে ঝুলিতেছে, এবং সেই সূর্য্য হইতে একটি সূক্ষ্মতম জ্যোতিরেখা শত সহস্র কোটি যোজন পার হইয়া, পৃথিবীতে আসিয়া, গোলাপ, গন্ধরাজ ও গুঞ্জভৃঙ্গ সরোজিনীর অঙ্গে রঙ্ ফলাইতেছে; অথবা সর্ষপ-প্রমাণ বীজ হইতে শত-শাখা-প্রসারিত বিশাল বট বিকাশিত করিয়া অসংখ্য বন-বিহঙ্গকে আশ্রয় দিতেছে, ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য। আর, সামান্য কএকটি তৈজস-পরমাণুর আলোড়নে একটা আতঙ্কজনক তূর্ণড উদ্ভূত হইয়া অসংখ্য গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত করিতেছে; অথবা মনুষ্যের চিন্তা, গ্রাম ও নগর, এবং পর্ব্বত ও সাগর পার হইয়া, বিনা তারে, দেশদেশান্তরে, সংবাদ লইয়া যাইতেছে, ইহাও পূর্ব্বোক্তরূপ লোকের পক্ষে বিশ্বাস ও বুদ্ধির অগ্রাহ্য। অযোধ্যার অনেক চিন্তাশ্রম-শূন্য, কার্য্যকারণ-তত্ত্বজ্ঞানহীন সামান্য লোক, রাম-লক্ষ্মণের মত পুরুষের সাক্ষ্যেও উপেক্ষা করিয়া, জানকীর অগ্নিপরীক্ষা-বৃত্তান্তে অবিশ্বাসী হইয়াছিল। যথা, রামের উক্তিতে,——

* রামায়ণের ইতিহাস ঠিক সাত হাজার বৎসরের পুরাতন বৃত্তান্ত কি না, ইহা অবধারণ করা কঠিন হইলেও, উহা যে মহাভারতের বহু পূর্ব্ববর্ত্তি ঘটনা, সে বিষয়ে টালবয় হুইলার ও তদীয় শিষ্যবর্গ ভিন্ন আর কাহারও মনে সংশয় থাকিতে পারে না।

যচ্চাদ্ভুতং কর্ম্ম বিশুদ্ধি কালে,
প্রত্যেতু কস্তদ্ধ্যাতিদূরবৃত্তম্।"

"হা! সেই অগ্নিপরীক্ষার সময়ে যে অদ্ভুত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অতি দূর-বর্ত্তী দেশের কথা। কে তাহাতে বিশ্বাস করিবে?"

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে আর একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অবশিষ্ট রহিয়াছে। বাল্মীকি লিখিয়াছেন,—এবং তদীয় লেখা ও পৌরাণিকদিগের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পৈত্র্যাভিমানী হিন্দুমাত্রই কহিয়া থাকেন যে, যে সকল দেবপুরুষ, শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আবির্ভূত হইয়া, জানকীর অপ্রতিম চারিত্রশুদ্ধি বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, শুভ্রমূর্ত্তি দশরথও, শ্বেতাম্বর-বিভূষিত সমুজ্জ্বল বেশে, তাঁহাদিগেরই সহিত ক্ষণকালের তরে দেখা দিয়া, জানকীরে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ আসিয়া দর্শন দান করিয়াছিলেন, এ কথাও কি সত্য? যে দশরথ, রাম-শোকে আকুল হইয়া, হা! রাম বলিতে বলিতে, অযোধ্যায় তনুত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দশরথ, চৌদ্দটি বৎসরের পর, অযোধ্যা হইতে বহুসহস্র-যোজন-দূরস্থিত সমুদ্রবেষ্টিত লঙ্কায় আসিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত আলাপ এবং জানকীরে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, ইহাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে?

এই শেষ-প্রশ্নের প্রত্যুত্তরেও আমরা কুণ্ঠিত কণ্ঠে এই মাত্র বলিব যে, যিনি লোকান্তরিত আত্মা ও চর্ম্মচক্ষুর অগ্রাহ্য অধ্যাত্মজগতের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করেন, বাল্মীকি ও ব্যাসের উদার হিন্দুধর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধতর্পণের ব্যবস্থান্বিত উন্নত হিন্দুজীবন তাঁহার জন্য নহে। পৃথিবী যখন শিক্ষা ও সভ্যতার সাধারণ আলোকেও বঞ্চিত ছিল, বাল্মীকি ও ব্যাস এবং ভারতবর্ষের আরও বহু তত্ত্বদর্শী ঋষি সেই সময়েও, পরলোক, পারলৌকিক জীবন,—পরলোকে পরস্পরের পুনঃসম্মিলন, এবং লোকান্তরিত আত্মীয়-জনের সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎকার-সংঘটন-সম্পর্কে অশেষপ্রকারে উপদেশ দিয়াছেন; আর, আজিকার দিনে, বিদ্যাদালোক-দীপ্ত বিজ্ঞানশিক্ষার বিবিধ নিকেতনে, ক্রুকস্, ক্রোয়েল, কামিল ফ্লামারিয়ন্, ওয়ালেস্, এপ্‌স্ সার্জেণ্ট, ব্যাবিট ও ডেণ্টন প্রভৃতি বিশ্রুত-কীর্ত্তি বৈজ্ঞানিকেরাও, নানাপ্রকার কঠোর প্রণালীতে পরীক্ষা করিয়া, সেই কথারই সমর্থন করিতেছেন।

সার উইলিয়ম ক্রুকস্, অধ্যাত্মমূর্ত্তির অঙ্গ-চ্ছিন্ন হস্ত অনেক দিন দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দুইটি রক্ত-মাংস-চর্ম্মময় অঙ্গুলি; অথবা তাদৃশ পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত—অথচ বাহুর সহিত অসম্পৃক্ত—একখানি হস্ত মাত্র ঘরের মধ্যে শূন্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এবং ঐ অবস্থায় একটি ফুল অথবা পেন্‌সিল লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, ইহা তিনি চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু, ইহা ছাড়া, তিনি তাঁহার স্বগৃহে, সুহৃৎস্বজনের সহিত একসঙ্গে, পূর্ণাবয়ব ছায়ামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। সার্ উইলিয়ম ইহা

স্বীকার করিয়াছেন যে, যাঁহারা সূক্ষ্মশরীরী, তাঁহাদিগের পক্ষে স্থূল-পরমাণু-সঙ্কলন দ্বারা, স্থূল দেহ ধারণ এবং স্থূল জগতে আপনাদিগের মূর্ত্তি প্রদর্শন বড়ই কঠিন। তথাপি, তিনি যে ভাবে, যেরূপ সময়ে, ঐ রূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভাষাতেই পরিষ্কার বর্ণিত রহিয়াছে। *

একদিন সন্ধ্যা হইয়াছে। সার্ উইলিয়ম ক্রুকস্ তাঁহার স্বগৃহে উপবিষ্ট। তাঁহার কএকটি বৈজ্ঞানিক সুহৃৎ, ডি ডি হোমকে লইয়া, তাঁহার চারি ধারে বসিয়া আছেন। ঘরের সকল দ্বার দৃঢ় রুদ্ধ, গবাক্ষ গুলিও পরদায় আবৃত। সে ঘরে একটি মক্ষিকাও কোন দিক্ দিয়া, সকলের দৃষ্টির অগোচরে, প্রবেশ করিবে এমন পথ নাই। এমন সময়ে সকলেই দেখিতে পাইল যে, একটি মনুষ্যাকৃতি মূর্ত্তি, গবাক্ষের সম্মুখে, অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; এবং সে গবাক্ষের পরদাটি হাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে নাড়িতেছে। মূর্ত্তির বর্ণ অন্ধকার-ছায়াময়, তথাপি কতকটা স্বচ্ছ; যেন উহার এ পিঠ ও পিঠ দেখা যায়। আমরা সকলে যখন উহার দিকে চাহিলাম, তখন মূর্ত্তি শূন্যে মিশিয়া গেল; পরদা আর নড়িল না।

সার্ উইলিয়মের বিবেচনায়, পরবর্ত্তি কাহিনীটি অধিকতর আশ্চর্য্য। এ দিনও তিনি পূর্ব্বের মত আপনার ঘরেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং তাঁহার পরীক্ষা-সহচর সুহৃদ্বর্গ এবং ডি ডি হোমও পূর্ব্বের মত সঙ্গে আছেন। কিন্তু এ দিন যাহা ঘটিল, তাহাতে সকলের শরীরই কণ্টকিত হইল। ছায়ামূর্ত্তি এ দিন ঘরের প্রান্তে আবির্ভূত হইয়া সকলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটি একর্ডিয়ন ছিল। একর্ডিয়ন এক প্রকারের বাদ্যযন্ত্র। সকলেই উহা হাতে তুলিয়া লইয়া সহজে বাজাইতে পারে। ছায়ামূর্ত্তি সেই একর্ডিয়নটি হাতে তুলিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিল; এবং ঘরের চারি দিকে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ঐ ভাবে ঐ যন্ত্রটি বাজাইল। এ দৃশ্য ধাঁধাঁর মত না হইয়া প্রকৃতই কিছুকাল স্থায়ি ছিল। সুতরাং সকলেই, বহুক্ষণ, চক্ষে মূর্ত্তি দেখিল, এবং কর্ণে যন্ত্রের মধুর আলাপ শুনিতে পাইল। ঐ ঘরে একটি ভদ্রমহিলা, এক প্রান্তে, একাকিনী উপবিষ্টা ছিলেন। মূর্ত্তি যখন তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি চকিতবৎ একটুকু মৃদু চীৎকার করি-

* "Phantom Forms and Faces,—These are the rarest of the phenomena I have witnessed. The conditions requisite for their appearance appear to be so delicate, and such trifles interfere with their production, that only on very few occasions have I witnessed them under satisfactory test conditions. I will mention two of these cases." Researches in The Phenomena of of Spiritualism by William Crooks, F. R. S.

লেন। মূর্ত্তি সে চীৎকার শব্দ শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তেই তিরোহিত হইল। *

উল্লিখিত-রূপ ছায়ামূর্ত্তি, পৃথিবীর স্থূল পরমাণুতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জড়িত হইলেও, প্রতিবিম্ব-মূর্ত্তিবৎ। কিন্তু, দশরথ যে মূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়াছিলেন, তাহা এ রূপ ছায়ামূর্ত্তি নহে। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ভাষায়, তাদৃশ মূর্ত্তির নাম—Materialized Form—অর্থাৎ নির্ম্মাণ-কায়া। উহা রীতি মত স্পর্শযোগ্য মনুষ্যমূর্ত্তি। লোকান্তরবাসী সূক্ষ্মশরীরীরা যখন, স্বকীয় ক্ষমতায়, অথবা ক্ষমতাপন্ন দেবপুরুষদিগের সাহায্যে, ঐরূপ স্পৃশ্যমান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহারা মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারেন; এবং মনুষ্যকে প্রাণের ভালবাসায় আলিঙ্গন করিয়া, অথবা মনুষ্যের গায়ে আশীর্ব্বাদের ভাবে হাত বুলাইয়া, আত্মহৃদয়ের প্রীতিস্নেহ জ্ঞাপন করিতেও সমর্থ হইয়া থাকেন। সার্ উইলিয়ম, যেমন পরের ঘরে, তেমন আপনার ঘরে, একাদিক্রমে, অনেক দিন, তাদৃশ জড়দেহ-প্রকাশিত লোকান্তরিত রমণীর দর্শন লাভ করিয়াছেন,—স্বহস্তে ফটোগ্রাফিক যন্ত্রগ্রহণে ও স্বকীয় বিশ্বস্ত বৈজ্ঞানিক সহযোগীর সাহায্যে, সে স্বর্গীয়া রমণীর প্রতিকৃতি তুলিয়াছেন; আর তাঁহাকে হস্তস্পর্শে সত্য বস্তু বলিয়া বুঝিয়া, এবং নানারূপ আলাপে ইংলণ্ডের পুরাতন অধিবাসিনী বলিয়া সম্যক্ বিশ্বাস করিয়া, তৎসম্পর্কে সমগ্র মানবজাতির নিকট নির্ভয়ে সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। *

সার্ উইলিয়ম্ ফটোগ্রাফ্ তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে হৃদয়ে তৃপ্তি লাভ করেন নাই। তিনি এতৎসম্পর্কে ধ্যান-গভীর বিষাদের ভাষায় বলিয়াছেন যে,—"শব্দের দ্বারা যেমন সে স্বর্গীয় মূর্ত্তির চাল-চলন-ভঙ্গীর চারুমাধুরী বর্ণনা করা অসম্ভব, ফটোগ্রাফী দ্বারাও সেইরূপ তদীয় মুখমণ্ডলের পূর্ণ-বিকশিত ঢল-ঢল লাবণ্য প্রতিফলিত করা একবারে অসাধ্য। ফটোগ্রাফী অর্থাৎ প্রভাচিত্র-প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাঁহার সে মুখচ্ছবির সাধারণ একখানি (map) প্রতিকৃতি মাত্র পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহা কিরূপে তাঁহার বর্ণের অমল-ধবল অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা অথবা ভাব-চঞ্চল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিমুহূর্ত্ত-পরিবর্ত্তনশীলতা চিত্রে ফলাইবে? তিনি যখন, তাঁহার পার্থিব জীবনের অতীত কাহিনী কহিবার সময়ে, কোন দুঃখের কথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন তাঁহার মুখের উপর অকস্মাৎ কেমন একখানি বিষণ্ণতার ছায়া পড়িত; অপিচ, যখন পুরাতন-স্মৃতির কোন পবিত্র সুখের কথা কহিতে

* Researches in The Phenomena of Spiritualism by William Crooks, F. R. S.

* আমাদিগের নিকট সে ফটোগ্রাফের মুদ্রিত প্রতিলিপি আছে। কিন্তু লণ্ডনের অসংখ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিত আসল ফটোগ্রাফ চক্ষে দেখিয়াছেন।

আরম্ভ করিতেন, তখন সেই মুখখানিই আবার শিশুসমুচিত সরল-প্রফুল্লতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। তাঁহার কাছে উপবিষ্ট থাকা কালে সকলেরই মনে লইত যে, চারিদিকের বায়ু যেন তাঁহার দৃষ্টিসংস্পর্শে স্বচ্ছতর ও সুখ-শীতল হইয়াছে; এবং আকাশের নীলপট যেমন, ক্ষণে ক্ষণে, বর্ণ-বৈচিত্র্যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাঁহার কোমল-মধুর মনোহর নয়ন-পটও যেন, ক্ষণে ক্ষণে, সেইরূপ ভাব-বৈচিত্র্যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাঁহার মহানুভব-সান্নিধ্যে মনে আপনা হইতেই এইরূপ একটি ভাবের উদয় হইত যে, ঈদৃশ স্থলে জানুপাত-সহকারে প্রণাম করা পৌত্তলিকতা নহে।" *

পাঠক এস্থলে জানিয়া রাখিবেন যে, লোকান্তরবাসিনীর অপ্রতিম রূপ ও আলাপ-মাধুর্য্যের উপরিধৃত বর্ণনা কোন ভাবুক-পণ্ডিত অথবা যুবক-কবির রচনা নহে। যিনি ইহা লিখিয়াছেন, তিনি বৃদ্ধবৈজ্ঞানিক,—অধুনাতন বৈজ্ঞানিক জগতের সর্ব্ববাদিসম্মত গুরু,—জড়তত্ত্বের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য, এবং অতি কঠোর ও নীরস-নিষ্ঠুর তত্ত্বপরীক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ, সার্ উইলিয়ম ক্রুক্সের পরীক্ষাপ্রণালীর উপর কোনরূপ দোষ অথবা সংশয়ের ভাব আরোপণ করিতে পারে, এমন ব্যক্তি জীবিত নাই। সার্ উইলিয়ম, নির্জ্জনে বসিয়া, লোক-লোচনের অগোচরে, শুধুই তাঁহার গ্রন্থপত্রে, নীরব-সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এমন নহে। আজি কএক বৎসর হইল, তিনি—British Association of Science—অর্থাৎ বৃটনীয় বৈজ্ঞানিক-সভার বার্ষিক অধিবেশনে,—দেশের সমস্ত বৈজ্ঞানিকদিগের সমবেত-সম্মেলনে দণ্ডায়মান হইয়া, সভাপতিরূপে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন যে,—"এই প্রত্যক্ষ জগতে যে স্থানে জড়-শক্তির শেষ-সীমা, সেই স্থানেই অনন্ত-শৃঙ্খলাবদ্ধ অধ্যাত্মশক্তির আরম্ভ; এবং তিনি, দেশীয় বৈজ্ঞানিক ও বিদ্বৎসমাজের বিশেষ অনুরোধে, পনরটি বৎসরকাল, অধ্যাত্মতত্ত্বের আমূল অনুসন্ধান করিয়া, যে সকল আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটি অনুস্বার অথবা বিসর্গও অসত্য নহে *।"

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও প্রথিতনামা ধন-কুবের, সাধুমতি লিভারমোর আপনার লোকান্তরিত সহধর্ম্মিণী ও লোক-গুরু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে ক্রমান্বয়ে তিন চারি শত দিন নিজ প্রাসাদ-নিচয়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; এবং চক্ষে তাঁহাদিগের ঝলমল জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দর্শনে,—কর্ণে তাঁহাদিগের মধুর

* অনূদিত-বর্ণনার প্রথম অংশ আক্ষরিক অনুবাদ, শেষ অংশ ভাবানুবাদ মাত্র। অক্ষরে অক্ষরে সর্ব্বত্র মূলের অনুসরণ করিতে পারি নাই বলিয়াই শেষভাগের তাৎপর্য্যার্থ মাত্র সংকলনে বাধ্য হইয়াছি। বঙ্গীয় পাঠকবর্গ সার্ উইলিয়মের মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে, প্রীত ও চমৎকৃত হইবেন।—বান্ধব-সম্পাদক।

* Vide Sir William Crook's Address to the British Association of Science, held at Bristol.

ও গভীর কথা শ্রবণে, এবং হস্তে সেই কেমন এক স্থকোমল কুসুম-স্নিগ্ধ শীতল-স্পর্শলাভে কৃতার্থ হইয়া, হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় হর্ষোচ্ছ্বাসে অশ্রুজলে ভাসিয়াছেন।

পাঠক তিন চারি শত দিনের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবে না। কারণ, লিভারমোর, কোন্ মাসে,—কোন্ দিন,—কেমন সময়ে, —কি ভাবে, তাঁহার স্বর্গগতা পত্নী (Estella) এস্‌টেলা ও ডক্‌টর ফ্রাঙ্কলিনের দর্শনলাভ করিতেন, তাহা তাঁহার ডায়ারি অর্থাৎ দৈনিকবিবৃতিতে, দিনের পর দিনে, যথাক্রমে, লিপিবদ্ধ আছে; এবং সে দৈনিক দর্শন-কাহিনী, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আরব্ধ হইয়া, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ঐ সময়ে Spiritual Magazine অর্থাৎ অধ্যাত্মতত্ত্বসন্দর্ভ নামে একখানি পণ্ডিত-জন-পাঠ্য মাসিকপত্র কএকটি উচ্চশিক্ষিত ধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিতের দ্বারা সম্পাদিত হইত। লিভারমোরের তাদৃশ মূর্ত্তিদর্শন-বৃত্তান্ত ঐ মাসিকসন্দর্ভে আদ্যোপান্ত মুদ্রিত আছে।

দৈনিকলিখিত বৃত্তান্ত লইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কিরূপ তন্ন তন্ন আলোচনা হইয়াছিল, তাহা পাঠক অবশ্যই অনুমান করিতে পারেন। লিভারমোরকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার সত্যবাদিতায় সন্দেহ করিতে সাহস পাইতেন না। অত বড় ধনী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি,—অমন স্বদেশহিতৈষী, সহস্র-লোকপালক সত্যপ্রিয় পুরুষ, কি উদ্দেশ্যে—কিরূপ ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে, ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল, মিথ্যা কথা কহিয়া, মনুষ্যজাতিকে প্রতারিত করিবেন? স্বার্থ বরং সত্য গোপনের দিকে। কেন না, লিভারমোর বুদ্ধিতে বিকল এবং দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে * বিশ্বাসশূন্য হইয়াছেন, এইরূপ কথা প্রচারিত হইলে, তাঁহার বিশাল বিষয়বাণিজ্যের ঘোরতর ব্যাঘাত সম্ভাবিত। কিন্তু তথাপি, কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতেন যে, লিভারমোর শোকে আচ্ছন্ন; সুতরাং তাঁহার দীমূর্ত্তি-দর্শন-লাভ শোকাচ্ছন্ন বুদ্ধির সাময়িক ভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে।

* আমেরিকার প্রচলিত ধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম। উহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের মূল-মর্ম্মে বড় বেসী পার্থক্য। হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে মনুষ্য, দেহত্যাগের পর, অধ্যাত্মজগতে—পিতৃলোকে—যাইয়া অবস্থিত হয়, এবং এই জন্যই তাঁহার শ্রাদ্ধাদি হইয়া থাকে। প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মানুসারে, মনুষ্য, দেহত্যাগের পর, শতসহস্র কোটি বৎসর, সমাধির গহ্বরে মোহনিদ্রায় অভিভূত রহে; এবং যখন বিশ্বসংসারের মহাপ্রলয়-সময়ে বিচার-ভেরী নিনাদিত হয়, তখন সে সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া, কৃতকর্ম্মের দণ্ড কিংবা পুরস্কার লাভ করে। খৃষ্টদেব স্বয়ং এমন উপদেশ করেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মেরই অধিকতর সামঞ্জস্য। কেন না, তাঁহার মত অনুসারে, মনুষ্য, মৃত্যুর পরক্ষণেই, সূক্ষ্মদেহ লাভ করিয়া, আপনার কর্ম্মফলানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই প্রকার সংশয়কারিদিগের প্রবর্ত্তনায়, প্রথমে ( Doctor John. F. Gray ) ডক্টর জন গ্রে নামক বিচক্ষণ চিকিৎসক, তার পর ( Mr. Groute ) মিষ্টার গ্রাউট নামক লিভারমোরের একটি সম্ভ্রান্ত আত্মীয়, কখনও পৃথক্ ভাবে, কখনও সম্মিলিতরূপে, তাঁহার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেন; এবং তাঁহারা উভয়েই ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন অথবা পতিপ্রণয়াকুলা স্বর্গবাসিনী এষ্টেলাকে সজীব মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, পারলৌকিক জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে একবারে নিঃসংশয় হন।

ডক্টর গ্রে, নিউইয়র্ক নগরে, সর্ব্বত্র পরিচিত, এবং তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর পূজাস্পদ ব্যক্তি। তিনি, তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ এপস্ সারজেণ্টের নিকট, এ প্রসঙ্গে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অধ্যাত্মতত্ত্বের ইতিহাসে সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রে লিখিয়াছেন,—"আমি লিভারমোরের সঙ্গে, অনেক দিন, প্রতীক্ষাপরায়ণ মনে উপবিষ্ট হইয়াছি; এবং সেখানে লোকান্তরিত দার্শনিক, স্বনামধন্য ফ্রাঙ্কলিনকে সজীব ও স্পর্শযোগ্য জড়মূর্ত্তিতে অনেক বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমরা বসিয়া আছি, এমন সময়ে, অনেক দিন, ঘরে অপূর্ব্ব আলো ফুটিয়াছে, এবং নানারূপ গন্ধ ও শব্দ আমাদিগের বিস্ময় জন্মাইয়াছে। কোন কোন দিন, আমাদিগের চক্ষের সান্নিধ্যে, নানারূপ ফুল ও বিচিত্র বস্ত্র, আপনা হইতে উৎপাদিত হইয়া, ক্ষণ পরে আবার শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। আমি লিভারমোরের সঙ্গে বসিয়া স্বচক্ষে যে সকল আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহাতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাঁহার সুদীর্ঘ দৈনিক-বিবৃতি-বর্ণিত যে সকল দৃশ্য আমার অসাক্ষাতে অন্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বাংশে সত্য।"*

লিভারমোর ও ডক্টর গ্রে উভয়েই এখন স্বর্গগত হইয়াছেন। আমরা এই নিমিত্ত, এখানে, তিনটি জীবিত পণ্ডিতের সাক্ষ্যমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই, এ দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কথিত পণ্ডিতত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কারণ,

* "Another friend, one I have known and honored for thirty years, Dr. John. F. Gray, of New york, writes ( Jun, 1869 ) 'Mr. Livermore's recitals of the seances in which I participated are faithfully and most accurately stated, leaving not a shade of doubt in my mind as to the truth and accuracy of his accounts of those at which I was not a witness. I saw with him the philosopher Franklin, in a living, tangible, physical form, several times : and, on as many different occasions, I also witnessed the production of lights, odors, and sounds ; and also the formation of flowers, cloth-textures, &c, and their disintegration and dispersion. &c, &c."

Gray's letter quoted by Eppes Sargent.

যাঁহারা ওয়ালেস্ ও ষ্টেড্ প্রণীত গ্রন্থপত্র পাঠ করেন নাই, তাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে অন্ধকারে আছেন। আমরা বান্ধবের অনেক প্রবন্ধেই ওয়ালেস্ ও ষ্টেডের কথা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি; এবং বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছি। এই প্রবন্ধেও, বিষয়ান্তর-প্রসঙ্গে, ওয়ালেসের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ওয়ালেস্ উচ্চপদবীরূঢ় বৈজ্ঞানিক,—ষ্টেড্ উদারতন্ত্রী রাজনৈতিক এবং সত্য ও স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বত্যাগী ধার্ম্মিক। তাঁহারা উভয়েই, লোকান্তরিত আত্মীয়ের ফটোগ্রাফ তুলিয়া, সে কথা, মনুষ্যসমাজের নিকট, পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং মনুষ্য, এখানে যেমন স্থূল-দেহে, লোকান্তরে সেইরূপ সূক্ষ্ম-শরীরে, সূক্ষ্মতর-পদার্থ-নির্ম্মিত জলস্থলময় প্রাকৃত জগতে বাস করে,—অথচ নিয়মবিশেষের আশ্রয়-গ্রহণে, পার্থিব-জগতেও সময়ে সময়ে দর্শনদান করিতে সমর্থ রহে, এই মহাসত্য প্রচার করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন। §

পূর্ব্ববর্ণিত পণ্ডিতদিগের তৃতীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষে বহু পরিচিত নহেন। কিন্তু লণ্ডনে তাঁহার সমধিক প্রতিপত্তি আছে। তাঁহার নাম ( Andrew Glendening ) এন্‌ড্রু গ্লেন্‌ডিনিঙ। ঈশ্বর-পরায়ণ গ্লেণ্ডিনিঙের বয়স এক্ষণ আটাত্তর। আমরা ওয়ালেস্ ও ষ্টেড্‌কে বড় বৈজ্ঞানিক ও বড় রাজনৈতিক বলিয়াছি; ঋষিপ্রতিম বলি নাই। কিন্তু গ্লেণ্ডিনিঙ্‌কে আমরা ঋষিপ্রতিম তাত্ত্বিক বলিতে প্রস্তুত আছি। কেন না, তিনি চরিত্রের উদারতা, চিত্তের মহত্ব ও জীবনের প্রশান্ত পবিত্রতায় প্রকৃতই ঋষিপুরুষ। তিনি জাতিতে ইংরেজ হইয়াও চিরকাল নিরামিষভোজী; এবং লণ্ডনের মত লোক-সমুদ্রে বাস করিয়াও নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। গ্লেণ্ডিনিঙের শরীরে সম্ভবতঃ একটুকু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি আছে। তিনি তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবনে অনেক দিনই স্বগৃহে ও পরগৃহে ছায়ামূর্ত্তির দর্শনলাভ করিয়াছেন। কোন কোন ছায়ামূর্ত্তির ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাহা যত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; * এবং আজি একমাস হইল একটি আত্মীয়ার প্রতিবিম্ব-মূর্ত্তি আপনার বাড়ীতে প্রত্যক্ষ করিয়া, তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধলেখককে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন।

পূজ্যস্বভাব গ্লেণ্ডিনিঙ্ বর্ত্তমান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে, প্রসঙ্গসঙ্গতির অনুরোধে, পাঠকের জন্য কিয়দংশ অনুবাদ করিব।—

"ঘটনার তারিখ ১২ই ফেব্রুয়ারি। রাত্রি

§ ওয়ালেস্ তাঁহার পরলোকগত মাতার পরিচয়-যোগ্য ফটোগ্রাফ পাইয়াছেন। ষ্টেড যে সকল ফটোগ্রাফ পাইয়াছেন, আমাদিগের নিকট তাঁহার অনেক খানির মুদ্রিত প্রতিলিপি আছে।

* গ্লেণ্ডিনিঙের স্নেহ ও অনুগ্রহে আমরা ঐরূপ একশত ফটোগ্রাফ উপহার পাইয়াছি; এবং ভবিষ্যৎপ্রয়োজন উদ্দেশ্যে যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

দুই টা বাজিয়া ত্রিশ মিনিট হইয়াছে। আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত, নিবিষ্ট চিত্তে, নির্জ্জনে বসিয়া লিখিয়াছি। লিখিতে লিখিতে যখন ক্লান্তি বোধ হইল, তখন নিদ্রার উদ্দেশ্যে শয্যার আশ্রয় লইলাম; এবং অতি অল্প ক্ষণেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নিদ্রা দীর্ঘস্থায়ি হইতে পারিল না। রাত্রি যখন ৫টা হয় নাই, তখন আপনা হইতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; এবং আমার বোধ হইল যে, আমার ঘরে আর কেহ যেন উপস্থিত আছে। ঘরে একটি গ্যাসের আলো জ্বলিতেছিল। আমার বোধ হইল, যেন আমার কনিষ্ঠা কন্যা এফি ( Effie ) সে আলোর কাছে আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এফি! তুমি এমন সময় এখানে দাঁড়াইয়া কেন? এফি আজও অবিবাহিতা। সে আমায় বড় ভাল বাসে, এবং ভক্তির সহিত আমার পরিচর্য্যা করে। আমার প্রথম এইরূপ মনে হইয়াছিল যে, বুঝি রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, এফি আমার জন্য গরম চা লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু, যে দাঁড়াইয়া আছে, সে কোন উত্তর করিল না। আমি তখন একটুকু বিস্মিত চিত্তে মাথা তুলিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম। দণ্ডায়মানা মূর্ত্তিও তখন, আলোর নিকট হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, আমা হইতে অল্প একটুকু দূরে, দৃষ্টিযোগ্য স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং আমার দিকে যার-পর-নাই স্নেহপূর্ণনয়নে তাকাইয়া রহিল।

"আমার একটি কন্যা বহুকাল হয় স্বর্গগত হইয়াছে। তাহাকে আদরের ভাষায় টিনা বলিয়া ডাকিতাম। টিনার একটি মাসীও বহুকাল হয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার নাম ছিল ফেমী। উভয়ের একটুকু আকৃতিগত সাদৃশ্য ছিল। যাহাকে দেখিতেছি সে টিনা, না ফেমী, তাহা ঐ সময়ে আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে না। কিন্তু সম্ভবতঃ ঐ দুইয়েরই একজন। আমি তখন হর্ষ, বিস্ময় ও স্নেহের সেই এক প্রকার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে আত্মহারা হইয়া, আদর করিয়া কহিলাম,—বাছা, তুমি টিনা কি ফেমী যেই হও, আমার আরও কাছে এস। তুমি নিশ্চয়ই নিতান্ত পুণ্যবতী; তাই লোকান্তরে যাইয়া এমন পবিত্র, উজ্জ্বল ও জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল মূর্ত্তি লাভ করিয়াছ। তুমি যদি তোমার এই নির্ম্মাণ-কামার কথা কহিবার শক্তি উপার্জ্জন করিয়া থাক, তাহা হইলে, দুটি কথা কহিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।

"মূর্ত্তির অধরে কথা ফুটিল না; কিন্তু তাহার মধুমাখা প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার প্রাণটা সত্যই একটু শীতল হইল। মূর্ত্তি এই ভাবে, আমার দিকে, বহুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, পুনরায় ঐ স্থানে, আমার চক্ষের কাছেই, ধীরে ধীরে, শূন্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ তিরোধান-সময়ে, প্রথম দেখিলাম মূর্ত্তির পা দুখানি অদৃশ্য হইয়াছে। তার পর দেখিলাম কটি পর্য্যন্ত অঙ্গ বিলয় পাইয়াছে। আমি স্থির-নয়নে চাহিয়া আছি,

এমন অবস্থায়, পরিশেষে দেখিলাম, মূর্ত্তির মুখচ্ছবিও শূন্যে মিশিয়া গিয়াছে। এ আনন্দময় মূর্ত্তি কিরূপ উজ্জ্বল বসনে আবৃত ছিল, তাহা লৌকিক ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।"*

পরলোকগত পিতা, মাতা, প্রিয় সুহৃদ্ ও পরিচিত স্বজনের দর্শনলাভ বিষয়ে এইরূপ একশত ব্যক্তির অভ্রান্ত সাক্ষ্য আমাদিগের নিকট লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সে সকল বৃত্তান্ত, বঙ্গীয় পাঠকদিগকে ক্রমে ক্রমে, উপহার দিয়া, সত্যের নিকট অঋণী হইতে যত্নপর হইব।

আমরা উপসংহার-স্থলে এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিব যে, আজিও যখন মনুষ্য সূক্ষ্মশরীরী স্বর্গবাসীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইতেছে;—কোথাও অকস্মাৎ প্রকাশিত ছায়ায় মূর্ত্তি, কোথাও বা প্রার্থনাহূত নির্ম্মাণ-কায়া, দর্শনে পরলোক ও দেব-ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছে, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরাও যখন তাদৃশ দর্শনকে প্রাকৃত নিয়মের অন্তর্গত পবিত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছেন, তখন পুত্রবৎসল দশরথ, প্রাণাধিক রামের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া, রামজানকীর জগদ্দুর্লভ ইতিহাসে আপনার হৃদয়ের একটু প্রীতি ঢালিয়াছিলেন, আর জানকীরে দুটি প্রিয় কথা কহিয়া জগৎপাবন সতীত্বধর্ম্মের গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, হিন্দু জাতির এই ঐতিহাসিক সত্যকে আমরা কোন্ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিইয়া দিব? এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় নির্ভরেই বাল্মীকির ভুবনমোহিনী বীণা, উহার পীযূষ-নিঃস্যন্দি বিলম্পিত-ঝঙ্কারে, প্রেমময় রাম ও পুণ্যপুঞ্জময়ী জানকীর নাম গাইয়া, ভারতবাসীকে ভক্তির উচ্ছ্বাসে বিভোর রাখিয়াছে;—এই বিশ্বাসের সঙ্কম্পনেই ভারতে আরও শত শত কবির কোমল ত্রিতন্ত্রী ও ভাবুকের কণ্ঠ, রামের অমিয়-চরিত ও জানকীর অমলকীর্ত্তি কবিতায় ও গীতে যুগের পর যুগে ও শতাব্দীর পর শতাব্দীতে গাইয়া আসিতেছে;—এবং এই প্রগাঢ় বিশ্বাসের আশ্রয় লইয়াই ভারতবাসীর অযুত-কোটি প্রাণ, দিনে ও নিশীথে, রাম-জানকীর নামোচ্চারণে, নয়নজলে ভাসিতেছে। আকাশের ঐ সূর্য্য যদি নিবিয়া যায়, তাহাতে সংসারের যত না অনিষ্ট, রাম-জানকীর চারিত্রকাহিনী বিলুপ্ত হইলে, তাহা হইতেও অধিকতর অনিষ্ট। কারণ, পৃথিবীর সাহিত্যে এ কাহিনীর তুলনা নাই;—পৃথিবীর ইতিহাসেও ইহার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নহে। ইহার আদ্যোপান্ত সমস্তই মঙ্গলময়, এবং প্রীতি ও পবিত্রতার অপূর্ব্ব মিশ্রণে অমৃতময়।

* আমরা আজি বার বৎসর অবধি, স্লেডিনিঙের অনুগ্রহে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পর্কে এইরূপ অসংখ্য পত্র পাইয়া আসিতেছি; এবং তাঁহার মুদ্রিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি পড়িয়াও বিস্তর শিক্ষা লাভ করিয়াছি। এখানে তাঁহার এতৎসম্পর্কিত শেষ পত্রের সারাংশ মাত্র তদীয় অনুমতি অনুসারে উদ্ধৃত হইল।

# দার্শনিক মতের সমন্বয়। ২

আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় দেখিয়াছি বৌদ্ধ-দর্শন নিত্যসত্তার কোন কথা উথাপন না করিয়া কেবল জগতের পরিবর্ত্তন প্রবাহের মাত্র তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে পরিবর্ত্তন প্রবাহের কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া, কিরূপে এই পরিবর্ত্তন গুলিকে বা সংস্কারনিবহকে সমূলে উচ্ছিন্ন করিতে হইবে, বৌদ্ধদর্শন তাহারও উপদেশ করিয়াছেন। কাজেই, এই পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার একান্ত ধ্বংস হইয়া গেলে, আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না; একেবারে নির্ব্বাণলাভ হইল। এ উপদেশের মর্ম্ম এই যে, বুদ্ধ যেমন নিত্যবস্তুর সম্বন্ধে কোন কথা না তুলিয়া, জগতে যে মহাপরিবর্ত্তন-প্রবাহ দেখা যাইতেছে তাহারই কথা বলিতেছিলেন; তেমনই নিত্যবস্তুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না তুলিয়া, তিনি এই পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া গুলির যে মানুষ একবারে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিয়া দিলেন। এতদ্দ্বারা এ কথা বুঝিতে হইবে না যে বৌদ্ধ সেই নিত্য আত্মা বা নিত্য পরমাণুর ধ্বংস করিতে বসিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা নহে। উপরে আমরা যে তত্ত্বের আভাষ দিলাম, তাহাতে বোধ হয় পাঠক বুঝিয়াছেন যে, এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, বুদ্ধ কেবল এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহেরই ধ্বংসের কথা বলিয়াছেন এবং ইহাই প্রকৃত বৌদ্ধমত। এই ভাবে বুদ্ধ-দর্শন না বুঝিয়া লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে যে, বুদ্ধ বুঝি আত্মার উচ্ছেদ করিতে বসিয়াছেন, বুদ্ধ বুঝি জগতের অন্তরালবর্ত্তী নিত্যবস্তুর উচ্ছেদ সাধন করিতে বসিয়াছেন! কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনও এই পরিবর্ত্তন প্রবাহের একান্ত ধ্বংসসাধনের উপদেশ দিয়াছেন। এ অংশে বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে উহাদের কোনই পার্থক্য নাই; এবং এই তিন দর্শনে, এই ধ্বংসের প্রণালীও প্রায় একরূপ। তবে সাংখ্য সেই নিত্যস্থায়ী অণুর (প্রকৃতির) সঙ্গে সঙ্গে নিত্য আত্মার (পুরুষের) কথাও বলিয়া গিয়াছেন; এবং বেদান্ত অণু ও আত্মাকে একই বস্তু ধরিয়া লইয়া, অথবা প্রকৃতিকে ব্রহ্মশক্তিরূপে ধরিয়া লইয়া, সেই একই বস্তু যে পরিবর্ত্তিতরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাই বুঝাইয়াছেন। আমরা এ কথাটি আর একটুকু পরিষ্কার করিয়া বলিব।

আমরা বলিয়াছি যে, বাহ্যজগতের মূলে এক নিত্যসত্তা রহিয়াছে, তাহারই বক্ষে এই বিশাল পরিবর্ত্তন-প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে। সাংখ্য এই নিত্যসত্তার নাম "প্রকৃতি" বা "অব্যক্ত" রাখিয়াছেন। এই প্রকৃতি অবশ্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের পরমাণু বা Atoms নহে। বরং অণুর Essence কে

কতকটা প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থাতেই Atoms বলা যায়; কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহা অবশ্যই অব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান ছিল। এ কথা Tyndall এবং Herbert spencer এর ন্যায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের উক্তি উদ্ধৃত করিতে চাই না; কৌতূহলী পাঠক তাহা তাঁহাদের পুস্তকেই দেখিয়াছেন। Atoms এর যাহা অব্যক্ত সূক্ষ্ম অবস্থা, যে অবস্থা হইতে Atoms ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় আসিয়াছে, তাহাই নিত্য-প্রকৃতি। এই অব্যক্ত প্রকৃতিতে রূপরসাদিগুণ ও সমস্ত নানরূপ, বীজে বৃক্ষের অবস্থিতির ন্যায় লুক্কায়িত ছিল। ইহা হইতেই ক্রমে সমস্ত জগৎ কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সাংখ্য তাহারই বিবরণ দিয়াছেন। যাহা নিত্য-সত্তারূপে অবস্থিত ছিল, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে জাতি সমূহ এবং জাতি হইতে ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিসমূহ বাহির হইয়া আসিয়াছে। সমষ্টিভাবে সমস্ত Atoms গুলিকে এক ধরিয়া লইলে, ইহাই বলিতে হয় যে, সেই এক অব্যক্ত উপাদান হইতে নানাবিধ ক্রিয়া বা Energy বলে, এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। কিন্তু সেই উপাদান এই ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন-প্রবাহের মধ্যে চির-স্থির থাকিয়া যায়। ইহাই Herbert spencer এর—"The one is not an worker of change." সাংখ্য অব্যক্তের সঙ্গে সঙ্গে আত্মচৈতন্যেরও যোগ রাখিয়াছেন; কেন না ভৌতিক ক্রিয়া সমূহ আত্মারই নানা প্রকারে জ্ঞানবিকার প্রাদুর্ভূত করাইয়া দেয়। বেদান্ত কিঞ্চিৎ ভিন্ন পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। আমরা অন্তর্জগতে অর্থাৎ মানসিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে (succession of ideas.) যে একটি নিত্যসত্তার আভাস পাই, যাহা সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে অচল থাকিয়া যাইতেছে, বেদান্ত সেই নিত্যবস্তুটিকে লক্ষ্য করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বহির্জগতের অব্যক্ত সত্তাটিকে বেদান্ত সেই চৈতন্যেরই শক্তিরূপে ধরিয়া লইয়াছেন। এইরূপে দুই সত্তাকে এক ধরিয়া লইয়া, জগতের পরিবর্ত্তন-রহস্য উদ্ভেদ করিয়াছেন। তাই, বেদান্তদর্শনে এই চৈতন্যেরই প্রাধান্য। কিন্তু বুদ্ধ এই দুই নিত্যসত্তা সম্বন্ধে কোন কথা তোলেন নাই। তিনি কেবল, যে যে প্রকারের পরিবর্ত্তন এই জগতে দেখা যাইতেছে, সেই পরিবর্ত্তনেরই কার্য্যকারণশৃঙ্খলার কথা বলিয়া দিয়াছেন। তাই এই তিন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে এইরূপ বিভেদ থাকিলেও, অন্যদিকে সকলেরই সর্ব্বতোভাবে মিল আছে। সেই মিল কোথায়? তিন দর্শনেই, কিরূপে এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ আসিতেছে ও যাইতেছে, কি প্রকার কার্য্যকারণ সূত্রে এই প্রবাহ ধৃত হইতেছে, এবং কি প্রণালীতে একটির পর একটি জন্মিতেছে ও লয় পাইতেছে, তাহার বিবরণ প্রায় একরূপ। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহের সম্যক্ উচ্ছেদ করিতে হইবে এবং সে উচ্ছেদে যে মানুষের পূর্ণ অধিকার আছে,—এ সকল

বিষয়ে তিনটি দর্শনেরই উপদেশ প্রায় একরূপ। এই উচ্ছেদ কি প্রণালীতে করা যায়, তাহা এই দর্শনত্রয়ের সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত, সুতরাং তাহা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে।

তবে কি বৌদ্ধদর্শনে সেই নিত্যপদার্থের কোনই আভাষ নাই? ইহা আমরা আগামী বারে বিবেচনা করিয়া দেখিব।

( ক্রমশঃ )।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ।

---

# আদর্শ সংস্কারক দয়ানন্দ

## ( ২ )

### হিন্দু-প্রকৃতি কি?

এক্ষণে দয়ানন্দ আদর্শসংস্কারক কি না, তাহাই বিচার্য্য। তাহা বিচার করিতে হইলে, হিন্দু কি, বুঝিতে হইবে। দেহের চিকিৎসককে বুঝিতে হইলে, যেমন আগে দেহ কি, বুঝা চাই, হিন্দুর সংস্কারককে বুঝিতে হইলে তেমনই আগে হিন্দু কি, তাহাও বুঝা চাই। হিন্দু কি বুঝিতে হইলে, হিন্দুপ্রকৃতি কি? হিন্দুজীবন কি? এবং হিন্দু সমাজ কি? এই তিনটির আলোচনা আবশ্যক। অতএব দেখা যাউক হিন্দু প্রকৃতিটা কি?

পৃথিবীতে এ কাল পর্য্যন্ত যত জাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে, এবং আজিও যত শ্রেণির মনুষ্য মেদিনীর বক্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদিগের সকলের সহিত তুলনায় হিন্দু দুইটি বিষয়ে বিশেষ। হিন্দুর সেই দুইটি বিশেষত্বই এই স্থলে হিন্দু-প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই বিশেষত্ব দুইটি তবে কি?

হিন্দুর প্রথম বিশেষত্ব,—হিন্দু সূক্ষ্মাভিমুখী। অন্যান্য জাতি স্থূলাভিমুখী। হিন্দু সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অন্যান্য জাতি স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আসিয়া পঁহুচিয়াছে, এবং পঁহুচিতেছে। এই কারণ, মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষিগণ উজ্জ্বল আত্মালোকে জীবনের আদ্যোপান্তটা আগেই বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই কারণ প্রশান্তচিত্ত ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মাবর্ত্তের পবিত্র ভূমিতে সমাসীন হইয়া প্রথমেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং লক্ষ্য স্থি[illegible]ত হইলে পর তবে সংসারক্ষেত্রে আ[illegible] সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন।

হিন্দুর সে[illegible] কি? সে লক্ষ্য সত্ত্বস্ফূর্ত্তি বা ব্রহ্মপ্রা[illegible] হিন্দুর দ্বিতীয় বিশেষত্ব,—হিন্দু সম[illegible]বেই লক্ষ্যানুসারী। লক্ষ্য যখন স্থিরীকৃত হইল, হিন্দু তখন জীবনের সমস্ত প্রবাহকে সেই লক্ষ্যের অনুসারী বা অভিমুখী করিয়া তুলিল। এক কথায় ব্রহ্ম বা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই হিন্দু জীবনের

কেন্দ্রস্থানীয় [illegible] সৌরজগতের গ্রহ নক্ষত্রমালা যেমন [illegible] কেন্দ্র করিয়া পরিভ্রমণ করে, [illegible] নই ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে [illegible] রিতে লাগিল।* নদী-প্রবাহ যেমন [illegible] প্রধাবিত হয়, পাবক-শিখা যেমন উর্দ্ধ [illegible] খিত হয়, হিন্দুর যাবতীয় কার্য্য এবং যাবত [illegible] অনুষ্ঠানও তেমনই সত্বস্ফূর্ত্তি বা ব্র[illegible]প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সুতরাং হিন্দুর দেহধারণ বা মৃত্যু ব্রহ্মের জন্যই। এই হেতু গৃহ হিন্দুর নিকট স্বার্থসিদ্ধির সাধনভূমি নহে,—পরিবার বিলাসের কেলিকুঞ্জ নহে,—সংসারটা ভোগ-লালসার লীলাভূমিও নহে,—এবং পত্নীও পাশবিকবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সঙ্গিনী নহে। ইহা স্বীকার করিব যে, রোম সৌভাগ্য সম্পদের উচ্চশিরে আরোহণ করিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিব যে, গ্রীস জ্ঞান-গৌরবে গরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ইহাও স্বীকার করিব যে, ইয়ুরোপের ফরাশি ও ইংরেজ প্রভৃতি আধুনিক জাতি সকল নানারূপ শিল্প-কলার প্রভাবে পার্থিব উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঐহিক জীবনের ভোগ ও সুখের পক্ষে মনুষ্যের সমক্ষে শত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ইহা কখনই স্বীকার করিব না যে, হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোন জাতিই, জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে—জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া, এবং সেই লক্ষ্যের অনুসরণে ক্ষুদ্র বৃহৎ পারিবারিক ও সামাজিক সমস্ত কার্য্যকেই অনুস্যূত করিয়া-তদভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অতএব ইহাই হিন্দুর বিশেষত্ব, অথবা ইহাই হিন্দু-প্রকৃতি।

* উল্লিখিত হিন্দু শব্দগুলি একণকার সর্ব্বপ্রকারেই অধঃপতিত হিন্দু সন্তানদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে বলা হইতেছে না, তাহা, পাঠক! বোধ হয়, সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন।

## হিন্দু জীবন কি?

হিন্দুপ্রকৃতি একদিকে যেরূপ লক্ষ্যানুসারিণী এবং সত্বাভিমুখিনী,—এক কথায় হিন্দুপ্রকৃতি যেরূপ সর্ব্বতোভাবেই সত্বানুসারিণী, হিন্দু-জীবনের গতিও সেইরূপ সর্ব্বতোভাবেই সত্ববিকাশিনী। হিন্দু-জীবনটা তবে কি? আশ্রম-চতুষ্টয় লইয়াই হিন্দু জীবন। আশ্রমচতুষ্টয়-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠানমালার উপরেই হিন্দু-জীবনের অস্তিত্ব এবং উন্নতি। আশ্রমচতুষ্টয় কি কি? ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্য্য কি? বেদাধ্যয়নের নাম ব্রহ্মচর্য্য, বীর্য্যধারণের নামও ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যধারণ না করিলে বেদাধ্যয়ন বা জ্ঞানার্জ্জন হয় না, এই কারণ ব্রহ্মচর্য্য বলিতে সাধারণতঃ বীর্য্যধারণই বুঝায়। বীর্য্যধারণ কি করিলে হয়? বিলাস-বর্জ্জন এবং কঠোরতা সাধন করিলে হয়। এই হেতু ব্রহ্মচারীকে কঠোর এবং বিলাস-বিতৃষ্ণ হইতে হয়। ব্রহ্মচারীকে আর কি হইতে হয়? ব্রহ্মচারীকে অগ্নিপরীক্ষিত হইতে হয়। অগ্নিপরীক্ষা কেন? না, পাছে

সংসারে প্রবেশ করিলে প্রলোভনের অগ্নি তাঁহাকে ভস্মীভূত করিয়া না ফেলে। আর, কি হইতে হয়? ব্রহ্মচারীকে বায়ু-পরীক্ষিত হইতে হয়। বায়ু-পরীক্ষা কেন? না, পাছে লালসার প্রচণ্ড বাত্যায় তাঁহাকে বিঘূর্ণিত করিয়া না ফেলে। আর কি হইতে হয়? পথ-পরীক্ষিত হইতে হয়। পথ-পরীক্ষা কেন? না, পাছে সংসারের অতি কুটিল ও পিচ্ছিল পথে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া না তুলে।

ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি অসাধারণ! ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাব অভাবনীয়! যদি জিজ্ঞাসা কর যে, ভারতভূমি উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়াছিল কেন? বলিব, তাহার কারণ ব্রহ্মচর্য্য। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুরাই জ্ঞান এবং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছিল কেন? বলিব, তাহার কারণ ব্রহ্মচর্য্য। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, হিন্দুরা সাহিত্যসম্পদে পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল কেন? বলিব, তাহারও কারণ ব্রহ্মচর্য্য। মনুষ্যের সাহিত্যে কত গ্রন্থের আবির্ভাব হইতেছে কত গ্রন্থ তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। কত গ্রন্থকার অভ্যুদিত হইতেছেন, কত গ্রন্থকার কিয়দ্দিনের মধ্যেই বিলুপ্তনামা হইয়া যাইতেছেন। কালের অবিশ্রান্ত এবং উদ্দাম তরঙ্গ তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া কোথায় ফেলিতেছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? কিন্তু মহাভারতের আজিও তিরোভাব ঘটে না কেন? আর মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নামই বা বিলুপ্ত হইয়া গেল না কেন? মহাভারত আজিও মহীয়ান্ কেন? মহাভারত আজিও আপনার গৌরবে আপনি উচ্ছ্রিত হইয়া রহিয়াছে কেন? ইহার উত্তরে বলিব যে, যে বুদ্ধির দ্বারা মহাভারত বিরচিত হইয়াছে, সে বুদ্ধি তোমার আমার বুদ্ধি নহে,—তাহা ব্রহ্মচর্য্যপ্রসূত বুদ্ধি। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, ব্রহ্মচর্য্যই হিন্দুর যাবতীয় উন্নতির নিদান। অতএব ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যে দিবস হইতে ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, সেই দিবস হইতেই ভারতভূমি দুঃখের পর দুঃখে এবং দুর্গতির পর দুর্গতিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া দিন দিনই আধোগতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

যাহাহউক, ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থাশ্রম। ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন। ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা এবং সাধনা যেমন সত্বস্ফূর্ত্তির সাধক, গৃহস্থাশ্রমের শিক্ষা এবং ব্যবস্থামালাও তেমনই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সহায়ক। যাহাতে হৃদয়ের সাধু ও মহতী বৃত্তিসমূহের বিকাশ হয়, যাহাতে পুত্র পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়াও মানুষ শান্ত দান্ত চিত্তে পরমার্থ চিন্তায় সমর্থ হয়, এমত সকল উপাদান লইয়াই হিন্দুর গার্হস্থ্যধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে। গৃহস্থ হিন্দুকে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ প্রভৃতি এক একটি, হৃদয়ের এক একটি উচ্চ বৃত্তির উন্মেষক এবং পরিপোষক। উহার কোনটি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির পুষ্প-

মালায় চরিত্রকে অলঙ্কৃত করে, কোনটি পরার্থপরতার পরাকাষ্ঠা শিক্ষা দিয়া হৃদয়ে বিশ্বপ্রীতির উদ্দীপনা করে, কোনটি বা উদারতার অতি উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র হইলেও, অতি বিশাল বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হইবার নিমিত্ত মনুষ্যকে উপদিষ্ট করিয়া থাকে। ফলতঃ গার্হস্থ্য-নীতির ন্যায় বাণপ্রস্থের নীতিও সত্ত্ববিকাশিনী। বাণপ্রস্থের পর সন্ন্যাস। সন্ন্যাসের সমস্ত ক্রিয়াই ত সত্ত্বভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লইয়া। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আশ্রমচতুষ্টয়ময় হিন্দু-জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত—ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সমগ্রাংশই যেমন ব্রহ্মভাবের বিকাশক, তেমনই সাত্ত্বিকতার উদ্দীপক।*

## হিন্দু সমাজ কি ?

হিন্দু-জীবন যেরূপ চারি অঙ্গে বিভক্ত, হিন্দু-সমাজ সেইরূপ চারিটি অঙ্গ লইয়া গঠিত। ব্রাহ্মণ এই সমাজ দেহের মস্তিষ্ক, ক্ষত্রিয় ইহার বাহু, বৈশ্য ইহার উরু এবং শূদ্র ইহার পাদদ্বয়। দেহ রক্ষার জন্য মস্তিষ্ক এবং পাদদ্বয় যেমন দুই-ই চাই, হিন্দু-সমাজ রক্ষার জন্যও তেমনই ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র দুই-ই চাই। মস্তিষ্ক স্পর্দ্ধা করিয়া যদি পাদদ্বয়কে উপেক্ষা করে, তাহা হইলে শরীর-যন্ত্র কখনই চলিতে পারে না। ব্রাহ্মণও যদি সেইরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া শূদ্রকে উপেক্ষিত করিতে থাকে, তাহা হইলে একক্ষণের জন্যও হিন্দু-সমাজ দাঁড়াইতে পারে না। বলা বাহুল্য কার্য্যসমষ্টির উপরেই সমাজের স্থিতি, এবং কার্য্যশৃঙ্খলার উপরেই সমাজের উন্নতি। সুতরাং এই বিবিধ কার্য্য-প্রবাহ-পরিচালিত বহুশক্তি-বিঘট্টিত অতি বিশাল সমাজ-যন্ত্র পরিচালনার পক্ষে একজন বেদপাঠক ব্রাহ্মণে আর একজন শিবিকাবাহক শূদ্রে কার্য্যগত প্রকৃতিতে কিছু প্রভেদ থাকিলেও কার্য্যগত প্রয়োজনীয়তাতে কিছুমাত্রও প্রভেদ নাই। সুতরাং যাঁহাদিগের ধারণা যে, ব্রাহ্মণগণ কেবল আপনাদিগের সুবিধার জন্যই—আপনাদিগের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্যই ভারতভূমিতে বর্ণ বিভাগরূপ বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন, আমার বিবেচনায় তাঁহারা হয় ভ্রান্ত, না হয় বড় স্থূলদর্শী।

এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবে বর্ণব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া, এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, চতুরাশ্রমময় হিন্দু জীবন্

* আশ্রমচতুষ্টয় ভিন্ন হিন্দুর সমগ্র জীবনের মধ্যে ষোলটি সংস্কার অনুষ্ঠেয় বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে। সমস্ত সংস্কারগুলির উদ্দেশ্যই যে শরীর মনের শুদ্ধিসাধন, তাহা একটু পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আর দেহশুদ্ধি এবং মনঃশুদ্ধি যখন সত্ত্বভাবেরই উদ্দীপক, তখন উল্লিখিত সংস্কারগুলিও যে পরোক্ষভাবেই সত্ত্বস্ফূর্ত্তির সহায়তা করিতেছে, তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষ করিয়া না বলিলেও, পাঠক বুঝিয়া লইবেন বলিয়া ভরসা করি।

নের মত চাতুর্ব্বর্ণ্যময় হিন্দুসমাজও সত্ত্ব-স্ফূর্ত্তির সহায়ক। সত্ত্বস্ফূর্ত্তি বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হিন্দু প্রকৃতির লক্ষ্য বলিয়া, উহা কিছু এক-কালে বা এক দিনেই ঘটিতে পারে না। জগতের কোন একটা সাধারণ কার্য্যই যখন এক দিনে বা অকস্মাৎ সাধিত হইতে পারে না, তখন মানব-প্রকৃতির পরম পরিণতি যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তাহা এক দিনের সাধনায় লব্ধ হওয়া দূরে থাকুক,—এক জীবনের সাধনা-তেও হয় কি না সন্দেহ। এই হেতু হিন্দু বড় ক্রমবাদী। এই হেতুই হিন্দু অধিকারবাদী। হিন্দু ক্রমবাদী বলিয়াই ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম পরম্পরার পক্ষপাতী; আর হিন্দু অধিকার-বাদী বলিয়াই ব্রাহ্মণাদি বর্ণপরম্পরারও পক্ষপাতী। ক্রমবাদ লইয়াই আশ্রমচতু-ষ্টয়, এবং অধিকারবাদ লইয়াই হিন্দুর বর্ণ-চতুষ্টয়। অধিকারবাদ কার্য্যগত এবং চরিত্রগত ভিত্তির উপরেই স্থাপিত। এই নিমিত্ত উহা উন্নয়নের সমর্থক এবং অবনয়-নেরও পরিপোষক। ফলতঃ অধিকারবাদের মূল উদ্দেশ্যটা কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে, উহা এক অধিকারের লোককে যেমন ভিন্ন অধিকারে প্রবেশ করিতে দেয় না, এক অধিকারের লোককে তেমনই চিরদিনই এক অধিকারে রাখিতে চাহে না। সুতরাং হিন্দুর বর্ণ-বিভাগ-প্রণালী শূদ্রকে চিরদিনই শূদ্র করিয়া রাখিবে না, এবং কেবল ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়াই কোন লোককে ব্রাহ্মণত্বের পূজ্য ও পবিত্র আসন প্রদান করিবে না। হিন্দুর বর্ণ-বিভাগ-প্রণালী কবষ ঐলুষের মত শূদ্রকেও ঋষি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, এবং নিরক্ষর ও কদাচারী ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্বের আসন হইতে অসঙ্কোচে সরাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, নিম্ন উচ্চ, নিম্নতর উচ্চতর, সকল অধিকারই যেরূপ সেই চরম অধিকারের অনুসারী, শূদ্রাদি বর্ণও সেইরূপ সেই চরম পদেরই অভিমুখী। এই হেতু বিশ্বাস করি যে, ব্রাহ্মণ যেমন হোমার্চ্চনা দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তির অভিমুখী হইতেছে, শূদ্রও তেমনই ব্রাহ্মণের পাদ ধৌত করাইয়া ব্রহ্মধামেরই অভিমুখে গমন করিতেছে। তবে কেহ সেই মহা-লক্ষ্যের নিকটে, কেহ বা কিছু দূরে, এই মাত্রই প্রভেদ।

---

## সংস্কারকের লক্ষণ কি ?

এতক্ষণ দেহটা বুঝিবারই চেষ্টা করি-লাম। এইবার দেহের চিকিৎসককে বুঝি-বার চেষ্টা করিব। রোগ বুঝিবার বা বুঝা-ইবার তত প্রয়োজন নাই, কারণ লেখক, পাঠক, বক্তা, শ্রোতা সকলেই রোগক্লিষ্ট। যাহা হউক হিন্দু কি, যদি তাহা বুঝা গেল, তবে এইক্ষণে হিন্দুর সংস্কারক কে, তাহা বুঝা যাউক। অতএব দেখিতে হইবে সংস্কারকের লক্ষণ কি কি ?

সংস্কারকের প্রথম লক্ষণ স্বজাতিজ্ঞতা। স্বজাতিকে জানার নামই স্বজাতিজ্ঞতা। স্বজাতিকে জানিতে হইলে স্বজাতির প্রকৃতি জানিতে হইবে। কি কি ধাতুতে স্বজাতি গঠিত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে

হইবে। জাতির প্রকৃতিটা আবার কি বস্তু? পৃথিবীতে যত জাতি জন্মিয়াছে এবং জন্মিতেছে, তাহারা সকলেই এক একটা বিশেষত্ব লইয়া জন্মিয়াছে এবং জন্মিতেছে। সেই বিশেষত্বকেই সেই জাতির প্রকৃতি বলিয়া ধরিতে হইবে। জাতীয় প্রকৃতি বুঝিতে হইলে, জাতীয় সাহিত্য ভাল করিয়া বুঝা চাই। যেহেতু জাতীয় সাহিত্যেই জাতীয় প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত। জাতীয় প্রকৃতির বিকাশ ও উন্নতি এবং বিকৃতি ও অধোগতি জাতীয় সাহিত্যের ভিতরে যেরূপ স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, সেরূপ আর কোথাও নাই। জাতীয় সাহিত্যের মত, জাতীয় আদর্শ এবং জাতীয় রীতি নীতির মধ্যেও জাতীয় প্রকৃতি বিদ্যমান। অতএব স্বজাতিজ্ঞ হইতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের স[illegible] যেমন সুপরিচয় আবশ্যক, জাতীয় আদর্শ এবং জাতীয় রীতি নীতির তত্বও তেমনই ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। ফলতঃ স্বজাতিকে না জানিলে কখন স্বজাতির কোথায় কি বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা জানা যায় না; এবং বিকৃতি বা ব্যাধি জানিতে না পারিলে যখন তাহার শোধন বা সংস্কারসাধন হইতে পারে না, তখন স্বজাতিজ্ঞতা সংস্কারকের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজনীয়। আমার বিবেচনায় চিকিৎসকের পক্ষে নাড়ীজ্ঞান যেরূপ অপরিহার্য্য, সংস্কারকের পক্ষে স্বজাতিজ্ঞানও সেইরূপ অপরিহার্য্য। কিন্তু দুঃখের কথা যে, এই ব্যাধি প্রপীড়িত দেশে নাড়ীজ্ঞানশূন্য চিকিৎসকের সংখ্যাই অধিক।

দ্বিতীয় লক্ষণ স্বজাতি-প্রিয়তা। যে জাতির মধ্যে জন্ম পাইয়াছি, যে জাতির ভিতরে পরিরক্ষিত হইয়াছি, যে জাতির শক্তি ও সহায়তা লইয়া আজি মনুষ্যলোকে মনুষ্যের মত বিচরণ করিতেছি, সে জাতির সহিত সংস্কারককে প্রীতিসূত্রে সম্বন্ধ থাকিতে হইবে। স্বজাতির প্রতি গাঢ় সমবেদনা না থাকিলে,—স্বজাতির সহিত প্রীতিযোগে যুক্ত না রহিলে, স্বজাতির ক্লেশকলঙ্কে কেনই বা ক্লিষ্ট হইব? এবং ক্লিষ্ট না হইলে তাহা অপসারণের নিমিত্ত কেনই বা বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইব? তুমি, হিন্দুর উদ্ধারক! হিন্দুর উদ্ধারকল্পে কাকাতুয়ার মত কতই না অভ্যস্ত কথা বলিতেছ! তুমি, হিন্দুর সংস্কারক! এই রুগ্ন ও অপমান-ম্লান হিন্দুর সমক্ষে বাণীর তুলিকা লইয়া কতই না আশা-চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছ। কিন্তু তুমি হিন্দু নামে পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ কর, হিন্দুর ভাষা লইয়া উপহাস করিতে থাক, এবং হিন্দুর রীতি, নীতি ও পরিচ্ছদ-পদ্ধতির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিতে না পারিলেই আপনাকে সার্থকজন্মা বলিয়া বিবেচনা কর। তাই বলি, তোমাকে সংস্কারক বলিয়া আলিঙ্গন করিব? না, সংহারক জ্ঞানে তোমার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করিব? এই তাক্ত সংস্কারকের দল হইতে দেশকে রক্ষা কর।

শ্রীদেঃ-

# বঙ্গ-ভাষা।

নবীন বসনে নবীন ভূষণে
মধুর মুরতি ধরি,
বসন্তের উষা কে তুমি ললনা,
মধুময়ী মরি মরি!
বদনে বিকাশে উজল প্রতিভা
কোটি শশী পরকাশ!
সরল নয়নে করুণার জ্যোতি
চিরমহিমার বাস!
নীরবে সুহাসি বরিষে অমিয়
বরষার জলধারা,
দেখিতে দেখিতে সে বিশাল স্রোতে
ভেসে গে'ছে বঙ্গধরা!
কি মধুর গীতি ললিত ঝঙ্কার
করুণার সুধারাশি,
ঢালিছে মরমে; কোমলে পঞ্চমে
সপ্তমে বাজিছে বাঁশী!
অযুত ছন্দে উঠিছে রাগিণী
অযুত ভাবের গাথা—
অযুত কণ্ঠে গমক মূর্চ্ছন
অযুত কাহিনী গাঁথা!
অযুত কীর্ত্তি পুণ্য কাহিনী
গাইছ কোমল স্বরে,
তটিনীর মত "তর তর তর"
পরাণ উদাস করে!

কে তুমি ললনা, জ্ঞানের পশরা
কুসুমে পূরণ করি,
হাসিতে হাসিতে বিলাইছ সতি!
সাধনার সহচরী!
পরশে তোমার সুপ্ত ধরণী
অই দেখ ধীরে ধীরে
উঠিছে জাগিয়া উষার পরশে
পদ্মসম সরোবরে!
নবীন সাধনা জাগিছে হৃদয়ে
তোমার পরশে আজি,
বিশুষ্ক কাননে উঠিছে ফুটিয়া
বাসনা কুসুমরাজি!
কোথা হ'তে সতি, আনিয়াছ হেন
মৃত-সঞ্জীবন-রস?
অয়ি রসময়ি, পরশে যাহার
নিখিল করেছ বশ?
কে তুমি সুন্দরি, যেন চিনি চিনি,
জগতের শোভারাশি
একত্র জড়িত! অপূর্ব্ব রচনা!
শারদ পূর্ণিমা নিশি!
তুমি কি আমার চিরসাধনার
চিরকামনার ধন
আশার দেবতা? অয়ি বঙ্গভাষা!
দরিদ্রের 'আকিঞ্চন'?

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণ তীর্থ।

# সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। "ভারতবর্ষে।—২। রজতগিরি; ব্রহ্মদেশীয় নাটক। ৩। ধনঞ্জয়-বিজয়,—ব্যায়োগ। ৪। কর্পূর-মঞ্জরী।—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকর্ত্তৃক অনুবাদিত।" বাঙ্গালায় অনূদিত-সাহিত্যের উৎকর্ষবিস্তার-কামনায় কবিবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কল্পতরুব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের কৃপায় তাঁহার এই উদার ব্রত সার্থক হউক। তাঁহার এই 'ভারতবর্ষে' একটি গদ্যপ্রবন্ধ। "দুই বৎসর হইল আঁদ্রে শেভ্রিয়োঁ নামক এক জন ফরাসিস্ পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।" সেই ভ্রমণবৃত্তান্তই, অতি সরল বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া, 'ভারতবর্ষে' এই নামে, পঁয়ষট্টি-পৃষ্ঠাত্মক একখানি সুন্দর গদ্য পুস্তক হইয়াছে। পুস্তকখানিতে শিখিবার কথা অনেক আছে।

'রজতগিরি' ব্রহ্মদেশীয় নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ। ব্রহ্মদেশীয় কাব্য এই বোধ হয় বাঙ্গালায় প্রথম অনূদিত হইল। অনুবাদের ভাষা অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু উহা সর্ব্বাংশে আক্ষরিক অথবা অর্থানুগত হইয়াছে কি না, তাহা অবধারণ করা আমাদিগের পক্ষে অসাধ্য। কারণ, ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় আমরা অপ্রবিষ্ট; এবং মূল গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদও আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। যাঁহারা ব্রহ্মদেশীয়দিগের রীতিনীতি, আচার-পদ্ধতি ও চিত্তের গতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, এই পুস্তক খানি, তাঁহাদিগের জন্য, একই সঙ্গে, আমোদ-জনক ও উপকারক হইবে। গ্রন্থের দুই একটি শব্দ, আমাদিগের কানে, পুরাতন সংস্কারের অভ্যস্ত শাসনে, একটু যেন বাধিল। যথা ১২ পৃষ্ঠায়—"প্রাণ-প্রিয়সী ওঠ,"—এবং ৫২ পৃষ্ঠায়,—

'কেন বাছা ম্লান-মুখ দেখি গো তোমায়,
বজ্রাহত লতা যেন লুণ্ঠিত ধরায়।'

প্রাণ-প্রিয়সী স্থলে প্রাণ-প্রেয়সী বলিলেই ভাল হয় না কি? অপিচ, 'লুণ্ঠিত ধরায়' এস্থলে 'লুণ্ঠিত' পদটি প্রযুজ্য কি না, ইহা চিন্তনীয়। লুণ্ঠন অর্থ অপহরণ। গ্রন্থকার যে অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছেন, সে অর্থে 'লুটায় ধরায়' বলিলে, বোধ হয়, ব্যাকরণে ও বাঙ্নিয়মে, কোন অংশেও আর আপত্তি থাকে না। কিন্তু শব্দপ্রয়োগের এইরূপ সামান্য স্খলন, শত সাবধানতা সত্বেও, সকলেরই অহরহঃ ঘটিয়া থাকে।

'ধনঞ্জয়-বিজয়' ও 'কর্পূর-মঞ্জরী' সংস্কৃতের অনুবাদ। আমরা এই দুই খানি পুস্তকই মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি; এবং প্রায় প্রত্যেক পংক্তি হেই অনুবাদ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া গ্রন্থ-

কারকে পুনঃ পুন ধন্যবাদ দিয়াছি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নাট্যসাহিত্যকে লক্ষণ-ভেদে নানারূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই শ্রেণীভাগ অনুসারে, ধনঞ্জয়-বিজয়ের নাম ব্যায়োগ, এবং কর্পূর-মঞ্জরীর নাম সট্টক। ব্যায়োগের বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহার আরম্ভ ও শেষ সমস্তই এক অঙ্কে সমাপ্ত; সট্টকের আগা গোড়া সমস্তই প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। ধনঞ্জয়-বিজয় ও কর্পূরমঞ্জরী উভয়ই, আপনা আপন ক্ষেত্রে, উৎকৃষ্ট বস্তু। এই দুই পুস্তকের বঙ্গানুবাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার যথাসম্ভব শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে। অনুবাদ, প্রায়শঃ আক্ষরিক হইয়াও, কিরূপ সরল, সুখ-পাঠ্য ও প্রশংসার্হ হইয়াছে, তাহা পাঠককে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি শ্লোক ও তাহার পদ্যানুবাদ তুলিয়া দিলাম।

"সারস্বতং স্ফুরতু চেতসি সৎকবীনাং
চক্ষুর্ভবন্তু কৃতিনো গতমৎসরাশ্চ।
ভূপাশ্চ সন্তু কবিসূক্তিষু সানুরাগাঃ
সন্ত্যজ্য মণ্ডল-কবিপ্রণয়ানুরাগম্।"

"সুকবির চিত্তে হোক্ সারস্বত চক্ষুর উন্মেষ;
কৃতীরা যেন না করে অপরের গুণেতে বিদ্বেষ;
গ্রাম্যকবিদের প্রতি প্রণয় করিয়া পরিত্যাগ,
সুকবিসূক্তিতে হোক্ নৃপতিগণের অনুরাগ।

উপরিধৃত শ্লোকটি ধনঞ্জয়-বিজয় হইতে গৃহীত হইয়াছে। আমরা এখানে কর্পূর-মঞ্জরী হইতেও একটি অনুদিত শ্লোক উদ্ধৃত করিব। যথা বসন্তবর্ণনায়,—

"ষোড়শী বালারা এবে বিম্ব-ওষ্ঠ না ... য়
বহুল মদন;
সুরভি তৈল দিয়া এবে দেখ নাহি করে
বেণী বিরচন;"

এই পংক্তি চতুষ্টয়ের মধ্যে—'সুরভি তৈল দিয়া'—এই পাদটি আমাদিগের নিকট ভাল লাগিল না। গদ্যরচনা কিয়দংশে পদ্য-লক্ষণান্বিত হইলে, উহাকে পদ্যগন্ধি গদ্য বলে। পদ্যরচনাও সেইরূপ গদ্যলক্ষণে লাঞ্ছিত হইলে, উহাকে গদ্যগন্ধি বলা যাইতে পারে। এ স্থলে, "সুরভি তৈল দিয়া" এই সপ্তাক্ষর-শব্দত্রয়ের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত প্রকারে পদ-যোজনা করিলে, বোধ হয়, যতিভঙ্গদোষ ও গদ্যগন্ধের আর কোন প্রকার সম্পর্ক থাকে না। যথা,—

সুরভিত তৈলে তারা এবে দেখ নাহি করে
বেণী বিরচন,—

গ্রন্থকারের আর একটি অনুদিত কবিতার "প্রশমিত" শব্দটি আমাদিগের নিকট মূল কবিতার অর্থ-বিঘাতক বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গাধর-হর, গৌরীর প্রণয়-কোপ প্রশমনার্থ, তদীয় পদারবিন্দে প্রণত হইয়াছেন। সে প্রসাদনী প্রণতিই কবিতার প্রতিপাদ্য। কবিতার আরম্ভে মূল-প্রাকৃতে আছে,—"ঈসারোসপ্পসাদপ্পণদিসু।" গ্রন্থকার ইহার বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"ঈর্ষাকোপ প্রশমিত—প্রণত হইয়া যিনি" ইত্যাদি। এখানে এই 'প্রশমিত' শব্দ কার বিশেষণ? গৌরীর, না হরের? প্রশমিত বলিলে প্রসাদন-ক্রিয়ার আর বাকি থাকে কি? আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই লয়

যে, এস্থলে প্রশমিত না বলিয়া 'প্রশমনে' কিংবা 'প্রসাদনে' বলিলেই, বুঝি বা প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হয়। আমরা 'বুঝি বা' বলিতেছি, ভয়ে ভয়ে। কারণ, অনুবাদকের নাম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমন কবি; কাব্যানুবাদে সিদ্ধহস্ত। তিনি স্বজাতীয় সাহিত্যসম্পর্কে যে কার্য্য করিতেছেন, তাহা তাদৃশ প্রশান্ত-প্রতিভান্বিত সুপণ্ডিত-কবিরই শোভা পায়। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, এবং ভরসা আছে ভবিষ্যতে আবারও বলিব যে, তাঁহার পুষ্পময়ী লেখনীর উপর সাহিত্যিক যশঃপ্রতিষ্ঠার পুষ্পবৃষ্টি হউক; এবং তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় বাঙ্গালি মাত্রকে বাঙ্গালা ভাষার উপাসনাব্রতে দীক্ষিত করুক।

৬। "অভিমন্যুবধ।—শ্রীমথুরানাথ সাহা প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রকাশিত।" অভিমন্যুর নাম—অভিমন্যুর বীর-কীর্ত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের অতুল কীর্ত্তি। বঙ্গের পুরাতন কবি কাশীরাম দাসের প্রসাদাৎ বাঙ্গালা সাহিত্যও অভিমন্যুর কথার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। এইরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রসঙ্গ লইয়া কবিতা রচনা এক অংশে কঠিন, আর এক অংশে বড় সহজ। কাঠিন্যটুকু লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরাতন কবিদিগের জন্য; সহজসাধ্য সুগমতাটুকু সমালোচ্য গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ সাহা প্রভৃতি নূতন কবিদিগের জন্য। অভিমন্যুবধের রচনা সরল; কোন কোন স্থান পাঠ করিবার সময় হৃদয় আপনা হইতেই প্রসঙ্গগুণে আর্দ্র হয়। কিন্তু গ্রন্থকার যে যে স্থানে পুরাতন প্রসঙ্গের কথা ছাড়িয়া নানাবিধ নূতন ভাবের সমাবেশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সেই সেই স্থানে তাদৃক্ কৃতার্থতা লাভ করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ তথাপি মোটের উপর সুখ-পাঠ্য।

৫। "ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য।" কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক ও গবর্ণমেণ্টের সহকারী তিব্বতীয়-অনুবাদক শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ,—এম, আর, এ, এস, প্রণীত।" যাঁহারা ভবভূতির বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালতীমাধব মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পড়িয়া সুখী হইবেন; ভবভূতির সহিত যাঁহাদিগের কোনরূপ প্রাণের পরিচয় নাই, তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া নানাবিধ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক কথা শিখিবার সুযোগ পাইবেন।

ভবভূতি প্রকৃতই লোকোত্তর মহাকবি। তিনি মহাকাব্য রচনা করিয়া মহাকবি হন নাই; মহাকবি হইয়াছেন, স্বরচিত কবিতায়, রস-ভাব ও দৃশ্যবর্ণনার মহামহিমময় সৌন্দর্য্য প্রদর্শনের দ্বারা। সে অংশে, এ পৃথিবীতে, অতি অল্প কবি তাঁহার সহিত সমান আসনে বসিবার উপযুক্ত। তিনি মালতীমাধবের এক স্থলে কহিয়াছেন,—

> যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাম্
> জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
> উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
> কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

অর্থাৎ,—যাঁহারা আমার এই কাব্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাঁহারাই তাঁহাদিগের তাদৃশ অবজ্ঞার কারণ অবগত আছেন। আমার এই যত্ন তাঁহাদিগের জন্য নহে। আমার সমান-ধর্ম্মা কোন ব্যক্তি,—যিনি আমার কাব্যের রসস্বাদ গ্রহণে সমর্থ, এমন কোন জন, কালে উৎপন্ন হইতে পারেন, অথবা হয় ত এখনও কো-

থায়ও বিদ্যমান আছেন। কারণ, কালের শেষ নাই; আর এই পৃথিবী ও বিপুলা, উহারও সীমা নাই। এইরূপ হিমাদ্রি-শীর্ষ-স্পর্শি অভিমানের কথা ভারতাভরণ ভবভূতির মুখেই ফুটিয়াছে; আর কোন কবির মুখে ফুটে নাই। কিন্তু ভবভূতি এইরূপ অভিমান প্রদর্শন করিয়াও সাহিত্য-সমাজে উপহসিত হন নাই। তিনি, তিনটি গুণে, প্রায় সমস্ত কবিরই গুরুস্থানীয়। এক গুণ কবিতায় Sublimity অর্থাৎ উচ্চতা অথবা উদাত্ত ভাবের অবতারণা। আর এক গুণ করুণ-বর্ণনা। তৃতীয় গুণ আদিরসে ভক্তি ও পবিত্রতার অপূর্ব্ব যোজনা। শেক্সপীর এবং কালিদাসের এমন অসংখ্য আদিরস-বিলোলা কবিতা আছে, যাহা মনুষ্য সমান-বয়স্ক সুহৃজ্জনের কাছে পাঠ করিতেও লজ্জায় মাথা হেঁট করে। কিন্তু ভবভূতির লেখনী হইতে যে সকল আদিরস-বহুলা মধুর কবিতা অজস্র ঝরিয়াছে, তাহার অনেকটি রসের উচ্ছ্বাসে টল-টল, অথচ কবির বর্ণননৈপুণ্যে মাতা ও দুহিতার নিকটও পঠনার্হ। এ অংশে এমন আশ্চর্য্য শক্তি কবিসমাজে আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই।

এ-হেন ভবভূতির পরিচয় সম্পর্কে বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থ ছিল না, ইহা বড় দুঃখের কথা। পণ্ডিতাগ্রগণ্য বিদ্যাভূষণ সে অভাব কিয়দংশে দূর করিয়াছেন। কিয়দংশে বলিতেছি; কারণ বিদ্যাভূষণ ইতিহাস সংকলন করিতে পারেন; ইতিহাস সৃষ্টি করা তাঁহার শক্তির আয়ত্ত নহে। তথাপি, তিনি বৌদ্ধ ইতিহাসের যে সকল গ্রন্থে দৃষ্টি প্রসারণ করিয়া ভবভূতিসংক্রান্ত বিবিধ বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরও অনায়াস-লভ্য নহে। বিদ্যাভূষণ নবীন যুবা হইয়াও, বিদ্যার গৌরবে প্রবীণ-পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এইরূপ সুকৃতি ব্যক্তিরা সাহিত্যক্ষেত্রে ধৃতব্রত হইয়া পরিশ্রম করিলে, বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ পুষ্ট, প্রসারিত এবং শক্তিসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিবে। সমালোচ্য পুস্তকের নাম "ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য।" ভবভূতির কাব্য তিনখানি একটুকু বিস্তৃত সমালোচনায় সম্মানিত হইলে গ্রন্থ অধিকতর গৌরবান্বিত হইত। গ্রন্থকার পালি ভাষায় পণ্ডিত। তিনি ভবভূতিব্যবহৃত 'কদন' শব্দটিকে পালিশব্দ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, তাঁহার এ অনুমান সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ, 'কদি' ধাতু ইদিত কি না, সে বিষয়ে বৈয়াকরণদিগের মধ্যে মত ভেদ আছে। ভট্টোজিদীক্ষিতের প্রদর্শন অনুসারেও, নন্দীর মতে উহা অনিদিত, স্বামীর মতে ইদিত। এইরূপ মতভেদ স্থলে বৈকল্পিক ব্যবস্থার আশ্রয় লওয়াই সুবিহিত; এবং তাহা হইলে, 'কদন' ও 'কন্দন' উভয় পদই ব্যাকরণ-সঙ্গত।

৭। "ভিক্টোরিয়া মেলা।—স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসূচক। শ্রীবিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত।" গ্রন্থকার বিনয় করিয়া লিখিয়াছেন, "আমি লেখক নহি, সামান্য বেতনভোগী রাজকর্ম্মচারি মাত্র।" কিন্তু তাঁহার এই পুস্তকে, স্থানে স্থানে, লেখার সরল মাধুর্য্য পাঠকের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করিবে। পুস্তকের কোন কোন স্থলে শব্দনির্ব্বাচনে সামান্য দোষ পরিলক্ষিত হইলেও, উহা মোটের উপর সুখ-পাঠ্য এবং শিক্ষার্থীর উপকারজনক।